হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

বিষয়সূচি

পৃষ্ঠাঙ্ক

নিবেদন [৫]

কুঞ্চিকা [১৪]

ভূমিকা [১৭]

দে খা - শো না মা নু ষ

রাজকৃষ্ণবাবুর জীবনী ৩

প্রচার, মাঘ ১২৯৩

প্রাসঙ্গিক তথ্য ৮

ব ঙ্কি ম চ ন্দ্র প্র স ঙ্গ

বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায় ১০

নারায়ণ, বৈশাখ ১৩২২

বঙ্কিমচন্দ্র-১ ২৪

নারায়ণ, আষাঢ় ১৩২৫

বঙ্কিমচন্দ্র-২ ৩৪

মাসিক বসুমতী ; শ্রাবণ, ভাদ্র ১৩২৯

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. সূত্র ৪৭

২. অনুষঙ্গ ৫৭

রাজেন্দ্রলাল মিত্র ৫৮

নারায়ণ , শ্রাবণ, আশ্বিন, ফাল্গুন ১৩২৩

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. সূত্র ৭৫

২. পাঠ-প্রসঙ্গ ৭৬

৩. অনুষঙ্গ ৭৮

রা মে ন্দ্র সু ন্দ র প্র স ঙ্গ

রামেন্দ্রবাবু ৭৯

নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত

'আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর' ১৯২০

পৃষ্ঠাঙ্ক

পুরানো বাংলার একটা খণ্ড ৮৮

বঙ্গশ্রী, মাঘ ১৩৪০

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. সূত্র ৯২

২. পাঠ-প্রসঙ্গ ৯৪

অ র্দ্ধে ন্দু শে খ র প্র স ঙ্গ

অর্দ্ধেন্দু-কথা ৯৮

মানসী ও মর্ম্মবাণী, কার্তিক ১৩২৭

অর্দ্ধেন্দুশেখর-১ ১০৩

নাচঘর, ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১

অর্দ্ধেন্দুশেখর-২ ১০৭

নাচঘর, ২৭ আষাঢ় ১৩৩১

প্রাসঙ্গিক তথ্য ১১১

আশীর্বচন ১১৫

সবুজপত্র, ভাদ্র ১৩২৮

প্রাসঙ্গিক তথ্য ১১৭

অক্ষয়চন্দ্র সরকার ১১৯

ভারতী, ভাদ্র ১৩২৯

প্রাসঙ্গিক তথ্য ১৩৪

দেবেন্দ্রবিজয় বসু ১৩৮

স্বর্ণবণিক সমাচার, বৈশাখ ১৩৩১

প্রাসঙ্গিক তথ্য ১৪১

প্যারীচাঁদ মিত্র ১৪৩

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, চতুর্থ সংখ্যা ১৩৩১

প্রাসঙ্গিক তথ্য ১৫৪

চি ত্ত র ঞ্জ ন প্র স ঙ্গ

বাংলা সাহিত্যে চিত্তরঞ্জন ১৫৯

মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ ১৩৩২

নারায়ণের প্রথম সংখ্যা ১৬৮

বাঙ্গলার কথা, ২ আষাঢ় ১৩৩৫

প্রাসঙ্গিক তথ্য ১৭০

পৃষ্ঠাঙ্ক

৺রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ১৭৫
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, প্রথম সংখ্যা ১৩৩৩
প্রাসঙ্গিক তথ্য ১৭৯

জগদিন্দ্রনাথ রায় ১৮০
মানসী ও মর্ম্মবাণী, শ্রাবণ ১৩৩৩
প্রাসঙ্গিক তথ্য ১৮৫

গুরুদাস-স্মৃতি ১৮৮
মাসিক বসুমতী ; অগ্রহায়ণ, পৌষ ১৩৩৩
প্রাসঙ্গিক তথ্য ২০৮

৺অধরলাল সেন ২১৪
সুবর্ণবণিক সমাচার, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪
প্রাসঙ্গিক তথ্য ২১৬

মহামহোপাধ্যায় মহাকবি মুরারিদান ২১৭
মাসিক বসুমতী, চৈত্র ১৩৩৮
প্রাসঙ্গিক তথ্য ২২৫

অভিভাষণ

সপ্তম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের
অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ ২৩৯
মানসী, বৈশাখ ১৩২১
অভিভাষণের পরিশিষ্ট ২৮৩
মানসী, আষাঢ় ১৩২১
প্রাসঙ্গিক তথ্য ২৮৫

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের
সভাপতির অভিভাষণ : ১৩২১ ৩০৬
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, প্রথম সংখ্যা ১৩২১
প্রাসঙ্গিক তথ্য
১. সূত্র ৩৪২
২. পাঠ-প্রসঙ্গ ৩৫৪

অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের
সাহিত্য-শাখায় সভাপতির সম্বোধন ৩৬০
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, চতুর্থ সংখ্যা ১৩২১
প্রাসঙ্গিক তথ্য ৩৭৩

পৃষ্ঠাঙ্ক

সম্বোধন : সাহিত্য-পরিষৎ ১৩২২ ৩৮০
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, দ্বিতীয় সংখ্যা ১৩২২
প্রাসঙ্গিক তথ্য
১. সূত্র ৪২০
২. পাঠ-প্রসঙ্গ ৪২৮

সভাপতির অভিভাষণ : সাহিত্য-পরিষৎ ১৩২৯ ৪৩৩
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, প্রথম সংখ্যা ১৩২৯
প্রাসঙ্গিক তথ্য ৪৪৯

সভাপতির অভিভাষণ : সাহিত্য-পরিষৎ ১৩৩৭ ৪৫৫
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, দ্বিতীয় সংখ্যা ১৩৩৭
প্রাসঙ্গিক তথ্য ৪৬৯

বাংলা বাঙ্ময়

বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি ৪৭৫
বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮৫
প্রাসাঙ্গক তথ্য ৪৯৩

বাংলা সাহিত্য, বর্তমান শতাব্দীর ৪৯৪
সাবিত্রী, আশ্বিন ১২৯৩
প্রাসঙ্গিক তথ্য
১. সূত্র ৫২৫
২. পাঠ-প্রসঙ্গ ৫৪৭
৩. অনুষঙ্গ ৫৫০

নূতন কথা গড়া ৫৫২
বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮

বাংলা ভাষা ৫৫৯
বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১২৮৮
প্রাসঙ্গিক তথ্য ৫৬৭

মুসলমানি বাংলা
শুজ্জু উজ্জাল বিবির কেচ্ছা ৫৬৮
বিভা, ফাল্গুন ১২৯৪
প্রাসঙ্গিক তথ্য ৫৭৫

		পৃষ্ঠাঙ্ক
কবি কৃষ্ণরাম		৫৭৮
সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩০০		
প্রাসঙ্গিক তথ্য		
১. সূত্র	৫৮৯	
২. অনুষঙ্গ	৫৯১	
বাংলা ব্যাকরণ		৫৯৩
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, প্রথম সংখ্যা ১৩০৮		
প্রাসঙ্গিক তথ্য		
১. সূত্র	৬০৩	
২. অনুষঙ্গ	৬১৫	
রাধামাধবোদয়		৬১৯
নারায়ণ ; অগ্রহায়ণ ১৩২২ বৈশাখ ১৩২৩		
প্রাসঙ্গিক তথ্য	৬৪০	
চ ণ্ডী দা স প্র স ঙ্গ		
চণ্ডীদাস-১		৬৪২
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, দ্বিতীয় সংখ্যা ১৩২৫		
চণ্ডীদাস-২		৬৫৫
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, চতুর্থ সংখ্যা ১৩২৯		
প্রাসঙ্গিক তথ্য	৬৮৩	
বাংলার পুরানো অক্ষর		৬৮৭
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, প্রথম সংখ্যা ১৩২৭		
প্রাসঙ্গিক তথ্য	৭২৬	
বাংলা সাহিত্য		৭২৮
বাসন্তিকা, প্রথম খণ্ড ১৩২৯		
প্রাসঙ্গিক তথ্য	৭৪৫	
ডাক ও খনা		৭৫১
প্রাচী, শ্রাবণ ১৩৩০		
প্রাসঙ্গিক তথ্য	৭৬০	
বিদ্যাপতি		৭৬১
'কীর্ত্তিলতা', ১৩৩১		

পৃষ্ঠাঙ্ক

প্রাসঙ্গিক তথ্য
১. সূত্র ৭৮২
২. পাঠ-প্রসঙ্গ ৭৮৬

এখনকার থিয়েটার ৭৮৮
নাচঘর, ২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১
প্রাসঙ্গিক তথ্য ৭৯১

প রি শি ষ্ট

The Late Bankim Chandra Chatterji ৭৯৫
The Calcutta University Magazine, May 1894.
Report of the Bengal Library
Krishna Charitra ৮০৫
Rajsinha ৮০৬
Vernacular Literature of Bengal Before
The Introduction of English Education. ৮০৭
Ancient Bengali Literature Under Muhammadan
Patronage ৮৩০
Proceedings, Asiatic Society of Bengal, 1894.
Notices of Sanskrit MSS ৮৩৫
Vol. XI, 1895.
Bengali Buddhist Literature ৮৪০
The Calcutta Review, 1917.
অ নু ক্র ম ণী ৮৬১
সংযোজন-সংশোধন ৮৮৫

চিত্রসূচি

	পৃষ্ঠাঙ্ক
আলোকচিত্র	
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	প্রবেশক
লুইপাদ	৪৩২
কঙ্করীপাদ	৪৩২
কুক্কুরীপাদ	৪৩৩
নাগার্জুন	৪৩৩

পাণ্ডুলিপিচিত্র

ফিনিসীয়, মোআবাইট ও ব্রাহ্মী ৬৯০ ব্রাহ্মী হইতে বাংলা ৬৯১ হরিবর্মদেবের রাজত্বে যশোহরে লেখা বৌদ্ধপুথির স্বরবর্ণ ৬৯৪ হরিবর্মদেবের রাজত্বে যশোহরে লেখা বৌদ্ধপুথির ব্যঞ্জনবর্ণ ৬৯৪ হরিবর্মদেবের রাজত্বে যশোহরে লেখা বৌদ্ধপুথি ৬৯৬ ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি ৬৯৬ বজ্রাবলী ৬৯৮ কালচক্রাবতার ৬৯৮ চর্যাগীতি ৭০০ কুট্টনীমতম্ ৭০২ হেবজ্রতন্ত্রটীকা ৭০২ রামচরিতমূল ৭০৪ রামচরিতটীকা ৭০৪ দোহাকোষপঞ্জি ৭০৪ দোহাকোষের বর্ণমালা ৭০৬ অপোহসিদ্ধি ৫০৭ সুভাষিতসংগ্রহ ৭০৮ পঞ্চরক্ষা ৭০৮ জীমূতবাহনের ধর্মরত্ন ৭১০ কুসুমাঞ্জলি প্রকাশ প্রথম অংশ ৭১০ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ৭১২ বোধিচর্যাবতার ৭১২ কাশীদাসের আদিপর্ব ৫১৩ অঙ্গদরায়বার ৭১৪ জৈমিনিভারত ৭১৫ হরিবর্মদেবের মন্ত্রী ভবদেব ভট্টের শিলাপত্র ৭১৬ বিজয়সেনের দেবপাড়া প্রশস্তি ৭১[illegible] বল্লালসেনের সীতাহাটি প্রশস্তি ৭২০ বল্লভদেবের শিলাপত্র ৭২১ লক্ষ্মণসেনের তর্পণদিঘি তাম্রপত্র ৭২২ বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসন ৭২৩ চট্টগ্রাম তাম্রশাসন ৭২৪

ভূমিকা

রচনা-সংগ্রহের দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত হল বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য শাস্ত্রীর (১৮৫১-১৯৩১ খৃ.) যাবতীয় রচনা এবং তাঁর দেখা-শোনা মানুষদের সম্পর্কে স্মৃতিচারণ-মূল্যায়নে মেশানো একুশটি প্রবন্ধ।

শাস্ত্রীমশায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কোনো পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখেন নি। কিন্তু তাঁর অভিভাষণগুলি এবং সেকাল ও একালের প্রধান লেখকদের সম্পর্কে নানা উপলক্ষে লেখা সব প্রবন্ধ সাজিয়ে দেখলে বাংলা ভাষা-সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশের একটা যুক্তিযুক্ত কাঠামো রূপরেখায় ফুটে ওঠে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আজ আমরা যে পূর্ণতায় পাচ্ছি, তার তথ্যভিত্তির মূল্যবান উপাদান বেশির-ভাগ তাঁরই আবিষ্কার। সারা জীবনের শ্রমে এবং নিষ্ঠায় তিনি অস্পষ্ট অন্ধকার অধ্যায়গুলির সাহিত্যকৃতির সাক্ষ্য উদ্ধার করেছেন, বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণে ছিন্ন সূত্রগুলি যোজনা করে বাঙালির সাহিত্যিক-মানসের ধারাবাহিকতা প্রস্ফুট করে তুলেছেন। এসব লেখার অনেকটাই এতদিন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে ছিল। হয়তো সেইজন্যেই বিশেষ কোনো রচনা বিশেষ উপলক্ষে বিবেচিত হলেও সমগ্রভাবে বাংলা ভাষা-সাহিত্যের ইতিহাস গড়ে তোলায় তাঁর ভূমিকা বা তাঁর সাহিত্য-ভাবনার তাৎপর্য নিয়ে আলোচনার সুযোগ হয় নি। একটি বইয়ে সংকলিত হওয়ায় তাঁর কীর্তিময় জীবনের এই বিশেষ দিকটি সম্পর্কে অবহিত হওয়া এখন সহজ হবে আশা করা যায়।

হরপ্রসাদ ছিলেন শৃঙ্খলাপরায়ণ ব্যক্তিত্বের মানুষ। তরুণ বয়স থেকেই তাঁর ভাবনায় এবং কাজে চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কোনো কাজেই তিনি অকস্মাৎ হাত দেন নি। সুস্থির বিবেচনায় সংকল্প গঠন করেছেন এবং সংকল্প উদ্‌যাপনের জন্যে পরিবেশের মধ্যে যতটা সুযোগ পাওয়া সম্ভব, আয়ত্ত করতে চেষ্টা

করেছেন। নিরলস প্রযত্নে চিন্তায় জেগে ওঠা অনুমানকে তথ্যের ভিত্তিতে প্রামাণ্য করে তুলেছেন। সাহিত্যের কোনো প্রত্ন-তথ্য হাতে এলে আবিষ্কারের উত্তেজনায় তখনি প্রকাশ না করে সেই প্রাচীন রচনার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে বুঝতে চেষ্টা করেছেন, কোন্ সামাজিক পরিমণ্ডলে, কোন্ ধ্যান-ধারণার পরিপোষণে রচনাটি তৈরি হতে পেরেছিল এবং সাহিত্যিক উৎকর্ষের বিচারে তার মূল্য কতটা। ইতিহাস-বোধ এবং স্থির সাহিত্য-বোধের এমন মিলন তাঁর সময়ের ভারতীয় গবেষকদের মধ্যে দুর্লভ। এই সাবালক আধুনিক সাহিত্যিক-বুদ্ধির জন্যেই তাঁর যে-কোনো রচনা আজও আমাদের মগ্ন মনোযোগে টেনে রাখে এবং তাঁর সাবলীল স্বচ্ছ গদ্যের প্রসাদগুণে বিচার-মূলক প্রবন্ধেও সাহিত্যিক তৃপ্তি পাওয়া যায়। মাঝে মাঝেই চমকে উঠতে হয় তাঁর বিচক্ষণ মন্তব্যে, যে-সব মন্তব্য আজকের অনেক অগ্রসর, সচেতন সাহিত্য-রুচির নিরিখেও মনে হয় একান্ত যথার্থ এবং প্রাসঙ্গিক এবং অনুমোদন-যোগ্য। নিছক গবেষণা-নিবন্ধগুলিও তাই মামুলি গবেষণা-নিবন্ধের সীমা ছাড়িয়ে ওঠে এবং বাংলায় মনন-জাত সাহিত্যের আপেক্ষিক দীনতা অনেকটা ঘোচে তাঁর রচনাবলী হাতের কাছে পেলে।

২

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লেখক জীবনের প্রথম পর্বকে বলা যায় 'বঙ্গদর্শন'-পর্ব, ১২৮২-৯০ বঙ্গাব্দ : ১৮৭৫-৮৩ খৃস্টাব্দ। বয়সের হিসাবে ৩০ বছর অবধি। এই ৮ বছরে অবশ্য তিনি 'আর্য্যদর্শন', 'কল্পনা' ও 'নব্যভারত' পত্রিকায়ও লিখেছেন। এর মধ্যে বঙ্গদর্শনের চারটি প্রবন্ধ, "বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি" (পৌষ ১২৮৫ ব.) "বাংলা সাহিত্য, বর্তমান শতাব্দীর" (ফাল্গুন ১২৮৭ ব), "নূতন কথা গড়া" (জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮ ব.) এবং "বাংলা ভাষা" (শ্রাবণ ১২৮৮ ব.) আপাতত প্রাসঙ্গিক।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগের শিক্ষিত বাঙালি যুবকের মনের গড়নের উপরে কালিদাস, বায়রন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার প্রভাব দেখিয়েছেন প্রথম প্রবন্ধে। লখনৌ প্রবাস থেকে পাঠানো হরপ্রসাদের এই প্রবন্ধ পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র খুব খুশি হয়েছিলেন। মন্তব্য করেছিলেন,

কোনো জর্মন পণ্ডিতের লেখা মনে হয়। খুশি হবারই কথা, কারণ, প্রবন্ধটিতে হরপ্রসাদ বঙ্কিমচন্দ্রের অনুমোদিত সাহিত্য বিচারের নিরিখ নিপুণভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত তরুণের সামাজিক মূল্যবোধ এই তিন লেখকের সৃষ্টি থেকে আহরণ করা উপাদানে কিভাবে গড়ে ওঠে দেখাতে হরপ্রসাদ মূলত সাহিত্যের সামাজিক উপযোগিতাকেই নিরিখ হিসাবে মেনেছেন। কোনো শিল্পবস্তু বা শিল্পস্রষ্টার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে ভাবনায় একটা দৃষ্টিভঙ্গির অবস্থান ফুটে ওঠেই। তারই মধ্যে প্রতিফলিত হয় মূল্যবিচারের তত্ত্বভিত্তি। শিল্প-সাহিত্যের মূল্য বিচারের নিরিখ সামাজিক উপযোগিতা, পজিটিভিস্ট দর্শনের আনুগত্য-জাত বঙ্কিমচন্দ্রের এই ধারণার বৃত্তে হরপ্রসাদের সাহিত্য-দৃষ্টির উন্মেষ। বঙ্গদর্শনের তরুণ লেখকের উপরে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনার প্রভাব খুব স্বাভাবিক। কিন্তু এ অবস্থান থেকে হরপ্রসাদ ক্রমেই দূরে সরে গেছেন। শিল্প-সাহিত্যের স্বাশ্রয়ী সৌন্দর্যমূল্যে বিশ্বাসের দিকে এগিয়েছেন।

"বাংলা সাহিত্য, বর্তমান শতাব্দীর" প্রবন্ধটিকে আজও মনে হয় আধুনিক কালের বাংলা সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের একটি নির্ভরযোগ্য খসড়া। এই প্রথম স্বদেশের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ক্রান্তির তাৎপর্যের সঙ্গে সংলগ্ন করে আধুনিক সাহিত্যের অভ্যুদয় এবং বিকাশের পুরো চেহারা ফোটানোর চেষ্টা। লেখাটির বাঁধুনির মূলে আছে কালান্তরের মর্ম সম্পর্কে তখন পর্যন্ত যতটা সম্ভব স্বচ্ছ ধারণা। বাংলার পুরানো সমাজের ভাঙন এবং নিরাশ্রয় বিদ্যাজীবী-সাহিত্যজীবী সম্প্রদায় উচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় ক্ষোভের সুর আছে এ লেখায়। কৃষি-নির্ভর সমাজের আবহমান বিন্যাস বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ার মূল কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আছে। কিন্তু কালান্তরের বাস্তবতা তিনি স্বীকার করেছেন। বাঙালির আধুনিক সংস্কৃতির নতুন কেন্দ্র কলকাতা মহানগরের উত্থান, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রগতি-ভূমিকা, তাঁর সমীক্ষায় যথাযথ তাৎপর্য পায়। "পরিবর্তন সময়ের" উদ্দীপনা সাহিত্যে বিকশিত হল মনন ও সৃজনের শাখা-প্রশাখায়, এ সাহিত্যকে তিনি দেখেন বাঙালি মানসের নবজন্মের প্রামাণ্য দলিল হিসাবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রাসঙ্গিক মন্তব্যে বিশেষ বিশেষ লেখকের বা লেখক-গোষ্ঠীর ঐতিহাসিক

গুরুত্ব ধরিয়ে দেন। যেমন, কবিতায় আধুনিকত্বের দিক থেকে মধুসূদনের রচনার গুরুত্ব, বঙ্গদর্শন-গোষ্ঠীর লেখকদের মনন ও সুরুচিশীলতা, ভারতীর লেখকদের রুচির উৎকর্ষ বা তরুণ রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ মানসিক শক্তির আভাস। বাংলায় তখন অনেক সাহিত্যিক-গোষ্ঠী, এ'দের মধ্যে বিরোধিতাও ছিল। কিন্তু হরপ্রসাদ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সমীক্ষাটি প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁর এই ইতিহাসদৃষ্টির শুদ্ধতার সঙ্গেই উল্লেখযোগ্য তাঁর সাহিত্যদৃষ্টির পরিবর্তন। স্পষ্টই বললেন, "নীতিশিক্ষা কাব্যে অতি অল্প-প্রশংসা", মূল বিবেচ্য সৌন্দর্য-রুচি।

ইতিহাসের বাঁক ফেরায় চিন্তা-চেতনার, তত্ত্ববিশ্বের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রকাশের ভাষা নিয়ে সমস্যা দেখা দেওয়া খুব স্বাভাবিক। আধুনিক বাংলার সাহিত্যিক ভাষার সংকট সংগতভাবেই হরপ্রসাদের গভীর মনোযোগের বিষয় হয়ে ওঠে। "নূতন কথা গড়া" এবং "বাংলা ভাষা" প্রবন্ধ দুটিতে দেখিয়েছিলেন, শিক্ষার হেরফেরে নতুন-গড়ে-ওঠা আধুনিক চিত্তস্তরটির বিচ্ছিন্নতাই সংকটের মূল। তিনি বোঝেন এবং বিশ্বাস করেন, স্বদেশের আশা ভরসার আশ্রয় এই আধুনিক মন। অথচ দেশের ব্যাপক জন-মানসের সঙ্গে এর যোগের সেতু নেই। সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন কৃতী ছাত্র হরপ্রসাদ বলেন, দুর্ভাগ্য এই যে গোড়ার দিকে আধুনিক সাহিত্যের ভাষা গড়ে তোলার ভার পড়েছিল পণ্ডিতদের উপর। পাণ্ডিত গদ্যের তিনটি উৎকট নমুনা তুলেছেন, যার একটি স্বয়ং বিদ্যাসাগরের লেখা, অন্য দুটি তারাশঙ্কর তর্করত্ন এবং অক্ষয়কুমার দত্তের (দ্র. পৃ. ৫৬৩-৫৬৫)। অন্য দিকে ইংরেজি-নবিশদের মারাত্মক বাংলার নমুনাও দেখিয়েছেন। ত্রাণের কোনো উপায় স্পষ্ট করে বলতে পারেন নি, তবুও ব্যাপক জন-বোধ্য ভাষাশৈলী উদ্ভাবনের ব্যাকুলতা অনুভব করা যায়।

লেখা দুটিতে এমন অনেক ইঙ্গিত আছে যা থেকে অনুমান করা যায়, কোনো একপেশে গোঁড়ামি প্রশ্রয় না দিয়ে চলতি আরবি-পারসি এবং চলতি সংস্কৃত শব্দের উপরে নির্ভর করা, চলতি বাক্‌রীতির উপরে নির্ভর করা তাঁর কাম্য। এ ইঙ্গিত পরে তাঁর নানা লেখায় বিশদ করেছেন। শ্যামাচরণ গাঙ্গুলির "চেলা" হরপ্রসাদ কথিত ভাষা আর লিখিত ভাষার বিচ্ছেদ সম্পর্কে

শ্যামাচরণের প্রবন্ধ "Bengali, Spoken and Written" (*Calcutta Review*, CXXX, 1877) থেকে মূল দৃষ্টি পেয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের "বাঙ্গালাভাষা" প্রবন্ধ ('বঙ্গদর্শন', জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫ ব.) হরপ্রসাদের ভাবনা উদ্দীপ্ত করে। আধুনিক সাহিত্যের ভাষা সম্পর্কে শ্যামাচরণ বলেছিলেন, "Most of our writers are fully under the sway of this supposed purity-of-style fetish." বাস্তব জীবনে সাধারণের আচরণে যে স্বাভাবিক কাণ্ডজ্ঞান প্রকাশ পায় তার মধ্যেই শ্যামাচরণ ভাষাশৈলীর বৈজ্ঞানিক যুক্তি পেয়েছেন. "Men could not indeed, be so irrational as to invent more than one arbitrary symbol for one and the same thing. Among the many significant symbols expressive of the same idea, there was a struggle for existence and survival in the long run, of the fittest." এইভাবে চলতি বাংলায় প্রচল যেসব শব্দ দাঁড়িয়ে গেছে, তা সরিয়ে দেবার চেষ্টা, তাঁর মনে হয়েছে, কৃত্রিম এবং অবৈজ্ঞানিক। হরপ্রসাদের ভাষাশৈলী ভাবনায় এই দৃষ্টিরই প্রসার ঘটেছিল।

১৮৮০ থেকে ১৮৯৪-৯৫-এর মধ্যে শিক্ষানবিশির পর্ব পেরিয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভারতবিদ্যার গবেষণায় নেতৃপদ অর্জন করেন। তাঁর ব্যক্তিগত বিদ্যাচর্চা এবং সমকালীন ভারতবিদ্যা চর্চার সংগঠন ও পরিচালনার ইতিহাসের দিক থেকে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ খুব গুরুত্বপূর্ণ। ছাত্রজীবনের শেষে ১৮৭৭-৭৮ খৃস্টাব্দেই যোগাযোগের সূত্রপাত, তবে রাজেন্দ্রলালের গবেষণা-সহযোগী রূপে পুরো মর্যাদা পেয়েছিলেন ১৮৮০-৮২তে, *The Sanskrit Buddhist Literature* (১৮৮২ খৃ.) সংকলনের সময়ে।

হজ্‌সন (Brian Houghton Hodgson, ১৮০০-৯৪ খৃ.) ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের একজন বিচক্ষণ সদস্য। ১৮৩৩ থেকে ৪৩ পর্যন্ত তিনি নেপালে

ভারত সরকারের প্রতিনিধি রেসিডেন্ট পদে ছিলেন। কোম্পানির প্রশাসনের স্বার্থে শুধু নেপাল নয়, চীনের ভেতর পর্যন্ত দৃষ্টি রাখতেন। অসামান্য মেধা ও শ্রমে হজ্‌সন এই দুর্গম অঞ্চলের প্রকৃতি ও মানবসমাজ সম্পর্কে বিস্ময়কর তথ্য আহরণ করেছিলেন। ভারতীয় উপনিবেশে সাম্রাজ্যের ভিত্তি পাকা করা এবং প্রভাবের এলাকা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ইংলন্ডের যে-সব মেধাবী মানুষ এখানকার মাটি ও মানুষকে বুঝবার কাজে আজীবন নিবিষ্ট থেকেছেন, হজ্‌সন তাঁদের অন্যতম। নেপালের পণ্ডিত অমৃতানন্দের সহায়তায় ইনিই বহু মূল্যবান বৌদ্ধ পুথি সংগ্রহ করে এনেছিলেন। সে সংগ্রহ গচ্ছিত হয় কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি, লন্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, অক্স্‌ফোর্ডের বর্ডালিয়ান লাইব্রেরি এবং প্যারির সোসাইতে আশিয়াতিক্‌-এ। দক্ষিণী বৌদ্ধবিদ্যার পরিচয় য়ুরোপের গোচরে আসে প্রায় ষোড়শ শতাব্দী থেকে, পর্তুগিজদের মাধ্যমে। কিন্তু উদীচ্য বৌদ্ধবিদ্যার চর্চা শুরু হয়েছে অনেক দেরিতে। হজ্‌সনের বিরাট সংগ্রহই বৌদ্ধবিদ্যার এই নতুন শাখায় গবেষণার তথ্যভিত্তি। হজ্‌সন নিজে এবং ক্যর‍্যস (Coros de Csoma, ১৭৮৪-১৮৪২ খৃ), বুর্নুফ (Eugene Burnouf, ১৮০১-৫২ খৃ.), ভ্যাসিলিয়েভ (Vasily Pavlovich Vasilyev, ১৮১৮-১৯০০ খৃ) ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র ভারতীয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি অজানা অধ্যায়ের পরিচয় উদ্‌ঘাটন করে দিলেন। রাজেন্দ্রলালের গবেষণা-সঙ্গী রূপে হরপ্রসাদ ভারতবিদ্যা চর্চার এই জগতে প্রবেশের সুযোগ পান। এখানকার প্রাত্যহিক কাজের ভেতর দিয়ে প্রাচীন পুথির পাঠ উদ্ধার, তুলনামূলক বিবেচনায় সঠিক পাঠ নির্ণয়, লিপির ছাঁদ ও বিবর্তন বুঝতে শেখা, ভাষাগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ এবং বিষয়ের তাৎপর্য উন্মোচনের আধুনিক গবেষণা-পদ্ধতি যেমন তিনি আয়ত্ত করেছেন, তেমনি দিনে দিনে তাঁর সৃজনপর মনীষা স্বাধীনভাবে স্বদেশের আবহমান ইতিহাসের অন্ধকার অধ্যায়গুলি আলোকিত করে তোলার নতুন নতুন সূত্র উদ্‌ভাবন করেছে। সব গবেষণাতেই জানা সত্যের উপরে ভর করে নতুন প্রকল্প গঠন করতে হয় এবং নিরন্তর অন্বেষণ-পর্যবেক্ষণে, তথ্যে-যুক্তিতে অনুমানকে প্রামাণ্য করে তুলতে হয়।

শাস্ত্রীমশায়ের কাজেও এই একই পদ্ধতি দেখা যাবে। কত বিচিত্র বিষয় নিয়ে লিখেছেন এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায়, ছোটো বড়ো কত লেখা। তার মধ্যে কিছু কিছু বিষয় থেকে মনোযোগ সরে গেছে। অনুসরণ করেন নি। অনুমান ভুল প্রমাণ হয়েছে। কিন্তু উদীচ্য বৌদ্ধবিদ্যায় তাঁর কাজ সারা বিশ্বে মৌলিক গবেষণার মর্যাদা পেল। বিংশ শতাব্দীর তিন দশক পর্যন্ত য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা তাঁকেই ভারতীয় গবেষকদের মধ্যে এ বিষয়ে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মানুষ মনে করতেন। বৌদ্ধবিদ্যা বিষয়ে প্রামাণ্য বইপত্রের তথ্যগত উৎস নির্দেশে তাঁর রচনাবলীর উল্লেখ এবং তাঁকে লেখা চিঠিপত্রে (স্মারকগ্রন্থ দ্র.) এই মর্যাদার স্বীকৃতি দেখা যায়।

এই চর্চার অনুষঙ্গেই তাঁর মনে হয়, মুসলমান আমলের এদিকের কিছু কাব্য-কবিতাই হয়তো প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সব নয়। বাঙালির ইতিহাস এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আরো দূর কাল থেকে সূচিত হয়ে থাকতে পারে। কারণ তিনি দেখলেন, কোনো কারণে বাংলা বিহার অঞ্চলের অসংখ্য বই নেপালে তিব্বতে চলে গেছে। বাঙালি সংস্কৃতির একটা আদি স্তরের, মুসলমান আমলের আগের পর্বের যা-কিছু তথ্য, সব নেপাল তিব্বতের পথে মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। একটি দৃঢ় সূত্র পেলেন পুঁথিপত্রে বাংলা লিপির বিবর্তনের মধ্যে। নানা ধরনের পুঁথিপত্রে স্বতন্ত্র কোনো লিপি ব্যবহার ব্যাপক বিদ্যাচর্চার এবং বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির প্রমাণ। ১৮৮১ থেকে ৯১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত রাজেন্দ্রলালের অভিভাবকত্বে কাজের ভেতর দিয়ে শাস্ত্রীমশায় যেমন ভারতবিদ্যার নানা শাখায় গবেষণা-কর্তৃত্ব বহনের যোগ্যতা অর্জন করেছেন, তেমনি স্বাধীনভাবে অনুসরণের মতো নিশ্চিত অনেক প্রকল্প নিজের ধারণায় স্পষ্ট উপলব্ধি করেছেন। এই-সব প্রকল্পের অন্যতম, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস উন্মোচন। বঙ্গদর্শন পর্বে সূচিত আগ্রহ এশিয়াটিক সোসাইটির পরিবেশে পরিণতি পেল একটি স্থির সংকল্পে।

স্বাধীনভাবে কাজের সুযোগ এল ১৮৯১ খৃস্টাব্দে। এই বছরে রাজেন্দ্রলালের মৃত্যু হয় এবং শাস্ত্রীমশায় সোসাইটির ডিরেক্টর অফ দি অপারেশন ইন সার্চ অফ স্যান্‌স্‌ক্রিট ম্যানস্‌ক্রিপ্টস্‌ পদে নিযুক্ত হন।

রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুতে ১৮৮৯-৯১ এর *Notices of Sanskrit MSS* Vol. X. হরপ্রসাদই প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। এই নোটিসে বাংলা পুথির উল্লেখ নেই। কিন্তু তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রথম তিন বছরের কাজের বিবরণ *Notices*-এর একাদশ খণ্ডের (১৮৯৫ খৃ.) ভূমিকায় পৃথকভাবে বাংলা পুথি সন্ধানের কথা উল্লেখ করেছেন। বলছেন, এতদিন মনে করা হত বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব ষোড়শ শতাব্দীতে, চৈতন্যের অনুগামী বৈষ্ণবদের হাতে। মাত্র তিন বছরের অনুসন্ধানেই এ ধারণা ভুল প্রমাণ হয়ে গেছে। পাওয়া গেছে ১৪৯৫ খৃস্টাব্দে লেখা বিপ্রদাস পিপ্পলাই-এর মনসামঙ্গল সমেত ধর্মমঙ্গল, রামায়ণ, শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়, মহাভারত, কৃষ্ণমঙ্গল, অদ্ভুত রামায়ণ, কালিকামঙ্গল প্রভৃতি পুথি। অনুমান করছেন, বাংলা সাহিত্য চতুর্দশ পঞ্চদশ শতাব্দীতে অপেক্ষাকৃত নিচু বর্ণের মানুষের হাতে পরিপোষিত হয়েছিল, কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই সমাজের উপরের দিকের মানুষেরাও নিজেদের ধর্মবিশ্বাস প্রচারের জন্য বাংলায় লেখা শুরু করেন। সৈয়দবংশীয় শাসকদের আনুকূল্যে এই সাহিত্যের শ্রী বেড়েছে। চৈতন্যের প্রভাবে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। বহু বই লেখা হল বাংলায়। কারণ, বাংলা ভাষাই ছিল চৈতন্যের ধর্মপ্রচারের প্রধান মাধ্যম। চৈতন্যের অনুগামীদের প্রভাব কমে এলে ব্রাহ্মণ্যবাদীরাও বাংলা লেখা শুরু করেন (পরিশিষ্ট দ্র.)। এখানে এসব অনুমানের যথার্থতা বিচারের প্রয়োজন নেই। দেখা যাচ্ছে, এশিয়াটিক সোসাইটির সরকারি নিয়ন্ত্রণের সীমাবদ্ধতার মধ্যেও শাস্ত্রীমশায় যতটা সম্ভব সুযোগ তৈরি করে নিয়েছেন। সংস্কৃত পুথি খোঁজার সঙ্গে সঙ্গে জেলায় জেলায় বাংলা পুথি উদ্ধারের কাজ শুরু করেছেন।

এই পর্বেরই আর-একটি উল্লেখ করার মতো ঘটনা বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ানের পদে তাঁকে নিয়োগ। ১৮৮৬তে তিনি এই দায়িত্ব পান এবং ১৮৯৪ পর্যন্ত ৮ বছর কাজ করেন। সমস্ত ছাপা বই বেঙ্গল লাইব্রেরিতে জমা পড়ত, লাইব্রেরিয়ানের কাজ ছিল এই-সব বই সম্পর্কে বাৎসরিক রিপোর্ট তৈরি করে দেওয়া। শাস্ত্রীমশায়ের লেখা রিপোর্টগুলি সারা বছরের প্রাচীন ও আধুনিক ছাপা বইয়ের বিবরণ মাত্র নয়। তিনি সমকালীন সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি ফুটিয়ে তুলতেন। গুরুত্বপূর্ণ বই

এবং লেখকের তাৎপর্য ধরিয়ে দিতেন। এই সংকলনে রিপোর্ট থেকে তোলা প্রাসঙ্গিক অংশগুলি দেখলে এ বিষয়ে কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে। কোনো বই বা লেখক সম্পর্কে মন্তব্যে প্রকাশ পেত তাঁর ব্যক্তিগত বিচার এবং রুচি। তাঁকে বোঝার পক্ষে রিপোর্টগুলি তাই মূল্যবান। বেঙ্গল লাইব্রেরির কাজে বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ এবং সম্পৃক্ততা গভীর হয়েছিল।

এই সময়েই তিনি লেখেন *Vernacular Literature Of Bengal Before The Introduction Of English Education* (১৮৯১ খৃ.) পুস্তিকাটি (পরিশিষ্ট দ্র.)। "বাংলা সাহিত্য, বর্তমান শতাব্দীর" প্রবন্ধে যেমন আধুনিক কালের বাংলা সাহিত্যের একটি রূপরেখা তৈরি করেছিলেন, তেমনি এই পুস্তিকায় তখন পর্যন্ত জানা তথ্যের ভিত্তিতে পুরানো কালের সাহিত্যের একটি রূপরেখা ফুটিয়ে তোলেন। শাস্ত্রীমশায় নিজেই বলেছেন, কম্বুলেটোলা রিডিং ক্লাবের বাৎসরিক উৎসবে এই প্রবন্ধ পড়ার সময়ে উপস্থিত শ্রোতারা প্রাচীন বাংলায় এত বই লেখা হয়েছিল শুনে অবাক হয়ে যান। অথচ তিনি প্রধানত ছাপা যেসব বই পাওয়া যায় তারই উল্লেখ করেছিলেন। এই প্রবন্ধের সঙ্গে "Ancient Bengali Literature under Muhammadan Patronage" (1894) প্রবন্ধটি (পরিশিষ্ট দ্র) একসঙ্গে দেখলে এখন যাকে আমরা বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ বলছি— সেই কালপর্বের সাহিত্যের ইতিহাসের একটি পুরো খসড়া পাওয়া যায়।

খসড়াটিকে পূর্ণ অবয়ব দেবার জন্যে প্রয়োজন ছিল আরো ব্যাপক অনুসন্ধান। এ কাজ একা করা যায় না। একই বিষয়ের বিভিন্ন পুঁথি হাতে না এলে সাহিত্যের সেই শাখার বিস্তার, বিবর্তন এবং জনপ্রিয়তার এলাকা সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হয় না। আবার শৃঙ্খলাময় অনুসন্ধানেই জানা শাখাগুলির বাইরের ভিন্ন ধরনের রচনার পরিচয় আয়ত্তে আসতে পারে। কোনো-না-কোনো ধরনের সংগঠন ভিন্ন শৃঙ্খলাবদ্ধ অনুসন্ধান সম্ভব নয়। সোসাইটির ভেতরের সামান্য সুযোগের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগের সামঞ্জস্য ঘটিয়ে তাই তিনি বাংলা পুঁথি খোঁজার একটা সংগঠন তৈরি করেন। এই যোগাযোগের মধ্যে দীনেশচন্দ্র সেনের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের কথা বিশেষভাবে মনে

করা যায়। তিনি ছাড়া বিভিন্ন সময়ে শাস্ত্রীমশায়ের 'ট্রাভেলিং পণ্ডিত' যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মাধ্যমে দূর দূর অঞ্চলে যোগাযোগ করতেন। আরো কিছু পরে যোগাযোগ হয় চট্টগ্রামের মৌলবি আবদুল করিমের সঙ্গে। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'র ভূমিকায় দীনেশচন্দ্রের স্বীকৃতি বা আবদুল করিমের চিঠি (স্মারকগ্রন্থ, পৃ. ৬৫) দেখলে বোঝা যায়, কিভাবে তখন শাস্ত্রীমশায় প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে সাহিত্যের ইতিহাসের তথ্যভিত্তি গড়ে তোলার কাজ পরিচালনা করতেন, প্রেরণা যোগাতেন।

৪

১৩০১ বঙ্গাব্দ, ১৮৯৪ খৃস্টাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পত্তন হল। তখন পর্যন্ত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যতটা প্রসার ঘটেছিল, ৭০/৭৫ বছরের শিক্ষাদীক্ষার নতুন পরিবেশে ভারতীয় উপনিবেশের খণ্ডিত আধুনিকতার আলো-হাওয়ায় বাঙালি মধ্যবিত্তের মন যতটা পরিণতি পেয়েছিল, তারই ভেতর থেকে জেগে উঠেছিল নানান্ সীমাবদ্ধতার যন্ত্রণা। চেতনার দিক থেকে যাঁরা অগ্রসর, তাঁরা অনুভব করছিলেন কলকাতাটাই স্বদেশ নয়। আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতির এই এলাকাটি যেন দেশের মধ্যে এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। চাকরিজীবী অস্তিত্বের বাস্তব সীমাবদ্ধতার মতোই মানসিক পুষ্টি ও মর্যাদা পাবার উপায়ও এই পরিবেশে একান্ত সীমাবদ্ধ। ইংরেজ রাজত্বের মহিমার চমক যে ভেঙেছিল তখনই এমন নয়, তবুও আত্মমর্যাদা সম্পর্কে একটা নতুন বোধ জেগে উঠেছিল। মর্যাদার ভিত্তি যথার্থ আত্মপরিচয়ে। সে পরিচয়ও বিদেশীদের পুঁথিপত্র যেমন জানায় তার বেশি জানা নেই। এই গ্লানি এবং বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা নানাভাবে প্রকাশ পেত সমকালীন সাহিত্যে, গানে। ক্ষোভের বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় হয়তো সেসব প্রকাশ কোথাও কোথাও তরল আবেগের উচ্ছ্বাস মাত্র। তবুও ক্ষোভটা সত্য। যথার্থ আত্মপরিচয় খোঁজার, স্বদেশের সংলগ্নতা পাবার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা থেকেই সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে বাঙালির নিজস্ব প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়া হয়েছিল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। প্রতিষ্ঠাতারা চেয়েছিলেন, এই প্রতিষ্ঠান

হবে স্বদেশের সর্বাঙ্গীণ পরিচয় জানবার, দেশের মাটিতে নিজেদের রোপণ করবার উপায়।

শাস্ত্রীমশায়ের পক্ষে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হওয়া একান্তই স্বাভাবিক ছিল। এখানে নিজের সংকল্প অনুযায়ী কাজ করবার, "বহুদর্শী শক্তির প্রভাব প্রয়োগ করবার উপযুক্ত ক্ষেত্র পেয়েছিলেন।" শুধু কাজের ক্ষেত্র নয়, সাহিত্য-পরিষৎ ক্রমে তাঁর অস্তিত্বে ওতপ্রোত হয়ে গিয়েছিল। খাঁটি বাংলার খাঁটি মঙ্গলের জন্য জ্ঞান-বুদ্ধি-সামর্থ্যের যা-কিছু তাঁর দেবার ছিল এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই উৎসর্গ করে কৃতার্থ বোধ করেছেন। "আপনারা মানুন আর নাই মানুন, আমি ইহাকে ধর্ম, পুণ্য ও ভাগ্য, এই তিন বলিয়াই মানি এবং আমার পরম সৌভাগ্য যে, আমি এরূপ পুণ্যময় অনুষ্ঠানের সহিত এত দীর্ঘকাল জড়িত ছিলাম" (পৃ. ৪৫৬)। এ সেই চরিতার্থতা বোধের গভীরতম প্রকাশ।

১৮৯৭ খৃস্টাব্দে শাস্ত্রীমশায় সাহিত্য-পরিষদে যোগ দেন এবং তাঁকে কেন্দ্র করে এখানে যে গবেষকমণ্ডলী গড়ে ওঠে তাঁরাই বাঙালি সংস্কৃতির আবহমান ধারার তথ্যভিত্তিক পরিচয় উদ্‌ঘাটন করেছেন। সাময়িক মনান্তর সত্ত্বেও কেউ কখনো তাঁর নেতৃত্বের প্রয়োজন সম্পর্কে দ্বিধা বোধ করেন নি।

গুছিয়ে কাজ করবার মতো একটা সংগঠন পেলেন এতদিনে এবং তাঁর মনে ইতিমধ্যে প্রস্তুত হয়ে ওঠা প্রকল্পগুলির তথ্যভিত্তি খোঁজার ব্যক্তিগত উদ্যোগও অনেকটা সংহত এবং একমুখী হল। বাংলার সমতল ভূমিতে পুঁথিপত্র খোঁজার কাজ পরিচালনার সঙ্গে তিনি নিজে হজ্‌সনের সেই তাৎপর্যময় আবিষ্কারের ইঙ্গিত ধরে বাংলার, বাঙালির প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টায়, "towards the elucidation of the ancient history and Literature of his own country, dear old Bengal" (পৃ. ৮৪৮) নেপাল যাত্রা করেছেন। প্রথম সুযোগ পেলেন ১৮৯৭তে, পরে ১৮৯৮, ১৯০৭ এবং ১৯২২ খৃস্টাব্দে আরো তিন বার নেপালে গিয়েছেন। নিজের স্বভাব অনুযায়ী সেই অপরিচিত পরিবেশে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরি করেছেন নেপালের দরবার লাইব্রেরির অধ্যক্ষ সুব্বা বিষ্ণুপ্রসাদ রাজভাণ্ডারীর সঙ্গে, হজ্‌সনের কাজের

সহায় ছিলেন যে অমৃতানন্দ, তাঁর বংশেরই ইন্দ্রানন্দের সঙ্গে। সরোজ-বজ্রের দোহাকোষ এবং অদ্বয়বজ্রের টীকার পুথি বিষ্ণুপ্রসাদ হাতে করে শাস্ত্রীমশায়কে উপহার দিয়েছিলেন। নেপালে কাজ করার রোমাঞ্চ এবং আনন্দের কথা তিনি নিজেই অতি অপূর্বভাবে বলেছেন "Bengali Buddhist Literature" প্রবন্ধে (দ্র. পরিশিষ্ট)।

এই সংকলনের "বাংলার পুরানো অক্ষর" প্রবন্ধটিতে দেখা যাবে প্রতিলিপি ধরে ধরে শাস্ত্রীমশায় বাংলা লিপির বিবর্তন বুঝিয়েছেন। লিপি সম্পর্কে মনোযোগের গভীর কারণ আছে। মুসলমান আমলের আগের কোনো বাংলা লিপির পরিচয় জানা ছিল না। রাজেন্দ্রলাল ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নকল করা একখানি 'সেতুবন্ধ' কাব্যের পুথি পেয়েছিলেন, অধ্যাপক বেণ্ডল 'হেবজ্রতন্ত্রে'র আধখানা পাতার ছবি ছাপেন, বলেন লিপি ১১৯৮ খৃস্টাব্দের। কোনোটিই মুসলমান আমলের আগের নয়। লিপিতত্ত্বের জ্ঞানে শাস্ত্রীমশায় অনুমান করতে পারছিলেন, এর চেয়ে পুরানো লিপিতে লেখা পুথি থাকা খুবই সম্ভব, যার সাক্ষ্যে উন্মোচন করা যাবে প্রাচীনতর বাঙালি সংস্কৃতির পরিমণ্ডল। লিপির সূত্রটি তাই খুব গুরুত্ব পায় তাঁর কাছে। এবং একে একে তিনিই আবিষ্কার করেন বাংলা লিপিতে লেখা হরিবর্মদেবের রাজত্বকালের 'কালচক্রযান' এবং 'ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি', অভয়াকরগুপ্তের 'বজ্রাবলী' ও 'কালচক্রাবতার', দামোদরগুপ্তের 'কুট্টনীমত', 'হেবজ্রতন্ত্রটীকা', সন্ধ্যাকরনন্দীর 'রামচরিত', অদ্বয়বজ্রের 'দোহাকোষপঞ্জি' এবং রত্নকীর্তির 'অপোহসিদ্ধি'র পুথি। মুসলমান আমলের আগের বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের অনুমান তথ্যভিত্তি পেল ১৮৯৭তে 'রামচরিত' আবিষ্কারে। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য পুথির সাক্ষ্যে বুঝতে পারলেন সংস্কৃত পুথির মতো সেই সময়ের বাংলা ভাষায় লেখার নমুনা থাকা একান্তই সম্ভব। ইতিমধ্যে দোহা-জাতীয় রচনার ভাষা নিয়েও প্রচুর মাথা ঘামিয়েছেন। তাঁর অনুমান সত্য প্রমাণিত হল ১৯০৭ খৃস্টাব্দে, চর্যাগীতির পুথি আবিষ্কারে। পুথিটি নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে কাজ করেছেন। এর ভাষা সম্পর্কে নানা দিক থেকে সংশয় জাগছিল। কিন্তু গানগুলির মধ্যে প্রতিফলিত একান্তভাবে বাঙালির জীবনযাত্রার ছবি এবং মহাযান বৌদ্ধধর্মের রূপান্তর সহজিয়া মতের নানা সংকেত থেকে তিনি নিশ্চিত ধারণা করতে পারছিলেন

এ বস্তু বাংলার সাহিত্য, বাঙালির বিশিষ্ট ধ্যান-ধারণা এবং কবিত্বের ফল। ১৩২৯-এর অভিভাষণে বলে দিলেন, "সেই কালে বাংলাদেশে চলিত ভাষায় গান লেখা হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে ভাষাকে বৌদ্ধ-প্রাকৃতই বলো, প্রাকৃতই বলো, অপভ্রংশই বলো, আর যা-ই বলো : ওটা তো নাম দেওয়া মাত্র। আমি না-হয়, বাংলাদেশের ভাষাকে বাংলা নাম দিলাম, তাহাতেই বা দোষ কী ?" (পৃ. ৪৩৫)। উক্তিটি যুক্তিতর্ক পেরিয়ে ভিন্নভাবে আমাদের মর্ম ছোঁয় আজও। পুথিটি দুটি দোহাকোষ ও ডাকার্ণবের সঙ্গে সম্পাদনা করে প্রকাশের সময়ে বইয়ের নামও দিয়েছিলেন 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' (১৩২৩ ব)।

১৮৯৭তে প্রথমবারের নেপাল ভ্রমণ থেকে ফিরে *Discovery of Living Buddhism in Bengal* পুস্তিকা যখন প্রকাশ করেছিলেন তখনই তাঁর মনে এই বিশ্বাস দানা বেঁধেছিল যে বৌদ্ধধর্মের উদয়-বিলয়ের সঙ্গে বাঙালির ইতিহাস জড়িয়ে আছে। এই সূত্রটি ছাড়া বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাসের গড়ন বোঝা যায় না। ওই পুস্তিকায় এবং অন্যত্র ধর্মঠাকুরের পূজা সম্পর্কে যে তত্ত্ব গড়েছিলেন তা শেষ পর্যন্ত টেকে নি। কিন্তু এই ভুলে তাঁর দৃষ্টি ভুল প্রমাণিত হয় না। চর্যাগীতিতে প্রমাণ হল বাংলা সাহিত্যের জন্ম বৌদ্ধ সহজিয়া কবিদের হাতে। গানগুলির ভেতরের এবং আনুষঙ্গিক ঐতিহাসিক তথ্যে তিনি মুসলমান আমলের আগের সমাজবিন্যাস এবং মুসলমান আমলে বাইরের ধাক্কায় বৌদ্ধে-হিন্দুতে সামাজিক সামঞ্জস্য রচনা করে তোলার স্তরগুলি নিপুণভাবে দেখিয়েছেন। বাংলার সামাজিক ইতিহাস ব্যাখ্যা, হিন্দু জাতি-বিন্যাস এবং বাঙালির একটা বড়ো অংশ মুসলমান ধর্মের আশ্রয়ে চলে যাবার ব্যাখ্যা তাঁর দৃষ্টির আলো ছাড়া সম্ভব নয়।

শাস্ত্রীমশায় কাজ শুরু করেছিলেন একান্তই তথ্যরিক্ত জল্পনার যুগে। যেসব আনুমানিক প্রকল্প ধরে নিয়ে তথ্যের সন্ধান করেছেন, সর্বদা সেই প্রকল্পে এবং তথ্যে সামঞ্জস্য হয় নি। এই বিরোধ-বৈপরীত্যের ভেতর দিয়েই এগোতে হয় সচেতন গবেষকদের। এ ছাড়া অন্য পথ নেই। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব এই যে, যতটা কাজ এগিয়ে নিতে পেরেছিলেন, তা থেকে সংগঠিত

ধারণায় বাঙালি সংস্কৃতির এবং বাংলা সাহিত্যের একটি কালানুক্রমিক পুরো ছবি চোখের সামনে দেখতে পেতেন। অভিভাষণগুলিতে যেভাবে আদি, মধ্য ও আধুনিক সাহিত্যের বিন্যাস ফুটিয়েছেন, আজ পর্যন্ত সে বিন্যাস আমরা মেনে চলছি। এবং শুধুই যে কিছু লেখক আর বইয়ের বিবরণ দিয়ে যুগগুলির চেহারা ফুটিয়েছেন তা তো নয়। বিকাশের স্তরে স্তরে বাঙালির জীবনযাত্রার কোন্ বাস্তব সজীব পরিপ্রেক্ষিত থেকে এই-সব সাহিত্যিক উদ্ভাস জেগে উঠেছিল তারই পরিচয় দিতে চেয়েছেন। এক-একটি যুগের জীবনযাপনের, ধ্যান-ধারণার, মন-মেজাজের সঙ্গে মিলিয়ে সাহিত্যের ধারাবাহিক তাৎপর্য বুঝতে চেয়েছেন। কোনো অখণ্ড ধারাবাহিক ইতিহাস লেখার সময় হয় নি তাঁর। তবুও বিচ্ছিন্ন লেখার ভেতরে সেই সামগ্রিক দেখার দৃষ্টি ফুটে আছে। এভাবে উপলব্ধি করতে পারতেন বলেই বাংলা সাহিত্যের আদি পর্বটির সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে 'বেনের মেয়ে'র মতো একটি উপন্যাস লিখতে পেরেছিলেন। চর্যাগীতির মধ্যে তিনি একটি জীবনভঙ্গি, মননভঙ্গি এবং বাক্‌ভঙ্গির বিশিষ্ট রূপ দেখতে পেয়েছিলেন। উপলব্ধির মধ্যে তথ্যগত এবং সৌন্দর্যগত মর্মের নিবিড় স্বাদ ছিল বলেই বেনের মেয়ে উপন্যাসের শেষে সেকালের ভাষাভঙ্গিতে মায়া এবং গুরুপুত্রের গান দুটি তৈরি করতে পেরেছিলেন। অভিভাষণে তোলা চর্যাগীতির অনুবাদেও একালের গদ্যে সেই আদি বাংলা কবিতার ভঙ্গীটি বজায় রাখার নিপুণতা লক্ষ করবার মতো।

অভিভাষণ কয়েকটি, পুরানো আমলের কবিদের সম্পর্কে বিচ্ছিন্ন লেখা এবং পরিশিষ্টে সংকলিত চারটি লেখায় যা বস্তু আছে তাতে ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি বিষয়ে তাঁর অবলোকন সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। বলা হয়, এই সাহিত্যের সবটাই নানা ধর্মসম্প্রদায়ের বিশেষ ধর্মবিশ্বাসের, সাধনার রীতিনীতির সংকেত দেবার জন্যে তৈরি হয়েছিল। শাস্ত্রীমশায় সর্বদাই বিশেষ বিশেষ ধর্মবিশ্বাসের উদয় এবং বিভিন্ন ধর্মের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, ওঠাপড়া সামাজিক শক্তির বিন্যাসে অদলবদলের পটে রেখে দেখেছেন। ধর্ম এবং আচার-বিচার তাঁর চোখে সামাজিক শক্তির প্রকাশ বলে মনে হয়েছে। উৎপাদন ব্যবস্থা এবং সমাজ পরিচালনার

দিক থেকে জনসমাজ শ্রেণীতে শ্রেণীতে, তখনকার ভাষায় বর্ণ বা জাতিতে কিভাবে ভাগ হয়ে যেত, শ্রেণীগুলির মর্যাদার পরিবর্তন এবং যতটা বোঝা গেছে তাঁর সময় পর্যন্ত— সে পরিবর্তনের কারণ দেখাতে চেষ্টা করেছেন।

দেশ-জাতি-ভাষা-সাহিত্য প্রসঙ্গে শাস্ত্রীমশায় বার বার 'খাঁটি বাংলা' কথাটা তোলেন। তাঁর চিন্তায় এবং গবেষণায় 'খাঁটি বাংলা' কথাটির তাৎপর্য খুব ব্যাপক ও গভীর। 'খাঁটি বাংলা' বলতে তিনি বাঙালি জাতি এবং বাঙালির সাহিত্য-সংস্কৃতির যে মৌল বৈশিষ্ট্যের দিকে ইঙ্গিত করেন, আর্য-ভারতবর্ষ বা ব্রাহ্মণ্য-আশ্রিত ভারতবর্ষ থেকে তা স্বরূপে আলাদা। শুরু থেকেই মোহমুক্তভাবে তিনি বাঙালির জীবন-প্রকৃতির যাবতীয় অভিব্যক্তির মূলে এখানকার আদি জনবৃত্তের বনিয়াদটি সত্য বলে মেনে নেন। ফলে কখনোই শাস্ত্রীয় নিরিখে বাঙালিত্বের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচারে সময় নষ্ট করতে হয় নি। তাঁর জীবনের সূচনার পরিবেশে এই দৃষ্টি অর্জন সহজ ছিল না। বাংলায় "আর্যের মাত্রা বড়োই কম, দেশীর মাত্রা অনেক বেশি" (পৃ. ২৭৬), বাঙালি মূলত বর্ণসংকর। ব্রাহ্মণ্য উপাদান, বৌদ্ধ উপাদান, ইসলামের উপাদান-- যা-কিছু এখানে এসেছে কিছুই মূলের শুদ্ধতা বজায় রাখতে পারে নি। বরং এখানকার আদি জনবৃত্তের ধ্যান-ধারণার আনুগত্য মেনে নিয়েছে। বাঙালির এই খাঁটিত্ব তাই শাস্ত্রীমশায়ের সব ভাবনার ভিত্তিতত্ত্ব। সেই খাঁটিত্বের সন্ধানে যুক্তিযুক্তভাবে তিনি সমাজের একেবারে বনিয়াদের, নিচুর স্তরের, আবহমান লৌকিকের তাৎপর্য উদ্ধার করতে চেষ্টা করেন। প্রাধান্য পায় আদি স্তরের মানুষের বিশ্বাসের জগৎ থেকে জাত আচার-অনুষ্ঠান, দেবদেবীর তত্ত্ব। ব্রাহ্মণ্যের উপর-স্তরেও তিনি এই লৌকিক উপাদানের অনুপ্রবেশ পদে পদে বিশ্লেষণ করেন। আরো পরে, সূচনার সংঘর্ষের স্তর পেরিয়ে ইসলাম যে বাংলায় সামঞ্জস্যে মিলেছে, বিশেষ করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যে এই বাইরে থেকে পাওয়া উপাদান আত্মস্থ করে সমৃদ্ধ হয়েছে, স্মার্ত ব্রাহ্মণ ঘরের ছেলে হরপ্রসাদই অন্ধ বিরুদ্ধতার মুখে দাঁড়িয়ে একথা বার বার বলেন। কারণ তিনি মুক্তমনে এই সত্য মানেন যে, "গত ৭০০ সাত শত বৎসর ধরিয়া মুসলমান ছাড়িয়া বাংলার কোনো কাজই হইতেছে না।" এমন-কি সাহিত্য-

পরিষদে প্রশ্ন তোলেন, "বাঙালি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য যে-সকল সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার উপর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অধিকার বিস্তার করিতে যাইতেছেন, তবে বাংলায় বসিয়া যাঁহারা ফারসি, উর্দু ও মুসলমানি বাংলায় বহু-সংখ্যক পুস্তক লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বাদ দেন কী করিয়া ? সেও তো বঙ্গীয় সাহিত্য !" (পৃ. ৩১০)। শুধু প্রশ্ন তোলা নয়, বেঙ্গল লাইব্রেরির রিপোর্টে মুসলমানি বাংলা সাহিত্য এবং মুসলমান ধর্ম ও সমাজ বিষয়ে লেখা বই সম্পর্কে ধারাবাহিক আলোচনা করেছেন। ১৮৮৭ খৃস্টাব্দে লেখা এই সংকলনের "মুসলমানি বাংলা" প্রবন্ধও নিশ্চয়ই দৃষ্টি এড়াবে না।

৫

আধুনিক কালের সাহিত্য নিয়ে কাজে তথ্যসংগ্রহ তেমন দুরূহ ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু জটিলতা ছিল অন্য দিক থেকে। সাহিত্যের এই পর্বের অনেকটাই তাঁর জীবিতকালের সমসাময়িক। জোয়ারের ঝাপ্‌টার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে জল মাপা সহজ নয়। শাস্ত্রীমশায়ের জন্মের সময়ে বিদ্যাসাগরমশায় সবে 'শকুন্তলা' লিখছেন, আর তিনি চোখের সামনেই জ্যেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র ও কনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিকাশ দেখেছেন। সমকালীন সাহিত্যের একজন মুখ্য লেখক হিসাবে তাঁর পক্ষে নিরপেক্ষ এবং সামগ্রিক দৃষ্টি বজায় রাখা সহজ ছিল না। ফলে এই সংকলনের আধুনিক সাহিত্য এবং আধুনিক লেখকদের সম্পর্কে তাঁর বিচার কোথাও কোথাও সমীচীন মনে না হতেও পারে। কিন্তু দু দিক থেকে এসব লেখার মূল্য বোধ হয় অপরিসীম। প্রথমত, একজন সচেতন সমকালীন মানুষের চোখে তাঁর নিজের কালের ছবি, আর দ্বিতীয়ত, তাঁর লেখায় সাহিত্যরুচির একটি মূল বিকাশশীল নিরিখের প্রতিফলন।

বঙ্গদর্শন-পর্বেই শাস্ত্রীমশায় ভাষা-সাহিত্যের ধারায় আধুনিকতার ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। ছাপাখানার সংখ্যা বাড়ছে, নতুন পত্রপত্রিকা প্রকাশ হচ্ছে, বইয়ের সংখ্যা বাড়ছে দিনে দিনে, সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় দেখা দিচ্ছেন শক্তিমান লেখক।

এই জোয়ার দেখে "বাংলা সাহিত্য, বর্তমান শতাব্দীর" প্রবন্ধের শেষে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে লেখকদের পেশাগত দায়িত্বের কথা তুলেছিলেন, "সাহিত্য জন্মিয়াছে, জন্মিতেছে ও জন্মিবে, কিন্তু যতদিন সাহিত্য ব্যবসায় না হইবে, profession না হইবে, ততদিন সাহিত্যের বদ্ধমূলতা হওয়া অসম্ভব।" সাহিত্যকে পেশা হিসাবে নেবার সুযোগ তখন কতটুকুই বা ছিল। কিন্তু এই উক্তিতে সাহিত্য সম্পর্কে এমন দায়িত্বের কথা প্রকাশ পেয়েছে যা জীবন-ধারণের সঙ্গে, অস্তিত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী, এবং শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে পেশাগত দায়িত্বের কথা আধুনিক মনেরই কথা। সচেতন আধুনিক দৃষ্টিতেই তিনি নিজের কালের সাহিত্যকে দেখেছেন। আধুনিক সাহিত্যের শিল্পরূপ বা রসাবেদন কেন সংস্কৃত-অলংকার-সম্মত হচ্ছে না— এই অনুযোগ তিনি তোলেন না। আধুনিকতার বিশ্বগত মান সম্পর্কে মোটামুটি সচেতনভাবেই সাহিত্যের ভালোমন্দ বিবেচনা করেন। কবিতায় মধুসূদনেই প্রথম কালান্তরের সূচনা, বা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস আধুনিক বাঙালির জীবনের শিল্পরূপ— এ সত্য মানতে তাঁর অসুবিধা হয় নি।

আধুনিক সাহিত্যের প্রসঙ্গেও তিনি অবশ্য 'খাঁটি বাংলা'র কথা তোলেন। কথাটা এই পর্যায়ে নতুন এবং সংগত তাৎপর্য পায়। শিক্ষাদীক্ষার পরিবর্তনে নতুন কালে যে আধুনিক চিত্তস্তর গড়ে উঠল, তার গুরুত্ব এবং অবশ্যম্ভাবিতা মেনেও তাকে দেখতে চান দেশের মাটিতে সংলগ্নভাবে। সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের প্রধান ব্যক্তিত্বদের বিষয়ে বিশ্লেষণে এই প্রসঙ্গ বার বার এসেছে। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের প্রতি তাঁর মন-প্রাণের শ্রদ্ধা অক্ষয়চন্দ্রের খাঁটি বাঙালিত্বের জন্যে। এই লেখাতেই শাস্ত্রীমশায়ের মূল দৃষ্টি ধরা যাবে। বলছেন, "বেশি সংস্কৃত পড়িলে লোকে ব্রাহ্মণ হইতে চায়, ঋষি হইতে চায়, সেটা খাঁটি বাংলার জিনিস নয়; তাহার সঞ্চার পশ্চিম হইতে। বেশি ইংরাজি পড়িলে কী হয় তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।... ইংরাজিই পড়ো, আর সংস্কৃতই পড়ো, ফার্সিই পড়ো আর উর্দুই পড়ো, বাংলার উপর তোমার নজরই পড়িবে না। বাংলার ভালো-মন্দ তুমি দেখিতেই পাইবে না, মোট কথা বাংলার উপর তোমার প্রীতিই থাকিবে না। সেই

প্রীতিটুকুই অক্ষয়বাবু আমাদের দিয়া গিয়াছেন।” (পৃ. ১২০-২১)। এ তো আধুনিক ব্যক্তিত্বের দেশজ শিকড় খোঁজারই চেষ্টা। এর বিপরীতে সামাজিক ক্রান্তিকালে ব্যক্তিত্বের দোটানা দশা চমৎকারভাবে ফুটিয়েছেন “গুরুদাস-স্মৃতি” লেখাটিতে। যে ক'জন দেখা-শোনা মানুষের চরিত্র-চিত্র এঁকেছেন সকলেই তাঁর শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজন হলেও এঁদের চরিত্রের অসংগতি দৃষ্টি এড়ায় নি। যেমন প্যারীচাঁদ মিত্র হিন্দুধর্মের কিছুই বিশ্বাস করতেন না, 'মাসিক পত্রিকা'য় শ্রাদ্ধের অসারতা নিয়ে জোরালো প্রবন্ধ লেখেন, “কিন্তু তিনি প্রতি বৎসর যথাসময়ে যথারীতি পিতা-পিতামহের শ্রাদ্ধ করিতেন।” (পৃ. ১৪৯)

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে লেখা চারটির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। “বঙ্কিমচন্দ্র-১” এবং “The Late Bankim Chandra Chatterji” প্রবন্ধ দুটি সম্ভবত কোনো বইয়ে এর আগে সংকলিত হয় নি। শাস্ত্রীমশায় বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখেছেন খুব কাছ থেকে। পারিবারিক পরিবেশে, কাজের পরিবেশে, বন্ধুজনের সঙ্গে খোলামেলা ভাবে। বঙ্কিম-ব্যক্তিত্বের এমন উজ্জ্বল সর্বায়ত ছবি একমাত্র তাঁর পক্ষেই ফুটিয়ে তোলা সম্ভব ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কাঁটালপাড়ার বাড়িতে এসে তরুণ বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করে যেতেন। একান্ত ঘনিষ্ঠদের আসরেও বঙ্কিমচন্দ্রের মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব সম্ভ্রমবোধ জাগিয়ে রাখত, কিন্তু তাঁকে ভালো না বেসে পারা যেত না। “সে একটা অনির্বচনীয় আকর্ষণ। যে সে আকর্ষণের মধ্যে পড়িয়াছে, সে তাহা বুঝিতে পারিয়াছে, অন্যের বুঝিবার শক্তি নাই।” এই অনির্বচনীয় আকর্ষণের মুগ্ধতা হরপ্রসাদের মন থেকে কখনোই কাটে নি। তারও বেশি, স্বদেশ-স্বজাতির প্রতি কর্তব্যের বোধ, স্বদেশের ইতিহাসের পটে আধুনিক কালের তাৎপর্য বোঝার আগ্রহ— যা-কিছু শ্রেয় মূল্যবোধ জীবনের সম্বল ছিল— তরুণ হরপ্রসাদের মনে তার উন্মেষ হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের মমত্বময় পরিপোষণে। তরুণ বয়সে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেই আধুনিক ভারতীয় বক্তিত্বের মূর্তি দেখতে পেতেন। কিন্তু এই আনুগত্য-কৃতজ্ঞতাময় মানসিকতার মধ্যেও হরপ্রসাদ নিজের একান্ত প্রাতিস্বিক দৃষ্টি এবং চরিত্র নিয়ে বড়ো হয়ে উঠছিলেন। তাঁর নিজস্ব বিকাশের পথে তিনি সচেতনভাবেই বঙ্কিমচন্দ্রের

প্রভাব-পরিমণ্ডল থেকে সরে গেছেন। এই সরে যাওয়াটা স্বদেশভাবনা এবং সাহিত্যভাবনা— দুদিক থেকেই সত্য মনে হয়। শাস্ত্রীমশায় স্পষ্টই ইঙ্গিত করেছেন, শশধর তর্কচূড়ামণির সঙ্গে বিবাদের ফলে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্মের নতুন ব্যাখ্যায় সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে গিয়ে যে স্বদেশতত্ত্ব গড়লেন, ভারতীয় বাস্তবতার ব্যাখ্যায় সে তত্ত্ব একদেশদর্শী। ভারতীয় জনবৃত্তের মিশ্র সাংস্কৃতিক বিশিষ্টতা বোঝার পক্ষে যথেষ্ট নয়। নিজের গবেষণার কাজের ভেতর দিয়ে এই মিশ্র সংস্কৃতির বাস্তবতা ক্রমেই হরপ্রসাদের চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল, সে সত্যের গুরুত্ব যত বেশি করে উপলব্ধি করেছেন, স্বদেশতত্ত্ব ভাবনায় বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ তত বেড়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখক জীবনকেও হরপ্রসাদ স্পষ্ট দুই ভাগে বিভক্ত করে দেখেন। "যখন বঙ্কিমচন্দ্র সৌন্দর্যসৃষ্টিকে লোকশিক্ষার দাসী করিতে উদ্যত হইলেন, আমি তাহাতে রাজি হই নাই। আমি বলিয়াছিলাম, চরম সৌন্দর্য, পরম সৌন্দর্য অথবা সৌন্দর্যের যাহাকে পরাকাষ্ঠা বলে, তাহাই চরম ধর্ম, তাহাই পরম ধর্ম। সুতরাং সৌন্দর্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মপ্রচার করিয়া দুই জিনিসই নষ্ট করা, দুটা জিনিসকেই পারমিতা প্রাপ্ত হইতে না দেওয়া বিশেষ দোষের কথা হইবে।" (পৃ ৩১)। এ আপত্তি বঙ্কিমচন্দ্র "Over rule" করেন। বিরোধটা মূলত নন্দনতাত্ত্বিক অবস্থানের। হরপ্রসাদ দেখান, 'দুর্গেশনন্দিনী' থেকে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের বিকাশের পরেই এসেছে একটা গুরুত্বপূর্ণ বাঁক, "the lowest development in the earlier writings and the highest in *Krishna Kanta*, with which the purely artistic work of Bankim Chandra ends." (পৃ. ৮০২)। এই বাঁক থেকে সাহিত্যভাবনাতে হরপ্রসাদ নিজের পথে এগিয়েছেন, অভিভাবকের হাত ছেড়ে। তাঁর নিজের পরিণতির দিক থেকে ভাবলে মনে হয়— এ তো স্বাভাবিকই। চেতনার স্বাবলম্বনে অনেক আজন্মের সম্পর্কই ভেঙে যায়। আবার হরপ্রসাদের সাহিত্যভাবনার বিকাশ, নন্দনতত্ত্বে প্রয়োজনবাদ-উপযোগিতাবাদ পেরিয়ে শিল্প-সাহিত্যের স্বাশ্রয়ী সৌন্দর্যমূল্য মানার দৃষ্টি অর্জন, আমাদের পরিবেশে রুচির প্রগতির দিক থেকেও তাৎপর্যময়। ঔপনিবেশিক আধুনিকতার

বিসংলগ্ন পরিবেশে বিকার-বিকৃতির আবর্জনা কম ছিল না। মনন ও কল্পনার শুদ্ধাচার এবং সুস্থ রুচিবোধ অনাহত রাখা রীতিমতো কঠিন ছিল। সেই সংবেদনহীন পরিবেশে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে আমাদের শিল্পী-সাহিত্যিকেরা সৌন্দর্যের স্বায়ত্তশাসনের তত্ত্ব আশ্রয় করেছেন। রুচির প্রগতির এই ধারাতেই রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথের নাম মনে আসে।

প্রাচীন সাহিত্যের মূল্য বিচারেও শাস্ত্রীমশায় একই নিরিখ ব্যবহার করেন। তাঁর ১৯২২-এর এই উক্তিটি বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করে: "...কাব্যের ভিতর দিয়ে জোর করে ধর্মপ্রচার করা যায় না। বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম গানের সাহায্যে প্রচারিত হয়েছিল বটে; কিন্তু সে গান প্রাণের আবেগে রচিত হয়েছিল— ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে সে গান রচিত হয় নাই।...

"মোটামুটি সাহিত্য সম্বন্ধে আমার শেষ একটি কথা বলবার আছে। Highest art, highest morality, highest religion একই জিনিস। যেখানেই এর কোনো একটির নির্মল ও সম্পূর্ণ বিকাশ, সেখানেই অপর দুটি আপনি এসে জুটে। কিন্তু যে মুহূর্তে একটির ভিতর দিয়ে আর-একটিকে প্রকাশ করবার চেষ্টা হয় তখনি সব পণ্ড হয়ে যায়।" (পৃ. ৭৪৩-৪৪)। এমন উক্তি আমরা রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে শুনতেই অভ্যস্ত।

আধুনিক সাহিত্যের ভাষা প্রসঙ্গেও তিনি 'খাঁটি বাংলা'র শিকড়ের প্রশ্ন তোলেন। বঙ্গদর্শনের আদি প্রবন্ধ দুটিতে তাঁর এই ভাবনার উন্মেষ দেখেছি। পরের পর্যায়ের লেখায় কোথাও কোথাও তাঁর মন্তব্যে গদ্য ভাষাশৈলী সম্পর্কে ইতিমধ্যে গড়া ওঠা আমাদের সুস্থির সিদ্ধান্ত বেশ নাড়া খায়। বলেন, পণ্ডিতি বাংলা বিদ্যাসাগরমশায়ের হাতে মাজা-ঘষা, শুনতে মিষ্টি হল। কিন্তু সে ভাষা কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশে না (দ্র. পৃ. ১৫০)। কিংবা, প্যারীচাঁদের ভাষা মরমে পশে মেনেও তাঁর প্রয়োগ উল্লেখ করে দেখান, সাহস করে চলতি ভাষা লিখতে গিয়ে তিনি কেমন মুশকিলে পড়তেন। ভাব আসত ইংরেজিতে, ভাষা সহজ হলেও হয়ে উঠত ইংরেজি বাংলা (দ্র. পৃ. ১৫১)। আমরা চমকে যাই, "একরকম সাহেবি বাংলা"র নমুনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র লাইন তোলা দেখে। (দ্র পৃ. ৩৬৯)

আসলে গদ্য ভাষাশৈলী সম্পর্কে একটা স্থির প্রত্যয় থেকেই তাঁর এসব আপত্তি। মধ্যযুগের কবিদের হাতে ভাষার যে রূপ দাঁড়িয়েছিল তাকেই তিনি খাঁটি বাংলা বলেন। কবিতার ভাষা হলেও তখনকার ভদ্র সমাজের মৌখিক ভাষার সঙ্গে তার যোগ ছিল। পণ্ডিতদের জন্যে কেউ কাব্য লিখতেন না, লিখতেন সাধারণ মানুষের জন্যে। এই সূত্রে ইংরেজ-পূর্ব যুগের রাজকীয় পরিবেশের "উর্দু মিশানো" বাংলা ও শাস্ত্রবিদ্‌দের "সংস্কৃত মিশানো" বাংলার দুই স্তরের মাঝামাঝি ব্যাপক ভদ্র সমাজের, "বিষয়ী লোকের" ভাষার কথা তোলেন। বিষয়ী লোকের, কথক মহাশয়দের সেই ভাষার স্বাভাবিক উত্তরণ ঘটলে, তার ভিত্তির উপরে আধুনিক সাহিত্যের গদ্যশৈলী গড়ে উঠলে ব্যাপক বোধগম্যতার দিক থেকে কোনো সংকট দেখা দিত না। কথাটা স্পষ্ট করে বলেছেন যদুনাথ সর্বাধিকারীর লেখা 'তীর্থভ্রমণ' বইয়ের সমালোচনায়, "খৃস্টীয় উনিশ শতকের আরম্ভে তিন রকম বাংলা চলিত, ১. ভট্টাচার্যদিগের বাংলা, ২. আদালতের বাংলা ও ৩. বিষয়ীলোকদের বাংলা। প্রথমটিতে টোলে যে-সকল সংস্কৃত বই পড়া হয় সেই-সকল সংস্কৃত বইয়ের সংস্কৃত শব্দ অনেক থাকিত। দ্বিতীয়টিতে পারসি আরবি ও উর্দু শব্দ বেশি থাকিত। তৃতীয়টিতে সংস্কৃতও থাকিত আরবিও থাকিত পারসিও থাকিত উর্দুও থাকিত, কিন্তু কিছুই অধিক পরিমাণে থাকিত না, কোনো কড়া শব্দ থাকিত না, যাহা দেশে প্রচলিত, যাহা সকলে বুঝিতে পারিত— সেই শব্দই থাকিত। যদুনাথের বাংলা খাঁটি এই বাংলা। ইহার পর বাংলার অনেক পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে : তিন রকম বাংলায় মিশিয়া এক রকম অদ্ভুত পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতমহাশয়েরা অনেক অপ্রচলিত সংস্কৃত পুস্তক হইতে ঝুড়ি ঝুড়ি চোয়ালভাঙা সংস্কৃত শব্দ আনিয়া চালাইয়া দিয়াছেন : পারসি ও আরবি শব্দ একেবারে উঠাইয়া দেবার চেষ্টা হইয়াছে।··· যেমন মনে উদয় হইয়াছে তেমনি তিনি [যদুনাথ] লিখিয়াছেন— বাংলায় ভাবিয়াছেন, বাংলায় লিখিয়াছেন। এখনকার মতো ইংরাজিতে ভাবিয়া বাংলায় তর্জমা করেন নাই।" ('নারায়ণ', ভাদ্র ১৩২৩ ব.)

ভাষাশৈলী প্রসঙ্গে শাস্ত্রীমশায় এই শিকড়ের কথাই ভেবেছেন।

আজ এ সত্য মানতেই হয় যে, তিনি নিজে বা অক্ষয়চন্দ্র সরকারের মতো দু-একজন লেখক ভিন্ন আর কোনো লেখক পুরোপুরি সেই মূল খাঁটি বাংলার মাটি ছুঁতে পারেন নি। ফলে আধুনিক বাংলার লেখকদের মধ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নাম ব্যতিক্রম হিসেবেই ওঠে, ভাষা-শৈলীর বিকাশ-বিবর্তন ভিন্ন পথে বয়ে গেছে।

শিকড় ছেঁড়া আধুনিক বাংলার কৃত্রিমতার সঙ্গে জড়িয়ে শব্দগঠনে, ব্যাকরণে দেখা দিয়েছে নানা জটিলতা। শাস্ত্রীমশায় খাঁটি বাংলার রূপ সম্পর্কে দেশের মানুষকে সচেতন করার জন্যে ১৯০১ খৃস্টাব্দে সাহিত্য-পরিষৎ থেকে একটা জোরালো আন্দোলনের সূচনা করেন। সঙ্গী পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। সেই বিচার-বিতর্কের পুরো বিবরণ "বাংলা ব্যাকরণ" প্রবন্ধের সঙ্গে সংকলন করে দেওয়া গেল। হরপ্রসাদ-রবীন্দ্রনাথের সব পরামর্শ 'চলন্তিকা' (১৯৩০ খৃ.) অভিধানে বা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বাংলা বানানের নিয়মে'ও (১৯৩৬ খৃ.) মানা হয় নি। সমস্যার জড় যে মরে নি আজও, ফিরে ফিরেই তা আমাদের অনুভব করতে হচ্ছে। তাই শাস্ত্রীমশায়ের মতামত এখনো প্রাসঙ্গিক এবং নতুন করে বিবেচনাযোগ্য মনে হবে।

৬

বাংলা ভাষা-সাহিত্যের কোনো পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস শাস্ত্রীমশায় লেখেন নি। হয়তো দীনেশচন্দ্র সেন লিখবেন এটাই চেয়েছিলেন। তাঁকে সব রকমে সাহায্যও করেছেন। দীনেশচন্দ্রের কাজের প্রশংসাও করেছেন অনেক বার। শাস্ত্রীমশায়ের আগে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়েছিল, রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭৩ খৃ.) এবং রমেশচন্দ্র দত্তর *Literature of Bengal* (১৮৭৭ খৃ.)। যে কয়েকটি প্রাচীন বই হাতের কাছে পাওয়া যেত তারই ভিত্তিতে রামগতি একটি ধারাবাহিক বিবরণ দাঁড় করিয়েছিলেন। তাঁর সামনে এ ধরনের বইয়ের একটিই আদর্শ ছিল, বিদ্যাসাগরের 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩ খৃ.)। সেইভাবেই রামগতি ভাষার পরিচয় এবং সাহিত্যের পরিচয় দুটি ভাগে

ভাগ করে সাজিয়েছেন। সাহিত্যের যথাযথ কালগত অনুক্রম নির্ণয় করা তখন সম্ভব ছিল না। তবুও তিনি 'আদ্যকাল'— চৈতন্য-পূর্ব, 'মধ্যকাল'— চৈতন্যের সময় থেকে ভারতচন্দ্রের আগে অবধি এবং 'ইদানীন্তনকাল'— ভারতচন্দ্র থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত, এইভাবে সাজিয়েছিলেন। বাংলা ভাষা-সাহিত্যের স্বাধীন বিকাশের একটা পরিচয় তিনি দিতে পেরেছিলেন। আধুনিক সাহিত্যের নতুন রূপের প্রতি তাঁর আগ্রহ এবং মূল্য স্বীকারের উদারতাও উল্লেখ করার মতো।

রমেশচন্দ্র দত্ত রামগতির তুলনায় অনেক পরিণত ইতিহাসবোধ-সম্পন্ন মানুষ। জ্ঞানের অন্যান্য শাখায় তাঁর কাজ আমাদের আধুনিক মনীষার উজ্জ্বল নজির হয়ে আছে। বাংলা সাহিত্যের পরিচয় লিখতে গিয়ে সেই ইতিহাস-বোধ এবং বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিই প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁর বইয়ের ভূমিকায় বলেন, "The condition of the people through successive ages should be the real subject of history, the dates and the names of kings should be the strings, as it were, by which to keep the real facts in order and commit them in memory. Instead of that we have shadow, the substance is no-where.

"To trace, as far as possible, the history of the people as reflected in the literature of Bengal will be the object of the future chapters." এবং কবিতায় সংবেদনার সূক্ষ্ম প্রকাশরূপ সম্পর্কে দৃষ্টি রেখেই সাহিত্যের ইতিহাস লেখার কথাও বলেন। বইটিতে 'Period of Lyrical Poetry', 'Classical Influence', 'European Influence'— এই তিন স্তরে ভাগ করে জয়দেব থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত যে ইতিহাস দাঁড় করিয়েছিলেন, তথ্যরিক্ত সেই কাঠামোর আর কোনো মূল্য না থাকলেও তাঁর দৃষ্টির অভ্রান্ততার কথা আজও স্মরণীয়। শাস্ত্রীমশায় প্রথম যৌবনে রমেশচন্দ্রের কাজে সহযোগী ছিলেন। রমেশচন্দ্রের ভাবনার এবং আগ্রহের বিষয়গুলি কাছ থেকে লক্ষ করেছেন। সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ে রমেশচন্দ্রের দৃষ্টি তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তবে বাংলা সাহিত্যের

ধারা সম্পর্কে রামগতি বা রমেশচন্দ্রের ধারণা শাস্ত্রীমশায়ের কাজে আমূল বদলে গেছে। এমন-কি দীনেশচন্দ্র সেনের কাঠামোটিও অটুট থাকে নি।

শাস্ত্রীমশায়ের আবিষ্কারে এবং বিচার-বিবেচনায় গড়ে ওঠা কাঠামোর উপরে তাঁর শিষ্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং "নাতি শিষ্য" শ্রীসুকুমার সেন বাংলা ভাষা-সাহিত্যের শিকড়সুদ্ধ ডালপালা নিয়ে পূর্ণ অবয়বের রূপ ফুটিয়েছেন।

যতটা সম্ভব এক পর্যায়ের রচনা একসঙ্গে রাখার নীতি আমরা অনুসরণ করছি। এই কারণে "বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ", "কান্তকবি রজনীকান্ত" এবং চলন্তিকা অভিধানের সমালোচনা নিবন্ধ "অভিধান" দ্বিতীয় খণ্ডে দেওয়া গেল না। এ তিনটি লেখা গ্রন্থভূমিকা ও সমালোচনা পর্যায়ের, ভূমিকা ও সমালোচনা পর্যায়ে পরের কোনো খণ্ডে থাকবে। 'বৌদ্ধগান ও দোহা' এই রচনা-সংগ্রহে ছাপা হচ্ছে না, বইটির নতুন সংস্করণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশ করেছেন। তবে "অভিভাষণ-২" এবং "অভিভাষণ-৪"-এ বৌদ্ধগান ও দোহার ভূমিকা অংশ সবটাই পাওয়া যাবে।

মূল রচনার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক-তথ্য পর্যায়ে শাস্ত্রীমশায়ের বিক্ষিপ্ত মন্তব্য সবই সংকলন করে দেওয়া হয়েছে। পরিশিষ্টে প্রয়োজনীয় ইংরেজি প্রবন্ধগুলিও ছাপা হল। এই খণ্ডটিকে বাংলা ভাষা-সাহিত্য বিষয়ে শাস্ত্রীমশায়ের লেখার পূর্ণাঙ্গ সংকলন বলা যেতে পারে।

পাঠ এবং বানানে প্রথম খণ্ডের মতো একই নীতি অনুসরণ করা হল।

সমস্ত কাজটি তত্ত্বাবধান করেছেন শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন। *Vernacular Literature Of Bengal Before The Introduction Of English Education* এবং Bengali Buddhist Literature প্রবন্ধ দুটির টীকা তিনি তৈরি করে দিয়েছেন। প্রয়োজনে অন্যত্র যে সব

টীকা যোগ করেছেন তাতে তাঁর স্বাক্ষর থাকছে। অনুবন্ধ সবই শ্রীযুক্ত সেনের করা।

দ্বিতীয় খণ্ড সম্পাদনা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় তথ্য জানিয়ে সাহায্য করেছেন শ্রীভবতোষ দত্ত (বিশ্বভারতী), শ্রীজহর সেন (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), শ্রীহারাধন দত্ত, শ্রীসুনীতিকুমার পাঠক (বিশ্বভারতী), শ্রীভজগোবিন্দ ঘোষ (সিকিম রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট অফ টিবেটোলজি), শ্রীহীরালাল মাহেশ্বরী (রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়) এবং শ্রীঅনিল গঙ্গোপাধ্যায়। এঁদের বিনীত কৃতজ্ঞতা জানাই।

সাজানো গোছানো এবং ছাপার কাজে অনুক্ষণ শ্রীসুবিমল লাহিড়ী (বিশ্বভারতী) আমাদের সঙ্গে থেকে তদারক করেছেন। এ কাজটিকে তিনি নিজেরই কাজ মনে করেন। বিশেষ করে উল্লেখ করি শ্রীমান্ অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্যের কথা। এত বড়ো প্রকাশনায় খুঁটিনাটি দায়িত্বের অন্ত থাকে না। তাঁর দৈনন্দিন সহকারিতা ছাড়া কাজ চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হত।

শ্রীসুরেশ দত্ত ও মডার্ন প্রিন্টার্সের সমস্ত কর্মীর আনুকূল্যে এবং রয়াল হাফটোনের শ্রীসুব্রত ঘোষের যত্নে এই রচনা-সংগ্রহ যথাসম্ভব শোভন ভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে।

পুস্তক পর্ষদের মুখ্য প্রশাসন-আধিকারিক অধ্যাপক দিব্যেন্দু হোতা এবং তাঁর দপ্তরের সকলের আন্তরিকতায় সম্পাদনার দায়িত্ব বহন সহজ হয়েছে।

৬ ডিসেম্বর ১৯৫৯ সম্পাদক

দেখা-শোনা মানুষ
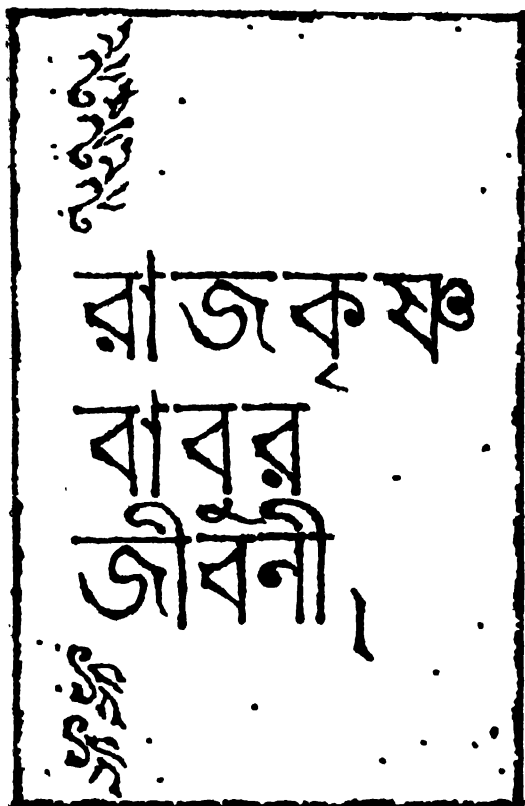
গোস্বামী দুর্গাপুর নিবাসী ৺আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় [মৃ. ১৮৫৩ খৃ.] পাইকপাড়া কন্‌সারন নামক নীলকুঠির দেওয়ানি কার্য করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিতেন, কিন্তু অর্থ রক্ষা করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। তিনি যাহা-কিছু পাইতেন সমস্তই হিন্দু ধর্মানু-মোদিত ক্রিয়াকলাপ ও ব্রাহ্মণ-ভোজনাদিতে ব্যয় করিতেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু দুর্গাপুরের লোক এখনো তাঁহার প্রদত্ত ভোজ ভুলিতে পারে নাই। অতি অল্প বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়স ১৫ বৎসর এবং তাঁহার

কনিষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বয়স নয় বৎসর মাত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধিকাপ্রসন্ন তখন কৃষ্ণনগর কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন, কনিষ্ঠ তখনো পাঠশালায়। হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় মৃত্যুকালে রাধিকাপ্রসন্ন পিতার নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়া উঠিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহার পৈতৃক যাহা-কিছু ছিল তাহা তিনি পান নাই। পূর্বপুরুষের যে-কিছু স্থাবর সম্পত্তি ছিল তাহা তাঁহাদিগের নাবালগ অবস্থায় অন্য লোকে উপভোগ করিত, সুতরাং পিতার মৃত্যুর পর দুই ভাইয়ে বিস্তর কষ্ট পাইয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুতে রাধিকা-প্রসন্নবাবু অগত্যা দ্বিতীয় শ্রেণী হইতেই জুনিয়র পরীক্ষা দিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তিনি উক্ত পরীক্ষায় প্রথম হইলেন এবং সেইরূপ বৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন। এই সামান্য বৃত্তি হইতে তাঁহাকে আপনার লেখাপড়া ভাইয়ের লেখাপড়া এবং পরিবারের ভরণপোষণ নির্বাহ করিতে হইত।

১৯ বৎসর বয়সে তিনি যখন পাঠ সমাপন করিয়া চাকরি করিতে আরম্ভ করিলেন; তখন ১৩ বৎসর বয়স্ক কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে কৃষ্ণনগরে আনয়ন করেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজকৃষ্ণবাবু এ পর্যন্ত গ্রামস্থ বর্ধমানীয় গুরুর নিকট অঙ্কিতপণ্ডক পর্যন্ত অঙ্ক কষা শেষ করিয়াছিলেন এবং মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কন্যা ছিলেন সুতরাং তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হয়েন। কিন্তু পিতৃকুলের অভিমত না হওয়ায় রাজকৃষ্ণ-বাবুর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হওয়া হইল না। বাল্যাবধিই রাজকৃষ্ণবাবু অতি ধীর ও শান্তপ্রকৃতি ছিলেন। তাঁহার পড়াশুনায় বড়োই অনুরাগ ছিল। এবং তিনি মাতার তৃপ্তির জন্য নানা প্রকারে তাঁহার সেবা করিতেন। তিনি কতবার বলিয়াছেন যে বাল্যকালে মায়ের পূজার জন্য ফুল তুলিতে তিনি বড়ো ভালোবাসিতেন।

যাহা হউক, কৃষ্ণনগরে গিয়া তিনি কিছু দিন দাদার বাসায় থাকিয়া ইংরাজি শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। কয়েক মাসের মধ্যে ইংরাজি দুই-একখানি পুস্তক পাঠ সমাপন করিয়া তিনি মিশনারি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে ভরতি হন ও ছয় মাসের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হন। পরে ২ বৎসর মাত্র কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়ন করত এন্ট্রান্স পরীক্ষায়.

ইউনিভার্সিটির তৃতীয় হয়েন [১৮৬১ খৃ.]। এইরূপে এল. এ. [এফ. এ. ?] পরীক্ষায় ১ম [১৮৬৩ খৃ.], বি. এ. পরীক্ষায় ২য় [১৮৬৬ খৃ.] ও বি. এল. পরীক্ষায় ২য় স্থান অধিকার করেন [১৮৬৮ খৃ.]। ফিলসফিতে এম. এ লইয়া তিনি প্রথম শ্রেণীতে পাস হন [১৮৬৭ খৃ.]। যে বৎসর তিনি এম. এ.-তে পাস হন সেই বৎসর কন্‌ভোকেশন-কালীন বক্তৃতায় ভাইস্‌চান্‌সেলার সাহেব তাঁহার বিস্তর সুখ্যাতি করেন। তিনি বলেন যে রাজকৃষ্ণবাবুর বিদ্যাবুদ্ধি অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রের সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পাস হইয়া তিনি প্রথমত কটক কলেজের প্রোফেসর ও ল লেক্‌চরর হইয়া গমন করেন [১৮৬৯ খৃ.]। বৎসরাবধি তথায় অবস্থান করিয়া সে কর্মে ইস্তফা দিয়া দিন-কতক তিনি কলিকাতায় বসিয়া থাকেন, পরে যখন শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮৪৪-১৯১৮ খৃ.] বহরমপুর কলেজের ল লেক্‌চারি হইতে অবসর গ্রহণ করেন তখন তথায় ল লেক্‌চরর নিযুক্ত হন [১৮৭১ খৃ.] এবং তথা হইতে পাটনায় প্রোফেসর ও ল লেক্‌চরর হইয়া যান [জুলাই ১৮৭১ খৃ]। পাটনা হইতে আসিবার কিছু দিন পরে তিনি কুমার ইন্দ্রচন্দ্র সিংহের[১] গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়েন [১৮৭৫-৭৮ খৃ.]। প্রায় ৩/৪ বৎসর এই কার্য করিলে পর, কুমার বাহাদুর সাবালগ হয়েন ও তাঁহার কর্ম যায়, তখন তিনি কিছু দিনের জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রোফেসর হয়েন [১৮৭৬-৭৮ খৃ.] এবং তাহার পর রবিন্‌সন সাহেবের [John Robinson] মৃত্যু হইলে বাংলা গবর্নমেন্টের অনুবাদক নিযুক্ত হন [১৮৭৯ খৃ]। ৭ বৎসর কয়েক মাস এই কার্য করার পর তাঁহার মৃত্যু হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিতি কাল হইতেই তিনি পুস্তক লিখতে আরম্ভ করেন। তিনি যখন বি. এল. পড়িতেছিলেন তখনই তিনি 'ভগীরথের গঙ্গানয়ন' নামক কাব্য প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করেন। প্রথমত কাব্য লেখার উপরই তাঁহার অধিক ঝোঁক ছিল। 'ভগীরথের গঙ্গানয়ন' কখনো মুদ্রিত হয় নাই, কিন্তু তাঁহার চারিখানি কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে। এই-সকল কবিতা দুষ্ট প্রণয় বা হতাশ প্রণয়ের বিকাশ নহে। ইহার বিষয়-সকল অতি উদার, মহান্! তাঁহার 'সৃষ্টি' নামক

কবিতা যিনিই পাঠ করিয়াছেন তিনিই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তাঁহার 'যৌবনোদ্যান' নামক রূপক অতি পরিপাটি হইয়াছে। উহা অনেক বৎসর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় কোর্স ছিল।

পদ্য ছাড়িয়া উনি একবার মাত্র গদ্য-কাব্য লিখিতে প্রয়াস পান। এ কাব্যখানির নাম 'রাজবালা'— আপনার গ্রামের উৎপত্তি লইয়া এ কাব্য আরম্ভ।

তিনি যে শুধু কাব্য সাহিত্য লইয়াই ক্ষান্ত ছিলেন এরূপ নহে। তাঁহার পরিমিতি ও বীজগণিত এখনো স্ট্যাণ্ডার্ড ওয়ার্ক বলিয়া গণ্য।

কিন্তু সাহিত্যের যে শাখায় তাঁহার সর্বাপেক্ষা অধিক পাণ্ডিত্য ছিল, তাহা ইতিহাস। তিনি ভারতীয় ইতিহাসে এতদূর পণ্ডিত হইয়াছিলেন যে তাঁহার গভীর গবেষণাপূর্ণ বাংলার ইতিহাসখানি লিখিতে ৭ দিন মাত্র সময় লাগিয়াছিল। তাঁহার আর ইতিহাস গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু তাঁহার 'নানা প্রবন্ধে' যে-সকল ঐতিহাসিক প্রবন্ধ আছে তাহা অত্যন্ত মূল্যবান।

তিনি যে শুদ্ধ বাংলা ভাষায়ই পুস্তক লিখিতেন এরূপ নহে। তাঁহার ইংরাজিতেও অতি উচ্চ দরের বিষয় লইয়া ৪/৫ খানি পুস্তিকা আছে যথা : *Origin of Language, Theory of Morals, Hindu Mythology, Hindu Philosophy* ইত্যাদি ; ইহার মধ্যে একখানি পাঠ করিয়া মহাত্মা লব[২] বলিয়াছিলেন—

I am glad that like your master Hume, you pay as much attention to style as to matter.

কিন্তু রাজকৃষ্ণবাবু ইংরাজি অপেক্ষা বাংলায় লিখিতে ভালোবাসিতেন। তিনি বলিতেন

"নানান্ দেশে নানান্ ভাষা ;
বিনে আপন [স্বদেশীয়] ভাষা পূরে কি আশা ?"

রাজকৃষ্ণবাবু কখনো জ্ঞানোপার্জনের সুবিধা পরিত্যাগ করিতেন না। কোনো পণ্ডিত বা শাস্ত্রজ্ঞ লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলেই তাঁহার নিকট কোনো-না-কোনো কূট প্রশ্ন বুঝাইয়া লইতেন। তিনি যখন উড়িষ্যায় ছিলেন তখন বিশেষ যত্নপূর্বক উড়িয়া ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। উৎকল ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল। পাটনায় অবস্থিতি

কালে তিনি হিন্দি, উর্দু ও পারস্য ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। পারস্য ভাষায় তাঁহার এতদূর ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল যে তিনি একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তিকে 'তোতিনামা'[৩] ও করীমা নামক দুইখানি পুস্তক পড়াইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে ফরাসি পুরাতত্ত্বজ্ঞ বর্নুফ [Eugene Burnouf, ১৮০১-৫২ খৃ.] সাহেব অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন এইজন্য রাজকৃষ্ণবাবু বিশেষ যত্ন সহকারে ফরাসি ভাষা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ঐ কারণেই তিনি আর-এক সময়ে বিশেষ উদ্যম সহকারে জর্মান ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল। তিনি বিশেষ যত্নপূর্বক সংস্কৃত ও পালি ভাষায় রচিত বৌদ্ধগ্রন্থ পাঠ করিতেন। মূলগ্রন্থ না পাইলে জর্মান, ফরাসি ও ইংরাজি ভাষায় তাহার অনুবাদ পাঠ করিতেন। পালি ভাষায় গ্রন্থাদি প্রায় রোমান অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া থাকে, কিন্তু রোমান অক্ষরে পালি ভাষা পড়িয়া রাজকৃষ্ণবাবুর তৃপ্তি হইত না। সেইজন্য তিনি ব্রহ্মদেশীয় বর্ণমালা অভ্যাস করিয়াছিলেন। সংস্কৃতমূলক বর্ণমালা সমূহের মধ্যে ব্রহ্ম বর্ণমালা যত নিকৃষ্ট এত আর-কোনোটিও নহে। কিন্তু রাজকৃষ্ণবাবু অতিশয় যত্ন সহকারে সেই বর্ণমালা অভ্যস্ত করিয়াছিলেন। বাল্যকালে গ্রামস্থ পণ্ডিতের নিকট তিনি মুগ্ধবোধ কিছু পড়িয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন বিদ্যালয়ে তিনি কখনো সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন নাই, তাঁহার সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের এত আদর ছিল না। কিন্তু সংস্কৃত তিনি বিশেষ যত্নপূর্বক শিক্ষা করিয়াছিলেন। এক সময়ে তিনি সমস্ত উপনিষৎগুলি পাঠ করিয়াছিলেন এবং উপনিষৎ শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। তিনি সংস্কৃত ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্র বিশেষ যত্নপূর্বক আলোচনা করিয়াছিলেন। অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া আপিস হইতে ফিরিয়া গিয়াও তিনি ১২টা ১টা পর্যন্ত জ্যোতিষশাস্ত্রের গ্রন্থ পাঠ করিতেন এবং অঙ্ক কষিতেন। তিনি ঠিকুজি ও কোষ্ঠী প্রস্তুত ও পরীক্ষা করিতে পারিতেন। করকোষ্ঠী উদ্ধারেও তাঁহার অনেক পারদর্শিতা জন্মিয়াছিল।—[ক্রমশঃ]

'প্রচার'
মাঘ, ১২৯৩ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ৩১ অক্টোবর ১৮৪৫ খৃ.। ইনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন এবং হরপ্রসাদের প্রথম রচনা 'ভারত মহিলা' বঙ্গদর্শনে (মাঘ-চৈত্র ১২৮২ ব.) প্রকাশের ব্যবস্থা করেন (এই সংকলনে 'বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়', ১৫ পৃ. দ্র.)।

রচনাবলী: 'যৌবনোদ্যান' (রূপক-কাব্য, ১৮৬৮ খৃ.); 'মিত্রবিলাপ ও অন্যান্য কবিতাবলী' (১৮৬৯ খৃ.); 'কাব্য-কলাপ' (১৮৭০ খৃ.); 'রাজবালা' (১৮৭০ খৃ.); 'প্রথম শিক্ষা বাংলা ব্যাকরণ' (১৮৭২ খৃ.); 'প্রথম শিক্ষা বীজগণিত' (১৮৭২ খৃ.); 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৭৪ খৃ.); 'কবিতামালা' (১৮৭৭ খৃ.); 'মেঘদূত' (পদ্যানুবাদ, ১৮৮২ খৃ.); 'নানা প্রবন্ধ' (১৮৮৫ খৃ.); 'Hindu Philosophy', *The Proceedings and Transactions of the Bethune Society*, from Nov. 10th 1859, to April 20th 1869; *A Lecture on Hindu Philosophy delivered...at the Cuttack Debating Club* (1870); *Hindu Mythology*, a lecture delivered at the Cuttack Young Men's Literary Assocn. on the 31st July 1870, 30th Nov. 1870; *Theory of Morals and Origin of Language* (1871); *Hints to the Study of the Bengali Language* (1883).

মৃত্যু ১০ অক্টোবর ১৮৮৬ খৃ., ২৫ আশ্বিন ১২৯৩ ব.

এই প্রবন্ধের শেষে [ক্রমশঃ] উল্লেখ ছিল। কিন্তু প্রচার পত্রিকায় এর পরের কোনো সংখ্যায় অনুবৃত্তি নেই।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বঙ্গদর্শন পত্রিকায় রাজকৃষ্ণ-অনূদিত মেঘদূত-এর দীর্ঘ সমালোচনা করেন (অগ্রহায়ণ, পৌষ, ফাল্গুন ১২৮৯ ব.)।

১. দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বংশধর, রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের ছেলে ইন্দ্রচন্দ্র (১৮৫৭?-৯৪ খৃ.)।

২. সম্ভবত Samuel Lobb (মৃ. জানুয়ারি ১৮৭৬ খৃ.) কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ ১৮৭০-৭৪ খৃ.। রচিত বই : *Analysis of Abercrombie on the Intellectual Powers with notes and questions*, 2nd edn., Calcutta 1867 ; *Analysis of Abercrombie on the Moral Feelings with notes and questions*, 2nd edn., Calcutta 1868.

৩. জিয়াউদ্দীন-রচিত 'তুতিনামা'।

বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়

বঙ্কিমবাবুর বাড়ি আমার বাড়ি হইতে বেশি দূর নয়। নৈহাটি স্টেশন হতে তাঁর বাটী যতটুকু দক্ষিণ, আমার বাড়ি প্রায় ততটুকু উত্তর-পশ্চিম। তাঁদের বাড়িতে রাধাবল্লভ বিগ্রহ আছে, খুব জাঁকাল নিত্য-ভোগ হয়, রোজ দশ সের চাল রান্না হয়, আর নয় সিকা করিয়া নিত্য বাজার খরচ বন্দোবস্ত আছে। শুনিয়াছি মুড়াগাছা পরগনায় রাধাবল্লভের খুব বড়ো একটা তালুক আছে। তারই মুনাফা হতে তাঁহার সেবা চলে। দুই ঘর চাটুয্যে মহাশয়রা রাধাবল্লভের সেবাইত, এক ঘর ফুলে, আর এক ঘর বল্লভী। বঙ্কিমবাবুরা ফুলে। চাটুয্যে

মহাশয়দের সেবার জন্য কিছু দিতে হয় না। কেবল উঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের অবস্থা তত ভালো নয়, ভোগের এক অংশ তাঁহাদের বাড়িতে যায়। অনেক গরিব দুঃখী লোক মধ্যে মধ্যে রাধাবল্লভের প্রসাদ পায়। রাধাবল্লভের বারো মাসে তেরো পার্বণ হয়। কিন্তু রথে খুব জাঁক হয়। রথখানি পিতলের, বেশ বড়ো। বারো মাস রথখানি গোলপাতার ছাউনিতে ঢাকা থাকে। রথের সময় উহা বাহির করিয়া ঘষে মেজে চক্চকে করিয়া লওয়া হয়। রথের সময় বঙ্কিমবাবুদের বাড়ির দক্ষিণে একটা খোলা জায়গায় বেশ একটি মেলা হয়; প্রচুর পাকা কাঁটাল ও পাকা আনারস বিক্রি হয়, তেলেভাজা পাঁপর ও ফুলুরির গাঁদি লাগিয়া যায়, আট-দশখানা বড়ো বড়ো ময়রার দোকান বসে, গজা, জিলিপি, লুচি, কচুরি, মিঠাই, মিহিদানা, মুড়িমুড়কি, মটরভাজা, চিঁড়ে, চিঁড়েভাজা যথেষ্ট থাকে। আগে ঘিয়োর ও খাজা থাকিত: এখন আর সেগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না। মেলায় মনিহারি দোকান অনেকগুলি থাকে। তাহাতে নানা রকম বাঁশি, কাগজের পুঁতুল, কাঠির ওপর লাফ-দেওয়া হনুমান, কট্কটে ব্যাঙ কিনতে পাওয়া যায়। এ সব তো গেল ছেলেদের। বুড়োদের একটি বড়ো দরকারি জিনিস এই মেলায় বিক্রি হয়— নানা রকম গাছের চারা ও কলম। আমাদের দেশে যাহারা বাগান করিতে চায়, তাহাদের চারা কিনিবার এই প্রধান সুযোগ। অনেক নারিকেলের চারা, আমের কলম, নেবুর কলম, সুপারির চারা, লকেট ফলের গাছ, গোলাপজামের গাছ, পিচের গাছ, সবেদার গাছ, ফল্সার গাছ এবং গোলাপ জুঁই জাতি বেল নবমালিকা কামিনী গন্ধরাজ মুচুকুন্দ বক্ কুরূচি কাঞ্চন টগর শিউলি প্রভৃতি নানা ফুলের চারা ও কলম পাওয়া যায়। মেলা আট দিন হয়। প্রথম প্রথম বলিয়া দিলে মালিরা, যে-কোনো গাছের চারা চাওয়া যায়, আনিয়া দিতে পারে।

আগে পুঁতুল-নাচের খুব ভালো ব্যবস্থা ছিল। প্রকাণ্ড এক দোচালার মধ্যে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ রকমের পুঁতুল হইত। সীতার বিবাহ, লবকুশের যুদ্ধ, কালীয়দমন, এ-সব তো ছিলই: তার উপর একটা মকদ্দমার সঙ ছিল— জজসাহেব বসেছেন, পেশকার কাগজ পেশ করিয়া দিল, কাঠগড়ায় আসামি থাকিল, সাক্ষীর জবানবন্দি হইল;

উকিলের বক্তৃতা হইল, জজসাহেব রায় দিলেন, আসামির ফাঁসি শাস্তি হইল, ফাঁসিও হইল। ফাঁসিকাঠে ঝুলিলে আসামির কাপড়ের ভিতর দিয়া এক রকম পদার্থ বাহির হইত দেখিয়া ছেলেরা হাসিয়া খুন হইত। আর-একরকম সঙ ছিল— আহ্লাদে পুঁতুল। তার একগাল হাসি লাগিয়াই আছে। সে হাত-পা নাড়ে আর হাসে। রাধাবল্লভের বাটীর গেটের বাহিরেই গুঞ্জবাড়ি, একখানা খুব বড়ো পাঁচচালা ঘর। গুঞ্জবাড়ি বলিলে অনেকেই মনে করেন কৃষ্ণ রথের সময় মাসির বাড়ি যাইতেন : সেখানে অনেক ফুলের গাছ ছিল ; কুঞ্জ ছিল, কুঞ্জ হইতে গুঞ্জবাড়ি হইয়াছে। কিন্তু সে কথাটা ঠিক নয়। গুঞ্জ শব্দের মূল গুণ্ডিচা, অর্থ ঝুঁড়ে ঘর, তামিল ভাষার শব্দ। উড়িয়ারা জগন্নাথকে গুণ্ডিচা বাড়ি লইয়া যায়, তাই দেখিয়া বাঙালিরাও গুঞ্জবাড়ি লইয়া যায়। বঙ্কিমবাবুদের পাঁচচালায় কৃষ্ণ আট দিন থাকেন ; দিনের বেলায় পুরুষেরা দর্শন করে, সন্ধ্যার পর নানা গ্রামের বউ, ঝি, গিন্নিবান্নি, আধাবয়সী ও বুড়িরা আসিয়া দেখিয়া যায়। রাধাবল্লভের পূজারি প্রায়ই একজন খুব বেশকার। নীলমণি ঠাকুর যে বেশ করিতেন, তাহা সত্য সত্যই বলিহারি যাই। বড়ো বড়ো জুঁইয়ের গড়ে দিয়ে কৃষ্ণ-রাধা তো প্রায়ই ঢাকা থাকেন, তাহার উপর নানা রকম ফুলের গহনা, ফুলের মুকুট ও ফুলের সাজ করিয়া দেওয়া হয়। সে সাজ দেখিয়া, দেশসুদ্ধ লোক চমৎকার হইয়া যায়। কোন্ দিন কোন্ সাজ হবে, আগে বলিয়া দেওয়া হয়। যাহার যে সাজ দেখিবার ইচ্ছা, সে সেইদিন আসিয়া তাহা দেখিয়া যায়। তা ছাড়া ঘরটিকেও বেশ করিয়া ফুলের মালাটালা দিয়া সাজানো হয়। এই ঘরের সামনে একখানি প্রকাণ্ড আটচালা, চারি দিক খোলা, গুটিকতক চৌকা থামের উপর দাঁড়াইয়া আছে। চালখানি আগে খড় দিয়া ছাওয়া হইত, এখন গোলপাতা দিয়া ছাওয়া হয়। এই আটচালায় রথের সময় যাত্রা, নাচ, গান, কীর্তন প্রভৃতি হইত। এখন দুই-একদিন যাত্রা হয় মাত্র, আগে আট দিনই খুব জমজমাট থাকিত।

আটচালার পশ্চিমে একটি শিবমন্দির, পাথরের শিবলিঙ্গ, নিত্য-পূজার ব্যবস্থা আছে। মন্দিরটির দক্ষিণ দিকে বঙ্কিমবাবুর বসিবার ঘর ও পশ্চিম দিকে একটি ঘর, তাহাকে বঙ্কিমবাবু আদর করিয়া

তোশাখানা বলিতেন। সেখানে তামাক খাওয়ার সরঞ্জাম থাকিত ; হুঁকা, কলিকা, বৈঠক, ফরসি, গড়গড়া, তামাক, টিকা, গুল, আগুন, দেশালাই ইত্যাদি ইত্যাদি। সে ঘরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বঙ্কিমবাবুর চাকর, নাম মুরলী। মুরলীর গলায় তুলসীর মালা, কিন্তু সে যে বিশেষ বৈষ্ণব ভক্ত, তাহা আমরা দেখি নাই। দক্ষিণ দিকে শিবমন্দির-সংলগ্ন একটি বড়ো দালান, উহা[র ?] পূর্ব দিকে দুটি দরজা একেবারে খোলা জমিতে পড়িয়াছে, আর পশ্চিম দিকে দুটি জানালা, ঘরটি খুব পশ্চিমে লম্বা। এই ঘরের দক্ষিণে দুটি ঘর। দালানটি যতখানি লম্বা, ঘর দুটিও ততখানি লম্বা। পশ্চিমের ঘরটিতে একখানি খাট থাকিত, পুবের ঘরটিতে একটি ফরাস থাকিত। পশ্চিমের ঘরটিতে বঙ্কিমবাবু দিনের বেলায় শুইতেন, পুবের ঘরটিতে একা বসিয়া লেখাপড়া করিতেন, দুই-একজন বিশেষ আত্মীয়েরও সেখানে যাইবার অধিকার ছিল। কখনো কখনো সে ঘরটিতে দুই-একখানি চেয়ার টেবিলও দেখিয়াছি। দালানটিতে দালানজোড়া একটি ফরাস পাতা থাকিত, অনেকগুলি তাকিয়া থাকিত, হারমোনিয়ম থাকিত, সময় সময় অন্যান্য অনেক রকমের বাজনাও থাকিত। দালানের উত্তর দিকে একটি দরজা থাকিত, সেই দরজা দিয়া তোশাখানায় যাওয়া যাইত।

এতক্ষণ যাহা বলিলাম, যে-কোনো সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাড়িতে এ-সব হইতে পারে। কিন্তু তিনি যে কবি, তাহার কোনো নিদর্শনই এখনো দিই নাই। সে নিদর্শনটি তাঁহার শুইবার ও বসিবার ঘরের দক্ষিণ দিকে দেখা যাইত। সে একটি ছোট্ট ফুলের বাগান, দু কাঠাও পুরা হইবে না। ঘর দুটি একত্রে যতখানি লম্বা, বাগানটিও ততখানি লম্বা, আড়েও প্রায় ঐরূপ, তিন দিকে পাঁচিল দিয়া ঘেরা, সে পাঁচিলের আগায় একটি আলসে ও তাহার নিচে একটি বেঞ্চি। চারি দিকেই এইরূপ। বাগানের ঠিক মাঝখানে একটি চৌকা গাঁথান, হাত-খানেক উঁচা, তাহারো আবার মাঝখানে একটি ছোটো চৌকা হাত-খানেক উঁচা, তাহারো মাঝখানে আবার একটি চৌকা হাত-খানেক উঁচা। চারি দিকেই যেন গ্যালারি মতো। এই-সমস্ত গ্যালারিতে চারি দিকেই টব সাজানো থাকিত। টবে

নানারূপ রঙিন ফুল ও পাতার গাছ। বাগানে আর-যেটুকু জমি ছিল, তাহাতে শুরকির কাঁকর দিয়া রাস্তা করা। বাকি জমিতে জুঁই জাতি কুঁদ মল্লিকা ও নবমালিকার গাছ। বর্ষাকালে ফুল ফুটিলে সব সাদা হইয়া যাইত, এবং বৈঠকখানাটি গন্ধে ভরপুর হইয়া যাইত। বঙ্কিমবাবু বাগানটিকে বড়োই ভালোবাসিতেন, যতদিন তিনি বাড়ি থাকিতেন, বাগানটি খুব সাবধানে পরিষ্কার রাখিতেন ও মাঝে মাঝে অবসর পাইলে আল্‌সেটিতে হেলান দিয়া বেঞ্চের উপর বসিয়া ফুলের বাহার দেখিতেন।

আমরা বালককালে প্রতিবৎসরই রথ দেখিতে যাইতাম। রেলওয়ের গেট হইতে শিবের মন্দির পর্যন্ত দুই ধারে অনেকগুলি কামিনী ফুলের গাছ ছিল। আমরা প্রায়ই ফুল ছিঁড়িতাম। ফুল ছিঁড়িলেই কেহ-না-কেহ আসিয়া আমাদিগকে ভয় দেখাইত, "তোমাদিগকে ধরিয়া সঞ্জীববাবুর [সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৩৪-৮৯ খৃ.] কাছে লইয়া যাইব।" সঞ্জীববাবু আমাদিগকে কী শাস্তি দিতেন জানিতাম না, কিন্তু সেই অবধি আমরা জানিতাম যে শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায়বাহাদুর মহাশয়ের [১২০১-৮৭ ব.] পুত্রেরা বড়ো দুষ্ট লোক, ছেলেপিলে ধরিয়া মারেন, সেই ভয়ে আমরা অনেকবার সুযোগ হইলেও রায়বাহাদুরের বাড়ি বড়ো একটা যাইতাম না। একবার ধরণী কথকের [১৮১৩-৭৫ খৃ.] কথা হইয়াছিল। তখন আমার বয়স বছর এগারো, টোলে পড়িতাম। টোলের ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে দু-চার দিন ধরণী কথকের কথা শুনিতে গিয়াছিলাম। রায়বাহাদুরের বাহির বাড়ির পাঁচফুকরে দালানের সামনে যে উঠান আছে, সেই উঠানে কথা হইত। কথকের জন্য যেমন সব জায়গায় ইটের বেদি হয়, এ বাড়িতে তাহা হয় নাই। একখানা বড়ো চৌকি ও একটা বড়ো তাকিয়া বেদির কাজ করিত। ঐ বেদির উপর একখানি ভালো গালিচা পাতা থাকিত। সামনে একটি বড়ো টিপায়ের উপর একখানি পিতলের সিংহাসনে শালগ্রাম থাকিতেন, তিনি কথার প্রধান শ্রোতা। উঠানময় গালিচা ও শতরঞ্চ পাতা থাকিত; ব্রাহ্মণেরা গালিচায় বসিতেন, শূদ্রেরা শতরঞ্চে বসিত। ধরণী কথক মহাশয় খুব ভালো কথা কহিতেন।

তাঁহার সুমিষ্ট অথচ গম্ভীর ও উচ্চ স্বরে প্রথম হইতেই আসর জমজম করিত। কিন্তু তিনি যখন হাঁ করিয়া গালের কাছে হাত আনিয়া গান ধরিতেন, তখন সমস্ত লোক মুগ্ধ হইয়া যাইত। আমরা তখন গানের কী বুঝি? কিন্তু এখনো সে সুর কানে লাগিয়া আছে। শুনিয়াছি বাড়ি হইতে কিছু দূর, পুব দিকে, সঞ্জীববাবুর ফুলবাগানে ধরণী কথকের বাসা ছিল। সে ফুলবাগান দেখিবার আমাদের খুবই শখ ছিল, কিন্তু পাছে সঞ্জীববাবু আমাদের মারেন, সেই ভয়ে কোনোদিন সেদিকে যাই নাই। চারি-পাঁচ দিন ধরণী কথকের কথা শুনিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার পর একদিন গিয়া শুনিলাম, তাঁহার শরীর বে-এক্তার হইয়া গিয়াছে, তিনি আসিবেন না। তাহার পর আর-কোনোদিন তাঁহার কথা শুনিতে যাই নাই। তাঁহার তো আর ঠিক ছিল না, কোন্ দিন আসিবেন, কোন্ দিন আসিবেন না।

আঠারো শো চুয়াত্তর সালে আমি সংস্কৃত কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ি। মহারাজ হোলকার সংস্কৃত কলেজ দেখিতে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে আসিলেন মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন [১৮৩৮-৮৪ খৃ.]। মহারাজ হোলকার একটি পুরস্কার দিয়া গেলেন। কেশববাবু বলিয়া দিলেন, সংস্কৃত কলেজের যে ছাত্র "On the highest ideal of woman's character as set forth in ancient Sanskrit writers" একটি 'এসে' লিখিতে পারিবে তাহাকে ঐ পুরস্কার দেওয়া হইবে। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন [১৮৩৬-১৯০৬ খৃ.] মহাশয় আমায় ডাকিয়া বলিলেন, "তুমিও চেষ্টা করো।" কলেজের অনেক ছাত্রই চেষ্টা করিতে লাগিল। ১৮৭৫ সালের প্রথমেই 'এসে' দাখিল করা হইল। পরীক্ষক হইলেন মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন [১৮২২-১৯০৩ খৃ.] মহাশয় ও বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল [১৮৫২-৯৮ খৃ.]। লিখিতে এক বৎসর লাগিয়াছিল, পরীক্ষা করিতেও এক বৎসরের বেশিই লাগিয়াছিল। ছিয়াত্তর সালের প্রথমে আমি বি. এ. পাস করিলাম, উমেশবাবুও প্রেম-চাঁদ রায়চাঁদ স্কলারশিপ পাইলেন। প্রিন্সিপাল প্রসন্নবাবু [প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী ১৮২৫-৮৭ খৃ.] মনে করিলেন সংস্কৃত কলেজের বেশ ভালো ফল হইয়াছে, সুতরাং তখনকার বাংলার লেপ্টেনান্ট গবর্নর স্যার রিচার্ড টেম্পলকে [১৮৭৪-৭৭ খৃ.] আনিয়া প্রাইজ দিলেন। সেইদিন

শুনিলাম রচনার পুরস্কার আমিই পাইব। স্যার রিচার্ড আমাকে একখানি চেক্ দিলেন ও কতকগুলি বেশ মিষ্ট কথা বলিলেন।

আমার মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইল। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহাশয়েরা যে রচনা ভালো বলিয়াছেন এবং গবর্নর সাহেব যাহার জন্য আমায় এতগুলি মিষ্ট কথা বলিয়া গেলেন, সেইখানি ছাপাইয়া দিয়া আমি কেন না একজন গ্রন্থকার হই? তাহার পর ভাবিলাম এম. এ. ক্লাস পর্যন্ত তো একরকম স্কলারশিপেই চলিয়া যাইবে। তাহার পর হঠাৎ কিছু আর চাকরি পাওয়া যাইবে না। তখন প্রাইজের ঐ ক'টি টাকাই আমার ভরসা। অতএব বই ছাপাইয়া ঐ ক'টি টাকা খরচ করা হইবে না। তখন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম. এ. [১৮৪৫-১৯০৪ খৃ.] মহাশয়ের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি সংস্কৃত কলেজের এম. এ., আমার উপর তাঁহার স্নেহদৃষ্টি থাকা সম্ভব, সুতরাং তিনি তাঁহার মাসিকপত্র 'আর্য্যদর্শনে' আমার লেখাটি স্থান দিলেও দিতে পারেন। তাঁহার কাছে গেলে, খুব গম্ভীর ভাবে, বেশ মুরুব্বিআনা চালে বলিলেন, "তুমি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, রচনা লিখিয়া তুমি পুরস্কার পাইয়াছ, আমার কাগজে উহা ছাপানো উচিত। কিন্তু তুমি বাপু যে-সকল 'ভিউ' দিয়াছ, আমার সঙ্গে তা মেলে না। আমূল পরিবর্তন না করিলে আমার কাগজে উহা স্থান দিতে পারি না।" আমি বলিলাম, "আমার তো মহাশয় নিজের কোনো 'ভিউ' নাই। পুরাণ পুঁথিতে যা পাইয়াছি, তাই সংগ্রহ করিয়া লিখিয়াছি।" যাহা হোক, তিনি উহা ছাপাইতে রাজি হইলেন না। আমি বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম, আপাতত গ্রন্থকার হইবার আশা ত্যাগ করিলাম।

তাহার পর একদিন চাঁপাতলার ছোটো গোলদিঘির ধার দিয়া বেড়াইতে যাইতেছি, শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় [১৮৪৫-৮৬ খৃ.] মহাশয়ের সহিত রাস্তায় দেখা হইল। তিনি ও তাঁহার দাদা বাবু রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় [জ. ১৮৩৯ খৃ.] মহাশয় আমাদের বেশ জানিতেন, আমাকে বেশ স্নেহ করিতেন, কিন্তু আমি তিন-চারি বৎসর-কাল তাঁহাদের বাড়ি যাই নাই বা তাঁহাদের কাহারো সহিত দেখা করি নাই। তিনি সেজন্য আমাকে বেশ মৃদু তিরস্কার করিলেন এবং আমাকে

অতি সত্বর তাঁহাদের বাড়ি যাইতে বলিলেন। আমি তাঁহাদের বাড়ি গেলেই এই তিন-চারি বৎসর কী করিয়াছি তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ক্রমে রচনাটির কথা উঠিলে তিনি সেটি দেখিতে চাহিলেন। আমি একদিন গিয়া তাঁহাকে উহা দেখাইয়া আসিলাম। তাহার পর তিনি আমায় একদিন বলিলেন, "তুমি যদি ইচ্ছা কর, আমি উহা বঙ্গদর্শনে ছাপাইয়া দিতে পারি।" আমি বলিলাম, "আর্য্যদর্শনে যাহা লয় নাই, বঙ্গদর্শনে তাহা লইবে, এ আমার বিশ্বাস হয় না।" তিনি বলিলেন, "সে ভাবনা তোমার নয়। তুমি রবিবারের দিন নৈহাটি স্টেশনে অপেক্ষা করিও, আমি সেই সময়ে সেখানে পৌঁছিব।" যথাসময়ে তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া রেলের ভিতর দিয়াই বঙ্কিমবাবুর বাড়ির দিকে যাইতে লাগিলেন। পথে শুনিলেন যে তাঁরা চারি ভাই শ্যামাচরণবাবুর বাড়িতে বসিয়া গল্প করিতেছেন। তারের বেড়া ডিঙাইলেই শ্যামাচরণবাবুর বাড়ির দরজা। রাজকৃষ্ণবাবু বাড়ি ঢুকিলেন, তাঁহার সঙ্গে আমারও এই প্রথম প্রবেশ। রাজকৃষ্ণবাবুকে তাঁহারা খুব আদর-অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন, আমিও বসিলাম। নানারূপ কথাবার্তা চলিতে লাগিল। চার ভাইয়েরই নাম শুনা ছিল, আমি তাঁহাদের গল্পের মধ্যেই কোন্‌টি কে, চিনিয়া লইলাম। ক্রমে বঙ্কিমবাবুর দৃষ্টি আমার উপর পড়িল। তিনি রাজকৃষ্ণবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটি কে ?" তিনি বলিলেন, "এটির বাড়ি নৈহাটি, সংস্কৃত কলেজে পড়ে, এবার বি. এ. পাস করিয়াছে।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রাহ্মণ ?" রাজকৃষ্ণবাবু বলিলেন, "হাঁ।" তখন তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "নৈহাটি বাড়ি ? ব্রাহ্মণের ছেলে, সংস্কৃত কলেজে পড়, বি এ. পাস করিয়াছ, আমাদের এখানে আসো না কেন ?" আমি মৃদুস্বরে বলিলাম, "সঞ্জীববাবুর ভয়ে।" তাঁহারা সকলেই তো হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সঞ্জীববাবু বলিলেন, "আমায় ভয় ? কেন ?" "শুনিয়াছি কামিনী গাছের ফুল ছিঁড়িলে আপনি নাকি মারেন।" হাসির মাত্রা আরো বাড়িয়া গেল। বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "নৈহাটি ? তোমার বাবার নাম কী ?" আমি বলিলাম, "৺রামকমল ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য মহাশয়" [মৃ. ১৮৬১ খৃ]। তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "তুমি রামকমল ন্যায়রত্নের পুত্র, নন্দর

[নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু-তর্করত্ন, ১৮৩৫-৬২ খৃ.] ভাই, রাজকৃষ্ণ তোমাকে আমার নিকট আনিয়া আলাপ করাইয়া দিল ! তোমার দাদার সঙ্গে আমার ভারি ভাব ছিল। সে আমার একবয়সী ছিল। তার মতো তীক্ষ্ণ বুদ্ধির লোক আর দেখা যায় না"— বলিয়া তিনি দাদার সম্বন্ধে জানা গল্প বলিতে লাগিলেন। দেখিলাম দাদার উপর তাঁহার বেশ শ্রদ্ধা ছিল। এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময় রাজকৃষ্ণবাবু বলিলেন, "হরপ্রসাদ আপনার নিকট আসিয়াছে, উহার একটু কাজ আছে।" অমনি বঙ্কিমবাবু বেশ গম্ভীর হইয়া গেলেন, বলিলেন, "কী কাজ ?" রাজকৃষ্ণবাবু বলিলেন, "ও একটি রচনা লিখিয়া সংস্কৃত কলেজ হইতে একটি প্রাইজ পাইয়াছে, আপনাকে উহা বঙ্গদর্শনে ছাপাইয়া দিতে হইবে।" বঙ্কিমবাবু মুরুব্বিআনা চালে বলিলেন, "বাংলা লেখা বড়ো কঠিন ব্যাপার, বিশেষ যারা সংস্কৃতওয়ালা, তারা তো নিশ্চয়ই 'নদনদী পর্বত কন্দর লিখিয়া বসিবে'।" আমি বলিলাম, "আমার রচনার প্রথম পাতেই 'নদনদী পর্বত কন্দর' আছে." বলিয়া খুলিয়া দেখাইয়া দিলাম এবং বলিলাম, "প্রথম চারিটি পাত ও সকলের শেষে আমি ঐ ভাবেই লিখিয়াছি, পরীক্ষক কে জানিয়াই আমার ঐরূপ ভাবে লেখা, কিন্তু ভিতরে দেখিবেন অন্যরূপ।" তখন বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "নন্দের ভাই বাংলা লিখিয়াছে, রাজকৃষ্ণ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, যাহাই হোক আমাকে উহা ছাপাইতে হইবে।" আমি তিনটি পরিচ্ছেদমাত্র লইয়া গিয়াছিলাম, এই কথা শুনিয়া, তাঁহাকে উহা দিয়া দিলাম। তাহার পর অনেক মিষ্টালাপের পর আমি বাড়ি গেলাম, রাজকৃষ্ণবাবু সেখানে রহিয়া গেলেন।

এই সময়ে কাঁটালপাড়া গ্রামে রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়[১] নামে এক বৃদ্ধ ছিলেন। লোকে তাঁহার কথাবার্তায় ও আচার-ব্যবহারে প্রীত হইয়া তাঁহার নাম রাখিয়াছিল "রামফক্কড়"। নৈহাটি ও কাঁটালপাড়া গ্রামে সকল বাড়িতেই তাঁর অবারিতদ্বার ছিল। তিনি সব বাড়িতেই যাইতেন, সকলের সঙ্গেই ফক্কুড়ি করিতেন ও ফক্কুড়িই তাঁহার জীবিকা ছিল। বঙ্কিমবাবুর নিকট অনেক আদর যত্ন পাইয়াও আমি মাসাবধি তাঁহার বাড়ি যাই নাই, যাইবার ভরসাও করি নাই। একদিন রামফক্কড় আমায় আসিয়া বলিল, "তুমি বঙ্কিমকে কী দিয়া আসিয়াছ ?" আমি বলিলাম,

"একটা লেখা।" সে বলিল, "তাই বটে! বঙ্কিম একটা প্রুফ দেখিতেছিল, আর বলিতেছিল 'নন্দের ভাইটি বেশ বাংলা লিখিতে শিখিয়াছে,' তুমি সেখানে যাও না কেন? বোধ হয় গেলে সে খুশি হবে।" রাম বাঁড়ুয্যের কথায় ভরসা পাইয়া আমি আর-একদিন বঙ্কিমবাবুর কাছে গেলাম। তিনি বসিয়া কী লিখিতেছিলেন। আমায় দেখিয়াই বলিলেন, "তুমি এসেছ, বেশ হয়েছে! তুমি এমন বাংলা লিখিতে শিখিলে কী করিয়া?" আমি বলিলাম, "আমি শ্রীযুক্ত শ্যামা-চরণ গাঙ্গুলি[২] মহাশয়ের চেলা।" তিনি বলিলেন, "ওঃ! তাই বটে! নাহলে সংস্কৃত কলেজ হইতে এমন বাংলা বাহির হইবে না।" সেই মুহূর্ত হইতে বুঝিলাম যে বঙ্কিমবাবু মুরুব্বিআনা ভাবটা একেবারে ত্যাগ করিয়াছেন। সেদিনকার মতো গম্ভীর ভাব আর নাই। তিনি আমাকে একেবারে আপন করিয়া লইতে চাহেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আরো কয়েকটি পরিচ্ছেদ উহার বাকি আছে, সেগুলি আপনি একবার দেখিবেন কি?" তিনি বলিলেন, "নিশ্চয়ই।" আমি আর-একদিন তাঁহার কাছে বাকি অধ্যায় কয়টি লইয়া গেলাম। প্রথম তিন অধ্যায়ই স্মৃতি অথবা তাহার টীকা হইতে লওয়া। কিন্তু বাকিগুলি সমস্তই পুরাণ অথবা কাব্য হইতে লওয়া। এবং পুরাণ ও স্মৃতিতে যতগুলি স্ত্রীচরিত্র ছিল, সবগুলিরই সমালোচনা আছে। তিনি বেশ মন দিয়া পাতা উল্টাইয়া উল্টাইয়া সেগুলি পড়িতে লাগিলেন। শেষে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এগুলি চলিবে কি?" তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, "যাহা ছাপাইয়াছি সে রুপা, এ-সব কাঁচা সোনা।" বলিতে কী, সেদিন আমি ভারি খুশি হইয়া বাড়ি ফিরিলাম। তাহার পর যখন নৈহাটি হইতে কলিকাতা যাতায়াত করিতাম, তখন প্রায় প্রত্যহই তাঁহার কাছে যাইতাম। যখন কলিকাতায় বাসা থাকিত, তখন শনি-রবিবার বৈকালে তাঁহার কাছে যাইতাম।

কাব্যের উপর বঙ্কিমবাবুর খুব ঝোঁক ছিল। তিনি কলেজ হইতে বাহির হইয়া ভাটপাড়ার শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয়ের নিকট 'রঘুবংশ', 'কুমারসম্ভব', 'মেঘদূত', 'শকুন্তলা' পড়িয়াছিলেন। ভালো শাব্দিক হইলেও শিরোমণি মহাশয়ের কাব্য বুঝিবার ক্ষমতা খুব ছিল। আমি তাঁহার নিকট 'মুগ্ধবোধ' ব্যাকরণের শেষ অংশ ও জয়কৃষ্ণের

'সারমঞ্জরী' পড়িয়াছিলাম। তাহার পর তিনি আমাকে নৈষধ পড়াইতে আরম্ভ করেন। নৈষধ পড়িতে গিয়া কাব্যাংশই তিনি বুঝাইতে চান, ব্যাকরণ বা দর্শনের দিকে তিনি ফিরিয়াও চান না। সেকালের টোলের পণ্ডিতেরা অলংকার খুব কমই পড়িতেন। যদি বা দুই-একজন পড়িতেন, তাঁহারা কাব্যপ্রকাশের জগদীশ তর্কালংকারের [জ. আ. ১৫৪০-৫০ খৃ.'র মধ্যে] টীকা পড়িতেন ও ন্যায়শাস্ত্রের কচ্‌কচি লইয়াই থাকিতেন। সেকালে লোকে যে-সকল ইংরাজি কাব্য পড়িত সে-সকলই বঙ্কিমবাবুর পড়া ছিল। বাংলায় তিনি কীর্তনের বড়ো অনুরাগী ছিলেন। একবার শুনিয়াছি কীর্তনওয়ালাকে পেলা দিতে দিতে তিনি বঙ্গদর্শনের তহবিল খালি করিয়া দিয়াছিলেন। গানের উপর তাঁহার বেশ ঝোঁক ছিল। তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া যদুভট্টের [যদুনাথ ভট্টাচার্য, ১৮৪০-৮৩ খৃ.] নিকট গান শিখিতেন, একটি হারমনিয়মও কিনিয়াছিলেন। বসিয়া বসিয়া তিনি তাহা বাজাইতেছেন, ইহাও দেখিয়াছি ; কিন্তু তাঁহাকে দলনী বেগমের ন্যায় গুনগুন করিয়া ছাড়া গলা ছাড়িয়া গাহিতে কখনো শুনি নাই। তিনি বাল্যকালে কবিতা লিখিতেন। বাল্যকালের কবিতাগুলি তিনি একত্র করিয়া ছাপাইয়াও ছিলেন। কিন্তু বয়স হইলে তিনি কবিতা লেখা একরকম ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন।

কাব্যের চেয়েও ইতিহাসেই তাঁহার বেশি শখ ছিল। ইউরোপের ইতিহাস তিনি খুব পড়িয়াছিলেন। তিনি সর্বদাই ফ্লরেন্সের মেডিচিদের কথা কহিতেন। 'রিনাইসেন্স' (Renaissance) ইতিহাস তিনি খুব আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং সেই পথ ধরিয়া বাংলারও যাহাতে আবার নবজীবন সঞ্চার হয়, তাহার জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, তিনি বাংলার একখানি ইতিহাস লিখিয়া যান। সেই উদ্দেশেই তিনি 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' বলিয়া বঙ্গদর্শনে সাতটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইতিহাস লিখিতে বসিয়া তাঁহার কিছু জানিবার দরকার হইলে আমায় বলিতেন, আমিও যথাসাধ্য প্রাচীন পুথি ঘাঁটিয়া তাঁহাকে খবর যোগাইয়া দিতাম। এই তিরিশ বছরের মধ্যে বাংলার ইতিহাস অনেক পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। মুসলমানেরা বাংলা দখল করিবার পূর্বে বাংলায় যে অনেক বড়ো বড়ো রাজত্ব ছিল, এখন তাহার অনেক আভাস পাওয়া গিয়াছে, তখন সব অন্ধকার

ছিল। তথাপি বঙ্কিমবাবু বঙ্গদেশে আর্য ও অনার্যগণের বাস সম্বন্ধে যে-সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন, তার চেয়ে এখনো কেহ বেশি কিছুই লিখিতে পারেন নাই।

আমার সহিত বঙ্কিমবাবুর যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন তাঁহার 'কপালকুণ্ডলা' [১৮৬৬ খৃ.], 'দুর্গেশনন্দিনী' [১৮৬৫ খৃ.], 'বিষবৃক্ষ' [১৮৭৩ খৃ.], 'চন্দ্রশেখর' [১৮৭৫ খৃ.] ও 'রজনী' [১৮৭৭ খৃ.] ছাপা হইয়া গিয়াছিল। 'কমলাকান্তের দপ্তর' [১৮৭৫ খৃ.] তখনো শেষ হয় নাই। বঙ্গদর্শন তিন বৎসর নয় মাস বাহির হইয়াছিল। আমার 'ভারতমহিলা' লইয়া বাকি তিন মাস পূর্ণ হয়। চারি বৎসরের পর তিনি বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতা ছাড়িয়া দেন। কেন ছাড়িয়া দেন, অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কোনো খোলসা জবাব পাই নাই। টাকার অভাবে যে উহা ছাড়েন নাই, তা নিশ্চয় ; কেননা, বঙ্গদর্শনের গ্রাহক-সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছিল, গ্রাহকেরাও বঙ্গদর্শনের টাকা দিতে নারাজ ছিল না। তিনি ছাপাখানার কাজ বেশ বুঝিতেন। তবে সম্পাদকতা ছাড়িলেন কেন, ঠিক বুঝা যায় না। বোধ হয় তিনি ঝঞ্ঝাট ভালোবাসিতেন না, এবং সঞ্জীববাবুর একটা উপায় হয়, সেটাও তাঁহার ইচ্ছা ছিল। সঞ্জীববাবু খুব রসিক লোক ছিলেন, একদিন একজন বড়ো সাহেবের সহিত রসিকতা করিতে গিয়া তাঁহার ডেপুটিগিরিটি যায়[৩]।* তখন দিন কতক তিনি সব্‌রেজিস্ট্রার থাকিলেন, কিন্তু

---

* সঞ্জীববাবু তখন প্রবেশনারি ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট। কয়েকটি পরীক্ষায় পাস হইলেই তিনি পাকা হইতে পারেন। ১৮৮৪ সালে 'ডিস্ট্রিক্ট টাউনস্ অ্যাক্ট' পাস হইল। ম্যাজিস্ট্রেট চেয়ারম্যান এবং জজসাহেব ও অন্যান্য ইংরাজ ও বাঙালি হাকিমেরা কমিশনার হইলেন ; সঞ্জীববাবুও একজন কমিশনার হইলেন। একদিন কমিটিতে কথা উঠিল— রাস্তার নাম দিতে হইবে, টিনের ওপর নাম লিখিয়া রাস্তায় রাস্তায় দিতে হইবে ; সংকল্প হইল ৩০০৲ টাকা মঞ্জুর করিতে হইবে। জজসাহেব বলিলেন, "আরো ৭৫৲ টাকা চাই, কারণ বাংলা নামগুলা কে বুঝিবে ? ওগুলা ইংরাজিতে তর্জমা করিয়া দিতে হইবে, বউমার গলি বলিলে কেহই চিনিবে না, Daughter-in-law's Lane বলিতে হইবে।" জজসাহেবের কথায় কেহই আস্থা করিতেছেন না, অথচ তিনি বার বার সেই কথাই বলিতেছেন। তখন সঞ্জীববাবু বলিয়া উঠিলেন, "৭৫৲ টাকায় হইবে না। আমি প্রস্তাব করি আরো ৩০০৲ টাকা দেওয়া দরকার।" জজসাহেব উৎফুল্ল

এখানেও তিনি বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। তাই বঙ্গদর্শন একবৎসর বন্ধ থাকার পর ১২৮৪ সালে সঞ্জীববাবুর সম্পাদকতায় আবার বাহির হয়।[৪] কিন্তু বঙ্কিমবাবু কার্যত বঙ্গদর্শনের সর্বময় কর্তা ছিলেন, তিনি নিজে তো লিখিতেনই, অন্যলোকের লেখা পছন্দ করিয়া দিতেন, অনেককে বঙ্গদর্শনে লিখিবার জন্য লওয়াইতেন, অনেকের লেখা সংশোধন করিয়া দিতেন। পূর্বেও তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে যেমন চলিত, বঙ্গদর্শন এখনো তেমনি চলিতে লাগিল। নূতন বঙ্গদর্শনে নূতনের মধ্যে আমি, আমি প্রায়ই লিখিতাম, কিন্তু কখনো নাম সহি করি নাই। সেইজন্য এখন সেই সকল লেখা যে আমার তাহা প্রমাণ করা কঠিন হইয়াছে।

নূতন বঙ্গদর্শন বাহির হইবার প্রায় বছরখানেক পরে আমি লক্ষ্ণৌ যাত্রা করি [সেপ্টেম্বর ১৮৭৮ খৃ.] এবং সেখানে এক বৎসর থাকি। আমি যেদিন যাই, সেইদিন সকালে বঙ্কিমবাবুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। বঙ্কিমবাবু তাড়াতাড়ি প্রেসে গিয়া ভিজা বাঁধানো একখানি 'কৃষ্ণকান্তের উইল' [১৮৭৮ খৃ.] আমাকে দিলেন। বলিলেন, "রেলগাড়িতে এইখানি পড়িও, ছাপাখানা হইতে এইখানা প্রথম বাহির হইল।" আমি অনেক বৎসর ধরিয়া সেখানি বিশেষ যত্ন করিয়া

হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, কেন?" সঞ্জীববাবু বলিলেন, "আদালতের সম্পর্কে যত লোক আছে, সকলের নামই ইংরাজিতে তর্জমা করিতে হইবে। মনে করুন কালীপদ মিত্র বলিয়া একজন হাকিম আছেন। কালীপদ মিত্র বলিলে কে বুঝিবে? উহাকে Black-footed Friend বলিয়া তর্জমা করিতে হইবে।" সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। জজসাহেবের মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি টুপি লইয়া কমিটি হইতে উঠিয়া গেলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বলিলেন, "সঞ্জীব ভালো কাজ করিলে না। বাড়ি গিয়া উঁহাকে ঠাণ্ডা করিয়া আইস।" সঞ্জীববাবু তিন দিন গেলেন, জজসাহেবের কাছে কার্ড পাঠাইলেন, সাহেব দেখা করিলেন না। সপ্তাহখানেক পরে খবর আসিল, জজসাহেব সেক্রেটারি হইয়া গেলেন। সঞ্জীববাবু তিন-চারিবার পরীক্ষা দিলেন, কিছুতেই পাস করিতে পারিলেন না। তাঁহার নাম ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেটের তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়া হইল। জজসাহেবের সেক্রেটারি হওয়ার সঙ্গে সঞ্জীববাবুর পাস করিতে না পারিবার কার্যকারণ ভাব সম্বন্ধ আছে কি না জানি না, কিন্তু সঞ্জীববাবু মনে করিতেন আছে।

রাখিয়াছিলাম। এখন কিন্তু বঙ্কিমবাবুর কোনো গ্রন্থই আমার বাড়িতে নাই। বউ-ঠাকুরানীরা অনেকগুলি সখীদের দিয়াছেন, এখন পুত্রেরা বড়ো হইয়া কতকগুলি আপন আপন বন্ধুদের দিয়াছেন, আমার এত যত্নের জিনিস একখানিও বাড়িতে নাই।

লক্ষ্ণৌ হইতে ফিরিয়া আমি কাঁটালপাড়ায় গিয়া দেখি বঙ্কিমবাবু সেখানে নাই। শুনিলাম তিনি চুঁচুড়ায় বাসা করিয়াছেন। শিবের মন্দিরের পাশে সে ঘরগুলিতে চাবিবন্ধ। বাগানটি গতপ্রায়। সেই-দিনই বৈকালে চুঁচুড়ায় গেলাম, দেখিলাম চুঁচুড়ার জোড়াঘাটের উপর দুইটি বাড়ি ভাড়া করিয়াছেন, একটিতে তাঁহার অন্দরমহল, আর-একটিতে তিনি নিজে বসেন। যেটিতে তিনি বসেন, সেটি একতালা। বাড়িটির একটি গেট আছে। যে ঘরটিতে তিনি বসেন, তাহা একটি বড়ো হল, গঙ্গার দিকে চারিটি জানালা। সে ঘরের পূর্বের দেওয়ালটি গুটিকতক বড়ো বড়ো মোটা গোল থামের উপর, বর্ষাকালে তার নিচেও জল আসে। বঙ্কিমবাবু যেখানে বসিয়া ছিলেন, সেদিন তার নিচে খুব জল ছিল। এক বৎসর পর হঠাৎ আমাকে দেখিয়া তিনি খুব খুশি হইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি তো চুঁচুড়ায় বাসা করিয়াছেন, ইহার ভিতরে কি কিছু 'কৃষ্ণকান্তী' আছে?" তিনি বলিলেন, "তুমি ঠিক বুঝিয়াছ, আমি বড়ো খুশি হইলাম, তোমার কাছে আমার বেশি কৈফিয়ত দিতে হইল না।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, লক্ষ্ণৌ হইতে আমি বঙ্গদর্শনের জন্য যে-কয়টি প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলাম, পড়িয়াছেন কি?" তিনি বলিলেন, "তুমি যেটির কথা মনে করিয়া বলিতেছ, সেটি কোনো জর্মান পণ্ডিতের লেখা বলিয়া মনে হয়।" আমি আর কিছু বলিলাম না। সে প্রবন্ধটির নাম 'বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি'— অর্থাৎ তিন জন কবির বহি কলেজের ছাত্রেরা খুব আগ্রহের সহিত পড়ে এবং এই তিন জন কবির কথা লইয়াই তাহারা আপনাদের 'চরিত্র গঠন করে'— সেই তিন জন কবি বাইরন, কালিদাস ও বঙ্কিমচন্দ্র।

'নারায়ণ'
বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতিসংখ্যা, বৈশাখ, ১৩২২ ॥

আমার বাড়ি নৈহাটি, বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ি হতে পোয়াটেক পথ তফাতে। তাঁহার পিতার কী নাম ছিল, লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল। তাহারা তাঁহাকে রায় বাহাদুর বলিয়াই জানিত। রায় বাহাদুর দেশের একজন বড়ো লোক ছিলেন। তাঁহার বাড়িতে রাধাবল্লভ বিগ্রহ ছিলেন। রাধাবল্লভের রথ হইত, দোল হইত, বারো মাসে তেরো পর্ব হইত। রাধাবল্লভের মন্দির ছিল, গুণ্ডিচা-ঘর ছিল, একখানি বড়ো আটচালা ছিল, সামনে অনেকটা খোলা জায়গা ছিল, সেখানে রথ-দোলে মেলা বসিত। রায় বাহাদুরের বাড়িতে মাঝে মাঝে কথকতা হইত। এগারো বৎসর বয়সে, যখন আমি কাঁটালপাড়ায় টোলে পড়ি, তখন একবার ধরণী কথকের কথা হয়। তখন আমি ভট্টাচার্য মহাশয়ের সহিত প্রায়ই কথা শুনিতে আসিতাম। কথকতার আসরে বঙ্কিমবাবুরা চারি ভায়েই থাকিতেন। আর-কিছু বুঝিতে পারি আর না পারি, কথাটা যে বেশ জমিত, তা বেশ মনে হয়। কথক মহাশয় গান করিবার জন্য 'হাঁ' করিলেই, সমস্ত আসর নিস্তব্ধ হইয়া যাইত, মাঝে মাঝে লোকে 'বাহবা বাহবা' 'বেশ বেশ' বলিতে থাকিত। সুতরাং এই সময় হইতেই আমি বঙ্কিমবাবুদের চারি ভাইকেই চিনিতাম, এবং তাঁহাদের বাড়ির খবরও অনেক শুনিতে পাইতাম। আমাকে কিন্তু তাঁহারা চিনিতেন না।

১৮৭৬ সালে, যখন আমি এম. এ. পড়ি, তখন তাঁহাদের সহিত প্রথম আলাপ হয়। সেই সময় হইতেই ১৮৯৪ খৃ. অব্দে, যখন বঙ্কিমচন্দ্রের দেহত্যাগ হয়, তখন পর্যন্ত সর্বদাই তাঁহার নিকটে থাকিতে চেষ্টা করিতাম। ১৮৭৬ সালে একটি বড়ো প্রবন্ধ ['ভারত মহিলা'] লইয়া তাঁহার নিকটে যাই। তখন তাঁহার চতুর্থ সালের বঙ্গদর্শন ৯ মাস বাহির হয় নাই। মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র তিন মাসের প্রবন্ধের অভাব। আমার প্রবন্ধ সে অভাব পূরণ করিয়া দিল এবং বঙ্কিমবাবু আমার প্রবন্ধ পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। এক বৎসর বঙ্গদর্শন আর বাহির হইল না। কিন্তু তাহাতে তাঁহার নিকটে যাতায়াত বন্ধ রহিল না। আমি শনিবারে বাড়ি আসিলেই, এইখানে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতাম। তিনি তখন হুগলির ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট ; বাড়ি হইতেই যাতায়াত করিতেন। আমরা রাত্রি সাড়ে নয়টা পর্যন্ত ইতিহাস,

সাহিত্য, পদ্য, গদ্য, নাটক, সংস্কৃত, বাংলা, ইংরাজি,•এই-সকল লইয়া আলোচনা করিতাম। কয়েকটি লোক ছিলেন, আমি আসিলেই তাঁহারা উঠিয়া যাইতেন, বলিতেন, "এইবার কেতাবি কথা আরম্ভ হইবে, আমরা আর বসিয়া কী করিব ?" সাড়ে নয়টার সময় বঙ্কিমবাবু তাঁহার চাকরকে ডাকিয়া আমায় বাড়ি রাখিয়া আসিতে হুকুম দিয়া অন্দরে যাইতেন। অন্দরের খুব কড়া শাসন ছিল, সাড়ে নয়টার পর তিনি এক মিনিটও বাহিরে থাকিতে পারিতেন না। দুই-পাঁচ মিনিট যদি কখনো তাঁহার দেরি হইত, অমনই চাকরানী আসিত।

বাংলা ১২৮৪ সালে কায়াবদল করিয়া বঙ্গদর্শন আবার বাহির হইলেন। এবার সম্পাদক হইলেন তাঁহার মেজো দাদা, সঞ্জীববাবু। কিন্তু লেখার ভার, অনেকটা তাঁহার উপরেই রহিল। তিনি আমাকে লিখিতে সর্বদা উৎসাহ দিতেন। বঙ্কিমবাবুর উপর তখন আমার এরূপ টান যে, প্রতি মাসেই তাঁহাকে এক-একটি প্রবন্ধ লিখিয়া দিতাম। প্রবন্ধ লিখিয়া নাম করিব, এ মতলব আমার একেবারেই ছিল না, সে-জন্য কখনো প্রবন্ধে নাম সহি করিতাম না। একটা ইচ্ছা ছিল— হাত পাকাইব, আর-এক ইচ্ছা— বঙ্কিমবাবুকে খুশি করিব। তিনি যদি কখনো কোনো প্রবন্ধের প্রশংসা করিতেন, তাহাতে হাতে স্বর্গ পাইতাম। অপ্রশংসা করা বা গালি দেওয়া, কখনো তিনি করেন নাই। যেবার কিছু বলিতেন না, বুঝিতাম, লেখাটা ভালো হয় নাই। সেবার চেষ্টা করিয়া জেরা করিয়া প্রবন্ধ সম্বন্ধে তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া লইতে চেষ্টা করিতাম।

দুই বৎসর এরূপ গেলে, আমায় এক বৎসরের জন্য লক্ষ্ণৌ যাইতে হইল। সেখান হইতেও আমি প্রায়ই লেখা পাঠাইয়া দিতাম। কিন্তু বঙ্কিমবাবুর মতামত কিছুই শুনিতে পাইতাম না। তিনি আমাকে চিঠিপত্র দিতেন না, আমিও তাঁহাকে বড়ো একটা চিঠিপত্র দিতাম না। এক বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, বঙ্কিমবাবু চুঁচুড়ার জোড়া-ঘাটের উপর বাসা করিয়াছেন। বঙ্গদর্শন বাহির হইতেছে, কিন্তু মাসে মাসে বাহির হয় না ; অনেক বাকি পড়িতে লাগিল। আবার একবৎসর ছাড়িয়া দেওয়া হইল। তাহার পর-বৎসর হইতে আবার বঙ্গদর্শন বাহির হইল। বঙ্কিমবাবু চুঁচুড়া ছাড়িলেন ; বউ-বাজারে

'বিড়ালের বিয়ের বাড়ি' ভাড়া লইয়া মাস-দুই রহিলেন। তাঁহার দৌহিত্র দিব্যেন্দুর[৫] অসুখই তাঁহার চুঁচুড়া ছাড়ার প্রধান কারণ। এই বাড়িতে ডক্টর চন্দ্রার চিকিৎসায় তাঁহার দৌহিত্রটি আরাম হইল। ডাক্তার চন্দ্রা কেবল বলিয়া গেলেন, বালকটির যে-পরিমাণ আহারের দরকার, তাহা সে পায় না। তিনি তাহার আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গেলেন, ঔষধপত্র বড়ো একটা কিছু দিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রার চিকিৎসার ও চন্দ্রার স্বভাবের বড়োই সুখ্যাতি করিতেন। এখান হইতে তিনি ফকিরচাঁদ মিত্রের লেনে যান। তথা হইতে ৯২নং বউ-বাজার স্ট্রিটে আসেন; এই সময় বঙ্গদর্শন প্রেসও কাঁটালপাড়া হইতে কলিকাতা উঠিয়া আসে। ৯২নং বউ-বাজার হইতে তিনি ভবানীচরণ দত্তের লেনে যান, সেখানে থাকিতে থাকিতেই প্রতাপ চাটুর্যের লেনে এক বাড়ি খরিদ করিয়া কলিকাতায় কায়েম মোকাম হন। এই দীর্ঘকাল আমি সর্বদাই তাঁহার কাছে যাইতাম; বৈকালে অথবা সন্ধ্যার পর তাঁহার কাছে উপস্থিত হইতাম এবং রাত্রি সাড়ে নয়টা পর্যন্ত থাকিয়া বাড়ি চলিয়া আসিতাম। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যত দিন জীবিত ছিলেন, প্রায়ই ঐখানে আসিতেন, চন্দ্রনাথ বসু [১৮৪৪-১৯১০ খৃ.] আসিতেন, সব্‌জজ বলরাম মল্লিক আসিতেন, বউ-বাজারের বলাই দে আসিতেন, সময়ে সময়ে কবি হেমবাবু [হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৩৮-১৯০৩ খৃ] আসিতেন, মফস্বল হইতে অনেকে বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিতে আসিতেন— তাঁহাদের মধ্যে কালীপ্রসন্ন ঘোষ [১৮৪৩-১৯১০ খৃ.] মহাশয় একজন। কেহ দেখিতে আসিলে, তিনি তাঁহাকে বিশেষরূপ আপ্যায়িত করিতে চেষ্টা করিতেন। তাহাতে অনেকেই তাঁহার উপর আকৃষ্ট হইয়া পড়িত।

বঙ্কিমবাবুর নিকট কেহ আসিলে, সাহিত্য ভিন্ন অন্য কোনো কথাবার্তা বড়ো একটা হইত না। লেখাপড়া-জানা লোকের তিনি খুব সম্মান করিতেন, এবং তাঁহাকে আত্মীয় করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেন। তিনি বেশ সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার চক্ষুতে এক অসাধারণ দীপ্তি ছিল। নাকটি শ্যেনপক্ষীর মতো না হইলেও বেশ দীর্ঘ ও সুদৃশ্য ছিল। গালদুটি ভারি ভারি ছিল; কিন্তু তাহাতে সৌন্দর্যের কোনো হানি হইত না। চেহারাটা মানুষের একটা আকর্ষণ বটে, সে বিষয়ে কোনো

সন্দেহ নাই। বঙ্কিমবাবু নিজেই বলিয়াছেন, সুন্দর মুখের সর্বত্র জয়। সে জয় যে তাঁহার হয় নাই, এ কথা কেহ বলিতে পারিবে না। কিন্তু সে জয় তো যতদিন বাঁচিয়া থাকা যায়, যতদিন সে সৌন্দর্য লোকে দেখিতে পায়। জয়ের সে কারণ, মরিলেই ফুরাইয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের জয়লাভের কারণ আরো আছে, সে অন্যরূপ। তিনি সুন্দর জিনিস বাছিয়া লইতে পারিতেন, তাহাদিগকে সাজাইয়া আরো সুন্দর করিতেন। যেখানে লোকে সৌন্দর্য দেখে না, তাহার মধ্যেও তিনি সৌন্দর্য দেখিতে ও দেখাইতে পারিতেন। অসুন্দরকে তিনি একেবারে বর্জন করিতেন। এই মনে করো কপালকুণ্ডলার ঐ যে সমুদ্রের ধারে বালিয়াড়ি আছে— কেবল বালির ঢিবি— বালিতে চারি দিক ধু ধু করিতেছে— রোদে সেই বালি তাতিয়া পথিককে ঝলসাইয়া দিতেছে— এই ভীষণ বালিয়াড়ি যে সুন্দর হইতে পারে, কে বিশ্বাস করিতে পারে? কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাহাতেই কত সৌন্দর্য দেখিয়াছেন, চোক যেন সেখান হইতে ফিরিতে চাহে না।

বঙ্কিমের একজন ভক্ত[৬] ১২৮৫ সালে বলিয়াছেন, "বঙ্কিমবাবুর স্বভাব-শোভার কেন্দ্র মনুষ্য। নগেন্দ্রনাথই হউন, অমরনাথই হউন, আর গোবিন্দলালই হউন, বা স্বয়ং বঙ্কিমবাবুই হউন, তাঁহারো নির্লিপ্ত দেখা— যেন সাংখ্য মতে পুরুষ নির্লিপ্তভাবে বসিয়া প্রকৃতির রঙ্গ দেখিতেছেন। বঙ্কিমবাবু স্বভাবের শোভার মধ্যে বসিয়া স্বভাবের শোভা দেখিতেছেন, আর কাছে যে থাকে, তাহাকে দেখাইতেছেন— 'দেখো কেমন সুন্দর, দেখো কেমন গম্ভীর। স্বভাবের শোভা দেখিয়া ঈশ্বরের প্রেমে তোমার শরীর পুলকিত হউক'।"

এইরূপ সুন্দর মানুষ লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র যে সুন্দর সমাজ গড়িয়াছেন, সে বিষয়ে ভক্তটি বলিয়াছেন—

"বঙ্কিমবাবুর সমাজ শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবকদিগের সমাজ। তিনি দেখাইয়াছেন, সমাজের বিরোধী কোনো কাজ করিয়া কেহ কখনো সুখী হইতে পারে না এবং করিলেই আত্মদুষ্কৃতের জন্য সকলকে অনুতাপ করিতে হয়। নগেন্দ্রনাথের অবৈধ প্রণয়জনিত বিধবাবিবাহের ফল তাঁহার ঘোর আধ্যাত্মিক বিকার। শৈবলিনীর অবৈধ অনুরাগের ফল পর্বতগুহায় প্রায়শ্চিত্ত। গোবিন্দলাল ও রোহিণীর যেরূপ অন্ত হইল, তাহাতেও ঐ কথা দৃঢ়তররূপে প্রতিপন্ন করিতেছে।"

আর এক জায়গায় তিনি বলিতেছেন—

"বঙ্কিমবাবুর লোক সব সমাজের লোক— শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবক ; শিক্ষিত যুবকের জীবন অনন্তবিবাদসংকুল। তিনি দুই প্রকার শিক্ষা পান। এক প্রকার বাড়িতে, এক প্রকার স্কুলে। উভয় প্রকার শিক্ষা সময়ে সময়ে বিলক্ষণ বিরোধী। এইজন্য শিক্ষিত যুবকের চরিত্রে সময়ে সময়ে বিলক্ষণ অসামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্কিমবাবুর পত্রগুলিতেও এই বিরোধীভাব কতক কতক প্রকটিত আছে, কিন্তু সম্পূর্ণ নহে ; যেখানে আছে, সেখানে অতি মনোহর। বঙ্কিমবাবুর মানুষগুলি দেশী বাঙালি নিরীহ ভালো মানুষ। বাঙালিরা যে স্বভাব ভালোবাসে, তাহারা সকলেই সেই স্বভাবের লোক— বুদ্ধিমান, চতুর, দয়ালু, সামাজিক ও গুণগ্রাহী। তাঁহাদের হৃদয়ের ভাব গভীর। ঐরূপ লোকের হৃদয়ের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম সন্ধান অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ। তাহা হইতে আমাদের অনেক জ্ঞানলাভ হয়। বঙ্কিমবাবু ইহাদের সেই ভাবেই দেখাইয়াছেন।"

বঙ্কিমবাবুর নভেলগুলি হইতে আমরা এখনকার সমাজে কোথায় কী জিনিস সুন্দর আছে, তাহা দেখিতে ও বুঝিতে শিখিয়াছি। হীরার ঘরে আলপোনাটি হতে আরম্ভ করিয়া নগেন্দ্রনাথের বৈঠকখানার পেণ্টিং পর্যন্ত সব জায়গায়ই তাঁহার চক্ষু গিয়াছিল, এবং আমাদেরও চক্ষু খুলিয়া দিয়াছেন। আচ্ছা, সুন্দর— সুন্দর— সব সুন্দর। বঙ্কিমবাবু সব সুন্দর দেখিয়াছেন, আমরা সব সুন্দর দেখিয়াছি। কোন্ জিনিসটি সুন্দর— তাহা বিচার করিতে শিখিয়াছি, কোন্ জিনিসটির কতটুকু সুন্দর— তাহারো বিচার করিতে শিখিয়াছি। কিন্তু ইহার ফল কী ? ইহার ফল এই যে, সুন্দর দেখিলেই তাহাতে লোকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, তাহার দিকে একটা প্রবল টান হয়, তাহাকে ভালোবাসিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে আপনার করিয়া লইতে ইচ্ছা করে। যদি এই ফল না হয়, তাহা হইলে সৌন্দর্য অনুভব করিয়া আর কী হইল ? বঙ্কিমবাবু আমাদের দেশের সৌন্দর্য সব ফুটাইয়া দিয়া আমাদিগকে দেশ ভালোবাসিতে শিখাইয়াছেন। বঙ্কিমবাবুর পূর্বে ইংরাজিওয়ালারা পড়িতেন শেক্স্পীয়ার, পড়িতেন মিল্টন, পড়িতেন বায়রন, পড়িতেন শেলি ; দেখিতেন ইংলণ্ডের সৌন্দর্য, ভালোবাসিতেন ইংলণ্ডের সৌন্দর্য— সে

সৌন্দর্য চোখে দেখিতে পাইতেন না, কল্পনায় তাহাকে আরো সুন্দর করিয়া তুলিত। দেশে যে কবিরা তাঁহাদিগকে সৌন্দর্য দেখাইতে চেষ্টা করিতেন, সে কবিদের তাঁহাদের পছন্দ হইত না। কবি বেচারারা মাঠে মারা যাইত। বঙ্কিমবাবু ইংরাজিওয়ালাদের চোখ ফিরাইয়া দিলেন। সারথি যেমন লাগাম টানিয়া ঘোড়ার চোখ ফিরাইয়া তাহাকে অন্য পথে লইয়া যায়, তেমনই বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজিওয়ালাদের চোখ ফিরাইয়া দিয়া অন্যপথে চালাইয়া দিলেন। সে পথ আর-কিছু নয়— দেশপ্রীতি।

বঙ্কিমবাবু কি প্রথম হইতেই এই মতলবে বই লিখিতে আরম্ভ করেন? না, ইহা তাঁহার বহু-বর্ষব্যাপী চিন্তার ফল? আমার বোধ হয়, অনেক বৎসর পরিশ্রম করিয়া তবে তিনি স্বদেশতত্ত্ব পাইয়াছিলেন। প্রথম প্রথম তিনি সৌন্দর্যই সৃষ্টি করিতেন— কিসে পাত্রগুলির চরিত্র ফুটিয়া উঠে, অনেকগুলি পাত্রকে কী ভাবে সাজাইলে নভেলখানি জমে, কিরূপ ভাষা ব্যবহার করিলে তাহা লোকের প্রিয় হয়, কোন্ রীতিতে লিখিলে লোকের পড়িতে ভালো লাগে, কোন্ কোন্ জিনিস বর্ণনা করিলে নভেলখানি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়— প্রথম প্রথম এইগুলিই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। সুন্দর— সুন্দর— সুন্দর— কিসে সুন্দর হয়? জমাট— জমাট —জমাট— কিসে জমাট বাঁধে? এই তাঁহার ধ্যান ছিল, এই তাঁহার জ্ঞান ছিল, এই তাঁহার তন্ত্র ছিল, এই তাঁহার মন্ত্র ছিল। ক্রমে যত বয়স বাড়িতে লাগিল, বুদ্ধি পাকিতে লাগিল, দৃষ্টি দূর হইতে দূরান্তরে যাইতে লাগিল, বিজ্ঞতা ঘোরালো হইয়া আসিতে লাগিল, লোককে শিক্ষা দিবার আকাঙ্ক্ষা তত বাড়িতে লাগিল। তখন তিনি বঙ্গদর্শন বাহির করিলেন। বঙ্গদর্শনের উদ্দেশ্য কী? "Knowledge filtered down" করিতে হইবে— অর্থাৎ জ্ঞানবিস্তার করিতে হইবে। বঙ্গদর্শন জ্ঞানবিস্তার সম্বন্ধে বাংলায় যে কী করিয়াছে, তাহা এখনকার লোকে বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু তখনকার লোকের কাছে বঙ্গদর্শন একটি অদ্ভুত পদার্থ বলিয়া মনে হইত। জ্ঞানপ্রচারের জন্য বঙ্গদর্শনের পূর্বে অনেক মাসিক পত্র, অনেক সাময়িক পত্র বাহির হইয়াছিল। কিন্তু কেহই Knowledge filtered down করিতে পারেন নাই। সরল ভাষায়, সরল রীতিতেই দর্শনবিজ্ঞানের গভীর তত্ত্ব-সকল সাধারণের সম্মুখে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম ধরিয়াছিলেন। বঙ্গদর্শনের উপকারিতা সম্বন্ধে আমার বলার

বিশেষ প্রয়োজন নাই। বঙ্কিমবাবু সৌন্দর্যের উপাসক ছিলেন, এখন আবার লোকশিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। তখন তাঁহার সৌন্দর্য-সৃষ্টি লোকশিক্ষার দাসী হইল, প্রথম পক্ষের স্ত্রী দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর দাসী হইয়া গেল, বঙ্কিমবাবুও দাস হইয়া গেলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন না, অথচ তাঁহার একটি ঘোর পরিবর্তন হইয়া গেল। কিন্তু তিনি শিক্ষা দিবেন কি ? তাঁহার ভক্ত বলিয়াছেন—

"রামানন্দ স্বামী যে ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহার নাম পরহিতব্রত। পীড়িত যে ধর্মাবলম্বী হউক না কেন, তিনি তাহার উপকার করিবার জন্য সর্বদাই উদ্যুক্ত। তিনি নিজ জীবন পরের উপকারের জন্য তৃণবৎ পরিত্যাগ করিতে কাতর হন না। নৈতিক উন্নতির রামানন্দ স্বামীই বোধ হয় পরাকাষ্ঠা। এই যে পরহিতব্রত— প্রথম প্রথম বঙ্গদর্শনের নভেলে বঙ্কিমবাবু ইহারই প্রচার করিয়াছিলেন —যথা বিষবৃক্ষে, চন্দ্রশেখরে।"

কিন্তু ইহাতে তিনি তৃপ্ত থাকিতে পারিলেন না। তিনি দেখিলেন— পরহিত বা ভূতদয়া বড়ো ফিকা, জমে না। বুদ্ধদেব ভূতদয়া প্রচার করিয়াছিলেন, বেশি দিন টিকে নাই। ইউরোপে অনেকে পরহিতব্রত প্রচার করিয়াছিলেন, ফল ভালো হয় নাই। তাই তিনি বঙ্গদর্শন ছাড়িয়া, যথেষ্ট বহুদর্শিতা লাভ করিয়া, তাহার দৃষ্টি কিছু সংকোচ করিয়া লইলেন— পরহিতের বদলে দেশহিত আশ্রয় করিলেন। এত দিন তিনি দেশের সৌন্দর্যমাত্র দেখাইতেছিলেন, এখন সেই পুঞ্জীকৃত, রাশীকৃত সৌন্দর্যের একমাত্রের আধার বঙ্গদেশকে ভালোবাসিতে শিখাইতে লাগিলেন, ভালোবাসিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন, জন্ম-ভূমিকে মা বলিতে শিখাইলেন, হিন্দুর যত দেব-দেবী আছেন, সবই এক মায়ের প্রতিমূর্তি— এই শিক্ষা দিতে লাগিলেন। সকলকে বলিতে লাগিলেন, একবার প্রাণ ভরে বলো— 'বন্দে মাতরম্'।

ইহার পর বঙ্কিমবাবু যতগুলি নভেল লিখিয়াছেন, দেশভক্তিই তাহাদের মূলমন্ত্র। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্মের প্রচারও ছিল। কিন্তু সে হিন্দুধর্ম তাঁহার নিজের মনের মতো। তিনি নিজে ভগবদ্‌গীতার টীকা করিয়া সেইমতো হিন্দুধর্ম চালাইতে গেলেন। এই সময়ে শশধর তর্কচূড়ামণির [১৮৫১-১৯২৮ খৃ.] সঙ্গে তাঁহার বিবাদ

বাধিল। বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, খাওয়ার বাঁধাবাঁধি বা ছোঁয়ার বাঁধাবাঁধি লইয়া ধর্ম নয়। ধর্ম আর-এক জিনিস। তাঁহার ধর্ম যে কী ছিল, তাহার কতক আভাস তাঁহার 'কৃষ্ণচরিত্রে' [১৮৮৬ খৃ] ও 'অনুশীলনে' [১৮৮৮ খৃ.] পাওয়া যায়। একটা পূর্ণ ধর্মের পথ তিনি দেখাইবেন বলিয়া আশা করিয়াছিলেন। তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইল না, মৃত্যু অকালে তাঁহাকে গ্রাস করিল। বঙ্কিমবাবু যাহা-কিছু করিয়াছেন, ইচ্ছায় করুন বা অনিচ্ছায় করুন, জানিয়া করুন বা না জানিয়া করুন— সব গিয়া এক পথে দাঁড়াইয়াছে। সে পথ জন্মভূমির উপাসনা— জন্মভূমিকে মা বলা— জন্মভূমিকে ভালোবাসা— জন্মভূমিকে ভক্তি করা। তিনি এই যে কার্য করিয়াছেন, ইহা ভারতবর্ষের আর-কেহ করে নাই। সুতরাং তিনি আমাদের পূজ্য, তিনি আমাদের নমস্য, তিনি আমাদের আচার্য, তিনি আমাদের ঋষি, তিনি আমাদের মন্ত্রকৃৎ, তিনি আমাদের মন্ত্রদ্রষ্টা। সে মন্ত্র— বন্দে মাতরম্।

যখন বঙ্কিমচন্দ্র সৌন্দর্যসৃষ্টিকে লোকশিক্ষার দাসী করিতে উদ্যত হইলেন, আমি তাহাতে রাজি হই নাই। আমি বলিয়াছিলাম, চরম সৌন্দর্য, পরম সৌন্দর্য অথবা সৌন্দর্যের যাহাকে পরাকাষ্ঠা বলে, তাহাই চরম ধর্ম, তাহাই পরম ধর্ম। সুতরাং সৌন্দর্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মপ্রচার করিয়া দুই জিনিসই নষ্ট করা, দুটা জিনিসকেই পারমিতা প্রাপ্ত হইতে না দেওয়া বিশেষ দোষের কথা হইবে। আমি বলিয়াছিলাম, কালিদাস কোথাও ধর্মপ্রচার করেন নাই, কিন্তু তাহার মতো হিন্দুধর্মের প্রচারকও বিরল। কিন্তু বঙ্কিমবাবু আমাকে Overrule করিলেন। আমিও দেখিলাম, হয়তো দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিলে বঙ্কিমবাবুর কথাই সত্য হইতে পারে। তিনি আপনার মতেই তিন-চারিখানি নভেল লিখিয়া ফেলিলেন। শুদ্ধ সৌন্দর্যবাদীরা তাহাতে এক-একবার নাক সিটকাইলেও দেশসুদ্ধ লোকেই তাঁহার অনুসরণ করিতেছে ও করিবে। তিনি এ বিষয় লইয়া কাহারো সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন না। আরো অনেক বিষয়ে তিনি বিচার করিতে রাজি হইতেন না। যেদিন তাঁহার দরবারে বসিয়া সর্বপ্রথম 'বন্দে মাতরম্' গান শুনিলাম, গানটি কাহারো মনে ধরিল না। একজন বলিলেন, 'অত্যন্ত শ্রুতিকটু হইয়াছে'—

'শস্যশ্যামলাং' শ্রুতিকটু নয় তো কী ? 'দ্বিসপ্তকোটীভুজৈর্ধৃতখরকরবালে' ইহাকে কেহই শ্রুতিমধুর বলিবেন না। একজন বলিলেন— 'কে বলে মা তুমি অবলে' অবলের এ-কার না ব্যাকরণ, না কিছু। বঙ্কিমচন্দ্র এই কথাগুলি একঘণ্টা ধরিয়া ধীরভাবে শুনিলেন, তাহার পর বলিলেন, "আমার ভালো লেগেছে, তাই লিখেছি। তোমাদের ইচ্ছে হয় পড়ো, না-হয় ফেলে দাও, না-হয় প'ড়ো না।" শ্রুতিকটু দোষ, ব্যাকরণ দোষ থাকিলেও 'বন্দে মাতরম্' সমস্ত ভারত ছাইয়া ফেলিয়াছে। বঙ্কিমেরই জয় হইয়াছে। তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে যে গভীর ধ্বনি উঠিয়াছিল, তাহাতে দিগন্ত ধ্বনিত হইতেছে। আমরাও এসো, প্রাণ ভরিয়া বলি, 'বন্দে মাতরম্'।

যাঁহারা সর্বদা বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে থাকিতেন, তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রকে কী ভাবে দেখিতেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলা যায় না। তাঁহাকে গুরু বলা যায় না, কারণ, তিনি উপদেশ দিতেন না ; তাঁহাকে সখা বলিবেন, সে স্পর্ধা কেহ রাখিতেন না ; অথচ সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিত, ভালোবাসিত, তাঁহার মুখে একটি ভালো কথা শুনিলে কৃতার্থ হইয়া যাইত। কেহ কিছু লিখিলে যতক্ষণ বঙ্কিম না ভালো বলেন, ততক্ষণ সে লেখা লেখাই নয়। সে একটা অনির্বচনীয় আকর্ষণ। যে সে আকর্ষণের মধ্যে পড়িয়াছে, সে তাহা বুঝিতে পারিয়াছে, অন্যের তাহা বুঝিবার শক্তি নাই। সাহিত্য ভিন্ন অন্য চর্চা তাঁহার বাড়িতে, অন্তত দরবারে হইতে পারিত না। আর সে চর্চার মধ্যে তিনিই সর্বময় কর্তা। যাহা তিনি বলিতেন, মানিয়া লইতে হইত, অথচ তাহাতে মান-অপমানের কিছু ছিল না। ২৪ বৎসর হইল, তিনি স্বর্গলাভ করিয়াছেন। তিনি যে দেশকে জাগাইয়া দিয়া গিয়াছেন, সে দেশ এখন স্বদেশপ্রীতিতে মাতিয়া উঠিয়াছে এবং তাঁহার স্মৃতিতে ভরিয়া গিয়াছে। আর এই-যে গৃহ, যেখানে বসিয়া তাঁহার বঙ্গদর্শনের অধিকাংশ প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল, যেখান হইতে বিষবৃক্ষ তাহার অমৃতময় ফল সর্বত্র ছড়াইয়া দিয়াছে, যেখান হইতে শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত দেশকে পবিত্র করিয়া তুলিয়াছে, যেখান হইতে কোকিলের কুহুস্বর রোহিণীকে উন্মাদিনী করিয়া দেশসুদ্ধ উন্মাদ করিয়াছে, সেই সুরম্য স্মরণীয় গৃহে বঙ্কিমবাবুর স্মৃতির কোনো চিহ্নই নাই। আমাদের

পরম-কল্যাণভাজন শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য[৭] মহাশয় পবিত্র দশহরার দিন গঙ্গাস্নান করিতে নৈহাটি আসিয়া বঙ্গবাসীর প্রধান তীর্থ বঙ্কিমের বৈঠকখানায় উপস্থিত হন এবং নিজ ব্যয়ে এই সুন্দর মার্বেল টেবলেটখানি লাগাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার নিকট সকলেই আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ। তিনি এই কার্য করিয়া যথেষ্ট সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন। বঙ্কিমবাবু যে শুদ্ধ, যাহারা তাঁহার কাছে থাকিত, তাহাদেরই আকর্ষণ করিতে পারিতেন, এমন নয়, যাহারা দেশত ও কালত তাঁহা হইতে অনেক দূরে, তাহাদিগকেও তিনি আকর্ষণ করিতে পারেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমরা পাইলাম। আসুন, আমরা মণ্ডলী হইতে বলি— 'পদ্মনাথবাবুর জয় হউক!'

আর যিনি[৮] দেবতার তুল্য স্বামী পাইয়াও তাহাতে বঞ্চিত হইয়া এই চব্বিশ বৎসর ধরিয়া পরলোকে স্বামীর মঙ্গলের জন্য নানা ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া জীবনযাপন করিতেছেন, যিনি এই বৈঠকখানাটি উত্তমরূপে মেরামত করিয়া দিয়া স্বামীর এই চিহ্নটি বজায় রাখিলেন, এবং যিনি এইখানে উপস্থিত থাকিয়া আপন সন্তানমণ্ডলীকে আশীর্বাদ করিতেছেন, আইস, আমরা সকলে তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করি।

বঙ্কিমবাবুর স্মৃতি চিরকাল জাগরূক থাকুক, এবং তাঁহার গ্রন্থগুলি বঙ্গবাসীর হৃদয় ও মন পবিত্র করিতে থাকুক।

'নারায়ণ'
আষাঢ়, ১৩২৫ ॥

বঙ্কিমচন্দ্র-২

আজ আটাশ বৎসর দুই মাস নয় দিন হইল বঙ্কিমবাবু স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। পঁচিশ বৎসরে এক পুরুষ ধরিলে আমরা দ্বিতীয় পুরুষে আসিয়া পৌঁছিয়াছি ; তাঁহার সহধর্মিণী ছাব্বিশ বৎসর বৈধব্যদুঃখ সহ্য করিয়া দুই বৎসর হইল স্বর্গে গিয়া স্বামীর সহিত মিলিয়াছেন। বঙ্কিমবাবুর ভাই শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [১৮৪২-১৯২২ খৃ.] মহাশয় অদ্যাপি জীবিত আছেন। তাঁহার দৌহিত্ররা ও তাঁহার ভাইপোরা অনেকে জীবিত আছেন এবং যথাশক্তি বাংলা সাহিত্যের সেবা করিতেছেন। যাঁহারা তাঁহার সহিত একযোগে 'বঙ্গদর্শন' চালাইয়াছিলেন ও বাংলা ভাষার সেবার জন্য একটা মজলিস তৈয়ার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সঞ্জীবচন্দ্র গিয়াছেন, অক্ষয়বাবু [অক্ষয়-চন্দ্র সরকার, ১৮৪৬-১৯১৭ খৃ.] গিয়াছেন, রাজকৃষ্ণবাবু গিয়াছেন, চন্দ্রনাথবাবু [চন্দ্রনাথ বসু, ১৮৪৪-১৯১০ খৃ.] গিয়াছেন, হেমবাবু [হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৩৮-১৯০৩ খৃ.] গিয়াছেন, যোগেন্দ্রবাবু [যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ ১৮৪৫-১৯০৪ খৃ.] গিয়াছেন, ঈশানবাবু [ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৫৬-৯৭ খৃ.] গিয়াছেন, রামদাস সেন [১৮৪৫-৮৭ খৃ.] গিয়াছেন, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় [১৮৫১-১৯০৩ খৃ.] গিয়াছেন, লালমোহন বিদ্যানিধি [১৮৪৫-১৯১৬ খৃ.] গিয়াছেন, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮৪৯-১৯০০ খৃ.] গিয়াছেন, জগদীশনাথ রায় [১৮২৫-৮৭ খৃ.] গিয়াছেন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮২৭-৮৭ খৃ.] গিয়াছেন, আরো অনেকে গিয়াছেন। থাকিবার মধ্যে আছেন, শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় [১৮৪৯-১৯২২ খৃ.] আর আছি আমি। চন্দ্রশেখরবাবু অথর্ব হইয়াছেন, আমি এখনো, সাম্-ঋক্-যজুর মধ্যে আছি বোধ হয়। এখনো আর-কতদিন এইরূপ থাকিব, তাহা বলিতে পারি না।

বঙ্কিমবাবুর কাঁটালপাড়ার বাড়ির আর সে শ্রী নাই। অধিকাংশ জমিই রেলওয়ে গ্রাস করিয়াছে ; সবই গ্রাস করিত, কেবল রায় শ্রীযুক্ত বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুরের (Land Acquisition Deputy-Collector) চেষ্টায় বঙ্কিমবাবুর বৈঠকখানা-সংলগ্ন শিব-মন্দিরটি রক্ষা পাইয়াছে। আর লর্ড কার্জন [George Nathaniel

Curzon, ১৮৫৯-১৯২৫ খৃ.] বঙ্কিমবাবুর বৈঠকখানাটি ভাঙিতে দেন নাই। লর্ড কার্জন কলিকাতার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তির বাড়িতে মর্মর-ফলক লাগাইয়া দিয়াছেন। তিনি যে বঙ্কিমবাবুর বৈঠকখানাটি নষ্ট করিতে দেন নাই, ইহাতে আর বিচিত্র কী ? এখন শুনিতে পাইতেছি, রাস্তার উত্তরে বঙ্কিমবাবুর বাড়ি, পূজার দালান, এমন-কি, ৺রাধাবল্লভের মন্দির পর্যন্ত রেলওয়েসাৎ হইয়া যাইবে। তাহা হইলে বঙ্কিমবাবুর শিবমন্দির ও বৈঠকখানা মাত্র— অতীতের সাক্ষ্য দিবে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বঙ্কিমবাবুর বৈঠকখানায় মার্বেল ফলক লাগাইয়া, উহা যে পুরাতন কীর্তি, তাহা প্রমাণ করিয়াছেন এবং উহা যে চিরস্থায়ী হইবে, তাহারো বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

এই মার্বেল ফলক-প্রতিষ্ঠার সময় চারি বৎসর পূর্বে কলিকাতার অনেক মান্যগণ্য লোক, অনেক প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী কাঁটালপাড়ায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়াই যাহাতে কলিকাতায় বঙ্কিমবাবুর মার্বেল মূর্তি প্রতিষ্ঠা হয়, তাহার চেষ্টা করেন এবং স্যার আশুতোষ চৌধুরী [১৮৬০-১৯২৪ খৃ.] মহাশয়কে মুখপাত্র করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে এক সভা আহ্বান করেন। সে সভা ও তাহার কমিটির রিপোর্ট আপনারা সম্পাদকের নিকট পাইয়াছেন। এখন আমাদিগকে এই মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

এরূপ ক্ষেত্রে যাঁহার মূর্তি প্রতিষ্ঠা হইতেছে, তাঁহার গুণগান করা চিরকালের রীতি। কিন্তু এই আটাশ বৎসরে বঙ্কিমবাবুর সম্বন্ধে প্রায় সকল কথাই বলা হইয়াছে। তাঁহার কাব্যের সমালোচনা অনেকবার হইয়াছে— একবার গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী [১৮৬২-৯৯ খৃ] মহাশয় করিয়াছেন, একবার পূর্ণচন্দ্র বসু মহাশয় করিয়াছেন, আর-একবার এখন প্রসিদ্ধ সমালোচক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮৬৮-১৯২৯ খৃ.] ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, [১৮৮১-১৯৭৪ খৃ.] মহাশয় করিয়াছেন। তাঁহার ভাইপো শচীশবাবু তাঁহার জীবনচরিত লিখিয়াছেন ; বঙ্কিমবাবুরজীবন সম্বন্ধে টুকিটাকি খবরও অনেক দিয়াছেন। [শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বঙ্কিম-জীবনী', ৩য় সং, ১৩৩৮ ব.] এই-সকল টুকিটাকি খবর জানিবার জন্য লোকের আগ্রহ অত্যন্ত অধিক, তাই অনেকে সেই-সকল সংবাদ সংগ্রহ করিতেছেন ও প্রকাশ

করিতেছেন। সুতরাং নূতন কথা যে অধিক বলিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। তথাপি এরূপ ক্ষেত্রে একটু সমালোচনার লোভও ছাড়িতে পারিতেছি না, একটু তুলনার লোভও ছাড়িতে পারিতেছি না, টুকিটাকি দুই-চারিটি খবর দিবার লোভও ছাড়িতে পারিতেছি না।

বঙ্কিমবাবু কলিকাতা ইউনিভার্সিটির প্রথম বি. এ. [১৮৫৮ খৃ.]। তাঁহার পড়াশুনা যথেষ্ট ছিল, ইংরাজি সাহিত্য, ইতিহাস তাঁহার যথেষ্ট পড়া ছিল। ভাটপাড়ার শ্রীরাম শিরোমণির নিকট তিনি অনেকগুলি সংস্কৃত কাব্য পড়িয়াছিলেন। শিরোমণি মহাশয় কাব্য পড়াইতে গিয়া কেবল ব্যাকরণ ও অলংকারের খুঁটিনাটি লইয়া থাকিতেন না। কাব্য, রস, সৌন্দর্য বিষয়ে তাঁহার বেশ দৃষ্টি ছিল। বঙ্কিমবাবু তাঁহার কাছ হইতে এ-সব বিষয়ে বেশ একটু উপদেশ পাইয়াছিলেন এবং সে উপদেশের মতো কিছু কিছু কাজও করিয়াছিলেন। সংস্কৃত প্রাচীন কাব্যের ভাবটা তাঁহার বইয়ে যতটা পাওয়া যায়, এখনকার বইয়ে ততটা পাওয়া যায় না। তিনি সংস্কৃত কাব্যের অনেকগুলি সমালোচনা করিয়াছেন।

তাঁহার কাব্যের গণ্ডি কিন্তু বাংলায় আবদ্ধ নহে ; হিন্দু জাতিতে আবদ্ধ নহে ; তাঁহার কাব্যে বইয়ে হিন্দু, মুসলমান, ক্রিশ্চান, ইংরাজ সব জাতিই আছে ; তাঁহার কাব্যের ক্ষেত্রও ভারতময়। তিনি লিখিতেন বাংলায়, কিন্তু তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল ভারতের কবি হইবেন, সব জাতির কবি হইবেন। বঙ্কিমবাবু যে সময় লিখিতে আরম্ভ করেন, সে সময় দেশ-ভক্তি বলিয়া জিনিস জাগিয়া উঠে নাই। সেটার জাগরণ ক্রমে ক্রমে হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবু যখন মরেন, তখনো "ভারত ঘুমাইয়া" ; কেবলমাত্র জাগরণের উদ্যোগ হইতেছিল। তাঁহার প্রধান চেলা অক্ষয়বাবু কিন্তু বাংলার বাহিরে একেবারে যাইতে চাহিতেন না। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল বাংলাকে ভালো করিয়া চেনা। তাই তিনি খুঁটিনাটি করিয়া বাংলার সব জিনিস দেখিতে চাহিতেন। বঙ্কিমবাবু খুঁটিনাটি করিয়া দেখিতে চাহিতেন না। তিনি বড়ো বড়ো জিনিসগুলিই দেখিতেন ; ভালো ও বড়ো জিনিসগুলিই দেখিতে চাহিতেন, বাছিয়া লইতেন। তাই তাঁহার বইয়ে দুঃখী গরিবের স্থান নাই ; যাহারা খেটে খায়, তাহাদের স্থান নাই। তাঁহার

সকল নায়ক-নায়িকাই বড়োমানুষ। অভাবের তাড়নায় তাহারা ক্লেশ পায় না। তাহাদের যাহা ক্লেশ, তাহা কেবল প্রেমের তাড়নায়। এই তাড়নাটা বঙ্কিমবাবুর সকল বইয়েই খুব। দুই পুরুষ এক মেয়েকে ভালোবাসে বা এক পুরুষকে দুই মেয়ে ভালোবাসে, এই তাঁর গল্পের মূলমন্ত্র। কিন্তু ইহারই মধ্যে তিনি এত বৈচিত্র্য দেখাইয়াছেন যে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কখনো একঘেয়ে হয় নাই, দুটি গল্পও কোনোমতেই এক নহে। ভাবের, ভাষার ও ঘটনার বৈচিত্র্য সব কয়টিতেই আছে।

একখানা বইয়ে দুইটি গল্প মিলাইবার চেষ্টা তিনি মাত্র দুই বার করিয়াছেন। একবার বিষবৃক্ষে, আর-একবার চন্দ্রশেখরে। বিষবৃক্ষে তিনি সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। দুইটি গল্প এমনভাবে মিলাইয়াছেন যে, তাহাদের তফাত করিবার উপায় নাই। কবি—বিশেষ উপন্যাস-লেখকের পক্ষে এটি বড়ো শক্ত 'কর্তপ'। এই কর্তপে সিদ্ধিলাভ করা অল্প প্রতিভার কর্ম নহে। চন্দ্রশেখরে কিন্তু বঙ্কিমবাবুর এই সিদ্ধিলাভ হয় নাই, দুইটি গল্প বেশ তফাত হইয়াছে। একটু চেষ্টা করলেই দুইখানি বই করিয়া ছাপানো যায়। কিন্তু চন্দ্রশেখরে বঙ্কিমবাবুর কল্পনার দৌড় সকলের চেয়ে বেশি। শৈবলিনীর স্বপ্নের মতো প্রকাণ্ড জিনিস বাংলায় আর নাই।

গোড়ায় গোড়ায় বঙ্কিমবাবু কেবল কাব্যাংশ দেখিতেন, সৌন্দর্য-সৃষ্টি দেখিতেন, কাব্যকলার বিকাশ দেখিতেন, রসসৃষ্টি দেখিতেন, আর-কিছুই দেখিতেন না। তাই কাব্যাংশে তাঁহার প্রথম বইগুলি ভালো হইয়াছিল। প্রথমখানির অপেক্ষা দ্বিতীয়খানি ভালো, দ্বিতীয়খানির চেয়ে তৃতীয়খানি ভালো, এইরূপে তিনি কৃষ্ণকান্তের উইলে আসিয়া পৌঁছিলেন। তাহার পর তাঁহার ইচ্ছা হইল, কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে একটু ধর্ম-প্রচার, একটু দেশ-ভক্তির প্রচার। এ বিষয়ে দুইটি মত আছে। এক দল বলেন, উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য-সৃষ্টি হইলেই তাহারই নাম ধর্ম-প্রচার, তাহারই নাম দেশ-ভক্তি-প্রচার। কারণ, উৎকৃষ্ট ধর্ম, উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য, উৎকৃষ্ট দেশ-ভক্তি, তিনই এক জিনিস। আর-এক দল বলেন, "না, উৎকৃষ্ট ধর্ম, উৎকৃষ্ট দেশ-ভক্তি, উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য, এক জিনিস নয়; সুতরাং উৎকৃষ্ট সৌন্দর্যে ধর্ম বা দেশ-ভক্তি না দিলে, শুধু সৌন্দর্যে ধর্ম

বা দেশ-ভক্তি প্রচার হয় না।" এখানেও দ্বৈত এবং অদ্বৈত দুই বাদই আছে। বঙ্কিমবাবু দ্বৈতবাদী হইলেন। তাঁহার চেলাদের মধ্যে যাঁহারা অদ্বৈতবাদী ছিলেন, তাঁহারা তাহাতে মত দিলেন না। বঙ্কিমবাবুর 'আনন্দমঠ' [১৮৮৪ খৃ.], 'দেবী চৌধুরানী' [১৮৮৪ খৃ.], 'সীতারাম' [১৮৮৭ খৃ.] এই সময়কার দ্বৈতবাদের বই। এই বইগুলিতে বঙ্কিমবাবুর কল্পনার যথেষ্ট খেলা আছে। আর এইগুলিই দেশের মধ্যে অধিক প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে এবং এগুলির ক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে বাংলার গণ্ডির মধ্যে। এগুলির জন্য লোক তাঁহাকে বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া মনে করে। এইরূপে যখনই দেখিয়াছি, বঙ্কিমবাবু চেলাদের সমালোচনা অগ্রাহ্য করিয়া "আমার খুশি আমি করিব, তোমাদের ইচ্ছা হয় পড়িও না" এই বলিয়া আপনার গোঁয়ে চলিয়াছেন, সেই সকল জায়গায় দেশের লোক তাঁহাকে অধিক প্রশংসা করিয়াছেন। ইহাতে বেশ বোধ হয়, বঙ্কিমবাবু তাঁহার চেলাদের চেয়ে দেশের মতিগতি ঢের বেশি বুঝিতেন। তিনি 'বন্দেমাতরম্' গান লিখিয়া যেদিন সকলকে শুনাইলেন, সকলেই আপত্তি করিল : কেহ ভাষার আপত্তি করিল, কেহ ভাবের আপত্তি করিল, কেহ বলিল কটমট হইয়াছে, কেহ বলিল বাংলায় সংস্কৃতে মিশিয়া একটা অদ্ভুত জিনিস হইয়াছে, কেহ বলিল বিটকেল হইয়াছে, কেহ বলিল মলয়জশীতলাং শী-এর ঈ-কারের জন্য শ্রুতিকটু হইয়াছে ; কিন্তু বঙ্কিমবাবু কাহারো কথা শুনিলেন না, আপনার গোঁয়ে উহা ছাপাইয়া দিলেন। এখন তো সমস্ত ভারতবাসীর সেইটাই মূলমন্ত্র হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, বঙ্কিমবাবুর এমন একটা-কিছু ছিল, যাহাতে তিনি অনেক দূর পর্যন্ত দেখিতে পাইতেন এবং যাহা তাঁহার চেলাদের ছিল না। এইটেই তাঁহার বিশেষত্ব, এইটেই তাঁহার প্রতিভা। তিনি দেশকাল-পাত্র বুঝিতেন, চেলারা বুঝিত না। যিনি যেমন দেবতা, তাঁহাকে তেমন বাহন ও ভূষণ দিতে হয়, এটা তাঁহারা জানিতেন না ; বঙ্কিমবাবু জানিতেন। অনেক লিখিয়া তাঁহার সে আক্কেলটুকু হইয়াছিল।

এইরূপ মূলতত্ত্ব বিষয়ে আসল সমস্যায় ঘোর মতভেদ থাকিলেও, বঙ্কিমবাবুর এমন একটা আকর্ষণ ছিল যে, বঙ্কিমবাবুর অন্তরঙ্গমণ্ডলীর মধ্যে কেহ ভাঙিয়া বাহির হইয়া যাইত না। আমার সঙ্গে তাঁহার দুই-

তিন বার ঘোরতর মতভেদ হইয়াছিল, এমন-কি, তাহার জন্য আমাকে কিছু দিন বাংলা লেখা ছাড়িতেও হইয়াছিল। আর-একবার অন্য কারণে একটু বিবাদ হওয়ায় আমি চারি-পাঁচ মাস বঙ্কিমবাবুর বাড়ি যাই নাই। এ কারণটা সাহিত্য-ঘটিত নহে, আমাদের দেশীয় কোনো ব্যাপার। কিন্তু ব্যাপারটি বঙ্কিমবাবু জানিতেন আর আমি জানিতাম। অন্য লোক ইহার বিন্দু-বিসর্গ কিছুই টের পায় নাই। "তুমি যাও না কেন," কেহ জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিতাম, "এই শীঘ্রই যাইব," বঙ্কিমবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, "বিশেষ কাজকর্ম আছে, আসিতে পারিতেছে না।" কিন্তু এক আশ্চর্য উপায়ে অন্যে কিছু জানিবার পূর্বেই আমাদের সেই বিবাদ মিটিয়া গেল। আমি সেই টুকিটাকি গল্পটি আজই বলিব, আপনারা বিরক্ত হইবেন না। কেহ জানে না, সুতরাং নূতন কথা, তাই বলিতেছি। আমি একদিন আপিসে বসিয়া কাজ করিতেছি, পিছন দিক হইতে একখানা লম্বা সাদা হাতে একটি চৌকো খামে চিঠি আমার সামনে ফেলিয়া দিল। পিছন ফিরিয়া দেখি 'সাহেবটি' আমার চেয়ে একহাত উঁচু, বেশ লম্বা-চৌড়ো মুখখানা, ইংরাজের মতো নয়, ফ্রেঞ্চের মতো নয়, জর্মানের মতো নয়, আরো ভয়ানক রাঙা। চাহিয়া দেখিলাম, সম্পূর্ণ অপরিচিত। চিঠিখানা আমাদের মহামান্য অধ্যাপক টনি সাহেবের [Charles H. Tawney, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ১৮৬৪-৭৬ খৃ, অধ্যক্ষ ১৮৭৬-৮৯ খৃ.] হাতের লেখা। সাহেবকে চিনিতে পারিয়া চিঠি খুলিলাম। পড়িয়াই শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া গেল। টনি সাহেব সেন্টপিটার্সবুর্গের অধ্যাপক মিনায়েফ্‌কে[১] আমার কাছে পাঠাইয়াছেন; অনুরোধ করিয়াছেন, ইনি যাহা চান, করিয়া দিবে। পড়িবার সময় প্রফেসর মিনায়েফ্‌কে একবার দেখিয়াছিলাম: সে 'এই ঘটনার প্রায় ষোলো সতেরো বৎসর আগে। তখন তিনি রোগা ছিপছিপে ছিলেন।

সেই দিন হইতে তিনি সর্বদা আমার বাসায় আসিতেন; আমিও সময় সময় তাঁহার হোটেলে যাইতাম। আপিসে কাজকর্ম কিছু ছিল না; প্রায় সমস্ত দিনই তাঁহার সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। আমি তখন একটু একটু পালি ও সিংহলি শিখিতেছিলাম। পালিতে তখন তিনি ইউরোপের প্রধান, তার উপর সংস্কৃত জানিতেন, বেশ বাংলাও

জানিতেন, অক্ষয়কুমার দত্তের [১৮২০-৮৬ খৃ.] 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' [প্রথম ভাগ ১৮৭০ খৃ., দ্বিতীয় ভাগ ১৮৮৩ খৃ.] তাঁহার নখদর্পণে ছিল। তাঁহার সব কথা বলার দরকার নাই। একদিন তিনি হঠাৎ বলিলেন, আমাকে জনকতক বড়ো বড়ো বাংলা লেখকের বাড়ি লইয়া যাইতে পারো? আমি বলিলাম পারিব না কেন? বলিলাম বটে, কিন্তু সর্বাগ্রে বঙ্কিমবাবুর কথা মনে হইল। তাঁহার কাছে আগে না লইয়া গিয়া অন্য জায়গায় গেলে সহচারবিরুদ্ধ হইবে; সুতরাং অগত্যা আগে তাঁহার বাড়ি দেখা করার স্থান ও কাল নির্ণয় করিতে গেলাম। আমি যাওয়ায় তিনি খুব খুশি হইলেন, কিন্তু কিছু প্রকাশ করিলেন না; কেবল বলিলেন, "তাঁহাকে লইয়া তুমি বাড়ি বাড়ি ঘুরিবে, তার চেয়ে আমি কেন তাঁহাদের আমার বাড়ি ডাকি না।" তিনি রবিবার সকালে নয়টায় সময় নির্ধারণ করিয়া দিলেন। অধ্যাপক মিনায়েফ্ আসিলে তাঁহাকে বলিলাম, রবিবার নয়টার সময় আমরা বঙ্কিমবাবুর বাড়ি যাইব। তিনি বলিলেন, "আমি তো পথ চিনি না, আটটার সময় আমার হোটেলে আসিয়া আমায় লইয়া যাইও।" রবিবার গাড়িতে আসিবার সময় বলিলাম, "বঙ্কিমবাবুর বাড়িতেই হয়তো অনেকগুলি বাংলা লেখকের সহিত আপনার দেখা হইবে।" তিনি অত্যন্ত দুঃখিত, ক্ষুব্ধ এবং বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমি যে তিন জন লোক একত্র থাকিলে কথা কহিতে পারি না, ভেবাচেকা খাইয়া যাই।" আমি বলিলাম, "আপনি ইউরোপীয়, কেন ভেবাচেকা খাইবেন?" তিনি বলিলেন, "আমি হই তা কী করিব। বাড়ি বসে পড়াশুনা করি, লোকজনের সঙ্গে বড়ো মিশি না তো।" যাহা হউক, বঙ্কিমবাবুর বাড়ি আসিয়া দেখি, হেমবাবু আছেন, চন্দ্রবাবু আছেন, রমেশ দত্ত [রমেশচন্দ্র দত্ত, ১৮৪৮-১৯০৯ খৃ.] আছেন, রজনী গুপ্ত [রজনীকান্ত গুপ্ত, ১৮৪৯-১৯০০ খৃ] আছেন, আরো চার-পাঁচ জন লোক আছেন। প্রফেসর মিনায়েফ্ আসিলে, তাঁহারা সকলে উঠিয়া দাঁড়াইয়া শেক-হ্যাণ্ড করিলেন। পরস্পর পরিচয় ও শিষ্টালাপের পর প্রফেসর মিনায়েফ্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই যে ব্রহ্মদেশটা ইংরাজরা সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইল [১৮৮৫ খৃ.], তাহাতে ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্র সকল কী বলিল?" আমরা সকলেই বলিলাম, "খবরটা দিল মাত্র, মতামত

কিছুই প্রকাশ করে নাই।” তাহার পর মিনায়েফ্ কেবলই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, আজমীর যাইতে হইলে কোন্ পথে যাইতে হয়, চিতোর যাইতে হইলে কোন্ পথে যাইতে হয় ইত্যাদি। তখন আমরা কেহই দেশ ভ্রমণ করি নাই ; করিয়াছিলেন কেবল রমেশবাবু। তিনি তাঁহাকে রাস্তার কথা সব বলিয়া দিতে লাগিলেন। বাংলা বইয়ের মধ্যে কী কী ভালো বই আছে, সে কথা হইল। যাঁহার যাহা মনে ছিল, তাহাই বলিয়া দিলেন ; তিনি সেগুলি লিখিয়া লইলেন। ঘণ্টাখানেক থাকিয়া প্রফেসর মিনায়েফ্ উঠিয়া গেলেন। আমি যখন তাঁহাকে গাড়িতে উঠাইয়া দিতে যাই, বঙ্কিমবাবু তখন বলিলেন, “হরপ্রসাদ, তুমি ফিরিয়া আসিও।” আসিয়া দেখি, বঙ্কিমবাবু প্রচুর আহারের উদ্যোগ করিয়াছেন। সকলে আহার করিয়া দুইটার সময় বাড়ি ফিরিয়া গেলেন; আমার হাঙ্গামটা মিটিয়া গেল। কিন্তু মিনায়েফের ব্যাপার মিটিল না। শুনিলাম, কে একজন 'মিরারে' [*Indian Mirror*] লিখিয়া দিয়াছে যে, Professor Minayeff was invited at the house of Babu Bankim Chandra Chatterji. The agitator class, mustered strong and inflammatory speeches were made ইত্যাদি। স্যার সুরেন্দ্রবাবুর [সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৪৮-১৯২৫ খৃ.] মুখে শুনিলাম, আমাদের সকলের নাম পুলিসের Black book-এ উঠিয়াছে। তখনকার Political পুলিসও অনেকবার আমার বাড়িতে পদার্পণ করিয়াছিল এবং অধ্যাপক মিনায়েফ্ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। দুই বৎসর পরে শুনিলাম, পুলিস আমাদের নামগুলি Black book হইতে কাটিয়া দিয়াছে।

২

এখন দেখিতেছি, লোকে বঙ্কিমবাবুর সম্বন্ধে এই-সব টুকিটাকি গল্প অনেক চায়। অনেকেই সংগ্রহ করিতেছেন এবং সংগ্রহ করিবেন। এগুলি সংগ্রহ করা খুব ভালো। ইহাতে বঙ্কিমবাবুর চরিত্রের অনেক কথা বুঝিতে পারা যায়। অন্যান্য লেখকের মতো বঙ্কিমবাবু নিজের জীবনী লিখিয়া যান নাই, সুতরাং

সে ভার বাঙালির উপর দেওয়া আছে। এইবেলা সে সমস্ত সংগ্রহ না হইলে সংগ্রহ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে। পূর্ণবাবু এখনো বাঁচিয়া আছেন, তিনি অনেক কথা বলিতে পারিবেন, শ্রীমান্ জ্যোতিশ্চন্দ্র অনেক কথা বলিতে পারিবেন, শ্রীমান্ বিপিনচন্দ্র অনেক কথা বলিতে পারিবেন [১০]। কলিকাতায় আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বাংলায় উচ্চ সমাজে খুব মিশিয়াছিলেন, অনেক বড়োলোক তাঁহার বাড়ি যাইতেন, তিনিও অনেকের বাড়ি যাইতেন। যতদিন বাহিরে ছিলেন, সভা-সমিতিতে বড়ো যাইতেন না ; কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া অনেক সভায় যাইতেন। তিনি কলিকাতা ইউনিভার্সিটির ফেলো হইয়াছিলেন। গবর্নমেন্ট হাউসের গার্ডেন পার্টি ও ইভনিং পার্টিতে যাইতেন ; কিন্তু তাঁহার লীলাক্ষেত্র হইয়াছিল University Institute তখন Society for the Higher Training of Young Men।[১১] তিনি প্রথম যেদিন সেখানে গিয়াছিলেন, সেদিন এত ভিড় হইয়াছিল যে, উহার প্রকাণ্ড হলেও লোক ধরে নাই। অনেকে দুঃখিত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছিল, তাঁহার চেহারাও দেখিতে পায় নাই। তিনি শেষ Higher Trainingএ বেদ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। Higher Training তখন খুব জমকাইয়া উঠিয়াছিল। ইংরাজি ১৮৯১ সালে তাঁহারই প্রবর্তনায় ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায় বাংলা বেশি পরিমাণে চালাইবার চেষ্টা হয়।[১২] আমি ও স্যার আশুতোষ [আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ১৮৬৪-১৯২৪] তাঁহার সহায় হই, আশুতোষের নামে Motion দেওয়া হয়। এমনকি, চেষ্টা হইয়াছিল, বাংলায় যাহাতে M.A. পর্যন্ত হয়। কিন্তু তখনো দেশ প্রস্তুত হয় নাই। স্থির হইয়াছিল, বাংলায় একটা স্বতন্ত্র পরীক্ষা হইবে ; তাহার নম্বর পাসের সময় ধরা হইবে না। এই উপলক্ষে Faculty of Artsএ বঙ্কিমবাবু একটি বেশ ছোটোখাটো অথচ সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন।[১৩]

১৮৯৪ সালের মার্চ মাসে একদিন শুনিলাম, বঙ্কিমবাবু অত্যন্ত পীড়িত ; গিয়া দেখিলাম, তিনি অজ্ঞান ও অভিভূত। ইহারই কয়েকদিন পরে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। তিনি পেনসন লইয়া এক বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। গবর্নমেণ্ট তাঁহাকে special pension ও C. I. E. [১৮৯৪ খৃ.] উপাধি দিয়াছিলেন। স্যার চার্লস ইলিয়ট

[Sir Charles Alfred Elliot, বাংলার লে. গবর্নর ১৮৭৪-৭৭ খৃ.] তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন।

শুনিয়াছি, বঙ্কিমবাবু মৃত্যুর পূর্বে একটি ভালো কাজ করিয়া গিয়াছেন। তিনি নাকি বলিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর বারো বৎসরের মধ্যে তাঁহার জীবন-চরিত না লেখা হয়। তিনি যদি এটি করিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি তাঁহার উপযুক্ত কর্মই করিয়া গিয়াছেন। সকল মানুষেই দোষও থাকে, গুণও থাকে। তাড়াতাড়ি জীবন-চরিত লিখিলে দোষ ও গুণ দুই-ই প্রকাশ হইয়া পড়ে, দোষগুলা বরং একটু অতিরঞ্জিত হইয়া পড়ে। অতিরঞ্জিত না হইলেও পরনিন্দা ও পরকুৎসা করা মানুষের যেরূপ স্বভাব, তাহাতে দোষগুলা লইয়াই বেশি আলোচনা আন্দোলন করে। তাই তিনি বারো বৎসর বলিয়া একটা সীমা নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।[১৪]

হয়তো তিনি ভাবিয়াছিলেন, বারো বৎসরের মধ্যে লোকের রুচি এমন বদলাইয়া যাইবে যে, লোকে তাঁহার কীর্তিকলাপ, কাব্য-নাটক ভুলিয়া যাইবে; তখন আর জীবন-চরিত লেখার দরকারই হইবে না। কিন্তু আমার অনেক সময় মনে হয়, তিনি যেরূপ প্রতিভাশালী লোক ছিলেন, তাঁহার যেরূপ দূরদৃষ্টি ছিল, তাহাতে তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, অল্পদিনের মধ্যেই ভারতবর্ষের একটা ঘোর পরিবর্তন হইবে, তাহাতে তাঁহার কার্যের, কবিত্বের, তাঁহার পুস্তকসমূহের আদর অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিবে। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, তিনি ও তাঁহার দলবল ভারতবর্ষে, বিশেষ বাংলায় যে জাগরণ-সংগীত গাহিয়া গেলেন, যে প্রাণপ্রতিষ্ঠামাত্র করিয়া গেলেন, সেই সংগীত জমিয়া উঠিবে, সে প্রাণে বল আসিবে, এবং তাহাতে দেশের অশেষ উন্নতি সাধিত হইবে; তখন হয়তো তাঁহার প্রত্যেক কথার দাম বাড়িয়া উঠিবে; তিনি যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রভাব বাড়িবে; তাঁহার জীবনের ঘটনা লোকে আগ্রহ করিয়া শুনিবে; টুকিটাকি খবর লইবার জন্য লোকে ব্যস্ত হইবে, তাঁহার কাজের, সকল কথার একটা নূতন মানে লোকে দেখিতে পাইবে।

আমি দেখিতে পাইতেছি, তিনি ঠিকই বুঝিয়াছিলেন, তিনি ঠিকই বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বারো বৎসরের মধ্যেই

একটা প্রকাণ্ড জাগরণ আসিয়াছিল। দুর্গাপূজার পূর্বে বাংলায় যেমন ঘরে ঘরে আগমনী গায়, তিনি সেইরূপ আগমনী গাহিয়া গিয়াছিলেন, তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, দেবী নিশ্চয়ই আসিবেন; কিন্তু সে আগমন দেখা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে না, তাই তিনি বাঙালিকে বারো বৎসর অপেক্ষা করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ভবিষ্যৎ বাণী সফল হইয়াছিল, দেবী আসিয়াছিলেন। জাগরণ হইল তাঁহারই "বন্দে মাতরং" লইয়া। তখন লোকে বুঝিল, তিনি কী ছিলেন— তাঁহার দূরদৃষ্টি কত তীক্ষ্ণ ছিল। এতদিন তিনি কবি ছিলেন, লেখক ছিলেন, উপন্যাসলেখক ছিলেন, ইতিহাসলেখক ছিলেন। এখন লোকে দেখিল, তিনি ঋষি ছিলেন, Saint ছিলেন, তিনি সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। এতদিন লোকে তাঁহাকে লৌকিকভাবে দেখিত, এখন তাঁহাকে অলৌকিক বা লোকোত্তরভাবে দেখিল। এতদিন তাঁহাকে মানুষ বলিয়া জানিত, এখন তাঁহাকে অতিমানুষভাবে জানিল, এতদিন তাঁহাকে হস্তপদাদিবিশিষ্ট জীব বলিয়া জানিত, এখন তাঁহাকে উপদেশ-রাশি বলিয়া মনে করিল। মানুষের যে-সব দোষ থাকে, সে-সব তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। এতদিন তাঁহার সম্ভোগকায় দেখিয়াছিল, নির্মাণকায় দেখিয়াছিল, এখন কেবলমাত্র তাঁহার ধর্মকায় দেখিতেছে। এখন তাঁহার নবেলগুলির প্রত্যেক অক্ষরে নূতন নূতন মানে দেখিতেছে; তাঁহার ধর্মতত্ত্বে, গীতা-রহস্যে নূতন নূতন মানে দেখিতেছে, এমন-কি তাঁহার লোক-রহস্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত গূঢ় অর্থ দেখিতেছে।

পঁচিশ শত বৎসর পূর্বে বুদ্ধের শিষ্যগণও তাঁহাকে এইরূপে দুই ভাবে দেখিয়াছিলেন। যাঁহারা সর্বদা বুদ্ধের নিকটে থাকিতেন, তাঁহারা তাঁহাকে লৌকিকভাবেই দেখিতেন, অক্ষরে অক্ষরে তাঁহার উপদেশ মানিয়া চলিতেন, তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন, একান্ত ধর্মভাবে তাহার সবই মানিয়া চলিতেন; কিন্তু দু-এক পুরুষের মধ্যেই লোকোত্তর-ভাব আরম্ভ হইল। যাঁহারা স্থবিরদিগের অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন না, তাঁহারা লোকোত্তরভাবে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। বুদ্ধ শুদ্ধোদনের পুত্র হইলেও, মনুষ্যভাবে পৃথিবীতে বহু দিন বিচরণ করিলেও, তিনি একটা চিরন্তন অনাদি অনন্ত ধর্মের ক্ষণিক বিকাশমাত্র। লোকোত্তর-বাদীরা বলিতেন, তিনি যদি মানুষ হইতেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সবই

ফুরাইয়া যাইত ; কিন্তু বুদ্ধ মরিলেও তো তাঁহার স্তব ফুরায় নাই, তাঁহার সঙ্ঘ বর্তমান আছে, তাঁহার শাসন বর্তমান আছে, তাঁহার বিনয় বর্তমান আছে, তাঁহার ধর্ম বর্তমান আছে, তবে আর তিনি মরিলেন কি ? তাঁহার ভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে মিশাইয়া গিয়াছে ; কিন্তু তাঁহার আসল দেহ, তাঁহার ধর্মে উপদেশে বিনয়ে সঙ্ঘে বর্তমান আছে। তিনি ছিলেন ক্ষণিক, এখন তিনি হইয়াছেন অনন্তকালব্যাপী। তিনি ছিলেন মূর্ত, এখন হইয়াছেন বিভু অর্থাৎ সর্বমূর্তসংযোগী। যাহা ছিল অল্প স্থান ও অল্প কালে আবদ্ধ; এখন তাহা হইয়াছে কালে ও স্থানে অনন্ত। এই লইয়া এক শত বৎসর ধরিয়া তুমুল আন্দোলন হয়, শেষ লোকোত্তরবাদীরাই প্রবল হইয়া উঠেন। সেই লোকোত্তরবাদী পরিণামে মহাসাঙ্ঘিক ও মহাযান হইয়া উঠেন।

আমাদেরও বঙ্কিমবাবু সেইরূপ। তিনি মরিয়াছেন, তাঁহার দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছে, তাঁহার আবদ্ধ সীমাবদ্ধ অল্পক্ষণস্থায়ী অল্পদেশব্যাপী সত্তা লোপ হইয়াছে ; কিন্তু তাঁহার ভারতব্যাপী যুগ-যুগান্তব্যাপী দেহ এখনো বর্তমান আছে। শুধু বর্তমান আছে নহে, ক্রিয়া করিতেছে, কাজ করিতেছে, দেশের লোককে অনুপ্রাণিত করিতেছে, তাহাদের আচার-ব্যবহারে হেতুভূত হইয়াছে, তাহাদের সর্ববিষয়ে শাসন করিতেছে, তাহাদের সমস্ত জীবনটা বদলাইয়া দিতেছে। তাঁহার ধর্মকায় বজায় আছে, তাঁহার অপূর্ব গ্রন্থাবলী বজায় আছে, তাঁহার উপদেশ বজায় আছে, তাঁহার দেহটা গিয়াছে, প্রাণটা বজায় আছে। সেই প্রাণ আজ আমরা এই মর্মর-মূর্তিতে প্রতিষ্ঠা করিতেছি। ইহার অর্থ কী ? আমরা কি আবার তাঁহাকে, তাঁহার ভারতব্যাপী প্রাণকে, 'যুগযুগান্তব্যাপী' প্রাণকে এই মার্বেলের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করিতেছি ? তাহা নহে। এ মর্মর-মূর্তি বঙ্কিমবাবুর প্রতিভাস মাত্র, ছায়া মাত্র, প্রতিবিম্ব মাত্র, এটা কিছুই না, শূন্য ফাঁকা। আমরা আরশিতে মুখ দেখি, আরশিতে আমাদের প্রতিবিম্ব পড়ে, ইহাকেই আমরা প্রতিভাস বলি। সে প্রতিবিম্ব প্রতিভাস কিছুই নহে, ফাঁকা, অথচ আমরা মনে করি, এ আমারই মুখ, আমি ঐ আরশির মধ্যে বসিয়া আছি।— এ মার্বেল-মূর্তিও তাই। আরশিতে যে ছায়া দেখিয়াছিলাম, তাহা হইতেই এই মূর্তি হইয়াছে, সুতরাং আরশির

প্রতিবিম্ব হইতেও এ মূর্তি ফাঁকা। তবু এই মূর্তিকেই আমরা বঙ্কিমবাবু বলিব। তিনি অদৃশ্যভাবে আমাদের জীবন পরিবর্তন করিবেন, এ আমাদের সহিবে না। তাই আমরা সামনে একটা কিছু বসাইতে চাই, তাই এ মূর্তি-কল্পনা।

লোকোত্তরবাদী মহাযানীরা বুদ্ধকে— বুদ্ধ-প্রতিবিম্বকে, বুদ্ধ-মূর্তিকে উপায় বলিতেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল, বোধি প্রজ্ঞা নির্বাণ। বুদ্ধ আর-কিছুই নহেন, সেই বোধি, সেই প্রজ্ঞা ও সেই নির্বাণ পাইবার উপায়। তিনি যেরূপে পাইয়াছিলেন, আমরাও সেইরূপে পাইব। তাই তাঁহাকে সম্মুখে রাখিতে চাই। তাঁহার ভাবে আমরা বিভোর হইতে চাই, তাঁহার পদাঙ্ক আমরা অনুসরণ করিতে চাই ; তাই তিনিই উপায়। আমাদের এখানেও তাই, আমরা তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে চাই, তাঁহার ভাবে বিভোর হইতে চাই, তাই তাঁহার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিতেছি। মূর্তি দেখিলেই আমাদের বঙ্কিমকে মনে পড়িবে, তাঁহার অপরূপ সৌন্দর্য-সৃষ্টি মনে পড়িবে, তাঁহার মন-মাতানো গান মনে পড়িবে, আর আমরা সেইরূপ হইতে চাহিব।

বঙ্কিমবাবুর মার্বেল-মূর্তি নিচেয় রহিয়াছে। সদর দরজার ঠিক সামনেই তাঁহার মূর্তি থাকিবে, আসুন, আমরা সকলে গিয়া তাঁহার মূর্তি উন্মোচন করি। তিনি জীবনে আমার Friend Philosopher and Guide ছিলেন। তিনি এখন উপর হইতে দেখুন যে, তাঁহার এই শিষ্যটি এখনো তাঁহার একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত।

বঙ্কিম, তুমি এখন স্বর্গে আছ। রক্ত-মাংসের শরীরে নাই, তুমি উপর হইতে দেখ, সমস্ত বাঙালি জাতি তোমায় কত ভালোবাসে, কত ভক্তি করে— তুমি তাহাদের আশীর্বাদ কর, তাহারা যেন তোমার উপদেশমতো কার্য করিতে পারে ও তোমার মনের মতো মানুষ হইতে পারে।

'মাসিক বসুমতী'
শ্রাবণ এবং ভাদ্র, ১৩২৯ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. সূত্র

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪ খৃ.) সম্পর্কে শাস্ত্রীমশায় তিনটি স্মৃতিকথা লেখেন—

১. 'বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়', নারায়ণ, বৈশাখ ১৩২২ ব.

২. 'বঙ্কিমচন্দ্র', নারায়ণ, আষাঢ় ১৩২৫ ব.

৩. 'বঙ্কিমচন্দ্র', মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ এবং ভাদ্র ১৩২৯ ব.

প্রবন্ধ তিনটি প্রকাশকালের অনুক্রম অনুসারে 'বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গ' এই সাধারণ শিরোনামে ছাপা হল। পত্রিকার মূল শিরোনাম এখানে উপ-শিরোনাম রূপে রাখা হয়েছে।

১৯১৮ খৃস্টাব্দে পদ্মনাথ ভট্টাচার্যের উদ্যোগে কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানাঘরের পুব দিকের দেওয়ালে মর্মর ফলক লাগানো হয়। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় শাস্ত্রীমশায় দ্বিতীয় প্রবন্ধটি পড়েন। এই ফলকখানি পরে তুলে ফেলে অন্য একটি ফলক লাগানো হয়েছে, তাতে পদ্মনাথের নাম নেই।

তৃতীয় প্রবন্ধটি পড়েন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বঙ্কিমচন্দ্রের মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ১৩২৯ বঙ্গাব্দের (১৯২২ খৃ) নবম বিশেষ অধিবেশনে। মুদ্রিত কার্য-বিবরণে (পৃ. ১০) উল্লেখ আছে, "নবম বিশেষ অধিবেশন : ৪ঠা আষাঢ়, ১৮ই জুন রবিবার। এই অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এই বিশেষ অধিবেশন হয়। বৌবাজার অবৈতনিক নাট্য-সমাজ কর্তৃক শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় রচিত 'বঙ্কিম-বরণ' গীত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র মর্ম্মর মূর্ত্তি-নির্ম্মাণ শাখা-সমিতির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় স্মৃতি-সমিতির কার্য্য-বিবরণ পাঠ করেন। স্মৃতি-সমিতির ১১২৲ টাকা দেনা দেখাইয়া সহকারী সম্পাদক অর্থের জন্য সকলের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে পর ৭০৫৲ টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। অনন্তর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দেব মহাশয় একটি কবিতা পাঠ করেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয় এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী'র এক গান গাহিলেন, তৎপরে শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভাগবতভূষণ মহাশয় একটি

কীর্ত্তন গান করিলেন এবং শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় 'আনন্দমঠে'র 'মায়ের তিন মূর্ত্তি' পাঠ করেন। গোবর্দ্ধন-সঙ্গীত-সমাজের পক্ষ হইতে 'বন্দেমাতরম্' গীত হয় এবং রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেন।"।

১. শাস্ত্রীমশায়ের ভাইপো মঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্যের (১৮৯৩-১৯৮১ খৃ.) লেখা ১৯০৯ খৃস্টাব্দের একখানি ডায়ারিতে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু মন্তব্য লেখা আছে। রামচন্দ্রের পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে, "Rampandit = Ramchandra Banerji worked in Bangadarshan press—father of Kshirod Banerji of Ichapore Gun & Shell factory." ডায়ারির প্রাসঙ্গিক অংশ নিচে তুলে দেওয়া হল—

বন্দেমাতরম গীতটি আনন্দমঠ রচনার পূর্ব্বেই রচনা করা হইয়াছিল। প্রথমতঃ প্রিয়নাথ কথককে সুরে চড়াইবার জন্য কহিলেন। তিনি অসমর্থ হইলে যদুনাথ ভট্টকে কহিলেন। সকলের মনোরঞ্জন হইল। তখন রামপণ্ডিত মহাশয় 'বঙ্গদর্শনের' একটি আর্টিকেলের জন্য বঙ্কিম[-এর] নিকটে গিয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, গীতটি কেমন শুনিলে।

রাম— শুনিলাম ভাল কিন্তু এ সকল গীতের দিকে আপনার প্রবৃত্তি হইল। দ্বিসপ্তভুজৈ etc ছেলে ছোকরার ঢঙ কেন ?*

ব— কি এ ছেলে ছোকরার ঢঙ। এ গীতের মহিমা ২৫ বৎসর যদি বাঁচ ত জানিতে পারিবে। আমি অত বাঁচিব না। কিন্তু তোমরা তখন দেখিয়া লইবে। ইহা ভারতকে মাতাইয়া তুলিবে। সমস্ত দেশ প্লাবিত করিবে। প্রথমে কিছু অনিষ্ট হইবে কিন্তু আর ২৫ বৎসর পরে সুফল ফলিবে।

* দ্বিসপ্তকোটি ইত্যাদি এসব কি। বাঙ্গালী কি রাজা হবে।

ব— রাজাপ্রজা কি ? রাজা যেই থাক না কিন্তু প্রজারা স্বাধীনতা বুঝিবে।

রা— আমার বুদ্ধিতে এসব প্রবেশ করিল না তবে আপনার যেরূপ লেখা অভ্যাস তাহাতে জগতের অনেক উপকার হইতেছে তাহাই লিখুন।

ব— আমি অদ্যাবধি যাহা লিখিয়াছি তাহাতে বঙ্গ সংসারের কিছুই উপকার হয় নাই বরং ক্ষতি হইয়াছে।

রা— কেন ?

ব— কতকগুলি স্ত্রীলোক কুন্দ কতকগুলি পুরুষ জগৎসিংহ হইতে চেষ্টা করিবে ইত্যাদি অথচ তাহাতে কোন ফল হইবে না। আমি এবার যাহা লিখিব তাহাতে দেশের যথার্থ উপকার হইবে।

(মন্তব্য— আনন্দমঠ)

বঙ্কিমবাবুর মতে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর not only obscene but immoral.

ছোড়দার চরিত্রের সাধুত্বের উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে হরপ্রসাদ যেন ঐরূপ চরিত্র রাখে। যে এক স্ত্রীতে রত থাকে সে দীর্ঘজীবী হয়— promiscuous intercourse এর ন্যায় আয়ুক্ষয় আর নাই। আমরা এক্ষণে তাহার ফল ভোগ করিতেছি।

বঙ্কিমবাবু কেহ তাঁহার লেখার প্রশংসা তাঁহার সম্মুখে করিলে তাহা ভালবাসিতেন না। তিনি কোন বিষয়ে একটি রচনা করিয়া রাম পণ্ডিত মহাশয়কে দেখাইলে তিনি (পণ্ডিত) কহিলেন তা না হবে কেন আপনার লেখা ! যাহা লেখেন তাহাই উত্তম। তাহাতে বঙ্কিমবাবু চটিয়া বলিলেন যে ও রকম প্রশংসা আমি পছন্দ করি না [।] তোমার উপর proofsheet-এর সংশোধন ভার নির্ভর [।] যদি কোন জায়গায় রচনার ত্রুটি থাকে তাহা হইলে তাহাও শুদ্ধ করিয়া বদলাইয়া দিতে পার [।] তোমার উচিত নহে যে আমার লেখা বলিয়া একেবারে নির্দোষ বলিয়া মানিয়া লও।

বঙ্কিমবাবু নভেল লিখিতে বসিয়া প্রায়ই সেখানি অবিচ্ছিন্ন ভাবে শেষ না করিয়া ছাড়িতেন [না]। কিন্তু নভেল লিখিতে ২ বন্ধ করিয়া যদি অন্য প্রবন্ধ লিখিতে বা অন্য কার্য্যে মন দিতেন তাহা হইলে পুনরায় খেই ধরিয়া লিখিতে একটু তাঁহার কষ্ট হইত।

একদিন রাম পণ্ডিত মহাশয় তাঁহাকে বলিলেন যে উইল খানা অনেক দিন লেখা হইতেছে না আপনি একটা উইল বিষয়ক প্রবন্ধ দিন। তখন বঙ্কিমবাবু আফিস হইতে প্রত্যাগত ক্লান্ত [।] বলিলেন সমস্ত দিন কলম পিষিয়া আসিয়া আর সামর্থ্য নাই যে ভাবি বা লিখি [।] তবে তুমি যদি কলম ধর তবে আমি একটা প্রবন্ধ লিখাইতে পারি কিন্তু নভেল নহে [।] তখন রাম পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন নভেলই চাই [।] আপনি dictation-এর মত করিয়া লিখাইবেন তাহাতে আমার কষ্ট কি কিন্তু নভেলই চাই। কারণ অন্যান্য অনেক প্রবন্ধ মজুদ আছে— উইলটাই অসমাপ্ত রহিয়াছে [।] বঙ্কিমবাবু বলিলেন নভেল কি প্রকারে লিখি [।] আমার উইলের প্রথম অধ্যায়ের সকলের কিছুই মনে

নাই [।] আবার সেগুলি অথবা শেষের দুই এক অধ্যায় পড়িয়া না লইলে কেমন করিয়া লিখিতে পারি। রাম পণ্ডিত মহাশয় তথাপি জিদ করিতে লাগিলেন [।] বলিলেন আপনার নিকট প্রথম অধ্যায়গুলি পড়িতেছি কিন্তু আপনাকে উইলই লিখিতে হইবে। বঙ্কিমবাবু তখন তোড়জোড় লইয়া বসিলেন রাম পণ্ডিত মহাশয় কাগজ কলম ধরিলেন। এমন সময় নিকটে একটি বৃক্ষে কুহুঃ রবে একটি কোকিল ডাকিল সে কুহু রব বঙ্কিমবাবুর মস্তিষ্ক প্লাবিত করিয়া কল্পনা প্রসূন উন্মেষিত করিল (illumined what was dark)। তখন বঙ্কিমবাবু বলিলেন এখন ভাবিতে হইবে না আর পড়িতেও হইবে না [।] এখন লেখ। যাহা লিখিলেন তাহা কৃষ্ণকান্তের উইলের বসন্তের কোকিল! [বঙ্গদর্শন, মাঘ ১২৮২ ব. উপন্যাসের এই অংশ প্রকাশিত হয়।]

২. শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম হুগলি জেলা, শ্রীরামপুর মহকুমার গরলগাছা গ্রামে, ৪ জুন ১৮৩৮ খৃ.। বাবা কালিদাস খিদিরপুর ডকে চাকরি করতেন।

পাঁচ বছর বয়সে গ্রামের পাঠশালায় শিক্ষা শুরু হয় এবং গ্রামের স্কুলেই ইংরেজি শেখেন। পরে হেয়ার সাহেবের কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল এবং ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি ঘুরে উত্তরপাড়া স্কুলে ভর্তি হন। এখানে প্রধান শিক্ষক রামতনু লাহিড়ীর ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসেন। উত্তরপাড়া থেকে জুনিয়র স্কলারশিপ পেয়ে হিন্দু কলেজের স্কুল বিভাগে ভর্তি হন। ১৮৫৫য় আবার জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা দিয়ে প্রথম হন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। ১৮৫৭য় সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় দ্বিতীয়। কিছু দিন চাকরি করে আবার ১৮৬০-এ বি. এ. পরীক্ষায় বসেন এবং প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় হন।

১৮৫৯ থেকে মেহেরপুর স্কুল, মিলিটারি অ্যাকাউন্টেণ্ট-জেনারেলের অফিস, গরলগাছা স্কুল, মালদহ জেলা স্কুল, আরা জেলা স্কুল এবং ছাপরা স্কুলে কাজ করে আগস্ট ১৮৬৭-তে ১৫০ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের লেকচারার হন। ফার্স্ট ও থার্ড ইয়ার ক্লাসে ইংরেজি এবং থার্ড ও ফোর্থ ইয়ার ক্লাসে সাইকলজি, এথিক্স ও লজিক পড়াতেন। নিজের ছাত্রদের প্রসঙ্গে শ্যামাচরণ মন্তব্য করেছেন, "আমার সময়ের সংস্কৃত কলেজের প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন ঃ— উমেশচন্দ্র বটব্যাল (বড়াল), (Premchand Roychand Student, Statutory Civilian); বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল, কালেজের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক; গোপালচন্দ্র সরকার, শাস্ত্রী, এম্-এ, বি-এল, কলিকাতা হাইকোর্টের

একজন প্রধান উকীল ; শিবনাথ ভট্টাচার্য্য, শাস্ত্রী, এম্-এ, গ্রন্থকার ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক ; হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, শাস্ত্রী, এম্-এ, সি-আই-ই, মহামহোপাধ্যায়, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও বাংলার এসিয়াটিক সোসাইটির চেয়ারম্যান ; হরিদাস ভট্টাচার্য্য, শাস্ত্রী এম্-এ, জয়পুর রাজ কলেজের অধ্যক্ষ ও জয়পুর রাজ্যের ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাক্‌শন্।" ১৮৭৬-এ শ্যামাচরণ সংস্কৃত কলেজ থেকে উত্তরপাড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়ে যান। ১৮৮৭-তে উত্তরপাড়া স্কুল দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ হয়, তিনি অধ্যক্ষ হন। জুলাই ১৮৯৬ খৃ. পেন্সন নেন।

লেখক জীবন সম্পর্কে শ্যামাচরণ বলেছেন, "প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িবার সময় সংস্কৃত-ভরা বাঙলা (Sanskritised Bengali) রচনার প্রতি আমার বিদ্বেষ জন্মে। Sir George Campbell-এর Sanskritised Bengali and Persianised Urduর বিরুদ্ধ Minutes ১৮৭২ সালে প্রকাশ হইলে আমি বড় খুসী হই, আর Calcutta Reviewতে আমি Sanskritised Bengaliর উপর এক প্রবন্ধ (Bengali, Spoken and Written) ১৮৭৭ সালে প্রকাশ করি।

"খ্যাতনামা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১২৮৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের বঙ্গদর্শনে আমার প্রবন্ধটীকে 'উৎকৃষ্ট' বলিয়া প্রশংসা করেন, আর Dr. (পরে Sir) George Grierson তাঁহার Linguistic Survey of India, part I, vol. V. p. 16এ আমার প্রবন্ধটীকে excellent বলেন।"

"আমি যে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছি তাহাদের সকলগুলিতে আমার নিজের চিন্তার ফল, নিজের ideas আছে। যে বিষয়ে আমার নিজের কিছুই ideas নাই সে বিষয়ে আমি কখনও লিখিতে ইচ্ছা করি নাই।" দ্র. 'আমার জীবনের কতকগুলি কথা', প্রবাসী, পৌষ ও মাঘ ১৩৩৪ ব.

রচনাবলী : *Calcutta Review* পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ— 'Bengali, Spoken and Written', CXXX 1877 ; 'A Universal Alphabet and the Transliteration of Indian Languages', April 1881 ; 'Hindi, Hindustani and the Behar Dialects', July 1882 ; 'The Language Question in the Punjab', Oct. 1882 ; 'The Behar Dialects—A Rejoinder', April 1883 (গ্রিয়ার্সনের 'In Self-Defence', Oct 1882— প্রবন্ধ সম্পর্কে লেখা) ; 'Transliteration *versus*

Phonetic Romanization', Oct. 1897 ; 'The Royal Titles and Imperial Federation', April 1903.

Modern Review পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ—'The Direct Method of Teaching Foreign Languages', Sept. 1908 ; 'The Partition of Bengal', Nov. 1911 (অক্টোবর ১৯১০-এ লেখা) ; 'Steps Towards Reduction of Armaments', Jan. 1914 ; 'More about Reduction of Armaments', July 1914 ; 'Some Ethical Aspects of the Present War and of its Probable End', Nov. 1914 ; 'The Teutonic, Latin and Slavonic Races of Popular Ethnology', Jan. 1915 ; 'The Rev. J. Knowles's Scheme for the Romanization of all Indian Writing', Feb. 1918 : 'The Undesirability of Devanagri Being Adopted as the Common Script for all India', April 1918 ; 'Hindi or Hindustani ?', June 1918 ; 'Bengali in Indo-Romanic Small Letters', Oct. 1918 ; 'Self-Determination as the Basis of a Just Peace', Feb. 1919 ; 'The International Phonetic Script', May 1919 ; 'Esperanto *versus* English Internationalized', Nov. 1919 ; 'Indian Nationality and Hindustani Speech', Feb. 1920 ; 'End of Fighting among Nations', Aug. 1921 ; 'Reform of Fighting in Courts of Law', Sept. 1921 ; 'Reform of Fighting in Courts of Law, no. 2', May 1923 ; 'Self-Determination and India's Future Political Status', Jan. 1923 ; 'Combined British and American Lead in Boycotting War', Aug. 1923 ; 'India's Two Great Gifts to the World', Dec. 1923 ; 'Phases of Religious Faith of a Bengali of Brahman Birth', Aug. 1924 ; 'Steps Towards a World Federation', Jan. 1925.

এবং 'My College Reminiscences', *Presidency College Magazine*, Centenary Number 1919.

প্রবন্ধ সংকলন— *Essays and Criticism*, Luzac & Co., 1927.

৩. সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৪-৮৯ খৃ.) ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট পদে স্থায়ী হতে না পারার এই বিবরণে অসংগতি আছে। সঞ্জীবচন্দ্র এই পদ পান সেপ্টেম্বর ১৮৬৪ খৃ., চাকরি যায় ৫ জুলাই ১৮৬৯। ডিস্ট্রিক্ট টাউন অ্যাক্ট হয় ১৮৬৮ খৃ., ১৮৮৪-তে নয়। ১৮৮৪ খৃ. তে এইচ. জে. রেনল্ডস্-এর উদ্যোগে আর একটি মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট পাস হয়েছিল। সঞ্জীবচন্দ্রের ডেপুটি চাকরির সময়-সীমা অনুসারে ১৮৬৮-র আইনটিই প্রাসঙ্গিক। তাঁর *Bengal Ryots : their rights and liabilities* (১৮৬৪ খৃ.) পড়ে লে. গবর্নর সিসিল বিডন তাঁকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদ 'উপহার' দেন। সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা-সংকলন 'সঞ্জীবনী-সুধা'র (১৮৯৩ খৃ.) ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "ডেপুটিগিরিতে দুইটি পরীক্ষা দিতে হয়। পরীক্ষা বিষয়ে তাঁহার যে অদৃষ্ট তাহা বলিয়াছি। কিন্তু এবার প্রথম পরীক্ষায় তিনি কোনরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। কর্ম্ম গেল। তাঁহার নিজ মুখে শুনিয়াছি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার মার্ক তাঁহার হইয়াছিল। কিন্তু বেঙ্গল অফিসের কোন কর্ম্মচারী ঠিক ভুল করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার অনিষ্ট করিয়াছিল। বড় সাহেবদিগকে এ কথা জানাইতে আমি পরামর্শ দিয়াছিলাম ; জানানও হইয়াছিল, কিন্তু কোন ফলোদয় হয় নাই।

"...সঞ্জীবচন্দ্র ডেপুটিগিরি আর পাইলেন না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তুল্য বেতনের আর একটি চাকরি দিলেন। বারাসতে তখন স্পেশিয়াল সবরেজিষ্ট্রার থাকিত। গবর্ণমেণ্ট সেই পদে সঞ্জীবচন্দ্রকে নিযুক্ত করিলেন।" অক্টোবর ১৮৬৯ খৃ. থেকে এপ্রিল ১৮৮১ খৃ. পর্যন্ত এই পদে তিনি কাজ করেন।

এ-বিষয়ে বিস্তারিত ত৷ ।র জন্য দ্র. গোপালচন্দ্র রায়, 'সঞ্জীবচন্দ্র ও কিছু অজ্ঞাত তথ্য', কলকাতা

৪. একটি দান-পত্রে বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্রকে বঙ্গদর্শনের স্বত্ব দেন। নৈহাটি 'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা'য় সংরক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে-লেখা দান-পত্রের অনুলিপি—

পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীচরণেষু
লিখিতং শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাং কাঠালপাড়া কস্য দানপত্র কার্য্যনাঞ্চাগে আমি বঙ্গদর্শন নামে যে সাময়িক পত্র প্রকাশ করিয়াছিলাম, অদ্য হইতে তাহাতে আমার যে কিছু স্বত্ব ও অধিকার, তাহা আপনাকে দান করিলাম। অদ্যকার তারিখের পূর্ব্বে উক্ত পত্রে মৎ-প্রণীত যে সকল

প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পুনঃপ্রকাশ বা পুনর্মুদ্রিত করিবার যে অধিকার তাহা পূর্ব্ববৎ আমার রহিল। তদ্ভিন্ন উক্ত পত্রের গ্রাহকদিগের কাছে বাং ১২৭৯ হইতে বাং ১২৮২ সাল পর্য্যন্ত কয় বৎসরের বাবত যে টাকা পাওনা আছে তাহাতেও আমার হক বজায় রহিল। ইহা ভিন্ন বঙ্গদর্শনে আমার আর কোন স্বত্বাধিকার রহিল না ; আপনি উহা প্রকাশ করিবেন বা করাইবেন ; এবং তাহার উপস্বত্ব ভোগ করিবেন ; উহা প্রকাশ করিতে বা উহার উপস্বত্ব ভোগ করিতে আমার কোন দাবিদাওয়া রহিল না ; এতদর্থে দানপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি তাং ১২ অগ্রহায়ণ বাং ১২৮৩

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সাং কাঠালপাড়া

৫. দিব্যেন্দুসুন্দর। বঙ্কিমচন্দ্রের বড়ো মেয়ে শরৎকুমারী দেবী ও রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড়ো ছেলে।

৬. বঙ্কিমচন্দ্রের এই ভক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ১২৮৫ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত তাঁর 'বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি' প্রবন্ধের ১৭, ২১, ২৪ ও ৩০ অনুচ্ছেদ থেকে চারটি অংশ এই লেখায় উদ্ধার করেছেন। পাঠ ঈষৎ পরিবর্তিত।

পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৮-১৯৩৮ খৃ.) শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজ ও গৌহাটি কটন কলেজের অধ্যাপক, কামরূপ অনুসন্ধান সমিতির প্রতিষ্ঠাতা (১৯১১ খৃ.)। সরদা আইনের প্রতিবাদে মহামহোপাধ্যায় উপাধি ত্যাগ করেন। রচিত ও সম্পাদিত বই— 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' (১৩১৭ ব.), 'প্রবন্ধাষ্টক' (১৩১৭ ব.), 'বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তিনিরাস' (১৩২১ ব.), 'হিন্দুবিবাহ সংস্কার' (১৩২১ ব.) 'কামরূপ-শাসনাবলী' (রংপুর ১৯৩১ খৃ.), *Translation of the Penal Code of the Last King of Cachar* (১৩১৭ ব.) প্রভৃতি।

৮. বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবী।

৯. রুশ প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ ইভান পাভ্‌লোভিচ মিনায়েফ Ivan Pavlovich Minayeff (১৮৪০-৯০ খৃ.) সেণ্ট পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। তিনবার ভারতে আসেন— ১৮৭৪-৭৫, ১৮৮০,

১৮৮৫-৮৬ খৃ.। এখানে শাস্ত্রীমশায় মিনায়েফের তৃতীয়বার ভারত ভ্রমণের সময়ের কথা বলেছেন। সুতরাং প্রথমবার তাঁকে দেখেছিলেন দশ-এগারো বছর আগে, ষোলো-সতেরো বছর নয়। মিনায়েফের ভারত-ভ্রমণের ডায়েরিতে প্রাসঙ্গিক উল্লেখ—

"4th March : Yesterday at 9 o'clock in the evening I went to the annual meeting of the Asiatic Society. The attendance at the meeting was poor. ...

"...The meeting welcomed me. After the meeting a Bengalee gentleman, one of the ex-pupils of Mahesh Chandra (Nàyaratna) who, I was told, was very ill, came to me. The kindness of the Bengalees towards me always surprised me. This kindness is extended to the Russians and not to me personally. Yesterday Haraprasad Shastri frankly declared that he was very glad to see a Russian with his own eyes. He, however, remembers me and my visits to the Sanskrit College ten years ago. ...

"7th March : ... Haridas Shastri [Haraprasad Shastri ?] had come to me in the morning. He took me to some literati. Met some ten of them and do not remember the name of any one. The substance of the discourse was of no account. We talked about Burma. As to annexation, the same opinion as I had heard before. Some one observed that the natives did not know anything about the state of affairs in Burma and they did not dare speak out the whole truth about whatever they know." I. P. Minayeff, *Travels in and Diaries of India and Burma*, Calcutta, pp. 190-93.

"সম্পাদকীয় ভূমিকার এক স্থলে (মূল সংস্করণ, পৃ. ১০-১১) বলা হইয়াছে যে, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহিত মিনায়েফের সাক্ষাৎ ঘটিয়া থাকিবে, এবং বঙ্কিমচন্দ্র নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়া তাঁহার রচনাবলীর একটী সেট মিনায়েফকে উপহার

দিয়াছিলেন, এবং বঙ্কিমচন্দ্রের নাম স্বাক্ষরিত সেই বইগুলি বর্ত্তমানে লেলিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত আছে।" হ-র ২, পৃ. ৫৮।

১০. পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বঙ্কিমচন্দ্রের ছোটো ভাই।
জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — সঞ্জীবচন্দ্রের ছেলে।
বিপিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — পূর্ণচন্দ্রের বড়ো ছেলে।

১১. মাসিক বসুমতী সম্পাদকের টীকা—
"প্রধানতঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের উদ্যোগে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। বড় লাট লর্ড ল্যান্সডাউন ও ছোট লাট স্যার চার্লস ইলিয়ট এ বিষয়ে তাঁহার সহায় ছিলেন। প্রথমে সভার তিনটি বিভাগ ছিল— (১) নীতি বিষয়ক, (২) সাহিত্য বিষয়ক, (৩) ব্যায়াম বিষয়ক। প্রতাপবাবু প্রথম, বঙ্কিমবাবু দ্বিতীয় ও কলিকাতা কর্পোরেশনের চেয়ার-ম্যান মিস্টার হ্যারি লী তৃতীয় বিভাগের সভাপতি ছিলেন। আমরা প্রতি রবিবারে বঙ্কিমবাবুর বাড়ীতে যাইয়া সাহিত্য-বিভাগের সভাপতির উপদেশ লইতাম। সোসাইটীতে তিনি বেদ সম্বন্ধে ২টি বক্তৃতা করিয়া-ছিলেন। তাহার পরই তাঁহার মৃত্যু হয়।"

'Vedic Literature' নামে বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি বক্তৃতা *The Calcutta University Magazine* Vol. I, 1894-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

১২. 'গুরুদাস-স্মৃতি' প্রবন্ধের ২ সংখ্যক সূত্র দ্র.।

১৩. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Mintues of the Faculty of Arts For the year 1891-92'-র ১১ জুলাই ১৮৯১ তারিখের বিবরণে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মূল প্রস্তাব উদ্ধৃত আছে এবং উল্লেখ আছে, "Babu Bankimchandra Chatterjee, Babu Chandra-nath Basu and Babu Mahendranath Ray spoke in favour of the motion."

"The Rev. Dr. Macdonald, Mr. A. M. Bose, and Babu Haraprasad Sastri supported the motion." আশুতোষের প্রস্তাব ১৭/১১ ভোটে অগ্রাহ্য হয়ে যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তৃতা এই বিবরণে লিপিবদ্ধ নেই।

১৪. মাসিক বসুমতী সম্পাদকের টীকা—

"বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি-সভায় তাঁহার বন্ধু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয় যে পত্র প্রচার করেন, তাহাতেই লিখিত ছিল— বঙ্কিমচন্দ্রের ইচ্ছা, তাঁহার মৃত্যুর পর ১২ বৎসর গত না হইলে যেন তাঁহার জীবন-চরিত লিখিত না হয়।"

২. অনুষঙ্গ

১৮৯২ এবং ১৮৯৩ খৃ.র *Report On The Bengal Library* তে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' এবং 'রাজসিংহ' সম্পর্কে শাস্ত্রীমশায়ের মন্তব্য আছে।

The Calcutta University Magazine, 1 May 1894 সংখ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় 'The Late Bankim Chandra Chatterji' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন।

এই তিনটি রচনা পরিশিষ্টে ছাপা হল।
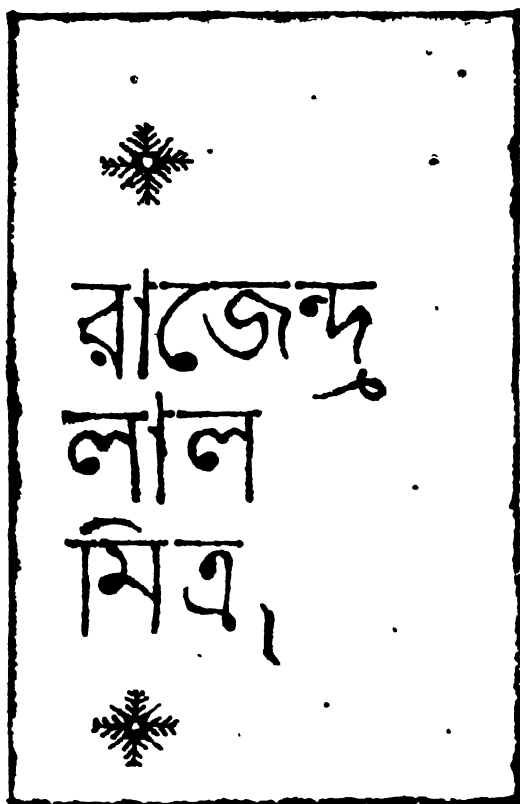
১৮৭৭ সালে সংস্কৃত কলেজ হইতে আমি এম. এ. পাস করি। মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন [১২৪২-১৩১২ ব.] তখন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহিত তাঁহার খুব সদ্ভাব ছিল। ন্যায়রত্ন মহাশয় একদিন প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার নিকট আমার উল্লেখ করেন। রাজেন্দ্রলাল আমাকে দেখিতে চান। পণ্ডিতমহাশয় এক দিবস আসিয়া আমাকে বলিলেন, "হরপ্রসাদ, রাজেন্দ্রলাল তোমাকে দেখিতে চাহেন, একদিন তাঁহার বাসায় গিয়া সাক্ষাৎ করো।"

রাজেন্দ্রলাল তখন মানিকতলায় ৮নং বাটীতে থাকিতেন। এই বাটীর একপার্শ্বে তখন ওয়ার্ড ইন্‌স্টিটিউশন ছিল, আর-এক পার্শ্বে তিনি

পুত্রগণকে লইয়া থাকিতেন। আমার বাসা সে সময় আমহার্স্ট স্ট্রিটে ছিল। একদিন রাজেন্দ্রলালের সহিত দেখা করিতে গেলাম। উমেশচন্দ্র বটব্যালের [১৮৫২-৯৮ খৃ.] নাম তোমরা সকলেই শুনিয়াছ। তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময় উমেশচন্দ্র রাজেন্দ্রলালের নিকট যাতায়াত করিতেন। মিত্রমহাশয় আমাকে ও উমেশকে একটা কাজের ভার দিলেন।

এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে রাজেন্দ্রলালের সম্পাদকতায় উপনিষদ বাহির হইবার কথা চলিতেছিল। তিনি উহার কিয়দংশের ইংরাজি অনুবাদের ভার আমাদের উপর দিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "উপনিষদের কোন্ অংশের অনুবাদ করিতে হইবে ?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "Make your own choice." ইহার কিছু দিন পরে আমি ও বটব্যাল অনুবাদ লইয়া মিত্রমহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলাম। উপনিষদের যে অংশ আমি অনুবাদ করিয়াছিলাম সে অংশের প্রত্যেক শব্দের টীকা ফুটনোটে দিয়াছিলাম এবং কে কোন্ অর্থে উহা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও উল্লেখ করিতে ভুলি নাই। রাজেন্দ্রলাল আমার অনুবাদ পড়িয়া বলিলেন, "তোমার কিছুই হয় নাই। কী প্রকারে অনুবাদ করিতে হয় তাহা তুমি জানো না। তোমার দ্বারা এ কাজ হইবে না। দেখ তো উমেশ কেমন সুন্দর অনুবাদ করিয়াছে।"

বটব্যালের লেখা তিনি খুব পছন্দ করিলেন এবং উহার প্রশংসাও করিলেন। ইহার পর কিছু কাল রাজেন্দ্রলালের সহিত আর সাক্ষাৎ করি নাই। একদিন ন্যায়রত্ন মহাশয়কে দিয়া তিনি আবার আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। উমেশচন্দ্র Statutory Civilian হইয়া কলিকাতা হইতে চলিয়া যান। রাজেন্দ্রলালের কাজ করিবার জন্য একজন লোকের আবশ্যক হয়, তাই আমাকে আবার ডাকিয়াছিলেন। আমি তাঁহার সহিত দেখা করিলাম। তিনি বলিলেন, "I have been rather too hard upon you. তুমি যে সবে কলেজ হইতে বাহির হইয়াছ তাহা আমার স্মরণ ছিল না। উপনিষদের অনুবাদ করা অতি দুরূহ, তাহার ভার তোমার উপর দিয়া বড়ো অন্যায় করিয়াছি। যাহা হউক, এইবার তোমাকে একটা সহজ কাজের ভার দিতেছি।"

নেপাল হইতে যে বৌদ্ধ সংস্কৃত পুথিগুলি সোসাইটিতে আসিয়া স্তূপাকার হইয়াছিল মিত্রমহাশয় তাহার একটা ক্যাটালগ প্রস্তুত করিতে ছিলেন। তাঁহার নিযুক্ত পণ্ডিতেরা পুথিগুলির summary করিয়া দিত, সেই সকল summary ইংরাজিতে অনুবাদ করিবার ভার পড়িল আমার উপর। আমি কিছু দিন কাজ করিয়া লক্ষ্ণৌ কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক হইয়া যাই। আমার শরীর তখন তেমন ভালো ছিল না, তাই যাইবার সময় রাজেন্দ্রলাল আমাকে বলিয়াছিলেন, "Try to increase the span of your existence." লক্ষ্ণৌ কলেজে আমি বেশি দিন থাকি নাই। ১৮৭৮ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৮৭৯ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত তথায় অধ্যাপনা করি, পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসি। লক্ষ্ণৌ শহরে থাকিবার সময় আমার সহিত রাজেন্দ্রলালের পত্রবিনিময় চলিত। আমাকে তিনি কত স্নেহ করিতেন তাহা তাঁহার পত্রে বুঝিতে পারিতাম। প্রায়ই তিনি আমাকে কলিকাতায় আসিতে উপদেশ দিতেন। আমার সহিত দেখা করিবার জন্য তিনি কত উৎসুক ছিলেন! তাঁহার ক্যাটালগের প্রুফগুলি আমার কাছে যাইত, আমি উহা সংশোধন করিয়া ফেরত পাঠাইতাম। রাজেন্দ্রলাল আমাকে যে-সকল পত্র লিখেন তাহা আর এখন নাই, অধিকাংশই হারাইয়া গিয়াছে, নৈহাটির বাটীতে সন্ধান করিলে এখনো বোধ হয় দুই-একখানি মিলিতে পারে।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় রাজেন্দ্রলালের কাজ আরম্ভ করি। ১৮৮২ খৃস্টাব্দে তাঁহার Nepalese Buddhist Literature [*The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal*, 1882] নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। উহার ভূমিকায় তিনি আমার নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি যে আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিবেন তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। একদিন তিনি ইচ্ছা করিয়া ভূমিকার ঠিক ঐ অংশেরই প্রুফ আমাকে দেখিতে দিলেন। সেই জায়গাটা তোমাকে দেখাইতেছি।

এরূপ প্রশংসা কখনো আশা করি নাই। বাস্তবিক সেদিন আমার যে আনন্দ হইয়াছিল আজ চৌত্রিশ বৎসর পরে তাহার স্মৃতি আমার মনে আসিতেছে। লক্ষ্ণৌয়ে থাকিবার সময় আমি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম। এই সময় রাজেন্দ্রলাল এক পত্রে

আমাকে লিখেন, "I wish you every success in your venture" —কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি কৃতকার্য হইতে পারি নাই। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার পর তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা আরো প্রগাঢ় হইয়াছিল। মিত্রমহাশয়ের ক্যাটলগ তখন বাহির হইয়া গিয়াছে। একদিন তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "হরপ্রসাদ, আমার পুস্তকের জন্য তুমি বিস্তর খাটিয়াছ, তোমাকে কিছু পারিশ্রমিক দিতে চাই।" এই বলিয়া আমার হাতে একখানা ১৪৫ টাকার চেক দিলেন ; এই অযাচিত দান আমি মাথা প্যাতিয়া লইয়াছিলাম।

তাঁহার দৈনিক জীবন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা তোমাকে বলিতেছি। তিনি খুব ভোরে উঠিতেন। তাঁহার একখানা গাড়ি ছিল ; তাহাতে করিয়া হেদোর ধারে আসিতেন। সেখানে কৃষ্ণদাস পাল [১৮৩৮-৮৪ খৃ.], মহেশ ন্যায়রত্ন প্রভৃতি অনেকে আসিয়া জুটিতেন। তখন একটা বেশ দল হইত। নানারূপ গল্প করিতে করিতে কর্নওয়ালিস স্ট্রিট ধরিয়া শ্যামবাজারের দিকে হাঁটিয়া যাইতেন, গাড়ি পিছন পিছন চলিত। বেড়ানো সারা হইলে রাজেন্দ্রলাল গাড়িতে উঠিয়া বাসায় ফিরিতেন। তাঁহার বাটীর উপর তলায় একটা বড়ো হল ছিল, তাহার পূর্ব পার্শ্বের একটি ঘরে তিনি অধ্যয়ন করিতেন। ঠিক যখন আটটা বাজিত, তখন আমরা আসিয়া জুটিতাম। আমি সব দিন যাইতাম না, যেদিন প্রুফ দেখার দরকার হইত সেইদিন যাইতাম। প্রুফ দেখা শেষ হইলে বেলা সাড়ে নয়টায় রাজেন্দ্রলাল স্নানে যাইতেন। স্নান আহার সারিয়া ১২টা পর্যন্ত বিশ্রাম করিতেন। তাহার পর পড়িতে বসিতেন। নূতন পুস্তক তিনি এক অভিনব প্রণালীতে পড়িতেন। পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠা পড়িলেন, যদি কিছু নোট করিবার থাকিত নোট করিলেন, নীল পেন্সিল দিয়া আবশ্যক অংশ চিহ্নিত করিলেন, তাহার পর পরবর্তী চারি পৃষ্ঠা একেবারে ছাড়িয়া দিলেন। পঞ্চম পৃষ্ঠা পড়া হইলে আবার দশম পৃষ্ঠা পড়িতে আরম্ভ করিতেন। এইরূপ চারি পাতা অন্তর একটি পাতা পড়া তাঁহার অভ্যাস ছিল। একদিন কৌতূহলী হইয়া আমি ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। রাজেন্দ্রলাল তদুত্তরে বলিলেন, "গ্রন্থের প্রথম পাতাতেই যদি কোনো মৌলিকতার আভাস পাই, তাহার পরবর্তী পৃষ্ঠা পাঠ করি, তাহা না পাইলে চারিটি পাতা বাদ দিয়া পঞ্চম পাতায়

কী আছে দেখি ; তাহাতেও যদি লেখকের কোনো বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় না পাই বহিখানি বন্ধ করি।"

এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে মিত্রমহাশয়ের সম্পাদিত পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র ও উহার ইংরাজি অনুবাদ বাহির হয়। ইহার কিছুদিন পরেই (১৮৮২ সালে) কাওয়েল এবং গাফ্ মাধবাচার্যের 'সর্বদর্শন সংগ্রহের' ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করেন[১]। একদিন রাজেন্দ্রলালের পড়িবার ঘরে ঢুকিয়া দেখি তাঁহার দুই ভলিউম যোগশাস্ত্র এবং সর্বদর্শন সংগ্রহের নব-প্রকাশিত ইংরাজি অনুবাদ গ্রন্থ সাজানো রহিয়াছে। নানা কথাবার্তার পর যখন আমি উঠিয়া আসিতেছি রাজেন্দ্রলাল বলিলেন, "এই কয়খানি পুস্তক লইয়া যাও, পড়িয়া দেখিও।" কয়েক দিবস পরে তাঁহার বাসায় উপস্থিত হইলে রাজেন্দ্রলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরপ্রসাদ, বহিগুলি পড়িয়াছ ?" আমি বলিলাম— হাঁ পড়িয়াছি। রাজেন্দ্রলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কোন্ অনুবাদ ভালো লাগিল ?" আমি বলিলাম— কাওয়েল ও গাফের কৃত অনুবাদ মূলানুগত, কিন্তু উহা বুঝিতে হইলে মনে মনে উহার সংস্কৃত তর্জমা করিয়া লইতে হয়। আপনার অনুবাদ সব জায়গায় ঠিক literal না হইলেও we are carried away by your English. তিনি সম্মতির সুরে বলিলেন, "exactly so, আমিও তাহাই মনে করি।"

রাজেন্দ্রলালের সমালোচকের দৃষ্টি খুব ছিল। লেখার ভালোমন্দ বুঝিতে বা বিচার করিতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার একটা বড়ো মারাত্মক দোষ ছিল। কেহ যদি তাঁহার নিজের লেখার কোনো ভুল দেখাইত, তিনি ক্রোধে আত্মহারা হইতেন। কিন্তু আমিও ছিলাম নাছোড়বান্দা, তাঁহার রাগ বড়ো একটা গ্রাহ্য করিতাম না। হয়তো পুঁথিতে এক কথা আছে, ভুলিয়া তিনি আর-এক লিখিয়া বসিয়াছেন এবং প্রুফ দেখিবার সময় আমি তাহা ধরিয়াছি। রাজেন্দ্রলাল তো একেবারে চটিয়া আগুন। আমি আস্তে আস্তে বলিলাম— রাগিলে তো হইবে না, পুঁথিতে যাহা নাই তাহা লিখিয়াছেন।

এই বলিয়া পুঁথির পাতা খুলিয়া যখন তাঁহাকে দেখাইয়া দিলাম, তখন তিনি মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে বসিয়া গেলেন। খানিক পরে, গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "এখন উপায় ?" আমি তখন তাঁহাকে সংশোধন

করিয়া লিখিতে বলিতাম। তখন তাঁহার রাগ জল হইয়া যাইত, সন্তোষের চিহ্ন দেখা দিত। লেখার দোষ বাহির করিতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন, তাঁহার মতো সুন্দর ইংরাজি লিখিতে আর-কাহাকেও দেখি নাই। আমি হয়তো একটা ইংরাজি লেখা তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতেছি; উহার যে অংশে দোষ তাহাও বেশ বুঝিতে পারিতেছি; কিন্তু কী হইলে যে ঠিক হয় স্থির করিতে পারিতেছি না। রাজেন্দ্রলাল ঠিক ধরিয়া ফেলিলেন এবং কাটিয়া কুটিয়া ভাষা এমন বদলাইয়া দিলেন যে, আমার আনন্দের আর সীমা থাকিল না।

ইংরাজি রচনায় তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। আমার বেশ মনে আছে, বাবু কৃষ্ণদাস পালের মৃত্যু হইলে যখন রাজকুমার সর্বাধিকারী [১৮৩৯-১৯১১ খৃ.] হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক হইলেন, কোনো কোনো দিন দেখিতাম, রাজেন্দ্রলাল বক্তৃতার মত অনর্গল ইংরাজি বলিয়া যাইতেছেন রাজকুমারবাবু লিখিয়া লইতেছেন এবং তাহাই হিন্দু পেট্রিয়টে পরে ছাপা হইয়া যাইতেছে। সে সময় রাজেন্দ্রলালই উহার প্রকৃত সম্পাদক ছিলেন। এই কাগজে তিনি বিস্তর প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক অধিকাংশ মতামতই এখন নূতন নূতন গবেষণার ফলে অসার বলিয়া প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার রচনা-প্রতিভা এখনো দেশের লোকের আদর্শ হইয়া আছে।

২

১৮৭৫ খৃস্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় সম্মানসূচক এল. এল. ডি. উপাধি প্রাপ্ত হন। কলিকাতা ইউনিভার্সিটি তাঁহাকে এই উপাধি দান করেন। ইহার পূর্বে কোনো বাঙালি এই সম্মান পান নাই। উপাধি প্রাপ্তির খবর পাইয়াই রাজেন্দ্রলাল ভাবিলেন, শুভ সংবাদটা গৃহিণীকে একবার দিয়া আসি; শুনিয়া নিশ্চয়ই তাঁহার খুব আহ্লাদ হইবে।— সটান গৃহিণীর সকাশে গমন। ভুবনমোহিনী তখন সাংসারিক কাজকর্মে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি পূর্বেই স্বামীর উপাধি প্রাপ্তির সংবাদ শুনিয়াছিলেন। স্বামীকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি নাকি কী একটা 'পায়া' পাইয়াছ?" রাজেন্দ্রলাল বলিলেন, "হাঁ, ইউনিভার্সিটি আমাকে এল. এল. ডি.

পদবি দিয়াছেন। ইহা একটা খুব বড়ো সম্মান। কোনো বাঙালির ভাগ্যে পূর্বে এ পদবি ঘটে নাই। ভুবনমোহিনী এল. এল. ডি.'র অর্থ ঠিক বুঝিলেন না। খানিক স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া বলিলেন, "পদবি-টদবি বুঝি না, উহাতে কত টাকা পাওয়া যাইবে তাই শুনি।" রাজেন্দ্রলাল বলিলেন, "টাকা তো পাওয়া যাইবে না, উপরি এখন ৩০০ টাকা দিয়া গাউন তৈয়ারি করাইতে হইবে।" রাজেন্দ্রলালের পত্নী সেকালের ইংরাজি ভাববর্জিতা সরলা নারী। সম্মান অর্জন করিতে হইলে কিঞ্চিৎ রজতখণ্ডেরও বিসর্জন দিতে হয় তাহা তাঁহার সরল বুদ্ধিতে আসিল না। বিস্মিত হইয়া স্বামীকে বলিলেন, "টাকা পাওয়া যাবে না? তবে অমনধারা 'পায়ায়' কাজ নেই, ছেড়ে দাও।"

রাজেন্দ্রলাল পত্নীর কথায় ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া অন্তঃপুর হইতে ধীরপদে প্রস্থান করিলেন। এ গল্প আমরা পরে, সম্ভবত ১৮৮০ খৃস্টাব্দে রাজেন্দ্রলালের নিজের মুখে শুনিয়াছিলাম।

কৃষ্ণদাস পাল ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র একসঙ্গে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের কাজ করিতেন। কিন্তু কোনো কোনো বিষয়ে উভয়ের মতে মিল হইত না। পালমহাশয় হিন্দু পেট্রিয়ট চালাইতেন। যখন পেট্রিয়টে রাজেন্দ্রলালের দ্বারা ঐ সকল বিষয়ে কোনো প্রস্তাব লেখার দরকার হইত, কৃষ্ণদাস তাঁহার বাসায় গিয়া ধরিয়া বসিতেন। অগত্যা মিত্রমহাশয়ের কথামতো তিনি লিখিয়া লইয়া যাইতেন। এই-সকল লেখায় অবশ্য রাজেন্দ্রলালের নিজের মতই ব্যক্ত থাকিত। কিন্তু ছাপিতে দেওয়ার সময় কৃষ্ণদাস ঐ সকল প্রবন্ধের স্থানে স্থানে, ঠিক নিজের মতের সমর্থক হয় এমনি ভাবে ঈষৎ বদলাইয়া পেট্রিয়টে বাহির করিতেন। এই রকম মজা প্রায়ই হইত। বলা বাহুল্য, রাজেন্দ্রলাল ভারি চটিয়া যাইতেন এবং কৃষ্ণদাসকে ডাকিয়া আচ্ছা করিয়া ধমকাইয়া দিতেন! অবশ্য তাঁহার রাগ কিছু স্থায়ী হইত না। কৃষ্ণদাসকে না হইলে তাঁহার চলিত না, রাজেন্দ্রলাল ভিন্ন কৃষ্ণদাসেরও অন্যগতি ছিল না।

কৃষ্ণদাসকে লইয়া রাজেন্দ্রলাল কৌতুক করিতে ভালোবাসিতেন। তাঁহার চাপকানের সমালোচনাই কতদিন যে হইয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। যাঁহারা রাজেন্দ্রলালকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন, বেশের পারিপাট্য তাঁহার খুব ছিল। তিনি অধিক দাম দিয়া চাপকান

পিরান প্রভৃতি বেশ পছন্দসাহি করিয়া প্রস্তুত করাইতেন। তিনি যে ঠিক বিলাসী ছিলেন তাহা নহে, তবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন এবং নিজে পরিষ্কৃত থাকিতে অপরকে পরিষ্কৃত দেখিতে ভালোবাসিতেন। বাবু কৃষ্ণদাস পালের বেশের পারিপাট্যের প্রতি একেবারেই লক্ষ্য ছিল না। বোধ হয় তাহা লক্ষ্য করিবার অবসরও তাঁহার অল্পই ছিল। সর্বদা কাজ লইয়াই তিনি ব্যস্ত থাকিতেন। রাজেন্দ্রলাল প্রায়ই আঙুল দিয়া কৃষ্ণদাসকে দেখাইয়া বলিতেন, "এ'র এই যে চাপকানটি দেখছেন, এটি মান্ধাতার আমলের। লাটসাহেবের কৌন্সিল হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বত্রই ইঁহার অবাধ গতি। কাপড়-চোপড়ের উপর বাজে ব্যয় করা ইঁহার মোটেই অভ্যাস নেই।"—এরূপ পরিহাস কৌতুক রাজেন্দ্রলালের বৈঠকখানায় প্রায়ই চলিত।

একবার রাজেন্দ্রলাল আমার উপর ভয়ানক চটিয়া গিয়াছিলেন। সেই ঘটনার কথা বলিতেছি। ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে রমেশচন্দ্র দত্ত [১৮৪৮-১৯০৯ খৃ.] মহাশয় ঋগ্বেদের Translation [ঋগ্বেদ সংহিতা, ১৮৮৫-৮৭ খৃ.] বাহির করিবার উদ্যোগ করেন। আমি তাহার কিয়দংশ লিখিয়া দিব, রমেশবাবু বাংলা দেখিয়া দিবেন এবং ছাপাইবার সমস্ত খরচ-খরচা দিবেন এইরূপ বন্দোবস্তে কাজ আরম্ভ হয়। পুস্তক বাহির হইবার পূর্বেই শশধর তর্কচূড়ামণি [১৮৫১-১৯২৮ খৃ.] 'বঙ্গবাসী'তে লিখিলেন —রমেশবাবু ইংরাজি হইতে বেদ ব্যাখ্যা করিতেছেন, যে ব্যাখ্যা একেবারেই অগ্রাহ্য। বেদের প্রত্যেক ঋকে গূঢ়ভাবে তিন প্রকার অর্থ আছে, নির্গুণ ব্রহ্মপক্ষে, সগুণ ব্রহ্মপক্ষে এবং সূর্যদেব পক্ষে।— এইরূপ মত প্রকাশ করায় আমিও বঙ্গবাসীতে লিখিতে শুরু করি। উভয়পক্ষের যুক্তিতর্ক এবং শাস্ত্রালোচনার সঙ্গে সঙ্গে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ কটূক্তিও বেশ চলিতেছিল। শেষ বঙ্গবাসী আমার লেখা আর লইলেন না। আমি 'ভারতবাসী'তে গেলাম। পূজার ভারতবাসীতে চূড়ামণি-ব্যাকরণ নামে আমার লম্বা এক প্রবন্ধ বাহির হইল। ছাপার দোষে, চূড়ামণি-ব্যাকরণ 'চড়ামণি-ব্যাকরণ হইয়া গিয়াছিল। তাহাতে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আমার অদৃষ্টে তাহার জন্য বড়োই দুর্গতি হইয়াছিল।

পূজার পর আমি রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং ডান হাত লম্বা

করিয়া একটু উচ্চৈঃস্বরে আমাকে বাহিরে যাইতে বলিলেন। আমি একটু থমকাইয়া গেলাম। ব্যাপারখানা কী জানিবার জন্য আমি ঘুরিয়া তাঁহার বাম কর্ণের কাছে উপস্থিত হইলাম। দক্ষিণ অপেক্ষা বাম কর্ণে তিনি একটু বেশি শুনিতে পাইতেন। কানের গোড়ায় মুখ লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম— আজ এ কী ? এ মূর্তি কেন ?

রাজেন্দ্রলাল বলিলেন, "মূর্তি হবে না ! তুমি— তুমি লেখাপড়া শিখেছ, ভদ্র সমাজে বেড়াও, তুমি···কিনা মেছোনিদের মতন মেছোবাজারে চৌমাথায় দাঁড়িয়ে লোকের সঙ্গে গালিগালাজ করছ ! ভদ্রলোকের সমাজে তোমার বসা উচিত নয়।" আমি বলিলাম— চূড়ামণি যে বড়ো অন্যায় করছে। কতকগুলি ভুল প্রচার করছে। তিনি আরো রাগিয়া বলিলেন, "ভুল প্রচার করছে, তাতে তোমার কী ? তোমার এক ছত্র লেখায় উহার এক শো পুড়ে ছাই হয়ে যাবে তা জান ? তুমি কিনা তার সঙ্গে সমান উত্তর করতে যাচ্ছ ! আমার বাড়িতে তোমার জায়গা হবে না।" আমি সভয়ে বলিলাম— এই তো, আর-তো কিছু না। আচ্ছা এমন কর্ম আমি আর করব না। তখন তিনি ঠাণ্ডা হইয়া আমাকে বসিতে বলিলেন। রাজেন্দ্রলাল আমাকে এই ঘটনায় যে শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহা আমি জীবনে ভুলিব না। সেই অবধি খবরের কাগজে আমাকে যতই গালি দিক-না আমি তাহার কখনোই জবাব দিই না। তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া যাইতেছি, উদ্দেশ্য আমার ঠিক আছে। ভুল ভ্রান্তি মানুষের হইয়া থাকে, যিনি উহা ভদ্রভাবে দেখাইয়া দেন আমি তাঁহার গোলাম হইয়া যাই। গালাগালি দিলে জবাব দিই না। আমি যে নিজেই এই কার্য করি তাহা নহে, আমার ছাত্রবর্গকেও এ কথাটি আমি বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিই।

একবার গরমের ছুটিতে ওয়ার্ডের ছেলেগুলিকে বাড়ি পাঠাইয়া রাজেন্দ্রলাল কলিকাতার নিকটে কাশীপুরের গঙ্গার ধারে, মতিঝিলের পশ্চিমে, মতিশীলেদের [মতিলাল শীল, ১৭৯২-১৮৫৪ খৃ.] যে অনেকগুলি বড়ো বড়ো কুঠি ছিল তাহার একটিতে বাস করিতে লাগিলেন। আমায় বলিলেন, "তোমার তো অনেক দূর হইবে, তুমি যাইবে কিরূপে ?" আমি বলিলাম— দূর হইবে না। কাশীপুরে আমার এক মামী থাকেন, আমি তাঁহার কাছে কাশীপুরেই থাকিব। এইবার

রাজেন্দ্রলালের নিকট সমস্ত দিন থাকিবার সুযোগ হইল। প্রায় সমস্ত দিনই তাঁহার কাছে থাকিতাম। তিনি সে সময় বোধ-গয়ার উপর তাঁহার বহি লিখিতেছিলেন। তাঁহার কাছে খুব চটালো চটালো প্রুফ আসিত। তিনি সেইগুলি নিজে দেখিতেন এবং আমাকেও দেখিতে বলিতেন। আমি তাঁহার কথামতো দেখিয়া দিতাম। বৌদ্ধদের গ্রন্থে গল্প আছে, এক স্ত্রীলোক শ্রাবস্তীতে আসিয়া বুদ্ধদেবের চরিত্রে কলঙ্ক অর্পণ করিয়া দিল। একদিন সেই লেখার প্রুফ রাজেন্দ্রলাল দেখিতে-ছিলেন। আমি তাঁহার নিকটে বসিয়াছিলাম। হাসিয়া বলিলেন, "তা হলে শাক্য সিংহেরও ও-সব দোষ ছিল। কেননা, যা রটে তা বটে।" আমি একটু হাসিয়া বলিলাম— শুধু যে কলঙ্ক ছিল তা নয়, বোধ হয় একটু দোষও ছিল।

তিনি কৌতূহলের সহিত বলিলেন, "সে কী রকম?" আমি বলিলাম, 'অবদান কল্পলতা'র প্রথম গল্পে এ কথা আছে। আমি যাহাকে তখন প্রথম গল্প বলিয়াছিলাম, সেটা বাস্তবিক 'অবদান কল্পলতা'র ৫১ গল্প। এশিয়াটিক সোসাইটিতে যে পুঁথি আছে, তাহাতে ঐ ৫১ গল্পেই বহি আরম্ভ হইয়াছে। রায়বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস [১৮৪৯-১৯১৭ খৃ.] তিব্বত হইতে পুরা অবদান কল্পলতার পুঁথি আনিলে উক্ত গল্প যে বহির ৫১ গল্প তাহা প্রকাশ হয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই দ্বিতীয় অংশেরই Notice করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের একবার একটা মূত্রকৃচ্ছ্র হইয়াছিল। তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে বুঝাইয়াছিলেন, যে পূর্বজন্মে তিনি একজন কবিরাজ ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল— তিক্তমুখ। শ্রীমান নামে এক ধনবানের পুত্রকে তিনি অনেকবার কঠিন পীড়া হইতে আরাম করেন। কিন্তু সে লোকটা বড়ো দুষ্ট ছিল। পুত্রের পীড়া সারিয়া গেলে (ঠিক এখনকার লোকেরই মতো) সে তাঁহাকে দর্শনী বা ঔষধের দাম বলিয়া কিছুই দেয় নাই। তাই ফের যখন তার পুত্রের অসুখ হইল, বুদ্ধদেব ঔষধের পরিবর্তে বিষ দিয়া তাহার প্রাণ সংহার করিলেন। সেই পাপেই তাঁহার একটা খারাপ ব্যারাম হয়।

রাজেন্দ্রলাল বলিলেন, "বুদ্ধদেবের রোগটা যত ঠিক, রোগের explanation-টা তত ঠিক নয়।"

আমি বলিলাম— শ্রাবস্তীতে সুন্দরী তাঁহার চরিত্রে যে কলঙ্ক অর্পণ করিয়াছিল, শিষ্যদিগের নিকট বুদ্ধদেব তাহারো কারণ দেখাইলেন— পূর্বজন্মে কী কী অপরাধ করিয়াছিলেন যে কারণে সুন্দরী তাঁহার বিরুদ্ধে কলঙ্ক আনিয়াছে।

বুদ্ধদেব বলিলেন-- পূর্বজন্মে আমি বৈশ্য ছিলাম, আমার নাম ছিল মৃণাল। আমি ভদ্রা নামে এক বারবিলাসিনীকে রাখি। শর্ত ছিল, সে আর-কাহাকে তাহার কাছে আসিতে দিবে না। কিন্তু একদিন অন্য এক পুরুষকে তাহার নিকটে দেখিয়া রাগিয়া সেই রমণীকে হত্যা করি। তাই এ জন্মে সুন্দরী আমার নামে কলঙ্ক রটাইতেছে।

এই সকল কথা শুনিয়া রাজেন্দ্রলাল খুব হাসিলেন। তখন তাঁহার কাছে কলিকাতার দুই-তিন জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও বসিয়া ছিলেন। তাঁহারও বুদ্ধদেবের এই অদ্ভুত গল্প শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। দিনটা নানা রকম গল্প গুজবে ও হাসিখুশিতে বেশ কাটিয়া গেল।

৩ সেকালের ১নং ওয়ার্ডে রাজেন্দ্রলাল অনেকবার কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মিউনিসিপালিটি ইউনিভার্সিটি এবং অন্যান্য সভায় শুধু যে তিনি বক্তৃতাই করিতেন, তাহা নয়, কাজও যথেষ্ট করিতেন। আবার অনেক সময় পেন্সিলে লিখিয়া কাগজের টুকরা মেম্বরদিগের নিকট পাঠাইতেন। তাহাতে অনেক ফুক্কুড়ি থাকিত। মেম্বররা যে সব সময়ে তাহা বুঝিতেন, তাহা নয়, অনেক সময় বুঝিতে পারিতেন এবং হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিতেন। এমন রসিকতা করার অভ্যাস তাঁহার খুব ছিল। বাহির হইতে তাঁহাকে গম্ভীর দেখা যাইত, তাঁহার যে-সকল ছবি বাহির হইয়াছে তাহাতেও এই ভাবটিই ফুটিয়াছে, কিন্তু তিনি যে কিরূপ রসিক ছিলেন, যাঁহারা তাঁহার সহিত মিশিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। কমিটিতে হারিলে রাজেন্দ্রলাল রাগ করিতেন না, রাগের কোনো লক্ষণও দেখাইতেন না, বরং অনেক সময় রসিকতা করিয়া দেখাইতেন যে, হারিয়াও তিনি হারেন নাই। একবার ১নং ওয়ার্ডের কমিশনার পদের প্রার্থী হইয়া পশুপতি বসু ও রাজেন্দ্রলাল দাঁড়ান। রাজেন্দ্রলাল

যাহাতে না হন, তাহার জন্য বসুজ মহাশয় কোনো যত্নের ত্রুটি করেন নাই। অনেক উকিলের চিঠি ঝাড়িয়াছিলেন, ব্যারিস্টারকেও অনেক পয়সা দিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলালও ছাড়েন নাই, তবে পশুপতি বাবুর যোগাড়টা ছিল কিছু বেশি, কাজে-কাজেই রাজেন্দ্র হারিয়া গেলেন। এ সম্বন্ধে তিনি পরে একদিন বলিয়াছিলেন, "কমিশনার হওয়ায় আমার কোনো স্বার্থ নাই। আমি শুধু কলিকাতাবাসীর জন্য দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহারা যদি আমাকে না চায়, আমি আর দাঁড়াইব না। তাহাদের জন্য আমি যে সময়টা নষ্ট করিতাম, তাহা নানারূপ Good Work-এ ব্যয় করিব। আমার সংস্কৃত পুথির 'নোটিশ' প্রস্তুত করায়, ইতিহাস পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বহি লেখায় একটা স্থায়ী ফল থাকিবে, কিন্তু মিউনিসিপালিটির কাজে কী ফল?"

ইউনিভার্সিটিতে Croft [Sir Alfred Woodley Croft, ১৮৪১-১৯২৫ খৃ] সাহেবের সঙ্গে রাজেন্দ্রলালের খুব ঠোকাঠুকি হইত। বিপক্ষ দলের ভোট যখন বেশি থাকিত, তখন তিনি অবশ্য হারিয়া যাইতেন। কিন্তু হারিয়াও বেশ শান্ত ও ধীর ভাবে চলিয়া আসিতেন। সময় সময় বিরুদ্ধবাদীদের দুই-একটা ঠোকা দিতেও ছাড়িতেন না। ডাক্তার হোর্নলি [Augustus Frederich Rudolf Hoernle, ১৮৪১-১৯১৮ খৃ.] Cathedral Mission কলেজের অধ্যাপক ছিলেন এবং নিজেও একজন মিশনারি ছিলেন। তিনি যখন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হন, মিশনারিকে গবর্নমেন্টে চাকুরি দেওয়া হইল এই কথা লইয়া রাজেন্দ্রলাল খুব আন্দোলন করেন। তাহাতে গবর্নমেন্ট জবাব দিয়াছিলেন— His missionary character will remain in abeyance. ইহার উত্তরে রাজেন্দ্রলাল জিজ্ঞাসা করিয়াছলেন, "How-long?" ছাত্রদের পক্ষ লইয়া তিনি অনেক সময় লড়িতেন। Entrance পরীক্ষায় যখন বছর বছর বিস্তর ছেলে ফেল হইতে লাগিল, তখন তিনি massacre of innocent বলিয়া তুমুল আন্দোলন করেন।

১৮৮৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সর্বপ্রথম একজন বাঙালিকে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রেসিডেন্ট করা হয়। অর্থাৎ Sir William Jones [১৭৪৬-৯৪ খৃ.] সোসাইটি পত্তন করিবার পর ঠিক একশো

বছর চলিয়া গেলে একজন দেশীয় লোককে প্রেসিডেন্ট করা হইল। যে দিনের সভায় তিনি নির্বাচিত হইলেন, সে দিন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তখনো মেম্বর হই নাই, সোসাইটির প্রতাপ ঘোষ [১৮৪০-১৯২১ খৃ] আমাকে সভায় টানিয়া লইয়া যান। দেশীয় অনেক মেম্বর উপস্থিত ছিলেন। কে কে ছিলেন, ঠিক মনে পড়িতেছে না, তবে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর [১৮৩১-১৯০৮ খৃ.] ছিলেন বেশ মনে আছে। আমি সেই প্রথম সোসাইটির মিটিং-এ যাই। সভাপতি নির্বাচিত হইবার পর রাজেন্দ্রলাল সমবেত সদস্যাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া একটি সুন্দর বক্তৃতা দেন। তাহার গোড়ার একটা ছত্র এখনো আমার মনে আছে। রাজেন্দ্রলাল উঠিয়া গম্ভীরস্বরে বলিয়াছিলেন, "Though my abilities may be humble I yield to none in my interest to the Asiatic Society." অনেক দিন পর্যন্ত সোসাইটির সভাপতিরা Annual advices দেন নাই, ১৮৮৬ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে অর্থাৎ সভাপতি হইবার ঠিক একবছর পরে রাজেন্দ্রলাল সোসাইটির বার্ষিক সভায় নূতন ধরনে একটা বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তিনি কানে শুনিতে পাইতেন না, সেইজন্য পুরা দুই বৎসর সভাপতিত্ব করিতে পারেনই নাই। কিন্তু প্রায় সকল অধিবেশনেই তিনি উপস্থিত থাকিতেন এবং বাদ-প্রতিবাদে খুবই যোগ দিতেন। তাঁহার দৃষ্টি চারি দিকে ছিল। অশ্ববৈদ্যক সম্বন্ধে দুইখানি মাত্র বহির কথা লোকে জানিত, একখানি নকুলের আর-খানি জয়দত্তের। রাজেন্দ্রলাল বিশেষ জিদ করিয়া সোসাইটি হইতে এই দুই খানি পুস্তক ছাপাইতে বলেন। তিনি খবর দেন যে, অশ্ববৈদ্যকের প্রধান সংস্কৃত গ্রন্থ শালিহোত্রের অশ্বশাস্ত্র আর পাওয়া যায় না; বোগদাদে উহার তর্জমা হইয়াছিল, তাহার পারসি তর্জমা চলিত আছে। পারসি হইতে হিন্দিতেও তর্জমা হইয়াছে, কিন্তু মূল পুথি এখনো পাওয়া যায় নাই, অথচ অশ্বচিকিৎসককে সমস্ত ভারতময় শালিহোত্র বলে। শালিহোত্রের পুথি রাজপুতানায় পাওয়া গিয়াছে শুনিলে আজ তিনি আনন্দে বিহ্বল হইতেন। ইংরাজি কোন্ সাল মনে নাই, এশিয়াটিক সোসাইটির অনুরোধক্রমে জর্মানির উর্‌টামবার্গের (Würtemberg) খ্যাতনামা পণ্ডিত জলি [য়ুলিউস য়োলি Julius Jolly, ১৮৪৯-১৯৩২ খৃ.] 'মনুটীকাসংগ্রহ' নামে এক

পুস্তক ছাপাইতে শুরু করেন [*Manu Tīkā Saṃgraha* being extracts from the commentaries of Medhātithi, Govindarāja, Nārāyaṇa, Rāghavānanda, Nandana and a Kāshmīrian author, 1885-89]। পুস্তকখানি আর-কিছু নয়, বাদ-প্রতিবাদ, বিচার বিতণ্ডা ছাড়িয়া দিয়া কোন্ টীকাকার মনুর শ্লোকের কী অর্থ করিয়াছেন তাহাই উক্ত পুস্তকে সংগ্রহ করিতেছিলেন। তিনি চারি-পাঁচখানি টীকার অনুযায়ী চারি-পাঁচ রকম অন্বয় ও প্রতিবাক্যও দিতেছিলেন। তিনটি অধ্যায় মাত্র শেষ হইয়াছে, এমন সময় বোম্বাই শহরের প্রসিদ্ধ উকিল মাণ্ডলিক মহোদয়ের সাত টীকাসুদ্ধ মনু [বিশ্বনাথ নারায়ণ মাণ্ডলিক, 'মানবধর্মশাস্ত্রম্', বোম্বাই ১৮৮৬ খৃ.] বাহির হইয়া গেল। রাজেন্দ্রলাল অমনি বলিলেন, জলির 'মনুটীকাসংগ্রহ' আর ছাপা হওয়া উচিত নয়। উনি তো কেবল চুম্বক দিতেছেন, পুরা পুঁথি ছাপা হইয়া গেল, তাঁহার চুম্বকের এখন আর-কোনো কদর রহিল না। সুতরাং মনুটীকাসংগ্রহ ছাপা বন্ধ হইয়া গেল। এশিয়াটিক সোসাইটি শাঙ্করভাষ্য ও তাহার টীকা 'ভামতি' ছাপাইয়াছিলেন [Bāla Śāstrī ed., Bhāmatī of Vācaspati Miśra, 1876-80]। ইহার কয়েক বছর পরে হোর্নলি সাহেবের কাশীস্থ কোনো বন্ধু ভামতীর টীকা 'কল্পতরু' ও তাহার টীকা 'পরিমল' ছাপাইবার প্রস্তাব করেন। হোর্নলি সাহেব একদিন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, সোসাইটিতে তুমি এই প্রস্তাবের সপক্ষে নোট দাও। আমি তাঁহার কথামতো নোট দিলাম কল্পতরু কী, পরিমল কী, বুঝাইয়া দিয়া বলিলাম, যখন ভামতী ছাপা হইয়াছে, এ দুইখানিও ছাপানো উচিত। আমার minute দেখিয়া রাজেন্দ্রলাল অগ্নিশর্মা হইলেন। আমিও দৈবক্রমে সেই সময় তাঁহার নিকট উপস্থিত। তিনি আমায় বলিলেন, "হরপ্রসাদ, তুমি এ কী কাজ করিয়াছ? দেখো আমার ইচ্ছা— যাহাতে তোমার একটু নামপসার হয়। কিন্তু তুমি এমনই লিখিয়াছ যে, বাধ্য হইয়া তোমার বিরুদ্ধে minute দিতে হইতেছে।" আমি বলিলাম, "কল্পতরু, পরিমল তো বেশ বই, আপনি ইহার বিরুদ্ধ হইতেছেন কেন?" তিনি বলিলেন, "আমরা বুঝি বসিয়া কেবল বেদান্তই ছাপিব? কেন? আর বুঝি দর্শনশাস্ত্র নেই?" তিনি আমার বিরুদ্ধে minute দিলেন, তাঁহার কথাই বজায় রহিল।

১৮৮৫ খৃস্টাব্দে একবার একটা চাকুরির উপরোধপত্র লইবার জন্য আমি বৈদ্যনাথে রাজেন্দ্রলালের কাছে যাই। সকালে বৈদ্যনাথে উপস্থিত হইয়া তীর্থের কাজ সারিয়া পাণ্ডার বাটীতে নিদ্রা গেলাম। বিকালে পাণ্ডা কৌশল্যা নদীর ওপার হইতে রাজেন্দ্রলালের বাটী দেখাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। আমি কৌশল্যা নদী পার হইয়া তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি বাটীর যে দিকে গিয়া উঠিলাম, বাটীর সদর দরজা ঠিক তাহার বিপরীত। বাটীখানি পঁয়ত্রিশ বিঘা জমির উপর— একতলা, মাঝে একটা হল, চারি কোণে চারিটা ঘর, অর্থাৎ ঠিক বাংলা প্যাটার্নের। আমাকে দেখিয়া রাজেন্দ্রলাল অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং বিস্মিত হইলেন। আমাকে বলিলেন, "তুমি এখানে ?… এখন তো গাড়ির সময় নয় ? তবে কোথা হইতে আসিলে ?" আমি বলিলাম, "সকালে আসিয়া পাণ্ডার বাসায় ছিলাম।" তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। যে কয়টি ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিয়া বলিলেন, "ইনি বোধ হয় আমাদিগের বাটীতে খাইতে চাহেন না, তাই পাণ্ডার বাটীতে অতিথি হইয়াছেন। কিন্তু আজ যখন আমার বাটী আসিয়াছ, আমিও তোমাকে ছাড়িব না।" ইহার উপর আর কথা চলে না, রাজেন্দ্রলালের আতিথ্য লইলাম। যতক্ষণ তাঁহার বাটীতে ছিলাম, তিনি আমাকে যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। আমি আসিয়াছি বলিয়া ভালো ভালো ব্যঞ্জন রাঁধাইলেন। কলিকাতা হইতে ভাঙন মাছ সংগ্রহ করা ছিল, তাহাও ফরমাইসমতো রাঁধাইলেন। বৈদ্যনাথের পেঁড়া প্রভৃতিও আনানো হইল। রাত্রিতে আহার হইয়া গেলে নিজে দাঁড়াইয়া একটি কোণের ঘরে বিছানা করাইয়া দিলেন, মশারিটি পর্যন্ত কিরূপ খাটানো হইল, তাহার তদারক করিলেন। আমাকে শুইতে বলিয়া, কিরূপে দরজা বন্ধ করিতে হয়, সে বিষয়ে উপদেশ দিয়া অন্য গৃহে চলিয়া গেলেন। সকাল বেলা রাজেন্দ্রলাল উঠিয়া পেণ্টুল, চাপকান পরিলেন এবং পকেটে কতকগুলি কী পুরিয়া লইয়া আমাকে বলিলেন, "চলো, বেড়াইয়া আসি। তোমার চাকুরির জন্য পত্র তোমার হাতে দিব না, ডাকে তোমার সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিব।" রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে তাহার পর বেড়াইতে

বাহির হইলাম। তিনি অনেকের বাটীতে গেলেন। বাটীতে ছোটো ছেলে দেখিলেই তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন এবং পকেট হইতে একটা পাখি বা অন্য কোনো খেলনা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলেন। সে খেলনা পাইয়া আহ্লাদে খুব হাসিতে লাগিল, তিনি তাহার গাল টিপিয়া দিলেন। এইরূপে পাঁচ-ছয় বাটীতে দশ-বারোটি খেলনা দিতে দিতে তাঁহার পকেট খালি হইয়া গেল। তিনি ছোটো ছেলেপিলেকে এত ভালোবাসিতেন এবং তাহাদিগকে পাইলে এত খুশি হইতেন তাহা পূর্বে জানিতাম না।

আমি তো সেইদিনই বৈদ্যনাথ হইতে চলিয়া আসিলাম। চলিয়া আসিবার পর এবং আমার চাকুরির জন্য রাজেন্দ্রলালের উপরোধপত্র লিখিবার পূর্বে তাঁহার কোনো বিশেষ বন্ধু শুনিলাম, পশ্চিম হইতে আসিয়া দেওঘরে পৌঁছিলেন। তিনি রাজেন্দ্রলালের নিকট বিশেষ রূপে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, আমি একজন good-for-nothing লোক। তাঁহার আদত মতলব ছিল এই যে, আমি যে কাজের প্রার্থী, সেই কাজের জনা তাঁহার কোনো আত্মীয়ের হইয়া রাজেন্দ্রলাল উপরোধ করেন। রাজেন্দ্রলাল তাহাতে বলেন, “সে কেমন করিয়া হইবে? আমি যে তাহাকে আশা দিয়াছি এবং সে আমার অনেক কাজ করিয়া দেয়। আমি তাহাকে ছাড়িয়া অন্যের জন্য চিঠি কেন দিব?” যে চাকুরির জন্য তিনি পত্র দেন, সে চাকুরি আমার হয় নাই, তাহার অর্ধেক মাহিনার আর-একটা চাকুরি হইয়াছিল। কিন্তু এখানে খাটুনি ছিল কম, যথেষ্ট সময় পাওয়া যাইত এবং নানারূপ বহি পাওয়ার সুবিধা হইত। রাজেন্দ্রলাল কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে একদিন আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার কী হইল?” আমি বলিলাম, “সে চাকুরি হয় নাই কিন্তু আপনার পত্র তো অব্যর্থ, আর-একটি হইয়াছে, ইহার বেতন তাহার অর্ধেক।” এই চাকুরির কী কী সুবিধা, তাহাও তাঁহাকে বলিলাম, তিনি সব শুনিয়া বলিলেন, “তা বেশ হইয়াছে। ইংরাজিতে বলে, half is often greater than the whole. তোমার পক্ষে সে কথাটি খুব খাটিয়া গেল।”

১৮৮৯ সালে রাজেন্দ্রলাল অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন। তখন

তিনি একদিন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার পীড়ার সময় তুমি আমার এই Notice-এর কাজটা করো।" অর্থাৎ তিনি যে Notice of Sanskrit Manuscript করিতেছিলেন, তাহার ভার আমার উপর দিলেন। আপিস তাঁহার বাটীতেই রহিল। আমি মাঝে মাঝে গিয়া পণ্ডিত মহাশয়দের কাজ তদারক করিয়া আসিতাম এবং প্রুফও দেখিতাম। এইরূপে প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গেল। ১৮৯১ সালের জুলাই মাসে রাজেন্দ্রলালের দেহত্যাগ হইল। সোসাইটির মেম্বরগণ তাঁহার নোটিস ছাপাইবার ভার আমাকে দিলেন। একটি খণ্ড শেষ হইয়াছিল, সেটি বাহির হইল, আমার নামেই বাহির হইল। সেই নোটিসের একখণ্ড কেম্ব্রিজে পণ্ডিতপ্রবর ডাক্তার অফ্রের [Theodor Aufrecht, ১৮২২-১৯০৭ খৃ.] নিকট পৌঁছিলে তিনি আমায় যে পত্র লিখেন, তাহা তো সেদিন তোমাকে দিয়াছি।

'নারায়ণ'
শ্রাবণ, আশ্বিন, ফাল্গুন : ১৩২৩ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. সূত্র

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের জন্ম কলকাতায়, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮২২ খৃ.

পাথুরিয়াঘাটার ক্ষেমচন্দ্র বসুর ইংরেজি স্কুলে এবং গোবিন্দচন্দ্র বসাকের হিন্দু ফ্রি স্কুলে পড়বার পরে রাজেন্দ্রলাল ১৮৩৭-৪১ খৃ. পর্যন্ত মেডিকেল কলেজে পড়েন। এর পরে কিছু দিন আইন পড়েন এবং সংস্কৃত, হিন্দি ও উর্দু ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন।

প্রথম পত্নী সৌদামিনীর মৃত্যুর (১৮৪৪ খৃ.) পরে আনুমানিক ৩৮ বছর বয়সে ভবানীপুরের কালীধন সরকারের বড়ো মেয়ে ভুবনমোহিনীকে বিয়ে করেন।

১৮৪৬-এ তিনি মাসিক ১০০ টাকা বেতনে এশিয়াটিক সোসাইটির অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারি এবং লাইব্রেরিয়ান হন। ১৮৫৬য় নাবালক জমিদারদের তত্ত্বাবধানের জন্য স্থাপিত ওয়ার্ডস ইন্স্টিটিউশনের ডিরেক্টর নিযুক্ত হন মাসিক ৩০০ টাকা বেতনে। ১৮৮০ খৃ. পর্যন্ত এই পদে ছিলেন।

এশিয়াটিক সোসাইটিই ছিল রাজেন্দ্রলালের মূল কাজের জায়গা, আমৃত্যু তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৮৬১-৬৫, ১৮৭০-৮৪, ১৮৮৬-৯১ সহকারী সভাপতি ছিলেন। সভাপতি হন ১৮৮৫ খৃ.

১৮৬৩-৭৬ খৃ. তিনি কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য বা জাস্টিস-অব-পীস এবং ১৮৭৬-এ করদাতাদের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন।

১৮৭৬ খৃ. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে এল.এল. ডি. উপাধি দেন।

১৮৫১-য় প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে প্রায় সূচনা থেকেই তাঁর যোগ ছিল। ১৮৭৮-৮০, ১৮৮৭-৮৮, ১৮৯০-৯১ এই সভার সহ-সভাপতি এবং ১৮৮১-৮২, ১৮৮৩-৮৪, ১৮৮৬-৮৭, ১৮৮৯-৯০ সভাপতি ছিলেন।

সরকার তাঁকে ১৮৭৭-এ রায়-বাহাদুর, ১৮৭৮-এ সি. আই. ই. এবং ১৮৮৮-তে রাজা উপাধি দেন।

গ্রন্থাধ্যক্ষ রূপে রাজেন্দ্রলাল ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ (১৮৪৩ খৃ.) সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নিজে সম্পাদনা করেন ‘পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক’ ‘বিবিধার্থ সংগ্রহ’ (১৮৫১ খৃ.) নামে সেকালের বিখ্যাত প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা এবং ‘রহস্য-সন্দর্ভ’ (১৮৬৩ খৃ.)।

রচনাবলী : ‘প্রাকৃত ভূগোল’ (১৮৫৪ খৃ,), ‘শিল্পিক দর্শন’ (১৮৬০ খৃ,), ‘শিবজীর চরিত্র’ (১৮৬০ খৃ.), ‘মেবারের রাজেতিবৃত্ত’ (১৭৬১ খৃ. ?) *The Antiquities of Orissa*. 2 Vols. ১৮৭৫, ৮০ খৃ.), *Buddha Gaya, The Hermitage of Śakya Muni* (১৮৭৮ খৃ.), *Indo-Aryans*, 2 Vols. (১৮৮১ খৃ.) ইত্যাদি। সম্পাদিত ও অনূদিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা’ গ্রন্থমালায় ‘চৈতন্যচন্দ্রোদয়’ (১৮৫৪ খৃ.), ‘তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ’ ১-৩ খণ্ড (১৮৫৫, ৬২, ৯০ খৃ.), তৈত্তিরীয় আরণ্যক’ (১৮৭১ খৃ.), ‘অষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতা’ (১৮৮৮ খৃ.) ইত্যাদি ১২ খানি বই. *The Sanskrit Bnddhist Literature of Nepal* (১৮৮২ খৃ., ৮৫টি অধ্যায়ের মধ্যে ১৬টি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লেখা), *Yoga-Sūtra* (১৮৮৩ খৃ.)। এ ছাড়া বিভিন্ন গ্রন্থাগারের পুঁথির ডেসক্রিপটিভ ক্যাটালগ, নোটিস ও রিপোর্টের ৭ খণ্ড তাঁর কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

মৃত্যু ২৬ জুলাই ১৮৯১ খৃ.।

২. পাঠ প্রসঙ্গ

রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পর্কে শাস্ত্রী মশায়ের এই স্মৃতিকথা ‘চল্লিশ বৎসর পূর্বে : রাজেন্দ্রলাল মিত্র’ শিরোনামে ননীগোপাল মজুমদারের (১৮৯৭-১৯৩৮ খৃ.) স্বাক্ষরে প্রকাশিত হয়েছিল ‘নারায়ণ’ পত্রিকার শ্রাবণ, আশ্বিন এবং ফাল্গুন ১৩২৩ব.— তিনটি সংখ্যায়। অনুলেখক ননীগোপাল রচনাটির সূচনায় এবং অন্যত্র নিজের মন্তব্য যোগ করেন এবং শাস্ত্রীমশায়ের উক্তি উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে রাখেন। নিচে ননীগোপালের মন্তব্যগুলি দেখানো হল।

উল্লেখগুলির সূচনায় ব্যবহৃত দুটি সংখ্যার প্রথমটি পৃষ্ঠা ও দ্বিতীয়টি ছত্র -নির্দেশক।

সূচনায় ছিল : "মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত একদিন তাঁহার পটল ডাঙ্গার বাসায় সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমাকে রাজেন্দ্রলালের শেষ জীবন সম্বন্ধে কিছু বলিবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—"

৬০/২৫ "সেই জায়গাটা তোমাকে দেখাইতেছি।" এর পরে পত্রিকায় ছিল,

"শাস্ত্রী মহাশয়ের পণ্ডিত শেল্ফ হইতে একখণ্ড Nepalese Buddhist Literature নামাইয়া আমার হাতে দিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় আমার হাত হইতে বইখানা লইয়া উহার গোড়ার একটা পাতা খুলিয়া আমাকে পড়িতে দিলেন। উহাতে লেখা আছে,—During a protracted attack of illness, I felt the want of help, and a friend of mine, Babu Haraprasad Sastri, M. A., offered me his co-operation, and translated the abstracts of 16 of the larger works.... I feel deeply obliged to him for the timely aid he rendered me and tender him my cordial acknowledgements for it. His thorough mastery of the Sanskrit Language and knowledge of European literature fully qualified him for the task ; and he did his work to my entire satisfaction.

শাস্ত্রী মহাশয় বলিতে লাগিলেন,"

৬৩/২০ "১৮৭৫ খৃস্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল মিত্র···" এর আগে পত্রিকায় ছিল, "শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন,"

৬৫/১২ "একবার রাজেন্দ্রলাল আমার উপর ভয়ানক চটিয়া গিয়াছিলেন।" পত্রিকায় এর আগে ছিল, "শাস্ত্রী মহাশয় একটু থামিয়া পরে বলিতে লাগিলেন,"

৬৮/১৪ "সেকালের ১নং ওয়ার্ডে রাজেন্দ্রলাল অনেকবার কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছিলেন।" পত্রিকায় এর আগে ছিল, "সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের পড়িবার ঘরে আলো জ্বলিল। খাটের উপর বিছানো ফরাসের উপর একটা তাকিয়া হেলান দিয়া বসিয়া শাস্ত্রী মহাশয় রাজা রাজেন্দ্রলালের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।"

৭৪/১২ "তাহা তো সেদিন তোমাকে দিয়াছি।" এর পরে এই অনুচ্ছেদটি ছিল, "কিছুদিন পূর্ব্বে শাস্ত্রী মহাশয়ের নৈহাটী বাটী হইতে ডাক্তার অফ্রের পত্র উদ্ধার করিয়াছিলাম। উহা ১৮৯৩ সালের ১১ই মার্চ্চ তারিখে লিখিত। উহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল—'Trust you will successfully continue the work Late Lamented Rajendralala had done up to the end of the 9th Vol.

ন সাধবঃ কদাচিন্ম্রিয়ন্তে।"

৩. অনুষঙ্গ

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকার ১৩২৩ বঙ্গাব্দের ভাদ্র ও কার্তিক সংখ্যায় এই রচনার তীব্র বিরূপ সমালোচনা করা হয়েছিল— যার অনেকটাই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উদ্দেশে ব্যক্তিগত আক্রমণ। শাস্ত্রীমশাই সাহিত্য পত্রিকার লেখক ছিলেন। এই সমালোচনার পরেও ভাদ্র ১৩২৬ ব. সংখ্যায় তাঁর 'রামেন্দ্রবাবু' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

রামেন্দ্রবাবু
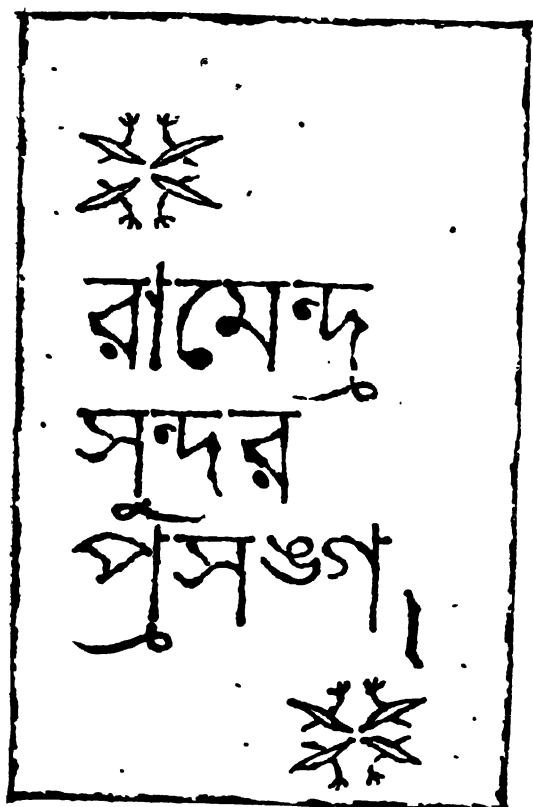
রামেন্দ্রবাবু এত অল্প দিন হইল আমাদের ছাড়িয়া গিয়াছেন যে, তিনি যে আর আমাদের মধ্যে নাই, এ কথা এখনো আমরা ধারণা করিতে পারিতেছি না। এখনো যেন মনে হইতেছে, তিনি রোগশয্যায় শুইয়া আছেন; এখনো যেন আশা হইতেছে, তিনি আবার সারিয়া উঠিয়া তাঁহার এই প্রিয় সাহিত্য-পরিষদ্-মন্দিরে আমাদের সহিত মিলিত হইবেন। আমার এই ভ্রম কিন্তু ক্রমে ক্রমে বড়ো কষ্ট দিয়া ঘুচিতেছে। আমার নিজের পড়ার ঘর হইতে তাঁহার পড়ার ঘর দেখা যায়। ভ্রমবশত, পাঁচ বৎসর ধরিয়া প্রত্যহ যেমন দিন রাত্রে পাঁচ বার

দশ বার তাঁহার বাড়ি যাইতাম, এখনো সেইরূপ যাইবার জন্য দুই-তিন বার উঠিয়াছি, এবং তিনি আর নাই, এই কথা মনে পড়ায় চক্ষু মুছিতে মুছিতে বসিয়া পড়িয়াছি ; পাঁচ বৎসর সত্য সত্যই আমরা পরমানন্দে ছিলাম। সাহিত্য-সংসারে, সুখে দুঃখে, আপদে বিপদে, আমরা সর্বদাই মিলিত হইতাম। যে-কোনো অবস্থায় রামেন্দ্র মন খুলিয়া আমাকে পরামর্শ দিত, উপদেশ দিত ; সে আমাকে কতই ভক্তি করিত, ভালোবাসিত। শেষ তাহার পরিবারবর্গের মুখে শুনিলাম যে, সে আমারই জন্য পটলডাঙায় বাস করিয়াছিল, এবং নানা বিঘ্ন সত্ত্বেও সে এখান হইতে যাইতে চাহে নাই। এ কথা আমার পক্ষে শ্লাঘার বিষয় বটে। কিন্তু সে শ্লাঘা প্রকাশ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিব কাহার কাছে ? সে তো আর ধরাধামে নাই !

শোক পবিত্র। শোক নির্মল। শোকে মানুষকে নির্মল করে। শোকে মনের অনেক ময়লা কাটিয়া যায়। কিন্তু শোক লইয়া তো মানুষে থাকিতে পারে না। শোক চাপা দিয়া আবার তাহাকে 'কঠোর কর্তব্যে'র অনুরোধে সকল কার্যই করিতে হয়। আজি এ সভায়-- এ পবিত্র শোকসভায়— একটি কঠোর কর্তব্য পালন করিতে আসিয়াছি ; আসিয়াছি প্রকাশ্যভাবে রামেন্দ্রের জন্য শোক করিতে, নিজের মন প্রবোধ মানুক আর না মানুক, তাহার পরিবারবর্গকে প্রবোধ দিতে, হয়তো তাহার পবিত্র স্মৃতি রক্ষা করিতে। এ কর্তব্য কঠোর বলিতেছি কেন ? যেহেতু এ-সব প্রকাশ্য ভাবে করিতে হইতেছে।

এ সভার উদ্বোধনে রামেন্দ্রের সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলিতে হয়। আমি তাহা পারিব না। আমি বক্তৃতায় এখনো এত অভ্যস্ত হই নাই যে, মনের আবেগ সংবরণ করিয়া বক্তৃতা করিয়া যাইব। সেইজন্য আমি মনে করিতেছি, রামেন্দ্রের সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া তাঁহার বংশের কথা কিছু বলিয়া যাইব। রামেন্দ্রের চরিত্রে এমন অনেকগুলি বৈচিত্র্য ছিল, যে-সব তাঁহারই বংশে সম্ভব, ইহাই দেখাইবার চেষ্টা করিব। একটা প্রবাদ আছে— 'বাপকা বেটা, সিপাইকা ঘোড়া, কুচ্ নহী, তব্‌বী থোড়া'— ইহা কতদূর সত্য, তাই দেখাইবার চেষ্টা করিব।

G.I.P. ও E.I.R. এই দুইটি রেল সংযোগ করিয়া ঝাঁসি হইতে মানিকপুর পর্যন্ত যে একটি রেলপথ আছে, তাহার ঠিক মাঝখানে

হরপালপুর নামে স্টেশন— সে স্টেশন হইতে ঝট্‌কায় চাড়িয়া দক্ষিণ দিকে ৮৫ মাইল যাইলে খাজুরাহা বলিয়া একটি প্রাচীন নগর পাওয়া যায়। দেশের লোকে উহা অতি পবিত্র তীর্থ বলিয়া মনে করে। এইজন্য উহার নাম রাখিয়াছে— 'পুরী'। 'পুরী'র মাঝখানে একটি প্রকাণ্ড জলাশয়, দুই দিক পাথরের পোস্তা দিয়া গাঁথা, অপর দুই দিক দিয়া গড়াইয়া জল আসে। এই পুকুরের ধারেই রাজবাড়ি, রাজবাড়ির পিছনে অনেকগুলি মন্দির। কতকগুলি মন্দির খুব মেরামত করা, তাহাতে এখনকার রাজাদের প্রতিষ্ঠিত শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতির মূর্তি আছে। যেগুলি মেরামত হয় নাই, সেগুলি নানা অবস্থায় ভাঙিয়া পড়িয়া আছে। সেখান হইতে পোয়াটাক পথ দূরে আবার কতকগুলি মন্দির, কতক বেমেরামত, সেগুলি জৈনদিগের। আরো কতকগুলি মন্দির— সব বেমেরামত— বৌদ্ধদিগের। এখানকার মন্দিরের একটু বৈচিত্র্য আছে। মন্দিরের সকল দেওয়াল হইতে পুত্তলি বাহির হইতেছে। পুতুলগুলি উপর হইতে নিচে পর্যন্ত এক এক সারিতে গাঁথা। ভিতরেও তাই, বাহিরেও তাই। দেখিতে মন্দিরগুলি অতি সুন্দর। এরূপ পুতুল বার করা মন্দির ভারতবর্ষের আর-কোথাও নাই। বিন্ধ্য পর্বতের বিশাল উদরে ছোটো ছোটো পাহাড়, ছোটো ছোটো ডেলা, ছোটো ছোটো ডুঙ্‌রি, ছোটো ছোটো নদী, ছোটো ছোটো হ্রদ, ছোটো ছোটো ঝরনা, এইসব বিচিত্র সৌন্দর্যের মধ্যে খাজুরা নগরে বিচিত্র মন্দিরগুলি আরো বিচিত্র দেখায়। দেশটিও বিচিত্র। গ্রামগুলিতে বসতি বিরল। বন ঘন। বসন্তে যখন বনময় পলাশ ফুল ফুটিয়া উঠে, বোধ হয় যেন পৃথিবী একখানি রাঙা চেলি পরিয়া বউ সাজিয়াছেন। এই উঁচু-নিচু, পাহাড়-বন-নদীর উপর রাত্রিতে যখন জ্যোৎস্না পড়ে, তখন যে আলো-আঁধারের খেলা হয়, সে আরো বিচিত্র। হাজার বৎসর পূর্বে প্রকৃতির এই প্রিয় ভূমির মধ্যে দুইটি জাতি উঠিয়াছিল— একটি ব্রাহ্মণ, জিঝোটিয়া; আর-একটি ক্ষত্রিয়, চাণ্ডেল। জিঝোটিয়ারা কুমারিলের[১] সময়ে যজ্ঞ করিতে এই দেশে আসিয়াছিলেন। দেশটির নাম জেজাভুক্তি, চলিতভাষায় জেঝৌটি; ব্রাহ্মণদের নাম জেজাভুক্তীয়, বা জিঝোটিয়া। জিঝোটিয়ার মধ্যে বড়ো বড়ো পণ্ডিত, বড়ো বড়ো কবি, বড়ো বড়ো যোগী, বড়ো বড়ো শাসনকর্তা রাজমন্ত্রী হইয়া গিয়াছেন।

জিঝোটিয়ারা বড়ো 'ঘরবোলা'— আপনার ঘর ছাড়িয়া বড়ো একটা যাইতেই চাহে না। রামেন্দ্রবাবু ১৮৭১ সালের সেন্সস রিপোর্ট হইতে দেখাইয়াছেন যে, জিঝোটি বা বুন্দেলখণ্ডে হামিরপুর, ঝাঁসি, জালোন, ললিতপুর— এই কয় জেলায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার ব্রাহ্মণ আছেন; কিন্তু ইহার বাহিরে পাঁচ হাজারও পাওয়া যায় না। একবার কেবল, শের শা [১৪৭২-১৫৪৫ খৃ.] কালিঞ্জরের চাণ্ডেল-বংশ ধ্বংস করিয়া দিলে, দুই-চারি ঘর বড়ো বড়ো জিঝোটিয়া ব্রাহ্মণ দেশত্যাগ করিয়াছিলেন। ইঁহাদেরই মধ্যে এক ঘর মানসিংহের সঙ্গে জুটিয়া বাংলা দখল করিতে আসেন, এবং মানসিংহের কাছে ফতেসিং পরগনা জায়গির পান। বাংলার জিঝোটিয়ারা আবার তেমনই 'ঘরবোলা' হইয়া যান। তাঁহাদের মুখে এই তিন-চারি শত বৎসর কেবল 'ফতেসিং' আর 'ফতেসিং'— বাংলায় যে আর-সব দেশ আছে, আর আর জেলা আছে, আর আর নগর আছে, তাঁহাদের কাছে সেগুলি কিছুই নয়— সব ফাঁকা। চারি শত বৎসর ধরিয়া একটি জমিদারি এক পরিবারের হাতে প্রায়ই থাকে না। ফতেসিং-এর অধিকাংশ জিঝোটিয়াদের হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহারা সেই 'ফতেসিং'ই ধরিয়া আছে। যে-সকল জিঝোটিয়ারা অল্পবিস্তর জমি জমিদারি ভোগ করিতেছেন, রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহাদেরই মধ্যে একজন।

তিনিও বড়োই 'ঘরবোলা' ছিলেন। বাংলার বাহিরে তিনি একবার পুরী গিয়াছিলেন, আর একবার সূর্যগ্রহণে সর্বগ্রাস দেখিবার জন্য বক্সারে গিয়াছিলেন। আর তীর্থ করিতে তিনি একবার গয়া আর-একবার কাশী গিয়াছিলেন। বাংলার মধ্যেও জেমো আর কলিকাতা, কলিকাতা আর জেমো। কেবল তাঁহার সাধের সাহিত্য-সম্মিলনের জন্য কয়েকবার এ-জেলা ও-জেলা বেড়াইয়াছিলেন। এই 'ঘরবোলা' ভাব তিনি তাঁহার বংশ হইতেই পাইয়াছিলেন।

তিনি জিঝোটিয়াদের আরো একটি ভাব পাইয়াছিলেন। তাঁহার খুব পড়াশুনা থাকিলেও সেজন্য তাঁহার গুমর ছিল না, বিদ্যা প্রকাশ করিবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইতেন না। জিঝোটিয়াদের মধ্যে পূর্বেও অনেক অনেক পণ্ডিত জন্মিয়াছিলেন, এখনো আছেন। আমি দুই-চারি জন জিঝোটিয়া পণ্ডিত দেখিয়াছি। তাঁহারা সে কালের ধরনে খুব

পণ্ডিত। কিন্তু সে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিবার তাঁহাদের কোনোই চেষ্টা নাই। জিঝোটিয়াদের বড়ো গৌরবের দিনে, কৃষ্ণমিশ্র[২] নামে এক প্রগাঢ় দার্শনিক জন্মিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি করিয়াছেন কী? লিখিয়াছিলেন এক নাটক, তাহার নাম 'প্রবোধচন্দ্রোদয়'। যে-কেহ সে নাটক পড়িয়াছে, সেই বুঝিয়াছে, কৃষ্ণমিশ্র কত বড়ো পণ্ডিত ছিলেন। তিনি শুধু দার্শনিক ছিলেন, তা নয়; সকল বিষয়েই তাঁহার দৃষ্টি ছিল, লোকচরিত্র বেশ বুঝিতেন। রামেন্দ্রবাবুও তেমনি সংস্কৃত, বাংলা, ইংরাজি, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি কতই পড়িয়াছিলেন; যাহাই পড়িয়াছিলেন, তাহাই হজম করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি লিখিয়াছেন কী? মাসিকপত্রে কতকগুলি প্রবন্ধ ও কয়েকখানি বই। এই যে বিদ্যাপ্রকাশে উদাস ভাব, তাহাও তিনি জিঝোটিয়াদের নিকট পাইয়াছেন।

রামেন্দ্রবাবু বড়ো উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। সে কথা খুব সত্য। পরনিন্দা, পরচর্চা, হিংসা, বিদ্বেষ— এগুলি তাঁহার ছিল না। এটিও তিনি তাঁহার পূর্বপুরুষদিগের নিকট পাইয়াছিলেন। ত্রিবেদী-মহাশয়েরা বহু-কাল ধরিয়া ফতেসিংয়ে বাস করিতেছিলেন। ফতেসিংয়ের জমিদারেরা অনেক সময় ঝগড়া, বিবাদ, মোকদ্দমা, মামলা করিতেন— কিন্তু ত্রিবেদীমহাশয়েরা ঝগড়া মিটাইবার চেষ্টা করিতেন, উস্কাইয়া দিতেন না। তাঁহার পিতা ও পিতামহ উভয়েই পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। রামেন্দ্রবাবু সর্বদাই বলিতেন, 'আমারও অল্প বয়সেই মৃত্যু হইবে।' তিনি অনেকবার বলিয়াছেন— 'পিতা পিতামহের তুলনায় আমি তো দীর্ঘজীবী।' তিনি যে এত উদার, এত ধার্মিক ছিলেন, তাহার কারণ তিনি সর্বদাই আপনাকে ভাবিতেন— 'গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা[৩]।' আমি একটা জিনিস বুঝিতে পারি নাই। তাঁহার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইলে, যখন তাঁহাকে আমরা সাহিত্য-পরিষৎ হইতে অভিনন্দন দিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম, তিনি যেন তখন বেশি বেশি আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে এক-একবার মনে হইত, তিনি জাঁক বড়ো ভালোবাসিতেন। আর জেঁকো লোকের উপর সকলেরই কেমন অশ্রদ্ধা হয়। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই রামেন্দ্রের কথাবার্তায় বুঝিলাম যে, তাঁহার এই

আনন্দের মধ্যে জাঁক নাই। 'বাপ পিতামহের চেয়ে অনেক দিন বাঁচিয়া আছি' ইহাই তাঁহার আনন্দের কারণ। সে আনন্দের ভিতরেও তিনি 'গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা— '।

রামেন্দ্রবাবু বড়ো কোমলপ্রকৃতি ছিলেন। অল্পেই তাঁহার হৃদয় গলিয়া যাইত। ইহারো প্রধান কারণ এই— তিনি পুরুষের নিকট শিক্ষা পান নাই, শিক্ষা পাইয়াছিলেন স্ত্রীলোকের নিকট। বাপ-দাদার চেয়ে মা ও ঠাকুরমাই তাঁহাকে বেশি শিক্ষা দিয়াছেন। আর তিনি যে-সকল স্ত্রীলোকের নিকট শিক্ষা পাইয়াছিলেন. তাঁহারা সকলেই বড়ো ঘরের মেয়ে। বড়ো ঘরের মেয়ে হইলেই একটু উদার হইবে, একটু ধর্মভীরু হইবে।

তাঁহার হৃদয় কত কোমল ছিল, তাহা আমরা একবার দেখিয়াছিলাম। তাঁহার দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ব্যোমকেশ মুস্তফী [১৮৬৮-১৯১৬ খৃ.] মহাশয় মারা গেলে, রামেন্দ্রবাবু সে সময় অত্যন্ত পীড়িত ও কাতর হইলেও বিশেষ আগ্রহ করিয়া উঁহার শোকসভায় প্রবন্ধ লিখিবার ভার গ্রহণ করেন। সেরূপ প্রবন্ধ রামেন্দ্রবাবুই লিখিতে পারিতেন। প্রাণ খুলিয়া তিনি আপন প্রীতিপাত্রের কর্মনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছিলেন।[৪] এবং উহা পড়িতে পড়িতে সভাস্থলে দুই-তিন বার কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার বড়ো ইচ্ছা ছিল— ব্যোমকেশের স্মৃতির সহিত তাঁহার নাম জড়িত থাকে। তাই আমরা, এই প্রবন্ধের মুখপত্রে, তাঁহার প্রিয় সহচর ব্যোমকেশের সহিত তাঁহার প্রতিকৃতি দিলাম।

বিদ্যার উপর রামেন্দ্রের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি সর্বদাই পড়িতেন, নিপুণ হইয়া পড়িতেন, হজম করিবার জন্য পড়িতেন, হজম না করিয়া ছাড়িতেন না। তাই তিনি অতি কঠিন বিষয়ও সহজেই বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। ইহারো মূলে দেখিতে পাই এই যে, বাংলায় আসিয়া তাঁহার পূর্বপুরুষেরা স্বচ্ছন্দেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেন, অন্নচিন্তা তাঁহাদের একেবারেই ছিল না। অল্পবিস্তর লেখাপড়া সকলেই শিখিতেন। পরস্পরের উপর তাঁহাদের খুব আত্মীয় ভাব ছিল, তাঁহারা সংখ্যায় অল্প বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে পরস্পরের উপর এত আত্মীয়তা। তাঁহারা লেখাপড়া করিয়াই দিন কাটাইতেন।

তাঁহার পিতা পিতামহরাও লেখাপড়া খুব করিতেন ; কেহ কেহ নাটক লিখিয়াছেন, কেহ বা কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। অল্পবিস্তর যে জমিদারি ছিল, তাহা সুশাসনে রাখা, আর লেখাপড়া করা— সেই তাঁহাদের ব্রত ছিল। তাঁহাদের ব্রত তাঁহারা রামেন্দ্রকে দিয়া গিয়াছিলেন। রামেন্দ্র তাঁহাদের চেয়ে বেশি কাল বাঁচিয়াছিলেন, তাঁহাদের চেয়ে বেশি কৃতিত্বও দেখাইয়া গেলেন। তাঁহাদের কৃতিত্ব জেমোর সমাজে আবদ্ধ ; রামেন্দ্রের কৃতিত্বে সারা বাংলা মুগ্ধ।

রামেন্দ্র দেশহিতের জন্য তিনটি অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন— একটি সাহিত্য-পরিষৎ, একটি সাহিত্য-সম্মিলন, আর-একটি সাহিত্য-পরিষদের মন্দির। ছেলেবেলায় যাহা দেখে, লোকে বড়ো হইলে তাই করিতে চেষ্টা করে। রামেন্দ্রবাবু ছেলেবেলায় দেখিয়াছিলেন, কাঁদির ডিস্পেন্সারি লইয়া ম্যাজিস্ট্রেট মেকেঞ্জির [Alexander Mackenzie, পরে লে. গবর্নর ১৮৯৫-৯৮ খৃ.] সহিত জেমোর রাজার ঘোরতর বিবাদ হয়, এবং সে বিবাদে জেমোর রাজারই জয় হয়। মেকেঞ্জি লিখিয়া যান, 'বাবু নরেন্দ্রনারায়ণকে লোকে রাজা বলিয়া থাকে, তিনি সর্বতোভাবে রাজোপাধির যোগ্য।' কিন্তু নরেন্দ্রনারায়ণ, প্রজারা তাঁহাকে রাজা বলে, ইহাতেই খুশি ছিলেন, তিনি রাজোপাধির জন্য কখনো ব্যস্ত হন নাই। ছেলেবেলায় নরেন্দ্রনারায়ণের কীর্তিকলাপ দেখিয়া ও শুনিয়া রামেন্দ্রেরও সেইরূপ কিছু করিবার প্রবৃত্তি হয়। নরেন্দ্রনারায়ণের চেষ্টা জেমোতেই আবদ্ধ, রামেন্দ্রের চেষ্টায় সারা বাংলা, এমন-কি, সারা ভারত উপকৃত।

রামেন্দ্র উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্র বংশেরই অনুযায়ী ছিল। তবে কি তাঁহার নিজের কিছুই কৃতিত্ব নাই ? বংশ হইতে আমরা কী পাই ? বীজ পাই। বিদ্যার উপর, সৎকর্মের উপর অনুরাগ— এ-সকল বংশ হইতে পাই। কিন্তু সে বীজকে অঙ্কুরিত করে কে ? ফলপুষ্পে শোভিত করে কে ? সে তো নিজের চেষ্টা। রামেন্দ্র যদি নিজের চেষ্টায় ভালো করিয়া পরীক্ষা পাস না করিতেন, তবে কাঁদি স্কুল হইতে পাস করা শত শত ছেলের মতো তাঁহারো চেষ্টা স্বগ্রামেই আবদ্ধ থাকিত। তিনি যদি কলিকাতায় আসিয়া বিদ্যার উপাসনা না করিয়া মা লক্ষ্মীর উপাসনা

করিতেন, বোধ হয় লক্ষ লক্ষ টাকা রাখিয়া যাইতেন, তাঁহার সময়ের অনেক লোক তো এমন রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি মহাবীরের মতো সে প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিলেন ; করিয়া 'যেন মে পিতরো যাতাঃ যেন যাতাঃ পিতামহাঃ' সেই পথেরই অনুসরণ করিলেন।

অনেকেই বলেন— কথাটাও সত্য— যে, দর্শনই হউক বা বিজ্ঞানই হউক, ইতিহাসই হউক বা প্রত্নতত্ত্বই হউক— রামেন্দ্রবাবু যাহাই লিখিতেন, তাহাই যে শুধু প্রাঞ্জল হইত এমন নয়, সত্য সত্যই তাহার মধুরতায় প্রাণকে জল করিয়া দিত, পড়িতে কবিতার মতো বোধ হইত, কল্পনায় মাখামাখি থাকিত, রসে ও ভাবে ভোর করিয়া দিত। তাঁহার 'মায়াপুরী'ই বলো, 'বিচিত্র-প্রসঙ্গ'ই বলো, আর যে-কোনো প্রসঙ্গই বলো, সবই যেন কবিত্বময়। এ মহা কবিত্বের বীজও তিনি আপনার পূর্বপুরুষদের নিকট পাইয়াছিলেন। তিনি এক জায়গায় লিখিয়াছেন,[৫] "পিতামহ ব্রজসুন্দর ত্রিবেদী একজন কাব্যামোদী লোক ছিলেন। 'মাধব-সুলোচনা' নামে একখানি গদ্যপদ্যময় নাটক ও 'স্বর্ণ-সিন্দূর সিংহ' বা 'গোরলাল সিংহ' নামে একখানি প্রহসন বাঙ্গালায় রচনা করিয়াছিলেন। পৌরাণিক শাস্ত্র আলোচনায় তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। বহু-ব্যয়ে সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত, মহাপুরাণ, উপ-পুরাণ আদির হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, স্বয়ং নিয়মিতরূপে পুরাণ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃগণকে শুনাইতেন।" আর-এক জায়গায় লিখিয়াছেন, "বাবা একখানি বাঙ্গালা উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, উপন্যাসের নাম দিয়াছিলেন 'বঙ্গবালা'। কয়েক ছত্র পয়ারে উহার ভূমিকা লিখিয়াছিলেন। উহার প্রথম কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইল—

বাঙ্গালীর রণবাদ্য বাজে না বাজে না !
বঙ্গদেশে নাহি হয় সমর-ঘোষণা ॥
রণক্ষেত্রে বীরমদে মত্ত হতজ্ঞান।
হয় নাই বহু দিন বাঙ্গালীসন্তান ॥
এবে বঙ্গজনস্থান নিস্তব্ধ নীরব।
কোন দিকে নাহি আর কোন কলরব ॥
রাজনীতি-আলোচনা দুরূহ ভাবনা।
রাজ্যরক্ষা হেতু চিন্তা, সাম্রাজ্য বাসনা ॥

এ সকল কষ্টকর কার্য্যে বাঙ্গালীরে।
প্রবৃত্ত হইতে আর না হয় সংসারে ॥"'

রামেন্দ্রবাবুর বাবা জেমোয় একটি থিয়েটার করেন; অনেক খরচ করিয়া তাহার সাজ-সরঞ্জাম করেন; 'বেণীসংহার', 'অশ্রুমতী', 'কৃষ্ণকুমারী'[৬] প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নাটকের অভিনয় হয়। তিনি নিজে 'দ্রৌপদীনিগ্রহ' নামে একখানি ছোটো নাটক লিখিয়া অভিনয় করেন। অভিমন্যুবধ অবলম্বন করিয়া আর-একখানি নাটক লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানির আর অভিনয় হয় নাই।

এরূপ কাব্যামোদী পরিবারে যিনি জন্মিয়াছিলেন, যাঁহার বাল্যকাল কাব্যচর্চায় অতিবাহিত হইয়াছিল, তাঁহার সকল কার্যেই, সকল লেখায়ই, সকল বক্তৃতায়ই যে কাব্যের গন্ধ থাকিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কী?

লোকে বলে, রামেন্দ্রবাবু Nationalist ছিলেন। এ দেশহিতৈষিতা তিনি নেতাদের নিকট পান নাই। কারণ, নেতাদের সহিত তিনি বড়ো একটা মিশিতেন না। কলেজ, ঘর আর সাহিত্য-পরিষদ্, এই তাঁহার স্থান ছিল। সুতরাং তাঁহার মধ্যে স্বদেশহিতৈষিতার এই বীজ অন্যত্র খুঁজিতে হইবে। আমরা তাহা খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি। 'বঙ্গবালা' উপন্যাসের ভূমিকার কয়েকটি ছত্র তুলিয়া রামেন্দ্রবাবু বলিতেছেন—

"এই উক্তি তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে বাহির হইয়াছিল। স্বদেশের কথা কহিবার সময় তাঁহার কণ্ঠস্বরের বিকৃতি ও লোমহর্ষ ঘটিত। স্বভাব-প্রদত্ত মেঘমন্দ্র স্বরে উদ্দীপনার ভাষায় তাঁহার অষ্টমবর্ষীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রটির মনে স্বদেশভক্তি সঞ্চারিত করিবার জন্য কতই না প্রয়াস পাইতেন।"[৭]

রামেন্দ্রবাবু জানিতেন যে, তিনি উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই বংশের মতো কার্য না করিলে তাঁহাকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। তাঁহার বাপদাদা দেবতার মতো লোক ছিলেন, তিনিও দেবতার মতো হইবার চেষ্টা করিতেন, এবং তাঁহাদের উপদেশ অনুসারে কার্য করিবার চেষ্টা করিতেন। তাই তিনি এত লোকের ভক্তির ও স্নেহের ভাজন হইয়াছিলেন। তাই বলিয়াছিলাম, 'বাপ্‌কা বেটা, সিপাইকা ঘোড়া, কুচ্ নহী, তব্‌বী থোড়া।'

নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত 'আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর' (১৯২০) থেকে সংকলিত ॥

পুরানো বাংলার একটা খণ্ড

১৯২৩ সালের এপ্রেল মাসের শেষে আমি ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য যে পুষ্করিণী ও হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য দুইটি পান্থশালা, মহামহিম রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর [লালগোলা রাজ] নির্মাণ করাইয়া রাখিয়াছিলেন তাহার প্রতিষ্ঠার্থ জেমোগ্রামে যাই। ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাদাস ত্রিবেদী মহাশয় আমার আতিথ্যের ভার লন। শুক্র, শনি, রবি, সোম চারি দিন তাঁহার বাড়িতে থাকি। নিজের বাড়ি থাকিলে যতটা স্বচ্ছন্দতা লাভ করা যায় ত্রিবেদীমহাশয়ের বাড়িতে তাহা অপেক্ষা অধিক বৈ অল্প স্বচ্ছন্দতা পাই নাই। তাঁহার চাকরটিকে কখনো ভুলিতে পারিব না। সে আমার খুব যত্ন করিয়াছিল। শনিবার শ্রীযুক্ত বাবু পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮৬৬-১৯২৩ খৃ.] এবং শ্রীযুক্ত বাবু জলধর সেন [১৮৬০-১৯৩৯ খৃ.] ঐ বাড়িতে বাসা পান এবং রবিবারে স্বয়ং লালগোলার রাজাও ঐখানেই আসেন কিন্তু দুর্গাদাসবাবুর যত্ন ভাগ হইয়া গেলেও যেন আমাদের সকলেরই উপর বর্ধিত হইয়াছিল। দারুণ রৌদ্র ১০টা হইতে ৫টা পর্যন্ত, ঘরের বাহির হওয়া যায় না। তাহাতে রাঢ়দেশ ভয়ানক টানের দেশ, তথাপি আমরা ক'দিন বেশ সুখেই ছিলাম। আতিথ্যের জন্য প্রচুর আয়োজন হইয়াছিল; শুদ্ধ যে ত্রিবেদী-মহাশয়ের বাড়ি তাহা নহে জেমোর সকল বাড়িতেই বিপুল আয়োজন হইয়াছিল। মোটরকার সমস্ত সময়ই মোতাএন থাকিত। যাহার যেখানে ইচ্ছা লইয়া যাইত।

রবিবার ৫টার সময় রামেন্দ্রবাবুর স্মৃতি প্রতিষ্ঠা। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী [১৮৬০-১৯৩০ খৃ.], লালগোলার রাজা বাহাদুর, আরো অনেক অনেক স্থানীয় ও জেলার বিখ্যাত লোক উপস্থিত ছিলেন। প্রায় দুই হাজার লোক পুষ্করিণী ও পান্থনিবাসের মধ্যস্থলে মিলিত হইয়াছিলেন। স্থানটি অতি মনোরম। কান্দির স্কুলের একটু দক্ষিণে একটি ছোটো খাল— খালের উপর একটি পুল— পুলের একটু দক্ষিণে পান্থশালা ও তাহার দক্ষিণে পুষ্করিণী। মাঠ তিন দিকে ধু ধু করিতেছে— উত্তরে স্কুল কোর্ট কাছারি ডাকবাংলা ও কয়েকজন উকিলের বাড়ি। শামিয়ানার নিচে বেঞ্চ ও চেয়ার সাজানো। কিন্তু চারি পাশে বেশি লোকই দাঁড়াইয়া।

রৌদ্রে প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হইয়াছিল, রৌদ্র পড়িল, বেশ ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে লাগিল। বক্তৃতা অনেকেই করিয়াছিলেন, আমি শুদ্ধ তাঁহার প্রতিভার কথাই বলি। বক্তৃতাগুলি সবই বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। রামেন্দ্রবাবুর দেশের লোক তাঁহাকে খুবই ভালোবাসিত। আমার এক-এক বার বোধ হইতে লাগিল তিনি যেন আমাদের মধ্যেই আছেন। পান্থনিবাসের দোয়ার খোলা হইলে খানিকক্ষণ সেখানে থাকিয়া আমরা আপন আপন স্থানে গেলাম।

রামেন্দ্রবাবু জীবিত থাকিতে আমার অনেকবার কান্দি যাইতে ইচ্ছা হইয়াছিল। তাঁহাকে যাইবার কথা বলিয়াও ছিলাম, কিন্তু ইচ্ছা ইচ্ছাই থাকিয়া যায়, ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। তাঁহার স্মৃতি রাখিতে আমায় জেমোকান্দি যাইতে হইবে আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই।

বাষট্টি বৎসর পূর্বে আমার দাদা ৺নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু [১৮৩৫-৬২ খৃ.] কান্দির হেডপণ্ডিত ছিলেন। তখন কান্দির ইস্কুল অ্যাংলো সংস্কৃত ইস্কুল ছিল। হেডমাস্টার ও হেডপণ্ডিত প্রায় সমান বেতন পাইতেন। আমার এ বি সি শিক্ষা কান্দির ইস্কুলেই হয়। আমরা প্রায় একবৎসর কান্দিতে ছিলাম। তখন আমার বয়স ৯ বৎসর, খুব ঘুরিয়া বেড়াইতাম— সব জায়গায়ই যাইতাম। নানা বাগান হইতে মায়ের জন্য পূজার ফুল তুলিতাম— নানা পুষ্করিণী-স্নান করিতাম। সে-সকল কথা আমার স্মৃতিপটে এখনো বিদ্যমান রহিয়াছে। তাই শেষ বয়সে কান্দি যাবার জন্য আমার এই ঝোঁক। গিয়া দেখিলাম কান্দির অনেক পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। আগে রাধাবল্লভের বাড়ির চারি দিকেই শহর ছিল— এখন আদালতের চারি দিকে শহর হইয়াছে— আগে যেখানে মাঠ ধান বন ছিল এখন সেখানে কোটাবাড়ি হইয়াছে আর যেখানে অনেক কোটাবাড়ি ছিল সেখানটায় কোটাবাড়ি আছে। কিন্তু বড়ো বেমেরামত আছে। পুকুরগুলি প্রায় দামে ঢাকিয়া গিয়াছে। রাধাবল্লভের নহবৎখানা পড়িয়া গিয়াছে। রাজাদের যে প্রকাণ্ড বাড়ি ছিল তাহা পড়িয়া গিয়াছে— খানিক খানিক জায়গা লইয়া নূতন বাড়ি হইয়াছে। নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড বাগান ছিল তাহাতে দুইটা পুষ্করিণী ছিল জগন্নাথের মন্দির ছিল আর কত যে ফুল গাছ ছিল বলা যায় না। বাগানের পাঁচিলের কোথাও কোথাও চিহ্ন আছে,

জগন্নাথ দেব কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। বাগান ভাঙিয়া বাজার হইয়াছিল এখনো আছে। শহরটা বাগানের দক্ষিণে অনেক দূর বাড়িয়া গিয়াছে।

আমরা যে বাড়িটিতে ছিলাম সে বাড়িটি ঠিক তেমনিই আছে। একজন সম্ভ্রান্ত উকিল এখন সেই বাড়িতে থাকেন। আমরা যেদিন যাই সেদিন তাঁহার পরিবারেরা বাড়ি ছিলেন না। তিনি আমাদের অবাধে সকল ঘর ঘুরিয়া বেড়াইতে দিলেন, ছাতে উঠিতে দিলেন। ৬২ বৎসরের পর সেই বাড়ি সেই ভাবে আছে দেখিয়া আমার ভারি আনন্দ হইল— বোধ হইল যেন আবার সেই ছেলেবেলায় সেই সুখের দিনে ফিরিয়া আসিলাম। পাশের বাড়িগুলিও ঠিক সেই রককই আছে।

ইস্কুলে আসিয়া অ্যাডমিসন রেজিস্টার দেখিলাম। তখন আমার নাম ছিল শরৎনাথ ভট্টাচার্য, সেই নামেই আমার ভরতি হইতে হইয়াছিল। আমার ভায়েরাও সেই দিনে ভরতি হইয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে আমাদের এক সহাধ্যায়ী জুটিয়া গেলেন— তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যগোপাল হাজরা। পরস্পর আলাপ হইল, আমরা দুজনে খুব প্রীত হইলাম। তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া আমাদের পুরানো বেড়াইবার জায়গাগুলি অনেক দেখাইলেন। তিনিও এখন পেন্সনার। কিন্তু তিনি আমার মতো ভবঘুরে হন নাই। তিনি কান্দির আদালতেই চিরদিন চাকরি করিয়াছেন এবং সেইখান হইতে পেন্সন লইয়াছেন। আর দশ দিন থাকিলেও বোধ হয় আমাদের সব পুরানো জায়গাগুলি দেখা হইত না। কিন্তু সকলে যেদিন চলিয়া আসিলেন আমাদেরও সেই দিনই চলিয়া আসিতে হইল। কলিকাতা হইতে ৩১ জন সাহিত্যসেবী রামেন্দ্রের স্মৃতিরক্ষায় গিয়াছিলেন। সকলেই রামেন্দ্রের আত্মীয় সুতরাং আমারও আত্মীয়। ইঁহারাও সব জেমোয় ছিলেন। ও ক'দিন জেমো যেন উৎসবময় হইয়া গিয়াছিল। সব রাজারাই বিপুল আয়োজন রাখিয়াছিলেন। সবাই বিশেষ রূপ আতিথ্য করিয়াছিলেন— আহারের সময় ৬০/৬৫টা বাটি প্রত্যেক পাতে পড়িত কিন্তু যেদিন রাধাবল্লভের প্রসাদ পাওয়া যায় সেদিন আরো বেশি— সেদিন ৭৫ হইতে ১০০ পর্যন্ত বাটি ছিল— অথচ রাধাবল্লভ নিরামিষাশী লঙ্কা খান না হলুদ খান না।

পুরানো বাংলার একটা খণ্ড এখনো এখানে আছে বলিয়া মনে হইল।

এখানে একজন লোকের সঙ্গে দেখা হইল— তাঁহার নাম সোজাসুজি শরৎ পণ্ডিত[৮] বিদূষকের এডিটার, তিনি মুখে মুখে পদ্য লিখেন, তাঁহার কাগজও পদ্যে। তিনি এক আধারে এডিটার, প্রুফ রিডার, কম্পোজিটার, ডেস্পাচার— তিনি কেবল সবস্ক্রাইবার নন। সেকালে ভাঁড়ের কথা শুনিয়াছিলাম, ইনি সেই ক্লাসের ভাঁড়। কিন্তু ইনি খুব তেজস্বী ব্রাহ্মণ, বেশ মিষ্ট করিয়া সকলকেই হক কথা শুনাইয়া দেন। বেচারার জাঁকজমক কিছুই নাই— সদানন্দ পুরুষ।

জেমো ও কান্দি হইতে ফিরিবার সময় মনটা বেশ একটু খারাপ হইয়া গিয়াছিল।

আরো এক কথা— সোমবার সকালে কান্দি ইস্কুলের পারিতোষিক দান। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সভাপতি আমায় আহ্বান করায় আমি কৃতার্থ মনে করিলাম। কান্দির লোকে মাস্টারমহাশয়েরা বিশেষ হেডমাস্টারবাবু বেশ আয়োজন করিয়াছিলেন। ছেলেদের রিসাইটেশন গান পাঠ সব বেশ হইয়াছিল। হাজরা পাড়ার একটি ছেলে 'ব্রজ গোপিকানন্দ' ধুয়া ধরিয়া একটি গান গাহিল তাহা আমার কানে এখনো লাগিয়া আছে। রামেন্দ্রবাবুর দৌহিত্র 'রে সতী রে সতী কান্দিল পশুপতি' এই গানটি গাহিল। তাহাও বেশ হইয়াছিল। মহারাজা ছেলেদের অনেক উপদেশ দিলেন। পাঁচকড়ি ও আমি ইংরাজি ছাড়িয়া বাংলা পড়িতে বলিলাম। মহারাজা আমাদের প্রতিবাদ করিলেন। সকালটা বেশ কাটিয়া গেল।

২রা জুলাই, ১৯২৩
'বঙ্গশ্রী'
মাঘ, ১৩৪০ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য।

১. সূত্র

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর জন্ম মুর্শিদাবাদ জেলার জেমোয়, ২০ আগস্ট ১৮৬৪ খৃ.। বাবা গোবিন্দসুন্দর, মা চন্দ্রকামিনী দেবী।

শিক্ষার সূচনা জেমো গ্রামের ছাত্রবৃত্তি পাঠশালায় ১৮৭০ খৃ.: কান্দি ইংরেজি স্কুল থেকে এনট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম ১৮৮১ খৃ.; প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ. এ.-তে দ্বিতীয় ১৮৮৩ খৃ. এবং বি. এ. ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রিতে প্রথম ১৮৮৬ খৃ.; ন্যাচারাল অ্যাণ্ড ফিজিক্যাল সায়েন্সে এম. এ.-তে প্রথম ১৮৮৭ খৃ.; প্রেমচাঁদ বৃত্তি ১৮৮৮ খৃ.।

শিক্ষকতা: রিপন কলেজে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার অধ্যাপক ১৮৯২ খৃ., রিপন কলেজের অধ্যক্ষ ১৯০৩ খৃ. থেকে মৃত্যু পর্যন্ত।

প্রতিষ্ঠা-বর্ষ (১৮৯৪ খৃ.) থেকেই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের যোগাযোগের সূচনা। সভ্য হবার কিছু দিনের মধ্যে অন্যতর সম্পাদক নিযুক্ত হন। পত্রিকাধ্যক্ষ, সম্পাদক, সহকারী সভাপতি এবং সভাপতি (১৩২৬ ব.) রূপে আমৃত্যু পরিষদের কর্মধারার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরিষদের 'বিশিষ্ট সদস্য' নির্বাচিত হন ১৩২১ বঙ্গাব্দে। তাঁর পঞ্চাশ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ায় পরিষদের পক্ষ থেকে আয়োজিত সংবর্ধনায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন ৫ ভাদ্র, ১৩২১ ব.। পরিষদের নিজস্ব ভবন তৈরির জন্য 'রামেন্দ্রসুন্দর ভিক্ষাপাত্র হস্তে দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেও সংকোচ বোধ করেন নাই।' (সা-সা-চ ৭০, পৃ. ৪৯)।

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে রবীন্দ্রনাথের পরামর্শে বাংলা দেশ ও বাঙালি জাতি সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞাতব্য কেন্দ্রীভূত করা এবং এই কাজে দেশব্যাপী উৎসাহ জাগানোর উদ্দেশ্যে রামেন্দ্রসুন্দর বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের আয়োজন করেন। প্রথম অধিবেশন হয় ১৭-১৮ কার্তিক ১৩১৪ ব., কাশিমবাজারে; সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ।

রচনাবলী: 'প্রকৃতি' (১৮৯৬ খৃ.), 'জিজ্ঞাসা' (১৯০৪ খৃ.), 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' (১৯০৬ খৃ.), 'মায়াপুরী' (১৯১১ খৃ.), 'কর্ম-কথা' (১৯১৩ খৃ.), 'চরিত-কথা' (১৯১৩ খৃ.), 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' (১৯১৪ খৃ.), রামেন্দ্রসুন্দরের

মুখ থেকে শুনে বিপিনবিহারী গুপ্ত নিজের ভাষায় লেখেন 'শব্দ-কথা' (১৯১৭ খৃ.), 'বিচিত্র জগৎ' (১৯২০ খৃ.), 'যজ্ঞ-কথা' (১৯২০ খৃ.), 'নানা-কথা' (১৯২৪ খৃ.), 'জগৎ-কথা (১৯২৬ খৃ.) প্রভৃতি।

মৃত্যু ৬ জুন ১৯১৯ খৃ.। "অন্তিমকালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রোগীর শয্যাপার্শ্বে ছিলেন, তিনি বড় আক্ষেপেই বলিয়াছিলেন, 'আমাদের চক্ষের সম্মুখে বিদ্যার একটা বড় জাহাজ ডুবিয়া গেল।" (সা-সা-চ ৭০, পৃ. ৮৩)।

১. মীমাংসা দর্শনের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কুমারিলভট্ট, জীবৎকাল খৃস্টীয় সপ্তম শতক। জন্মস্থান মধ্যভারত, মতান্তরে কামরূপ অঞ্চল। রচিত গ্রন্থ : 'শ্লোকবার্ত্তিক', 'তন্ত্রবার্ত্তিক'।

২. একাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে, ১০৮০ খৃ. বা এর কিছু আগে রচিত সংস্কৃত রূপক নাটক 'প্রবোধচন্দ্রোদয়'-এর লেখক কৃষ্ণমিশ্র। বিভিন্ন মানবিক প্রবৃত্তিকে নাটকে চরিত্র-রূপ দেওয়া হয়েছে। মহামোহের পরাক্রমে রাজ্যচ্যুত বিবেক ও উপনিষদ্ দেবীর সন্তান প্রবোধোদয় মহামোহকে পরাস্ত করে— এই বিবরণে লেখক নৈতিকশক্তি ও আস্তিক দর্শনের শ্রেয়ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। চন্দেল্লরাজ কীর্তিবর্মা চেদিপতি কর্ণকে পরাস্ত করার পরে কীর্তিবর্মার অমাত্য অথবা জ্ঞাতি গোপালের আদেশে নাটকটির অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। অহংকার চরিত্রের উক্তি—

গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়াপুরী
ভূরিশ্রেষ্ঠক নাম ধাম পরমং তত্রোত্তমো নঃ পিতা।

'অনুত্তম (শ্রেষ্ঠ) গৌড় রাজ্য সেখানে (যে) নিরূপম রাঢ়াপুরী (যা) যথার্থ বহু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পরম আশ্রয় স্থান সেখানে (যাঁর নাম) উত্তম (অথবা সেখানে যিনি উত্তম তিনি) আমাদের বাবা।'

এবং নাটকের অন্যান্য উল্লেখ অনুসরণে কৃষ্ণমিশ্রকে অনেকে 'রাঢ়ের সন্তান' মনে করেন। দ্র. রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, "কৃষ্ণমিশ্র কি রাঢ়ের সন্তান ছিলেন ?" সা-প-প, বর্ষ ৮৬ সংখ্যা ১, পৃ. ২৮-৪১ ; সুকুমার সেন, "রাঢ়াপুরী ও ভূরিশ্রেষ্ঠক", সা-প-প, বর্ষ ৮৬ সংখ্যা ২-৩, পৃ ১-২।

৩. অনুবাদ : মৃত্যু যেন চুলের মুঠি ধরে আছে।

৪. 'স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী', "রামেন্দ্র-রচনাবলী" ৬ষ্ঠ খণ্ড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ১৩৬৩ ব., পৃ. ২৫৮-২৬৬।

৫. 'পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকা', "রামেন্দ্র-রচনাবলী", চতুর্থ খণ্ড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৫৭ ব., পৃ. ৫৩৯, ৫৪২-৩।

৬. রামনারায়ণ তর্করত্নের 'বেণীসংহার নাটক' (১৮৫৬ খৃ.), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অশ্রুমতী নাটক' (১৮৭৯ খৃ.), মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' (১৮৬১ খৃ.)।

৭. ৫ সংখ্যক সূত্র দ্র.

৮. শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (১২৮৭-১৩৭৫ ব.) দাদাঠাকুর নামে পরিচিত ছিলেন। 'জঙ্গীপুর সংবাদ' ও 'বিদূষক' পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। মফস্বল থেকে পত্রিকা চালিয়ে এবং নির্ভীক সংবাদিকতায় সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। তিনি বেঁচে থাকতেই তাঁকে নিয়ে 'দাদাঠাকুর' চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছিল। নলিনীকান্ত সরকার লিখেছেন, "জেমোকান্দিতে রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতিরক্ষা-সভায় সৌভাগ্যক্রমে আমিও নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, গণপতি সরকার, কিরণচন্দ্র দত্ত, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নরেন্দ্র দেব, সুধীরচন্দ্র সরকার, চারু রায়, রামকমল সিংহ প্রভৃতির সঙ্গে একই দলভুক্ত হয়ে কলকাতা থেকে আমিও জেমোকান্দিতে গিয়েছিলাম। … দাদাঠাকুর বোধ হয় এসেছিলেন তাঁর বাসস্থান রঘুনাথগঞ্জ থেকে। কেবল মহা-মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কেন, দাদাঠাকুর এই ক'টি দিন আমাদের সকলকেই রসধারায় মাতিয়ে তুলেছিলেন।" দ্র. 'দাদাঠাকুর', অষ্টম মুদ্রণ, কলকাতা, ১৩৮০ ব., পৃ. ১৪৮-৪৯।

২. পাঠ-প্রসঙ্গ

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সম্পর্কে শাস্ত্রীমশায় দুটি প্রবন্ধ লেখেন :

১. 'রামেন্দ্রবাবু', সাহিত্য, ভাদ্র ১৩২৬ ব.। পরে নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত 'আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর' (১৯২০ খৃ.) বইয়ে সংকলিত।

২. 'পুরাণ বাংলার একটা খণ্ড', বঙ্গশ্রী, মাঘ ১৩৪০ ব. ।

প্রবন্ধ দুটি প্রকাশকালের অনুক্রম অনুসারে 'রামেন্দ্রসুন্দর প্রসঙ্গ' শিরোনামে ছাপা হল। মূল প্রবন্ধের শিরোনাম উপ-শিরোনাম রূপে রাখা হয়েছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৫তম বর্ষের মুদ্রিত কার্যবিবরণ থেকে জানা যায় রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ ও তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য ২১ আষাঢ় ১৩২৬ ব., ৬ জুলাই ১৯১৯ খৃ. সন্ধ্যা ৬টায় অনুষ্ঠিত পরিষদের প্রথম বিশেষ অধিবেশনে সভাপতি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী "স্বর্গীয় ত্রিবেদী মহাশয়ের বংশ-পরিচয়

প্রদান করিয়া একটি অভিভাষণ পাঠ করেন।" (দ্র. সা-প-প, ১৩২৬ ব.) সাহিত্য পত্রিকায় 'রামেন্দ্রবাবু' নামে প্রকাশিত এই প্রবন্ধের শেষে "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রামেন্দ্রসুন্দরের শোক-সভায় পঠিত" উল্লেখ ছিল। নলিনী-রঞ্জন 'আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর'-এর প্রথম সংস্করণের 'নিবেদন'-এ বলেছেন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে উৎসাহ পেয়ে এই সংকলন প্রকাশের প্রস্তাব নিয়ে তিনি শাস্ত্রীমশায়ের কাছে যান। "তিনিও ঐ সুরে সুর মিলাইয়া বলিলেন, 'এগুলি সংগ্রহ ও সম্পাদন করে বের করতে পারলে খুব একটা ভাল কাজ হয়। আর এটার প্রকাশ দ্বারা রামেন্দ্রের স্মৃতি-রক্ষার কাজটাকেও এগিয়ে দেওয়া হবে।' এই বলিয়া তিনি তাঁহার লিখিত প্রবন্ধটি আমায় প্রকাশের অনুমতি দিলেন।"

পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ এবং বইয়ে সংকলিত পাঠ কোথাও কোথাও পৃথক। এখানে বইয়ের পাঠ নেওয়া হয়েছে। পত্রিকার পাঠান্তর দেখানো হল।

নিচের উল্লেখগুলির শুরুতে ব্যবহৃত সংখ্যা দুটির প্রথমটি পৃষ্ঠা এবং দ্বিতীয়টি ছত্র সংখ্যা নির্দেশক।

বর্তমান পাঠের সূচনার আগে পত্রিকায় এই দুটি বাক্য ছিল :

"আমরা আজ যে জন্য এখানে একত্রিত হইয়াছি, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। সে বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক দেখি না।"

৭৯/৫ : "তাঁহার এই প্রিয় সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে আমাদের সহিত মিলিত হইবেন।" পত্রিকার পাঠ : "...তাঁহার এই প্রিয় মন্দিরে আমাদের সহিত মিলিত হইবেন।"

৮০/১৪ : "শোকে মনের অনেক ময়লা কাটিয়া যায়।" পত্রিকার পাঠ : "শোকে মনের অনেক মলা কাটিয়া যায়।"

৮১/৮ : "শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতির মূর্তি আছে।" পত্রিকার পাঠ : "শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতির মন্দির আছে।"

৮১/১০ : "...দূরে আবার কতকগুলি মন্দির।" এর পর পত্রিকায় আছে : "কতক মেরামত, কতক বেমেরামত,... ।"

৮১/১৪ : "পুতুলগুলি উপর হইতে নিচে পর্যন্ত এক এক সারিতে গাঁথা।" পত্রিকার পাঠ : "পুতুলগুলি উপর হইতে নীচ এক এক সারিতে গাঁথা।"

৮১/২২ : "...বোধ হয় যেন পৃথিবী একখানি রাঙা চেলি পরিয়া বউ সাজিয়াছেন।" পত্রিকার পাঠ : "...বোধ হয় যেন পৃথিবী রাঙা চেলি একখানি পরিয়া বৌ সাজিয়াছেন।"

৮১/২৩ : "কেবল তাঁহার সাধের সাহিত্য-সম্মিলনের জন্য কয়েকবার এ-জেলা ও-জেলা বেড়াইয়াছিলেন।" পত্রিকার পাঠ : "কেবল তাঁহার সাধের সম্মিলনের জন্য এ জেলা ও জেলা কয়েকবার বেড়াইয়াছিলেন।"

৮২/২৭ : "...বিদ্যা প্রকাশ করিবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইতেন না।" পত্রিকার পাঠ : "বিদ্যা প্রকাশ করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন না।"

৮৩/৪ : "লিখিয়াছিলেন এক নাটক, তাহার নাম প্রবোধচন্দ্রোদয়।" পত্রিকার পাঠ : "লিখিয়াছিলেন এক নাটক। যে কেহ সে নাটক পড়িয়াছে,..."

৮৩/৬ : "তিনি দার্শনিক ছিলেন, তা নয় ;" পত্রিকার পাঠ : "তিনি শুধু দার্শনিক ছিলেন, তা নয় ;"

৮৩/১০ : "মাসিকপত্রে কতকগুলি প্রবন্ধ ও কয়েকখানি বই।" পত্রিকায় আছে : "মাসিকপত্রে কতকগুলি প্রবন্ধ। একখানি বই লিখিয়াছেন— বিচিত্র প্রসঙ্গ। তাহাও শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয় ঠুকরাইয়া বাহির করিয়াছেন।"

৮৩/১৮ : "ত্রিবেদীমহাশয়েরা ঝগড়া মিটাইবার চেষ্টা করিতেন, উস্কাইয়া দিতেন না।" পত্রিকার পাঠ : "...ত্রিবেদী মহাশয়েরা ঝগড়া মিটাইবার চেষ্টা করিতেন, উস্কাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন না।"

৮৩/২৬ : "তাঁহাকে আমরা সাহিত্য-পরিষৎ হইতে অভিনন্দন দিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম," পত্রিকার পাঠ : "যখন তাঁহাকে আমরা অভিনন্দন দিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম,"

৮৪/১১ : "তাঁহার হৃদয় কত কোমল ছিল...তাঁহার প্রতিকৃতি দিলাম।" অনুচ্ছেদটি বইতে নতুন সংযোজন।

৮৫/১ : "কেহ কেহ নাটক লিখিয়াছেন," পত্রিকার পাঠ : "কেহ নাটক লিখিয়াছেন।"

৮৭/১৬ : "বঙ্গবালা উপন্যাসের ভূমিকার কয়েকটি ছত্র তুলিয়া…" পত্রিকার পাঠ : "বঙ্গবালা উপন্যাসের ভূমিকার পয়ার কয়েকটি তুলিয়া…"

৮৭/২৫ : "দেবতার মতো হইবার চেষ্টা করিতেন," এর পরে পত্রিকায় আছে : "সকল বিষয়েই তাঁহাদের অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিতেন,…"

৮৭/২৫ : "এবং তাঁহাদের উপদেশ করিতেন।" এর পরে পত্রিকায় ছিল : "তাই তিনি এত লোকের উপদেশ অনুসারে কার্য করিবার চেষ্টা করিতেন।"

অর্দ্ধেন্দু-কথা
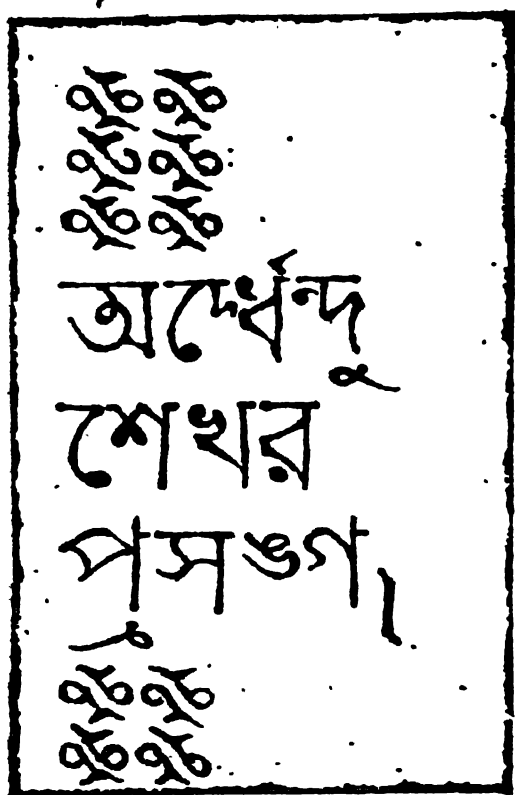
যাঁহারা আজ রাত্রে আমায় 'অর্দ্ধেন্দু-কথা'র বোধনতলায় বসাইয়া এই মহা-যজ্ঞের পুরোহিত করিয়াছেন, তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধির বা বিচার-শক্তির বিশেষ প্রশংসা করিতে পারি না। কারণ, অর্দ্ধেন্দুবাবু হাসির ফোয়ারা ছুটাইতেন— তাঁহার ভাবভঙ্গি পোশাক পরিচ্ছদ, সুরলয় সব জিনিসেই হাস্যরস বা ভাঁড়ামি ফুটিয়া পড়িত ; আর আমি চিরদিন ইস্কুলমাস্টারি করিয়া আসিয়াছি, আমাকে সর্বদাই গম্ভীর হইয়া থাকিতে হইত, অথবা গম্ভীর হইতেও গম্ভীরতর গম্ভীরতম হইয়া থাকিতে হইত— কারণ আমি ইস্কুলমাস্টারও ছিলাম না, ছিলাম ইস্কুল-পণ্ডিত। যে হেপ্‌লামিতে

অর্দ্ধেন্দুবাবুর সুখ্যাতি ধরিত না, সেরূপ ছেপ্‌লামি আমি করিলে, মার খাইতে হইত। তাই বলিতেছিলাম, এ কাজের ভারটা আমার উপর না দিলেও হইত।

তাহার পর আর-এক কথা— গ্রহ, উপগ্রহ আকাশে ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু কখনো-না-কখনো তাহাদের orbit cross করে; আমরা দু জনেই যদিও কলিকাতার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতাম, আমাদের orbit কদাচ কখনো cross করে নাই। সুতরাং তাঁহাকে বুঝিবার সুযোগ আমার হয় নাই। কখনো কখনো থিয়েটারে যাইতাম। কিন্তু কে যে কোন্ পার্ট লইয়াছে তাহা জানিবার সুযোগও হইত না, ইচ্ছাও ছিল না। তবে অর্দ্ধেন্দুবাবুর যশ বাল্যকাল হইতেই শুনিয়া আসিতেছি। ১৮৭৬/৭৭ সালে চিৎপুর রোডে মল্লিকবাবুদের বাড়ির সামনে একটা বড়ো বাড়িতে 'নীলদর্পণ' দেখিতে গিয়াছিলাম। সেদিনকার কথা বেশ মনে পড়ে। সেদিনকার উড্ সাহেবটি খুব ভালো হইয়াছিল। সেদিনকার কথা বেশ মনে পড়ে— যেন সব চোকের উপর ভাসিতেছে। অনেক সময় থিয়েটারে দেখিতাম, অর্দ্ধেন্দুবাবু ধুতি ও চাদর গায়ে, ভুঁড়িটি খুলিয়া নানারূপ রঙ্গভঙ্গ করিতেছেন, আর থিয়েটারসুদ্ধ লোক হাসিতেছে। একবারের একটা কথা বড়োই মনে পড়িতেছে— সেটা আলবার্ট হলে। তিলক [বালগঙ্গাধর টিলক, ১৮৫৭-১৯২০ খৃ] আসিয়াছেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য আলবার্ট হলে সভা হইয়াছে, স্টেজ হইয়াছে, নানারূপ আমোদ প্রমোদ ও কৌতুক হইতেছে। অর্দ্ধেন্দুবাবু একাই একটি ডিস্পেন্‌সরি সাজিয়াছেন। অতি কাতর স্বরে ক্ষীণ কণ্ঠে চিঁ চিঁ করিতে করিতে ডাক্তারের কাছে গিয়া আপনার কষ্টের কথা বলিতেছেন; আবার ডাক্তার হইয়া ভঙ্গি করিয়া রোগী দেখিতেছেন, রোগীকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আর টেবিল হইতে কাগজ লইয়া প্রেস্কৃপ্সন লিখিতেছেন: আবার কম্পাউণ্ডার হইয়া 'এসো' বলিয়া রোগীকে ডাকিতেছেন আর ঔষধ দিতেছেন— বলিতেছেন, "এ কাগজখানি হারিও না, আবার যখন আসবে কাগজখানি হাতে করে এসো।" ঔষধ দিতেছেন কিন্তু সেই এক ক্যাস্টর অয়েল। একজন রোগী চিৎকার করিতে করিতে আসিল, দাঁত কট্‌কটানিতে সে মারা যাইতেছে, সে কখনো মুখে হাত দেয়,

কখনো কাঁদে, কখনো যন্ত্রণায় বসিয়া পড়ে। ডাক্তার হাত দেখিলেন, পেট টিপিলেন, আর ক্যাস্টর অয়েল ব্যবস্থা করিলেন। কম্পাউণ্ডার বলিলেন— এসো। খানিক ক্যাস্টর অয়েল একটা শিশিতে ঢালিয়া দিলেন। রোগী বলিল, "আমার হয়েছে দাঁতে শূল, আপনি জোলাপ দিলেন যে ?" কম্পাউণ্ডার খাদে গলা তুলিয়া বলিলেন, ওতেই আরাম হবে।" এইরূপ কত রোগী আসিল—সবই এক সুর, একই রকম চিকিৎসা, একই রকম ঔষধ, হলসুদ্ধ লোক হাসিয়া অস্থির।

ডিস্পেন্‌সরি-কাণ্ড শেষ হইয়া গেলে অর্দ্ধেন্দুবাবু তিন তোতলার নকল করিতে বসিলেন। একটা তেমাথার পথে একটা রকের উপর দুই তোতলা বসিয়া আলাপচারি করিতেছে, এমন সময় আর-একজন তোতলা আসিয়া তাঁহাদের দু জনকে জিজ্ঞাসা করিল, "ম— ম— মশায়, মাঝের পাড়ার ম— ম —মহিম চক্রবর্তীর বাড়ি কোথায় যাব ?" সে লোকটা "ম"-এ তোতলা, ম বলিতে গেলেই ম— ম— ম— মকার। দু জনের মধ্যে একজন বলিল, "এই যে বাঁ— আ দিকের রা— রাস্তা দেখছেন, ঐ রাস্তা ধরে শুঁ— উঁ— উঁ— ড়িদের পুকুর দেখতে পাবেন। সেই পুকুরের বাঁ— আঁ দিকে সি— ই— ইংগি ওয়ালা বাড়ি চ— অ— অক্রবর্তী মশায়ের।" এ লোকটা অনুনাসিকে তোতলা, আর তালব্য বর্ণে তোতলা। যে আসিয়াছিল, সে লোকটা মনে করিল আমায় ভেঙচাইতেছে। সে বড়োই রাগ করিয়া উঠিল, আর বলিল, "ম— ম— শায়, আমা— মারই যেন গলার দোষ আছে। তাই বলে কি ম— ম— শায়ের তামা— মা— আশা করা উচিত ?" তাই শুনিয়া তৃতীয় তোতলা, মধ্যস্থ করিতে আসিয়া বলিল, "মশায় র্ র্ র্ রাগই কর্ র্ রেন কেন ? আপনা— র্— র্ যেমন একটু গলার— র্— র্ দোষ আছে, এনার্ রো তেমনি একটু আছে।" হলসুদ্ধ লোক তো হাসিয়া অস্থির।

আমি অল্পবিস্তর অর্দ্ধেন্দুবাবুর যাহা-কিছু দেখিয়াছিলাম, তাহাতেই তিনি যে একটা খুব প্রতিভাশালী লোক, তাহা আমার বেশ জ্ঞান হইয়াছিল। থিয়েটারের যাহাতে ভালো হয়, তাহারই জন্য তিনি অকাতরে পরিশ্রম করিতেন, নিজের পরিবারের সুখদুঃখের দিকে চাহিয়াও দেখিতেন না, থিয়েটারের আমোদেই মশগুল হইয়া থাকিতেন

—একথা রঙ্গালয়ে দাঁড়াইয়া বলা আমার পক্ষে ধৃষ্টতামাত্র। যাঁহারা রঙ্গালয়ের অধিকারী, যাঁহারা থিয়েটার করেন, যাঁহারা থিয়েটার দেখিতে যান, তাঁহারা সকলেই অর্দ্ধেন্দুবাবুকে জানিতেন, এখনো অর্দ্ধেন্দুবাবুর কথা তাঁহাদের মনে পড়ে। তিনি থিয়েটারে যে-দাঁড়া বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছেন, সে-দাঁড়া অনেক দিন চলিবে, সে-দাঁড়া লোপ হইবে না। যাঁহারা অর্দ্ধেন্দুবাবুর সহিত সর্বদা মিশিতেন, তাঁহার সহিত একহাড় একপ্রাণ ছিলেন, একত্র কাজকর্ম করিতেন, তাঁহাদের অনেকেই এখনো বাঁচিয়া আছেন এবং এখানে উপস্থিত আছেন।

তবে আমার একটি বলিবার কথা আছে। "পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্।"[১] অর্দ্ধেন্দুবাবু যেমন তন্-মন্-ধন দিয়া কেবল রঙ্গালয়েরই সেবা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পুত্র আমাদের পরম বন্ধু ব্যোমকেশ মুস্তফী [১৮৬৮-১৯১৬ খৃ.] মহাশয়ও তন্-মন্-ধন দিয়া সাহিত্যের, বিশেষ সাহিত্য-পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন। একজন থিয়েটারকে, আর-একজন সাহিত্যকে আপনাদের জীবনের ব্রত করিয়াছিলেন। দারিদ্র্যের সহস্র তাড়না সহ্য করিয়াও দু জনেই আপনাদের জীবনব্রত উদ্যাপন করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। বাঙালি দু জনেরই জন্য সমানভাবে কাঁদিতেছে এবং বাঁচিয়া থাকিতে তাঁহাদের ভালোরূপ আদর করিতে পারে নাই বলিয়া আক্ষেপ করিতেছে। হয়তো সাহিত্য-সেবক আরো মিলিবে, থিয়েটার-সেবক আরো মিলিবে ; কিন্তু অর্দ্ধেন্দুর মতো হাস্যরসের রসিক আর-একটি মিলিবে কি না সন্দেহ। কারণ নিরন্ন বাঙালি পেটের জ্বালায় হাসিখুশি ভুলিয়া যাইতেছে। আমরা বাল্যকালে লোকের যেরূপ স্ফূর্তি, হাসির গর্‌রা, ফক্করির আদর দেখিয়াছি, একালে তাহার শতাংশের এক অংশও দেখি না। তখন অন্ন ছিল, তাই অর্দ্ধেন্দুবাবুর মতো লোক অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এখন অন্ন নাই, ঐরূপ লোক আর হইবে না।

বসিবার পূর্বে আমার একটি প্রাণের কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। সেটি এই। আমি একটু একটু নাট্যপ্রিয়। যখন পড়িলাম— নাট্যশাস্ত্রে পড়িলাম— নটগণ কুশীলবদের অংশে জন্মিয়াছেন, তখন আমার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। কিন্তু তাহারই পর-অধ্যায়ে পড়িলাম, ঋষিদিগকে কেরিকেচার করার দরুণ

ঋষিরা শাপ দিলেন, তোমরা শূদ্র হইয়া যাও। হইলও তাহাই। চাণক্য কুশীলবদের শূদ্র বলিয়াই লিখিয়া গেলেন। সেই অবধিই নটেরা সমাজে হেয় হইয়া রহিল।[২]

কিন্তু আজি আপনারা আপনাদের একজন কুশীলবের স্মৃতি রক্ষার জন্য যেরূপ উদারভাবে কার্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে আমার আশা হইতেছে আপনারা আবার আপনাদের পূর্বগৌরব লাভ করিতে পারিবেন, আবার লোকে আপনাদের দেব-অংশ-সম্ভূত বলিয়া মনে করিবে ও আদর করিবে। আপনারা এই উদারভাবে কার্য করিয়া আপনাদের গৌরব বৃদ্ধি করুন, আর দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন।

'মানসী ও মর্ম্মবাণী',
কার্তিক, ১৩২৭ ॥

অর্দ্ধেন্দুশেখর-১

যে-সকল মহারথী বাংলাদেশে নাটকের উৎপত্তি ও স্থিতি বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে ৫ জন খুব বড়ো, প্রথম ৺রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর [১৮৩০-৭৩ খৃ.], দ্বিতীয় ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ [১৮৪৪-১৯১২ খৃ.], তৃতীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় [১৮৬৩-১৯১৩ খৃ.], চতুর্থ ৺অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, পঞ্চম শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু [১৮৫৩-১৯২৯ খৃ.]। ইঁহাদের মধ্যে ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও অমৃতলাল বসু একাধারে নটরাজ ও নাটককার। দীনবন্ধুবাবু ও দ্বিজেন্দ্রলাল কেবল নাটক লিখিয়াছেন মাত্র, কখনো অভিনয় করেন নাই। অর্দ্ধেন্দুবাবু যাবজ্জীবন অভিনয় করিয়া গিয়াছেন, কখনো নাটক লিখেন নাই। কিন্তু দেশের লোকের কাছে পসার-প্রতিপত্তিতে ইনি কাহারো অপেক্ষা হীন নহেন। নাট্যবিদ্যায় ইনি গিরিশবাবুর দক্ষিণ হস্ত এবং অমৃতবাবুর গুরু। ইঁহার পাল্লায় পড়িয়া অনেকে নট হইয়াছেন এবং উত্তমরূপে নটের কার্য শিখিয়াছেন। ইনি একরূপ মূর্তিমান হাস্যরস ছিলেন। ইঁহার চলনে বলনে ভাবে ভঙ্গিতে কথায় ও চাউনিতে হাস্যরস ফুটিয়া পড়িত ; অনেক সময় ইনি গ্রন্থকারকেও ছাপাইয়া হাসি ছড়াইয়া দিতেন। পরের যেটুকু দায়, সেটুকু নকল করিতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি কখনো তোত্‌লা সাজিতেন, কখনো খোনা সাজিতেন, অনেক সময় স্টেজের মধ্যে তামাক সাজিতেন ও খাইতেন, সকলেরই উদ্দেশ্য এক, লোক হাসানো। লোককে হাসাইতে পারিলে অর্দ্ধেন্দুবাবু চরিতার্থ হইতেন, সেইটাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, কিছুরই দিকে তিনি তাকাইতেন না, কেবলই চেষ্টা করিতেন কী করিয়া লোককে খুশি করিবেন ও হাসাইবেন। থিয়েটারগুলিতে তাঁহার অগাধ প্রতিপত্তি ছিল। কোনো থিয়েটারে তিনি সাজিবেন শুনিলে সে থিয়েটারে লোক ধরিত না। ভদ্রলোকের মজলিসেও তাঁহার খুব পসার ছিল, মজলিস জমাইতে তাঁহার মতো লোক আর পাওয়া কঠিন ছিল।

অর্দ্ধেন্দুবাবু খুব বড়ো মানুষ ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার সম্পত্তিরও অভাব ছিল না। তাঁহার কুটুম্বেরা সকলেই কলিকাতার মধ্যে প্রসিদ্ধ

বড়ো মানুষ। সুতরাং তিনি কিছুই না করিলেও হাসিয়া খেলিয়া জীবন কাটাইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু অল্প বয়সেই তিনি নাটকে সাজিতে লাগিলেন, তাঁহার অভিনয় দেখিয়া লোকে মুগ্ধ হইতে লাগিল। অতি অল্প দিনের মধ্যে একই নাটকে তিনি ৭/৮টি পাত্র সাজিতেন, কেহই বুঝিতে পারিত না যে, এক ব্যক্তিই সাজিয়া আসিল। সাহেব সাজিতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন, তাঁহার নামই হইয়াছিল সাহেব। সাহেবেরা যেমন পা ফাঁক করিয়া দাঁড়ায়, পা ও গা নাচায়, বাঁ হাত দিয়া পকেট হইতে রুমাল তুলিয়া লয়, বাঁ হাত দিয়া কপালের ঘাম মুছে, তিনি সেইগুলি সমস্ত করিতে পারিতেন, গলার স্বর ইচ্ছামতো গম্ভীর, ইচ্ছামতো চেরা, ইচ্ছামতো পাতলা, ইচ্ছামতো সরু, ইচ্ছামতো মোটা করিতে পারিতেন। রাজা-রাজড়া হইতে চাকর-বাকর পর্যন্ত তিনি সবই সাজিতে পারিতেন।

সাজে তো সবাই, সাজিতে পারেও অনেকে, নিজে ভাবে নিজে চিন্তায় আর নিজে নিজে আপনার অভিনয় বদলাইয়া ফেলে ; কিন্তু পরকে শিখানো আর-এক ব্যাপার। অর্দ্ধেন্দুবাবুর দৃষ্টিশক্তি খুব ছিল, ওঁর শিষ্যের যদি সেরূপ দৃষ্টিশক্তি না থাকিত, তাহা হইলে তিনি তাকে 'যা তুই পাল্লি নি, তোর দ্বারা হল না' বলিয়া সরাইয়া দিতেন না। সে যতক্ষণ না শিখিত, যতক্ষণ তার দৃষ্টিশক্তি না জন্মিত, ততক্ষণ ছাড়িতেন না। একবার দুই-বার পাঁচ-বার সাত-বারও যদি না হইত, তবুও ছাড়িতেন না। শুনিয়াছি, তিনি বারো বৎসর যোগাভ্যাস করিয়াছিলেন। পঞ্চাশ রকম আসন করিতে পারিতেন। যোগ করিতে গেলে ঘি খাইতে হয়, শস্যের জিনিস অল্প খাইতে হয়, ফলমূল অল্প খাইতে হয়, নুন একেবারে খাইতে নাই। এই প্রকার কঠোর সংযম করিয়া যোগমার্গে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। কতদূর জানি না, পূরক কুম্ভকে কতদূর সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, জানি না, সমাধিতে কতদূর একাগ্রতা জন্মিয়াছিল, জানি না, তাঁর যোগ, হঠযোগ, রাজযোগ, ক্ষয়যোগ কি লয়যোগ ছিল, জানি না। তবে তিনি হঠে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি আবার নূতন রকমের যোগে আসিয়া পড়িলেন, সেটা নটযোগ। চিত্তের একাগ্রতা হইলেই তাহাকে যোগ বলে। নটের কার্যে তাঁহার

চিত্তের একাগ্রতা হইয়াছিল সেই তাঁর যোগ। অন্যান্য অনেক প্রতিভাশালী লোকের মতো তিনিও বলিতেন, যে-কোনো বিষয়ে চিত্তকে লীন করিতে পারিলে তাহাতে মুক্তি হয়। যদি সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা হইতে তফাত হইয়া খানিকটা এমন অবস্থায় থাকিতে পারো, যাহাতে আমি তুমি জ্ঞান থাকে না, শত্রু-মিত্র জ্ঞান থাকে না, আপনাতে আপনি মজে, আর সকল জ্ঞান সরিয়া যায়, সেইটাই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রথম সিঁড়ি। অনেক প্রতিভাশালী লোক বলিয়া থাকেন যে, যেমন যোগের দ্বারা আত্মা, মন, বিষয় ও ইন্দ্রিয় এক হইয়া যায়, তেমনি নাচ দেখিয়াও হয়, গান শুনিয়াও হয়, নাটক দেখিয়া ছবি আঁকিয়া হয়, ৫১৮ কলার[৩] অনেক কলাতেই হয়। যাঁরা ধর্মচর্চা করেন, তাঁরা মনে করেন, আমরাই পরম সুখে আছি। যেহেতু, মন্দ জিনিস আমাদের কাছে আসিতে পারে না। আমরা অনেক তপস্যা করিয়া তাহাদিগকে সরাইয়া দিয়াছি। অর্দ্ধেন্দুবাবু বলিতেন, তা নহে— তা নহে। খানিকটা তন্ময় হইলে, খানিকটা একাগ্র হইলে, খানিকটা ভুলিয়া থাকিলে, সকল কলাতেই পরম সুখের আস্বাদ পাওয়া যায়। তাঁর চেলা অমৃতবাবু বলেন, highest art আর highest morality একই জিনিস ; morality কুৎসিত জিনিসকে ত্যাগ করে, art কুৎসিত জিনিসকে ত্যাগ করে। Artও চায় যাহা সর্বাঙ্গসুন্দর, moralityও চায় যাহা সর্বাঙ্গসুন্দর। আমিও এই দুই জন নটরাজের গলায় গলা মিলাইয়া বড়ো গলায় বলি 'তথাস্তু'। কলা সাধিবার সময় কলার দিকেই দেখিবে, যাহাতে তোমার কলাটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়। তখন ধর্মপ্রচার করিতে যাইও না। তাহা হইলে কলাটি সর্বাঙ্গসুন্দর হইবে না, ধর্মপ্রচারও হইবে না। কলাতেই ধর্ম-প্রচারের সুবিধা হয়, ধর্মপ্রচারে কলার সুবিধা হয় না।

অর্দ্ধেন্দুশেখর শুধু যে নটরাজ ছিলেন, তাহা নহে— নট-যোগী ছিলেন, নট-ঋষি ছিলেন। ধ্যান, ধারণা ও সমাধিতে নাট্যযোগের দ্বারা পরমপদলাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাই তিনি আপনার সংসারধর্ম একেবারেই দেখিতেন না। বহু-কাল শখের অভিনয় করিয়া, অভিনয়ে সিদ্ধিলাভ করা যায় না দেখিয়া শেষ পেশাদারি ধরিলেন। কতকগুলি লোক তন্ময় হইয়া যাহাতে নটের কার্য করে, তাহারই

জন্য পেশাদারি ধরিলেন। পেশাদারি নিজের জন্য নহে, নাট্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য। কিছু-দিন কাজ করিয়া দেখিলেন, পেশাদারি করিতে গেলে দল বাঁধিতে হয়, দল বাঁধিতে গেলেই পয়সার দরকার হয়, পয়সার দরকার হইলেই বখ্‌রাদার চাই। অনেক সময় বখ্‌রাদারদের সঙ্গে তাঁহার মত মিলিত না ; সুতরাং তাঁহাকে তফাত হইতে হইত। এইরূপ ২/৩ বার তফাত হইয়া শেষ তিনি সংকল্প করিলেন, তিনি নিজেই দল বাঁধিবেন। কিন্তু অ্যাক্ট করা এক, তাহাতে তিনি দক্ষ বৃহস্পতি ছিলেন, অ্যাক্‌টিন দেখানোতে তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, দল বাঁধা আর-এক রকম কাজ। তাহা তাঁহার মাথায় ঢোকে নাই, তিনি দল বাঁধিতে পারেন নাই। তাঁর থিয়েটার ভাঙিয়া গেল, ক্রমে তাঁহার দেনা হইয়া পড়িল, তাঁহার ঘর-বাড়ি বিষয়-আশয় সবই গেল ; কিন্তু তাঁর স্ফূর্তি গেল না, তাঁহার অ্যাক্‌টিন গেল না, অ্যাক্‌টিন শেখানোও গেল না। অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়িলে একদিন তাঁহার পুত্র ব্যোমকেশ তাঁহাকে বলিলেন, "বাবা, আমাদের সবই গেল, আমাদের চল্‌বে কিসে ?" অর্দ্ধেন্দুবাবু উত্তর করিলেন, "বাবা, তুমি কেন মনে করো না, তোমার বাবা মরেছে আর সংসারটা সমস্তই তোমার ঘাড়ে পড়েছে।"

এই মহাপুরুষই বলিতে গেলে বাংলার সাধারণ নাট্যশালার সৃষ্টিকর্তা। স্টেজ যখন শখের ছিল, তখন হইতেই আরম্ভ করিয়াছিলেন, আর স্টেজ যখন সমস্ত বাংলা, সমস্ত ভারত মাতাইয়া তুলিয়াছে, তখনো তিনি সেই স্টেজের চূড়ামণি। এখনকার যত নটধুরন্ধর সকলেই তাঁহার শিষ্য বা প্রশিষ্য। যাঁহারা নাটক লেখেন, নাটকই তাঁহাদের স্মৃতিচিহ্ন। তাঁহাদের আর বাহিরের চিহ্ন না হইলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু অর্দ্ধেন্দুবাবুর মতো ব্যক্তি, যাঁহার এত শক্তি, এত ক্ষমতা, এত বিদ্যা, এত বুদ্ধি, এত গভীর চিন্তাশক্তি— এত প্রতিভা সত্ত্বেও তিনি বই লেখেন নাই, কেবল অভিনয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি একরকম বাংলা স্টেজের গ্যারিক[৪] ছিলেন এমন-কি, ভরতমুনি অথবা কোহল, ধূর্ত্তিল, শাণ্ডিল্য[৫] বলিলে বিশেষ ক্ষতি হয় না।

'নাচঘর'
৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ ॥

অর্দ্ধেন্দুশেখর-২

১৩১৫ সালের ৩১শে ভাদ্র অর্দ্ধেন্দুবাবু পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য একটি স্মৃতি-সমিতি গঠিত হয়। কিন্তু ১৩১৫ হইতে ১৩২৬ পর্যন্ত— এই এগারো বৎসরকাল স্মৃতি-সমিতি কোনো কাজ করিতে পারেন নাই। স্মৃতি-রক্ষার জন্য তাঁহারা তিনটি মাত্র সংকল্প স্থির করেন—

১. তাঁহার তৈলচিত্র বা আবক্ষ প্রস্তরমূর্তি প্রতিষ্ঠা।
২. তাঁহার নামে নাটক ও নাট্যকলা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনার জন্য বার্ষিক বৃত্তি প্রতিষ্ঠা।
৩. সমস্ত প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা নাট্যগ্রন্থ সংগ্রহ পূর্বক তাঁহার নামে পুস্তক ভাণ্ডার স্থাপন।

১৩২৬ সালে একটি কাজের লোক পাওয়া গেল, এই লোকটি আপনাদের সকলের পরিচিত— অক্লান্তকর্মা, পরম উৎসাহী, সাহিত্য-সেবক ও সাহিত্যভক্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত [১২৮৯-১৩৪৭ ব.]। তিনি মিনার্ভা থিয়েটারের কর্তাদের ধরিয়া বসিলেন —অর্দ্ধেন্দুবাবুর স্মৃতি-রক্ষার সাহায্যের জন্য একটি 'বেনিফিট নাইট' দিতে হইবে। তাঁহাদের সহৃদয়তা ও নলিনীরঞ্জনের চেষ্টায় ষোলো শত টাকার টিকিট বিক্রয় হইল। এই টাকা হইতে অর্দ্ধেন্দুবাবুর আবক্ষ পিত্তল-মূর্তি তৈরি করতে দেওয়া হইয়াছে। এইরূপে প্রথম সংকল্পটিকে কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তারপর গত ১৫ই ভাদ্র স্টার থিয়েটারে স্মৃতি-সমিতির যে অধিবেশন হয় তাহাতে নলিনীরঞ্জন জানান যে, তিনি স্মৃতি-সমিতির তৃতীয় সংকল্পটিকেও কার্যে পরিণত করিতে— অর্দ্ধেন্দুবাবুর নামে একটি নাট্য-পাঠাগার স্থাপন করিতে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছেন। আমি অনেক দিন হইতে জানি এবং আপনারাও জানেন যে, তিনি যাহা করিব বলিয়া মনে করেন, প্রাণপাত করিয়া তাহা করিয়া তুলেন। ইহার জন্য তিনি শ্রমকে শ্রম জ্ঞান করেন না, কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান করেন না— আহার, নিদ্রা, সংসার সবই ভুলিয়া সেই কাজে একেবারে তন্ময় হইয়া যান। পরিষদে অর্দ্ধেন্দুবাবুর পুত্র ব্যোমকেশের ও আমাদের সকলের

প্রিয় রামেন্দ্রসুন্দরের [ত্রিবেদী, ১৮৬৪-১৯১৯ খৃ.] স্মৃতি-রক্ষার কাজ তিনিই সম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাঠাগারের জন্য নাটক ও নাটক সংক্রান্ত বই যোগাড়ে লাগিয়া গেলেন। প্রায় পনেরো ষোলো দিনের চেষ্টায় কতকগুলি বই যোগাড় করিয়া তিনি নাট্য-পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করিয়া দিলেন। আজ সেই 'অর্দ্ধেন্দু-নাট্য-পাঠাগারের' প্রতিষ্ঠা-উৎসব; এই দশ মাসের মধ্যে তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া লোকের কাছে ভিক্ষা করিয়া পাঠাগারের জন্য প্রায় ১৩ শত পুস্তক যোগাড় করিয়াছেন। এই সংগ্রহের মধ্যে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ আছে। আমরা সকলে মিলিয়া এইমাত্র সেই পাঠাগার খুলিয়া দিয়া আসিয়াছি।

এই জিনিসটি— 'নাট্য-পাঠাগার'— আমাদের দেশে একেবারে নূতন। ইহার আগে বাংলাদেশে এ ভাবের পাঠাগার একটিও হয় নাই! এর দ্বারা নট, নাট্যশালা ও নাট্য-সাহিত্যের অনেক কাজ হইবে। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, এ ব্যবস্থাটি অতি উত্তম হইয়াছে। তাঁহার— সেই অর্দ্ধেন্দুশেখরের— স্মৃতি-রক্ষার জন্য আমরা মিলিয়াছি। আসুন, আমরা সকলে মিলিয়া তিনি যে পরম সুখের কিঞ্চিৎ আস্বাদ দিয়া গিয়াছেন, সেই সুখের আস্বাদন করিতে থাকি; পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনিও সেই পরম সুখকে সোপান করিয়া পরলোকে ব্রহ্মাস্বাদসুখে নিমগ্ন হউন।

উপসংহারকালে সমবেত নটমণ্ডলী ও সাধারণের নিকট আমার একটি সবিনয় নিবেদন আছে। আমাদের দেশে থিয়েটার ছিল না। ছিল যাত্রা, তাও বেশি দিন নয়। একশো বৎসর হইল কলিকাতার বাবুরা শখের যাত্রা করেন, তাঁহাদের শখ মিটিলে সে দল দুর্গা ঘোড়েলকে[৬] দেন। ক্রমে ইংরাজি থিয়েটার আসে। ইংরাজির দেখাদেখি ক্রমে বাংলা শখের, পরে পেশাদারি থিয়েটার হয়। আমাদের থিয়েটারের যত কথা প্রায়ই ইংরাজি।

থিয়েটার, অ্যাকটিং, stage, scene, audience, manager, actor, actress, movable scene, seat, orchestra, stall, box, back seat, concert ইত্যাদি। কিন্তু আমরা এখন দেখিতে পাইতেছি, সেই সেকালে মানে অতি পুরাতন কালে আমাদের যে

থিয়েটার ছিল সে ইংরাজি থিয়েটারের চেয়ে ভালো বৈ মন্দ নয়। তাহাতে থিয়েটারের দরকারি যত শব্দ সবই আছে। শব্দগুলি ছোটো, মধুর এবং অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারে। থিয়েটারের নাম ছিল প্রেক্ষাগৃহ বা পেক্‌খাঘর, stage-এর নাম ছিল রঙ্গ, actorদের নাম ছিল পাত্র, audienceএর নাম ছিল প্রেক্ষক; sceneএর নাম ছিল চিত্র ইত্যাদি, ইত্যাদি। তাহাদের stage দোতলা ছিল, নহিলে একই থিয়েটারের স্বর্গ ও মর্ত কেমন করিয়া দেখাইবে। আমাদের বাংলা রঙ্গমঞ্চে ৫/৭ set scene আছে। কতকগুলি অকেজো, কতকগুলি কেজো। গ্রীকেরা অকেজোগুলি কোরাসের মুখে দিয়া দিত। গল্পটা বুঝাইবার জন্য তাহারা অকেজো কথা তুলিয়া রসভঙ্গ করিত না। আমাদের সেকালে অকেজো কথার জন্য কতকগুলি scene রাখিত; তাহাদের নাম 'অর্থোপক্ষেপক' যথা, বিষ্কম্ভক, প্রবেশক, অঙ্কাবতার ইত্যাদি। কিন্তু বাংলায় আমরা ইংরাজি নকল করিয়া actএর মধ্যে কেজোও দিয়াছি, অকেজোও দিয়াছি; বড়ো ভালো করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আমাদের সেকালে থিয়েটারের ভিতর থিয়েটার হইত। তাহার নাম ছিল গর্ভাঙ্ক। বাংলায় sceneএর নামই হইয়াছে গর্ভাঙ্ক, ভালো হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সে-জন্য আমি প্রস্তাব করি আপনারা নাট্যের পরিভাষা স্থির করিবার সময় সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রগুলি পড়িবেন এবং বিদেশী শব্দ বর্জন করিয়া ছোটো, মিষ্ট দেশী শব্দ গ্রহণ করিবেন। সেকালের মুনিরা আপনাদের অনেক বিষয় শিখাইতে পারিবেন। নাটকের সিদ্ধির দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল। সিদ্ধির প্রধান শত্রু ঘাত, সেগুলিকে তাঁহারা বর্জন করিতেন। তাঁহাদের নাটকের বৃত্তিজ্ঞান ছিল, প্রবৃত্তিজ্ঞান ছিল, তাঁহাদের বেশকার ছিল, painter ছিল, আতোদ্য ছিল, ইতিবৃত্ত ছিল। ইতিবৃত্তকে কিরূপ করিয়া ভাগ করিয়া অঙ্ক করিতে হয়, তাহাও ছিল, তাঁহাদের বীজ, বিন্দু, পতাকা ছিল। তাঁহারা বিস্তর পরিশ্রম করিয়া নাট্যশাস্ত্র লিখিয়াছিলেন। সে পরিশ্রমের ফল আপনাদের হাতের মুঠোর মধ্যে আসিয়াছে। আপনারা সে ফল গ্রহণ করুন। সেইমতে আপনাদের নাটককে পরিবর্জন [পরিবর্তন ?] করুন, দেখিবেন, আপনাদের নাটকের শ্রীবৃদ্ধি

হইয়াছে। এখনই তো বাংলার stage বাংলার একটি শক্তি হইয়াছে, হয় তো পরে এই শক্তি শতগুণে বর্ধিত হইবে। হয় তো পূর্ব-পাশ্চমের মিলনে অদ্ভুত অপূর্ব জিনিস হইবে।

'নাচঘর'
২৭শে আষাঢ়, ১৩৩১ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী সম্পর্কে শাস্ত্রীমশায় বিভিন্ন সময়ে তিনটি প্রবন্ধ লেখেন :

১. 'অর্দ্ধেন্দু-কথা', মানসী ও মর্ম্মবাণী, কার্তিক ১৩২৭ ব.

২. 'অর্দ্ধেন্দুশেখর', নাচঘর, ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ ব.

৩. 'অর্দ্ধেন্দুশেখর', নাচঘর, ২৭ আষাঢ় ১৩৩১ ব.

'অর্দ্ধেন্দুশেখর প্রসঙ্গ' শিরোনামে প্রবন্ধ তিনটি প্রকাশকাল অনুযায়ী পর পর ছাপা হল। মূল রচনার শিরোনাম এখানে উপ-শিরোনাম রূপে রাখা হয়েছে।

প্রথম প্রবন্ধ 'অর্দ্ধেন্দু-কথা' সম্পর্কে 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে উল্লেখ ছিল, "বিগত ৩০শে ভাদ্র ১৩২৬, মঙ্গলবারে মিনার্ভা থিয়েটারে ৺অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষা-কল্পে যে বিশেষ অভিনয় হয়, সেই অভিনয়ের পূর্ব্বে শাস্ত্রী মহাশয় রচিত এই প্রবন্ধটী উক্ত স্মৃতি-সমিতির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছিল।"

তৃতীয় প্রবন্ধটি শাস্ত্রীমশায় পড়েন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ ব., অর্দ্ধেন্দু-নাট্য-পাঠাগার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে। অনুষ্ঠানে তিনি সভাপতিত্ব করেন। দ্র. হ-র ২, পৃ. ৪১।

অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর জন্ম কলকাতায় ১৮৫০ খৃ., বাবা শ্যামাচরণ। আত্মীয় যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ির মঞ্চে অভিনয় দেখে বালক বয়সে অনুপ্রাণিত হন। প্রথম অভিনয় ২ নভেম্বর ১৮৬৭ খৃ., জোড়াসাঁকো কয়লাহাটায় হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কিছু কিছু বুঝি' প্রহসনে। এই অভিনয়ে মধুসূদন দত্ত উপস্থিত ছিলেন। প্রহসনটিতে পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ির উদ্দেশে কটাক্ষ থাকায় যতীন্দ্রমোহনদের আশ্রয় ছাড়তে হয়। এর পরে তিনি বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটারে যুক্ত হন এবং গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে 'সধবার একাদশী' নাটকে জীবনচন্দ্রের ভূমিকায় অভিনয় করেন ১৮৬৮ খৃ. সপ্তমী পূজার রাত্রে। এই নাটকের চতুর্থ অভিনয় (শ্রীপঞ্চমী ১৮৭০ খৃ.) দেখে দীনবন্ধু মিত্র অর্দ্ধেন্দুশেখর সম্পর্কে মন্তব্য করেন, "আপনি অটলকে যে লাথি মারিয়া চলিয়া গেলেন, উহা improvement on the author. আমি এবার সধবার একাদশীর

নূতন সংস্করণে অটলকে লাথি মারিয়া গমন লিখিয়া দিব"। দ্র. গিরিশচন্দ্র ঘোষ, 'বঙ্গীয় নাট্যশালায় নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী,' কলিকাতা, ১৩১৫ ব.

বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার দলের তরুণরাই পরে ন্যাশনাল থিয়েটার গড়ে তোলেন। ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম অভিনয় নীলদর্পণ নাটক, ৭ ডিসেম্বর ১৮৭২ খৃ.। উডসাহেব, সাবিত্রী, গোলক বসু এবং একজন রায়ত —চারটি ভূমিকায় অভিনয় করেন অর্দ্ধেন্দুশেখর। মতান্তরের ফলে গিরিশচন্দ্র দল ছেড়ে যাওয়ায় ন্যাশনাল থিয়েটার পত্তনের সময়ে অর্দ্ধেন্দুশেখরই ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। পরে বিভিন্ন সময়ে তিনি মিনার্ভা থিয়েটার, এমারেল্ড থিয়েটার, অরোরা থিয়েটার, স্টার থিয়েটার ও কোহিনুর থিয়েটারের সঙ্গে অভিনেতা এবং অভিনয় শিক্ষক হিসাবে যুক্ত ছিলেন। Dave Carson নামে একজন ইংরেজ অভিনেতা অপেরা হাউসে 'ডেভ কার্সন সাহেব-কা পাকা তামাসা' নামে বাঙালি বাবুদের নিয়ে ব্যঙ্গ-অভিনয় করতেন। তার জবাবে অর্দ্ধেন্দুশেখর 'মুস্তফী সাহেব-কা পাকা তামাসা' চালু করেন। থিয়েটার জগতে তাঁর নাম দাঁড়িয়ে যায় মুস্তফীসাহেব। প্রায় ৪০ বছর তিনি দল গড়া এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীদের গড়ে তোলায় কঠোর পরিশ্রম করেন। নিজে সর্বোচ্চ বেতন পেয়েছেন মাসে ৮৫ টাকা। ৯ আগস্ট ১৯০৮ খৃ. কোহিনুর থিয়েটারে এক রাত্রে 'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশ এবং 'নবীন তপস্বিনী' নাটকে জলধরের ভূমিকায় অভিনয় করে অসুস্থ হয়ে পড়েন। দ্র. K. Raha, *Bengali Theatre*, N-B-T, New Delhi, 1978, p. 54-57.

তাঁর মৃত্যু হয় ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৮ খৃ.।

১. অনুবাদ : মানুষের পুণ্য-অর্জনের পরিচয় পাওয়া যায় পুত্রের আচরণে, নিজের যশে আর কাটা পুকুরে ও খনিত কুয়ায়।

২. "যস্মাদজ্ঞানমদোমত্তা ন চেচ্ছাবিনয়ান্বিতা।
তস্মাদেতদ্ধি ভবতাং কুজ্ঞানং নাশমেষ্যতি ॥
ঋষীণাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ সমবায়সমাগমে।
নির্ব্রহ্মণো নিরাভূ(হূ)তঃ শূদ্রাচারো ভবিষ্যতি ॥"

ভরত নাট্যশাস্ত্র, ৩৬ অধ্যায়।

অনুবাদ : যেহেতু (এরা) অজ্ঞানমদে উন্মত্ত, সংযম নেই, অতএব এ-সবের দ্বারা আপনাদের কুজ্ঞান নাশ পাবে। ঋষিদের ও ব্রাহ্মণদের মিলনে মেশায় যে ব্রাহ্মণ্য-বিরহিত ও যজ্ঞক্রিয়াহীন সে শূদ্রাচারী হবে।

"শূদ্রস্য দ্বিজাতিশুশ্রূষা বার্ত্তা কারুকুশীলবকর্ম চ।" অর্থশাস্ত্র ১.৩।
অনুবাদ : শূদ্রের ভালো জীবিকা হল ব্রাহ্মণের সেবা, শিল্পকর্ম ও নটবৃত্তি।

৩. "চৌষট্টি কলা কী, জানিবার জন্য বড়ো আগ্রহ হইল। নানা জায়গায় চৌষট্টি কলা খুঁজিতে ল্যাগিলাম ; অনেক জায়গায় চৌষট্টির ফর্দ মিলিল, কিন্তু একটি ফর্দ আর-একটির সঙ্গে মিলে না। শেষে একজন গ্রন্থকার বলিয়া দিলেন, চৌষট্টি তো মূল কলা মাত্র, ঐরূপ আট সেট চৌষট্টি কলা আছে। মনে মনে বুঝিলাম, ৫১২টি কলা সবসুদ্ধ আছে। আরো খুঁজিতে দেখি, টীকাকার আরো ছয়টি ফাউ দিয়া কলার নম্বর করিয়াছেন, ৫১৮টি।" শাস্ত্রী, 'নাট্যকলা', মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯।

"ইতি চতুঃষষ্টির্মূলকলাঃ। আম্ববান্তরনির্বিষ্টানামন্তরকলানামষ্টাদশাধিকানি পঞ্চশতান্যুক্তানি।"

বাৎস্যায়ন-কামসূত্র, যশোধর টীকা ; ১. ৩. ১৩।

অনুবাদ : এই চৌষট্টিটি মূল কলা। এদের মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট আরো আঠারো বেশি পাঁচশো কলাও কথিত হয়েছে।

৪. প্রসিদ্ধ ইংরেজ অভিনেতা David Garrick (১৭১৭-৭৯ খৃ.)। ১৭৪১ খৃ. শেকস্‌পীয়রের 'Richard III' নাটকের নাম-ভূমিকায় অভিনয়ে তাঁর গৌরবময় নট-জীবনের সূচনা হয়। শেকস্‌পীয়রের মূল নাটক মঞ্চস্থ করার রীতি প্রবর্তন, স্বাভাবিক অভিনয় পদ্ধতি প্রচলন এবং শিল্প হিসাবে থিয়েটারের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা তাঁর কীর্তি। ১৭৪৭-এ ড্রুরি লেন মঞ্চের মালিক-পরিচালক রূপে মঞ্চরীতির গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার করেন। গ্যারিক ডক্টর জনসনের অন্যতম পার্ষদ ছিলেন।

৫. 'নাট্যশাস্ত্র' ভরত বা ভরতমুনি রচিত মনে করা হয়। তাঁর আবির্ভাবকাল সম্পর্কে মতভেদ আছে। নিম্নতম সীমা খৃস্টীয় অষ্টম শতকের শেষ ভাগ। শাস্ত্রীমশায় মনে করেন খৃ. পূ. দ্বিতীয় শতক ('The origin of the Indian Drama', *J-A-S-B*, 1909, NS : V, pp. 351-61.)। নাট্যশাস্ত্রের পরম্পরায় কোহল, ধূর্তিল বা দত্তিল, শাণ্ডিল্য প্রভৃতি লেখকের নাম পাওয়া যায়।

৬. "হাড়কাটা গলি নিবাসী দত্তবংশীয় কায়স্থ দুগো ঘড়েলের (দুর্গাচরণ

ঘড়িয়াল) যাত্রার দল নামজাদা। ইনি বয়োবৃদ্ধ দোয়ারের স্থানে বালক দোয়ার আটজন রাখেন। সকল বড় লোকের বাড়িতেই তাঁর যাত্রা হইয়াছে। বেনেপুকুরের লোকা ধোপা (লোকনাথ দাস— চাষী ধোপা) ও কালীনাথ হালদার ইঁহার দলে গান গাহিতেন। ইঁহারা তখন দুগোর দলের ছোকরা, শেষে তাঁহারা নিজের নিজের দল করেন।"
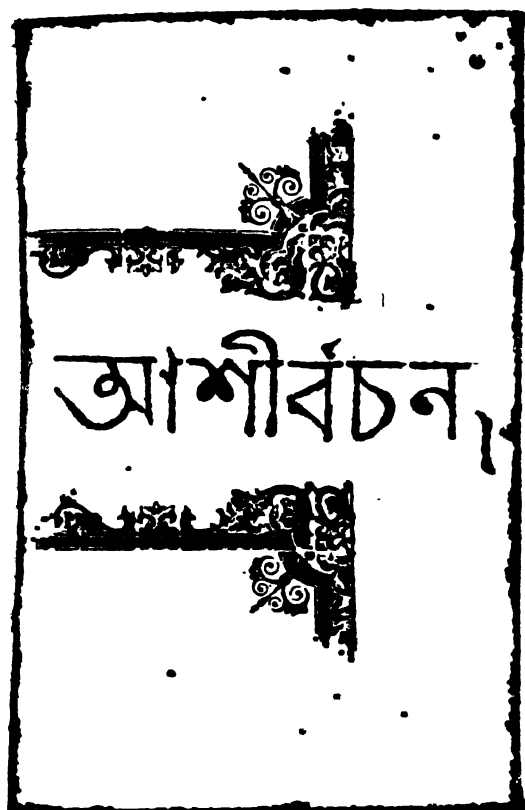
শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ,

তুমি যখন নিতান্ত বালক, তখন হইতেই তোমার কবিতায় বাঙালি মুগ্ধ। তোমার যত বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই তোমার প্রতিভা বিকাশ হইতে লাগিল। সে প্রতিভা যেমন একদিকে দেশ হইতে দেশান্তরে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, তেমনি সাহিত্যেরও সকল মূর্তিই আয়ত্ত করিতে লাগিল। সে প্রতিভা প্রথম প্রথম কবিতায় আবদ্ধ ছিল, ক্রমে গদ্য, নাটক, নবেল-রচনা, ছোটো গল্প, বড়ো গল্প, সমালোচনা, রাজনীতি, কর্মনীতি, এইরূপে সমস্ত সাহিত্য-সংসারে ছড়াইয়া পড়িল। তুমি সাহিত্যের যে মূর্তিতেই হাত দিয়াছ, তাহাকে

উদ্ভাসিত ও সজীব করিয়া তুলিয়াছ। কারণ, তোমার প্রাণ আছে, সে প্রাণে যেমন মধুরতা আছে, তেমনি তেজ আছে— যেমন মোহিনীশক্তি আছে, তেমনি উন্মাদিনীশক্তি আছে— যেমন সূক্ষ্ম-দৃষ্টি আছে—তেমনি দূরদৃষ্টি আছে। তোমার প্রতিভা যেমন গড়িতে পারে, তেমনই ভাঙিতে পারে— যেমন মাতাইতে পারে— তেমনই ঠাণ্ডা করিতে পারে —যেমন কাঁদাইতে পারে তেমনই হাসাইতে পারে। কিমধিকং, তোমার প্রতিভা সর্বতোমুখী, সর্বতঃপ্রসারী এবং সর্বতোমুগ্ধকারী। সঙ্গীতের সহিত সাহিত্যের মিলনে তোমার হাতে উভয়েরই গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে ; তোমাকেও যশোমন্দিরের উচ্চ চূড়ায় তুলিয়া দিয়াছে।

ইংরাজ-রাজত্ব হইয়া অবধি তোমার পূর্বপুরুষগণ ধনে মানে বিদ্যায় বুদ্ধিতে, সদ্‌গুণে সাহসে বাংলায় অতি উচ্চ আসন অধিকার করিয়া আসিতেছেন। তোমার প্রতিভায় সেই বংশের গৌরব উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর— উজ্জ্বলতম হইয়া উঠিয়াছে। তোমার গুণে বাংলা তো চিরদিনই মুগ্ধ— ভারত গৌরবান্বিত, এখন পূর্ব ও পশ্চিম, নূতন ও পুরাতন সকল মহাদেশই তোমার প্রতিভায় উদ্ভাসিত। আশীর্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া সমস্ত পৃথিবী আরো উদ্ভাসিত করো। তোমার বংশ দীর্ঘজীবীর বংশ, তুমি শতায়ু হও, সহস্রায়ু হও। তোমার বয়স যতই পাকিতেছে, অভিজ্ঞতা বাড়িতেছে, ততই মানুষের ব্যথায় তোমার মন গলিতেছে, তোমার বীণার ঝংকার গভীর হইতে গভীরতর হইতেছে। মানবের মঙ্গলের জন্য তোমার আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ যতই বাড়িতেছে, ততই তুমি ব্যাকুল হইয়া মঙ্গলময়ের মঙ্গলাসনের সমীপবর্তী হইতেছ। তোমার মঙ্গলবাসনা চরিতার্থ হউক, তোমার নাম অক্ষয় হউক, তুমি অমর হইয়া ভারতের মঙ্গলকামনা করিতে থাক। তুমি দিগ্বিজয় করিয়া, বাংলার মুখ উজ্জ্বল করিয়া, আবার সোনার বাংলায় ফিরিয়া আসিয়াছ, তুমি আমাদের ভক্তি, প্রীতি, শ্রদ্ধা ও স্নেহের উপহার স্বরূপ এই পুষ্পমাল্য গ্রহণ করো। বিধাতার সৃষ্টিতে যাহা-কিছু সুন্দর, যাহা-কিছু সুরভি, সব এই পুষ্পেই আছে। আমাদেরও যাহা-কিছু সুন্দর, যাহা-কিছু সুরভি তাহা তোমাতেই আছে। আইস, উভয়ের মিলন করিয়া দিয়া আমরা কৃতার্থ হই। —

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি

'সবুজপত্র'
ভাদ্র, ১৩২৮ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৮ বর্ষের সাংবৎসরিক কার্যবিবরণে উল্লেখ আছে, "রবীন্দ্র সংবর্দ্ধনা : শাখা সমিতির নির্দেশ অনুসারে আলোচ্য বর্ষের [১৩২৮ব.] ১৯-এ ভাদ্র [৪ সেপ্টেম্বর ১৯২১খৃ.] এই সংবর্দ্ধনা হয়। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ঢাকা হইতে যে আশীর্ব্বাদ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন তাহা পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পাঠ করেন।" দ্র. সা-প-প, ১৩১৯ব.

রবীন্দ্রনাথের ৬০তম জন্মদিন উপলক্ষে এই সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। সংবর্ধনার উত্তরে কবি বলেন, "য়ুরোপে আমার কাছে তারা হৃদয়ের অনুরাগ অকৃত্রিম উৎসাহের সঙ্গে ব্যক্ত করেছে,— তারা প্রীতি দিয়েচে, যা সকল মূল্যের বেশি। ... এই আনন্দের মধ্যে একটি মুক্তির উৎসাহ আছে। দেশ যখন আপনটুকুকে নিয়েই আপনি নিবিষ্ট, তখন সে বিশ্বের অগোচর থাকে। ... আমরা বিশ্বের মানুষ, কেবলমাত্র দেশের মানুষ নই : ... আমার রচনায় আমি মহামানবের বাহন, এই বলে যদি আমাকে সমাদর করেন তবে তাঁর আতিথ্যের জন্য প্রস্তুত থাকুন। তাঁকে ফেরাবেন না, বলবেন না, আজ আমাদের দুঃসময়, আজ আমাদের দরজা বন্ধ।" দ্র. 'সবুজপত্র', ভাদ্র ১৩২৮ব., পৃ. ১১০-১৭।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, রবীন্দ্রনাথের ৭০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে ৯ পৌষ ১৩৩৮ব. থেকে যে জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন শাস্ত্রীমশায়। অনুষ্ঠানের প্রস্তাবের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রীমশায়কে দার্জিলিং থেকে ১২. ৬. ৩১ তারিখে একটি চিঠিতে লেখেন, "আপনার সস্নেহ পত্রখানি আমাকে গভীর তৃপ্তিদান করিয়াছে। আমার সপ্ততিতম জন্মোৎসবের উদ্বোধন সভায় [ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট হলে ১৬ মে ১৯৩১ তারিখে অনুষ্ঠিত পরামর্শ সভা] আপনি সভাপতি পদে বৃত হইয়াছিলেন ইহা আমার সৌভাগ্য। বাংলা সাহিত্যে এতদিন ধরিয়া আমি যাহা কিছু করিয়াছি তাহা সমগ্রভাবে দেখিবার শক্তি আপনার মতো কয়জনের আছে ? সেদিনকার সভায় উদার ভাষায় আমার সম্বন্ধে আপনি যে দাক্ষিণ্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে আমি ধন্য হইয়াছি।

"আগামী শীতকালে কোনো এক সময়ে আমাকে অভিনন্দন করিবার প্রস্তাব আপনারা করিয়াছেন। সম্মানের অতি বিপুল সমারোহে আমি অত্যন্ত সংকোচ

বোধ করি। তথাপি এ আমন্ত্রণ অস্বীকার করিবার শক্তি আমার নাই। এ বৎসর দেশের বাহিরে কোথাও যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না, অতএব দেশের লোকের নিকট হইতে পুরস্কৃত হইবার অবকাশ পাইব। আপনি আমার অভিবাদন জানিবেন।" দ্র. স্মারকগ্রন্থ, পৃ. ৮২।

মূল অনুষ্ঠানের আগেই শাস্ত্রীমশায়ের মৃত্যু হয়।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার বাংলা সাহিত্যে একজন মহারথী ছিলেন। অন্যান্য লেখকদের মতো তিনি অনেক রকমের, অনেক রঙের, অনেক ঢঙের অনেকগুলি বই লিখিয়া যান নাই সত্য; কিন্তু তিনি বাংলা সাহিত্যের যে উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা আর-কেহ বড়ো করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার দীর্ঘ জীবনটাকে তিনি একখানা বাংলা বিশ্বকোষ করিয়া বাঙালিদের দিয়া গিয়াছেন। লেখক লেখকই থাকেন, বই লেখেন, গদ্য-পদ্য, নাটক, নবেল, ইতিহাস, ভূগোল, খগোল, রচনা বিবেচনা দর্শন বিজ্ঞান আরো কত কী তার সীমা নাই অন্ত নাই। কিন্তু বই আর লেখক দুই স্বতন্ত্র পদার্থ। লেখক হইতে

বই অনেক তফাত। সময়ে সময়ে ঠিক বিপরীতও দেখা যায়। মাতাল হয়তো মদ ছাড়াইবার জন্য বই লিখিতেছেন। ঘোর-বাবু সংযম শিক্ষা দিতেছেন, "আমরা যাহা বলি তাহাই করো, যাহা করি তাহা করিও না।" অক্ষয়বাবু সে রকম লোক ছিলেন না। তাঁহার জীবন সাহিত্যময় ছিল। শয়নে-স্বপনে, ঘরে-বাহিরে, সমাজে-মজলিসে, ঘাটে-পথে, আহারে-বিহারে, পূজায়-পার্বণে, খবরের কাগজে মাসিক পত্রে, কাগজে-কলমে, সংসারে-সভায় তিনি বাংলাময় ছিলেন; তাঁহার সবটাই বাংলা সাহিত্য। তাই বাঙালি তাঁহাকে উপাধি দিয়াছে 'আচার্য'। তিনি টোল করিয়া পড়ান নাই, তবুও তিনি আচার্য। তিনি জ্যোতিষ-গণনায় দক্ষ ছিলেন না, তবুও তিনি আচার্য। তিনি বিজ্ঞানে বিজ্ঞানী ছিলেন না, তথাপি তিনি আচার্য। তিনি কখনো কলেজে অধ্যাপনা করেন নাই তবুও তিনি আচার্য। কিন্তু তাঁহার মতো আচার্য কে আছেন? তিনি যে তাঁহার জীবনটাই লোক-শিক্ষায় উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাই তিনি আচার্য। তাই কৃতজ্ঞ বাঙালি তাঁহাকে উপাধি দিয়াছেন, 'আচার্য'। অক্ষয়বাবু, আপনার কাছে আমরা যত পাইয়াছি, এত আর-কাহারো কাছে পাই নাই, তাই আপনি আমাদের আচার্য। তাই আপনি আমাদের পূজ্য, তাই আপনি আমাদের হৃদয়ে এত অধিক স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

বলিবেন, অক্ষয়বাবু বাঙালিকে কী দিয়াছেন যে আমরা তাঁহার এত বড়াই করি? আমি বলি, যাহা আর-কেহ দেয় নাই। সেটা কী? বাঙালিয়ানা, বাঙালিত্ব, আমি বাঙালি এই বোধ। আমার বাঙালি বলিয়া যে একটা সত্তা আছে— এই জ্ঞান। বেশি সংস্কৃত পড়িলে লোকে ব্রাহ্মণ হইতে চায়, ঋষি হইতে চায়। সেটা খাঁটি বাংলার জিনিস নয়; তাহার সঞ্চার পশ্চিম হইতে। বেশি ইংরাজি পড়িলে কী হয় তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। সাহেব হয়, হ্যাট কোট পরে, নেকটাই গলাবন্ধ পরে, পা ফাঁক করিয়া দাঁড়ায়, হক্-না-হক্ ইংরাজি বুলি ঝাড়ে, মনটা ইংরাজ-ইংরাজ হইয়া যায়। এই যে ভাব ইহারো সঞ্চার পশ্চিম হইতে, সাগর-পার হইতে। ইংরাজিই পড়ো, আর সংস্কৃতই পড়ো, ফারসিই পড়ো, আর উর্দুই

পড়ো, বাংলার উপর তোমার নজরই পড়িবে না। বাংলার ভালো-মন্দ তুমি দেখিতেই পাইবেনা, মোট কথা বাংলার উপর তোমার প্রীতিই থাকিবে না। সেই প্রীতিটুকুই অক্ষয়বাবু আমাদের দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার হাড়ে হাড়ে সে প্রীতি ছিল, তাই তিনি সে প্রীতিটুকুই বাঙালিকে শিখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং শিখাইতে পারিয়াছেন এবং তাই তিনি জীবনে মরণে আমাদের উপর আচার্যগিরি করিতেছেন।

সে বাঙালিয়ানাটা কী ? সে কথা এত বাঙালি সাহিত্যসেবীকে আমি কী বুঝাইব ? তাঁহারা সকলে তাহা বুঝেন। অন্তত অক্ষয়বাবুর কল্যাণে বা আশীর্বাদে তাহা বুঝিয়াছেন। আমি তাহার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করিলে ধার্ষ্টামি হইবে। তবে মোটামুটি দু-চার কথা বলিয়া দেখাইব, আমিও আপনাদের মতো অক্ষয় আচার্যের শিষ্য হইতে পারিয়াছি কিনা! বাঙালিয়ানার অর্থ এই যে, বাংলার যা ভালো তাহা ভালো বলিয়া জানা, আর যাহা মন্দ তাহা মন্দ বলিয়া জানা। ভালো লওয়া ও মন্দ না লওয়া তোমার নিজের কাজ। কিন্তু জানাটা প্রত্যেক বাঙালির দরকারি কাজ। জানিতে হইলে বুদ্ধিপূর্বক বাংলা দেশটা কী দেখিতে হইবে, বাংলায় কে থাকে দেখিতে হইবে, বাংলার আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, সমাজ-সংসার, উৎসব-আনন্দ, দুঃখ-শোক, কুস্তি লাঠিখেলা টোল পাঠশালা দেখিতে হইবে। ইহার গান গীতি পয়ার পাঁচালি, নাচ খেমটা, কীর্তন ঢপ যাত্রা কবি সব দেখিতে হইবে। মন প্রাণ দিয়া দেখিতে হইবে। আবার এখনকার কালে যাহা যাহা বদলাইতেছে, তাহাও দেখিতে হইবে। খবরের কাগজ, মাসিক পত্র, কনসার্ট, থিয়েটার, ইস্কুল, কলেজ, আপিস, আদালত সবই দেখিতে হইবে। বাংলার এবং বাঙালি জাতির সমস্ত জীবনটা ভালো করিয়া দেখিতে হইবে, তবেই তুমি বাঙালি হইবে। অক্ষয়বাবু তাহা করিয়া ছিলেন, তিনি বাংলা চিনিয়াছিলেন, তাই চিনাইতে পারিয়াছিলেন। তাহাতে তিনিও ধন্য হইয়াছেন, আমরাও ধন্য হইয়াছি।

এখনকার লোকের জীবন-চরিত নাই বলিলেই হয়। অথবা অত লম্বা কথাটা আপনারা ভালো বলিবেন না। এখনকার লোকের জীবন-চরিতে বিশেষ কিছু নাই, বৈচিত্র্য নাই। সব একরকম একঘেয়ে।

শিক্ষা-বিভাগের ও কলিকাতা ইউনিভার্সিটির কল্যাণে সব একাকার হইয়া গিয়াছে। যেমন ভাত-হাঁড়ির ভাত, একটা টিপিলেই সবগুলা টেপার কাজ হয়, এখনকার লোকের জীবন-চরিতও সেই রকম। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন, এক পাকের তৈয়ারি কিনা, তাই সবই স্বাদ একই রকম। তেমনি সব বাঙালিরই জীবন-চরিত একই রকম : সেই পাঠশালা, সেই ইস্কুল, সেই কলেজ, সেই ইউনিভার্সিটি, সেই মাস্টারি কেরানিগিরি উকিলি বা ডাক্তারি, সেই বিবাহ, সেই ছেলে-পিলে, সেই সাহেব, সেই আপিস। সবই এক রকম। এক পাকের তৈয়ারি কিনা, তাই স্বাদ একই রূপ!

এখানে বলিয়া রাখি, বিদ্যাসাগরমহাশয় এখন বাঁচিয়া থাকিলে বোধ হয় ঢাকা পাটনা কাশী লক্ষ্ণৌ আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় দেখিয়া খুশি হইতেন ; বলিতেন, সব আর এক পাকের তৈয়ারি হইবে না, অনেকগুলা পাক চড়িয়াছে, হয়তো এখন লোকের জীবন-চরিত একটু একটু বিচিত্র হইবে। অক্ষয়বাবুর জীবনে বিশেষত্ব এই যে তিনি বাবার নিকট অনেক শিখিয়াছিলেন[১]। বাবা তাঁহাকে সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন : কখনো মজলিস হইতে 'অক্ষয়, তুই উঠিয়া যা' বলিয়া ছেলেকে সরাইয়া দিতেন না। অক্ষয়বাবুর বাবা একাধারে বাবা, মাস্টার, বন্ধু ও গুরু ছিলেন, তাই অক্ষয়বাবুর বাবার উপর এত টান। তিনি এক জায়গায় লিখিয়াছেন, "জগৎ একদিকে আর বাবা আর-এক দিকে থাকিলে আমার মনোতুল-দাঁড়িতে বাবার দিকেই ঝোঁক ছিল।" তাঁহার মৃত্যুর সময় যে ঘটনা হয়, তাহা আরো করুণ হৃদয়গ্রাহী। অক্ষয়বাবুর পীড়া হয় শিবপুরে, তিনি বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার আর রক্ষা নাই। তাই ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া কদমতলার বাড়িতে ফিরিয়া যান। তাঁহার পিতার যে ঘরে মৃত্যু হয়, সেই ঘরে তাঁহার বিছানা হয়। মৃত্যুর পূর্বেই তিনি ইশারা করেন, বাবার যেখানে মৃত্যু হইয়াছিল এবং চিরন্তন হিন্দু নিয়ম অনুসারে যেখানে পেরেক পোতা ছিল, সেইখানে তাঁহাকে শোয়ানো হয়। সেখানে শুইয়া সম্মুখে বাবার ছবি টাঙানো ছিল, তাহা দেখিতে দেখিতে তাঁহার শিবচক্ষু হয়।

. তাঁহার বাবার উপর এই যে অসাধারণ টান এটাও একটা বাঙালিয়ানা— বাঙালির বিশেষত্ব। এ জিনিসটা এখন বড়ো দেখা যায়

না। সেকালে খুব দেখা যাইত। এখনকার বাপেরা ইলিশ মাছের মতন উজান ঠেলিয়া চলিয়া যান, আর ইলিশ মাছের ডিমের মতন ছেলেরা ভাটাইয়া গিয়া যে কোথায় চলিয়া যায়, তাহার ঠিকানা থাকে না। ইলিশ মাছের সহিত ইলিশ মাছের ছানার কখনো দেখা-সাক্ষাৎ হয় না। এখনকার বাঙালি ছেলেদেরও তেমনি বাপের সঙ্গে বড়ো দেখা হয় না। সেকালের বাঙালি বাপের কাছেই শিক্ষা-দীক্ষা পাইত। সে বাবার সঙ্গেই দিনরাত ঘুরিত ; বাবার প্রতি ছেলের ভক্তি হইত, ছেলের প্রতি বাবার স্নেহ হইত। এখনকার বাবারা ছেলের শিক্ষার ভার দিয়াছেন মাস্টারের উপর, ছেলেরও ভক্তিটুকু ভাগ হইয়া গিয়াছে, অথবা ভাগ হইয়া লোপ পাইয়া গিয়াছে। বাপে-ছেলেয় আর সে ভাবটা নাই। সেকালে পিতৃভক্তি বলিলে বাবার শ্রাদ্ধের উদ্যোগ বুঝাইত। পিতার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি না থাকিলে যথাসর্বস্ব বেচিয়া ও জাঁকাইয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে প্রবৃত্তি হইত না। এখন সে প্রবৃত্তি নাই। তাই তেমন করিয়া শ্রাদ্ধ করিবার প্রবৃত্তিও নাই। সেকালে কামার কুমোর ময়রা তেলি তাঁতি সকল জাতিই আপনার ঘরে বসিয়া বাবার কাছে জাত-ব্যাবসা শিক্ষা করিত, ভট্টাচার্যেরা বাড়িতে বাপের কাছে সব বিদ্যা শিক্ষা করিত। গুরু-শিষ্য বলিয়া পরস্পরের প্রতি একটা টান হইত, সর্বদা নিকটে থাকিবার জন্য একটা টান হইত এবং সে টানে বড়ো একটা বখরাদার থাকিত না, তাই টানটা বেশ জমাট হইত। পিতৃভক্তিও জমাট হইত। অক্ষয়বাবু বাঙালির এই পিতৃভক্তির বিশেষত্বটুকু বেশ দেখাইয়া এবং শিখাইয়া গিয়াছেন। অনেকে বাপকে 'পদায়' অর্থাৎ আত্মজীবনী লিখিতে গিয়া বাপের যাহা পদপসার তার চেয়ে অনেক বাড়াইয়া দেন ; অক্ষয়বাবু সে রকম ছিলেন না। তিনি খাঁটি বাঙালি, সোজা কথায় সোজা ভাব প্রকাশ করিয়াছেন।

অক্ষয়বাবু আসল বাঙালির মতন শৌখিন ছিলেন না। মোটা ভাত মোটা কাপড়েই তাঁহার চলিত। অতিথি-অভ্যাগত আসিলে ভালো খাইবার আয়োজন হইত, পাল-পার্বণে খাওয়া-দাওয়ার ভালো উদ্যোগ হইত, নহিলে সবই সাদাসিদে। এটুকুও বাঙালির সাধারণ গুণ, সকলেরই এ গুণ আছে, তবে শিক্ষার দোষে এখন কতক কতক

বিগড়াইয়াছে। বাঙালি নিরীহ শান্তিপ্রিয় জাতি। নিরীহ শান্তিপ্রিয় হইলেই প্রায় একঘেয়ে হইয়া যায়। সেই একঘেয়ের হাত হইতে বাঁচিবার জন্যই বারো মাসে তেরো-পার্বণের সৃষ্টি। এই বারো মাসে তেরো-পার্বণের উদ্যোগে খানিকটা মুখ বদলাইয়া যায়, খানিকটা নূতন জীবনের সঞ্চার হয়। খানিকটা আমোদ-আহ্লাদ হয়, একঘেয়ের হাত হইতে দু-চার দিন পরিত্রাণ পাওয়া যায়। অক্ষয়বাবু বারো মাসে তেরো-পার্বণ ঠিক ঠিক করিতেন। ক্রমে বছর বছর বারো মাসে তেরো-পার্বণ করিতে করিতে তেরো-পার্বণ একঘেয়ে হইয়া যায়, তখন তার হাত থেকে উদ্ধারের উপায় কী? মাঝে মাঝে তীর্থ করিতে যাওয়া। ঘরে বসিয়া বসিয়া একই রকম কাজ করিতে করিতে যখন বিরক্তি ধরিয়া গেল, তখন একটা-না-একটা তীর্থে যাওয়া, ইহাতে বাঙালির বড়োই উৎসাহ। যখন রেল ছিল না, স্টিমার ছিল না, তখন বাঙালি অনেক দিন ধরিয়া তীর্থ-যাত্রার উদ্যোগে কাটাইয়া দিত, এবং তীর্থ করিয়া আসিয়া সেই গল্পে অনেক দিনের একঘেয়ে ভাবটা কাটিয়া যাইত। অক্ষয়বাবু তাঁহার দীর্ঘজীবনে এক এক করিয়া সকল তীর্থেই বেড়াইয়াছেন। সারা ভারতটা ঘুরিয়া লইয়াছেন। এটাও একটা বাঙালির বাঙালিত্ব; এটাও অক্ষয়বাবুতে ছিল।

অক্ষয়বাবুর একটা বড়ো সৌভাগ্য ছিল, তাঁহাকে উদরান্নের জন্য কখনো খাটিতে হয় নাই। তাঁহার অনেক বয়স পর্যন্ত বাবা বাঁচিয়াছিলেন, আর মরিয়াও যাহা রাখিয়াছিলেন, তাহাতে অক্ষয়বাবুর ও তাঁহার পরিবারবর্গের মোটা ভাত-কাপড়ের বেশ সংস্থান ছিল। তিনি সাহিত্যচর্চাতেই দিন কাটাইবেন স্থির করিয়াছিলেন, সেরূপ দিন কাটাইবার পক্ষে যেরূপ শিক্ষা-দীক্ষার আবশ্যক, তাঁহার বাবা তাঁহাকে সে সবই দিয়াছিলেন। একজন শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সদ্বংশজাত কায়স্থ-সন্তানের যাহা যাহা জানা আবশ্যক, অক্ষয়বাবু পাঠশালা, ইস্কুল কলেজ প্রভৃতি হইতে এবং নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া, নানা লোকের নিকট, যে যে-বিষয়ে ওস্তাদ তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহাদের সব শিক্ষা আদায় করিয়া লইয়াছিলেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে সেইগুলি ছড়াইবেন এই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাই তিনি প্রথম

বয়সেই বঙ্কিমবাবুর সহিত জুটিয়া বঙ্গদর্শনে লিখিতে আরম্ভ করেন, তারপর 'সাধারণী' প্রকাশ করেন, তারপর 'নবজীবন'। নবজীবন মানে হিন্দুর নবজীবন অর্থাৎ Hindu Revival. শিক্ষিত বাঙালিরা (তখন বাঙালি ছাড়া অন্য দেশের শিক্ষিত যাঁরা, তাঁদের সংখ্যা এত কম ছিল যে গণনাতেই আসিত না) একটু একটু বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ইংরাজি পড়িয়া সাহেবিয়ানা করিলে সাহেব তো হওয়া যাইবেই না ; বরং দেশের লোকের সঙ্গে তফাত হইয়া দেশের উন্নতির বিঘ্নের কারণ হইবে। বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময় Civil Service হইতে বরখাস্ত হইলেন।[২] বঙ্কিমচন্দ্র গোরার হাতে লাঞ্ছিত হইয়াও ক্ষমা প্রার্থনা বৈ অন্য প্রতিকার পাইলেন না।[৩] শিক্ষিত বাঙালির চক্ষু ফুটিল যে, সাদা সাদাই থাকিবে, কালো কালোই থাকিবে, সাদায় কালোয় মেশামেশি ঘেঁষাঘেঁষি হইবে না। তাই যখন শশধর তর্কচূড়ামণি [১৮৫১-১৯২৮ খৃ.] মুঙ্গের হইতে আসিয়া হিন্দুধর্মের বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন এবং 'বঙ্গবাসী' [প্রথম প্রকাশ ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৮৮ ব., ১০ ডিসেম্বর ১৮৮১ খৃ.] তাঁহাকে কোল দিলেন, তখন শিক্ষিত বাঙালি বলিয়া উঠিল, এইবার হিন্দুধর্মের একজন apostle আসিয়াছেন। সে দলের মধ্যে অক্ষয়বাবু তো ছিলেনই, কারণ বঙ্গবাসী তাঁহার শিষ্য, সেবক, কর্মচারী, আজ্ঞাবহ মাত্র। বঙ্কিমবাবু, চন্দ্রনাথ বসু [১৮৪৪-১৯১০ খৃ.], রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় [১৮৪৫-৮৬ খৃ.] প্রভৃতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বড়ো বড়ো লোক আগ্রহ-সহকারে তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে গেলেন, তর্কচূড়ামণি সেই সপ্তাহেই বঙ্গবাসীতে লিখিলেন, "ইঁহারা আমার শিষ্য হইয়াছেন।" বঙ্কিমবাবু চটিয়াই লাল ; কিন্তু তখন 'বঙ্গদর্শন' উঠিয়া গিয়াছে ; সেইজন্য নবজীবনে চূড়ামণির জবাব দিলেন। চূড়ামণি আবার বঙ্গবাসীতে তাহার জবাব দিলেন। দিন-কতক বেশ জমাট হইতে লাগিল। চূড়ামণি বলিলেন, যদি হিন্দু হইতে চাও, খাদ্যাখাদ্য বিচার করো, ত্রিসন্ধ্যা করো, নিত্যস্নানী নিরামিষাশী হও, তবে তো হিন্দু হবে। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, তাহা নহে, আমরা অখাদ্যও খাইব, হিন্দুও হইব। তখন Hindu Revival দুই দল হইল। একদল conservative, আর-একদল liberal ; কিন্তু হিন্দুর নবজীবন

করিতে হইবে, সে বিষয়ে কাহারো সন্দেহ রহিল না। সুতরাং অক্ষয়বাবুর নবজীবন বেশ জোরে চলিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তফাতে দাঁড়াইয়া বেশ মজা দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিতেন, আমাদের ধর্ম তো আর মরে নাই যে তাহার নবজীবন বা পুনর্জীবন হইবে; যাহাদের ধর্ম মরিয়াছিল, তাহাদের নবজীবন হউক। আমাদেরই সুবিধা, আমাদেরই দল পুষ্ট হইবে।

নবজীবন ও সাধারণীর দিনকতক তো বেশ পসার হইল। 'সাধারণীর চানাচুর'[৪] তখন আচমনীয় হইলেও আমরা বেশ পেট ভরিয়া খাইয়াছি। সে সময়ে চানাচুর পড়িয়া লোকে যেমন আমোদ ও আনন্দ পাইয়াছিল, তাহার বর্ণনা হয় না। ঘরে ঘরেই চানাচুরের কথা। অক্ষয়বাবুর দেখাদেখি অক্ষয়বাবুর বাবাও চানাচুর লিখিতে আরম্ভ করিলেন। সাধারণীতে কত রহস্য, কত ব্যঙ্গ, কত ঠাট্টা, কত তামাসা চলিত, তাহার আর পার নাই। গুপ্তকবি [ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ১৮১২-৫৯ খৃ.] ত্রিশ বৎসর পূর্বে এইরূপেই বাংলা মাতাইয়াছিলেন, কিন্তু এখন সে রুচি বদলাইয়া গিয়াছে, অক্ষয়বাবুর রঙ্গ-তামাসায় রুচির দোষ একেবারেই ছিল না। তাঁহার 'শুধুই রহস্য,' 'নূতন মতে নূতন পঞ্জিকা,' 'চণকচূর্ণ বা চানাচুর,' 'শুকসারী-সংবাদ,' 'নববোধোদয়,' 'নবজীবনের আটকৌড়ে,' 'ভাই হাততালি' প্রভৃতি লেখাগুলির রুচি অতি বিশুদ্ধ, ব্যঙ্গ অতি তীব্র এবং উপদেশ অতি গভীর। উহাতে আমাদিগকে কমলাকান্তের দপ্তরের মতো ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহালোক, জ্ঞানলোক ও সত্যলোকেরও উপরে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে না সত্য, কিন্তু উহাতে বেশ বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করা যায়। এইরূপ ব্যঙ্গ লেখাই অক্ষয়বাবুর বিশেষ গুণ।

অক্ষয়বাবু পিতার কাছে অনেক শিক্ষা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কিরূপে খবরের কাগজ চালাইয়া লাভ করিতে হয়, সে শিক্ষা তিনি পান নাই। তাঁহার গ্রাহকরা কাগজের দাম দিত না, তিনি আদায় করিতে পারিতেন না। কী কৌশলে চাঁদা আদায় করিতে হয়, জানিতেন না। মাঝে মাঝে ব্যঙ্গ করিয়া, রহস্য করিয়া গ্রাহকদিগকে লজ্জা দিয়া প্রবন্ধ লিখিতেন, আর বিজ্ঞাপন দিতেন। গ্রাহকরা পাইয়া

বসিত। তাহারা মনে করিত যে, টাকা না দিলে যদি এরূপ রঙ্গ-রহস্য বাহির হয়— সে তো ভালোই।

তারপর ভাঙা দল হইতে লাগিল। সাধারণী ভাঙিয়া বঙ্গবাসী হইল, নবজীবন ভাঙিয়া 'ভ্রমর' [প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১২৮১ ব.] হইল, 'প্রচার' [প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১২৯১ ব.] হইল, আরো কত কী হইল। অক্ষয়চন্দ্র ক্রমে সম্পাদকতা ছাড়িয়া আচার্যগিরি আরম্ভ করিলেন ও করিতে লাগিলেন। সে কথা পরে বলিতেছি।

এদিকে তাঁহার বাড়ির অবস্থাও ক্রমে খারাপ হইতে লাগিল। পিতা স্বর্গারোহণ করিলেন, স্ত্রীও পরলোকে গেলেন [সৌদামিনী দেবী, মৃ ১৬ ডিসেম্বর ১৮৯০ খৃ.], কতকগুলি অপোগণ্ড শিশু লইয়া অক্ষয়বাবু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। শিশু তো শিশু, একেবারেই শিশু, একটিও দশ বৎসরের বেশি নহে, নম্বরেও অনেকগুলি, মাতৃহীন ছোটো ছোটো ছেলে লালন-পালন যে কী কষ্ট, তা যে করিয়াছে সেই জানে ; যে ভুক্তভোগী নহে, তাহাকে সে কথা বুঝানো যায় না। অক্ষয়বাবু একেবারে কদমতলাবাসী হইলেন, বাড়ি ছাড়িয়া একপাও নড়িবার জো রহিল না। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার স্ফূর্তি কমিল না। তিনি বলিতেন, মাতৃহীন অপোগণ্ড শিশু পালন করা আর বালগোপালের সেবা করা একই কাজ। তিনি তো বালগোপালের সেবা লইয়া আখড়াধারী বাবাজির মতো কদমতলার আখড়ায় বিরাজ করুন, তাঁহার সাধারণী তাঁহার নবজীবন তাঁহার সাহিত্য-সেবা সব গুটাইয়া আসিল। কিরূপে গুটাইল, কেমন করিয়া গুটাইল, তাহার বিশেষ বিবরণ তাঁহার জীবন চরিত-লেখকেরা দিবেন। আমার এক্ষেত্রে সে কথা কহিতে গেলে একটু বাড়াবাড়ি হইবে।

ছেলেদের লেখাপড়া শিখানো, তাহাদের শরীর যাতে ভালো থাকে তাহা দেখা, তাহাদের স্বভাবচরিত্র যাতে ভালো হয়, তাদের মনে যাতে কোনো ক্ষোভ না হয়, মেয়েরা যাহাতে লেখাপড়া শিখে, সংসারধর্ম করিতে শিখে তাহার চেষ্টা করা, তাহাদের বিবাহ দেওয়া — এই সকল গুরুতর কার্যে অক্ষয়বাবুর অনেক সময় এমন-কি অধিকাংশ সময় কাটিলেও অক্ষয়বাবু বাংলা সাহিত্য ছাড়েন নাই ; কিন্তু এখন হইতে তিনি নিজে আর বড়ো লিখিতেন না, করিতেন

গুরুগিরি বা আচার্যগিরি। বঙ্গবাসীর আচার্যগিরি তাঁহাকে খুবই করিতে হইত, কারণ যোগীন্দ্র বোস্ [১৮৫৪-১৯০৫ খৃ.] তাঁহার হাতে গড়া শিষ্য। তিনি অনেক দিন সাধারণীর সহিত কাজকর্ম করিয়াছিলেন। সকল কাজেই তাঁহাকে অক্ষয়বাবুর পরামর্শ লইতে হইত, অক্ষয়বাবুও অকাতরে তাঁহাকে পরামর্শ দিতেন ও লেখাপড়ার বিষয় সাহায্য করিতেন। অনেক সময় তাঁহার কাগজে লিখিতেনও। শক্ত সমস্যা হইলে যোগীনবাবু গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। চুঁচুড়ায় সমিতি ছিল ; অক্ষয়বাবু তার সভাপতি ছিলেন। ছেলেরা প্রবন্ধ লিখিলে দেখিয়া দিতেন ও তাহাদের ভাষা দুরন্ত করিয়া দিতেন এবং নানা উপায়ে তাহাদের উৎসাহ দিতেন। চুঁচুড়ার শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাকে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিল, উহারা তাঁহার ঋণ ভোলে নাই, ভুলিবে না, ভুলিতে পারিবে না। বৃদ্ধ দীননাথ ধর [জ. ১৮৪০ খৃ.] সর্বদাই অক্ষয়বাবুর কাছে যাইতেন এবং নানারূপ রহস্য করিয়া অক্ষয়বাবুকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেন। বাংলা লেখা, বাংলা গান বাঁধা দীননাথ ধরের একটা বুড়া বয়সের রোগ। তিনি বলেন, 'আমি যাহা কিছু লিখিতাম, অক্ষয় একবার না দেখিয়া দিলে আমার তৃপ্তি হইত না।' অক্ষয়বাবুর আর-এক চেলা আমাদের স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী [১৮৬৪-১৯১৯ খৃ.]। নবজীবনেই তাঁহার হাতেখড়ি হয়। তিনি কেমন করিয়া অক্ষয়বাবুর সহিত পরিচিত হন, কেমন করিয়া তাঁহার লেখা সর্বপ্রথম নবজীবনে প্রকাশ হয়, কেমন করিয়া অক্ষয়বাবু রামেন্দ্রবাবুকে আস্তে আস্তে আপনার করিয়া লন— সে কথা রামেন্দ্রবাবু নিজেই অনেক জায়গায় বলিয়া গিয়াছেন। অক্ষয়বাবুর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। রামেন্দ্রবাবু বলিতেন, দেশটা আপনার : দেশকে মা বলিয়া পূজা করিতে হইবে— বঙ্কিমবাবু এ কথার উদ্বোধন করিয়া যান, কিন্তু এ কথার প্রচার ও বিস্তার অক্ষয়বাবুর নবজীবনে হয়। আর বর্তমান সময়ের যে দেশ-প্রীতি, সেও নবজীবনের লেখার ফল। রামেন্দ্রবাবুর মতন চেলা পাওয়া বড়ো ভাগ্যের কথা। অক্ষয়বাবু তাহা পাইয়াছিলেন, সেজন্য তিনি ধন্য হইয়াছেন।

কিন্তু অক্ষয়বাবুর আচার্যগিরি দশটি বিশটি বা পাঁচশটি চেলা

তৈরি করায় নয়। সেটি হইতেছে তাঁহার বাড়ির মজলিসে। তাঁহার বাবা মজলিস ভালোবাসিতেন। সেকালে গ্রামে গ্রামে বৈঠকখানায় বৈঠকখানায় মজলিস বসিত। পাড়ার লোকে, গ্রামের লোকে একত্র হইয়া গান-বাজনা, আমোদ-প্রমোদ, ঠাট্টা-তামাসা, সেই সঙ্গে সঙ্গে দলাদলির ঘোঁট পরনিন্দা পরকুৎসা সবই চলিত। মজলিসের মুরুব্বি ভালো লোক হইলে ভালো কথাই চলিত, মন্দ লোক হইলে মন্দ কথাই চলিত। ভালো হউক, মন্দ হউক, কতকগুলি লোকে তো মেশামেশি করিত, তার একটা ভালো ফল হইতই হইত। শ্রীযুক্ত দীননাথ ধর বলেন, 'এখনকার লোকে ল্যাজের কেল্লা পাকাইয়া তার উপর বসিয়া গোঁজমোহন হইয়া বাড়িতে থাকেন।' অর্থাৎ একেবারেই মেশামেশি নাই। অক্ষয়বাবুর বাবা ভালো লোক ছিলেন। তাঁর মজলিসে মকদ্দমা মেটামিটির কথা হইত, গল্প-গুজব হইত। সাধারণের অনেক কাজের কথা হইত, গান-বাজনা হইত, স্কুল-কলেজের কথা হইত। অক্ষয়বাবুর নিজের কদমতলার মজলিসে কেবল সাহিত্য হইত। দেশের লোক তো যাইতই, কলিকাতা হইতেও অনেকে তাঁহার ওখানে যাইত। অনেকে সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ লইতে যাইত, অনেকে তাঁহার কাছে শিখিতে যাইত, অনেকে তাঁহার কী মত, তাহা জানিবার জন্য যাইত। গান-বাজনাও তাঁহার বাড়িতে অনেক সময় হইত, সে-সব গান-বাজনা সাহিত্য। তাহাতে কুৎসিত কুৎসার বড়ো নাম-গন্ধ থাকিত না। দূর হইতে যাঁহারা আসিতেন, অক্ষয়বাবু তাঁহাদের খুব যত্ন করিতেন। আমের সময় আম, কাঁঠালের সময় কাঁঠাল, আনারসের সময় আনারস, যখনকার যা খাওয়াইতেন। কেহ দু-একদিন থাকিতে চাহিলে বিশেষ আনন্দিত হইতেন। এইরূপেই তাঁহার আচার্যগিরিটা বেশি হইয়াছিল। রবিবারে প্রায়ই কলিকাতা হইতে দু-চার জন লোক যাইতেন। পাল-পার্বণে ছুটির সময় আরো বেশি, বড়ো বড়ো ছুটিতে আরো বেশি। সুরেশ সমাজপতি [১৮৭০-১৯২১ খৃ] প্রায়ই যাইতেন, পাঁচকড়িবাবু [বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৬৬-১৯২৩ খৃ.] প্রায়ই যাইতেন। ব্যোমকেশ মুস্তফী [১৮৬৮-১৯১৬ খৃ.] অনেক সময় যাইতেন। রামেন্দ্রবাবুও যাইতেন। সাহিত্য-পরিষদের দলের অনেকেই তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিয়াছেন এবং

তাঁহার আচার্যগিরি গ্রহণ করিয়াছেন। অনেকে আবার তাঁহার বই পড়িয়া, সাধারণী নবজীবন পড়িয়া তাঁহার চেলা হইয়াছেন, আর অনেকে দেখা পান নাই। কারণ, স্ত্রী-বিয়োগের পর তিনি কলিকাতার সমাজে বড়ো একটা মিশিতে পারিতেন না। শেষ বয়সে যখন কলিকাতায় আসিলেন, তখন তিনি স্থবির। তিনি বড়ো কোথাও যাইতে পারিতেন না, তাঁহার কাছেই লোককে আসিতে হইত।

তিনি কী দিয়া গুরুগিরি করিতেন, কোন্ বিষয়ে শিক্ষা দিতেন, পূর্বেই বলিয়াছি। তিনি বাঙালির মধ্যে বাঙালি, তাঁহার প্রথম শিক্ষা ও প্রধান শিক্ষা সোজা সরল বাংলা। সংস্কৃত বেশি থাকিবেনা, ফারসি বেশি থাকিবেনা, অথচ চলিত কোনো কথা ছাড়া হইবে না, এইটিই তাঁহার মূলমন্ত্র, এইটিই তিনি সকলকে শিখাইয়াছেন। এমন-কি বঙ্কিমবাবু পর্যন্ত বোধ হয় তাঁহার পাল্লায় পড়িয়া কড়া সংস্কৃত পরিহার করিয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকারের ভাষা, লেখা ও ভঙ্গির খুব সুখ্যাতি করিতেন। চার বৎসর বঙ্গদর্শন চালাইয়া যখন তিনি বিদায় গ্রহণ করেন, তখন সাধারাণী খুব চলিতেছিল। বঙ্কিমবাবু 'তীক্ষ্ণদৃষ্টি-শালিনী তেজস্বিনী' বলিয়া সাধারাণীর খুব সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবুর শেষ বয়সের লেখায় বাংলাটা অনেক সোজা হইয়াছিল, এমন-কি তিনি শেষ বয়সে আগেকার লেখা বইগুলা নূতন ভাষায় লিখিয়া যান। এ-সবই অক্ষয়বাবুর জন্য।

অক্ষয়বাবু আর শিক্ষা দিতেন বাঙালি হইতে। সেই সেকালের সরল সোজা বিশ্বাসী বাঙালি হইতে, পুরানো বাংলা পড়িতে, কীর্তনের গান শুনিতে এবং পুরানো বাংলা বুঝিতে— মোটামুটি বাঙালিকে বাঙালি হইতে উপদেশ দিতেন। দেশের উপর যাহাতে দেশের লোকের টান হয় সেজন্য চেষ্টা করিতেন। ইহার উপর বেশি বলিতে গেলেই রাজনীতি আসিয়া পড়ে, কারণ দেশের লোকের যদি দেশের প্রতি টান হয়, তাহা হইলে ইংরাজের দিকে টান কমিয়া যায় সুতরাং রাজনীতিতে আসিয়া পড়ে। অক্ষয়বাবু 'পিতাপুত্র' নামে তাঁহার পিতার ও নিজের জীবন-চরিত লিখিয়াছেন। তাহাতে সর্বত্রই রাজনীতি পরিহার করিয়াছেন, অনেক জায়গায় বলিয়াছেন, "এই পর্যন্ত

লিখিলাম আর-একটু বলিলেই রাজনীতি হইবে সুতরাং তাহা আর লিখিলাম না।"

চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনীর [ষষ্ঠ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, ১৩১৯ ব.] সভাপতি হইয়া তিনি বাংলার ম্যালেরিয়ার জন্য বড়ো কাঁদিয়াছেন। অনেকে বলেন, তিনি ধান ভানিতে শিবের গীত গাহিয়াছেন। সাহিত্য সম্মিলনে ম্যালেরিয়ার কথা কেন? অক্ষয়বাবুর কাছে বাঙালি লইয়া বাংলা সাহিত্য, আর বাংলা সাহিত্য লইয়া বাঙালি; দুইয়ে একটা অচ্ছেদ্য অভেদ্য সম্বন্ধ। বাংলার সাহিত্য বলিতে গেলেই বাঙালি আসে, আর বাঙালির কথা বলিতে গেলেই ম্যালেরিয়ার কথা আসে। বাস্তবিকই ম্যালেরিয়া বাংলার গণ্ডগ্রামগুলিকে উৎসন্ন দিয়া শুধু বাঙালির নহে, বাংলা সাহিত্যেরও অর্ধেকটা প্রাণবধ করিয়াছে। অক্ষয়বাবুর বাবা উলোর যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে গ্রাম যেন হাসিতেছে। লোকের কত স্ফূর্তি, কত আনন্দ, কিন্তু একবৎসরের মধ্যে সে উলো কোথায় চলিয়া গেল। সে স্ফূর্তি নেই, আমোদ নাই, গ্রাম যেন বন হইয়া গিয়াছে। অক্ষয়বাবু হালিশহরের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পড়িলে চক্ষে জল আসে।

অক্ষয়বাবুর সমালোচনা খুব তীব্র ছিল, সে সমালোচনার ঘায়ে অনেককেই ছটফট কারতে হইত। আমি একবার তাঁহার হাতে পড়িয়াছিলাম। আমি বঙ্গদর্শনে 'কাঞ্চনমালা' নামে একটি গল্প লিখি। ভাষা যতদূর সোজা করিবার, তাহা করি; কিন্তু এক জায়গায় একটা গভীর রাত্রির বর্ণনা করিতে গিয়া কথকদের একটা চূর্ণী চুরি করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারি নাই। সেটা এই, "ঘোরা দ্বিপ্রহরা যামিনী কুমুদ-বনাহ্লাদিনী শান্তনলিনী ঝিল্লীরব মুখরিতা পেচককুল কলরব উদ্ঘোষিণী, তখন শাট্যঞ্চলে বদনাবগুণ্ঠন করত অভিসারিকাকুল আপনাপন প্রেমপাত্রের নিকট গমন করিতেছেন।"[৫] অক্ষয়বাবু প্রবন্ধটির সমালোচনা করিলেন— ভাষাটি বেশ সুন্দর, পরিষ্কার কিন্তু মাঝখানে এ-কি কক্কড়-কক্কড় ক্কড়াৎ! আমি পড়িয়া হাসিলাম, মনে হইল, অক্ষয়বাবু বোধ হয় কথকতা ভালো করিয়া শুনেন নাই। নইলে কথকের চূর্ণী তিনি ধরিতে পারিলেন না কেন? কথকের চূর্ণীগুলিকে আমি বাংলা ভাষার অতুলনীয় সম্পত্তি বলিয়া মনে করি।

তাল ও লয়ের সহিত উচ্চারণ করিলে হাজার হাজার লোক মুগ্ধ হইয়া যায়, ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তাহার পর অক্ষয়বাবুর 'পিতাপুত্র' পড়িয়া দেখিলাম, তিনি বাংলার সব রকম সাহিত্যের কথা বলিয়াছেন, কীর্তন-গান, খেমটা, ঢপ, যাত্রা, কবি, পাঁচালি, সকলের কথা, কিন্তু কথকতার কথা নাই।

অক্ষয়বাবু নিজে একবার বিষম সমালোচনার দায়ে ঠেকিয়াছিলেন। কয়েকজন বন্ধু— বিশেষ শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী বসু মহাশয়ের অনুরোধে অক্ষয়বাবু একখানি বাংলা school book লিখিয়াছিলেন। বইখানি টেক্সট বুক কমিটি তিনবার না-পছন্দ করিল। তখন অক্ষয়বাবু কমিটির চাঁইয়ের কাছে দূত পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, কেন তাঁহার বই না-পছন্দ হইল। চাঁই বলিলেন, "দেখুন দেখি মহাশয়, অক্ষয়বাবু লিখিয়াছেন কিনা 'গুরু-মহাশয় আমাকে বেঞ্চের উপর দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন।' এই সব ভাষা শেখাবার জন্যই কি আমরা স্কুলে ছেলে পাঠাই?" অক্ষয়বাবুর দূত অক্ষয়বাবুকে এই সকল কথা বলিলেন। অক্ষয়বাবু তাঁহাকে আবার চাঁইয়ের কাছে পাঠাইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কী লিখিতে হইবে?" চাঁই বলিলেন, "কাষ্ঠাসনের উপর দণ্ডায়মান করাইয়া দিয়াছিলেন।" অক্ষয়বাবু বলিলেন, "তবে আর আমি স্কুল-বই লিখিব না।"

অক্ষয়বাবু আমার আর-একখানি বইয়ের ['ভারত মহিলা' ১৮৮১ খৃ.] বেশ সমালোচনা করিয়াছিলেন, সেখানিই আমার প্রথম বই, ১৮৭৪ সালে লেখা। ছাপা অনেক পরে হইয়াছিল, সমালোচনা আরো অনেক পরে। অক্ষয়বাবু বলিয়াছিলেন, "এই গ্রন্থকার ও পাঠকের মধ্যে ভাষা বলিয়া একটা ব্যবধান নাই।"[৬] আমি সোজা বাংলা লিখি বলিয়া তিনি আমাকে বড়ো ভালোবাসিতেন। তাঁহারই প্রস্তাবে একবার এই সাহিত্য-পরিষদে সভাপতি হইয়াছিলাম। আমার মেজদা ৺রঘুনাথ ভট্টাচার্য [১৮৪৬-৯৭ খৃ.] ও অক্ষয়বাবু একই বৎসরে জন্মগ্রহণ করেন। উভয়েই হুগলি কলেজে পড়িতেন এবং একই ক্লাসে পড়িতেন। মেজদার মুখে সর্বদাই শুনিতাম, অক্ষয় বড়ো ভালো ছেলে— অক্ষয় ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট হইয়াছিল। আমি বরাবরই তাঁহাকে বড়ো ভাইয়ের মতন ভক্তি করিতাম। তাঁহার সহিত আলাপ করিবার চেষ্টা

করিতাম। তাঁহাকে দেখিলে আমার খুব স্ফূর্তি হইত। আজ তাঁহার এই তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠায় পৌরোহিত্য করিয়া আমি ধন্য হইলাম এবং আমায় এই কার্যে বরণ করিয়া আপনারা আমার যে উপকার ও সম্মান করিলেন, তাহা আমি কখনো ভুলিব না।

‘ভারতী’
ভাদ্র, ১৩২৯ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্যবিবরণীর খাতায় উল্লেখ আছে ৩ আষাঢ় ১৩২৯ ব. শনিবার অপরাহ্ণ সাড়ে ছটায় অনুষ্ঠিত অষ্টম বিশেষ অধিবেশনে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন উপলক্ষে শাস্ত্রীমশায় সভাপতির অভি-ভাষণ রূপে এই প্রবন্ধ পড়েন। এই সভায় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "বাল্য-কাল হইতেই অক্ষয়চন্দ্রের সহিত আমি পরিচিত ছিলাম। 'বঙ্গবাসী'র সম্পর্কে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ইন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্র তখন 'বঙ্গবাসী'র লেখক ছিলেন। সভাপতি মহাশয় ঠিক বলিয়াছেন যে, অক্ষয়চন্দ্র খাঁটী বাঙ্গালীনবীশ ছিলেন। আজকাল স্বদেশী-নন-কোঅপারেশন প্রভৃতি হইতেছে। কিন্তু ১৮৯৬ সালে 'বঙ্গবাসী'তে তিনি দেশীয়ভাব, দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের জন্য, স্বদেশজাত দ্রব্যের ব্যবহারের জন্য ধারাবাহিকভাবে লিখিতেন ও নিজে সেই সকল দ্রব্য ব্যবহার করিতেন এবং এই সকল প্রচলনের জন্য বহু অর্থব্যয় করিয়াছেন। ইংরেজী শিক্ষিত ও সাহেবী চালচলনের পক্ষপাতীদের লক্ষ্য করিয়া তিনি ৩০ বৎসর পূর্ব্বে 'আর্য্যামী ও সাহেবীয়ানা' লিখিয়াছিলেন। প্রাচীন সাহিত্য বিশেষতঃ ছড়া পাঁচালী রক্ষার জন্য তাঁহার প্রচেষ্টা সর্ব্বজনবিদিত ছিল। দাশুরায়ের পাঁচালী সংগ্রহের জন্য নানা স্থানে অক্ষয়চন্দ্র নিজে ঘুরিয়া ছিলেন। বড়ায় এই পাঁচালী সংগ্রহের সময় আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। অক্ষয়বাবুর সময়কে বাঙ্গালার বৈদিকীযুগ— বঙ্কিমযুগ— অথবা Augustan Period বলা যায়। ইন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ, চন্দ্রশেখর, রাজকৃষ্ণ, ভূদেবচন্দ্র, হেমচন্দ্র —আর অদ্যকার সভাপতি শাস্ত্রীমহাশয়— ইঁহাদের মধ্যে আলোচনা-পরামর্শ হইত— বৈঠক হইত। শাস্ত্রীমহাশয় গেলেই সে যুগের পরম্পরা যাইবে। আমাদের কথা কইতে তাঁহারা শিখাইতেন। এখন আর সে সজীবতা নাই। বাঙ্গালার সে মজলিস আর নাই। হেমচন্দ্র কবিতা লিখতেন— আড্ডায় দেখাতেন —অক্ষয়চন্দ্রকে দেখাতেন। অনেকে জানেন বঙ্কিমের 'কমলাকান্তের দপ্তরের' অনেক লেখা অক্ষয়চন্দ্রের। বঙ্কিমের দৃষ্টি ছিল দেশের দিকে, অক্ষয়ের দৃষ্টি দেশের শিল্প বাণিজ্য— রোগশোক প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ অবস্থার দিকে। আমরা যাকে Partiotism বলি— অক্ষয়চন্দ্রের তাহা ছিল— দেশাত্মবোধ তাঁহারই ছিল। সে বঙ্কিমযুগ— সেই first class intellect এর যুগ চলিয়া গিয়াছে।

১৮৩৭ হইতে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার একটা areaর মধ্যে হালিসহর, কাঁটালপাড়া, চুঁচুড়া, বাঁশবেড়ে হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত— এই স্থানটুকুর মধ্যে কেশবচন্দ্র, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র প্রভৃতি বহু মনীষীর উদ্ভব হইয়াছিল —এমন আর কোথায়ও নাই। সন্দর্ভ, ভাষা, কবিতা, গদ্যপদ্য প্রভৃতি নূতন পদ্ধতিতে রচনা এই সময় হইতেই সুরু হয়। আমাদের সভাপতি শাস্ত্রীমহাশয় —সে যুগের শেষ শিবরাত্রের সলিতা— তিনি বাঙ্গালার প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা popularise করিয়াছেন। তিনি সে যুগের ব্যাখ্যাতা, পরামর্শদাতা, বিশ্লেষণকারীদিগের শেষ। সাহিত্য-পরিষৎ অক্ষয়চন্দ্রের চিত্র-প্রতিষ্ঠা করিয়া খুব ভাল কাজ করিয়াছেন। এই শ্রেণীর মনস্বীগণকে দেখিয়া— তাঁহাদের রচনা পাঠ করিয়া—উপদেশাবলী গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যতে বাঙ্গালী কোন শুভক্ষণে হয়ত অমৃত উদ্গীরণ করিয়া দেশকে ধন্য করিবে। বৈষ্ণব-সাহিত্য ব্যাখ্যা করিয়া অক্ষয়চন্দ্র অমর হইয়াছেন— বন্দেমাতরম ব্যাখ্যা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অমর হইয়াছেন।

"বাঙ্গালী অমর ; এই সকল মহাত্মার ভাব ও প্রভাব বাঙ্গালী জীবনে অনুস্যূত হউক। আমরা সেই পথের পথিক, আসুন, আমরা তাঁহাদের কাজের ধারা বজায় রাখিবার চেষ্টা করি।"

অক্ষয়চন্দ্রের জন্ম চুঁচুড়ায় ২৭ অগ্রহায়ণ ১২৫৩ ব., ১১ ডিসেম্বর ১৮৪৬ খৃ.। বাবা গঙ্গাচরণ।

শিক্ষা : হুগলি কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা ১৮৬৩ খৃ., হুগলি কলেজ থেকে এফ. এ. ১৮৬৫ খৃ. ও বি. এ. ১৮৬৭ খৃ., প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এল. ১৮৬৮ খৃ.।

বাবা বহরমপুরে সদর মুন্সেফ ছিলেন। এই সূত্রে অক্ষয়চন্দ্র বহরমপুরে ১৮৬৮-৭৩ খৃ.— পাঁচ বৎসর ওকালতি করেন।

চুঁচুড়া থেকে 'সাধারণী' সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন ১১ কার্তিক ১২৮০ ব., ২৬ ডিসেম্বর ১৮৭৩ খৃ.। সাধারণীর শেষ সংখ্যা (চতুর্থ ভাগ, ২১ সংখ্যক) প্রকাশিত হয় ১৮ ভাদ্র ১২৯৬ ব.। কলকাতা থেকে 'নবজীবন' মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন শ্রাবণ ১২৯১ ব.। নবজীবন শেষ সংখ্যা (পঞ্চম ভাগ, ১২ সংখ্যক) প্রকাশিত হয় ভাদ্র ১২৯৬ ব.।

রচনাবলী : 'শিক্ষানবিশের পদ্য' (১৮৭৪ খৃ.), 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ (১৮৭৪-৭৭ খৃ.), 'সমাজ-সমালোচন' (১৮৭৪ খৃ.), 'গোচারণের মাঠ' (১৮৮০ খৃ.), 'হাতে হাতে ফল' (১৮৮২ খৃ.), 'সংক্ষিপ্ত রামায়ণ' (১৮৮২ খৃ.), 'আলোচনা' (১৮৮২ খৃ.), 'পিতা-পুত্র' (১৩১১ ব.), 'সনাতনী' (১৯১১ খৃ.), 'কবি হেমচন্দ্র' (১৯১২ খৃ.), 'মোতি-কুমারী' (১৯১৭ খৃ.),

'মহাপূজা' (১৯২১ খৃ.), 'রূপক ও রহস্য' (১৯২৩ খৃ.), কালিদাস নাগ সম্পাদিত 'অক্ষয় সাহিত্যসম্ভার' (১৯৬৫ খৃ.) এবং 'অক্ষয় সাহিত্যসম্ভার' শেষার্ধ' (১৯৬৬ খৃ.)।

মৃত্যু ১৬ আশ্বিন ১৩২৪ ব., ২ অক্টোবর ১৯১৭ খৃ.।

১. অক্ষয়চন্দ্রের বাবা গঙ্গাচরণ সরকার (১২৩০-৯৫ ব.) সাধারণী ও নবজীবনের লেখক ছিলেন। রচিত বই 'ঋতুবর্ণন' (কবিতা, ১৮৭৪ খৃ.), 'হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা' (১৮৭৯ খৃ.), 'বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা' (১৮৮০ খৃ.) 'ঋতুবর্ণন, কবিতাবলী ও গীতাবলী' (১৩২০ ব.)। বিস্তারিত পরিচয়ের জন্য দ্র. অক্ষয়চন্দ্র রচিত 'পিতা-পুত্র', "অক্ষয় সাহিত্যসম্ভার", কলকাতা ১৯৬৫ খৃ.।

২. সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫ খৃ.) ১৮৬৯-এ ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাস করে ১৮৭১-এ সিলেটের অ্যাসিস্টাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। ১৮৭৩-এ সরকারি চাকরি থেকে বরখাস্ত হন।

৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪ খৃ.) ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার হয়ে বহরমপুরে যান। বহরমপুরে থাকার সময়ে একদিন সেনা নিবাসের সামনের মাঠ দিয়ে কাছারি থেকে ফেরার পথে কম্যাণ্ডিং অফিসার কর্নেল ডাফিন তাঁকে অপমান করেন। বঙ্কিমচন্দ্র ডাফিনের বিরুদ্ধে মামলা করলে জজ বেন্‌ব্রিজ মধ্যস্থ হয়ে মামলা মিটিয়ে দেন। প্রকাশ্য আদালতে ডাফিন বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। দ্র. শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বঙ্কিম কাহিনী,' "স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবন-চরিত", কলকাতা ১৩১৮ ব., পৃ. ৪১-৪৭।

৪. সাধারণী পত্রিকার একটি বিভাগ 'চণকচূর্ণ'। এতে হাল্‌কা ব্যঙ্গাত্মক রচনা থাকত। অক্ষয়চন্দ্রের মন্তব্য, "সাধারণীতে 'চেণাচুর' নাম দিয়া, পাঠককে বালক সাজাইয়া মুঠা মুঠা বিদ্রূপ বর্ষণ করিতাম। 'সাধারণীর চেণাচুর' একটা উপমার সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছিল। সাহিত্যে, সংবাদ-পত্রে,— সাধারণীর চেণাচুরের উল্লেখ থাকিত, কিষণ দাস্ কি চেণা,— তের রূপেয়া, চার আনা— বড় লোক লেতেহে, বড় লোক খাতেহে' ইত্যাদি কথা তখন লোকের মুখে মুখে শুনা যাইত। চেণাচুর ছেলেরাই

খায় ; সাধারণীর চেণাচুর বুড়ারাও ফোক্‌লা দাঁতে চিবাইতে লাগিলেন ; এ দিকে কেশববাবুর সম্প্রদায়ের দুই চারিজন লেখক বুদ্ধদেব যীশুখৃস্ট শ্রীগৌরাঙ্গকে লইয়া বড়ই নাচাইতে আরম্ভ করিলেন। পিতা ধর্মের বিকৃত ভাব লক্ষ্য করিয়া সাধারণীতে এক 'ধরম্‌চাঁদাকি চেণাচুর' লিখিলেন।" দ্র. 'পিতা-পুত্র', "অক্ষয় সাহিত্যসম্ভার", কলকাতা ১৯৬৫ খৃ.।

৫. দ্র. হ-র-সং-১, পৃ. ১০৪।

৬. "পুস্তকের লেখা এমন পরিষ্কার যে, ভাষার যে একখানা আবরণ আছে তাহা বুঝিতেই পারা যায় না। মনে হয়, নিরবচ্ছিন্ন ভাবের সহিত বুঝি একেবারেই সাক্ষাৎ হইতেছে।" 'সাধারণী', ২৩ আষাঢ় ১২৮৮ ব., পৃ. ১৩৮।

আমি ৺দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠার দিন উপস্থিত হইতে পারিলাম না, ইহার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। কার্যের অনুরোধে আমায় দূরদেশে আসিতে হইয়াছে, সুতরাং সভায় উপস্থিত হইতে পারিলাম না।

দেবেন্দ্রবিজয় আমার পরম বন্ধু ছিল। আমরা দুই জনে একত্রে হেয়ার স্কুলে দুই-তিন বৎসর কাজ করিয়াছিলাম। সে আজ দীর্ঘ ৪০ বৎসরের কথা। আমি তখন হইতেই জানি, বাংলা সাহিত্যে দেবেন্দ্রবিজয়ের কত অনুরাগ। আমরা দু জনে বসিয়া বাংলা বই পড়িতাম, সমালোচনা করিতাম, অনেক গ্রন্থকারের দাবি ডিক্রি ডিস্‌মিস

করিতাম। দেবেন্দ্র কবিতা লিখিয়া আনিত, আমি সমালোচনা করিতাম ; আমিও তখন যাহা লিখিতাম, দেবেন্দ্রকে না দেখাইয়া ছাপিতে দিতাম না। দেবেন্দ্র 'বঙ্গবাসী'তে আমার 'বাল্মীকির জয়ে'র যে সমালোচনা করিয়াছিল,[১] এখনো সেটা পড়িলে আমার আনন্দ হয়। দুই-তিন বছরের পর আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়। দেবেন্দ্র ক্রমে উকিল, মুন্সেফ ও সব্‌জজ হইয়া পেন্‌সন লয়। আমিও অনেক জায়গায় চাকরি করিয়া পেন্‌সন লই। দেবেন্দ্র যখন বর্ধমানে সব্‌জজ, তখন বর্ধমানে সাহিত্য-সম্মিলন হয়। সেই সম্মিলনে দেবেন্দ্র আমার গলায় মালা দেয়,[২] তাহাতে আমার যে কী আনন্দ হইয়াছিল, তাহা কথায় প্রকাশ করা যায় না। দেবেন্দ্র পেন্‌সন লইয়া কলিকাতায় আসিলে আমি তাহাকে প্রায়ই দেখিতে যাইতাম, কারণ তাহার দৃষ্টিশক্তি কমিয়া গিয়াছিল, সে বাড়ির বাহির হইতে পারিত না। আমি তাহাকে দেখিতে গেলে, সে গায়ে হাত দিয়া আমাকে চিনিত। শেষ কয় বৎসর ধরিয়া সে ভগবৎগীতা লইয়াই থাকিত। ভগবৎগীতা সম্বন্ধে কে কোথায় কী বলিয়াছে, ভগবৎগীতা বুঝিতে হইলে কোন্ কোন্ শাস্ত্র পড়া চাই, কোন্ পুস্তক পড়া চাই, এই সকল খুটিনাটি করিয়া লিখিত এবং ভগবৎগীতার যত প্রকার ব্যাখ্যা হইতে পারে, তাহা করিবার চেষ্টা করিত। তাহার ইচ্ছা ছিল, আট ভলুমে বইখানি শেষ হয়, কিন্তু ততদূর সে যাইতে পারে নাই। তাহার পূর্বেই কাল তাহাকে গ্রাস করিয়াছে। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সে গীতার ব্যাখ্যা লিখাইয়াছে।

১৩২০ সালে দেবেন্দ্রবিজয়ের সম্পাদিত গীতার প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। মৃত্যুর পূর্বে সে উহার অষ্টম ভাগ পর্যন্ত প্রকাশ করিয়া যায়। ইহার শেষ খণ্ড এখনো প্রকাশিত হয় নাই।

বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর যে সংস্করণ বাহির হয়— দেবেন্দ্রবিজয় তাহা সম্পাদন করে। ঐ সংস্করণে সে কবির জীবনবৃত্তান্ত, কবির কাব্যের সমালোচনা ও টীকা করে। তাহা খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সুন্দর।

১৩১৫ সালে দেবেন্দ্রবিজয়ের 'সমাজ ও তাহার আদর্শ' নামে একখানি সামাজিক প্রবন্ধের বই বাহির হয়। এ ছাড়া বহু মাসিক

পত্রিকায় প্রকাশিত দেবেন্দ্রবিজয়ের লিখিত অনেক প্রবন্ধ ও কবিতা আছে। তাহার পুত্রগণ, আশা করি, সেগুলি প্রকাশ করিবে।

দেবেন্দ্রবিজয়ের মনটি বড়ো নরম ছিল ; সে পরের দুঃখে বড়ো কাতর হইত. কিন্তু তাহার জন্য, তাহার বিচার-কার্যে কোনো দোষ ঘটে নাই। বিচারের সময় সে যেন পাথরের মানুষ, কোনো দিকেই টলিত না।

দেবেন্দ্রবিজয় বিখ্যাত নাটককার ৺দীনবন্ধু মিত্র [১৮৩০-১৮৭৩ খৃ.] মহাশয়ের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল, তাহাতেও শ্বশুর বাড়ির সংসর্গে তাহার সাহিত্যানুরাগ বাড়িয়া গিয়াছিল।

সে মরিয়া গিয়াছে, আমরা তাহার বন্ধুবান্ধব তাহার জন্য শোক করিতেছি, আমাদের হৃদয়ে তাহার স্মৃতি জাগরূক আছে এবং যে-কয় দিন বাঁচিব থাকিবে, পরবর্তী লোকের কাছে তাহার স্মৃতি জাগরূক রাখিবার জন্য এই চিত্র রহিল। ইহা দেখিলে, লোকের মনে হইবে দেবেন্দ্রবিজয় বসু নামে একব্যক্তি যাবজ্জীবন সাহিত্যের ও ভগবৎগীতার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন।

'সুবর্ণবণিক সমাচার'
বৈশাখ, ১৩৩১ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য।

'সুবর্ণবণিক সমাচার' বৈশাখ ১৩৩১ ব. সংখ্যায় এই রচনা 'সাহিত্য সংবাদ' পর্যায়ে ছাপা হয়েছিল। সূচনায় মন্তব্য ছিল—

"গত ২০শে মাঘ [১৩৩০ ব.] রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে স্বর্গীয় সাহিত্যিক দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে একটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। অধিবেশনে পূজনীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নিম্নলিখিত মন্তব্য লিখিয়া পাঠান, উহা শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত কর্ত্তৃক পঠিত হয়।"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩০ বর্ষের সাংবৎসরিক কার্যবিবরণে উল্লেখ আছে—

"সপ্তম বিশেষ অধিবেশন ২৩এ মাঘ, রবিবার স্বর্গীয় দেবেন্দ্রবিজয় বসু এম্. এ., বি. এল্. মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠার্থ এই অধিবেশন আহূত হয়। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি. এ. মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।... সভাপতি মহাশয় ৺দেবেন্দ্রবাবুর চিত্রাবরণ উন্মোচন করেন।..."

দেবেন্দ্রবিজয় বসুর জন্ম হুগলি জেলার বাক্‌সাড়া গ্রামে, ২৮ ফাল্গুন ১২৬৪ ব., ১০ মার্চ ১৮৫৮ খৃ.। বাবা শ্যামাচরণ, মা গঙ্গামণি দেবী।

Presidency College Centenary Volume 1955-এ উল্লেখ আছে দেবেন্দ্রবিজয় ১৮৭৬-৮২ খৃ. এখানে ছাত্র ছিলেন, প্রথম শ্রেণীতে চতুর্থ হয়ে বি. এ. পাস করেন ১৮৭৯ খৃ.। পরে এম. এ. ও বি.এল. পাস করেন জানা যায়।

কর্মজীবনের সূচনা হেয়ার স্কুলের শিক্ষকরূপে, পরে মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যাপক হন। আলিপুর আদালতে কিছুদিন ওকালতি করেন এবং এই সূত্রে মুন্সেফের পদ পান। চাকরি থেকে অবসর নেবার সময়ে সাব্‌জজ ছিলেন।

'নবজীবন', 'প্রচার', 'নব্যভারত', 'বঙ্গবাসী' প্রভৃতি পত্রিকার লেখকরূপে সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। ১৮৮২ খৃ. থেকে বঙ্গবাসীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয় এবং কিছু দিন সম্পাদনার কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

রচিত বই : 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা' ব্যাখ্যাসহ পদ্যানুবাদ ১-৬ খণ্ড ১৩২০-২৬ ব.।

মৃত্যু ৮ কার্তিক ১৩২৬ ব.

১. দ্র. হ-র-সং ১, পৃ. ৫৬৪-৬৫।

২. "স্বস্তিবাচনের পর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু এম এ, বি এল এবং শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় সরস্বতী-মন্দির হইতে প্রসাদ-মাল্য লইয়া আসিয়া সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই ও অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মাননীয় মহারাজাধিরাজ সার বিজয়চন্দ মহতাব বাহাদুর কে সি, এস, আই, কে, সি, আই, ই, আই ও এম্ মহাশয়দ্বয়ের গলদেশে প্রদান করিলেন।" দ্র. বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, অষ্টম অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ, বর্ধমান ১৩২১, পৃ. ১১।

ইংরাজি ১৮৫৪ সালের ভাদ্র মাসে ৺প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় ৺রাধানাথ শিকদারের সহায়তায় একখানি মাসিকপত্র বাহির করেন। উহার প্রত্যেক সংখ্যার গোড়ায় লেখা থাকিত, "ইহা চলিত ভাষায় লেখা, স্ত্রীলোকদের জন্যই লেখা, পণ্ডিতেরা ইচ্ছা করেন— পড়িতে পারেন, তবে ইহা তাঁহাদের জন্য লেখা নহে।" এইরূপে চলিত ভাষায় লিখিব বলিয়া পণ করিয়া বাংলা লেখা এই প্রথম। স্ত্রীলোকদিগের জন্য লিখিব বলিয়া পণ করিয়া লেখাও, বোধ হয়, এই প্রথম। ইহার পূর্বে বাংলা ছিল, বাংলা গদ্য ছিল— কিন্তু সেগুলি সাধুভাষা বা পণ্ডিত ভাষায় লেখা। চলিত ভাষা থেকে যত দূরে থাকা যায়,

ততই ভাষার গৌরব হইবে, পণ্ডিত মহাশয়দের এই ধারণাই ছিল। সে ভাষা স্ত্রীলোকের কথা দূরে থাকুক, অনেক পুরুষের পক্ষে বোঝা কঠিন ছিল। আমি বাল্যকালে এক বৃদ্ধকে তারাশঙ্করের [তর্করত্ন, মৃ. ১৮৫৮ খৃ.] 'কাদম্বরী'র [১৮৫৪ খৃ.] তর্জমা পড়িয়া বলিতে শুনিয়াছিলাম— আহা! তারাশঙ্কর কী চমৎকার ভাষাই লিখিয়াছে! অভিধান ভিন্ন এক বর্ণও বোঝা যায় না। এই তো লেখার গাম্ভীর্য।

যখন ভাষার প্রতি লোকের এইরূপ ভাব, তখন চলিত ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করা খুব সাহসের কাজ, খুব দূরদৃষ্টিরও কাজ। প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, সাধুভাষা লোকে পড়িতে পারে না, বুঝিতে পারে না, সুতরাং সে ভাষায় লেখা আর না লেখা, দুই সমান। তাই তিনি চলিত বাংলা ধরেন। এ ধরায় বিশেষ উপকার হইয়াছে। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে বাংলা একটা ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

স্ত্রীলোকদের জন্য লেখা, ইহারো বিশেষত্ব আছে। আগে বাংলা গদ্যে বই লেখা হইত— তার বিষয় হয় সংস্কৃত হইতে নেওয়া, নয় বিচার, না-হয় নাটক ও নভেল— রুচি এমন কদাকার যে, স্ত্রীলোকের হাতে কোনো মতেই দেওয়া যায় না। তাই শুধু মেয়েদের পড়িবার জন্য, তাহাদের আমাদের জন্য, যাহাতে তাহাদের শরীর ও মনের স্ফূর্তি হয়, তাহার জন্য ভালো ভালো উপদেশ দিয়া এই পত্রিকা বাহির করা হয়। বঙ্কিমবাবু ঠিক বলিয়াছেন, ইহার পূর্বে বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরাজির গণ্ডির মধ্যে থাকিত, তাহার নিজের গণ্ডি ছিল না। বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রই প্রথমে দেখাইয়াছেন যে, বাংলাদেশেও ঘরের কথা লইয়া বই লেখা যায়, আর সে বই পড়িবার মতনও হয়। আর এই ৭০ বৎসর পরে এখনকার লোকের ধারণা, বাংলায় ঘরের কথা লইয়াই বই লেখা উচিত এবং তাহা পড়িলেই বেশি উপকার হয়।

প্যারীচাঁদ মিত্রের 'মাসিক পত্রিকা'তেই 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রথম বাহির হয়। ঐ গল্প পঁচিশ সংখ্যাতে বই হইয়া বাহির হয়। ঐ বইয়ে কিন্তু বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রের নাম ছিল না, মলাটে লেখা ছিল, 'শ্রীটেকচাঁদ ঠাকুর প্রণীত'। টেকচাঁদ ঠাকুর কে, ইহা

কেহই বুঝিতে পারিত না। বাবু প্যারীচাঁদ যখন মেট্‌কাফ হলের সেক্রেটারি ও পব্‌লিক লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান, সেই সময় আসাম দেশ হইতে একজন বড়োলোক কলিকাতায় বেড়াইতে আসেন— তাঁহার নাম ছিল ঢে'কচন্দ্র ফুকন্। তিনি কলিকাতার বড়ো বড়ো বাঙালিদিগের সঙ্গে খুব মিশিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইতেই বোধ হয়, টেকচাঁদ ঠাকুরের উৎপত্তি। সেকালের অনেক লোকেই তাঁহার নাম জানিত, এখনকার লোকে ভুলিয়া গিয়াছে।

বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র যদি দুই-একখানি আলালের ঘরের দুলালের মতন গল্পের বই লিখিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতেন, তাহা হইলেও তাঁহাকে গল্পের প্রথম লেখক বলিয়া মান্য করিতে হইত। কিন্তু গল্প লেখার চেয়ে তিনি ঢের বেশি কাজ করিয়া গিয়াছেন। তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন, বাংলায় সব জিনিসই লেখা যায়, সব ভাবই প্রকাশ করা যায়। বাংলায় দর্শনবিজ্ঞানেরও বই লেখা যায়। তিনি চাষ ও বাগান করা সম্বন্ধে বাংলায় অনেক রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি এগ্রি-হর্টিকাল্‌চার সোসাইটির মেম্বর ছিলেন। এই উপলক্ষে চাষ ও বাগানের বিষয়ে তিনি অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। সেগুলি চলিত ভাষায় লেখা, সহজ করিয়া লেখা, তাহা পড়িলে এখনো লোকের উপকার হইতে পারে। তাঁহার 'আধ্যাত্মিকা'য় অতি সহজ করিয়া যোগ ও বেদান্ত-দর্শনের অনেক গভীর কথা বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তাঁহার 'অভেদী'তেও এই রকম দর্শনশাস্ত্রের কথা আছে। মাসিক পত্রিকায় তিনি যে-সকল ইতিহাসের গল্প লিখিয়াছেন, সেগুলিও বড়ো মিষ্ট। গজনির সুলতান মামুদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া কোন্ বারে কী করিয়াছিলেন, তাঁহার মাসিক পত্রিকায় অতি সুন্দর করিয়া তাহা লেখা আছে। ভণ্ড পাষণ্ডদের কী করিয়া বিদ্রূপ করিতে হয়, তাহা তিনি বেশ জানিতেন। ভবশংকরবাবু, বাচস্পতি মহাশয়, গোঁসাইজি প্রভৃতির চরিত্রে ভণ্ডামি কেমন করিয়া ধরাইয়া দিতে হয়, তাহা তিনি বেশ দেখাইয়াছেন। তিনি চোঁচাপটে দেখাইয়াছেন যে, বাংলা ভাষায় সব রকম ভাবই প্রকাশ করা যায়, আর সব রকম সাহিত্যই লেখা যায়।

প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় এক অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি

খুব খাটিতে পারিতেন। খাটিয়া তিনি কখনো ক্লান্তি বোধ করিতেন না। ছেলেবেলা হইতেই তাঁহার খাটুনির আরম্ভ। হিন্দু কলেজে পড়িতে পড়িতেই তিনি বাড়িতে এক স্কুল বসাইয়াছিলেন। তিনিই বেশি করিয়া পড়াইতেন। তাহার পর যত বয়স বাড়িতে লাগিল, তাঁহার খাটুনিও বাড়িতে লাগিল। তাঁহার বাপ-পিতামহ কারবারি লোক ছিলেন। কারবারেই তাঁহাদের শ্রীবৃদ্ধি। তিনিও কারবারই করিতেন। লর্ড মেট্‌কাফ [Charles Metcalfe, ১৭৮৫-১৮৪৬ খৃ.] কলিকাতা ত্যাগ করিলে তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার জন্য যে আন্দোলন উপস্থিত হয়, প্যারীবাবু তাহাতে খুব একহাত ছিলেন। তাই সেই স্মৃতির জন্য যখন মেট্‌কাফ হল হইল, তখন লোকে তাঁহাকেই সেক্রেটারি ও সেখানে যে পব্‌লিক লাইব্রেরি হইল, তাহার লাইব্রেরিয়ান করিল। তিনি এত মিশুক ছিলেন ও তাঁহার পড়াশুনা এত বেশি ছিল যে, কি ইংরাজ, কি বাঙালি, যাঁহার যখন কিছু জানিবার দরকার হইত, মেট্‌কাফ হলে লাইব্রেরিতে গিয়া উপস্থিত হইতেন এবং তিনি তাঁহার সাধ্যমতো তাঁহাদের উপকার করিতে চেষ্টা করিতেন। মেট্‌কাফ হল তখন বড়ো রকম একটি পণ্ডিতের আড্ডা হইয়াছিল। এখানে পণ্ডিত শব্দে শুধু সংস্কৃতওয়ালাই নয়, বরং ইংরাজিওয়ালাই বেশি। বাঙালি-সমাজের কোনো বিপদ সম্পদ উপস্থিত হইলে, একটা বড়ো রকম আন্দোলন উপস্থিত হইলে, প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় তাহাতে একহাত আছেনই আছেন। কিন্তু কোথাও প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় প্রধান (অগ্রণী, নেতা) হইবার চেষ্টা করিতেন না। ইংরাজিতে তাঁহার কলম খুব চলিত। সভা-সমিতির কাজকর্ম ইংরাজিতেই হইত ; সুতরাং প্যারীচাঁদ ভিন্ন চলিত না। তিনিও ইচ্ছা করিয়া ধরা দিতেন এবং খুব খাটিয়া কাজ উদ্ধার করিয়া দিতেন। হেয়ার-সাহেবের [David Hare, ১৭৭৫-১৮৪২ খৃ.] প্রতি তাঁহার ভক্তি অগাধ ছিল। সুতরাং হেয়ার-সাহেবের নামে যে-কোনো কার্য আরম্ভ হইত, তিনি প্রাণপণে সেই কার্যটিকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতেন। এইরূপে তিনি হেয়ার মেমোরিয়াল, হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড, হেয়ার অ্যানিভার্সারি প্রভৃতি হেয়ার-সাহেবের নামের সহিত জড়িত যত কার্য ছিল, সেই সব কার্যেই জড়িত থাকিতেন।

তিনি ইংরাজিতে হেয়ার-সাহেবের একখানি জীবনচরিত লিখিয়াছিলেন। সেই বইখানি প্রত্যেক বাঙালির, বিশেষত কলিকাতাবাসীর পড়া অবশ্য কর্তব্য। হেয়ার-সাহেব যে-কয় বছর বিলাতে ছিলেন, এ বইয়ে তাহার কোনো কথা নাই। তিনি ষোলো বছর কলিকাতায় ঘড়ির কারবার করিয়াছিলেন, এ বইয়ে সে ষোলো বছরের কোনো কথা নাই। ১৮১৬ সালে[১] হেয়ার-সাহেব কারবার উঠাইয়া দিয়া কলিকাতার হিন্দুরা যাহাতে ইংরাজি শেখে, ইংরাজি শিখিয়া মানুষ হয়, সেজন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন। ১৮৪২ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই ২৬ বৎসর তিনি অকাতরে টাকা খরচ করিয়াছেন এবং প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি সকালেই পালকি করিয়া বাহির হইতেন। পালকিতে বই থাকিত, ওষুধ থাকিত ; তিনি স্কুল দেখিতেন, পাঠশালা দেখিতেন। পালকি করিয়া সারা কলিকাতা ঘুরিয়া বেড়াইতেন। বড়ো বড়ো ভদ্রলোকের বাড়ি যাইতেন, তাহাদের সঙ্গে মিলিতেন মিশিতেন, তাহাদের রোগে শোকে, উৎসবে ব্যসনে তাহাদের সহিত দেখা করিয়া যাইতেন। ছোটো ছোটো ছেলেদের খেলানা দিতেন। তাহাদের তালপাতে, কলাপাতে ও কাগজে লেখা দেখিতেন ; বই দিতেন, কাগজ দিতেন। প্যারীচাঁদ য এমন একজন অদ্ভুত প্রকৃতির লোকের ভক্ত হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য কী ? এই যে ২৬ বৎসর, ইহাতেই কলিকাতায় ইংরাজি শিক্ষার আরম্ভ। এই সময় হিন্দু কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, মেডিকেল কলেজ প্রভৃতি অনেকগুলি কলেজ খোলা হয়, ইংরাজিতে সভা-সমিতি হইতে থাকে, ইংরাজিতে ও বাংলায় অনবরত কাগজ বাহির হইতে থাকে। এই সময় ইংরাজি শিখিবার জন্য একটা ভয়ানক ঝোঁক ও একটা বিশেষ নেশা আসিয়া উপস্থিত হয়। হেয়ার-সাহেবই ঐ নেশার গুরুমশায়। সুতরাং কলিকাতায় ইংরাজি শিক্ষার ইতিহাস প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের এই বইখানায় বিশেষ করিয়া লেখা আছে। তাই আমি বলিয়াছি, কলিকাতার বাঙালি মাত্রেরই এই বইখানা পড়া উচিত।

তিনি ইংরাজিতে আরো একখানি জীবনচরিত লিখিয়াছিলেন। সেখানি স্বনামধন্য রামকমল সেন মহাশয়ের [১৭৮৩-১৮৪৪ খৃ.]।

ইঁহার নিবাস গরিফা; কিন্তু কলিকাতায় ইনি খুব প্রতিপত্তি করিয়াছিলেন এবং ব্যাঙ্কের দেওয়ান [১৮৩২ খৃ.] হইয়াছিলেন। তিনি একজন আস্তিক হিন্দু; সুতরাং রামমোহন রায়ের [১৭৭২-১৮৩৩ খৃ.] ব্রাহ্মসমাজের— সতীদাহ নিবারণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ইংরাজমহলে ইঁহার খুব প্রতিপত্তি ছিল। ইংরাজেরা ইঁহাকে ভালোবাসিতেন, শ্রদ্ধা করিতেন এবং একটু ভয়ও করিতেন। ইনি এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম কেরানি [১৮১৭ খৃ.], পরে ধনাধ্যক্ষ ও পরে মেম্বর [১৮২৯ খৃ.] হইয়াছিলেন। সেখানকার সভায় কাগজ পাড়িতেন ও পুরাণ তর্জমা করিতেন। কলিকাতার হিন্দু বাসেন্দাগণ তাঁহাকে খুব বড়ো লোক বলিয়া মনে করিতেন। রাজা রাধাকান্ত দেব [১৭৮৪-১৮৬৭ খৃ.] বলিতেন যে, রামকমলের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যে, সে না এলে সভা-সমিতি জমে না। সংস্কৃত কলেজ [১৮২৪ খৃ.] যখন খোলা হয়, সেনমহাশয় তাহাতে একজন প্রধান উদ্‌যোগী। সে সভায় রামমোহন রায়কে আসিতে দেওয়া হয় নাই। হেম্যার-সাহেব রায়মহাশয়কে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, তুমি গেলে হিন্দুরা আসিবেন না। গবর্নমেণ্টের একটা কাজ মাঠে মারা যাইবে। সেন-মহাশয় সংস্কৃত কলেজের কমিটির সেক্রেটারি হইয়াছিলেন [১১ জুন ১৮৩৫- ১ জানুয়ারি ১৮৩৯ খৃ.]।

প্যারীচাঁদ ইংরাজিতে আরো একখানি জীবনচরিত লিখিয়াছিলেন। সেখানি কোলস্‌ওয়ার্দি গ্র্যাণ্ট সাহেবের [Colesworthy Grant, ১৮১৩-৮০ খৃ.] জীবনচরিত। এই মহাত্মা আপনার সকল কাজকর্ম পরিত্যাগ করিয়া, যাহাতে পশুদিগের উপর অত্যাচার নিবারণ হয়, সে বিষয়ে যত্নবান্ হইয়াছিলেন এবং 'প্রিভেন্‌শন অব ক্রুয়েল্টি টু অ্যানিম্যালস'নামক আইন পাশ করাইয়া দিয়াছিলেন এবং অনেক দিন ধরিয়া সেই আইনমতো যাতে কার্য হয়, তাহা দেখিবার ভার লইয়াছিলেন।

প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় ইংরাজিতে স্পিরিচুয়ালিজ্‌মের উপর অনেক বই লিখিয়াছিলেন। তিনি স্পিরিচুয়ালিজ্‌ম বিশ্বাস করিতেন, প্ল্যান্‌চেট বিশ্বাস করিতেন, মিডিয়াম বিশ্বাস করিতেন এবং এই শাস্ত্রের তিনি খুব উন্নতি করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে ইংলণ্ড

আমেরিকা প্রভৃতি স্থানের বড়ো বড়ো লোকের সহিত তাঁহার চিঠি লেখালিখি চলিত। এই উপলক্ষেই তিনি যোগ বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার 'আধ্যাত্মিকা'য় প্রকাশ। নতুবা তিনি হিন্দুধর্মের কিছুই বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার মাসিক পত্রিকায় প্রথম রচনা 'শ্রাদ্ধে কোনও ফল নাই।' সেটি চলিত ভাষায় লেখা এবং বেশ জোরের লেখা। তিনি বলেন, শ্রাদ্ধ করিলে যদি লোকে স্বর্গে যায়, তাহা হইলে বড়ো লোকেই স্বর্গে যাইবে, গরিব মানুষের আর কোনো উপায় নাই। ধনী লোকেরা প্রায় জীবনে মদখোর ও বেশ্যাবাজ হয়, তাহারা যদি শ্রাদ্ধের চোটে স্বর্গে যায়, তাহা হইলে স্বর্গ যে বিশেষ কামনার বস্তু হইবে, বোধ হয় না। প্যারীবাবু লিখিবার সময় এরূপ জোর কলমে লিখিলেন। কিন্তু তিনি প্রতি বৎসর যথাসময়ে যথারীতি পিতা-পিতামহের শ্রাদ্ধ করিতেন। শেষ বয়সে ইংরাজ গুরুর উপদেশে তাঁহার মত পরিবর্তন হয়। তিনি লিখয়াছেন—

The three births, above alluded to, are the natural birth, the regenerated birth and the spiritual birth. The conviction as to the immortality of the soul was so strong that it gave rise to *shraddhas* or offering funeral cakes to the souls of the deceased, which is considered not only a sacred duty on the part of every Hindu, but a condition of inheritance. In the offer of funeral cakes, there is a spirit of charity for the souls of the unfortunate :—"May those who have no father or mother or kinsman, no food or supply of nourishment, be contented with this food offered on the ground and attain like it a happy abode."

The Spiritual Stray Leaves, p. 7.

যাহা হউক, প্যারীবাবু কিরূপ লোক ছিলেন, সে বিষয়ে আলোচনা করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই। তিনি চলিত ভাষায় বই লেখার একরকম আদিগুরু। সুতরাং তাঁহার ভাষা সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা

করিতে হইবে : আমাদের নিজের উপকারের জন্য— তাঁহার নহে। তিনি এখন স্তুতি-নিন্দার অতীত। স্পিরিচুয়ালিজ্‌মের মতে তিনি এখন সপ্তম বা অষ্টম স্বর্গে। কিন্তু তিনি যে ভাষা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা তো সে কালের ভাষা। সে কালের ভাষার সহিত এ কালের ভাষার তুলনা করিলে আমরা অনেক জিনিস শিখিতে পারিব।

প্যারীবাবুর ভাষার খুব জোর, খুব দৌড়। যে ভাষায় লিখিলে 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল হায়,' ইহা সেই ভাষা— যেহেতু ইহা চলিত ভাষা। এই ভাষায় যে লেখে ও যে পড়ে, তাহাদের মধ্যে ভাষা বলিয়া একটা পর্দাই থাকে না। এই জন্যই এ ভাষায় লিখিলে হাসিবার সময় লোকে হাসে ও কাঁদিবার সময় লোকে কাঁদে। সেই জন্যই মাতাল ভবশংকর কৃষ্ণ সাজিয়া যখন 'নবনারীকুঞ্জ' হইতে ধপাত করিয়া পড়িয়া গেলেন, তখন লোকে হাসিয়া অস্থির হইল। আর যখন ঠক্‌চাচা আর বাহুল্য, দুজনে জাল করার জন্য জেলে গেলেন, তখন লোকের আনন্দের আর সীমা রহিল না। আবার যখন আধ্যাত্মিকার পৈতৃক সম্পত্তি সব গেল— বাবাও মারা গেলেন, দেনার দায়ে বাড়িখানিও বিক্রি হইয়া গেল, অথচ আধ্যাত্মিকার ভ্রূক্ষেপ নাই, শান্তভাবে নির্বিকার চিত্তে যোগ-সাধনায় চলিয়া গেল, তখন লোকে তাহার দুঃখে দুঃখী হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

বাংলা পদ্যে এ ভাবটা চিরকালই আছে, বাংলা পদ্য কোনো কালেই পণ্ডিতের জন্য লেখা নয়। বৌদ্ধেরা ধর্ম প্রচারের জন্য লিখিত, হিন্দু কবিরাও ধর্ম প্রচারের জন্য লিখিত, সুতরাং যাদের কাছে প্রচার করিবেন, তাদের ভাষায় লিখতে হত। নিজের বিদ্যে তাতে ফলাবার জো ছিল না। বাংলা গদ্যের অবস্থা কিন্তু অন্যরূপ। উহার উৎপত্তি ইউরোপীয় মিশনারিদের হাতে— উঁচু নিচু, এবড়োখেবড়ো এক রকম ফিরিঙ্গি বাংলা বললেও হয়। তারপর সে বাংলা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের হাতে পড়ে। সেটা হল সংস্কৃতের গণ্ড। তার ভাবও সংস্কৃত, ভাষাও সংস্কৃত। ইহার পরের বিকাশ বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের হাতে। সেখানে এই সাধুভাষা, মাজা ঘষা, শুনতে মিষ্টি হয়।. কিন্তু সে ভাষা 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশে' না। তাই প্যারীচাঁদের ভাষার এত আদর।

কিন্তু সাহস করিয়া চলিত ভাষায় লিখিতে গিয়া প্যারীবাবু বেশ বিপদে পড়িয়াছিলেন। অনেক সময় তাঁহার ভাব আসিত ইংরাজিতে, সেগুলিকে বাংলা করিতে তাঁহার বিশেষ বেগ পাইতে হইত। আবার সেগুলি সহজ হইলেও চলিত বাংলা হইত না। সে ইংরাজি-বাংলা হইত। এই ইংরাজি-বাংলাটাই শেষ ইংরাজি-শিক্ষিত মহলে বড়োই চলিয়া গিয়াছে। সেটা কিন্তু সংস্কৃত চলার চেয়ে খারাপ হইয়াছে!

ব্রাহ্মসমাজের ভাষায় এই দোষ অত্যন্ত বেশি। ইংরাজি-নবিশ বাংলা লিখিতে গেলেই এই দোষ করিবেন এবং তাহাতে এই ভাষা বাঙালিদের পক্ষে দুর্বোধও হইবে। যাঁহারা রাজনীতি, সমাজনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি লিখেন, এই কারণে তাঁহাদের ভাষা লোকের কাছে অত্যন্ত কঠিন বলিয়া বোধ হয়, এবং তাঁহাদের বইও চলে না। এই জন্য আমি একবার রাগ করিয়া বলিয়াছিলাম, "বাবু হে! বাংলায় ভাবিতে শেখো। যদি তা না পারো, তাহা হইলে বাংলায় কলম ধরিও না।"

প্যারীবাবু স্ত্রীলোকদের জন্য বই লিখিয়াছেন; সুতরাং কোন্‌টা সুরুচি, কোন্‌টা কুরুচি, তাহা তিনি বেশ বুঝেন। তাঁহার রচনার বিষয়ে কুরুচি নাই, থাকিতেও পারে না। কিন্তু কোন্ শব্দটা সুরুচি, কোন্ শব্দটা কুরুচি, ইহা তখনো ঠিক জানা যায় নাই। কারণ, সে-সকল কথা বইয়ে লেখা হয় নাই। সজ্জনে সে-সকল কথা আলোচনা করিবার অবসর পান নাই। দুই-একটা দৃষ্টান্ত দিব। — প্যারীবাবু লিখিয়াছেন, মদখোর ও বেশ্যাবাজি। মদখোর কথাটা তখনো চলিত ছিল না, এখনো নাই। গাঁজাখোর, গুলিখোর, সুদখোর, ঘুষখোর চলিত, কিন্তু মদখোর চলিত নহে। বেশ্যাবাজ চলিত নহে। যে শব্দটা চলিত, সেটা বড়ো শ্রুতিকটু— বেশ্যাসক্ত বলে বটে, কিন্তু পণ্ডিত মহলে। লম্পট শব্দটা এই অর্থে অনেক সময় ব্যবহার হয়।

অধিক দৃষ্টান্ত দিয়া আমরা আর সময় নষ্ট করিব না। অলংকারে যাহাকে দোষ বলে, পদাংশদোষ, পদদোষ, শব্দদোষ, অর্থদোষ, বাক্যদোষ— প্যারীচাঁদবাবুর বইয়ে সবই আছে। তিনি নূতন ভাষায় লিখচেন— হইবারই কথা। কিন্তু তাঁহার বর্ণনার শক্তি অতি অদ্ভুত। পড়িবার সময় মনে হয়, জিনিসটা চোখে দেখিতেছি। ছবিখানি যেন

চোখের উপর ভাসছে। বইগুলি যেন একখানি অ্যাল্‌বাম— তাতে কত পুরানো ছবি রয়েছে। আলালের ঘরের দুলালে ব্ল্যাকিয়ার-সাহেবের চেহারা, ব্ল্যাকিয়ার-সাহেবের আদালত, সুপ্রিম কোর্টের গ্র্যাণ্ডজুরি, পেটিজুরি প্রভৃতির ছবিগুলি যেন পর পর সাজানো আছে। রচনা সর্বত্রই প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। শব্দ অনেক জায়গায়ই সেকেলে, পুরানো ও একটু কটমট হইলেও ভাব ঠিক আছে। প্যারীবাবুর রচনার একটি বিশেষ গুণ এই যে, ইংরাজিতে যাহাকে হিউমার (humour) বলে, তাহাতে উহা পরিপূর্ণ। সোজা কথাও প্যারীবাবু একটু বাঁকাইয়া বলেন। এই বাঁকাইয়া বলার নাম বক্রোক্তি। অনেক অনেক অলংকারিকেরা বক্রোক্তিকেই কাব্যের জীবন বলিয়াছেন। ইংরাজেরাও এখন হিউমার বড়ো ভালোবাসেন। প্যারীবাবু ইংরাজের শিষ্য। সুতরাং তিনিও বক্রোক্তি বা হিউমারের ভক্ত। কিন্তু বই লিখিতে গেলে, বিশেষ উপদেশ দিতে গেলে সব জায়গায় বক্রোক্তি চলে না। তখন সোজা ভাষায় সোজা কথা বলিতে হয়। সেই সব জায়গায় প্যারীবাবু যেন মনপ্রাণ ঢালিয়া দেন এবং মধ্যে মধ্যে বক্তৃতার ছটা বাহির করেন। তিনি যে-সকল মনুষ্যের চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন, সেগুলি বেশ টিকল হইয়াছে। তাঁহার ঠকচাচা, বাহুল্য, বাবুরামবাবু, বেণীবাবু, বেচারামবাবু, বরদাবাবু, মতিলালবাবু, বাঞ্ছারামবাবু, মণিরাম-পুরের মাধববাবু, বট্‌লার-সাহেব, জান্‌-সাহেব, ভবশংকরবাবু, বাচস্পতি-মহাশয়, গোস্বামীমহাশয়, বক্রেশ্বরবাবু, অন্বেষণবাবু, পতিভাবিনী, জে‍ঁকোবাবু, বাবুসাহেব, লালবুঝকড়্‌, হরদেব তর্কালংকার, আধ্যাত্মিকা, ভজহরিবাবু ও চম্পকলতা— সবগুলিই অতি মনোহর হয়েছে।

প্যারীবাবু শুধু গল্প লিখিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, চাষ ও বাগান করার কথা অনেক আছে। স্ত্রীলোকদিগকে উপদেশ দেওয়াই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তাঁহার মাসিকপত্রখানিও স্ত্রীলোকদিগের জন্যই বাহির হইয়াছিল। তাঁহার 'রামারঞ্জিকা' ও 'বামাতোষিণী'ও সেই উদ্দেশ্যেই লেখা। প্রথম প্রথম তিনি সাহেবিয়ানার দিকেই বেশি ঢলিয়াছিলেন। কারণ, তাঁহার মাসিক পত্রিকার প্রথম রচনার নাম 'শ্রাদ্ধে কোনও ফল নাই'। ক্রমে যত বয়স হইতে লাগিল, ততই তিনি হিঁদুয়ানির দিকে আসিতে লাগিলেন। তাঁহার 'অভেদী' তাঁহার

'আধ্যাত্মিকা' উচ্চ অঙ্গের হিঁদুয়ানি শিক্ষা দিয়াছে। কিন্তু তিনি হিঁদুয়ানি সংস্কার করিয়া লইতে চাহিতেন।

তিনি ভণ্ডামির বড়ো বিরোধী ছিলেন। 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' বইখানি ভণ্ড তপস্বীদের ভণ্ডামি ভাঙিয়া দিয়াছে। প্যারীবাবুর কোনো ধর্মেই দ্বেষ ছিল না। তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজ, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ, নূতন ব্রাহ্মসমাজ, মুসলমানসমাজ, খৃস্টানসমাজ— সকল সমাজের কথাই লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শেষটা তাঁহার হিন্দুধর্মের প্রতিই আস্থা হইয়াছিল। যোগ ও স্পিরিচুয়ালিজ্‌মের উপর তাঁহার খুব ঝোঁক হইয়াছিল। সাহেবরাই তাঁহার বাল্যকালের গুরু, সাহেবদের উপর তাঁহার ভক্তিও অগাধ। তাঁহার আধ্যাত্মিকাতেও এক বিবিসাহেব আসিয়া উপদেশ দিতেছেন। তাঁহার বইগুলি বাংলায় লেখা হইলেও তিনি ইংরাজিতেই প্রায় ভূমিকা লিখিতেন। এ-সব হইলেও তিনি কিন্তু খাঁটি বাঙালি ছিলেন। বাংলার জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিত। বাংলার মেয়ে ও পুরুষ যাতে ভালো হয়, তিনি তার চেষ্টা করিতেন। ইতর জন্তুর প্রতিও তাঁহার দয়া কম ছিল না। পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণের জন্য কোলস্‌ওয়ার্দি গ্র্যাণ্ট সাহেব যখন কোমর বাঁধিয়া লাগিলেন, প্যারীবাবুই তখন তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইলেন। তিনি যখন বেঙ্গল কাউন্সিলের মেম্বর, সেই সময়ে তাঁহারই উদ্যোগে পশুদিগের প্রতি অত্যাচার নিবারণের আইন প্রথম পাশ হয়।

প্যারীচাঁদবাবুর ন্যায় লোকের একখানি ভালো জীবনচরিত হওয়া উচিত। মালমসলা যথেষ্ট সংগ্রহ আছে। একজন সুলেখকের এই কার্যের ভার লওয়া উচিত।

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'
৪র্থ সংখ্যা, ১৩৩১ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে ১৫ চৈত্র ১৩৩১ ব., ২৯ মার্চ ১৯২৫ খৃ., তারিখে অপরাহ্ণ ৬ টায় চুণীলাল বসুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ৩১ বর্ষের দশম মাসিক অধিবেশনে শাস্ত্রীমশায় এই প্রবন্ধ পড়েন, তখন প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল 'বঙ্গসাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রভাব'। কার্যবিবরণীতে উল্লেখ আছে—

"মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, ৺প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ সুখেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় তাঁহাকে প্যারীচাঁদ সম্বন্ধে যাবতীয় কাগজপত্র ব্যবহার করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহাকে তিনি ধন্যবাদ দিয়া প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

"প্রবন্ধ পাঠের পর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধে ভাবিবার কথাই বেশী। প্রকাশিত হইলে রীতিমত আলোচিত হওয়াই উচিত। অনেক জিনিষ প্রবন্ধে আছে— যাহাদের সম্বন্ধে কেবল শুনিয়া মত দেওয়া চলে না। কেমন করিয়া ইংরাজি শিক্ষার কুফল হইয়াছে— ইংরাজি শিক্ষার কি করিয়া ভালটুকু গ্রহণ ও মন্দটুকু পরিহার করা যায়, তাহা ভাবিবার বিষয়। আত্মার অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধে কেন তাঁহার ধারণা প্রথমে হয় নাই ও পরে পরলোকে বিশ্বাস হইয়াছিল— এ সকল বিষয় বিচার করিয়া দেখা উচিত।

"অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,— 'এই প্রবন্ধে একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় রহিয়াছে। প্রবন্ধ-লেখক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই প্রবন্ধের জন্য বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছেন ও বৎসরাধিক কাল ধরিয়া ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের পূর্ব্বেকার এবং পরের যাবতীয় কাগজপত্র অনুসন্ধান করিয়া প্রবন্ধের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহার প্রবন্ধ সাতিশয় মনোজ্ঞ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট আমরা এই জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ। প্রবন্ধে অনেক নূতন বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সাধারণতঃ প্রাচীন বঙ্গবাসী অনেকেই ৺প্যারীচাঁদ সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু জানেন— আধুনিক যুগের বঙ্গবাসী ততটা নাও জানিতে পারেন, তাঁহারা বোধ হয়, 'আলালের ঘরের দুলালে'র রচয়িতা হিসাবেই তাঁহাকে জানেন। তিনি যে সে সময়কার সমাজে কত উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন— তাঁহার জীবনী কত বিচিত্র ঘটনার

সমাবেশে উজ্জ্বল ছিল, তখনকার কত সৎকার্য্যের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, স্ত্রী-শিক্ষার প্রচারে তিনি কত উৎসাহী ছিলেন— এ সব কথা হয়ত অনেকে জানেন না। তখন সবেমাত্র স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলনের আন্দোলন দেশে উঠিয়াছিল ; সুতরাং এই কার্য্যে তাঁহাকে কত বিরোধ সহ্য করিতে হইয়াছিল। তিনি কত যত্ন, পরিশ্রম ও লেখনী দ্বারা স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারকল্পে তাঁহার শক্তি-পরিচালন করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। মাসিক 'রামারঞ্জিকা' ও 'বামাতোষিণী' পত্রিকা [এ দুটি পত্রিকা নয়, বই] প্রচার দ্বারা যাহাতে দেশে মহিলা-সমাজ হইতে অজ্ঞানান্ধকার দূর হইয়া জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত হয়, তজ্জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি এই আন্দোলনের প্রথম প্রবর্ত্তক না হইলেও একজন অনুরাগী শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী ছিলেন — এ কথা সর্ব্বজনবিদিত ছিল। এই হিসাবে তাঁহার স্থান এ দেশের সমাজ-সংস্কার-ইতিহাসে অতি উচ্চে। বঙ্গসাহিত্য তাঁহার নিকট বিশেষভাবে ঋণী। তিনি চলিত ভাষায় তাঁহার গ্রন্থাদি লিখিতেন ; পণ্ডিতগণের বিরাগ-ভাজন হইতে হয় বলিয়া সে বিষয়ে সংকোচ বোধ করিতেন না। তাঁহার ভাষার একটি বিশেষ ধারা ছিল। চলিত ভাষার আবরণে অনেকানেক দুরূহ তত্ত্ব সাধারণের বোধগম্য করিয়া লেখাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। শিক্ষা-বিস্তারের জন্য প্রচলিত গদ্য-সাহিত্যের ধারা পরিত্যাগ করিয়া তিনি একটি নূতন ধারার প্রচলন করিয়াছিলেন ; ইহাতেও তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। এখন অবশ্য সে ধারা নাই ; অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখনকার এক এক লেখকের এক এক ধারা— চলিত ভাষাও আছে : সংস্কৃতমূলক ভাষাও আছে ; আবার এই দুইয়ের সংমিশ্রণও আছে ; আবার অনেক গ্রন্থকার গ্রাম্য ভাষাও অবলম্বন করিতেছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদের প্রভাব বিশেষ আলোচনার বিষয়। তিনি অনেক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। একটা যুগের তিনি চিন্তাশীল লেখক, সমাজ-সংস্কারক, নেতা ও অগ্রণী ছিলেন। যাহা তিনি বলিতেন, কাজে তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। ডেভিড হেয়ার এ দেশে যে জ্ঞান ও শিক্ষার ধারার প্রতিষ্ঠাতা, প্যারীচাঁদ তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। নিমতলার দুইটি প্রাচীন কায়স্থ— দত্ত ও মিত্রবংশ সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য কলিকাতার হিন্দুসমাজের অন্যতম নেতা ছিলেন। রাস্তার একদিকে প্রসিদ্ধ দত্তবংশ ও অপরদিকে মিত্রবংশ। হাটখোলার স্বর্গীয় মদন দত্তের কন্যাকে ইঁহার পিতামহ বিবাহ করেন। মেটকাফ্ হলের (বর্ত্তমানকালের ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী) তিনি সুধু প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না— তাঁহাকেই তাহার লাইব্রেরীয়ান ও কর্ম্মাধ্যক্ষপদে থাকিয়া মাথায় করিয়া এই প্রতিষ্ঠানটি চালাইতে হইয়াছিল। তিনি সাধারণের প্রভূত উপকার করিয়া গিয়াছেন। প্রেত-তত্ত্ব (Spiritualism) সম্বন্ধে সে কালে এ দেশে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন— এ বিষয়ের জটিল তত্ত্বের মীমাংসা তখন একমাত্র তিনিই করিতে পারিতেন।

আমরা শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। পূর্ব্বযুগে একজন প্রকৃত দেশহিতৈষী, কর্ম্মী, সমাজ-সংস্কারক, সৎকার্যে ব্রতী, বাঙ্গালার সাহিত্যের উচ্চস্তরের চিন্তাশীল লোকের পরিচয় আজ আমরা তাঁহার নিকট হইতে পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। আমরা এমন প্রবন্ধই তাঁহার নিকট হইতে আশা করিয়াছিলাম। আমি আপনাদের সকলের পক্ষ হইতে পূজনীয় শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।" দ্র. সা-প-প, ১৩৩৩ ব.।

প্যারীচাঁদ মিত্রের জন্ম কলকাতায়, ২২ জুলাই ১৮১৪ খৃ.। বাবা রামনারায়ণ।

ছেলেবেলায় ঘরে বাংলা ও ফারসি শেখেন। হিন্দু কলেজে ভর্তি হন ৭ জুলাই ১৮২৭ খৃ.।

প্যারীচাঁদের জীবিকা ছিল আমদানি-রপ্তানি ব্যাবসা। নিজের 'প্যারীচাঁদ মিত্র অ্যাণ্ড সন্স' ছাড়া আরো কয়েকটি বিলাতি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

লর্ড চার্লস মেট্‌কাফ ১৮৩৫-৩৬ খৃ. অস্থায়ী বড়োলাট হিসাবে মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত বিধিনিষেধ তুলে দেওয়ায় তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য মেট্‌কাফ হল তৈরি হয় এবং ১৮৩৬-এ স্থাপিত ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি ১৮৪১-এ এই বাড়ির দোতলায় তুলে আনা হয়। প্যারীচাঁদ ১৮৩৬ থেকে সাব-লাইব্রেরিয়ান ছিলেন, ১৮৪৮-এ লাইব্রেরিয়ান ও সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। পরে এটি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি (৩০ জানুয়ারি ১৯০৩ খৃ.) এবং ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে (১৯৪৭ খৃ.) রূপান্তরিত। এ ছাড়া প্যারীচাঁদ সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা বা The Society for the Acquisition of General Knowledge-এর যুগ্মসম্পাদক (১৮৩৮ খৃ.); বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সম্পাদক (১৮৪৩ খৃ.); ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের কার্য নির্বাহক সমিতির সদস্য (১৮৫২ খৃ.); বেথুন সোসাইটির সম্পাদক (১৮৫১ খৃ.); বঙ্গদেশীয় সামাজিক বিজ্ঞানসভা বা The Bengal Social Science Association-এর যুগ্ম সম্পাদক(১৮৬৭ খৃ.); উইলিয়ম কেরির প্রতিষ্ঠিত এগ্রিকাল্‌চারাল অ্যাণ্ড হর্টিকাল্‌চারাল সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়ার (১৮২০ খৃ.) সদস্য (১৮৪৭ খৃ.) ও ১৮৫৭-৮১-র মধ্যে দশ বৎসর সহকারী সভাপতি এবং ১৮৭১ খৃ. থেকে অনারারি মেম্বার ছিলেন।

১৮৬০-এ স্ত্রী বামাকালীদেবীর মৃত্যুর পরে প্যারীচাঁদ spiritualism বা প্রেততত্ত্বের আলোচনায় নিবিষ্ট হন। তিনি লণ্ডনের ব্রিটিশ ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ স্পিরিচুয়ালিস্টস-এর (১৮৭৩ খৃ.) করেস্পণ্ডিং মেম্বার, সেন্ট্রাল অ্যাসোসিয়েশন অফ স্পিরিচুয়ালিস্টস-এর (লণ্ডন ১৮৮২ খৃ.) অনারারি মেম্বার, কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত ইউনাইটেড অ্যাসোসিয়েশন অফ

স্পিরিচুয়ালিস্টস-এর সহকারী সভাপতি (১৮৮০ খৃ.) ছিলেন। নিউইয়র্কের থিয়সফিক্যাল সোসাইটি (১৮৭৫ খৃ.) গঠিত হয় মাদাম ব্লাভাট্স্কি Mme. H. P. Blavatsky-র উৎসাহে, প্যারীচাঁদ এর করেস্পণ্ডিং ফেলো এবং কলকাতায় এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হলে (১৮৮২ খৃ.) সভাপতি হন।

প্যারীচাঁদ কোলসৃওয়ার্দি গ্র্যাণ্ট প্রতিষ্ঠিত পশুক্লেশনিবারণী সভা বা The Calcutta Society for the Prevention of Cruelty to Animals-এর (১৮৬১ খৃ.) কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য এবং পরে সম্পাদক হন।

রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-৭০ খৃ.) এবং প্যারীচাঁদের যুগ্ম সম্পাদনায় 'মাসিক পত্রিকা' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৬ আগস্ট ১৮৫৪ খৃ., ১ ভাদ্র ১২৬১ ব.। পত্রিকাখানি চার বৎসর চলেছিল। প্রথম সংখ্যায় উল্লেখ ছিল, "এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই। প্রতিমাসে এক এক নম্বর প্রকাশ হইবেক, তাহার মূল্য এক আনা মাত্র।" উল্লেখযোগ্য, এই পত্রিকাতেই প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রথম বর্ষের সপ্তম সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়।

রচনাবলী : 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮ খৃ.), 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯ খৃ.), 'রামারঞ্জিকা' (১৮৬০ খৃ.), 'কৃষিপাঠ' (১৮৬১ খৃ.), 'যৎকিঞ্চিৎ' (১৮৬৫ খৃ.), 'অভেদী' (১৮৭১ খৃ.) 'ডেবিড হেয়ারের জীবন চরিত' (১৮৭৮ খৃ.), 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা (১৮৭৯ খৃ.), 'আধ্যাত্মিকা' (১৮৮০ খৃ.), 'বামাতোষিণী' (১৮৮১ খৃ.), *A Biographical Sketch of David Hare* (১৮৭৭ খৃ.), *The Spiritual Stray Leaves* (১৮৭৯ খৃ.), *Stary Thoughts on Spiritualism* (১৮৮০ খৃ.), *Life of Dewan Ramcomul Sen* (১৮৮০ খৃ.), *Life of Colesworthy Grant* (১৮৮১ খৃ.), *Agriculture in Bengal* (১৮৮১ খৃ.) ইত্যাদি।

মৃত্যু ২৩ নভেম্বর ১৮৮৩ খৃ.।

১. প্যারীচাঁদ *A Biographical Sketch of David Hare* বইয়ে লেখেন, "Before 1816 he made over his business to Mr.

E. Gray." (p. 1)। এই তথ্য ঠিক নয়। তিনি ঘড়ির কারবার গ্রের হাতে তুলে দেন ১ জানুয়ারি ১৮২০ খৃ.। ৬ জানুয়ারির গবর্নমেণ্ট গেজেটে (সাপ্লিমেণ্ট) এই মর্মে হেয়ারের একটি বিজ্ঞাপ্ত প্রচারিত হয়েছিল। দ্র. উ-শ-বাং, পৃ. ৬৮।
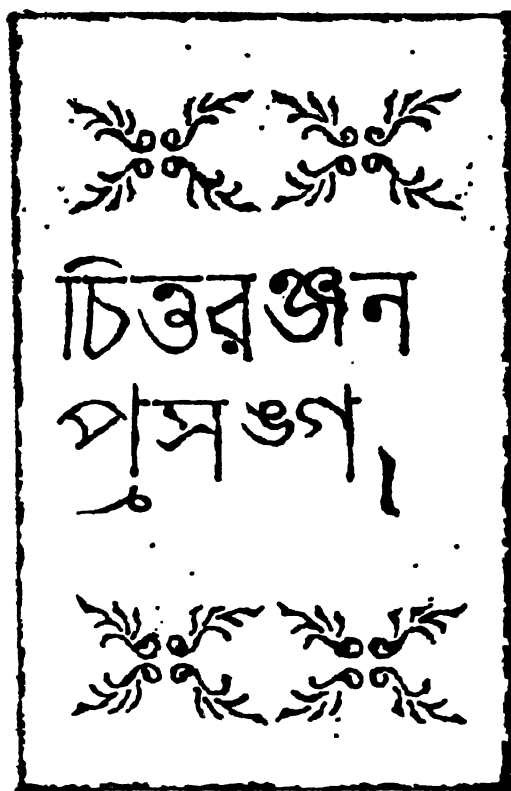
বাংলা সাহিত্যে চিত্তরঞ্জন

কবি বলিয়াছেন—

"এ জগতে হেন জন মিলে উঠা ভার।
মন মুখ কাজ সব একরূপ যার ॥"

হাজারের মধ্যেও একজন পাওয়া যায় না, লাখের মধ্যেও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। পুরাণে পড়া যায়, লোক ব্যগ্র হইয়া নারায়ণের বা শিবের নিকট এইরূপ একটি ভালো লোক অন্বেষণে উপস্থিত হইলে তাঁহারা বলিতেন, ভদ্রলোকের মধ্যে পাইবে না, যাও অমুক ব্যাধের কাছে, বা অমুক চণ্ডালের কাছে। হয় তো ছোটোলোকের মধ্যে

এরূপ মিলিলেও মিলিতে পারে। কিন্তু বড়োলোকের মধ্যে মেলা একেবারে দুষ্কর। বিশেষ যাঁহারা পরহিতব্রত লইয়া দেশ উদ্ধারে লাগিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একেবারেই পাওয়া যায় না। পরহিতব্রত, দেশোদ্ধার, দেশের কাজ একটা পেশা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, একটা সহজে অর্থ ও সম্মান লাভ করার পথ হইয়াছে। অনেক সময় দেখিয়াছি, পরহিতব্রত লইয়া লোক গুরুতর আত্মহিত করিয়া বসিয়াছেন অর্থাৎ চাঁদার বাড়িটির পাট্টাখানি নিজের অথবা নিজের স্ত্রীর নামে লিখাইয়া লইয়াছেন। এখন সেদিন গিয়াছে, ততদূর আর কেহ হইতে দেয় না, লোক সেয়ানা হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম—

"এ জগতে হেন জন মিলে উঠা ভার।
মন মুখ কাজ সব একরূপ যার॥"

স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন দাশ কিন্তু খাঁটি এইরূপ একজন লোক ছিলেন। তাঁহার মন, মুখ, কাজ সব একরূপই ছিল। নাইকুণ্ডল থেকে আরম্ভ করিয়া ঠোঁটের আগা পর্যন্ত তাঁহার এক ছিল। ইংরাজিতে যাহাকে সিনসেরিটি বলে, তিনি তাহার মূর্তিমান্ আদর্শ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার মতো পুরুষ হয় না।

পরের দুঃখে তাঁহার মন যেমন কাঁদিত, এমন অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। কত লোক যে তাঁহার টাকায় প্রতিপালিত হইত, বলা যায় না। দাতা বলিয়া নাম লইতে তাঁহার একেবারেই প্রবৃত্তি ছিল না। আমি একটি দৃষ্টান্ত জানি। সে অনেক দিনের কথা— ১০/১২ বৎসর হইবে। একজন পাড়াগাঁয়ের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নানা কারণে দেশত্যাগ করিয়া একটি মিউনিসিপ্যাল টাউনে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। সেখানে ২/১ বৎসর বাস করার পর তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পরিবারে ৩/৪টি লোক মহা-দুরবস্থায় পড়ে। তাহারা কাহার পরামর্শে জানি না, মিউনিসিপ্যালিটির ভাইসচেয়ারম্যানের এক পত্র লইয়া চিত্তরঞ্জনবাবুর সাহায্য চায়। তিনি বরাবর তাঁহাদের দশটি করিয়া টাকা পাঠাইয়া দিতেন। যিনি সাহায্য পাইতেন, তিনি বলিয়াছেন মাসের পহেলা তারিখে ঘড়ির কাঁটার মতো টাকাটি মনি অর্ডারে তাঁহার নিকট পৌঁছিত। এরূপ দান চিত্তরঞ্জনের অনেক

চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের জীবনচরিত সম্বন্ধে কাহারো এমন কিছু বলিতে যাওয়া এখন বিড়ম্বনা মাত্র। কারণ, তিনি তো একজন প্রকাণ্ড লোক ছিলেন, আর এই কুড়ি বৎসর ধরিয়া সব লোকই তাঁহার সমস্ত কার্যকলাপ জানেন। সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিতেন, আদর করিতেন ও ভালোবাসিতেন। সর্বসাধারণের এত প্রীতি আর-কেহ এত পরিমাণে পাইয়াছিল কি না সন্দেহ। আমি তাঁহার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলাম না। লোকের মুখে তাঁহার গুণানুবাদ শুনিতাম মাত্র।

শুনিতাম, তাঁহার পিতা [ভুবনমোহন দাশ, ১৮৪৪-১৯১৪ খৃ.] দেউলিয়া হইয়া যে-সকল লোকের টাকা দিতে পারেন নাই, তিনি নিজের রোজগারের টাকা হইতে তাহা সমস্ত কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

শুনিতাম, তিনি পরের দুঃখে কাতর। শুনিতাম, দুঃখী দরিদ্র লোক পুলিসাদি দ্বারা উৎপীড়িত হইলে তিনি অযাচিতভাবেও তাহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার দয়ায় সকলে মুগ্ধ হইয়া যাইত।

প্রথম বোমার কেসে তিনি যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিপন্ন অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়কে রক্ষা করবার জন্য কোর্টে উপস্থিত হয়েন ও তাঁহার ওকালতি গ্রহণ করেন, তখনকার কথা সকলেই জানেন[১]। কিরূপে তিনি মকদ্দমাটি আয়ত্ত করেন, কিরূপে তিনি সাক্ষীদিগকে জেরায় নাস্তানাবুদ করেন, সে-সব কথা এখনো লোকের বেশ মনে আছে। তাঁহাকে কোর্টে আসিতে দেখিয়া পরমভক্ত অরবিন্দবাবু বলিয়াছিলেন, "আমার রক্ষার জন্য স্বয়ং নারায়ণ উপস্থিত হইয়াছেন।" সে কথাটা যে-কেহ পড়িয়াছিল, সকলেরই মনে খুব লাগিয়াছিল। চিত্তরঞ্জনের তো লাগারই কথা। কারণ, চিত্তরঞ্জন একজন খুব ভক্ত লোক ছিলেন। তাঁহার কবিতা পুস্তকগুলিতে[২] ভক্তির যে একটা আকুলতা দেখা যায়, সেটা প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলী ভিন্ন আর-কোথাও আছে কি না সন্দেহ। বৈষ্ণবরা তাঁহাদের ভক্তির পাত্রকে চিনিতেন, তাই তাঁহাদের আকুলতা একরকমের, আর চিত্তরঞ্জন তাঁহাকে চিনিতেন না, তাই তাঁহার আকুলতা আর-এক রকমের। বৈষ্ণবের আকুলতা সেকালের লোকের ভালো লাগিত, আর চিত্তরঞ্জনের আকুলতা একালের লোকের ভালো লাগে। আমি তো মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

ভক্তিপ্রাণ অরবিন্দ চিত্তরঞ্জনকে 'নারায়ণ' ভাবে দেখায় একটা ফল ফলিয়াছিল। চিত্তরঞ্জন যখন কয়েক বৎসর পরে একখানি বাংলা কাগজ বাহির করিয়াছিলেন, তাহার নাম রাখিয়াছিলেন 'নারায়ণ' [অগ্রহায়ণ ১৩২১ ব.]। তাঁহার মনের মধ্যে যে মন, তাহার তলদেশে বোধ হয় বিশ্বাস ছিল, 'নারায়ণ' দেশ রক্ষা করিবেন। হইয়াছেও তাই। একটা মহলে বাংলার বড়ো একটা আদর ছিল না, সেটা ব্যারিস্টার ও বিলাত ফেরত মহল। নারায়ণ সে মহলে বিশেষ প্রচার হইয়াছিল। এমন সকল লোক আমার কাছে নারায়ণের কথা কহিতেন, যাঁহারা কখনো যে বাংলা পড়েন, আমি বিশ্বাস করিতেও পারিতাম না। তাঁহাদের অনেকে ছেলেদের বাংলা কথা শিখিতেই দেন না। ছেলে আধ আধ কথা কহিতে শিখিলেই তাঁহারা চোখ দেখাইয়া বলেন, ইটি কী ? ছেলে বলে, "আই।" ইটি কী ? ছেলে বলে, "নোজ।" ইটি কী ? "ইয়ার।"

যাঁহারা ছেলে ভূমিষ্ঠ হইলেই পাছে বাংলা কথা শিখিয়া বাঙালি হইয়া যায়, সেইজন্য গোড়া থেকে ছেলেদিগকে 'সাহেব' করিয়া তুলিতে চাহেন, তাঁহারাও নারায়ণ পড়িতেন। নারায়ণ একটি বড়ো কাজ করিয়া গিয়াছে। অনেক দিন হইতে বাংলা পণ্ডিতী সাধুভাষার অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল, উহার বিরুদ্ধে অনেকেই যুদ্ধ করিতেছিলেন, কিন্তু পারিয়া উঠেন নাই। নারায়ণ পারিয়া উঠিয়াছিল। নারায়ণের সময় হইতেই সাধুভাষা একরকম উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। এখন "নির্ম্মিমিৎসা, চিকীর্ষা, জিগমিষা" "নদ নদী পর্বতকন্দর" প্রভৃতি শব্দ আর বড়ো একটা দেখিতে পাওয়া যায় না ; নারায়ণ বাংলা ভাষাকে খাঁটি বাংলা ভাষা করিয়া দিয়া গিয়াছে। নারায়ণে ছোটো ছোটো গল্পগুলি খুব ভালো ছিল। মাঝে মাঝে দুই-একটা গল্প পড়িয়া রুচিবাগীশরা নাক সিঁটকাইলেও গল্পগুলি ভালো যে, তাহাতে সন্দেহ নাই। দাশমহাশয়ের নিজের গদ্যগুলি বেশ মিষ্ট লাগিত। তিনি যেন কী একটা প্রেমভক্তি ভালোবাসার জিনিস খুঁজিতেছেন, পাইতেছেন না, পাইবার জন্য আকুল হইয়া বেড়াইতেছেন, উধাও হইয়া বেড়াইতেছেন।

নারায়ণে সমালোচনার অভাব ছিল না। সমালোচনা কোনো

দিকে ঢলিয়া পড়িত না, বিশেষ করিয়া চারি দিক দেখিয়া লেখা হইত। অনেক লোকের উপাস্য দেবতাকে অসার বলিয়া উল্লেখ করিতে নারায়ণ ভয় পাইত না। অনেক ঋষি-তপস্বী ভণ্ড হইয়া গিয়াছে। অনেক অজানা লেখককে নারায়ণ জানাইয়া দিয়াছে। দাশমহাশয় আমায় বাংলা কবিগণের সমালোচনা করিবার জন্য বলিয়াছিলেন, আমি স্বীকার করি নাই। কাহারো বইকে তাহার মনের মতো সুখ্যাতি না করিলে সে জন্মের মতো শত্রু হইয়া থাকিবে আর পথে ঘাটে যা তা বলিয়া গালি দিয়া বেড়াইবে। বাস্তবিক এখনো বাংলা লেখকদের সমালোচনার সময় হয় নাই। তাই আমি কালিদাসের সমালোচনা করিয়াছিলাম। আমার সমালোচনা দাশ-সাহেব খুব পছন্দ করিয়াছিলেন এবং দুই-একবার আমায় তাহা বলিয়াও পাঠাইয়াছিলেন, কালিদাসের কনে দেখানো ['কালিদাসের মেয়ে দেখান', ভাদ্র ১৩২২ ব.] তাঁহার খুব পছন্দ হইয়াছিল। তিনি লেখকদিগকে বড়ো একটা ফরমাস করিতেন না। আমায় কেবল দুই বার দুর্গোৎসবের সময় দুর্গোৎসব সম্বন্ধে লিখিতে বলিয়াছিলেন। আমি প্রথমবার দুর্গোৎসব worship of the spirit of vegitation লিখিয়াছিলাম, বর্ষার পর প্রকৃতির সতেজ ও সহাস্য ভাবের পূজা বলিয়াছিলাম ['দুর্গোৎসবে নব-পত্রিকা', কার্তিক ১৩২২ ব.]। ইহাতে অনেক ভক্ত আমার উপর চটিয়া ছিলেন; কিন্তু দ্বিতীয়বারে যাহা লিখিয়াছিলাম ['দুর্গাপূজা', আশ্বিন ১৩২৩ ব.], তাহাতে ভক্তমণ্ডলী অনেকে আমায় খুব আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। তিনি আমায় আর-একবার ফরমাস করিয়াছিলেন বঙ্কিমবাবুর সম্বন্ধে কিছু লিখিবার জন্য। সেটার জন্যও ['বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়', বৈশাখ ১৩২২ ব.; 'বঙ্কিমচন্দ্র', আষাঢ় ১৩২৫ ব.] তিনি খুব খুশি হইয়াছিলেন। আমি যখন বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখি, তখন তরুণ ইতিহাসবাগীশ-গণ, তাঁহার কাছে শুনিয়াছি নালিশ করে যে, উনি ফুট নোট দেন না, উনি অথরিটি দেন না, উঁহার কথায় বিশ্বাস কী? দাশ-সাহেব তাঁহাদের কথায় বড়ো একটা কান দেন নাই। কিন্তু কর্তারাই আমার কাছে কথাটা পাড়িয়াছিলেন। আমি বলিলাম, বাপু হে, তোমাদের বয়স কম, ৫ বছর কি ৭ বছর কলেজ ছাড়িয়াছ, তোমাদের সব মনে আছে

আর তোমরা ক'খানাই বা বই পড়িয়াছ, আর পড়িয়াছ তো এক ইংরাজিতে না-হয় বাংলায়। আমার প্রায় ৫০ বৎসর ঐ চর্চা। আমার সব অথরিটি মনে তো থাকে না, তবে ও-সকল প্রবন্ধ লেখার সময় আমার মটো "নামূলং লিখ্যতে কিঞ্চিন্নানপেক্ষিতমুচ্যতে"[৩] মল্লিনাথেরও যে মটো, আমারও তাই। আমায় কত কী যে ঘাঁটিতে হইয়াছে, তাহা কি এত কাল মনে থাকে? কত সংস্কৃত বই ও পুঁথি, কত পালি পুঁথি, কত হিন্দি, কত ভাষার কত পুঁথি, সে-সব মনে থাকে না। সে পুঁথিও আমার কাছে থাকে না, হয়তো কাশীর কোনো পণ্ডিতের বাড়ি, রাজপুতানার কোনো চারণের বাড়ি। একখানা পুঁথিতে একটা কথা পাইয়াছি, মনে গাঁথিয়া গিয়াছে, লিখিয়া দিয়াছি, তোমাদের সন্দেহ হইলে আমায় জিজ্ঞাসা করিতে পারো। আমি এই-সব ইতিহাসবাগীশদের হাঙ্গামায় শেষে অথরিটি দিতে লাগিলাম সব বৌদ্ধপুঁথি, তাহার নামও বাগীশমহাশয়দের জানা নাই। আমার নোটবুকে আছে। কর্তারা কতক থামিলেন। সবাই থামেন নাই। এখনো মাঝে মাঝে ঐ কথা তোলেন, কাগজে তোলেন, পত্রে তোলেন, বলেন, ও-সব পুঁথিই নাই। আমি নাচার। নারায়ণ এই-সব ইতিহাসবাগীশদের হাত হইতে আমায় রক্ষা করিয়াছিলেন। সে কালে শুনিতাম, 'লিখনং পঠনং বিবাহেরই কারণম্।' ইতিহাস-বাগীশদেরও লিখনং পঠনং চাকরির কারণম্। চাকরি যদি মনের মতো হইলং; লিখনং পঠনং সবং ফুরাইলম্। কিন্তু যত দিন মনের মতো অর্থাৎ পেটভরা মতো চাকরি না হয়, তত দিন আমার মতো লোক তাঁদের জ্বালায় অস্থির। একবার আমি লিখিয়াছিলাম, সংস্কৃতে যাহাদের মগ বল, তাহারা পারস্যদেশের মগিয়াই[৪]। এ কথা ইংরাজ লেখকমাত্রই জানেন, শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণরা এখনো আপনাদের মগ ব্রাহ্মণ বলেন, বোম্বাই অঞ্চলের পার্সিরা অগ্নি-উপাসক মগদের বংশধর, তাহাদের পরস্পর আপনাদের মেগুপেত অর্থাৎ মগপতি বলে। যেখানে সংস্কৃত 'মগ' শব্দ আছে, ইংরাজি তর্জমাকাররা সেখানে Magii লিখিয়াছেন। তথাপি একজন ইতিহাসবাগীশ চিৎকার করিয়া আমায় বলিয়া উঠিলেন, 'প্রমাণ?' আমি ভাবিলাম, ইঁহারা এই বিদ্যায় 'বাগীশ' হইয়াছেন। দাশ-সাহেব কিন্তু আর-এক শ্রেণীর লোক ছিলেন। তিনি যখন

নারায়ণ বাহির করেন, তখনো তিনি একজন দেশমান্য লোক ছিলেন। তথাপি তিনি আমার কুটিরে উপস্থিত হইয়া আমায় লিখিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আমি বলিলাম, মহাশয়, লিখিতে আমার কোনো আপত্তি নাই। তবে কি না, আমার অনেক বয়স হইয়াছে, অনেক দিন লিখিতেছি, অনেক দিন লেখার জন্য নবিশি করিয়াছি, ভালো ভালো লোকের সঙ্গে লিখিয়াছি। কিন্তু এখনকার ছেলেছোকরা এডিটাররা আমার লেখায় দস্ত আন্দাজ করে। তাই আমি কাগজে লেখা ছাড়িয়া দিয়াছি। আপনার কে এডিটার হইবে, তাহা তো জানি না। তিনি বলিলেন, সে বিষয়ে আপনার কোনো ভয় নাই। আমিই এডিটার থাকিব। আমি আপনার লেখার দস্ত আন্দাজ করিব না। আপনার বাড়ির কাছেই ছাপাখানা— আপনার কাছ হইতে উহারাই কাগজ লইয়া যাইবে। আপনিই শেষ প্রুফ দেখিয়া দিবেন। তাঁহার মন, মুখ, কাজ সবই একরূপ। সেজন্য আমি তাঁহার নিকট চিরদিন বাধিত থাকিব। তিনি বেশ সোজা লোক ছিলেন। তাঁহার সহিত কাজকর্ম করিতে বা কথাবার্তা কহিতে বড়োই ভালো লাগিত। তাঁহার কাছে গেলে বা তিনি কাছে আসিলে মনে হইত, যেন তাঁহার একটা বিশেষ আকর্ষণী শক্তি আছে। সে আকর্ষণে বাংলায় অনেকেই পড়িয়াছেন, আমিও পড়িয়াছিলাম।

দাশ-সাহেব অল্প দিন হইল পৃথিবী ত্যাগ করিয়াছেন, এখনো তাঁহার রাজনীতি সম্বন্ধে কার্যকলাপ সমালোচনার সময় হয় নাই এবং লোকের ভালোও না লাগিতে পারে। এখন তাঁহার সম্বন্ধে এমন দু-চারিটি গল্প করা উচিত, যাহাতে তাঁহার চরিত্র ফুটিয়া উঠে ও তাঁহার উপর লোকের ভক্তিশ্রদ্ধা বৃদ্ধি হয়। খবরের কাগজে দেখিলাম, দাশ-সাহেব মহাত্মা গান্ধীর চেলা হইয়াছেন এবং উকিলরা পরগাছা, আসল গাছের রস চুষিয়া বড়ো হয়, মহাত্মার এই কথা মানিয়া লইয়া ব্যারিস্টারি ত্যাগ করিয়াছেন [১৯২০ খৃ.]। ব্যারিস্টারিতে তাঁহাকে কিরূপ খাটিতে হয়, তাহা আরায় গিয়া একটু দেখিয়াছিলাম এবং কিরূপ টাকা পাইতেন, তাহাও জানিতাম। শুনিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলাম। দুই-একবারমাত্র তাঁহার বাড়ি গেলেও, তাঁহার অসীম দানের কথা আমার বেশ জানা থাকিলেও,

আমি জানিতাম, তাঁহার চালচলন খুব উঁচু অঙ্গের। চালের জন্যও তাঁহাকে অনেক খরচ করিতে হয়। সে চাল চলিবে কিরূপে ? বোধ হয় কিছু করিয়াছেন, তাহাতে অন্তত চালটা বজায় থাকিবে। তাহার পর শুনিলাম, তিনি সর্বস্ব সাধারণের উপকারার্থ দান করিয়াছেন, এমন-কি, ভিটাবাড়িটি পর্যন্ত। আশ্চর্য হইয়া গেলাম। এই সময়ে আমাদের সাহিত্য-পরিষদের পণ্ডিত মহাশয় তারাপ্রসন্ন কাব্যকণ্ঠ আমায় আসিয়া বলিলেন, শাস্ত্রীমহাশয়, দাশ-সাহেব তো যথাসর্বস্ব দান করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অনেক বাংলা পুঁথি আছে। সেগুলির জন্য তিনি অনেক টাকা খরচ করিয়াছেন এবং ২/৩ বৎসর পণ্ডিত রাখিয়া সেগুলি গুছাইয়াছেন, আপনি গিয়া চাহিলে বোধ হয়, সাহিত্য-পরিষদের জন্য পাইতে পারেন। কথাটা আমার পছন্দ হইল না। লোক সর্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু শৌখিন লোক শখের জিনিস ত্যাগ করিতে পারে না। যাহা হউক, গেলাম। আমাকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন, "আপনি এখানে ?" আমি বলিলাম, "আমি সাহিত্য-পরিষদের দূত হইয়া আসিয়াছি।" "আমার তো এখন দিবার কিছু নাই যে, সাহিত্য-পরিষদের কোনো উপকার করিব।" আমি বলিলাম, "আমি জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি, আপনি যে অনেক যত্ন করিয়া বাংলা পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার কী ব্যবস্থা করিয়াছেন ?" তিনি বলিলেন, "হাঁ, তা বটে, সেগুলোর তো কোনো ব্যবস্থা করা হয় নাই, আমিও আর ৫/৭/১০ বৎসর তাহার কোনো ব্যবহারই করিতে পারিব না। আপনারা সেগুলি চান ?" আমি হাঁ বলিলে, তিনি ডাকিলেন—"সরকার !" সে আসিলে বলিলেন, "পুঁথির আলমারির চাবি লইয়া আইস।" চাবি আনিলে চাবিটি আমার হাতে দিলেন। আমি তো স্তম্ভিত, আর বাক্যস্ফূর্তি হইল না। তিনিও তাঁহার অন্য কাজে মন দিলেন, আমিও খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া বিদায় লইয়া আসিলাম। সাহিত্য-পরিষদের মিটিংয়ে এই-সব কথা শুনিয়া তাঁহারাও স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। দাশ-সাহেবের পুঁথিগুলি [৪২৪ খানি] স্বতন্ত্র করিয়া একটি আলমারিতে রাখার ব্যবস্থা হইল। উহার নাম হইল 'দেশবন্ধুর দান'।

দাশ-সাহেবকে যাঁহারা দেশবন্ধু উপাধি দিয়াছেন, তাঁহারা

দাশ-সাহেবকে সত্য সত্যই ভালোবাসিতেন, আর বন্ধু শব্দটি ভালোবাসারই চিহ্ন। দেশও তিনি ভালোবাসিতেন, দেশও ভালো-বাসিয়া তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে।

'মাসিক বসুমতী'
শ্রাবণ, ১৩৩২ ॥

নারায়ণের প্রথম সংখ্যা

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যখন ১৩২১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে নিজে সম্পাদক হইয়া 'নারায়ণ' নামে মাসিকপত্র বাহির করিলেন তখন চারি দিকে একটা শোরগোল পড়িয়া গেল। দাশ-সাহেবকে লোকে একজন বড়ো ব্যারিস্টার বলিয়াই জানিত; ইংরেজিতে ধুরন্ধর বলিয়া জানিত। কিন্তু বাংলায় লেখক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি কিছুই ছিল না। তবে কি না কালিদাস বলিয়া গিয়াছেন "ন হি কশ্চিদ বিষয়োনাম ধীমতাম্।"[৫] দাশ-সাহেব যে 'ধীমতাম্'-এর মধ্যে একজন সে বিষয়ে অনেকেরই সন্দেহ ছিল না; সুতরাং তিনি যে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে একটা-কিছু করিয়া যাইতে পারিবেন এমন আশা অনেকেই হৃদয়ে পোষণ করিত। মাসিক পত্রিকাখানি বাহির হইবামাত্র একটা জিনিস দেখা গেল। বিলাত-ফেরতা বাঙালি মহলে উহার খুব প্রচার হইল। কারণ দাশ-সাহেব নিজে একজন বিলাত-ফেরতা বাঙালি এবং নিজের দলে সকলেই তাঁহাকে ভালোবাসিতেন। তাঁহারা অন্য সম্পাদকের মাসিকপত্র বড়ো পড়িতেন না; কিন্তু যখন তাঁহাদেরই মধ্যে একজন সম্পাদক হইয়া দাঁড়াইলেন এবং ভালো কাগজে, ভালো ছাপায়, বড়ো বড়ো অক্ষরে নারায়ণ বাহির হইতে লাগিল, তখন তাঁহারাও নারায়ণ না পড়িয়া থাকিতে পারিলেন না। স্যার জে. সি. বোস [জগদীশচন্দ্র বসু, ১৮৫৯-১৯৩৭ খৃ.] বিজ্ঞানালোচনার অবসরে নারায়ণ পড়িতেন। অন্যে পরে কা কথা। বাংলা সাহিত্যের পক্ষে এটা একটা নূতন কথা বটে।

এত নাম থাকিতে মাসিকপত্রখানির নাম নারায়ণ হইল কেন? ঠাকুর দেবতার নামে তো মাসিকপত্রের নাম হয় না। প্রথম প্রথম তো দর্শন দিয়া নাম হইত, যেমন বঙ্গদর্শন, আর্যদর্শন ইত্যাদি। তাহার পরে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে মাসিক পত্রিকার নামকরণ হইতে লাগিল; যেমন তরঙ্গিণী, জ্যোৎস্না, জাহ্নবী, জন্মভূমি ইত্যাদি। কিন্তু ঠাকুর দেবতার নাম দিয়া মাসিকপত্র প্রকাশ এই প্রথম। ভক্ত যাঁহারা তাঁহারা মনে করিলেন দাশ-সাহেবও একজন ভক্ত। তিনি যে ভক্ত ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার লেখার প্রতি ছত্রেই তাহার আভাস আছে। কিন্তু অনেকে বলিলেন যে ভক্তচূড়ামণি অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়

যখন রাজদ্রোহ অপরাধে আলিপুর জেলে আটক ছিলেন এবং চিত্তরঞ্জন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আদালতে তাঁহাকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন ; সেই সময়ে একদিন অরবিন্দবাবু বলিয়াছিলেন, "আমার বোধ হয় যেন নারায়ণ স্বয়ং আসিয়া আমার পক্ষ-সমর্থন করিতেছেন।" কথাটা তখন অনেকেরই মনে লাগিয়াছিল। অরবিন্দবাবুরও যেন হৃদয়ের অন্তস্তল মথিত করিয়া কথাটা বাহির হইয়াছিল। তাই যখন দেখিলাম দাশ-সাহেব [৫/৭ ?] বৎসরের মধ্যেই নারায়ণ নামে পত্রিকা বাহির করিতেছেন, তখন আমার মনে হইল যেন এই দুইটি ঘটনার একটা বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

দাশ-সাহেবের নারায়ণ প্রথম সংখ্যা বাহির হইল। উহার প্রথমেই তাঁহার নিজের লেখা 'নমস্তে নারায়ণ' [স্তব]। তিন পাতা মাত্র নারায়ণের মহিমা বর্ণন ; উহাতে প্রার্থনা নাই, স্তব নাই, স্তুতি নাই। নারায়ণকে পাইবার একটা গভীর আশা আছে, একটা প্রখর চাঞ্চল্য আছে। পড়িলে সত্য সত্যই মনে হয় যে চিত্তরঞ্জনের হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে সে আশা, সেই চাঞ্চল্য ব্যক্ত হইয়াছে। পড়িলে আরো মনে হয় যে এমন জিনিস বুঝি বাংলায় আর কখনো পড়ি নাই। খানিকটা তুলিয়া দিলে বোধ হয় বিশেষ অপরাধ হইবে না। তিনি লিখিয়াছিলেন—

"সকল ভোগ্যের তুমি ভোক্তা, সকল রসের তুমিই আস্বাদনকারী। আমাদের সকল কর্ম্মের তুমি কর্ত্তা, সকল ধর্ম্মের তুমি ধাতা, সকল বিধির তুমিই বিধাতা, অনন্ত তোমার লীলা, হে অনন্তরূপী নারায়ণ তোমার কথা যখন ভাবি, অতীতের সমস্ত যবনিকা উত্তোলিত হয় ; তখন বুঝিতে পারি ইতিহাস শুধু তোমারই লীলা পরিপূর্ণ পুণ্য কাহিনী। সকল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জীব আর তুমি, তুমি আর জীব। তুমি এক, তুমিই দুই— এই দুই মিলিয়াই তুমি এক। ইহাই বিশ্বের নিগূঢ় রহস্য ইহাতেই বিশ্বের রস-স্ফূর্তি। ধন্য জীব ধন্য তুমি, ধন্য তোমার লীলা !

নমস্তে নারায়ণ !"

দাশ-সাহেব নিজে সম্পাদক হইয়াও নারায়ণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনো কথা বলিলেন না। কাহাকেও দিয়া সে কথা লিখাইলেনও

না। তিনি শিষ্য, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল [১৮৫৮-১৯৩২ খৃ.] তাঁহার গুরু। তিনি গুরুকে দিয়া একটি লম্বা প্রবন্ধ লিখাইলেন— 'নূতনে পুরাতনে'। সেই পুরানো কথা, সেই 'হিন্দু রিভাইভ্যাল', সেই হিন্দুধর্মের নবজীবন। বঙ্গদর্শনের শেষকালে যাহার অঙ্কুর বাহির হইয়াছিল : প্রচারে যাহার দুইটি পাতা বাহির হইয়াছিল ; অক্ষয় সরকারের [১৮৪৬-১৯১৭ খৃ.] নবজীবনে যাহার নবপল্লব প্রকাশ হইয়াছিল— সেই কথা। কিন্তু তখন সুর ছিল একটু চাপা, সব কথা খুলিয়া বলিতে লেখকদের যেন একটু বাধো-বাধো ঠেকিত। তাঁহাদের মুখ যেন ফোটে, ফোটে, ফোটে না। কিন্তু দাশ-পালের কাগজে ইহা খুব জোরের সহিত বলা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, আমাদের পুরানো যাহা ছিল ভালোই ছিল ; আমরা বুঝিতে পারি নাই। আমাদের বুঝাইয়া দিবার লোক ছিল না। আমাদিগকে উল্টা বুঝাইল, আমরাও তাহাই বুঝিলাম। দেশের সব জিনিস মন্দ বলিয়া মনে হইল, দেশ ছাড়িয়া বিলাতে গেলাম। তখন আমাদের চোখ ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। দেখিলাম তাহাদের মধ্যেও অনেক মন্দ আছে। আরো দেখিলাম যে তাহাদের পক্ষে যাহা ভালো আমাদের পক্ষে তাহার সবই ভালো নয় ; আবার আমাদের পক্ষে যাহা ভালো তাহাদের পক্ষেও তাহার সবই ভালো নয়। তখন একটা বিচার ও একটা মীমাংসার দরকার হইল। সেই মীমাংসায় আসিতে গেলে পাঁচটি পর্বের মধ্য দিয়া আসিতে হয়। প্রথম শাস্ত্র, দ্বিতীয় সন্দেহ, তৃতীয় বিচার, চতুর্থ সংগতি, এবং পঞ্চম সমন্বয়। পাল-মহাশয় বলিতেছেন এই পাঁচটি পায়ের উপর আমাদের ধর্মমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে শাস্ত্রের পরিবর্তে যদি সমাজের প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত বিধানাদিকে বসাইয়া দেই তাহা হইলে—

"যাহা প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত,
তাহার সত্যতা বা সনাতনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ,
সেই সন্দেহ নিরসনের জন্য বিচার,
এই বিচারের ফলে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তের
পরস্পরের সঙ্গে সঙ্গতি

আর সর্ব্বশেষে, এ সকল বিশিষ্ট সিদ্ধান্তের
সার্ব্বভৌমিক যে বিশ্ব সমস্যা তাহার
যথাযোগ্য সমন্বয়…

এই পঞ্চ অঙ্কে[৬]…সমাজ জীবনের অভিব্যক্তি ক্রমও ঠিক প্রকাশিত হইয়া থাকে।"

অর্থাৎ, বিপিনবাবু ইংরাজি পড়িয়া হিন্দুসমাজ ত্যাগ করিয়া যে অন্যায় করিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারিয়া এখন আর-এক চোখে হিন্দুসমাজ দেখিতেছেন এবং ইঙ্গিতে বলিয়াও দিলেন, "নারায়ণে তাহাই দেখানো হইবে।"

দাশ-সাহেবের প্রতি লোকের এতই শ্রদ্ধা ছিল যে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীলও [১৮৬৪-১৯৩৮ খৃ.] নারায়ণে নামিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে হাতে-কলমে কিছুই লেখেন নাই; তিনি বলিয়া গিয়াছেন, অন্য কেহ টুকিয়া লইয়াছে। তাঁহার প্রবন্ধের নাম 'হিন্দুর প্রকৃত হিন্দুত্ব'। দাশ-সাহেব ব্রজেন্দ্রবাবুকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছিলেন, "বারান্তরে এই বিষয়ের সর্বশেষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন।" কিন্তু ব্রজেন্দ্রবাবু সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন কি না জানি না।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের একটি গল্পও প্রথম সংখ্যায় ছিল। গল্পটির নাম 'মৃণালের কথা'। একালের মেয়েরা নিজের গরবে গরবিনী হয়ে কেমন বিটকেল হইয়া যায়, গল্পটিতে তাহাই দেখানো হইয়াছে। গল্পটির সার এই, "লোকে ব'লত আমার রূপের কথা, অমন রূপ বাঙালির ঘরে হয় না; আমি তারই গর্বে ফেঁপে উঠ্‌লাম। মা-বাবা বলতেন আমার বুদ্ধির কথা :—আমি সেই অহংকারেই ঘট হয়ে বসলাম। তুমি শিখালে আমার লেখা পড়া আমি তাই নিজেকে বিদ্বান ভেবে একেবারে টঙে চড়লাম। অন্য লোক হলে কত ঝগড়া-ঝাঁটি হত। কিন্তু তুমি একদিন একটা কড়া কথা পর্যন্ত বলো নি। যখন বড়ো অন্যায় করিতাম কেবল মুখখানা একটু ভার হত।… আমি নিজেকে তোমা থেকে কেবলই আলাহিদা ক'রে দেখতাম বলে, তোমার মহত্ত্ব যে কত ও কোথায় তা বুঝতে পারি নি। তাই আমার এ দুর্গতি।

"বড়ো সাধ হয়েছে, এবার যদি তুমি এ কলঙ্কিনীকে আবার

চরণাশ্রয় দাও তবে তোমার মধ্যে ও তোমার পরিবার-পরিজনের মধ্যে একবার ডুবে গিয়ে এ নারীজন্মটা সার্থক করি।"

নারায়ণের প্রথম সংখ্যার এই একটু নমুনা দিয়া আমি এই প্রবন্ধ শেষ করিলাম। চিত্তরঞ্জনের চেষ্টায় এই বৎসরের বৈশাখ মাসের ষষ্ঠ সংখ্যাটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতির কথা লেখা হয়।[৭] সংখ্যাটিও খুব বড়ো। ৫১২ পাতা হইতে ৬৬৯ পাতা পর্যন্ত। সেইজন্য এই সংখ্যা লিখিবার আগে ২০৮/২নং কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের বারান্দায় এক সভা হয়। চিত্তরঞ্জনের নিতান্ত ইচ্ছা ছিল যে সেই সভায় তিনি হাজির থাকেন। কিন্তু কাজের ভিড়ে তিনি আসিতে পারেন না এবং বিপিনবাবু সভার কাজ চালান। সভায় ঠিক হয় যে বৈশাখ সংখ্যায় বঙ্কিমবাবুর কথা ছাড়া আর-কিছু লেখা হইবে না। বঙ্কিমবাবু সম্বন্ধে যিনি যাহা জানেন যেন লিখিয়া পাঠান। এই সংখ্যায় বঙ্কিমবাবুর কনিষ্ঠ সহোদর পূর্ণবাবু [পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৪২-১৯২২ খৃ] লিখিয়াছিলেন, ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮৬৬-১৯২৩ খৃ.] লিখিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ [১৮৭৬-১৯৬২ খৃ.] লিখিয়াছিলেন, সুরেশ সমাজপতি [১৮৭০-১৯২১ খৃ.] লিখিয়াছিলেন, শ্রীমান্ জ্ঞানাঞ্জন পাল লিখিয়াছিলেন, ললিতচন্দ্র মিত্র লিখিয়াছিলেন, শ্রীমান্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮৮৫-১৯৩০ খৃ.] লিখিয়াছিলেন, হীরেন্দ্রবাবু [হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৮৬৮-১৯৪২ খৃ.] চণ্ডীচরণবাবু [বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৫৮-১৯১৬ খৃ] বঙ্কিমবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র জ্যোতিষচন্দ্র [১২৬৫-১৩৪২ ব.], বিপিনবাবু ইত্যাদি অনেকে লিখিয়াছিলেন। আমারও দুইটি প্রবন্ধ এই সংখ্যায় বাহির হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবুর কাঁটালপাড়ার বাড়ির অনেকগুলি ছবিও বাহির হইয়াছিল। ভবিষ্যতে যিনি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী লিখিতে যাইবেন, নারায়ণের এই সংখ্যাখানি হইতে তিনি তাঁহার গ্রন্থের অনেক মালমশলা সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

'বাঙ্গলার কথা'
-২ আষাঢ়, ১৩৩৫ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য।

চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫ খৃ.) প্রসঙ্গে শাস্ত্রীমশায় দুটি প্রবন্ধ লেখেন :

১. বাংলা সাহিত্যে চিত্তরঞ্জন, মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ ১৩৩২ ব.

২. নারায়ণের প্রথম সংখ্যা, বাঙ্গলার কথা, ২ আষাঢ় ১৩৩৫ ব.

'চিত্তরঞ্জন-প্রসঙ্গ' শিরোনামে এখানে প্রবন্ধ দুটি প্রকাশকালের অনুক্রম অনুসারে ছাপা হল। মূল প্রবন্ধের শিরোনাম উপ-শিরোনাম রূপে রাখা হয়েছে।

'বাঙ্গলার কথা' দি ফরওয়ার্ড পাবলিশিং লিমিটেড পরিচালিত, সত্যরঞ্জন বক্সী সম্পাদিত পত্রিকা। ২ আষাঢ় ১৩৩৫ ব. সংখ্যার। ৪ পৃষ্ঠায় শাস্ত্রীমশায়ের প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল।

১. অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০ খৃ.) ১৯০৮-এর মে মাসে গ্রেপ্তার হন এবং আলিপুর বোমার মামলায় অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁর বিচার হয়। সিডিশন কমিটি রিপোর্টে উল্লেখ আছে, "Meanwhile, on the 2nd May, on evidence obtained in connection with a previous outrage, searches were made in a garden at Maniktala and elsewhere in Calcutta and bombs, dynamite, cartridges and correspondence seized. Upon this 34 persons were charged with conspiracy, of whom one, Narendra Gosain, became an approver."

"The first batch of accused persons were under trial in the Magistrate's Court from the 4th of May to the 19th of August 1908. There was a second batch, and all those committed were under trial in the Sessions Court from the 14th of October 1908 to the 4th of March 1909." দ্র. *Sedition Committee 1918*, *Report*, New Age Publisher, Calcutta 1973, pp. 32, 214.

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য Emperor *Vrs* Arabinda Ghose and others মামলায় অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ব্যারিস্টার পি. মিত্র [প্রমথনাথ মিত্র ১৮৫৩-১৯১০ খৃ.] ২০, ২৩ অক্টোবর; ১, ৮, ৯, ১৪, ১৬ নভেম্বর; ২০, ২১ ডিসেম্বর ১৯০৮ এবং ৬ জানুয়ারি ১৯০৯ অরবিন্দদের পক্ষে দাঁড়ান। প্রমথনাথের ব্যারিস্টারির আয়ের হিসাবের খাতায় এই তথ্য পাওয়া যায়। দ্র. সত্যজিৎ চৌধুরী সম্পাদিত, 'প্রমথনাথ মিত্র বর্ধাপন ১৯৮০', নৈহাটি ১৯৮০ খৃ.।

২. 'মালঞ্চ' (১৩১৯ ব.), 'সাগরসঙ্গীত' (১৯১৩ খৃ.), 'অন্তর্যামী' (১৯১৪ খৃ.)।

৩. অনুবাদ: স্বকল্পিত কিছু লেখা হচ্ছে না, অপ্রয়োজনীয় কিছু বলা হচ্ছে না।

৪. দ্র. 'Note on the existance of the Magii (the Median Pristhood) in India at the present day', *Proceedings of Asiatic Society of Bengal*, 1901, pp. 75-77.

৫. অনুবাদ: বুদ্ধিমানের কাছে বিবেচনার অযোগ্য কিছু নেই।

৬. এখানটা ছেঁড়া থাকায় পাঠ উদ্ধার করা যায় নি।

৭. 'নারায়ণ' প্রথম খণ্ড ষষ্ঠ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২২ ব.
সূচিপত্র: হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়'; পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'অর্জ্জুনা পুষ্করিণী'; পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী': সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, 'সেকালের স্মৃতি— বঙ্কিমচন্দ্র'; পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা'; হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, 'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র'; জ্ঞানাঞ্জন পাল, 'রজনী (সমালোচনা)'; ললিতচন্দ্র মিত্র, 'বঙ্কিমবাবু': রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ঐতিহাসিক গবেষণায় বঙ্কিমচন্দ্র'; বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র, 'বঙ্কিমমণ্ডল বা বঙ্গদর্শন (কবিতা)'; হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'বঙ্কিমবাবু ও উত্তরচরিত'; হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, 'বঙ্কিমপ্রসঙ্গ— গীতার কথা'; চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্কিম-স্মৃতি'; জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বঙ্কিমচন্দ্র ও তাহার দ্বারবান্ 'পাঠক'; বিপিনচন্দ্র পাল, 'চরিত চিত্র'; ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, 'স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র ও ৺ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়'; পরিশিষ্ট: বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তলিপি [৭ পৃষ্ঠা]।
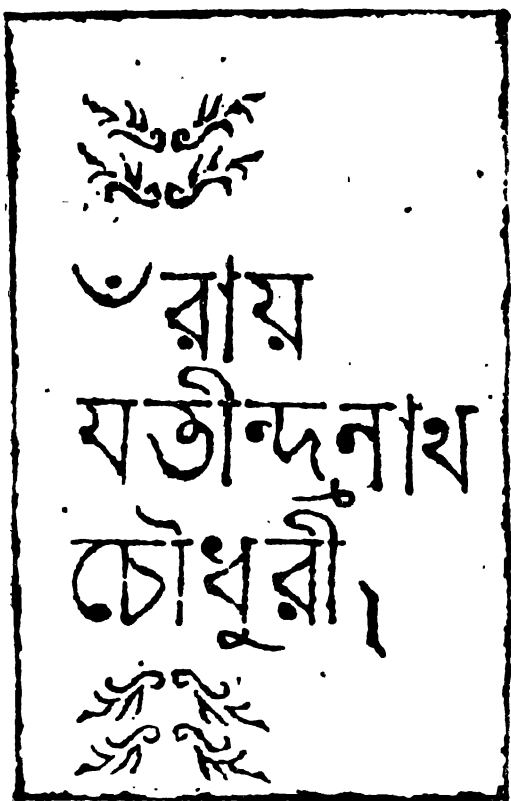
৺রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে আমরা ১৯-এ চৈত্র (১৩৩২ ব.) শুক্রবার দিন সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে ৩/৪ ঘণ্টা কাজ করিয়াছিলাম। আর ২৫-এ চৈত্র বৃহস্পতিবার সকালে খবরের কাগজে দেখিলাম, তিনি আর নাই। অনুসন্ধানে জানিলাম, তিনি রবিবারেও কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, মঙ্গলবারে পরিষদে আসিয়াছিলেন। বুধবার স্নান করিয়া ভিজা কাপড়েই বলিলেন, "এ কী, আমার আবার একটা কী রোগের সঞ্চার হইল, মাথাটা কেমন করিতেছে"— বলিয়াই তিনি ঘুরিয়া পড়িলেন। লোকে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে বিছানায় লইয়া গেল এবং ভিজা কাপড় ছাড়াইয়া লইল। কিন্তু তাঁহার জ্ঞান আর হইল

না। সন্ধ্যা ৭৷৷০ টার সময় মারা গেলেন। মানুষের জীবন এমনই চঞ্চল; কখন আছে, কখন নাই, কিছুই বলা যায় না। সত্যই আচার্য বলিয়াছেন, "নলিনীদলগতজলমতিতরলং, তদ্বৎ জীবনমতিশয়-চপলম্।"

রায় যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বন্ধুবান্ধবের সংখ্যাও কম ছিল না। সকলেই ভাবিলেন, আমরা একজন পরমাত্মীয়কে হারাইলাম। কারণ, তিনি সকলকেই খুব সমাদর করিতেন, সকলের সঙ্গেই সদ্ব্যবহার করিতেন— সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে সহায় হইতেন। তিনি কখনো রাগিতেন না। কটুকথা, অসভ্যকথা তাঁহার মুখ দিয়া কখনো বাহির হইত না। হাসি মুখে শত্রুর সহিতও আত্মীয়তা করিতেন।

যতীন্দ্রনাথ টাকির অতি প্রাচীন বঙ্গজ কায়স্থবংশে পোষ্যপুত্ররূপে গৃহীত হইয়াছিলেন। এই বংশের আদি খুঁজিতে গেলে মোগল-পাঠানের যুদ্ধের সময় যাইতে হয়। সেই সময় শ্রীহরি বিক্রমাদিত্য গৌড় হইতে পলাইয়া আসিয়া যশোরে দুর্গ নির্মাণ করেন। শ্রীহরির অনুচরগণের মধ্যে রায় যতীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষ একজন ছিলেন। বিক্রমাদিত্য মরিলেন— তাঁহার রাজ্য দুই ভাগ হইয়া গেল; একভাগ পাইলেন বসন্ত রায়, আর-একভাগ পাইলেন তাঁহার পুত্র প্রতাপাদিত্য। ক্রমে পুত্র কিরূপে খুড়াকে মারিয়া সমস্ত রাজ্য দখল করিলেন, কিরূপে খুড়ার ছেলে দিল্লিতে গিয়া বাদশাহের শরণাপন্ন হইলেন, কিরূপে বাদশাহ মানসিংহকে পাঠাইয়া প্রতাপাদিত্যের রাজ্য লোপ করিয়া দিলেন, সে কথা ইতিহাসে প্রসিদ্ধই আছে[১]। সেই রাজ্য লোপ হওয়ার পরই টাকির উন্নতি। টাকির বঙ্গজ কায়স্থরাও চন্দ্রদ্বীপ হইতে শ্রীহরির সঙ্গে আসিয়া টাকিতে বাস করেন। এই বংশে রামচাঁদ মুন্সি ইংরাজের পক্ষ হইয়া ইংরাজরাজ্যের প্রথমে প্রভূত ধন-মান ও ভূমি অর্জন করেন। টাকির জমিদারেরা প্রথম হইতেই দাতা বলিয়া বিখ্যাত হন এবং তাঁহারা হিন্দুধর্মের একঘর প্রধান পরিপোষক ছিলেন। তাঁহারা প্রায় ১০০ বৎসর ধরিয়া আপনাদিগকে রাজা বলিয়াই মনে করিতেন। দেশীয় কবি, যাত্রাওয়ালা, পাঁচালি-ওয়ালাদের যথেষ্ট অর্থ দিতেন এবং দেশী ভাবেরই পরিপুষ্টি করিতেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহারা প্রথম বুঝিতে পারেন যে, তাঁহারা ইংরাজরাজের অধীন এবং সাধারণ প্রজা হইতে তাঁহাদের ভেদ অতি অল্প।

যতীন্দ্রনাথ এই বংশেই পোষ্যপুত্ররূপে গৃহীত হন। বাল্যকালে তিনি টাকিতেই থাকিতেন এবং বরাবরই টাকির উপর তাঁহার খুব টান ছিল। তিনি বৎসরে ২/৩ মাস ক্লিপ্তভাবে সেখানে থাকিতেন এবং সর্বদাই সেখানে যাইতেন। লেখাপড়া শিক্ষার জন্য কলিকাতায় তাঁহার দীর্ঘ প্রবাস। পরে বরাহনগরে মুন্সিদের প্রকাণ্ড রাজভবনের এক অংশে আপনার বাসস্থান প্রস্তুত করান। তাঁহার বাড়িটি গঙ্গার উপরেই অতি সুন্দর জায়গায়। যতীন্দ্রনাথ হেয়ার স্কুল হইতে এন্ট্রান্স পাস করিয়া, ৫ বৎসর প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িয়া এম.এ. পর্যন্ত পাস করেন। স্কুল কলেজের ছেলেদের ভিতর ভালো ছেলে বলিয়া তাঁহার বেশ সুখ্যাতি ছিল। তিনি স্কুল হইতেই ভালো বাংলা শিখিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার ভাষা বেশ সুললিত ছিল। কলেজে তখন বাংলার কোনো চর্চাই ছিল না। কলেজে বাংলা ঢুকাইবার একজন প্রধান উদ্যোগী রায় যতীন্দ্রনাথ।

রায় যতীন্দ্রনাথ যে বংশে জন্মিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে অর্থ উপার্জনের জন্য ভাবিতেই হয় নাই। তিনি কলেজ ছাড়িয়াই টাকির মুন্সিদের বাংলা সমাজে যে স্থান ছিল, সেইটি অধিকার ও পূরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আর এই ৪০ বৎসর ধরিয়া তিনি বাঙালি হিন্দুদের একজন নেতা বলিয়া গণ্য ছিলেন। এমন কাজ ছিল না, যাহাতে যতীন্দ্রনাথ ছিলেন না। তিনি সাহিত্য-পরিষদে খুব ওতপ্রোতভাবে সংসৃষ্ট ছিলেন। ইউনিভার্সিটির তিনি একজন ইলেক্‌টেড ফেলো ছিলেন, অনেকবাব ব্যবস্থাপক-সভায় সভ্য হইয়াছিলেন। এক সময় কংগ্রেসে তাঁহার বেশ প্রতিপত্তিও হইয়াছিল; সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি যোগ দিতেন এবং নিজের একটা কৃতিত্ব দেখাইবার চেষ্টা করিতেন। অনেক সময় তাহাতে বেশ কৃতকার্যও হইয়াছেন। যতীন্দ্রনাথ রাজনীতিক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথের [বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৪৮-১৯২৫ খৃ] ছাত্র; অনেক সময় তাঁহারই পরামর্শমতো কার্য করিতেন। যতীন্দ্রনাথের জিদ ছিল, বল ছিল,

মন ছিল, প্রাণ ছিল। দানে তিনি প্রথম বয়সে মুক্তহস্ত ছিলেন। সাহিত্য-পরিষদের অনেক অনুষ্ঠানই তাঁহার অর্থে আরম্ভ হইয়াছিল। তিনি যখন দিতেন, অকাতরে দিতেন। বাংলা সাহিত্যে যে একটা প্রাচীন অক্ষয় ভাণ্ডার আছে, তাঁহার বংশগত ইতিহাস হইতেই তিনি তাহা জানিতেন এবং সেইটাকে রক্ষা করার জন্য তাঁহার একটা ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল। তিনি পুরানো গল্প করিতে ও শুনিতে ভালোবাসিতেন। বিশেষ পুরানোকালের জমিদারেরা ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কী কী করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা জানিবার জন্য যতীন্দ্রনাথের একটা উৎকট কৌতূহল ছিল। পুরানোর উপরে খুব ঝোঁক থাকিলেও নূতনে তাঁহার যথেষ্ট টান ছিল। তাহার প্রমাণ তাঁহার লাইব্রেরি। তিনি রাবিশ নাটক নবেল ছাড়া সব বইই এক-এক কাপি কিনিতেন। দর্শনশাস্ত্রের উপর তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। আমাদের দর্শন তিনি পণ্ডিত রাখিয়া অনেক পড়িয়াছিলেন। কিন্তু ইউরোপীয় দর্শনেও তাঁহার খুব ব্যুৎপত্তি ছিল। ঐ দর্শনের নূতন কোনো বই বাহির হইলেই তিনি তাহা কিনিতেন এবং দুই দর্শনের যিনি সামঞ্জস্য দেখাইতে পারিতেন, যতীন্দ্রনাথ তাঁহার গোলাম হইয়া যাইতেন। পুরাণী রোশনীতে যতীন্দ্রনাথ খুব উজ্জ্বল ছিলেন। নয়ী রোশনীতেও তিনি খুব উজ্জ্বল ছিলেন। দুই রকমের উজ্জ্বলতায় তাঁহার নিজের যে ঔজ্জ্বল্য হইয়াছিল, তাহা তিনি জানিতেন কি না, জানি না। কিন্তু আমরা জানিতাম, তাহারা তাঁহাকে উজ্জ্বলতর ও উজ্জ্বলতম করিয়া তুলিয়াছিল। যাহা হারাইয়াছি, তাহা আর পাইব না। যেমনটি যায়, তেমনটি আর হয় না।

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'
প্রথম সংখ্যা, ১৩৩৩ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে ১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ ব., ৩০ মে ১৯২৬ খৃ., রবিবার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীর (১২৬৯-১৩৩২ ব.) শোকসভায় শাস্ত্রীমশায় সভাপতিত্ব করেন। এই সভায় এই প্রবন্ধটি পড়েন। সাহিত্য-পরিষদের কার্যবিবরণীতে উল্লেখ আছে —

"সভাপতি মহাশয় বলিলেন,— 'যতীন্দ্রবাবুর কথা আপনারা অনেক শুনলেন। বক্তাগণের মধ্যে অনেকেই তাঁর সঙ্গে কাজ করিয়াছেন, আমার সঙ্গে ৫০ বছর আগে তাঁর জানাশুনা হয়— যখন তিনি হেয়ার স্কুলে পড়তেন, তখন থেকে আমার সঙ্গে আলাপ। যতীন্দ্রবাবুর বংশ বাঙ্গালার একটা অতি প্রাচীন জমিদারবংশ। তিনি প্রাচীন জমিদারবংশের প্রাচীন রীতিনীতিতে দুরস্ত ছিলেন। নূতন ও পুরাতন সভ্যতার নিদর্শন তাঁহাতেই দেখিয়াছি। তিনি কথকতা, পুরাণ ও প্রাচীন গল্প শুনতে খুবই ভালবাসতেন। আর এ সব গল্প তিনি অনেক জানতেন। তাঁর culture ছিল এক রকমের, যা সাধারণের কাছে পাওয়া যায় না। সাহিত্য-পরিষদে তাঁর সঙ্গে কাজ করেছি। অনেক ক্ষেত্রে আমি তাঁর উপর রাগ করেছি। তিনি কিন্তু রাগতেন না। ইংরেজিওয়ালাদের অমন ধারা দেখা যায় না। সাহিত্য-পরিষদের যে ক্ষতি হয়েছে— তা আর বলবার নয়। এ ক্ষতি পূরণ হবে না। তাঁকে এ বছর পরিষদের সভাপতি করতে চেয়েছিলাম— তার প্রস্তাবও করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন— 'আপনি যা প্রস্তাব করবেন, তাতে আমার আপত্তি থাকিতে পারে না।' এ ভাবে আমার প্রস্তাব ব্যর্থ হবে, তা জানতাম না। তিনি স্বর্গে গেলেন। আমাদের কষ্ট বলে বোঝাবার নয়। আমরা আশা করি, তাঁর বংশের উপযুক্ত বংশধরগণ পরিষদে এসে তাঁর স্থান গ্রহণ করুন— ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।" দ্র. সা-প-প, ১৩৩৩ ব.

১. আকবরের রাজত্বকালে মানসিংহ দুবার সুবাদার হয়ে বাংলায় আসেন, ১৫৯৪-৯৯ খৃ. এবং ১৬০০-০৫ খৃ.। জাহাঙ্গীরের আমলে আবার আসেন ১৬০৬-এর নভেম্বরে অল্প দিনের জন্য। প্রতাপাদিত্যের চূড়ান্ত পরাজয় হয় ইসলাম খাঁর সুবাদারির সময়ে (১৬০৮-১৩ খৃ.)। মানসিংহের সময়ে নয়।

সভার কাজ প্রায় শেষ হয়েছে, কাজ কিছু বাকি আছে আমার। এই সভার সভাপতি হয়ে আপনাকে আজ অত্যন্ত ধন্য বলে বিবেচনা করছি। কেন ? এই যে নাটোরের রাজবংশ, এ বহু-কাল বাংলাদেশে বঙ্গসাহিত্য বলুন, সংস্কৃতসাহিত্য বলুন এ-সকলের অভিভাবকস্বরূপে অযাচিত সাহায্য করে আসছেন, আর সংস্কৃতসাহিত্যের উন্নতির জন্য কতবার চেষ্টা করেছেন বলে শেষ করা যায় না। আপনারা জানেন, নবদ্বীপে একটি বৃত্তি আছে, সে বৃত্তি আগে ১০৮ টাকা ছিল, তার সাহায্যে এক শত ছাত্র নবদ্বীপে পড়ত, এই টাকাটা মোগল গবর্নমেন্টের সময়, নবাবদের সময়, নাটোরের

রাজার অনুরোধে মুর্শিদাবাদ ট্রেজারি হতে দেওয়া হত। তার পর সেটা যখন চলে যায়, মোগল গবর্নমেণ্ট চলে গিয়ে যখন ইংরেজ গবর্নমেণ্ট হয়, তাঁরা সেই টাকাটা দিতেন। ক্রমে ইংরেজ গবর্নমেণ্টের কয়েকজন রাজপুরুষের চেষ্টায়, বিশেষত স্যার জন ওয়ার এডগারের[১] চেষ্টায় সেটা ১০৮৲ থেকে ১৫০, ২০০, এখন ৫০০ দাঁড়িয়েছে। সুতরাং এ জিনিসটি নাটোর রাজপরিবার থেকে পেয়েছি। নাটোরের রাজ পরিবার বহু-সংখ্যক ব্রাহ্মণকে বৎসরে ৬ শত টাকা করে বৃত্তি দিতেন। এখনো উত্তরবঙ্গে অনেকে সে বৃত্তি পাচ্ছে, পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের বৃত্তি লোপ পেয়েছে। বাংলা সাহিত্যের অনেক কবি তাঁদের নিকট থেকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রাপ্ত হয়েছেন, এখনো হচ্ছেন। এখানে নাটোর রাজবংশের গৌরব বর্ণনা করা অপ্রাসঙ্গিক, আমাদের উদ্দেশ্য জগদিন্দ্রনাথের গুণাবলী বর্ণনা করা। যাঁরা তাঁর সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতার সম্পর্কে বদ্ধ, তাঁদের কাছে এইমাত্র আপনারা তাঁর অশেষ প্রকার গুণাবলীর বর্ণনা শুনেছেন। আমি তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হতে পারি নি, কেননা আমাদের সাংসারিক পথ ভিন্ন। কিন্তু সাহিত্য-পরিষদে এসে পর্যন্ত আমরা দেখেছি এমন কোনো কাজ ছিল না যাতে মহারাজ জগদিন্দ্রনাথকে ডাকলে অগ্রণী হয়ে এখানে তিনি না আসতেন। কতবার এখানে এসে কত বক্তৃতা করেছেন, কতবার মৃদঙ্গ বাজিয়েছেন, কতবার কত কাজে সহায়তা করেছেন তা আপনারা সকলে জানেন। সে সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু বলব না।

আমি তাঁর অনেক গ্রন্থ পড়ি নি। আমার বন্ধু অবিনাশবাবু বললেন সরকারি কার্যোপলক্ষে তিনি তাঁর অনেক গ্রন্থ পড়েছেন। সে সৌভাগ্য আমার হয় নি। তাঁর মতো সরকারি মাহিনা খেয়ে আমি বেশি দিন কাজ করি নি। যা হোক, যতগুলি বক্তৃতা তাঁর শুনেছি, কানে লেগে আছে। তাঁর প্রথম বক্তৃতা শুনি বর্ধমানের বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে। তিনি মেঘদূতের উপর বক্তৃতা করেন। সে বক্তৃতার ঝংকার, তার সংস্কৃত শব্দবাহুল্য গঙ্গানদীর স্রোতের ন্যায় প্রবাহ, শ্লোকের পর শ্লোক ব্যাখ্যা সমস্ত আমার কানে এখনো লেগে আছে। তিনি মেঘদূত কত যত্নসহকারে পড়েছেন আমি সেদিন

বুঝেছি। তার পর আর-একদিন তাঁর ঝংকার শুনেছি, সাহিত্য-পরিষদে স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের [১৮৬৪-১৯২৪ খৃ.] পরলোকগমনে যখন শোকপ্রকাশ-সূচক প্রস্তাব হয়েছিল [১ আষাঢ় ১৩৩১ ব.]। তিনি ছিলেন তার প্রথম বক্তা, প্রথম প্রস্তাবক, তিনি যে বক্তৃতা করেন তার স্মৃতি এখনো অনেকের মনে আছে, আমার কানে এখনো সেটা মৃদঙ্গের বাদ্যের মতো লাগছে।

মহারাজ যে শুধু সংস্কৃতবহুল বাংলাই লিখতেন এমন নয়, একবার তাঁহার লেখা হায়দারাবাদ ও সেকেন্দরাবাদে ভ্রমণের কথা আমি পড়ি। প্রথম দুই প্যারাগ্রাফ পড়েই মনে হল— এ তো যে-সে লোকের লেখা নয়! শেষটা উল্টে দেখিলাম— জগদিন্দ্রনাথ রায়। তখন চলিত বাংলায় লেখা দেখে বেশি আগ্রহের সহিত পড়লাম। সেরূপ ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়া আমার ভাগ্যে বড়ো ঘটে নি। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত রসে পরিপূর্ণ, আর ইংরেজির বুকনিগুলি বড়োই মধুর। সাহেবরা কেমন করে প্রথম বেশ একটু কষ্ট দিয়েছিল এবং শেষ তাঁর সঙ্গে খুব ভাব করেছিল সে কথাগুলি পড়লে আপনি হাসি আসে।

তাঁর 'নূরজাহান' পড়ে তিনি যে ইতিহাসতত্ত্বে বেশ নিপুণ ছিলেন তা বোঝা যায়। নূরজাহানের চরিত্র তিনি খুব পরিষ্কার করে ফুটিয়েছেন এবং আকবর যে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে নূরজাহানের বিবাহ না দিয়ে অন্যায় কর্ম করেছিলেন তাও বেশ বোঝা যায়। নূরজাহান যে করে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে মহবত খাঁর হাত হতে জাহাঙ্গীরকে উদ্ধার করেন, তা পাঠ করে মনে হয় নূরজাহান সাধারণ রমণী ছিলেন না।

মহারাজ জগদিন্দ্রের অমায়িকতার পার ছিল না। আমার মতো একজন সামান্য লোক— তিনি একদিন আমাকে বলে পাঠালেন— 'আমি তোমার বাড়ি যাব।' আমি অবাক হয়ে গেলুম। নাটোরের মহারাজ হুকুম করলে আমার মতো কত লোক তাঁর দ্বারদেশে উপস্থিত হত। কী রকম করে বাড়ি সাজাব, কী রকম করে তাঁকে অভ্যর্থনা করব, বসাব কোথায়— এই নিয়ে আমি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লুম। বসাবার জায়গা তো করলুম, তিনি কিন্তু এসেই আপনা হতে আমার

ভাঙা চেয়ারে গিয়ে বসলেন এবং দু ঘণ্টা আমার সঙ্গে গল্প করলেন। নানা প্রকার গল্প। আমার মনে হল, আমার প্রতি অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন। এটা যখন মনে হল, কী একটা আনন্দ হল, আত্মপ্রসাদ হল আমি বর্ণনা করতে পারি নে।

তারপর মহারাজকে সাহিত্য-পরিষৎ থেকে যখনই আসবার জন্য অনুরোধ করেছি, এসেছেন। যখন যে সাহায্য চেয়েছি, দিয়েছেন। তিনি অনেক জায়গায় যেতেন, অনেক জায়গায় তাঁকে দেখেছি। একবার দেখা হয় আর্ট থিয়েটারের এক সভায়। তিনি ছিলেন সভাপতি, আমি তাঁর পাশে বসেছিলাম। তিনি দুঃখ করে বললেন, "আমাদের দেশ এমন খারাপ হয়ে গেছে, এই যারা এমন সুন্দর অ্যাক্ট করতে পারে, যারা নটরাজ, তাদের কোনো উপাধির ব্যবস্থা নাই। বিলাতে এখন তাদের স্যার করতে আরম্ভ করেছে, অল্প দিনের মধ্যে হয়তো লর্ড করে দেবে। যারা ভালো অভিনয় করতে পারে তাদের আমাদের দেশে সে-সব কিছুই নাই। রাজা নাই, তাই শিল্পকলা নাট্যকলার কোনো আদর নাই।"

আমি বললাম, "মহারাজ আপনি তো রানী ভবানীর বংশধর, আপনি নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে যান না! এই যে অমৃতলাল বসু [১৮৫৩-১৯২৯ খৃ.], অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় [১৮৭৫-১৯৩৪ খৃ.] আছেন— এঁরা নাট্যশাস্ত্রের অনেক আলোচনা করেছেন, এবং তাতে সার্থকতা লাভ করেছেন, এঁদের কেন আপনি উপাধি দেন না? আপনাদের রাজবংশ চিরকাল গুণের সমাদর করে এসেছেন ; আপনি তাঁদের বংশধর।"

তখন তিনি বললেন, "আমি বললেই কি লোকে তা গ্রহণ করবে?"

"কেন করবে না, আপনি বলুন।" তখন তিনি অমৃতলাল বসু মহাশয়কে নাট্যাচার্য এবং অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যাকে নটরাজ উপাধি দিলেন এবং তাঁরা এই দুইটি উপাধি অতি আগ্রহসহকারে আদরের সহিত আজ পর্যন্ত ব্যবহার করছেন। সুতরাং নাটোরের মহারাজকে যদি তাঁর পারিবারিক গৌরব কেউ স্মরণ করিয়ে দিত, তিনি সকলের নামে সেটা করতে চেষ্টা করতেন। কেউ কেউ বলেন তিনি

পারিবারিক সম্পর্কটা ভালোবাসতেন না, নিজের প্রভাবে সব কাজ করতে চাইতেন। আবার কেউ কেউ বলেন উল্টা, তিনি নিজেকে ডুবিয়ে রাজপরিবারকে জাহির করতে চেষ্টা করতেন। আর্ট থিয়েটারের এই উদাহরণে কিন্তু এ দুইয়ের সুন্দর সামঞ্জস্য দেখা যায়।

আরো অনেক জায়গায় আমরা একত্র হয়েছি। তাঁর সদাচার ও সৌজন্যে সকলে মুগ্ধ হয়েছে। তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সুযোগ উপস্থিত হয় নি এবং আমার বোধ হয় উপস্থিত হলেও তিনি তা পছন্দ করতেন না, কারণ তাঁর চেয়ে আমি বয়সে অনেক বড়ো ছিলাম, সুতরাং আমি উপস্থিত হলে তাঁদের আমোদ-আহ্লাদে ব্যাঘাত হত যাতে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। তিনি চলে যাওয়ার দরুন বঙ্গদেশ প্রকাণ্ড রত্ন হারিয়েছে। তিনি এত শীঘ্র যাবেন আমি বিশ্বাস করি নি। তিনি সাহিত্য-পরিষদের নেতা হবেন, বঙ্গ-সাহিত্যের নেতা হবেন, সংগীতবিদ্যার নেতা হবেন, থিয়েটারের নেতা হবেন, রজেনৈতিক নেতা হবেন, বরাবর আশা করেছি। তাঁর বয়সই বা কত হবে? বোধ হয় ৫৮ হয়েছিল। তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত, সে দুঃখ আমাদিকে বহু-কাল সহ্য করতে হবে। তাঁর মৃত্যুতে দেশে যে শূন্যতা এল, শীঘ্র তা পূর্ণ হবে না। তাঁর সুযোগ্য পুত্র এই সভায় উপস্থিত আছেন। কালিদাসের কথায় বলতে হলে তিনি—

প্রবর্ত্তিতো দীপইব প্রদীপাৎ[২]

অথবা বাল্মীকির কথায় হলে বলতে হয়—

বিম্বাৎ বিম্বমিবোত্থিম্[৩]।

তিনি পিতার রূপ ও গুণ যথেষ্ট পরিমাণে পেয়েছেন। বংশগৌরব তো দুজনেরই এক। তিনি যদি পিতৃপথ অনুসরণ করেন তবে সে স্থান পূর্ণ হয়ে যাবে।

'মানসী ও মর্ম্মবাণী'
শ্রাবণ, ১৩৩৩॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য।

প্রবন্ধটি 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে শোকসভা' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে 'মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর'-এর মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য ২ ফাল্গুন ১৩৩২ ব., ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬ খৃ. সন্ধ্যা ৬ টায় ৩২ বর্ষের নবম বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষণের সার কার্যবিবরণে এইভাবে লেখা আছে—

"নাটোর-রাজবংশ বাঙ্গালা ও সংস্কৃত শিক্ষার অভিভাবক ছিলেন এবং এখনও আছেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণদের রীতিমত বৃত্তি দিতেন, বাঙ্গালার কবিগণকে উৎসাহ দিতেন। মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের গুণাবলীর কথা আপনারা অনেক শুনিয়াছেন। আমি তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে পারি নাই। পরিষদে এসে তাঁহার প্রবন্ধ ও মৃদঙ্গ বাদ্য শুনেছি। পরিষদে অনেক অধিবেশনে সভাপতিরূপে তাঁহাকে দেখেছি। যখনই তাঁহার শরণাপন্ন হয়েছি, তখনই তিনি পরিষদে এসেছেন। তাঁর প্রবন্ধ ও বক্তৃতাগুলি এখনও কানে লেগে আছে। বর্দ্ধমানে সাহিত্য-সম্মিলনে তাঁহার মেঘদূতের প্রবন্ধ শুনেছি—কত যত্নে তিনি সে প্রবন্ধ পড়েছিলেন। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক গমনে শোক প্রকাশের জন্য পরিষদে যে বিশেষ অধিবেশন হয় তাহাতে তিনি যে প্রবন্ধ পড়েছিলেন তাহা মৃদঙ্গের মত কানে বাজছে। একবার, আমার মত এই সামান্য লোককে বলে পাঠালেন যে, তোমার বাড়ী যাব। আমি তখন বিষম বিপদে পড়লাম, কি দিয়ে আমার কুটীর সাজাব। কিন্তু তিনি এলেন, ২ ঘণ্টা আমার ভাঙা চেয়ারে বসে কত গল্প করলেন। তখন কত যে আনন্দ ও আত্মপ্রসাদ হল তা বলতে পারি না। তিনি আর্ট থিয়েটারের সভাপতি ছিলেন। একদিন থিয়েটারে তিনি আছেন, আমিও আছি ; তিনি বললেন, আমাদের দেশে নটগণকে উপাধি দেওয়া হয় না কেন? বিলাতে এইরূপ উচ্চশ্রেণীর অভিনেতাগণকে Sir উপাধি দেওয়া হয়, পরে হয়ত তাঁহারা Lord উপাধিও পেতে পারেন। আমি বললাম, উপাধি দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু লোকে তাহা গ্রাহ্য করবে কেন? তিনি বললেন, আমরা যদি আপনার ন্যায় নেতৃবর্গের অনুমোদনে অমৃতবাবু ও অপরেশবাবুর ন্যায় কৃতী

নটগণকে 'নটরাজ', 'নটেশ্বর' প্রভৃতি উপাধি দিই তবে দেশ তাহা গ্রহণ করবে না কেন? তিনি তাঁহার পারিবারিক গৌরব স্মরণ করে গৌরব অনুভব করতেন। তাঁহার সদাচার ও সৌজন্যে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তিনি আমার ২০ বছরের ছোট ছিলেন। তাঁহার আমোদ আহ্লাদে ব্যাঘাত হবে বলে আমি তত মিশতাম না। আমাদের জাতির উপর ভগবানের কোপ আছে বলে তিনি তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। আশা করি তাঁর সুযোগ্য পুত্র পিতৃপদ গ্রহণ করবেন। তাহলে আমরা এই নিদারুণ শোকে কতক শান্তি পাব।" দ্র. সা-প-প, ১৩৩৩ ব.

প্রবন্ধটি এই ভাষণের পূর্ণতর অনুলিপি। 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র এই সংখ্যাতে রমাকান্ত ভট্টাচার্যের 'জগদিন্দ্র-জীবন-পঞ্জী' ছাপা হয়েছিল।

•

জগদিন্দ্রনাথ রায়ের জন্ম নাটোরের ২ মাইল দূরে হরিপুর গ্রামে ৪ কার্তিক ১২৭৫ ব. ২১ অক্টোবর ১৮৬৮ খৃ.। বাবা শ্রীনাথ রায়। নাটোরের মহারাজ গোবিন্দনাথের পত্নী ব্রজসুন্দরী ১৮ মাস বয়সে তাঁকে দত্তক নে। আগে জগদিন্দ্রনাথের নাম ছিল ব্রজনাথ।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করেন ১৮৭৫ খৃ.।

সাহিত্য ও রাজনীতিতে আগ্রহী ছিলেন। সংস্কৃত ও ইংরেজি সাহিত্যে অধিকার ছিল। সংগীত ও খেলাধুলোয় উৎসাহী ছিলেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর নাটোর অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ১৮৯৭ খৃ., বহরমপুর অধিবেশন সভাপতি ১৯০৩ খৃ.। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ১৯০১ খৃ.।

বর্ধমানে অনুষ্ঠিত অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে (১৩২১ ব., ১৯১৫ খৃ.) সাহিত্য-শাখায় ২১ চৈত্র, ৪ এপ্রিল জগদিন্দ্রনাথ 'সাহিত্যে মানব-হৃদয়' প্রবন্ধ পড়েন।

১ আষাঢ়, ১৩৩২ ব. বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশনে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শোকসভায় 'স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়' প্রবন্ধ পড়েন।

'মানসী' পত্রিকার ষষ্ঠ বর্ষ (১৩২০ ব.) থেকে সম্পাদন; অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের সঙ্গে 'মর্ম্মবাণী' (১৩২২ ব.) সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদন। দুটি পত্রিকা পরে যুক্ত হয়ে 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' হয়। ১৩২২ বঙ্গাব্দ থেকে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে জগদিন্দ্রনাথ আমৃত্যু এর সম্পাদক ছিলেন।

রচনাবলী : 'নূরজাহান' (১৩২৪ ব.), 'সন্ধ্যাতারা' (কাব্য, ১৩২৩ ব.)।

এক মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যু ২১ পৌষ ১৩৩২ ব. ৫ জানুয়ারি ১৯২৬ খৃ.।

১. Sir John Ware Edgar (১৮৩৯-১৯০২ খৃ.) ১৮৮৭ থেকে ১৮৯১ পর্যন্ত বাংলা সরকারের চিফ্ সেক্রেটারি ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে বিশেষজ্ঞ।

২. অনুবাদ : প্রদীপ থেকে দীপ জ্বালিয়ে নেওয়া।

৩. অনুবাদ : বুদ্‌বুদ থেকে বুদ্‌বুদের মতো উৎপন্ন।
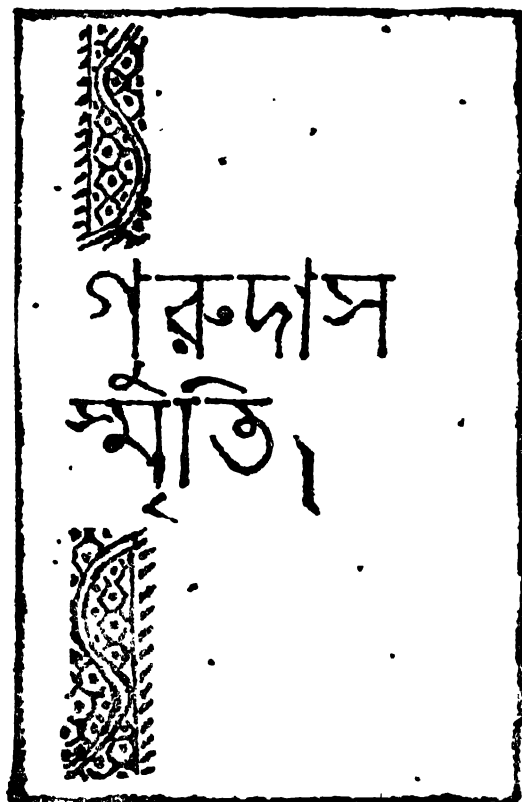
ইংরাজি ১৯ শতকের মধ্যভাগে স্যার গুরুদাসের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। তিনি মোক্তারি করিবার আশায় নারিকেলডাঙায় বাস করিয়াছিলেন। রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের এক মন্দিরের পুরোহিতের বাড়িতে তিনি বিবাহ করেন, ইঁহারাও খুব নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। গুরুদাসবাবুর মামা কেল্লায় চাকুরি করিয়া আপনাদের অবস্থা একটু ফিরাইয়াছিলেন। গুরুদাসবাবুর মুখে তাঁহার মামার অনেক কথা শুনিতে পাইতাম, মামার চরিত্রের অনেক ছায়া তাঁহার উপর পড়িয়াছিল। অল্প বয়সেই স্যার গুরুদাসের পিতৃবিয়োগ হয়, তাঁহার মা-ই তাঁহাকে মানুষ করিয়াছিলেন, মায়ের উপর গুরুদাসবাবুর

অচলা ভক্তি ছিল ! তাঁহার মা-ও খুব বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং পাকা গিন্নিও ছিলেন, গুরুদাসবাবুর সকল উন্নতির মূলেই তাঁহার মা।

স্যার গুরুদাস যে সময় জন্মগ্রহণ করেন, সেটা হিন্দু সমাজের পক্ষে ঘোর বিপ্লবের সময়। সে বিপ্লবটা বাংলায় যত ফুটুক আর না ফুটুক, কলিকাতায় অত্যন্ত ফুটিয়াছিল। এক দিকে বাপ, মা, আত্মীয়স্বজন ছেলেদের হিন্দু করাইবার জন্য চেষ্টা করিতেন, তাহাদিগকে আচার-বিচার শিখাইতেন, সন্ধ্যা-আহ্নিক করিতে শিখাইতেন, দেবতা-ব্রাহ্মণে ভক্তি করিতে শিখাইতেন, আর-একদিকে স্কুলে মাস্টাররা বলিতেন, ইংরাজি শেখো, ইংরাজের মতো চালচলন করো, দেবতাটা কু-সংস্কার, ব্রাহ্মণরা জুয়াচোর, আচার-বিচার বৃথা পরিশ্রম। এই দোটানায় পড়িয়া সে কালের লোক বড়োই বিষম সমস্যায় পড়িয়াছিল, ইংরাজি ও বাংলা সভ্যতার কোন্‌টা টিঁকিবে, তখনো তাহা স্থির হয় নাই, অধিকাংশ ছেলেই মাস্টারদের কথাই শুনিত। মাস্টার হয় ইংরাজ, নয় ইংরাজের চেলা, ছেলেদের চালচলন সব ইংরাজি ধরনের হইয়া পড়িত, ইংরাজি শিখিলেই মদ খাইতে হইত, মদ না খাইলে সভ্যতাই হয় না।

এই বিষম সংকটের সময় স্যার গুরুদাস ইংরাজি শিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ ছিল। যে-সকল মাস্টার তাঁহাকে হেয়ার স্কুলে ভর্তি করিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিতেন, ভর্তি করার জন্য গুরুদাসকে পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখি, তাহার কিছুই ঠেকে না। তাহাকে খুব নিচের ক্লাসেই ভর্তি করা হইল, তখন নিচের ক্লাসে উঠানামা হইত। গুরুদাস প্রথম দিনেই ফার্স্ট হইয়া বসিল, তাহার পর কখনোই সেখান হইতে নামিল না, স্কুল হইতে এন্‌ট্রান্স ক্লাসে ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট হইয়া পাস হইল, কলেজেও তাই, বরাবর ফার্স্ট, এম. এ.-তেও ফার্স্ট। গুরুদাসবাবুর হেয়ার স্কুলের উপর বড়োই টান ছিল, হেয়ার স্কুলের সকল প্রকার উৎসবেই তিনি আসিতেন। যখন হেড মাস্টার গিরীশচন্দ্র দেব মহাশয় [এপ্রিল ১৮৬৭ - জানুয়ারি ১৮৮২ খৃ.] পেন্সন লয়েন, তখন গুরুদাসবাবুকে প্রেসিডেণ্ট করিয়া তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ চেষ্টা করা হয়। কার্যটি ছোটো হইলেও গুরুদাসবাবুর তাহাতে বেশ আগ্রহ ছিল।

সমাজ-সংকটের, সভ্যতা-সংকটের সময় গুরুদাসবাবু ছেলেমানুষ হইয়াও খুব ধীরভাবে কাজ করিয়াছিলেন। ইংরাজি চালচলন তাঁহাতে একেবারেই প্রবেশ করে নাই, তাঁহার মা তাঁহাকে খাঁটি হিন্দু করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি নিত্য সন্ধ্যা-আহ্নিক করিতেন, তাঁহার মা তাঁহাকে কিছুই বাদ দিতেন না; ঠাকুরপূজা, লক্ষ্মীপূজা, ষষ্ঠীপূজা গুরুদাস নিজেই করিতে পারিতেন এবং অনেক সময় করিতেন, শ্রাদ্ধ-তর্পণাদিও যথাশাস্ত্র করিতেন, তাঁহার ক্লাসের ছেলেরা তাঁহাকে অদ্ভুত জীব বলিয়া মনে করিত।

কলেজ হইত বাহির হইয়া গুরুদাসবাবু দিন-কতক জেনেরল অ্যাসেম্ব্লিতে প্রফেসারি করেন, তাহার পর উঁকিল হইয়া বহরমপুরে যান। সেখানে, শুনিয়াছি, কোনো ভদ্র শূদ্র তাঁহার বাড়ি খাইতে আসিলে তিনি খুব যত্ন করিয়া খাওয়াইতেন, কিন্তু থালাখানি পুড়াইয়া শুদ্ধ করিয়া লইতেন। তাঁহার আফিসের কাপড় বাহিরের ঘরে থাকিত। সে কাপড় লইয়া তিনি বাড়ির ভিতর যাইতেন না। তিনি যখন হাইকোর্টের উঁকিল, তখন তিনি ১০টা ১১টার সময় বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিতেন, কোর্টের কাজ সারিয়া, অনেক মিটিং সারিয়া, বাড়ি যাইতে তাঁহার ৭টা ৮টা বাজিত, কিন্তু আফিসের কাপড়ে তিনি এক বিন্দু জলও পান করিতেন না। শুনিয়াছি, তিনি আদালতেই বাড়ির [জন্য ?] জল ও ভালো ভালো ফলমূল কিনিতেন; কিন্তু কেহ শুঁকিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ ফেলিয়া দিতেন।

তিনি যখন বহরমপুরের উঁকিল এবং সেখানকার ল-লেকচারার, তখন সর্বপ্রথমে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ পরীক্ষা হয়। ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার মিঃ সাটক্লিফ[১] তাঁহাকে এই পরীক্ষা দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কারণ তাঁহার ইচ্ছা ছিল এই স্কলারশিপটি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় পান। ইনি স্যার আশুতোষ নন, তাঁহার অনেক আগের লোক। গুরুদাসবাবু কিন্তু পরীক্ষা দিতে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই মিঃ সাটক্লিফ বলিলেন, "তুমি এখানে কেন ?" পরীক্ষা হইয়া গেল, আশুবাবুই প্রথম প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ স্কলারশিপ [১৮৬৮ খৃ.] পাইলেন। গুরুদাসবাবু জন্মের মধ্যে একবার ফেল হইলেন, তিনি আর এ পরীক্ষা দেন নাই।

কলেজে এম. এ. পরীক্ষা দিবার সময় নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় [১৮৪২-১৯২০ খৃ] মহাশয় তাঁহার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। স্যার গুরুদাস অঙ্কশাস্ত্রে, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় সংস্কৃতে পরীক্ষা দিবেন। আপনার আপনার বিষয়ে দুই জনই ধনুর্ধর, দুই জনই ফার্স্ট হইবার জন্য খুব চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা শুনিতে পাইয়া গুরুদাসবাবুর মা একদিন তাঁহাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "কী গুরুদাস, তুই আর নীলাম্বর না-কি রেষারেষি করিয়া লেখাপড়া শিখিতেছিস, ছিঃ!" গুরুদাসবাবু আমাকে অনেকবার বলিয়াছেন— "এই কথা শোনার পর আমি আর প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব মনেও রাখি নাই। যেমন রীতিমতো পড়িয়া যাই, তেমনই করিতে লাগিলাম, দু জনেই ফার্স্ট ক্লাসে ফার্স্ট হইয়া পাস হইলাম।"

এখনকার ইংরাজিওয়ালাদের প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, গৃহস্থালির দিকে অণুমাত্রও দৃষ্টি নাই। ভাঁড়ার যে একটা রাখিতে হয়, ইহা অনেকের ধারণাই নাই, দিন পয়সা ফেলিয়া বাজার হইতে জিনিস আনিয়া তাঁহারা আহারাদি করেন। কিন্তু গুরুদাসবাবু বাড়ির চারি দিকে বাগান করিতেন, বলিতেন চাকর-বাকরের হাতে দিলে তাহারা কী করিতে কী করিয়া বসে, ঠিক নাই, নিজে করাই ভালো। একদিন বাড়ির পাশেই দক্ষিণ দিকে একটি প্রকাণ্ড মাচা দেখাইলেন, তাহাতে শিম, শশা, ধুন্দুল, সব ফলিয়া রহিয়াছে। গাছপালার শখও তাঁহার বেশ ছিল, কোথা হইতে একটি ভালো আমের কলম আনাইয়াছিলেন। দুই-এক মাসের মধ্যেই কলম বা কলমের গাছটিতে একটি আম ফলিল। ছেলেরা আমটিকে তুলিতে সর্বদাই চেষ্টা করিত। তিনি বলিতেন, "না, ওটি পাকিলে ঠাকুরদের দিয়া খাইতে হইবে।" তিনি অনেক সময় দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, "সে আমটি কে চুরি করিয়া লইয়া গেল, ঠাকুরদেরও দেওয়া হইল না, খাওয়াও হইল না।"

পূর্বেই বলিয়াছি, মায়ের প্রতি তাঁহার বড়োই ভক্তি ছিল। তিনি মাকে দিয়া সবরূপ তীর্থধর্ম করাইয়াছিলেন। একটি পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। মায়ের শ্রাদ্ধও খুব ভক্তিপূর্বক করিয়াছিলেন। অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে বিদায় দিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় কোথাও বিদায় লইতেন না, কিন্তু গুরুদাসবাবু তাঁহাকে একটি রুপার

গ্রাস লওয়াইয়াছিলেন। তাহাতে অনুষ্টুপ্ ছন্দের দুই চরণ খোদা ছিল। মায়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য তিনি ইউনিভার্সিটিতে কিছু টাকাও দিয়াছিলেন— যাহা হইতে বৎসর বৎসর একটি মেডেল দেওয়া হয়।

গুরুদাসবাবু প্রতি বৎসর জগদ্ধাত্রীপূজা করিতেন। প্রথম প্রথম নিজেই গিয়া সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিতেন, শেষে ছেলেরা যাইতেন। জগদ্ধাত্রীপূজা কিছু কঠিন, প্রায় দুর্গাপূজারই মতো ; কিন্তু সব একদিনে করিতে হয়। পুরোহিত পূজা করিতেন, কিন্তু গুরুদাসবাবু সমস্ত দিন উপবাস করিয়া থাকিতেন। পূজার ব্যাপার সমস্তই শাস্ত্রমতো ঠিক হইত, সে বিষয়ে কোনোরূপ বিত্তশাঠ্য করিতেন না। দালানের সামনে তাঁহার যে উঠান ছিল, তাহার উপর ছাদ দেওয়া ছিল ; সুতরাং জায়গা অনেক ছিল। অনেক লোক বসিয়া দাঁড়াইয়া প্রতিমা দর্শন করিত। কলিকাতায় মান্যগণ্য লোক সকলেই গুরুদাসবাবুর নিমন্ত্রণ পাইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিত। খাওয়ারও নানারূপ উদ্যোগ চলিত। যাঁহারা আচমনীয় জিনিস খাইতেন না, তাঁহাদের জন্য এরারুট দিয়া অথবা পানফলের পালো দিয়া নানারূপ মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইত। আর যাঁহারা আচমনীয় খাইতেন, তাঁহাদের জন্য সুজি, ময়দা প্রভৃতি দ্বারা মিষ্টান্ন তৈয়ারি হইত। যাঁহারা বসিয়া খাইতেন না, তাঁহাদের জন্য হয় সরায়, না-হয় হাঁড়িতে মিষ্টান্ন গাড়িতে তুলিয়া দেওয়া হইত। গুরুদাসবাবু সকলকেই সমান-ভাবে আপ্যায়িত করিতেন, এবং সকলকেই কিছু খাওয়াইবার জন্য চেষ্টা করিতেন। নিজে সমস্ত দিন উপবাসী হইয়া তিনি যে কেমন করিয়া এত খাটিতে পারিতেন, সেটা একটা আশ্চর্যের বিষয়।

হিন্দুয়ানির কথা উঠিলে গুরুদাসবাবু বলিতেন যে, "স্রোত ফিরানো কঠিন। আমি তো বিশেষ যত্ন করিয়া ছেলেগুলিকে নিষ্ঠাবান্ হিন্দু করিয়া তুলিয়াছি ; কিন্তু সব নাতিগুলিকে বোধ হয় পারিলাম না।" পারিবেন কেমন করিয়া ? তিনি যখন জন্মিয়াছিলেন, তখন দোটানা একটু একটু আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহার শেষ বয়সে সমস্ত দেশ ইংরাজিতে প্লাবিত, সব ছেলেই সাহেবিয়ানা করিতে চায়। হিন্দুর আচার-বিচার আর কতক্ষণ টিকে ? আর বাস্তবিক কথাও বটে, ছেলেরা করিবেই বা কী ! তাহারা ইংরাজি, ভূগোল,

ইতিহাস, অঙ্ক, জ্যামিতি, বাংলা, সংস্কৃত, পরিমিতি, ড্রইং করিবে, ফুটবল খেলিবে, ক্রিকেট খেলিবে, না, শিখিবে ত্রয়োদশীর দিন বেগুন খাইতে নাই, নবমীতে লাউ খাইতে নাই, দশমীতে কলমি শাক, একাদশীতে শিম খাইতে নাই? তাহার পর আচার-বিচার বাড়ির মেয়েরা অথবা বুড়োরা শিখাইত। এখন মেয়েরা বেথুন কলেজ থেকে আসেন আর ছেলেরা বুড়োদের মতোই ইংরাজিওয়ালা, শিখাইবেই বা কে? তবে গুরুদাসবাবু নিজে যতটুকু পারিতেন, মানিয়া চলিতেন।

একদিন গুরুদাস বলিলেন, "দেখুন, ভাষাটাই বদলে যাচ্ছে (সেটা বোধ হয় আশ্বিন মাসে), এই দেখুন, এখন লক্ষ্মণতর্পণ বলিলে কেহ আর বুঝিতে পারে না। আশ্বিন মাসে অপর পক্ষে সকলকেই তর্পণ করিতে হয়। রামচন্দ্র তর্পণ করিতেন, দুইটি অনুষ্টুপের শ্লোক পড়িয়া তর্পণ করিতেন, কিন্তু লক্ষ্মণ বলিতেন, আমি অত পারিব না। তিনি শুধু বলিতেন, 'আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু' ইহারই নাম লক্ষ্মণতর্পণ। কোনো কাজ সংক্ষেপে সারিতে হইলে সেকালের লোক বলিত, লক্ষ্মণতর্পণ করিয়া ফেলুন, এখন ও কথাটাই উল্টিয়া গিয়াছে। কোনো পূজা-অর্চনার সংকল্প করিতে গেলে তাহার শেষে কর্তা বলিতেন, 'করিষ্যে' বা 'করিষ্যামি'। একজন ব্রাহ্মণ সেখানে বসিয়া থাকিতেন। তিনি বলিতেন, 'কুরুষ্ব'। ইঁহার নাম উত্তরসাধক ছিল। এখন উত্তরসাধক কথাটা কেহই বুঝেন না।" কথাটি খুব ভালো, কোনো রেজলিউশন করিতে গেলেই একজন তাহাকে সেকেণ্ড করা চাই। সেকেণ্ড করার নাম উত্তরসাধকতা। এখনকার লোক দিনকতক চেষ্টা করিল, 'দ্বিতীয় করিল' বা 'দ্বিতীয়িল'; কিন্তু সেটা চলিল না, সেকেণ্ড করাই চলিল। এমন একটি সুন্দর কথা 'উত্তর-সাধকতা' লোপ হইয়া গেল। এখন আর 'দক্ষিণা' নাই, তাহার বদলে 'ফি' হইয়াছে। সুতরাং গুরুদাসবাবু যে দুঃখ করিতেন, ভাষাটাই বদলাইয়া যাইতেছে, সেটা বড়ো মিথ্যা নয়। শুধু ভাষা কেন, আমাদের খাওয়া পরা সবই ইংরাজি ধরনে হইয়া যাইতেছে।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগকে গুরুদাসবাবু খুব মান্য করিতেন। নারিকেল-ডাঙায় তাঁহার বাড়ির কাছেই সংস্কৃত কলেজের ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের [১৮০৬-১৮৭২ খৃ.] বাড়ি ছিল, ছেলেবেলা

হইতেই জয়নারায়ণের প্রতি গুরুদাসবাবুর খুব ভক্তি ছিল। ক্রমে বয়স যত বাড়িতে লাগিল, অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁহার আলাপ-পরিচয় হইল। তিনি তাঁহাদের যথেষ্ট মান্য করিতেন। কিন্তু তাঁহার এ জ্ঞান ঠিক ছিল যে, ইংরাজি পণ্ডিতরা ইঁহাদের অপেক্ষা ঢের বড়ো। একদিন তাঁহার বাড়িতে কী কাজ, অনেকগুলি হাইকোর্টের উকিল নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত কেহই নাই, সংস্কৃত-জানা লোক একটিমাত্র ছিল। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের কথা উঠিলে গুরুদাসবাবু বলিলেন, "আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরা বেশ intelligent. দেখুন, একদিন হাতিবাগানের একজন বড়ো স্মার্ত-পণ্ডিতকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, 'বিষুব মানে যেদিন দিনরাত্রি সমান, তা যদি হয়, তবে বিষুবসংক্রান্তি তো ১০ই চৈত্র হওয়া উচিত, ওটা আপনারা চৈত্র মাসের শেষে লইয়া গিয়াছেন, ঠিক হয় নাই।' পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন, 'তুমি এখন যে গলিতে বসিয়াছ, এ গলির নাম কী?' আমি বলিলাম, 'রাজা নবকৃষ্ণের লেন।' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রাজা নবকৃষ্ণ কোথায়?' আমি বলিলাম, 'অনেক দিন মরিয়া গিয়াছেন।' পণ্ডিত বলিলেন, 'তাঁর নামে গলি থাকে কেন? তা যদি থাকিতে পারে, তবে ৩১শে চৈত্র বিষুবসংক্রান্তি হলই বা?' দেখুন দেখি, কেমন intelligent answer. যে সংস্কৃত-জানা লোকটি সেখানে বসিয়াছিলেন— তিনি একটু ঠোঁটকাটা; তিনি বলিলেন, "মশায়, আপনি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের যেরূপ patronising ভাবে কথা বলছেন, তাঁহারা বোধ হয়, সে ভাবের লোক নন। তাঁরা ৩/৪ হাজার বৎসর ধরিয়া সমস্ত ভারতবর্ষটা চালিয়া আসিয়াছেন, আর তাঁদের আপনি intelligent বলে certificate দিচ্ছেন; আর দিতে পারছেন, কারণ এখানে যাঁরা বসে আছেন, তাঁদের কেহই বোধহয় তাদের জানেন না।" গুরুদাস বলিলেন, "হাঁ, আপনি বলেছেন ঠিক বটে। এ কথাটাই বোধ হয় ঠিক, তাঁরাই ৩/৪ হাজার বৎসর দেশটা চালিয়ে এসেছেন।"

খাওয়া-দাওয়া বিষয়ে গুরুদাসবাবু বড়োই 'কটকেনা' করিতেন। তিনি কাহারো বাড়ি অন্নগ্রহণ করিতেন না, শ্বশুরবাড়িও খাইতেন না, ভগিনীপতির বাড়িও খাইতেন না, বলিতেন, "আমাদের বংশের ধারাই

এই, আমরা কখনো কোথাও খাই না।" একদিন এইরূপ কথা হইতেছে, একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সেখানে বসিয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন, "আপনি ভগিনীপতির বাড়ি খান না, ভাগ্নের বাড়িও খান না বোধ হয়।" উত্তর হইল, "আজ্ঞে, তা কেমন করে হয়, হতেই পারে না।" ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বলিলেন, "আচ্ছা, আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনাদের বংশের কেহ মরিলে ভাগ্নে তো তেরাত্রিতে তার শ্রাদ্ধ এবং পিণ্ডদান করে। সে কি ভাতের পিণ্ড দেয়, না লুচির পিণ্ড দেয়, না সন্দেশের পিণ্ড দেয়?" গুরুদাসবাবু বলিলেন, "আজ্ঞে, আপনি ঠিক বলেছেন, মরলে যার ভাত খেতে হবে, জেন্তে তার ভাত খাব না, এটা অসংগত বটে ; কিন্তু আমরা কী করব, আমাদের এটা কুলপ্রথা।"

২

গুরুদাসবাবু যখন কলেজে পড়েন, তখন বাংলা সেকেণ্ড language ছিল, কলেজের অধিকাংশ ছাত্রই বাংলা পড়িত, কেবল সংস্কৃত কলেজ, জেমোকান্দি স্কুল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বীরসিংহের স্কুল, প্রসন্নবাবুর খানাকুলের স্কুল আর হরিনাভির অ্যাংলো-সংস্কৃত স্কুলের ছেলেরা সংস্কৃত সেকেণ্ড language নিত, তাদের কিন্তু এখনকার অপেক্ষা বেশি সংস্কৃত পড়িতে হইত। গুরুদাসবাবু প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র, তিনি কলেজে সংস্কৃত একেবারেই পড়েন নাই, মাত্র বাংলা পড়িয়াছিলেন। কিন্তু ওকালতি অবস্থায় (বিশেষ বহরমপুরে) তিনি অনেক যত্ন করিয়া সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন, বহরমপুর কলেজে তখন রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় [১৮৩১-৯৪ খৃ] সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন, তাঁহার নিকট ব্যাকরণ ও সাহিত্য পড়িয়াছিলেন এবং সংস্কৃতে যথেষ্ট উন্নতিও লাভ করিয়াছিলেন, তিনি অনেক সংস্কৃত শ্লোক মুখে মুখেই আওড়াইতে পারিতেন, স্ত্রীধন সম্বন্ধে যখন আইনের বই লেখেন, তখন তাঁহাকে দায়ভাগখানি খুব ভালো করিয়া পড়িতে হইয়াছিল, দায়ভাগের সংস্কৃত বড়ো গম্ভীর ও গাঢ়। আইনের বইয়ের যেমন হওয়া উচিত, দায়ভাগের সংস্কৃত ঠিক তেমনই, সে বইখানি তিনি বেশ আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং স্ত্রীধন সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, এখন তাহাই আইন বলিয়া চলিয়া যাইতেছে। এই বই লিখিবার

সময় তাঁহাকে স্মৃতিশাস্ত্রের অনেক চর্চা করিতে হইয়াছিল, তিনি ইংরাজিওয়ালা, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মতো শুধু বাগর্থের বিচার করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না, কোনো পুঁথি হইতে কিছু উদ্ধৃত অংশ পাইলে তিনি সে পুথিখানি আনাইয়া উদ্ধৃত অংশ ঠিক তোলা হইয়াছে কি না, যে পুথিতে ঐ উদ্ধৃত অংশ আছে, তাহার অর্থের সহিত উদ্ধারকর্তার অর্থের ঐক্য আছে কি না, এ সবগুলি দেখিতেন, এবং এরূপে দেখিতে দেখিতে স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁহার বেশ ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল। পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন ; সুতরাং সন্ধ্যা-আহ্নিকের বই তিনি খুব যত্ন করিয়া ছাপাইয়াছিলেন, শুধু ছাপাইয়াছিলেন না, অর্থবোধ করিয়া টীকা-টিপ্পনীর সহিত ছাপাইয়াছিলেন। হলদে কাগজে উহা ছাপা হইয়াছিল। সেই সন্ধ্যার পুথি তিনি মুক্তহস্তে দান করিতেন, ছেলেদের পৈতা হইলে অনেকে ঐ পুথি তাঁহার বাড়ি হইতে আনাইয়া ছেলেদের মুখস্থ করাইতেন। অনেকবার চেষ্টা হয়, ইউনিভার্সিটি হইতে সংস্কৃত উঠাইবার জন্য ; গুরুদাসবাবু আড় হইয়া পড়িয়া উঠাইতে দেন নাই। কিন্তু এখন আর তিনি নাই, এখন সংস্কৃত উঠিতে বসিয়াছে। আর না বসিবেই বা কেন ? যে টোল সংস্কৃতবিদ্যার কেন্দ্র, সেই টোলেই যখন ছাত্র নাই, তখন ইউনিভার্সিটিতে আর দুখানা বই পড়াইয়া লাভ কী ? কিন্তু গুরুদাসবাবুর সংস্কৃত আর বাংলার সংস্কৃত একটু তফাত ছিল, গুরুদাসবাবুর সংস্কৃতের উচ্চারণ পশ্চিমাদের মতো, অক্ষর দেবনাগর, —বাংলা হইবে না, বাংলার চলিত বইয়ের উপর তাঁহার বড়ো শ্রদ্ধা ছিল না। কেন ছিল না, জানি না, তিনি বাংলার ন্যায়শাস্ত্র অপেক্ষা হিন্দুস্থানি বেদান্ত ভালোবাসিতেন, বাংলার মুগ্ধবোধ, সুপদ্ম, কলাপ তুলিয়া দিয়া পাণিনি চালাইতে ব্যগ্র ছিলেন, বাংলার চণ্ডী অপেক্ষা পশ্চিমা ভগবদ্‌গীতায় তাঁহার শ্রদ্ধা বেশি ছিল, যা হউক, তিনি সংস্কৃতের খুব পক্ষপাতী ছিলেন।

বাংলার সম্বন্ধে কিন্তু তাঁহার ধারণা অন্যরূপ ছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, লেখাপড়াটা যেন বাংলায় শেখানো হয়, ইংরাজি দিয়া শাস্ত্র শিখিব, এটা যে একটা বিষম ব্যাপার, তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন, সেইজন্য ১৮৯২ খৃস্টাব্দে যখন তিনি ভাইস-চ্যান্সেলার হয়েন, তখন ভাইস-চ্যান্সেলারের বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, ইউনিভার্সিটিতে বাংলাই

মিডিয়াম হওয়া উচিত। এম. এ. পর্যন্ত বাংলায় শিক্ষা দেওয়া উচিত, একটা বিদেশী ভাষায় জ্ঞান লাভ করিতে হইবে, এটা অতি শোচনীয় ব্যাপার।[২] কিন্তু তিনি সেদিন সাহস করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাঁহার যে বক্তৃতা ছাপা হইয়াছে, তাহাতে ততদূর নাই। জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা একটু ছাঁটিয়া-ছুটিয়া ছাপাইয়াছি। অনেকে মনে করেন, যেহেতু বাংলাতে বই পাওয়া যায় না, অতএব বাংলাতে শিক্ষালাভ হইতে পারে না, গুরুদাসবাবু সে দলে ছিলেন না। তিনি মনে করিতেন, বাংলা মিডিয়াম হইলে বাংলায় সব বই-ই তৈয়ারি হইতে পারিবে, তাহাতে জ্ঞান বিস্তারেরও উন্নতি হইবে, ভাষারও উন্নতি হইবে।

গুরুদাসবাবু যখন ছেলেমানুষ, তখন বাংলা ভাষায় প্রথম স্কুল-বই লেখা আরম্ভ হয়, স্কুল-বই লেখাটা সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতদের উপরেই পড়ে। তাঁহারা যে বাংলা লিখিতেন, তাহাতে পারসি আরবি প্রভৃতি চলিত শব্দ একেবারেই থাকিত না, তাহার বদলে থাকিত দাঁতভাঙা, চোয়ালভাঙা নূতন তৈরি, কড়া কড়া সংস্কৃত শব্দ। ক্রমে এই ভাষার নাম হয় সাধুভাষা, সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতরা যে বাংলা বই লিখিতেন, তাহার একটা রীতি ছিল, অনেকগুলি গুণ ছিল, বেশ অহংকার ছিল, কিন্তু তাঁরা ছাড়া আর যাঁরা বই লিখিতেন, তাহাতে এই তিনটার কিছুই ছিল না। কেবল বড়ো বড়ো সংস্কৃত কথা, আবার তাঁহারা মাঝে মাঝে খুব চল্‌তি আরবি পারসি কথাও ব্যবহার করিতেন। রেভারেণ্ড কে. এম. বানার্জি, [কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮১৩-৮৫ খৃ.], রাজা রামমোহন রায় [১৭৭২-১৮৩৩ খৃ], গুড়গুড়ে ভট্টাচার্যি [গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, ১৭৯৯-১৮৫৯ খৃ.], ঈশ্বর গুপ্ত [১৮১২-৫৯ খৃ] ও সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতদের বই পড়িয়াই গুরুদাসবাবু বাংলা শিখেন, সুতরাং সংস্কৃতবহুল সাধুভাষার উপর তাঁহার বেশি শ্রদ্ধা ছিল। মাইকেল [মধুসূদন দত্ত, ১৮২৪-৭৩ খৃ.] ও হেমচন্দ্রের [বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৩৮-১৯০৩ খৃ.] বই তিনি খুব ভালোবাসিতেন, অনেক সময় লম্বা লম্বা বক্তৃতা আওড়াইতেন। কিন্তু একখানা বড়ো আশ্চর্য বই তাঁহার খুব মুখস্থ ছিল, তিনি সময় সময় সমস্তটা আওড়াইয়া শুনাইতেন, সেই বইখানার নাম ছুছুন্দরী-বধ কাব্য। কার লেখা জানি না, অনেকে বলে, রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের লেখা,

অনেকে বলে, সংস্কৃত কলেজের আর-কোনো পণ্ডিতের লেখা, উদ্দেশ্য শুধু মাইকেলের মেঘনাদ-বধকে ব্যঙ্গ করা।[৩] ছুছুন্দরী শব্দের বাংলা অর্থ ছুঁচো. বইখানির এক সর্গ বৈ লিখা হয় নাই; কিন্তু সমস্ত সর্গটি গুরুদাসবাবু মুখস্থ বলিতে পারিতেন। তিনি মাঝে মাঝে নিজে কবিতা লিখিতেন এবং অন্যের কবিতা পরীক্ষা করিয়া দিতেন।

গুরুদাসবাবু সাধুভাষা ভালোবাসিলেও নিজে যখন বাংলা বই লিখিতে বসিয়াছিলেন, তখন কিন্তু তত কড়া সংস্কৃত ব্যবহার করিতেন না, চলিত কথাই ব্যবহার করিতেন। কিন্তু সেগুলি প্রায়ই সংস্কৃত হইতে নেওয়া. তাঁহার 'জ্ঞান ও কর্ম' নামে একখানি বই আছে, ইংরাজি দর্শনশাস্ত্রের মতো লেখা, ইহার ভাষাটা বেশ পরিষ্কার। শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে তাঁহার আর-একখানি বই ছিল, তিনি প্রায়ই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালী সমর্থন করিয়া গিয়াছেন. প্রণালীও ঐ, রীতিও ঐ, বিষয়গুলিও ঐ। তবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক বিষয়ে এবং কোন্ পুস্তকের কী বিষয় পড়াইতে হইবে, সে বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট মতভেদ ছিল। বাংলা অক্ষর যে দেবনাগরি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি একখানা খুব বড়ো বই লিখিয়াছিলেন, তাহার ভাষা কিন্তু জ্ঞান ও কর্মের ভাষার মতো সহজ নহে। তিনি বাংলা যে দেবনাগর হইতে আসিয়াছে, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ইতিহাস তাঁহার বিরোধী। তেকোণা অক্ষর গোল অক্ষরের অনেক আগে। অক্ষরশাস্ত্রের যতই আলোচনা অধিক হইতে লাগিল এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ের অক্ষরের লতা অর্থাৎ chart বাহির হইতে লাগিল, ততই ও কথাটা ইতিহাসসিদ্ধ নয় প্রমাণ হইতে লাগিল, কিন্তু স্যার গুরুদাস শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করিতেন, দেবনাগরি আদি অক্ষর, তাহা হইতে বাংলা বাহির হইয়াছে। এই সংস্কারের বশবর্তী হইয়া তিনি যখন ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন, তখন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আদেশ বাহির হইয়াছিল, যে কেহ সংস্কৃত লইবে তাহাকে দেবনাগরি অক্ষরে লিখিতে হইবে। কয়েক বৎসর ধরিয়া বাংলাময় কান্নাহাটি পড়িয়া গেল, ছেলেরা শ্লেট-পেন্সিল লইয়া ছাপা দেবনাগরি বই দেখিয়া ক, খ, গ, ঘ, কুঁদিতে লাগিল, কারণ, বাংলাদেশে তো আর দেবনাগরি অক্ষর

শিখাইবার গুরুমহাশয় পাওয়া যায় না, কে হাতে ধরিয়া ছেলেদের দেবনাগর অক্ষর লেখা শেখাইবে ? যাহা হউক, ৫/৭ বৎসর পরে দেবনাগর অক্ষর পরীক্ষায় নির্দিষ্ট হইবার আগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট ও-নিয়ম বন্ধ করিয়া দিলেন, তাহার পর গুরুদাসবাবু ও সারদাবাবু [সারদাচরণ মিত্র, ১৮৪৮-১৯১৭ খৃ.] দুজনে 'একলিপি-বিস্তার সমিতি'তে যোগ দিলেন, সারা ভারতবর্ষে একলিপি এক অক্ষর হইবে এবং সে অক্ষর হিন্দি, এই ব্যাপারটা হিন্দুস্থান হইতেই বাহির হইয়াছিল, হিন্দুস্থানিরা খুব খুশি হইয়া গেল। গুরুদাসবাবু অনেক সময়ে বাংলা চিঠি দেবনাগরি অক্ষরে লিখিতেন। একলিপি-বিস্তার সমিতি এখনো জীবিত আছে, কিন্তু মুমূর্ষুপ্রায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিহার, উড়িষ্যা ও রেঙ্গুন বাহির হইয়া যাওয়ার পর বাংলায় আর দেবনাগর বিভীষিকা হইবার কারণ নাই। আরো কারণ নাই, সংস্কৃতই তো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উঠিতে চলিল, দেবনাগর অক্ষরের আর দরকার কী ? এইখানে বলিয়া রাখি, অনেকের সংস্কার, দেবনাগর অক্ষরই সংস্কৃতের আদি অক্ষর। সেটা বড়ো ভুল। সংস্কৃত ভাষার অনেক উন্নতি হইলে পর কলমবন্দি হইতে আরম্ভ হয়— বর্ণমালা আরম্ভ হয়, সুতরাং প্রাচীনকালে সংস্কৃত নানা বর্ণমালায় লেখা হইত, যথা— অশোক অক্ষর অথবা ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী, পুষ্করসাদি প্রভৃতি, তার পর কুশান অক্ষর, তার পর গুপ্ত অক্ষর, তার পর সারদা কুটিল ও শ্রীহর্ষ অক্ষর, তার পর বাংলা, উড়িয়া, ত্রিহুতি, হিন্দি, মাড়োয়ারি, কাশ্মীরি, পঞ্জাবি, সিন্ধি, গুজরাটি, মারাট্টি, তৈলঙ্গি, দ্রাবিড়ি, কর্ণাটি, সিংহলি, ব্রহ্ম, শ্যাম, নেওয়ারি, তিব্বতি ইত্যাদি ইত্যাদি বহু-সংখ্যক। হিন্দির মধ্যে যেটা একটু পরিষ্কার, তার নাম দেবনাগরি, যেটা জড়ানো, তার নাম কাইতি। পাহাড়ে দুই রকম হরপ চলিত আছে— একটার নাম শাস্ত্রী হরপ, আর একটার নাম দেশী বা পাহাড়ি। শাস্ত্রী হরপে সংস্কৃত লেখা হয়। মহারাষ্ট্রদেশে দুই রকম অক্ষর চলিত আছে— একটার নাম মোড়ি আর-একটার নাম বালবোধ। বালবোধ অক্ষরে সংস্কৃত লেখা ও ছাপা হয়। সুতরাং যাঁরা মনে করেন, দেবনাগরিই সংস্কৃতের আদি অক্ষর, তাঁহাদের কথাটা ঠিক নয়।

গুরুদাসবাবু একখানি পাটীগণিত লিখিয়াছিলেন, বইখানি অল্প-

বিস্তর বিক্রয় হইয়াছিল। বইখানি যেরূপ পরিষ্কার এবং সরল করিয়া লেখা, অধিক বিক্রয় হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু গুরুদাসবাবু তো শিক্ষা-বিভাগের লোক ছিলেন না, তাই কেমন করিয়া বিজ্ঞাপন দিয়া বই চালাইতে হয়, তাহা হয়তো জানিতেন না, নয় জানিয়াও করিতেন না, নয় বা করা উচিত মনে করিতেন না। কিন্তু যখন তিনি Central Text Book Committeeর প্রেসিডেণ্ট হইলেন তখন সেই বই ছাপানো বন্ধ করিয়া দিলেন। এই Text Book Committeeতে গুরুদাসবাবুর ক্ষমতা আমরা খুব দেখিয়াছি, তিনি ৫টার সময় কমিটিতে আসিতেন, ৭৷৷০/৮টা পর্যন্ত কমিটির কাজ করিতেন, একটুমাত্র বিরক্ত হইতেন না। যদিও বিরক্ত হইবার যথেষ্ট কারণ থাকিত, অন্যান্য মেম্বররা বিরক্ত বা ক্লান্ত হইয়া উঠিয়া যাইতেন, গুরুদাসবাবু যাইতেন না। আরো এক কথা বলিয়া রাখি, অন্য জাতির মেম্বররা উঠিয়া যাইতেন, ব্রাহ্মণরা যাইতেন না, সারদাবাবু বলিতেন, ব্রাহ্মণদের উপোস করার ধাত, আপনারা থাকতে পারেন, আপনারা থাকুন, আমি চললুম। Central Text Book কমিটিতে একখানি বই পাস হইলে সেই গ্রন্থকারের কতকটা অন্নসংস্থান হইত এবং অনেকের তাহাতেই চলিত, সুতরাং অনেকেরই মত ছিল, বইখানা নিতান্ত খারাপ না হইলে কমিটির বই পাস করা উচিত। একজনের সে ভাব ছিল না। তিনি বলিতেন, যখন ছেলেদের শিক্ষা দিতে হইবে, তখন ভুল জিনিস তাহাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়, মন্দ জিনিস শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। তিনি অত্যন্ত কড়া করিয়া বই পরীক্ষা করিতেন। তিনি আরো বলিতেন, যাহার বই পড়াইবে, তাহার খুব একটা নাম-সম্মান থাকা চাই, 'গ্যারাণ্টি অব এ নেম' চাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় বই লিখিয়াছিলেন, তিনি দেশের গুরু হইবার উপযুক্ত, তাঁহার বই খুব চলিয়াছিল, তাই বলিয়া ধাপধাড়া গোপীনাথপুরের মধ্য-বাংলা স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিত পৈতৃক ব্রহ্মোত্তর বন্ধক দিয়া একখানি বই ছাপাইয়াছে, সেখানি যে চালাইতে হইবে, ইহার মানে কী? নির্ভুল ও নির্দোষ সে বই তো হইতেই পারে না। কারণ, সে পণ্ডিতের লেখাপড়ার দৌড় কতটুকু। এই নিয়ে Central Text Book কমিটিতে অনেক ঝগড়াবিবাদ হইত। গুরুদাসবাবু অনেক সময় অপক্ষপাত বিচার করিতেন, অনেক সময় দয়াপরবশ হইয়া

বই পাস করিয়া দিতেন। গুরুদাসবাবু অনেক বই পড়িতেন, কিন্তু বলিতে-কি, ঐ এক ব্যক্তি ছাড়া আর-কেহ ভালো করিয়া বই পড়িতেন না, উপরোধ অনুরোধ ইত্যাদি নানা কারণে বই পাস করিবার চেষ্টা করিতেন। ৫/৬ বৎসর Text Book কমিটির প্রেসিডেন্টগিরি করার পর লর্ড কার্জনের গভর্নমেন্ট বলিলেন, এ কমিটিগুলি official হওয়া উচিত, অর্থাৎ Director সাহেব ইহার প্রেসিডেন্ট হওয়া উচিত। গুরুদাসবাবু Presidentship resign করিলেন। তাহার পর হইতেই Director সাহেব প্রেসিডেন্ট। পূর্বে প্রায় কলিকাতা ইউনিভার্সিটির fellowরাই Text Book কমিটির মেম্বর হইতেন। ডাইরেক্টর ক্রফ্‌ট[৪] অনেক সময় গর্ব করিয়া বলিতেন, বাংলার Text Book কমিটির মতো সম্ভ্রান্ত কমিটি খুব কম আছে। তাহার পর non-official Chairman থাকিত। সে কমিটির একটা মর্যাদা, একটা মান ছিল, এখন ওটা শিক্ষা-বিভাগের ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে।

বহরমপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া হাইকোর্টে ওকালতি করার ২/৩ বৎসর পরেই গুরুদাস কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হয়েন [১৮৭৯ খৃ.]। ফেলো হইয়া অবধি তিনি যথানির্দিষ্ট সময়ে সেনেটের সমস্ত মিটিঙে উপস্থিত হইতেন এবং মিটিঙের কার্যে সহায়তা করিতেন। অল্পদিনের মধ্যে এ বৎসর এ কমিটির, পর বৎসর আর-এক কমিটির, তৎপরবৎসর অন্য কমিটির মেম্বর হইয়া সিণ্ডিকেটের মেম্বর হয়েন। সিণ্ডিকেটের মেম্বর হইয়া তিনি তাঁহার কাজ খুব মনোযোগ দিয়া করিতেন। তখন খুব বড়ো বড়ো লোকই সিণ্ডিকেটের মেম্বর হইতেন, যথা— জস্টিস্ চন্দ্রমাধব ঘোষ, [১৮৩৮-১৯২৮ খৃ.], ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জি [উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৪৪-১৯০৬ খৃ.], হেন্‌রি কটন [Sir Henry John Stedman Cotton, ১৮৪৫-১৯১৫ খৃ.]। তাঁহারা বড়ো বড়ো কথার খুব বিচার করিতেন। তাঁহাদের এইরূপ বাদানুবাদ প্রায়ই হইত। সিণ্ডিকেটের যা নিত্যকর্ম, তাহার ভার রেজিস্ট্রারের উপরই ছিল। রেজিস্ট্রার যাহা করিতেন, তাঁহারা তাহাই মঞ্জুর করিয়া দিতেন। গুরুদাসবাবু সিণ্ডিকেটে গেলে রেজিস্ট্রার অনেক সময় তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য করিতেন। সুতরাং ক্রমে সিণ্ডিকেটে গুরুদাসবাবুর বেশ প্রতিপত্তি হইল। ১৮৮৯

খৃস্টাব্দে স্যার আশুতোষ [মুখোপাধ্যায়, ১৮৬৪-১৯২৪ খৃ.] ফেলো হইয়াই সিণ্ডিকেটে প্রবেশ করেন এবং সিণ্ডিকেটের অনেক কাজ তিনি করিতে থাকেন। পরীক্ষক নিয়োগ করা, লোকজন নিয়োগ করা, বই ধরানো, examination moderate করা— এগুলি আস্তে আস্তে ৮/১০ বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে স্যার আশুতোষের হাতে পড়িয়া গেল। ১৮৯০ খৃস্টাব্দে স্যার গুরুদাস বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার হয়েন। এই উচ্চপদে বাঙালির নিয়োগ এই সর্বপ্রথম, সুতরাং দেশে একটা খুব শোরগোল পড়িয়া গেল। গুরুদাসবাবু প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলার হইয়াছেন এবং লাট 'সাহেবের' পাশে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিয়াছেন! সেকালে লাটসাহেবের পাশে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করা একটা মস্ত গৌরবের বিষয় ছিল। গুরুদাসবাবু ৩ বৎসর কাল এই কার্য করিয়াছিলেন, প্রথম নিয়োগ হয় ২ বৎসরের জন্য, ২ বৎসর চলিয়া গেলে তাঁহাকে আবার ২ বৎসরের জন্য নিয়োগ করা হয়, কিন্তু তৃতীয় বৎসরের শেষে তিনি পদত্যাগ করেন। গভর্নমেন্টের সঙ্গে কোনোরূপ মনোমালিন্য ইহার কারণ নহে, কেননা, গভর্নমেণ্ট হইতে তাঁহাকে পুনঃপুনঃ পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিতে বলা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে কোনো কেলেঙ্কারিতে তিনি পদত্যাগ করেন। ইউনিভার্সিটিতে কোনো কালেই কেলেঙ্কারির অভাব নাই। কিন্তু সে যে কী, তিনি কাহাকেও বলেন নাই। লোক তাহাই সন্দেহ করে, উহাই তাঁহার পদত্যাগের কারণ।

স্যার গুরুদাসের ইউনিভার্সিটির ক্রিয়াকলাপের কথা সিণ্ডিকেটের মিনিটে যথেষ্ট আছে, আমাদের এখানে সে-সকল কথা তোলা পুনরুক্তিমাত্র। তিনি বিচারাসনে বসিয়া যেরূপ দক্ষতার সহিত কার্য করিয়াছেন, তাহাও সকলের সুবিদিত। তিনি অপক্ষপাত বিচার করিতে খুব চেষ্টা করিতেন, সে বিষয়ে কাহারো সন্দেহ নাই এবং মোকর্দমাটা তলাইয়া বুঝিবারও খুব চেষ্টা করিতেন। তবে 'মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ'। তাঁহার কোনো কোনো রায় প্রিভি কাউন্সিল হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে এবং ২/৪টা নজির পরের নজিরে নাকচ হইয়াছে। কাজকর্ম করিতে গেলেই এইরূপ হইয়া থাকে।

'সাহেবদের' সঙ্গে ব্যবহারে স্যার গুরুদাস অনেক সময় খুব সাহসের

পরিচয় দিয়াছেন। প্রথম স্বদেশী আন্দোলনের সময় স্যার গুরুদাসও গভর্নমেণ্টের বিষ-নজরে পড়িয়াছিলেন।[৫] সেই সময়কার গভর্নমেণ্টের চিফ সেক্রেটারি তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান এবং একটু অশিষ্ট আচরণ করেন। তাহাতে গুরুদাসবাবু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আপনি যেমন গভর্নমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, আমিও তেমন His Majesty's জজেদের মধ্যে একজন। আমি আপনার নিকট হইতে এরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করি নাই। এবং আপনি ডাকিয়া পাঠাইলে আমি আর আসিব না।"

কোনো মিটিঙে ডাকিলে গুরুদাসবাবু নিশ্চয়ই সেখানে যাইতে অন্যথা করিতেন না। মহাকালী পাঠশালার প্রাইজ বিতরণে প্রতিবারেই যাইতেন। নারিকেলডাঙার স্কুলটিকে তিনি খুব ভালোবাসিতেন। প্রথম শ্রেণীর ছেলেদিগকে তিনি ২/৩ ঘণ্টা করিয়া পড়াইতেন। প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশানের সমস্ত ব্যবস্থা নিজে করিতেন এবং নিজে উপস্থিত থাকিতেন, ভাইস-চ্যান্সেলারের পদ ত্যাগ করার পর তিনি আর-কখনো সিণ্ডিকেটের মেম্বর হয়েন নাই। কেহ জিদ করিলে বলিতেন, একবার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব করিয়া আসিয়া আর সেখানে যাওয়া ঠিক নয়। 'সাহেবরা' কেহ এমন যায় না ; আমারও যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু প্রত্যেক সেনেটের মিটিঙে যাইতেন, সব বোর্ডের মিটিঙে যাইতেন, ফ্যাকাল্‌টির মিটিঙে যাইতেন, সাহিত্য-পরিষদের অনেক মিটিঙে যাইতেন, আর সাধারণে যে-সকল সভা-সমিতিতে ডাকিত, তাহাতেও যাইতেন। তবে পেন্‌সান লওয়ার পর হইতে তিনি কোনো সভা-সমিতিতে আর সভাপতিত্ব করিতে রাজি হইতেন না, এমন-কি, স্কুলের পারিতোষিক দানেও সভাপতিত্ব করিতেন না। অনেকে আছেন সভাপতি না হইলে সভায় যাইতে চাহেন না, স্যার গুরুদাসের কিন্তু তাহা ছিল না, তিনি এমনই যাইতেন। একবার জানি, প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে গড়পারে কোনো ভদ্রলোকের বাড়িতে ছেলেদের এক সভা হয়। তর্ক হয় জাতির উৎপত্তি লইয়া, সেখানে গুরুদাসবাবু বেশ উৎসাহের সহিত সভার কার্যে সহায়তা করিয়াছিলেন।

কেহ কোনো বই পাঠাইলে গুরুদাসবাবু স্বহস্তে তাহাকে লিখিতেন —"আপনার প্রদত্ত উপহার আমি সাদরে গ্রহণ করিলাম" এবং ২/৪টি

কথা বলিয়া তাহাকে উৎসাহ দিতেন। তিনি সকল প্রকার সভা-সমিতিতে যাইতেন বলিয়া 'বঙ্গবাসী'[৬] তাঁহাকে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিল, "গুরুদাসবাবু আলু তরকারি, ঝোলেও চলেন, ঝালেও চলেন, চর্চড়িতেও চলেন।" বঙ্গবাসীর ব্যঙ্গ করাটা ভালো হয় নাই, তাঁহার মতো পদস্থ পণ্ডিত ব্যক্তির সভায় গেলে যে আনন্দ ও উৎসাহ হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই. সেটা তাঁহার একটা প্রধান গুণ বলিয়া আমরা মনে করি।

স্যার গুরুদাস যখন ইউনিভার্সিটি কমিশনের মেম্বর ছিলেন [১৯০২ খৃ.], তখন তিনি একাই সকলের রিপোর্টের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। শিক্ষিত দরিদ্র সম্প্রদায়ের জন্য তিনি বেশি পরিমাণে ওকালতি করেন, কিন্তু গভর্নমেণ্ট তাঁহার কথা খুব আগ্রহের সহিত শুনিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কার্যে সেরূপ কিছুই করেন নাই। তাঁহার সেবারকার 'ডিসেণ্ট' পড়িয়া ভারতবর্ষের লোক বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল।[৭]

গুরুদাসবাবু উকিল অবস্থায় এবং জজ অবস্থায় অনেক দরিদ্র ছাত্রের স্কুলের ফি দিতেন. তাহাতে তাঁহার বেশ দু পয়সা খরচ হইত। স্বদেশী আন্দোলনের সময় অত্যাচারপীড়িত যুবকদের তিনি অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু পেন্‌সন লওয়ার পর তাঁহাকে বাধ্য হইয়া হাত কিছু খাটো করিতে হইয়াছিল।

গুরুদাসবাবু যদিও 'সাহেবদের' সঙ্গে অনেক ঝগড়া করিয়াছেন, তাই বলিয়া তাঁহার রাজভক্তি যে কিছু কম ছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। কারণ, জর্মান যুদ্ধে ইংরাজের মঙ্গলকামনা করিয়া কালীঘাটে যে প্রকাণ্ড যজ্ঞের আয়োজন করা হয়, তাহাতে স্যার গুরুদাস খুব আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন এবং যত দিন যুদ্ধ ছিল, প্রতি সপ্তাহে কালীঘাটে পূজা দিয়াছেন শুনা যায়।

ছেলেদের জন্য বাপের যা-কিছু করা উচিত, গুরুদাসবাবু তাঁহার ছেলেদের জন্য সে-সব করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাহাদের লেখাপড়া দেখিতেন এবং পড়াইতেন, ভালো ঘরে সকলের বিবাহ দিয়াছেন, সকলেরই একটি একটি স্বতন্ত্র বাড়ি করিয়া দিয়াছেন এবং বিষয় আশয় যা ছিল. নিজে থাকিতেই ছেলেদের ভাগ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে যত দিন ছিলেন, ছেলেদিগকে নিজের বাড়িতে একান্নভুক্ত রাখিয়াছিলেন, তাহার পর কী হইয়াছে জানি না।

পূর্বেই বলিয়াছি, স্যার গুরুদাসের গাছপালা এবং বাগান করার খুব শখ ছিল। তিনি কাঁচড়াপাড়ার স্টেশন হইতে কিছু দূরে বাঘের খালের উপর এক লপ্তে ৭০ বিঘা জমি লইয়া চাষবাস আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার তৃতীয় পুত্র উপেনবাবু প্রথম প্রথম প্রতি রবিবারেই সেখানে যাইতেন ও সমস্ত দিন থাকিতেন, অনেক পয়সা খরচ করিয়া কাঁটা তার দিয়া সমস্ত জমি ঘেরাইয়াছিলেন এবং ইউরোপীয় প্রণালীতে চাষবাসের উদ্যোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু ২/৩ বৎসরের পর তিনি সে সমস্ত জায়গা-জমি এক সিণ্ডিকেটের হস্তে সমর্পণ করেন, কতকগুলি যুবক তাঁহার স্বত্বে স্বত্ববান্ হইয়া সেখানে কিছু দিন চাষবাস করে। কাঁচড়াপাড়া অনেক দূর, নিজে দেখিতে পারেন না বলিয়া সেখানকার চাষবাস হইল না, গুরুদাসবাবুর ইহা ধারণা হইয়াছিল, তাই তিনি আবার বিড়িতি স্টেশন হইতে কিছু দূরে ২০ বিঘা জমি লইয়া বাগান করিতে আরম্ভ করেন। বিড়িতি কলিকাতা হইতে ৭/৮ মাইল, তিনি নিজেই সেখানে যাইতেন, জমি লইতে তাঁহাকে বেশ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কারণ, বাংলার জমির প্রত্যেক ইঞ্চি জমিতেই নানা রকম স্বত্ব আছে ও নানা রকম বিবাদের বীজ আছে, তিনি সে বাগানটির ভার শেষ এক নাতির উপর দেন। বাগান হইতে টাট্‌কা তরকারি পাইলেই গুরুদাসবাবু খুব খুশি হইতেন, সুতরাং তাঁহাকে খুশি করিতে তাঁহার নাতির বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই।

প্রথমেই বলিয়াছি, গুরুদাস যে সময় জন্মগ্রহণ করেন, সেটা বিষম দোটানার সময়। গুরুদাসবাবুর টান হিন্দুয়ানির দিকে বেশি ছিল এবং তিনি মোটামুটি হিন্দুয়ানি ভাবে কাটাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার জীবনের শেষ কালে দেশে হিন্দুয়ানির দিকের টানটা খুব কমিয়া গিয়াছিল। তথাপি গুরুদাসবাবু নিষ্ঠাবান্ হিন্দুদিগের আদর্শস্বরূপ ছিলেন ; এই ঘোর বিপ্লবের সময় সমুদ্রের বাতি-ঘরের ন্যায় তাঁহাকে দেখিয়াই হিন্দুরা দিগ্‌নির্ণয় করিয়া লইত, তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিত। তিনি কিন্তু বোধ হয় যেন একটু টলিয়াছিলেন। তাঁহার আচার-ব্যবহারে তিনি যেরূপ বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন, বক্তৃতায় সকল সময় তাহা রাখিতে পারিতেন না, সময় সময় বলিয়া ফেলিতেন, জাতি জিনিসটা না থাকিলেই ভালো হইত। বোধ

হয় যেন কতকটা ইংরাজি স্রোতে তিনি গা ভাসান দিয়াছিলেন। ১৮৫৬ খৃস্টাব্দে যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রথম বিধবা-বিবাহ করেন, তখন তাঁহার বাড়িতে একটা বিদায় আসে, সে বিদায় তাঁহার মা গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না জানা যায় না, বোধ হয় করেন নাই। আশুবাবু যখন আপনার বিধবা কন্যায় বিবাহ দেন, তখনো গুরুদাসবাবু বিধবা-বিবাহের ঘোর বিরোধী ছিলেন। আশুবাবু একদিন নিজে আসিয়াছিলেন, একদিন ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার ত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮৯৮ খৃ. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার] মহাশয় আসিয়াছিলেন, তখন গুরুদাসবাবু বলিয়াছিলেন—ছেলেদের তো হিন্দুয়ানি গেছে, মেয়েদের মধ্যে কড়াকড়ি আছে, সে বন্ধন শিথিল হইতে দিলে হিন্দুয়ানি ডুবিয়া যাইবে। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব-বৎসর জগদ্ধাত্রী পূজায় তিনি আশুবাবুকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্বে ছেলেদের বলিয়া গিয়াছিলেন—আমার শ্রাদ্ধে তোমরা যদি আশুবাবুকে পরিতোষপূর্বক খাওয়াইতে না পার, তবে আমার আত্মার পরিতৃপ্তি হইবে না। ইহাতে আমরা স্যার গুরুদাসের দোষ দিই না। কারণ, তিনি যেরূপ ভীষণ দোটানায় সারা জীবন যুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং যেভাবে হিন্দুয়ানি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম-রূপে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে পূজা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

আহারে গুরুদাসবাবু অতি মিতাচারী ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল বাঁচিয়াছিলেন, এবং তাঁহার কোনো ইন্দ্রিয় শিথিল হয় নাই, এজন্য অনেকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত, আপনি কী খাইয়া থাকেন। তিনি বলিতেন, হিন্দুয়ানিতে যে-সব জিনিসের বিধি আছে, আমি সে-সব জিনিসই খাই, কিন্তু খুব অল্প পরিমাণে। সে কত অল্প, অন্য লোকের ধারণা হয় না। একবার জানি, তিনি চারটি করিয়া আঙুর খাইয়া ৪ দিন জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। তখন তিনি খুব বৃদ্ধ হয়েন নাই, তখনো তিনি জজিয়তি করেন। মাছ-মাংসে তাঁহার আপত্তি ছিল না, কিন্তু বৃথা মাংস খাইতেন না, কালীঘাটের মাংস পাইলে আপত্তি ছিল না, কিন্তু খাইতেন অতি অল্প। খাওয়ার বাঁধাবাঁধি থাকাতেই যে তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অনেক বয়স পর্যন্ত তিনি সপ্তাহে একদিন হাঁটিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেন, তাঁহার বাড়ি হইতে গঙ্গা প্রায় ৪ মাইল তফাত। সেজন্য বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত তিনি গঙ্গাতীরে ছোট্ট একটি বাড়ি করিয়াছিলেন এবং গঙ্গাতীরের উপর সে বাড়িতেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়। শেষ পর্যন্ত হিন্দুয়ানিতে তাঁহার খুব বিশ্বাস ছিল। হিন্দুদের সংস্কার, গঙ্গাযাত্রা করিয়া সে রোগী যদি বাড়ি ফিরিয়া আসে, সে বাড়ির অমঙ্গল হয়। প্রত্যেক গ্রামেই লোক এইরূপ ২/১টি বাড়ি দেখাইয়া দেয় এবং বলে, ইহার পিতামহী গঙ্গাযাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, সেজন্য ইহারা উচ্ছন্ন গিয়াছে। সেজন্য গুরুদাসবাবু গঙ্গাযাত্রা করেন নাই, বাগবাজারের বাড়িতে গিয়াছিলেন। সে বাড়িতে তাঁহার নিকট সর্বদাই গীতা, চণ্ডী, ভাগবত পাঠ হইত। কেহ গেলে গুরুদাস তাঁহার সহিত বেশ গল্প-গুজব করিতেন। শুনিয়াছি, তিনি মৃত্যুর দিন পেন্‌সনের বিলখানি সই করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন।

'মাসিক বসুমতী'
অগ্রহায়ণ ও পৌষ, ১৩৩৩ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম কলকাতায়, ২৬ জানুয়ারি ১৮৪৪ খৃ.। বাবা রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মা সোনামণি দেবী।

শিক্ষা : এন্ট্রান্স ১৮৬০ খৃ.। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ.এ. ১৮৬২ খৃ., বি. এ. ১৮৬৪ খৃ., এম. এ. ১৮৬৫ খৃ.। বি. এল. ১৮৬৬ খৃ.। এফ. এ. থেকে বি. এল. পর্যন্ত সব পরীক্ষায় প্রথম হন। ডক্টর-অফ-ল ১৮৭৭ খৃ.।

শিক্ষকতা : প্রেসিডেন্সি কলেজ ১৮৬৪, ১৮৬৫ খৃ.; জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইন্সটিটিউশন জানুয়ারি—মে ১৮৬৬ খৃ.; বহরমপুর কলেজ ১৮৬৬-৭২ খৃ.; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ল-লেকচারার ১৮৭৮ খৃ.।

১৮৮৮-১৯০৪ খৃ. পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। ২ জানুয়ারি ১৮৯০ খৃ. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনিই প্রথম ভারতীয় উপাচার্য। ১৯০৪ খৃ. স্যার উপাধি পান।

মৃত্যু ২ ডিসেম্বর ১৯১৮ খৃ.

রচনাবলী : 'শিক্ষা' (১৯০৭ খৃ.) , 'জ্ঞান ও কর্ম্ম' (১৯১০ খৃ.), *A Note on the Devanagari Alphabet for Bengali Students* (১৮৯৩ খৃ.), *A Few Thoughts on Education* (১৯০৪ খৃ.), *The Education Problem in India* (১৯১৪ খৃ.), *Hindu Law of Marriage and Stridhan* (১৮৭৯ খৃ.) ; দ্র. Anathnath Basu ed., *Sir Gooroodass Centenary Commemoration Volume*, University of Calcutta 1948 ; Upendrachandra Banerjee ed. *Reminiscences, Speeches and Writings of Sir Gooroodass Banerjee*, Calcutta 1927.

১. James C. Sutcliffe দর্শন ও সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অধ্যাপকরূপে হিন্দু কলেজে যোগ দেন ১৮৪৭, অধ্যক্ষ এপ্রিল ১৮৫২-'৫৫ ;

প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ জুন ১৮৫৫-৭৫ ; ডিরেক্টর অব পাব্‌লিক ইন্‌স্‌ট্রাকশন ১৮৭৬ ; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ১৮৬৪-৬৫, ১৮৭৩,, ১৮৭৫, ১৮৭৬ ।

২. ১৮৯১ এবং ১৮৯২-এর সমাবর্তন ভাষণের প্রাসঙ্গিক অংশ—

"I also deem it not merely desirable, but necessary, that we should encourage the study of those Indian vernaculars that have a literature, by making them compulsory subjects of our examinations in conjunction with their kindred classical languages. The Bengali language has now a rich literature that is well worthy of study, and Urdu and Hindi are also progressing fairly in the same direction. In laying stress upon the importance of the study of our vernaculars, I am not led by any mere patriotic sentiment, excusable as such sentiment may be, but I am influenced by more substantial reasons. I firmly believe that we cannot have any thorough and extensive culture as a nation, unless knowledge is disseminated through our own vernaculars.... The darkness of the Middle Ages of Europe was not completely dispelled until the light of knowledge shone through the medium of the numerous modern languages. So in India, notwithstanding the benign radiance of knowledge that has shone on the higher levels of our Society through one of the clearest media that exhist, the dark depths of ignorance all round will never be illumined until the light of knowledge reaches the masses through the medium of their own vernaculars. (১৮৯১-এর ভাষণ, ১৬ অনুচ্ছেদ)।

"One great reason why our University education fails to awaken much original thinking, is because it

is imparted through the medium of a difficult foreign language, the genius of which is so widely different from that of our own. The acquisition of such a language must to a great extent be the work of imitation; and the habit of imitation gradually becomes so deep-rooted as to influence our intellectual operations generally. Again, the costly foreign drapery in which our students have to clothe their thoughts, taxes their limited mental resources to an extent which does not leave enough for the proper feeding and fostering of thought. The only way out of the difficulty is for the student to economise his means and to forego all desire for finery in language, and concentrate his efforts to the cultivation of the thinking faculty, and he may rest assured that noble thoughts never fail to command attention, though clad in plain and homely garb." (১৮৯২-এর ভাষণ, ৪০ অনুচ্ছেদ)।

গুরুদাসের উক্তির ইঙ্গিত অনুসরণ করে তরুণ সেনেট-সদস্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১ মার্চ ১৮৯১ আর্টস ফ্যাকাল্টির কাছে এফ. এ., বি. এ., এম. এ. পরীক্ষায় বাংলা-হিন্দি-উর্দু অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। ১১ জুলাইয়ের সভায় ১৭/১১ ভোটে এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে যায়।

দ্র. Minutes of the Faculty of Arts For the year 1891-92, C. U.

২৩ নভেম্বর ১৮৯৫ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ থেকে সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্ত এফ. এ. ও বি. এ.-তে ঐচ্ছিক বিষয়রূপে মাতৃভাষা পড়ানোর এবং এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় মাতৃভাষায় উত্তর লেখার সুযোগ দেবার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি প্রস্তাব পাঠান। এই উদ্যোগ সম্পর্কে পরিষদের কার্য-বিবরণীর উল্লেখ—

"পরিষদের চতুর্থ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম. এ., বি. এল. ও শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর পরীক্ষায় বাঙ্গালা প্রচলনের উদ্যোগার্থ দুইটি প্রস্তাব করেন। প্রথম প্রস্তাবটির উদ্দেশ্য, প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত সাহিত্য ব্যতীত ভূগোল ও গণিতাদি বিষয় বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দেওয়া

হউক। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্তের প্রস্তাবটির উদ্দেশ্য, এল. এ. ও বি. এ. পরীক্ষায় সংস্কৃত ভাষালোচনার সহিত বাঙ্গালা ভাষালোচনারও ব্যবস্থা থাকুক। পরিষদ এই বিষয় আলোচনার ভার মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ., ডি. এল. এল., শ্রীযুক্ত নন্দকৃষ্ণ বসু এম. এ., সি. এস., শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম. এ., বি. এল. এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পাঁচ জনের প্রতি অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা অনুকূল ও প্রতিকূল পক্ষ আলোচনা করিয়া কি উপায়ে প্রস্তাব দুইটি কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, তাহা নির্দ্দেশ করিলে পরিষদ এই বিষয়ে যথাকর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আনন্দের বিষয় যে, তাঁহারা প্রস্তাব দুইটি সম্বন্ধে ইতিমধ্যে দেশের সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের মতামত সংগ্রহ করিয়াছেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই কার্য্যে যেরূপ উৎসাহ ও অনুরাগ দেখাইতেছেন, তন্নিমিত্ত পরিষদ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ না হইয়া থাকিতে পারেন না। ফলতঃ তিনি পরিষদকে যেরূপ অনুরাগচক্ষে দেখিয়া থাকেন, ইহার উন্নতির জন্য যেরূপ যত্ন প্রকাশ করেন, তজ্জন্য পরিষদ তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন। (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম বার্ষিক বিবরণী, ১৩০২ ব., পৃ. ৪-৫)।

২৩ নভেম্বর ১৮৯৫ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ থেকে সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্ত এফ. এ. ও বি. এ.-তে ঐচ্ছিক বিষয়রূপে মাতৃভাষা পড়ানোর এবং এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় মাতৃভাষায় উত্তর লেখার সুযোগ দেবার জন্য অনুরোধ জানান। গুরুদাসের উদ্যোগে আর্টস ফ্যাকাল্টির ২৮ মার্চ ১৮৯৬ তারিখের সভায় প্রথম প্রস্তাবটি ২২/২১ ভোটে অনুমোদিত হয় কিন্তু দ্বিতীয় প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে যায়।

৩. জগদ্বন্ধু ভদ্র (১৮৪২-১৯০৬ খৃ.) রচিত ছুছুন্দরীবধ কাব্য (প্রথম সর্গ) ৭২ ছত্রের কবিতা— মেঘনাদবধ কাব্যের প্যারডি— প্রকাশিত হয় অমৃতবাজার পত্রিকায় ১২ আশ্বিন ১২৭৫ ব.।

৪. Sir Alfred Woodley Croft (১৮৪১-১৯২৫ খৃ.)। প্রেসিডেন্সি কলেজে দর্শনের অধ্যাপক ১৮৬৬-৭৮, অস্থায়ী অধ্যক্ষ ১৮৭৬-৭৭ : ডাইরেক্টর অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাক্‌শন ১৮৭৮-৯৭ ; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস ফ্যাকাল্টির ডীন ১৮৭৮-৮১, ১৮৮২-৮৫, ১৮৮৬-৯২ এবং উপাচার্য ১৮৯৩-৯৬। এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ১৮৯১-৯২।

৫. বিচারপতি পদাধিকারীর রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্রব রাখা উচিত

নয়, এই মত পোষণ করা সত্ত্বেও গুরুদাস বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন। কার্জনের বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা কার্যকর হয় ১৬ অক্টোবর ১৯০৫ খৃ.। এই দিন 'ফেডারেশন হল'-এর ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠানে তিনি বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ করেন। স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান অঙ্গ জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদ সংগঠনে প্রথম থেকে যুক্ত ছিলেন। ১৫ আগস্ট ১৯০৬ টাউন হলে রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পরিষদের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন।

৬. যোগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা। প্রথম প্রকাশ ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৮৮ ব., ১০ ডিসেম্বর ১৮৮১ খৃ.।

৭. সভাপতিসহ সাত জন সদস্যের মধ্যে Indian Universities Commission (1902)-এর পাঁচ জন সদস্যই ছিলেন ইউরোপীয়। মূল রিপোর্টে যে-সব সুপারিশ করা হয় তার উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ পরিচালনায় ইউরোপীয় আধিপত্য বাড়ানো এবং শিক্ষার সুযোগ সংকোচন। গুরুদাস দীর্ঘ Note of dissent-এ মূল রিপোর্টের সুপারিশগুলির বিরোধিতা করেন। তাঁর প্রতিবেদন শেষ করেন এই মন্তব্যে—

"...My learned colleagues have aimed exclusively at raising the standard of University education and college discipline, and some of the measures of reform they have advocated for the attainment of that exclusive object, naturally enough, tend to place education under the control of Government and small bodies of experts and to reduce the control of what is known as the popular element, to repress imperfectly equipped colleges and schools, to deter students of average ability and humble means from pursuit of knowledge, and, in short, to sacrifice surface in order to secure height. While yielding to none in my appreciation to the necessity for raising the standard of education and discipline, I have ventured to think that the solution arrived at is only a partial solution of the problem,

and that we should aim not only at raising the height, but also at broadening the base, of our educational fabric. And where I have differed from my learned colleagues, I have done so mainly with a view to see that our educational system is so adjusted that while the gifted few shall receive the highest training, the bulk of the less gifted but earnest seekers after knowledge may have every facility afforded to them for deriving the benefits of high education."

গুরুদাসের এই প্রতিবেদন বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে, ১৯০২-এর আগস্ট মাসে কলকাতার টাউন হলে এক সভায় তাঁকে অভিনন্দন জানানো হয়। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্টের প্রতিবাদের জন্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের (১৮৬৫-১৯৪৮ খৃ.) সম্পাদকতায় গঠিত ডন সোসাইটির (১৯০২ খৃ.) সভাপতি পদে বৃত হন।

দেশের মানুষের দৃষ্টিতে এই সময়ে গুরুদাসের মর্যাদার আভাস পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যে, "যিনি একদিকে আচার ও নিষ্ঠাদ্বারা হিন্দুসমাজের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন, অপর দিকে আধুনিক বিদ্যালয়ের শিক্ষায় যিনি মহৎ গৌরবের অধিকারী ; একদিকে কঠোর দারিদ্র্য যাঁহার অপরিচিত নহে, অন্য দিকে আত্মশক্তির দ্বারা যিনি সমৃদ্ধির মধ্যে উত্তীর্ণ ; যাঁহাকে দেশের লোকে যেমন সম্মান করে, বিদেশী রাজপুরুষেরা তেমনি শ্রদ্ধা করিয়া থাকে ; যিনি কর্তৃপক্ষের বিশ্বাসভাজন, অথচ যিনি আত্মমতের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করেন নাই ; নিরপেক্ষ ন্যায়বিচার যাঁহার প্রকৃতিগত ও অভ্যাসগত ; নানা বিরোধী পক্ষের বিরোধসমন্বয় যাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক ; যিনি সুযোগ্যতার সহিত রাজার ও প্রকৃতিসাধারণের সম্মাননীয় কর্মভার সমাধা করিয়া বিচিত্র অভিজ্ঞতার দ্বারা ঐশ্বর্যবান্ অক্ষুব্ধ অবসর লাভ করিয়াছেন— সেই স্বদেশবিদেশের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, সেই ধনসম্পদের মধ্যে অবিচলিত, তপোনিষ্ঠ, ভগবৎপরায়ণ ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম যদি এইখানে আমি উচ্চারণ করি, তবে অনেক পল্লবিত বর্ণনার অপেক্ষাও সহজে আপনারা বুঝিবেন কিরূপ সমাজকে আমি প্রার্থনীয় ও সম্ভবপর জ্ঞান করিতেছি। বুঝিতে পারিবেন, নিজের ব্যক্তিগত সংস্কার, মতামত, আচারবিচার লইয়া আমি লেশমাত্র আপত্তি তুলিতে চাহি না— আমি আমার সমস্ত দেশের অভাব দেশের প্রার্থনা অন্তরের মধ্যে একান্তভাবে উপলব্ধি করিয়া নম্রভাবে নমস্কারের সহিত সমাজের শূন্য রাজভবনে এই দ্বিজোত্তমকে মুক্তকণ্ঠে আহ্বান করিতেছি।" ('স্বদেশী সমাজ', বিশ্বভারতী ১৩(ব., পৃ. ১১৫-১৬)।

ইংরাজি ১৮৭৩/৭৪ খৃস্টাব্দে অধরলাল সেন আমার সহিত প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িয়াছিল। কলিকাতার বেনেটোলায় সে বাস করিত। সাহিত্যে তাহার বেশ অনুরাগ ছিল। আমারই মতো অঙ্কশাস্ত্রে তাহার রুচি ছিল না।

সেকালের ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের অনেকেরই জীবনের উদ্দেশ্য ছিল যে, ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট হইবে, নয় মুন্সেফ হইবে। অধরের ইচ্ছা ছিল, সে ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট হইবে, সেইজন্য সে প্রস্তুত হইয়াছিল এবং তাহার মনোবাঞ্ছাও পূর্ণ হইয়াছিল।

কলেজে অধর সকলেরই সহিত মিশিত। সে বেশ মেধাবী ছেলে

ছিল। ১৮৭৭ খৃস্টাব্দে সে বি. এ পাস করে। বি. এ. পাস করার পর সে ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট হয়।

ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ার পর সে সাহিত্য-চর্চায় মন দিয়াছিল। মাঝে মাঝে সে ইংরাজি ও বাংলাতে বই লিখিত এবং আমাকে পাঠাইয়া দিত। একখানি বইয়ের কথা আমার বেশ স্মরণ আছে। সেখানি ইংরাজিতে লেখা। বইখানির নাম *The Shrines of Sitakund*। অধরের স্মৃতি-স্বরূপে বইখানি এখনো আমার লাইব্রেরিতে আছে। ১৮৮৪ খৃস্টাব্দে এই বইখানি প্রকাশিত হয়।

বাংলাতেও অধর কয়েকখানি কবিতার বই লিখিয়াছিল। তার বইগুলি বেশ সুখ্যাতি পাইয়াছিল। তার একখানি কবিতার বইয়ের নাম—'মেনকা,' এই বই সম্বন্ধে 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে সে সময়ে যে সমালোচনা বাহির হইয়াছিল, তাহা এখানে তুলিয়া দিলাম—

"Babu Adharlal Sen writes in a style that shows evident marks of thought and cultivation. A distinguished graduate of the Calcutta University, he has well and wisely devoted his talents to the improvement of the literature of his own country : and in this field we confidently predict for him a highly successful career. The sentiments breathed in the poems before us are such as befit a gentleman and a scholar— refined and tender ; the language is chaste and well-chosen, and the versification though not always perfect is generally smooth and agreeable. We shall look with interest for further contributions to Bengali literature from the Babu's accomplished pen." [*The Calcutta Review*, Vol. LXII, 1876 P. iv.]

'সুবর্ণবণিক সমাচার'
অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য।

অধরলাল সেন (১৮৫৫-৮৫ খৃ.) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। ১৮৭৯ খৃস্টাব্দে তিনি ডেপুটি কালেক্টর রূপে সরকারি কাজে যোগদান করেন এবং ১৮৮৪ খৃস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো ও 'ফ্যাকাল্টি অব আর্টস'-এর সভ্য নির্বাচিত হন। তাঁর কাব্যগ্রন্থ— 'ললিতা-সুন্দরী' (১৮৭৪), 'মেনকা' (১৮৭৪), 'নলিনী' (১৮৭৭), 'কুসুম-কানন' (১ম ভাগ ১৮৭৭, ২য় ভাগ ১৮৭৮)। অধরলাল চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড থেকে সংগৃহীত তথ্য নিয়ে লেখা প্রবন্ধ 'A short note on the shrines of Sitākund in Chittagong' এশিয়াটিক সোসাইটিতে পাঠ করেন। *The Shrines of Sitakund in the District of Chittagong in Bengal* (১৮৮৪ খৃ.) বইখানি এই প্রবন্ধেরই পুনর্লিখিত রূপ।

১৯০৯ খৃস্টাব্দে আমি যখন ভাট ও চারণদিগের পুঁথি সংগ্রহ করিবার জন্য রাজপুতানায় গিয়াছিলাম, সেই সময় মহামহোপাধ্যায় মহাকবি মুরারদানের[১] সহিত আমার আলাপ হয়। তখন তাঁহার বয়স ৮৫ বৎসর; কিন্তু তাঁহার শরীরে অটুট শক্তি ও সামর্থ্য ছিল। তখন যোধপুরের অনেক বড়োলোকই সাহেবিয়ানা আরম্ভ করিয়াছেন। পুরানী জ্যোৎস্নী তাঁহাদের আর ভালো লাগে না, নয়ী জ্যোৎস্নীতে তাঁহারা ভরপুর হইয়াছিলেন। পুরানো কোনো জিনিসই তাঁহাদের ভালো লাগে না। তাঁহারা হ্যাট ধরিয়াছেন, কোট ধরিয়াছেন, নেকটাই ধরিয়াছেন। হয় বগি গাড়ি, না-হয় মোটর চালান।

মহাকবি মুরারদান কিন্তু পুরানোর উপাসক। তাঁহার লম্বা দাড়িটি সাদায়-পাকায় গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমের মতো হইয়াছে; তিনি সেই দাড়িটি দুই ভাগ করিয়া দুই কানে লাগাইয়া দেন এবং মাথায় রাজপুতানি পাগড়ি দেন। গায়ে চৌবন্দি জামা, পায়ে নাগরা জুতা। তিনি খুব দীর্ঘচ্ছন্দ ছিলেন না, তবে বেঁটেও বলা যায় না। তাঁহার চেহারা বেশ মানানসই ছিল। কোথাও যাইতে হইলে তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেন। হাতে একটা লম্বা বর্শা থাকিত। ঠিক যেন একজন সেকেলে রাজপুত বীর।

তিনি কিন্তু রাজপুত ছিলেন না, তাঁহারা জাতিতে চারণ ছিলেন। ভাট, বাড়োয়ে, মোতিহার [মোতিসার ?] প্রভৃতি জাতি[২] লোকের যশোগান করিয়া ভিক্ষা করিয়া খাইত, লোকে তাহাদিগকে মাঙ্গনিয়া জাত বলিত। চারণও সেইরূপ এক জাতি। চারণেরা আপনাদিগকে দেবাংশ বলিয়া উল্লেখ করে; বলে— পুরাণে যে সিদ্ধচারণদের কথা বলা আছে, আমরা সেই চারণ। তাহারা ভিক্ষা করে বটে, কিন্তু যার তার কাছে ভিক্ষা করে না, কেবল রাজপুতদের কাছেই ভিক্ষা করে। রাজপুতানায় এক বয়েত আছে—

"ঘাট ভাট গড়েরীয়া সবকোইকো হোয়।
চারণ হ্যায় চতুর নর গড়পতিয়োঁকো জোয় ॥"

ময়দা গুলিয়া ডেলা পাকাইয়া তাই আগুনে সেঁকিয়া ঘাঁট বলিয়া এক রকম খাবার তৈয়ারি হয়, সেই ঘাঁট, ভাট ও গাধা সব লোকেরই আছে; কিন্তু চারণেরা অত্যন্ত চতুর, তাই তাহারা কেবল গড়পতির বাড়িতেই যায়। রাজপুতেরা চারণদিগকে বড়ো ভালোবাসেন; উহাদের সঙ্গে খুব মেলামেশা করেন, একত্রে খাওয়াদাওয়া করেন; বলেন— চারণরা না থাকিলে রাজপুতদের আর-কেহ সুপথে রাখিতে পারে না। রাজপুতেরা অসৎপথে গেলে চারণরাই তাহাদের ফিরাইয়া আনিতে পারে। চারণ বন্ধু মরিলে অনেক রাজপুতকে কান্নাকাটি করিতে দেখা গিয়াছে এবং শোনা গিয়াছে। অনেক রাজারাও চারণের মৃত্যুতে গভীর শোকের কবিতা লিখিয়াছেন।

মাঙ্গনিয়া জাতি সকলেই বাল্যকাল হইতে কবিতা লিখিয়া থাকেন। ছেলেবেলা হইতেই কবিতা লেখা তাঁহাদের অভ্যাস হয়। কবিতা

লিখিয়াই তাঁহারা লোকের যশ-কীর্তন করেন, এবং সেই যশ-কীর্তনেই তাঁহাদের জীবিকানির্বাহ হয়। চারণরা রাজপুতদের যশ-কীর্তন করেন। অনেক সময় এক-এক কবিতায় তাঁহারা দুই-দশখানি গ্রাম পান ও লাখপসাও[৩] পান। লাখপসাও শব্দের অর্থ একলক্ষ টাকা দান। এই লক্ষটাকা চেকেও দেওয়া হয় না, মোহরেও দেওয়া হয় না, টাকায় দেওয়া হয় না; হাতি, ঘোড়া, উট, চাল, ডাল, নুন, তেল, সোনা, রুপা, হীরা, জহরৎ, রেশমি, পশমি ও তুলার কাপড় ইত্যাদিতে প্রচুর সামগ্রী দেওয়া হয়। সমুদয়ের দাম একলক্ষ টাকা হইবে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। কাজে কিন্তু ৩০ হইতে ৭০ হাজার অবধি হয়, তাহার বেশি বড়ো একটা হয় না; নাম হয় লাখপসাও। অনেক চারণ নিজ জীবনে ৫/৭ বার লাখপসাও পাইয়াছেন। আবার যদি যশ করিতে করিতে অযশ করিয়া বসেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে হুকুম দেওয়া হয়— ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তুমি আমার দেশ ছাড়িয়া যাইবে।

চারণদিগের এক অধিষ্ঠাত্রী দেবী আছেন। সকল চারণকেই তাঁহার পূজা করিতে হয়। তিনি সরস্বতীরই মূর্তিভেদ বলিয়া মনে হয়। তাঁহার নাম করণী। তাঁহার একটি সুন্দর লাল পাথরের মন্দির আছে— বিকানীর হইতে ১৬ মাইল পূর্বে দেশনোখ নামক রেলওয়ে স্টেশনের কাছে; মন্দিরটি খুব বড়ো নয়, কিন্তু অতি সুন্দর। মন্দিরটির চারি দিকে বড়ো বড়ো ইন্দুর আছে, এইজন্য উহার নাম চুহার মন্দির। মন্দিরটি স্টেশনের খুব কাছে; স্টেশনে গাড়িও ১৫ মিনিট থামে— যাহাতে লোকে চট্‌ করিয়া গিয়া করণী দেবীর পূজা করিয়া আসিতে পারে। চারণরা বছরে একবার অন্তত করণীর মন্দিরে যান ও তাঁহার পূজা দিয়া আসেন। চারণদের নাম দেবতার নামে 'দান' যোগ করিয়া হয়; যেমন মুরারদান, গণেশদান, বাঁকেদান, শামলদান ইত্যাদি ইত্যাদি। চারণেরা লেখাপড়া শিখুক বা না শিখুক, কবিতা করিতে পারেন এবং ভালোই পারেন, চট্‌পট ও মুখেমুখেই করিতে পারেন। এক-একটা কবিতা এক-এক সময় রাজপুতানা ছাইয়া ফেলে, অথচ তাহা লেখা হয় না। এইরূপে অনেক ভালো ভালো কবিতা মারা যায়। ইতিহাসের উপর চারণদের বড়োই ঝোঁক। চারণদের সব কবিতা সংগ্রহ করিতে পারিলে রাজপুতানার একখানি

পুরাদস্তুর ইতিহাস হয়। কিন্তু সংগ্রহ করা বড়োই কঠিন, মুখে মুখে কবিতা অনেক লোপ হইয়া গিয়াছে। সময় সময় দেখিয়াছি, এক-একটা ঘটনার ইতিহাস কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না, দূর-দূরান্তরে অজ পল্লীগ্রামে চারণের মুখের কবিতায় তাহার ইতিহাস পাওয়া গেল।

যোধপুরের এইরূপ এক চারণ-বংশে মুরারদানের জন্ম হয়। তিনি ছেলেবেলা হইতেই কবিতা লিখিতে পারিতেন। চারণরা যে ভাষায় কবিতা লেখেন, তাহার নাম ডিঙ্গল[৪]। ডিঙ্গল মাড়োয়ারের একটি পুরানো ভাষা ; ঐ ভাষায় হাম্বীরনামা নামে একখানি কোষ আছে। সেখানি সকল চারণকেই মুখস্থ করিতে হয়, মুরারদানও মুখস্থ করিয়াছিলেন। রাজপুতানায় অন্যান্য কবি জাতির ন্যায় মুরারদান অন্‌-পড় আদমি ছিলেন না। যশোবন্ত সিংহ মুরারদানকে অনেকগুলি গ্রাম দিয়াছিলেন এবং আরো কয়েকখানি দিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু দেওয়ার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয় ; সুতরাং মুরারদানের আর সেই গ্রাম কয়খানি পাইবার আশা ছিল না। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র কায়েম সিংহ রাজসভায় বসিয়াই "বাবা এখন কোথায় আছেন" এই কথা বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে সভায় মুরারদান উপস্থিত ছিলেন ; তিনি বলিলেন, মহারাজ, দুঃখের কোনো কারণ নাই। তিনি সূর্যবংশের রাজা, সূর্যবংশের রাজাদের সহিত একত্র মিশিয়া গিয়াছেন। সূর্যবংশের রাজারা যশোবন্ত সিংহকে খুব সমারোহে আপনাদের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন। পিতৃসত্যপালন সূর্যবংশের একটা প্রধান গৌরব। দশরথ বলিতেছেন, রাম যেমন পিতৃসত্য পালিয়াছেন, এমন বোধ হয় আর-কেহ পারিবে না। তখন যশোবন্ত সিংহ বলিলেন, আমার ছেলে কায়েম সিংহও ঠিক পিতৃসত্য পালন করিবে, অর্থাৎ আমি মুরারদানকে যে কয়খানি গ্রাম দিব বলিয়াছিলাম, সে তাহা দিয়া দিবে। রাজা কায়েম সিংহ সভার মধ্যে এই কথা শুনিয়া মুরারদানকে গ্রাম কয়খানি না দিয়া থাকিতে পারিলেন না।

যোধপুর-মহারাজার নিযুক্ত যে পরম বিদ্বান্ লোকটি[৫] সর্বদা আমার সঙ্গে থাকিতেন, তিনি যেদিন মুরারদানের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দেন, সেদিন মুরারদান শিরে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "কী সর্বনাশ ! এই-সকল পুথি আমাদেরই লেখা, আমাদেরই করা, কিন্তু

এগুলি কংগ্রহ করা এতদিন পর্যন্ত আমাদের কাহারো খেয়ালে আসে নাই। গবর্নমেণ্টের খেয়ালে আসিয়াছে, আর তাঁহারা বাংলা হইতে এক ব্রাহ্মণকে এখানে পাঠাইয়া দিয়াছেন : আমাদের কাজ করিবার জন্য বাংলা হইতে লোক আনিতে হয়! আমাদের যা ত্রুটি হইবার, তাহা তো হইয়াছে, এখন যদি আপনাকে সর্বান্তঃকরণে সাহায্য করা যায়, তাহা হইলে সে ত্রুটি কতক পূরণ হইবে।" তিনি আমার কাজে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। আমি সময়ে অসময়ে তাঁহার বাড়ি গিয়াছি, সব কাজ ছাড়িয়া তিনি আমার যাহা জিজ্ঞাসার ছিল, তাহা বলিয়া দিয়াছেন।

৮৫ বৎসর বয়সেও তিনি যোধপুর কাউন্সিলের মেম্বর ছিলেন। যথাসময়ে কাউন্সিলে যাইতেন এবং আপনার দপ্তরের কাজ খুঁটিয়া করিতেন। কিন্তু যাইবার সময় সেই ঘোড়ায় চড়িয়া বল্লম হাতে করিয়া যাইতেন।

তিনি আশ্চর্য কবি ছিলেন। আমি তাঁহার কবিতার নমুনা চাহিলে বড়ো বড়ো মোটা মোটা হিন্দি অক্ষরে ছাপা তিনটি কবিতা ও তাহার ইংরাজি তর্জমা আমায় দিয়াছিলেন। আমি এতকাল যক্ষের ধনের ন্যায় সেই তিনটি কবিতা পুতুপুতু করিয়া রাখিয়াছিলাম। এখন জীবনের শেষ মুহূর্তে বাংলার পাঠকবর্গকে উপহার দিয়া যাইতেছি।

যখন মহাকবির বয়স ৩০ কি ৩২, সেই সময় পশ্চিমাঞ্চলে মিউটিনি হয়। রাজপুতানা অঞ্চলে অনেকের সংস্কার যে, মোগল বাদশাহই এই মিউটিনি বাধাইয়াছিলেন। তাই মোগলকে সম্বোধন করিয়া মুরারদান এই কবিতাটি লিখিয়াছিলেন। কবিতাটি ইংরাজ গভর্নমেণ্টের এত ভালো লাগিয়াছিল যে, তাঁহারা লক্ষ লক্ষ কপি ছাপাইয়া সমস্ত রেজিমেণ্টে বিতরণ করিয়াছিলেন—

"তৌঁ লোঁ মদমত্ত ভয়ে কুঞ্জর কলোল করো।
যৌঁ লোঁ বনরাজ গাজ শবদ শুনায়ে না॥
তৌঁ লোঁ দিন দুএক লগ লুভকী লপট চলো।
যৌঁ লোঁ নভ উমড় ঘুমড় ঘন ছায়ে না॥
ভনত মুরার তৌঁ লোঁ হিমকে পহাড় থির।
যৌঁ লোঁ মারতণ্ড চণ্ড কিরণ সতায়ে না॥

তৌ লোঁ দিল হিল মিল মুগল মিজাজ করো।
যোঁ লোঁ চড় জঙ্গ পর ফরঙ্গদল আয়ে না ॥"

হে কুঞ্জর, তুমি মদমত্ত হইয়া ততক্ষণ কল্লোল কর, যতক্ষণ না বনরাজ সিংহের গর্জনশব্দ শুনা যায়।

হে পক্ষী, দু-একদিন আকাশে লাফ-ঝাঁপ দিয়া ওলট-পালট করিয়া বেড়াও, যতক্ষণ না মেঘ, বজ্র ও বৃষ্টিতে আকাশ ছাইয়া না ফেলে।

মুরারদান বলিতেছেন, হিমের পাহাড় ততক্ষণ স্থির— যতক্ষণ মার্তণ্ডের চণ্ডকিরণ তাহার শত্রুতা না করে।

হে মুঘল, ততক্ষণ পর্যন্ত উল্লসিত-হৃদয়ে মেজাজ দেখাও, যতক্ষণ না ফিরিঙ্গির দল যুদ্ধে সজ্জিত হয়।

মহারানী ভিক্টোরিয়ার স্বর্গারোহণের পর সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্য-প্রাপ্তি উপলক্ষে[৬] মহাকবি মুরারদান এই কবিতাটি লিখিয়াছিলেন—

"অতি সুখ পীছে দুখ অতি দুখ পীছে সুখ,
সুন্যো ঔর দেখ্যো দসতূর চল্যো আবতৌ ॥
ভনত মুরার হিন্দ ইংগলিস ভাগ্যবলে,
অতি সুখ পীছে মিল্যো অতি সুখ চাবতৌ ॥
ক্বীন বিকটোরিয়াকে তখত বিরাজ্যো আজ,
ঐডবর্ড সপ্তম সো সবকোঁ সুহাবতৌ ॥
বিশ্বমে' বিখ্যাত চৈত পূনে'্যাকী বিহাত রাত,
আত জে'্যা বসন্ত প্রাত জগ হরসাবতৌ ॥"

অতি সুখের পরে দুঃখ, অতি দুঃখের পর সুখ— এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে, ইহা শুনা যায় ও দেখা যায়। মুরার বলিতেছেন, হিন্দু ও ইংরাজের ভাগ্য ভালো, অতি সুখের পর অতি সুখ উপস্থিত হইয়াছে; যেহেতু, ভিক্টোরিয়ার সিংহাসনে আজ সপ্তম এডওয়ার্ড। তিনি সকলকে সুখী করেন, যেমন বিশ্ববিখ্যাত চৈত্র পূর্ণিমার রাত্রির পর আগত বসন্তের প্রাতঃকাল জগৎকে হর্ষযুক্ত করে।

মহাকবিকে যখন সপ্তম এডওয়ার্ড মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রদান করেন, তদুপলক্ষে এই কবিতাটি লেখা হইয়াছিল—

"বিক্রম ঔ ভোজ সর্ব-সিরোমনি দীনে উন,
নিজ কীর্ত্তি আপ সুনি দান সনমান হৈ ॥

আপকৌ ন কীনৌ ঐ উসৌ জস বসৌ ভারত মে',
মেরী কবিতা কী পুনি অন্যহী জবাঁন হৈ ॥
ভনত মুরার মোকৌঁ লন্দন বিরাজে কীনো,
মহা সে মহান উপাধ্যায় পদবাঁন হৈ ॥
ঐডবর্ড সপ্তম জ, শাহন কে শাহ তোসৌ,
কাব্য রিঝবার ভয়ো হিন্দ নৃপ কাঁন হৈ ॥"

সর্বশিরোমণি বিক্রম এবং ভোজ নিজকীর্তি নিজে শুনিয়া অর্থ এবং সম্মান দান করিতেন। আপনার যশ ভারতে কেহ ঐরূপভাবে প্রকাশ করে নাই। আমার কবিতার ভাষা অন্যরূপ। মুরার বলিতেছেন —লণ্ডনে বিরাজমান (আপনি) কেন আমাকে মহামহোপাধ্যায় পদযুক্ত করিলেন ? হিন্দু কোন্ নৃপ এডওয়ার্ড সপ্তমের মতো কাব্যরসিক হইয়াছেন ?

চারণেরা প্রায়ই অলংকারের বই লেখেন। মুরারদানের ঠাকুরদাদা বাঁকেদান৭ একখানি অলংকারের বই লিখিয়াছিলেন। মুরারদানও সেই দেখাদেখি একখানি অলংকারের বই লেখেন, তাহার নাম 'যশোবন্ত যশোভূষণ'। সেখানি খুব বড়ো বই— ডিঙ্গল ভাষায় লেখা। সেখানি বড়ো বলিয়া মুরারদান সেখানিকে আবার সংক্ষেপ করেন, তাহার নাম 'যশোবন্তভূষণ'। যোধপুরনিবাসী আসোপা দাধীক রামকরণ নামে একজন পণ্ডিতকে দিয়া উহার সংস্কৃত তর্জমা করানো হয়। প্রায়ই দেখা যায়, সংস্কৃত বইয়ের ভাষায় তর্জমা হয় ; কিন্তু এ জায়গায় উল্টা হইয়াছে : বইটা ভাষায় লেখা হইয়াছিল, তর্জমা হইল সংস্কৃতে। যশোবন্ত সিংহের গুণবর্ণনা অনেক উদাহরণে আছে ; এইজন্য উহার নাম হইয়াছে— যশোবন্ত যশোভূষণ অথবা যশোবন্তভূষণ। যখন ডিঙ্গল ভাষায় ঐ বই শেষ হইয়া যায়, তখন যশোবন্ত সিংহ রাজপুতানার সব জায়গা হইতে বড়ো বড়ো পণ্ডিত আনাইয়া সভা করিয়া ঐ গ্রন্থ শোনান। মেওয়ারের সর্দার মনোহর সিংহ এই-সকল পণ্ডিতের মধ্যে একজন ; আর 'বংশভাস্কর' নামক প্রকাণ্ড রাজপুতানার ইতিহাস-লেখক কৃষ্ণসিংহ [সূরজমল ?] আর-একজন। রাজা একদিন এই দুজনকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন— কবিরাজ মহাশয়ের গ্রন্থ এমন হইয়াছে যে, উহার ওজনে যত সোনা হয়, তত সোনা দিয়া তাঁহার প্রতিমা নির্মাণ

করিয়া নিত্যপূজা করা উচিত। রাজার এইরূপ উৎসাহে মুরারদানেরও খুব উৎসাহবৃদ্ধি হইয়াছিল। মহারাজা কিন্তু সংস্কৃত পুথিখানি ছাপা হইল দেখিয়া যাইতে পারেন নাই ; তাহার পূর্বেই তাঁহাকে দেহরক্ষা করিতে হইয়াছিল। ইংরাজি ১৮৯৩ খৃস্টাব্দে এই গ্রন্থ শেষ হয়। গ্রন্থপাঠ হইয়া গেলে যশোবন্ত সিংহ মুরারদানকে লাখপসাও দেন। মুরারদান লিখিতেছেন— সোনার গয়নায় সাজানো একটি বড়ো হাতি দেন, সেই রকম দুটি ঘোড়া দেন, মুক্তার একছড়া হার দেন, মণিময় শিরোভূষণ দেন, দুটি কুণ্ডল দেন, দুগাছি বালা দেন, অনেক রকম কাপড় দেন, যমদ্রংষ্ট্রা এক অতি মূল্যবান্ তলোয়ার দেন, আমার স্ত্রীর জন্য পাঁচ হাজার টাকা ; এবং লক্ষ টাকা যাহাতে পূর্ণ হয়, সেইজন্য বছরে ৬ হাজার টাকা আমদানির কতকগুলি গ্রাম দেন।

আরো নানা উপায়ে নানা কারণে ও নানা সময়ে রাজা যশোবন্ত সিংহ মুরারদানের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি উঁহাকে চামরের বাতাস খাইবার অধিকার দিয়াছিলেন, সোনার মল পরিবার অধিকার দিয়াছিলেন, রাজবাড়ির দারোয়ানের ছড়ি ব্যবহার করিবার অধিকার দিয়াছিলেন। তিনি রাজসভায় আসিবার সময় ও রাজসভা হইতে যাইবার সময় রাজা উঠিয়া দাঁড়াইতেন ; রাজসভায় তাঁহার আসন রাজার খুব নিকটে ছিল ; পত্র লিখিতে হইলে রাজা তাঁহাকে আদর অভ্যর্থনা করিয়া লিখিতেন। মুরারদান বলেন— রাজা তাঁহাকে যতই সম্মান করুন, একটি সম্মান সকলের চেয়ে বড়ো— তিনি প্রণাম করিলে রাজা তাঁহাকে প্রতিপ্রণাম করিতেন।

'মাসিক বসুমতী'
চৈত্র, ১৩৩৮ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

এশিয়াটিক সোসাইটির জন্য ভাট ও চারণ গানের পুঁথি সংগ্রহের দায়িত্ব নিয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তিনবার রাজপুতানা ও গুজরাট পর্যটন করেন। প্রথমবারে ১৯০৯ খৃস্টাব্দের ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত তিনি জয়পুর, যোধপুর ও বরোদায় যান। তাঁর অনুসন্ধানের বিবরণ *Report of a Tour in Western India in Search of Mss. of Bardic Chronicles* এবং *Preliminary Report On The Operation In Search Of Mss. Of Bardic Chronicles* (1913)-এ প্রকাশিত হয়েছিল। এই বিবরণ দুটি থেকে প্রয়োজনীয় অংশ সংকলন করে দেওয়া হল। উদ্ধৃতির উৎস বোঝাতে প্রথম বিবরণের জন্য *R. T. B. C.* এবং দ্বিতীয় বিবরণের জন্য *P. R. B. C.* ব্যবহার হয়েছে।

।

১. "Mahāmahopādhyāya Morārdānji, a member of the Mehakuma Khās of Jodhpore, a Cāraṇa by caste and himself a bard of superior abilities, regarded as one of the foremost men in Jodhpore, was really delighted to find that the Government of India is taking an interest in what he considered as the property of his own caste, and did everything to make the collection of Bardic collection in Marwar a success....

"...A Rājput cannot subsist without a Cāraṇa. The Cāraṇa lives with the Rājput, shares all his weals and woes and by his songs keeps him straight, rouses his spirits in moments of depression, and keeps him in the path of duty. The Rājput gives him land, villages, horses, camels, shawls, ornaments, and so forth. Great chiefs often grant him

Lākh-pasāo, *i.e.* movable and immovable property worth a lac of rupees, sometimes for one song only. Mahāmahopādhyāya Morārdānji received such Lākh-pasāos three times. His grandfather Bāṅkidas was granted Lākh-pasāo twice in his life but was three times expelled [from] the country for songs which too severely criticised the reigning princes' actions. In Marwar alone the Cāraṇs enjoy the revenue of nearly 380 villages with an income of over two lacs of rupees." (*R.T.B.C.*,pp.2,3.)

২. "But the Cāraṇs are not the only people that write verses in Rājputānā. There is a song to the effect that they are clever people and they attach themselves to Rājput alone, while Bhāṭs write songs for all classes of men. The Bhāṭs seem to be the older people than Cāraṇs. They are very jealous of the Cāraṇs. While Cāraṇs say that they keep the Rājput straight, the Bhāṭs say that they lead them astray. The Bhāṭs had very great influence over the Rājputs during the earlier centuries of the Muhammadan rule. Witness the Prithvirājrāsa written by Cānd kavi, who was a Bhāṭ. One of his descendants, Suradās, the contemporary of Akbar, is still regarded as a great poet in Western India. The Bhāṭs say that they are Brahmins, the Chāraṇs claim a divine descent. They think that they were descended from the celestial songsters, Cāraṇs.

"Besides Bhāṭs and Cāraṇs there are Baḍoās, the genealogists, who keep the genealogies of all castes ; they also write songs in honour of their clients. The Dhulies or drummers, who live by beating drums on all ceremonial occasions, also write historic songs." *Ibid.*pp. 3-4.

P. R. B. C.-র Appendix I-এ চারণ, ডাঢ ঢুলি, সেবক, মোতিসার, ব্রাহ্মণ ও ভাট এই সাতটি কবি-জাতির বিস্তৃত বিবরণ আছে, কিন্তু মোতিহার নামে কোনো জাতির উল্লেখ নেই। মাসিক বসুমতী পত্রিকায় ছাপার ভুলে মোতিসার শব্দটি মোতিহার হয়ে থাকতে পারে। মোতিসার জাতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, "Motisar is a caste which keeps the genealogies of Cāraṇs, sings their praises and begs money of them. The Motisars themselves are often good composers." (*P.R.B.C.*,p.9.)

৩. "The system of giving Lakh-Pasāv is another source of encouragement to ready poetry and ready wit. The word Lakh-Pasāv means the gift of a lakh of rupees, which is never given in cash but always in kind :— elephants, horses, camels. jewellery, conveyances, villages, lands, grain, etc. The total value of such gifts varies in worth generally from 30,000 to 70,000 rupees, but it is always taken as a Lakh-Pasāv. Mahāmahopādhyāya Kavirājā Murārdān has received three Lakh-Pasāvs from the Rājās of Jodhpur ; ...Murārdān's grandfather Bānkidan got two Lakh-Pasāvs from Mahārājà Mān Singh of Jodhpur alone, but he was thrice banished for his abusive verses addressed to the Court." *Ibid*, p. 16.

এই বিবরণে শাস্ত্রীমশায় উল্লেখ করেছেন, যোধপুরে চারণরা ৩৮০ খানি গ্রামের আয় ৩ লক্ষ টাকা ভোগ করতেন। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ধনীরা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে চারণদেরও দান করেন। এই দানকে 'ত্যাগ' বলা হয়। চারণদের মধ্যে একজনকে প্রধানরূপে নিয়োগ করা হয়, তিনি অপর চারণদের মধ্যে যোগ্যতা অনুযায়ী 'ত্যাগ'-এর দান বিতরণ করে দেন।

৪. স্যার জর্জ গ্রিয়ার্সনের প্রেরণায় ইতালীয় গবেষক তেস্‌সিতোরি শাস্ত্রী-মশায়ের পরে ভাট-চারণ গান সম্পর্কে রাজপুতানায় গবেষণা করেন। ভাট-চারণ গানের ঐতিহ্য এবং ভাষা সম্পর্কে শাস্ত্রীমশায়ের অনেক

ধারণা তিনি খণ্ডন করেন। শাস্ত্রীমশায় তাঁর রিপোর্টে ডিঙ্গলকে ভাষা বা উপভাষা না বলে রচনাশৈলী বলেন। তেস্‌সিতোরি প্রমাণ করেন এই সিদ্ধান্ত ভুল। শাস্ত্রীমশায় তাঁর সিদ্ধান্ত যে মেনে নিয়েছিলেন, এই প্রবন্ধের মন্তব্য থেকে তা বোঝা যাচ্ছে। উভয়ের আলোচনা নিচে তুলে দেওয়া হল—

"In Sanskrit the first writer on prosody is Piñgalanāga. From him the art of Prosody is often called Piñgala. There is a Prākṛt work on Prosody written evidently long after Piñgala, which goes by the name of Prākṛt-Piñgala. There are reasons to believe that this work was written in Rājputānā, and in the 14th Century. I think that the influence of this work has something to do with the popularity of the word Piñgala in that country. The words Piñgala and Diñgala have nothing to do with the language or dialect. Piñgala means all the various Chandas which the dialects of Western India are capable of, while Diñgala means only one Chanda called Gīta or Gītacchanda which consists of four Dohās generally. I am told that there are a few other Chandas in Diñgala but they are of very rare occurrence. Diñgala is always Gīta and Gīta is always Diñgala. There is little of Diñgala outside Marudesha, so Marubhāṣā is the basis of Diñgala poetry. But as the literate bards of Rājputānā are in the habit of drawing words from various languages and dialects, which are known to them, Diñgala has an extensive lexicography. The Hambīranāmālā is the shortest and most elementary. It is learnt by rote by every aspirant of poetic fame. The Diñgala Koṣa (of which a copy has been acquired for the Government of India) by Murārdāna, the adopted son of Sūrajmal, is a much larger work....There are certain grammatical pecularities of the language in

which the Diñgala poetry is written, such for instance as Didho for Datta and Kidho for Kṛta, which I believe the bards have retained from an older form of Prākṛta. The simple Marubhāṣā in which the 'Āi ānanda prakāhsa' and 'Āi Ugra Prakasha' are wṛitten, appears on the first sight to be very different from Diñgala poetry. But if the few grammatical and the large number of lexicographical peculiarities are eliminated, the language of both appears to be the same. There is a peculiar habit of the bards to change and corrupt Sanskṛt, prakṛt and other borrowed words to suit their idea of rhyme and rhythm. The Diñgala poets are very fond of Varansagai, viz. the repetition of the same consonant at regulated intervals in the same line. The poets are prepared to sacrifice spelling, grammar, rhyme, rhythm, reason and common sense for Varansagai....

"As regards the extent of corruption, it may be stated that the word Dagara has been changed into Diñgala to rhyme with Piñgala. *So Diñgala is not a language, not even a dialect as some would allege, but it is a style of poetry peculiar to the Cāraṇas and Rājputs, and is more suited for heroic poetry than for describing love.* [ইটালিক আমাদের]

"I have the high authority of Mahāmahopādhyāya Morārdānji in support of the above theory. Quoting a verse from Ālā Cāraṇ, the protector of Cuṇḍā, he showed to me that in the 14th century the Marubhāṣā was actually called Dagar and the verse is given here :

दीसे जंगल डगल जेथ जल बगल चांटे ।
अनहुता गल दियै गला हुंता गल काटे

etc., etc.,

[দীসে জঙ্গল ডগল জেথ জল বগল চাঁটে।
অনহুতা গল দিয়ে গলাহুংতা গল কাটে]

From this it is clear that the language of Jañgaladesa, that is Marudesa or Marwar, the Jañgala of the ancient Kurujāngala, was called Dagala." (*P.R.B.C.*, pp. 14-15.)

তেস্সিতোরি বলেন—

"It is well known that there are two languages used by bards of Rajputana in their poetical compositions, and they are called *Ḍiṅgaḷa* and *Piṅgaḷa*. These are no more 'style of poetry' as held by Mahamahopadhyaya Hara Prasad Sastri, but two distinct languages, the former being the local *bhāṣā* of Rajputana, and the latter the Braja *bhāṣā* more or less vitiated under the influence of the former. Sir George Grierson in his *Linguistic Survey of India*, Vol. IX, Part II (1908), p. 19, has given the following clear definition : 'Mārwāṛī has an old literature about which hardly anything is known. The writers sometimes composed in Mārwāṛī and sometimes in Braj Bhākhā. In the former case the language was called *Ḍiṅgaḷ* and in the latter *Piṅgaḷ*', a definition which would have given the Śāstrī a good clue if he had not overlooked it. Leaving aside *Piṅgaḷa*, on which it would be superfluous here to make any remark in addition to the statement made above, I will confine myself to a few considerations in regard to *Ḍiṅgaḷa*, which I think necessary in order to eliminate the prejudice current in Rajputana that *Ḍiṅgaḷa* is an artificial language invented by the bards, and to show its real nature and relationship to the other languages of India.

"In my 'Notes on the Grammar of the Old

Western Rājasthānī with special reference to Apabhraṃśa and to modern Gujarātī and Mārwāṛī', which are being published in the *Indian Antiquary*, I have tried to prove the common derivation of the vernaculars of Rajputana and Gujarat from a unique stock, which I have termed 'Old Western Rājasthānī', and have explained as the immediate offspring of the Saurasena Apabhraṃśa. This language had been explained as simply Old Gujarātī, but from the fact that it contains many peculiarities which nowadays are not found in modern Gujarātī, whilst they are common in modern Mārwāṛī, and also that it seems to have been in use over an area including a great part, if not most, of Rajputana, it is clear that it is to be considered as the parent of Mārwāṛī not less than Gujarātī. I have fixed A. D. 1200 and A. D. 1600 as the approximate limits of the Old Western Rājasthānī, and shown that the differentiation of this language into Gujarātī and Mārwāṛī began long before the sixteenth century. I have also shown that in the later stage of the Old Western Rājasthānī the differentiation is so marked that it is always possible to say whether a work is written under the influence of the Gujarātī or the Mārwāṛī tendency. It has seemed to me that as far as Old Western Rājasthānī goes, the difference between these two currents of speech is not so important as to justify the classing of them as separate ; otherwise I would have distinguished in the later Old Western Rājasthānī stage two different dialects to be named Old Gujarātī and Old Mārwāṛī. With the latter, whether we call it Old Mārwāṛī or simply Old Western Rājasthānī, Ḍiṅgaḷa is to be identified.

"Ḍiṅgaḷa is therefore in origin Old Western Rājasthānī, i.e. the old local speech of Western Rajputana, and consequently identical with the language so well preserved to us in the works of Jain commentators and poets of the fifteenth and sixteenth century and described in my 'Notes' mentioned above. It is, however, the Mārwāṛī side of the Old Western Rājasthānī, and it is partly for this reason and partly also because of its having been somewhat modernised in orthography during the four or five centuries in which it came down to us, that the bards nowadays ignore and deny its identity with the language preserved in Jain works, which they call 'Jatiyā rī bōlī', and attribute its invention to themselves. The term Ḍiṅgaḷa, which has nothing to do with Ḍagara nor with any other of the fantastic etymologies proposed by the bards and pandits of Rajputana, but is a mere adjective meaning probably 'irregular', i. e. 'not in accordance with the standard poetry' or possibly 'vulgar', was applied to it when the use of the Braja Bhāṣā (Piṅgaḷa) as a polite language of the poets was in general vogue. Ḍiṅgaḷa is therefore the old vernacular of Rajputana which, though long a dead language, has survived in the songs of the bards, a fact which, however strange and inexplicable it may appear at a first sight, yet is quite natural in the case of professional poets, whose oral partimony —art, style, language and manuscripts— is transmitted from father to son. But this should not be taken to mean that Ḍiṅgaḷa has been transmitted *qualis talis* and there are no differences in it. It is obvious that the Ḍiṅgaḷa poetry composed during the Old Western Rājasthānī period, i. e. before the

seventeenth century, must necessarily partake of all the Old Western Rajasthani peculiarities of which the most characteristic is the hiatus in the vocalic nexus *aï* and *aü*, whereas the Ḍiṅgaḷa poetry composed within and after the seventeenth century, i.e. after the development of modern Mārwāṛī, must to a certain extent have undergone some modlfications under the influence of the latter language. Thus in the later Ḍiṅgaḷa *aï* and *aü* cannot be expected to remain in hiatus, but they are contracted into *ai* (ē) and *au* (ō) after the example of modern Mārwāṛī. We shall have therefore to distinguish, in the Ḍiṅgaḷa literature, two stages, namely *Old Ḍiṅgaḷa* included in the Old Western Rājasthānī period, and Later Ḍiṅgaḷa, included in modern Mārwāṛī period. The difference between the two stages is more in points of phonetics and morphology than lexicography, and the unintelligibility of Ḍiṅgaḷa largely depends on the use of obsolete words, which are no longer understood by the people. The same modernising influence which has been exercised on Later Ḍiṅgaḷa, has not been without an effect on the poetry composed during the Old Ḍiṅgaḷa stage, which has therefore come down to us in an incorrect and uncritical form, and this accounts for the modern bards ignoring its very existance. To restitute Old Ḍiṅgaḷa into its original form must now be one of the tasks of the editor, and it can be accomplished through the analogy of the Old Western Rājasthānī of Jain writers, of which numbers of good and reliable manuscripts are available, and also through searching for very old bardic manuscripts, which though I have never seen any to this day, yet are sure to be found.

"Besides Ḍiṅgaḷa and Piṅgaḷa, which are the languages used for the poetry, the editor of the Bardic and Historical Literature will have to consider the various modern varnaculars of Rajputana, which are used for the prose, and chiefly in the compositions of *Khyātas*, vātas, genealogies etc. It is certain that some of these works were composed during the Old Western Rājasthānī and in course of time underwent the same modernising process as Old Ḍiṅgaḷa. Should any of these works in prose be found of such an interest as to deserve to be edited, it is clear that the text should be restituted to its original form. Prose-chronicles written in modern Mārwāṛī or in any other of the modern vernaculars of Rajputana present no particular difficulty. The practical conclusion to be drawn from the above consideration in regard to our Scheme is that Ḍiṅgaḷa is no artificial jargon, but an old dead language, the key to the understanding of which cannot be attained through guessing at random, but only through a critical study of all the factors in its derivation and development, made according to the principles of modern philology, and on all the available materials. These materials are the manuscripts.

"Turning now to the bards, I must point out that Mahamahopadhyaya Hara Prasad Sastri in his afore-mentioned *Preliminary Report* has given an Appendix on the bards, in which of the two chief classes of them, Cāraṇas and Bhāṭas, the former are rather diminished and discredited, whilst the latter are dignified beyond what they actually are. The reason for this is simply that the Śāstrī derived most of his information from a Bhāṭa, who naturally

enough availed himself of the opportunity of discrediting his rivals, the Cāraṇas, before him. The fact is that by far the most influential class of bards in Rajputana, with the exception of some places in the South-East, are the Cāraṇas, and the proof is in the number of villages they still enjoy as Śāsanas. In the Marwar State, where their influence is most felt, they continue to enjoy not less than about 350 villages, whilst the villages of the Bhāṭas are only seven or eight." (Dr. L. P. Tessitori, "A Scheme for the Bardic and Historical Survey of Rajputana", *J. A. S. B.*, Nov. 1914, Vol. X, No. 10 (NS), P. 375-79.)

৫. মুন্সী দেবীপ্রসাদ। যোধপুরের উচ্চপদাধিকারী রাজকর্মচারী। পুথি সংগ্রহের কাজে শাস্ত্রীমশায়কে সাহায্য করার জন্য যোধপুর দরবার এ'কে নিয়োগ করেন।

৬. সপ্তম এডওয়ার্ড (১৮৪১-১৯১০ খৃ.)। ১৯০১ খৃস্টাব্দে ইংলণ্ডের সিংহাসন লাভ করেন।

৭. ডক্টর হীরালাল মাহেশ্বরী বলেন, "The correct name is Bankidas and not Bankedan. There was no poet of the name of Bankedan. MM. Shastri meant Bankidas. Muraridan of Jodhpur was the grand son of Bankidas." ২৮ মার্চ ১৯৮১ তারিখের চিঠি। আরো তথ্যের জন্য দ্র. Dr. Hiralal Maheshwari, *History of Rajasthani Literature*, Sahitya Akademi 1980.

৮. 'বংশভাস্কর' গ্রন্থের লেখক সূরজমল। শাস্ত্রীমশায় তাঁর বিবরণে লিখেছেন, "About 70 years ago a powerful Cāraṇ, Bārhaṭ Sūrajmal, wrote a lengthy work, 'Vaṃshabhāskar', giving a history of the Hāḍa Chauhan family of Bundi and all Rajput families that came in contact with them. This is everywhere

regarded as a classical work of Bardic poetry.” (*P.R.B.C.*,p. 2.)

ডক্টর গণপতি চন্দ্র গুপ্ত সূরজমল সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, “ডিঙ্গলকে প্রসিদ্ধ কবি রাজা সূর্য্যমল মিশ্রণ ইয়া সূরজমল (১৮১৫-৬৮) নে ভী পিঙ্গল ভাষামে বংশভাস্কর (১৮৪০) নামক গ্রন্থ লিখাথা জো রাজস্থানমে পিঙ্গল ভাষাকে বঢ়তে হুএ প্রভাব কা সূচক হৈ। ইসমে কবিনে আশ্রয়দাতা বুঁদী নরেশ এবং উসকে পূর্বজোঁকা চরিত প্রস্তুত কিয়া হৈ।” (‘হিন্দী সাহিত্যকা বৈজ্ঞানিক ইতিহাস’, ভারতেন্দু ভবন, চণ্ডীগড়

ডক্টর হীরালাল মাহেশ্বরী জানিয়েছেন, “The writer of Vamsha Bhaskar is Suryamall or Surajmal. He was a charan of the Misan or Misran branch. Vamsha Bhaskar was published in V. S. 1956 from Jodhpur. Its annotator was Krishandas (Barhat Sodee Krishnadas)।”
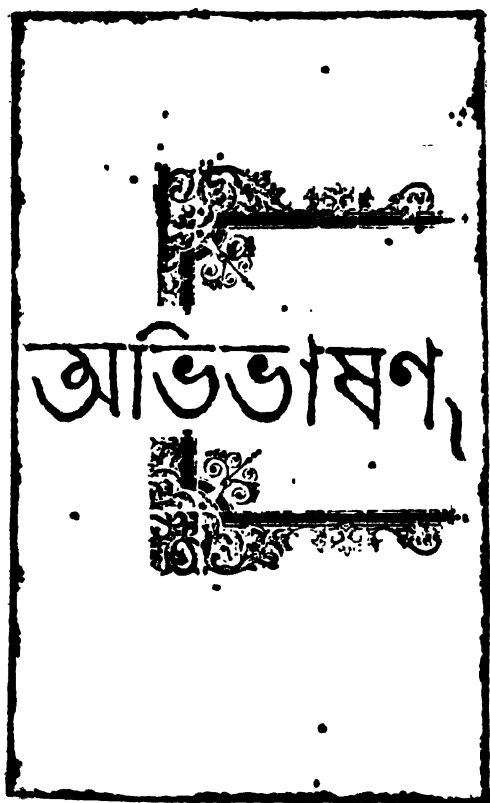
অভিভাষণ

১. সপ্তম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের
অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ

আজ আমাদের অতি শুভদিন। আজ বঙ্গদেশের রাজধানী কলিকাতা নগরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন হইতেছে। এই সম্মিলন ছয় বার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সকল বারই মফস্বলে, সদরে— কলিকাতায় এই প্রথম।

কলিকাতা সাহিত্য-সম্মিলন

সম্মিলনের জন্য বাংলা সাহিত্যসেবীদের এবার যেরূপ উদ্যম ও অধ্যবসায়

দেখিতেছি, এত উদ্যম ও অধ্যবসায় পূর্বে দেখা যায় নাই। এই বিশাল সভাগৃহে, যাঁহারা বাংলা সাহিত্যসেবায় জীবন কাটাইতেছেন, যাঁহারা সেই সাহিত্যসেবায় বিপুল যশোলাভ করিয়াছেন, যাঁহারা গুরুতর পরিশ্রম করিয়াছেন, যাঁহারা নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া নানা ভাষা হইতে নূতন নূতন ভাব সংগ্রহ করিয়া মাতৃভাষাকে উপহার দিয়াছেন, যাঁহারা নানা ভাষা হইতে নানা গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া বঙ্গভাষার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন, যাঁহারা নানা ভাষার কাব্যের ছায়া অবলম্বন করিয়া বিবিধ কাব্য রচনা করিয়াছেন, যাঁহারা সংবাদপত্র পরিচালনা করিয়া দেশের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন, যাঁহারা নানা মাসিকপত্র লিখিয়া, নানা বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করিয়া সমাজস্থ, কী ইতর কী ভদ্র, সকল লোককেই শিক্ষা ও আনন্দ প্রদান করিয়াছেন, যাঁহারা গদ্যে, পদ্যে, গানে, গীতে, দেশস্থ লোকদিগকে মোহিত করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই এখানে দেখিতে পাইতেছি।

ডা. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাংলা সাহিত্য

এ বৎসর বাংলা সাহিত্যের বড়ো শুভ সম্বৎসর। ভারতবর্ষে, আধুনিক সাহিত্যক্ষেত্রে, বাংলাভাষার স্থান অতি উচ্চ হইলেও ভারত-বর্ষের বাহিরে ইহার গৌরব তত বিস্তৃত হয় নাই। বাংলা সাহিত্যের বহু-সংখ্যক পুস্তক ইংরাজি ভাষায় অনূদিত হইলেও ইউরোপ অঞ্চলে বঙ্গীয় লেখক-গণের কৃতিত্ব কেহ এ পর্যন্ত স্বীকার করেন নাই। কিন্তু এ বৎসর [১৯১৩ খৃ.] শ্রীযুক্ত ডা. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া, ইউরোপ তাঁহাকে নোবেল প্রাইজ দিয়াছেন। তাহাতে বঙ্গীয় সাহিত্যের গৌরব স্বীকারই করিতে হইয়াছে। বঙ্গীয় লেখকগণের সেজন্য ডা. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকটে চিরকৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

লর্ড কারমাইকেল ও বাংলা সাহিত্য

আমাদের এ বৎসরের উদ্যোগ আরো শুভফল প্রসব করিয়াছে। বাংলাভাষার লেখকদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য বাংলাদেশের গবর্নমেণ্ট অনেকদিন হইতে অনেক টাকা খরচ করিয়া আসিতেছেন। সভা করিয়া, সমিতি করিয়া, সান্ধ্য সম্মিলনে নিমন্ত্রণ করিয়া, উপাধি দানে ভূষিত করিয়া, তাঁহাদিগের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন। কিন্তু এবার স্বয়ং বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল— আমাদের পরমভক্তিভাজন রাজেশ্বর পঞ্চম

জর্জের প্রতিনিধি সম্মিলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া আমাদিগকে সম্মিলনের কার্যে নিযুক্ত করিয়া এবং স্বয়ং সেই কার্য আরম্ভ করিয়া দিয়া, সম্মিলনের— বাংলা সাহিত্যের ও বাঙালিদিগের যে উপকার সাধন করিলেন, বঙ্গবাসী তাহা কখনোই বিস্মৃত হইতে পারিবেন না।[১]

লর্ড ক্লাইব [Robert Clive, ১৭২৫-৭৪ খৃ.] ও লর্ড হেস্টিংস [Warren Hastings, শাসনকাল ১৭৭৪-৮৫ খৃ.] বাংলা জানিতেন, বাংলায় কথা কহিতেন, কিন্তু তাহার পর প্রায় সকল বঙ্গেশ্বরই ইংরাজিতে বাঙালির সহিত কথা কহিতেন। কিন্তু আমাদের প্রথম গবর্নর লর্ড কারমাইকেল সাহেব শত শত গুরুতর রাজকার্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও বাঙালির প্রতি এতই অনুরক্ত যে, তিনি বাংলাভাষা শিক্ষা করিয়াছেন ও বাংলাভাষায় বক্তৃতা করিতেছেন। সেদিন অধ্যাপক-মণ্ডলীর উপাধি বিতরণে তিনি বাংলায় বক্তৃতা করিয়াছেন। আজিও আপনারা দেখিলেন তিনি বাংলাভাষাতেই সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। শাসনকর্তার এইরূপ বঙ্গভাষার প্রতি অনুরাগ সাহিত্য-সম্মিলনের আর-একটি শুভফল।

এরূপ সভায় সমাগত সভ্যমণ্ডলীর অভ্যর্থনার ভার যোগ্যতর ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হইলে আমি বিশেষ আনন্দিত হইতাম। যাঁহারা সভা-সমিতিতে সর্বদা গমনাগমন করেন, সভাস্থলে বক্তৃতা করিতে যাঁহারা চিরাভ্যস্ত, সভাসমিতি সংগঠন করিয়া যাঁহারা বিখ্যাত হইয়াছেন, এরূপ কোনো বিখ্যাত বাগ্মীর হস্তে এ ভার ন্যস্ত হইলে, আমার মনের বিশেষ তৃপ্তি হইত। যাঁহারা আমায় এই কার্যের ভার দিয়াছেন, তাঁহারা যে আমার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং আমি সেজন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমার ভয় হয়, পাছে, তাঁহাদের কাজ মনের মতো না হওয়ায় শেষে আমার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেন। আমার ভয় হয়, পাছে আমার দোষে তাঁহাদের কার্যের কোনো ক্ষতি হয়। আমার ভয় হয়, পাছে আমার ত্রুটিতে তাঁহাদের সংকল্পিত ব্যাপারে কোনো ব্যাঘাত উপস্থিত হয়।

এবার কিন্তু অভ্যর্থনা-সমিতির কার্য বড়োই অল্প। মফস্বলে সাহিত্য-সম্মিলন হইলে অভ্যর্থনা-সমিতি হন গৃহস্থ, নিমন্ত্রিত সভ্যমণ্ডলী

হন অতিথি। সুতরাং অতিথিকে যেরূপ সম্মান করা উচিত গৃহস্থকে তাহা বিশেষরূপে করিতে হয়। এবার কলিকাতায় অধিবেশন হওয়ায়, কে গৃহস্থ, কে অতিথি, চিনিয়া উঠা ভার হইয়াছে। কে এমন বঙ্গবাসী আছেন, সাক্ষাৎ বা পরম্পরায়, কলিকাতার সহিত যাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই? সুতরাং কলিকাতায় সকল বঙ্গবাসীই গৃহস্থ, সকল বঙ্গবাসীই অতিথি। অতএব অভ্যর্থনা-সমিতির কোনো ত্রুটি হইলে, সকলকেই সেটি আপনার ত্রুটি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

উপস্থিত সম্মিলনের বিশেষত্ব

এইরূপ পরস্পর ত্রুটি মার্জনা করিয়া আপনারা সকলে মিলিয়া বাংলা সাহিত্যের যাহাতে উন্নতি হয়, বাংলা সাহিত্য যাহাতে সৎপথে চলিতে পারে, বাংলা সাহিত্যের দ্বারা যাহাতে দেশের লোকের মনে উদার ভাবের আবির্ভাব হয়, যাহাতে তাঁহাদের মনে আত্মসম্মান ও আত্মজ্ঞান জন্মে, যাহাতে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যে দেশের ধনাগম হয়, যাহাতে দেশের যে-সকল কলঙ্ক আছে, সে-সকল দূর হয়, তদ্‌বিষয়ে আলোচনা করুন।

বাংলা সাহিত্যের গতি

দেশের লোককে ভালো ও মন্দ পথে লইয়া যাইবার বিষয়ে সাহিত্যের ক্ষমতা প্রভূত। সেকালে ভাট্ ও চারণেরা রবাব ও বীণায় গান করিয়া রাজপুতদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগের জন্য প্রস্তুত করিয়া দিত। সাহিত্যের প্রভাবে, বক্তৃতার প্রভাবে, বৌদ্ধগণ ভারত-বর্ষীয় এমন-কি সমস্ত এশিয়ার লোককে ধর্মপথে লইয়া গিয়াছিল। দেশীয় সাহিত্য লোককে যে পথে চালায় লোকে সেই পথে চলে। আপনারা সেই সর্বশক্তিমান্ সাহিত্যকে হাতে পাইয়াছেন। আপনারা এই সাহিত্যের দ্বারা দেশের যাহাতে ধনাগম হয়, দারিদ্র্য দূর হয়, আত্ম-সম্মান রক্ষা হয় ও আত্মজ্ঞান লাভ হয় সেই বিষয়ে চেষ্টা করুন। আপনাদের পূর্বপুরুষেরা এ জগৎটাকে কিছুই নয় বলিয়া মনে করিতেন, সুতরাং তাঁহাদের সাহিত্যে এদিকে দৃষ্টি একেবারেই ছিল না। তাঁহাদের দৃষ্টি জীবনের ওপারে কেবল পরলোকের দিকেই ছিল। তখন কিন্তু দ্রব্যাদির মূল্য এত বৃদ্ধি হয় নাই। জীবিকা উপার্জন, প্রাণধারণ এত কঠিন ব্যাপার হয় নাই। তাঁহাদের দিনে তাঁহারা যাহা করিয়া গিয়াছেন

ইহকাল ও পরকাল উভয় দিকে

তাহা শোভা পাইয়াছে। তাঁহারা ভিক্ষা পাইতেন ; লোকের ছিল, তাহারা ভিক্ষা দিত। সাহিত্যসেবীগণ ভিক্ষা করিতে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হইতেন না। কিন্তু এখন জগতের গতি আর-একরূপ হইয়া গিয়াছে, এখন ভিক্ষা পাওয়া যায় না। ভিক্ষায় আত্মসম্মান রক্ষা হয় না। তাই আপনাদিগকে বলিতেছিলাম, বাংলা সাহিত্যের দ্বারা আপনারা বঙ্গবাসীদিগকে সর্বপ্রথমে 'পরিশ্রমের মাহাত্ম্য' (Dignity of labour) শিক্ষা দিউন। ভিক্ষা হইতে লোককে বিরত করুন। আপনাদের পূর্বপুরুষেরা দেশবাসীকে যে পথে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা হইতে আপনারা তাঁহাদিগকে কতকটা নিবৃত্ত করুন, তাঁহারা পরকাল পরকাল করিয়া লোককে পাগল করিয়া দিয়াছিলেন, আপনারা তাহাদিগকে ইহকালের কথাও স্মরণ করাইয়া দিন। তাঁহাদিগকে বলিয়া দিন, যে, ইহকাল ও পরকালের পরস্পর সংস্রব ও সম্পর্ক অতি নিকট ও অতি ঘনিষ্ঠ। যখন ইহকালে থাকিয়াই পরকালের চেষ্টা করিতে হইবে, তখন ইহকালকে একেবারে উপেক্ষা করা কোনো মতে উচিত নয়, আপনাদের সাহিত্যে যেন এ উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়।

অভ্যর্থনা-সমিতি ও নিমন্ত্রিত বর্গ

অদ্যকার সমাগমে ২৪ পরগনা ও কলিকাতার লোক গৃহস্থ, আর যত বাঙালি সকলেই অতিথি। বাঙালি বলিতে গেলে আগে কলিকাতার প্রতি দৃষ্টি পড়ে সুতরাং এবার গৃহস্থ ও অতিথির লক্ষ্য নির্দেশ করা অতি কঠিন। তথাপি চিরন্তন প্রথা অনুসারে লক্ষ্য নির্দেশ করিতেই হইবে। বলিতে হইবে আমরা তোমাদের আহ্বান করিতেছি, তোমরা এসো। আমরা বলিতে গেলে কলিকাতার লেখকমণ্ডলী ও ২৪ পরগনার লেখকমণ্ডলী। কলিকাতার কথা পরে বলিব, সূচিকটাহের ন্যায় আগে ২৪ পরগনার কথাটা বলিয়া রাখি। অনেকের সংস্কার যে ২৪ পরগনা

চব্বিশ-পরগনা ১০০০ বৎসর পূর্বে

অল্প দিন পূর্বে সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল। এ অল্প দিন বলিতে গৃহস্থের অল্প দিন বুঝায় না, ভূতত্ত্ববিদের অল্প দিন বুঝায়। বাংলার অন্যান্য ভাগ অপেক্ষা ২৪ পরগনা যে নূতন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চারি শত বৎসর পূর্বে সমস্ত ২৪ পরগনা জেলাকে 'বুড়ানিয়ার দেশ' বলিত অর্থাৎ বর্ষাকালে উহা জলে বুড়িয়া যাইত। এখন বুড়ানিয়ার দেশ আছে,

কিন্তু তাহা ২৪ পরগনা হইতে কিছু দূরে। বুড়িয়া যাইত বলিয়া যে দেশে লোক ছিল না বা সাহিত্যচর্চা হইত না, এমন নয়। প্রায় হাজার বৎসর পূর্বেও ২৪ পরগনার নানা স্থানে বৌদ্ধদিগের বিহার ছিল। বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা পুথিপাঁজি লিখিতেন, ধর্মপ্রচার করিতেন। এমন-কি এখন যে হাতিয়াগড় ও বালাণ্ডা পরগনা নগণ্য পরগনার মধ্যে গণ্য, সেখানেও বৌদ্ধদিগের বিহার ছিল। পণ্ডিতেরা প্রজ্ঞাপারমিতার[২] চর্চা করিতেন, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। তমলুক বন্দর লোপ হইলে পিছলদা ও ছত্র-ভোগ সমুদ্রযাত্রীদিগের প্রধান বন্দর বলিয়া পরিগণিত হইত। গঙ্গার ধারে যে-সকল গণ্ডগ্রাম ছিল, তথায় যথেষ্ট পরিমাণে ধর্ম ও সাহিত্যচর্চা হইত। খড়দহ গ্রাম বহু-দিন হইতে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের প্রধান স্থান ছিল। মাইনগর ও জাগুলিতে কায়স্থদিগের বড়ো বড়ো সমাজ ছিল। কুমারহট্ট বিদ্যাচর্চার একটি প্রধান স্থান ছিল। খিদিরপুর হইতে রাজ-গঞ্জ পর্যন্ত যে কাটি-গঙ্গা আছে, তাহা যখন কাটা হয় নাই, তখন অর্থাৎ চারি-পাঁচ শত বৎসর পূর্বে, কুমারহট্ট, ভাটপাড়া, কাঁকিনাড়া, মূলাজোড়, গাঁড়ুলে, ইছাপুর, বাঁকিবাজার, চাণক, খড়দহ, শুকচরপানিহাটি, কামার-হাটি, এ'ড়েদহ, বরাহনগর, চিৎপুর, কলিকাতা, ধলণ্ড, কালিঘাট, চূড়া-ঘাট, জয়ধূলি, ধলস্থান, বারুইপুর, ছত্রভোগ ও পিছলদা এই-সকল গণ্ড-গ্রামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। চৈতন্যদেবের বৃদ্ধ পরিকরগণের মধ্যে তাঁহার গুরু ঈশ্বরপুরীর[৩] বাড়ি কুমারহট্টে। শ্রীবাস পণ্ডিতেরা[৪] চারি ভাই কুমারহট্ট হইতে যাইয়া নবদ্বীপে টোল করিয়াছিলেন। পানিহাটির রাঘব পণ্ডিত[৫] চৈতন্যদেবের একজন প্রধান সেবক। বরাহনগরের ভাগবতাচার্য[৬] শ্রীমদ্ভাগবতের বাংলা অনুবাদ 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী' লিখিয়াছেন। তেমন সরস, সুমধুর ও তানলয়বিশুদ্ধ পদ্যানুবাদ, বোধ হয়, এ পর্যন্ত আর-কখনো হয় নাই।

৪০০ বৎসর পূর্বে

ইহার কিছু দিন পরেই ২৪ পরগনার পূর্বাঞ্চলে কতকগুলি মুসলমান পীর ও ফকিরের আবির্ভাব হয়। তাঁহারা বহু-সংখ্যক ভিক্ষুহীন বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করিয়া লন। পূর্বে যে বালাণ্ডা পরগনার কথা উল্লেখ করিয়াছি, সেখানে এক্ষণে আর হিন্দু দেখিতে পাওয়া যায় না, সব মুসলমান হইয়া গিয়াছে। যে মাদুর বোনা বালাণ্ডা

পরগনার প্রধান সম্পত্তি, সে মাদুর এখন মুসলমানেই বোনে। যে সুন্দরবন এককালে কালু রায় ও দক্ষিণ রায়[৭] নামক বৌদ্ধ সিদ্ধপুরুষের লীলাক্ষেত্র ছিল, এখন তাহা বর্নাবিবি ও সা জঙ্গুলির[৮] লীলাক্ষেত্র হইয়াছে। বড়োগাজি, বড়োপীর, পীর গোরাচাঁদ প্রাচীন বোধিসত্ত্ব ও সিদ্ধাচার্যদিগের স্থান অধিকার করিয়াছেন, এবং মুসলমানি বাংলায় আপন আপন পীরত্বের কিচ্ছা লিখিয়া বঙ্গভাষার পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন। এই-সকল গ্রন্থের মধ্যে বর্নাবিবির জহুরানামা অতি আশ্চর্য। বর্নাবিবি ও তাঁহার ভাই সা জঙ্গুলি আল্লার দরবার হইতে আসিয়া মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের উপর হুকুম থাকে যে, তাঁহারা সুন্দরবন দখল করিবেন। সুন্দরবন তখন দক্ষিণ রায়ের রাজত্ব। তিনি বড়োই পরাক্রান্ত দেবতা। জলে তিনি কুমিরে চড়িয়া বেড়ান, ডাঙায় তিনি বাঘে চড়িয়া বেড়ান। বাঘ ও কুমির তাঁহার বাহনও বটে, সেনাও বটে। ফকিরেরা তাঁহার সহিত লড়াই করেন, কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন না। তাই বর্নাবিবির ও সা জঙ্গুলির আবির্ভাব। ইঁহারা মদিনা হইতে ভাঙড়ে উপস্থিত হইলে ভাঙড়ের বড়োগাজি তাঁহাদিগকে দক্ষিণ রায়ের পরাক্রমের কথা কহিলেন। তাঁহারা দক্ষিণ রায়ের বাড়ি উপস্থিত হইয়া 'যুদ্ধ দাও' বলিয়া বসিলেন। দক্ষিণ রায় যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে তাঁহার মা নারায়ণী আসিয়া বলিলেন, "বাবা, স্ত্রীলোকের সঙ্গে লড়াই কত্তে যাবে। হারলে বড়োই লজ্জা, জিতলে নাম নাই। তুমি থাকো, আমি লড়াইয়ে যাই।" নারায়ণীতে ও বর্নাবিবিতে সাত দিন লড়াই হইল। কাহারো জয় পরাজয় হয় না। এমন সময় একদিক হইতে বিষ্ণু ও অন্য দিক হইতে আল্লা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ধি হইয়া গেল। বর্নাবিবি সমস্ত সুন্দরবনের বাদশাহ্ হইলেন। দক্ষিণ রায় আঠারো ভাটির অধিকার পাইলেন অর্থাৎ আঠারোটি ভাটায় যতদূর যাওয়া যায় ততদূর অধিকার পাইলেন। কিন্তু তাঁহাকে বন-বিবির প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইল। সা জঙ্গুলি এবং অন্যান্য পীরেরা বর্নাবিবির অধীনে সুন্দরবনের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

বর্নাবিবির জহুরানামা

পীর গোরাচাঁদ[৯] কোথা হইতে আসিলেন, জানা যায় না। তবে

তিনি চন্দ্রকেতু রাজা ও তাঁহার তিন পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া ও তাঁহাদের বধসাধন করিয়া অনেকটা দেশ দখল করিয়া লইলেন। হাড়োয়া গ্রামে তাঁহার আস্তানা আছে। সেখানে এখনো মেলা হইয়া থাকে। পীর গোরাচাঁদ এখন হিন্দু ও মুসলমান সকলের আরাধ্য দেবতা, কারণ তিনি মুশকিলে আসান করিয়া থাকেন। অনেকেরই বোধ হয় মনে আছে যে, ফকিরেরা এখনো "পীর গোরাচাঁদ মুশকিলে আসান" বলিয়া গান করিয়া ভিক্ষা করে।

পীর গোরাচাঁদের পুঁথি

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলায় শেরশাহের আবির্ভাব হয় [১৫৩৪ খৃ.]। ইনি হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই সমানভাবে দেখিতেন। আপনারা অনেকেই যবন হরিদাসের[১০] বৈষ্ণব হইবার কথা শুনিয়াছেন। আরো শুনিয়াছেন যে, রামচন্দ্র খাঁ, হরিদাস বৈষ্ণব হওয়ায়, তাহার প্রতি বড়োই অত্যাচার করিয়াছিল। সে-সকল কথায় আমাদের কাজ নাই। রামচন্দ্র খাঁর বাড়ি ২৪ পরগনার উত্তর সীমার নিকটে। উহাকে কাগজপুকুর বলে। রাম খাঁর পুত্র ভুবনেশ্বর কবিকণ্ঠাভরণ[১১] শেরশাহের [১৪৭২-১৫৪৫ খৃ.] বড়োই প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। শেরশাহ্ ক্রমে যখন বিহার, অযোধ্যা, কাশী, এলাহাবাদ, আগ্রা দখল করিয়া বাদশাহ্ হইলেন, তখন এই-সকল দেশে ভুবনেশ্বর শেরশাহ্কে দিয়া অনেক গ্রাম ও ভূমি ব্রাহ্মণদিগকে দান করাইয়াছিলেন। কবিকণ্ঠাভরণ শেরশাহের সহিত নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া অনেক পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই-সকল পুস্তকের বলে তিনি এক অতি প্রকাণ্ড Encyclopædia আরম্ভ করেন। সংস্কৃতে আঠারোটি বিদ্যা আছে। তিনি সেই আঠারোটি বিদ্যারই এক-একটি Encyclopædia লিখিবার চেষ্টা করেন। কতদূর কৃতকার্য হইয়াছিলেন জানি না, কিন্তু তাঁহার সংগীতের গ্রন্থ নেপালে ও জ্যোতিষের গ্রন্থ লণ্ডন নগরে আছে। এই দুই গ্রন্থে তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী যত লোক সংগীত ও জ্যোতিষের গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার সার সংগ্রহ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এরূপ Encyclopædia লেখার কথা মনে হইলে সত্য সত্যই বিস্মিত হইতে হয়।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মোগল-পাঠানের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে

২৪ পরগনায় বিশেষ কোনো উৎপাত ঘটে নাই। কারণ শেষ পাঠান সুলতান দায়ূদের [রাজত্বকাল ১৫৭২-৭৫ খৃ.] প্রধান কর্মচারী [শ্রীহরি] বিক্রমাদিত্য গৌড় হইতে পলাইয়া আপন জায়গিরে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার জায়গির যমুনা হইতে সাগর দ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সমস্ত ২৪ পরগনা, যশোহর ও খুলনার কিয়দংশ এই জায়গিরের অধীন ছিল। বিক্রমাদিত্য যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন ২৪ পরগনায় শান্তি ছিল। কিন্তু তাঁহার পুত্র প্রতাপাদিত্য প্রবল হইয়া বাদশাহ্‌কে কর দেওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন এবং পুরী হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সমস্ত সমুদ্রের উপকূলভাগ দখল করিয়া লইলেন। তিনি অনেক পণ্ডিত প্রতিপালন করিতেন, তাঁহার সময় সংস্কৃত সাহিত্যের বেশ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। সেই সময় কুশদহ পরগনায় একজন ভট্টাচার্য কৃষ্ণসিদ্ধান্ত, কিছুতেই তাঁহার অধীনতা স্বীকার করেন নাই। কিন্তু প্রতাপাদিত্য নানারূপ কৌশলে তাঁহাকে বশ করিয়া ফেলেন এবং তাঁহার প্রভূত সম্মান বৃদ্ধি করেন। বাংলা-ভাষায় প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কোনো সমকালীন ইতিহাস এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। কিন্তু সংস্কৃতে কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে। প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে অনেক খবর পর্টুগিজ মিশনারিদিগের গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়। এই সময়ে পাটনা নগরে বিজ্জলদেব নামে একজন চৌহান রাজা ছিলেন। তিনি জগমোহন নামে একজন পণ্ডিতকে নিযুক্ত করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষের একখানি Gazetteer প্রস্তুত করেন। উহার নাম 'দেশাবলিবিবৃতি'।[১২] উহাতে প্রতাপাদিত্যের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়, সমস্ত ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিত হইয়াছে। প্রতাপাদিত্য অনেকবার মোগল সৈন্য পরাজিত করিলে দিল্লীর বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর আমেরের রাজা মানসিংহকে বাংলার সুবাদার করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ইছামতী ও যমুনার সংগমস্থলে ঘোরতর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রতাপাদিত্য বন্দী হন।[১৩] তাঁহাকে খাঁচায় পুরিয়া দিল্লীতে লইয়া যাওয়ার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু পথেই তাঁহার মৃত্যু হয়। কথিত আছে, যে-সকল লোকের সাহায্যে মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে জয় করেন, তাঁহাদের একজনকে ২৪টি পরগনা দেওয়া হয়। সেই-জন্য এ অঞ্চলের নাম ২৪ পরগনা হইয়াছে। বিজ্জলদেবের পুস্তকে

প্রতাপাদিত্য

টাকি ও কুশদহের অনেক বর্ণন আছে। টাকির চৌধুরীরা চন্দ্রদ্বীপ হইতে আসিয়া এই স্থান অধিকার করিয়া লন এবং কয়েক পুরুষ ধরিয়া তথায় রাজত্ব করিতে থাকেন। এ অঞ্চলে তখন অনেক সিদ্ধ পুরুষের বাস ছিল, তাহার মধ্যে কুশদহের কৃষ্ণসিদ্ধান্ত ও গুণানন্দ প্রধান। ইঁহারা উভয়েই কালীভক্ত ছিলেন। কৃষ্ণসিদ্ধান্ত প্রতাপাদিত্যের গুরু ছিলেন ও গুণানন্দ তাঁহার স্থাপিত যশোরেশ্বরীর পুরোহিত ছিলেন। টাকির চৌধুরীদের আদিপুরুষ দুর্লভ গুহ। তাঁহার পুত্রের নাম ভবানীদাস গুহ। ভবানীদাসের পুত্র কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণদাসের পাঁচ পুত্র ছিল।

এই সময়ে বড়িষার সাবর্ণ চৌধুরী মহাশয়েরা তাঁহাদের আদি নিবাস নিমতা হইতে বড়িষায় গিয়া বাস করেন। তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে নিমতা-নিবাসী কায়স্থ কবি কৃষ্ণরামও[১৪] বড়িষায় যান। সেখানে দক্ষিণ রায় তাঁহাকে স্বপ্ন দেন। তিনি বলেন, "মাধবাচার্য আমার মঙ্গল লিখিয়াছে। কিন্তু সে মঙ্গল আমার পছন্দ হয় নাই, সে ইতিউতি করিয়া বই সারিয়াছে। তুই ভালো করিয়া আমার মঙ্গল লেখ, তোর মঙ্গল গাহিবার সময় যে মন দিয়া না শুনিবে তাহাকে বাঘে খাইয়া ফেলিবে। আর তুই যদি না লিখিস তাহা হইলে তোকেও বাঘে খাইয়া ফেলিবে।" রায় মহাশয়ের ভয়ে কৃষ্ণরাম 'রায়মঙ্গল' লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার রায়মঙ্গলখানি বেশ বই। রায়মঙ্গল লিখিতে তাঁহার হাত বেশ পাকিয়া যায়। তাহার পর তিনি 'কালিকামঙ্গল' লেখেন। কালিকামঙ্গল বিদ্যাসুন্দরের গল্প। বিদ্যাসুন্দরের গল্প লইয়া অনেকেই কালিকামঙ্গল গান করিয়াছেন। কিন্তু কালিকামঙ্গলের আদি কবি কৃষ্ণরাম। ভারতচন্দ্রের [১৭১২-৬০ খৃ.] 'অন্নদামঙ্গল' [১৭৫২ খৃ.] রচিত হইবার প্রায় ৮০ বৎসর পূর্বে কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গল লিখিত হয়। বাঁকুড়া হইতে কালিকামঙ্গলের এক পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। সেখানে ইং ১৭৫৩ সালে হাটখোলায় এক সওদাগরের গদিতে উহার দোতালা ঘরে নকল করা হয়। দক্ষিণা একজোড়া কাপড় ও দুটি টাকা। ইহার পর বনমালী দাস নামক এক ব্যক্তি ১৭৩১ সালে কলিকাতায় বসিয়া প্রাকৃত ভাষায় 'গীতগোবিন্দ' অনুবাদ করেন। ১৭৫৩ সালে হালিশহর-নিবাসী কবি রামপ্রসাদ

সেনের [১৭২০ ?-৮১ খৃ.] অন্নদামঙ্গল রচিত হয়। ঠিক এই সময় আবার ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলও রচিত হয়। ভারতচন্দ্র বৃদ্ধবয়সে মূলাজোড়ে গঙ্গাতীরে বাস করিতেন, তাঁহার গ্রন্থ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানীতে [কৃষ্ণনগর] লিখিত হয় বলিয়া এ স্থলে উল্লেখ করা গেল না।

খৃস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে কতকগুলি সুপণ্ডিত দাক্ষিণাত্য বৈদিক দক্ষিণদেশ হইতে আসিয়া ২৪ পরগনায় বাস করেন। রাজপুর, হরিনাভি মজিলপুর তাঁহাদের আদিস্থান। সেখান হইতে তাঁহারা কলিকাতার দক্ষিণে অনেক গ্রামে আপনাদের বাসস্থান নির্মাণ করিয়াছেন এবং বিদ্যা ও বুদ্ধি বলে দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। প্রতাপাদিত্যের রাজ্য ধ্বংস হইয়া গেলে একজন পাশ্চাত্য বৈদিক [নারায়ণ ঠাকুর] ভাটপাড়ায় আসিয়া বাস করেন। তাঁহার বংশাবলী ভাটপাড়ার ঠাকুরগোষ্ঠী হইয়াছে। খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই কলিকাতার উন্নতি আরম্ভ হয়। দেশের বাণিজ্য সমস্তই কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হয়। দেশের শিল্পও কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হয়। এই ২০০ শত বৎসরের মধ্যে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান, শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতিতে কলিকাতা বঙ্গদেশের, এমন-কি ভারতবর্ষের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। কলিকাতা ২৪ পরগনার ঠিক মধ্য স্থানে অবস্থিত। সুতরাং ২৪ পরগনার যাহা-কিছু ছিল, সমস্তই কলিকাতায় আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তথাপি ২৪ পরগনার অনেক প্রধান প্রধান লেখক ও পণ্ডিত আবির্ভূত হইয়া উহার সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের জীবনচরিত লিখিতে গেলে, এমন-কি নাম উল্লেখ করিতে গেলেও একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে। সেইজন্য আমরা এই স্থলে কয়েকজন মাত্র প্রধান লেখকের বৃত্তান্ত লিখিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

প্রথম রামনারায়ণ তর্করত্ন [১৮২২-৮৬ খৃ.]। ইঁহার নিবাস হরিনাভি। ইনি দাক্ষিণাত্য বৈদিক। ইনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ইনি অনেকগুলি নাটক লেখেন। তাহার মধ্যে কয়েকখানি সংস্কৃতের আদর্শে লিখিত। সংস্কৃত নাটকের যাহা দোষগুণ, সমস্তই তাহাতে বর্তিয়াছে। এখানে তাহার সবিস্তার সমালোচনার

প্রয়োজন নাই। কিন্তু তিনি বর্তমান বাংলা সমাজ সম্বন্ধে যে দুইখানি নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন, তন্মধ্যে 'কুলীন কুলসর্বস্ব' [১৮৫৪ খৃ.] হাস্যরসের নাটক : রাঢ়ীয় কুলীনদিগের মধ্যে যে বহুবিবাহপ্রথা চলিতেছিল ব্যঙ্গচ্ছলে তাহার দোষ দেখাইতে গিয়া এই গ্রন্থে তৎকালে যে-সকল বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য টিকি ও দীর্ঘ ফোঁটার জোরে জনসমাজে পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইতেন, তাঁহাদের প্রতিও যথেষ্ট কটাক্ষ করা হইয়াছে। ঘটক মহাশয়েরা শত মুখে পরের বংশাবলী বর্ণনা করিতেন। একেবারে ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া বর ও কন্যা পর্যন্ত উভয় কুলের পূর্বপুরুষদিগের নাম কীর্তন করিতেন। কিন্তু নিজের পিতার নাম করিতে বলিলে মাথা চুলকাইতেন। বলিতেন, "কী জানেন, পরের বাপ, যা-হয়-তাই একটা বলিয়া দিলাম। কিন্তু নিজের বাপের বেলা কি সে রকম করা যায় ?" কুলীন মহাশয়েরা অত্যন্ত যথেচ্ছাচারী হইয়াও কেবল পূর্বপুরুষেরা কেহই কুল ভাঙেন নাই, এই গুণে সর্বত্র সমাদর পাইতেন, ও শত শত বিবাহ করিতেন। এই নাটকে একজন বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্যের গল্প আছে। তাঁহার নাম অভব্যচন্দ্র দেবশর্মা। তিনি জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন উপাধি লইয়া অভব্যচন্দ্র দেবশর্মা জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন হইয়াছেন। রামায়ণ ও মহাভারতে তাঁহার বিদ্যার দৌড় অত্যন্ত অধিক। তিনি বলেন—

পুরাণে নবীন বিদ্যা হয়েছে আমার।
রাবণ উদ্ধবে কন শুন সমাচার॥
দ্রৌপদী কান্দিয়া কহে বাছা হনুমান।
কহ কহ কৃষ্ণকথা অমৃত সমান॥
পরীক্ষিৎ কীচকেরে করিয়া সংহার।
অধিকার করিলেক রাজত্ব লঙ্কার॥

পণ্ডিত মহাশয় হাস্যরসের বর্ণনায় কতদূর কৃতকার্য হইয়াছিলেন, উপরি-লিখিত ঘটনা হইতে তাহার অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার 'নবনাটক'খানিও [১৮৬৬ খৃ.] বর্তমান সমাজের চিত্র। এখানিতে কিন্তু হাস্যরসের নামও নাই। প্রেম ও শোকের উচ্ছ্বাসে ইহা পরিপূর্ণ। পণ্ডিত মহাশয় অনেক দিন স্বর্গস্থ হইয়াছেন। লোকের রুচি ফিরিয়াছে। তাঁহার নাটকগুলি লোপ পাইতে

বসিয়াছে। কিন্তু যে-কেহ তাঁহার নাটক পড়িবে, সে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিবে না।

পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ [১৮১৯-৮৬ খৃ.] মহাশয় দাক্ষিণাত্য বৈদিক ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার মতো অধ্য-বসায়শীল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি অতি বিরল। অধ্যাপনাকালে ইংরাজি শিখিয়া তিনি গ্রীস ও রোমের ইতিহাস তর্জমা করিয়াছিলেন; অনেকগুলি সুন্দর স্কুলপাঠ্য গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু 'সোম-প্রকাশে'ই [প্রথম প্রকাশ ১৫ নভেম্বর ১৮৫৮ খৃ.] তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি। সোমপ্রকাশ নূতন ধরনের সংবাদপত্র। ইহাতে ইংরাজি সংবাদপত্রের ন্যায় সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা থাকিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সংবাদপত্র প্রথম প্রচার করেন। পরে উহার ভার বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের হস্তে সমর্পণ করেন। সোম-প্রকাশের সংস্কৃতবহুল ভাষা সেকালের লোক অত্যন্ত পছন্দ করিত। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও নিজেই অধিকাংশ প্রবন্ধ লিখিতেন। ক্রমে তিনি 'কল্পদ্রুম' [প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১২৮৫ ব] নামে একখানি মাসিকপত্র বাহির করেন। সে মাসিকপত্রেরও যথেষ্ট আদর হইয়াছিল। মুঙ্গের ও জামালপুরের কেরানি মহাশয়েরা সেই মাসিকপত্রে লিখিতেন ও যাহাতে তাহার উন্নতি হয় তাহার চেষ্টা করিতেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় পেন্‌সন লইয়া অনেক দিন জীবিত ছিলেন। তিনি খুব হিসাব করিয়া চলিতেন। এজন্য তিনি যথেষ্ট ভূসম্পত্তি রাখিয়া ধনে মানে বিভূষিত হইয়া পরলোকগমন করেন। বর্তমান রাজনৈতিক সংবাদপত্র-সমূহের তিনিই আদি।

বঙ্কিমবাবু

প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে কাঁটালপাড়া গ্রামে এক দরিদ্র ঘোষাল ব্রাহ্মণের গৃহে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হন। ঘোষালের স্ত্রী ও দুইটি কন্যা। তিনি অতি দরিদ্র, তাঁহার দিনপাত হওয়া কঠিন ছিল। তথাপি তিনি সপরিবারে সন্ন্যাসীর যথেষ্ট আতিথি-সৎকার করিলেন। দৈবক্রমে সন্ন্যাসী তাঁহার বাড়িতেই পীড়িত হইয়া পড়িলেন। ঘোষাল মহাশয় বহু-দিন যাবৎ প্রাণপাত করিয়া তাঁহার সেবা করিলেন। সন্ন্যাসী আরোগ্য লাভ করিয়া বলিলেন, "আমি তোমার সেবায় বড়োই সন্তুষ্ট হইলাম।

আমার আর-কিছুই নাই, এই রাধাবল্লভ বিগ্রহটি তোমায় দিয়া গেলাম, তুমি ইহার সেবা করিবে।" ঘোষাল মহাশয় কহিলেন, "আমার দিনই চলে না, কী করিয়া বিগ্রহের সেবা করিব।" তিনি কহিলেন, "আমি আসা পর্যন্ত যেরূপে পারো চালাও, আমি আসিয়া তাহার ব্যবস্থা করিব।" কিছু দিন পরে সন্ন্যাসী ফিরিয়া আসিয়া রাধাবল্লভের নামে একখানি তালুক লিখিয়া দিয়া গেলেন। ঘোষাল মহাশয়েরা বেশ সম্পন্ন লোক হইয়া উঠিলেন। ফুলে ও বল্লভীমেলে দুই জন ভঙ্গ কুলীনের সঙ্গে দুইটি কন্যার বিবাহ দিলেন এবং জামাইদিগকে রাধাবল্লভের সেবার ভার দিয়া পরলোকগমন করিলেন। এই ফুলে মেলে যে জামাই হইল তাহারই বংশে বঙ্কিমবাবুর জন্ম। ইঁহার পূর্বপুরুষেরা রাধাবল্লভের সেবায়েত এবং নবাবি ও ইংরাজি আমলে রাজসরকারে চাকরি করেন। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক[১৫] সর্বপ্রথম যে চারি জন দেশীয় কর্মচারীকে ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেটি প্রদান করেন, তাহার মধ্যে বঙ্কিমবাবুর পিতা একজন[১৬]। বঙ্কিমবাবু কলিকাতা ইউনিভার্সিটির প্রথম বৎসরের বি.এ. [১৮৫৮ খৃ.]। কলেজ ছাড়িয়াই তিনি ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। এবং তিনিই সর্বপ্রথম মহকুমার ভার প্রাপ্ত হন। ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেটিতে তাঁহার বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। গবর্নমেণ্ট তাঁহাকে রায় বাহাদুর ও সি. আই. ই. [১৮৯৪ খৃ.] উপাধি দিয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবু ইতিহাস ও নবেল পড়িতে বড়ো ভালোবাসিতেন। তখন ভারতবর্ষের ইতিহাস ছিল না ও হয়ও নাই। বঙ্কিমবাবু ইউরোপের ইতিহাস খুব ভালো জানিতেন। ভারতবর্ষের মুসলমান ও ইংরাজ অধিকারে যে-সকল ইতিহাস ছিল, তাহা সমস্তই তিনি পড়িয়াছিলেন। কলেজে তিনি সংস্কৃত পড়েন নাই। টোলে সংস্কৃত কাব্য ও নাটক অনেকগুলি পড়িয়াছিলেন। তিনি যখন স্কুলে পড়েন, তখন ঈশ্বর গুপ্তের [১৮১২-৫৯ খৃ.] খুব প্রভাব। তাঁহার 'সংবাদ প্রভাকর' [প্রথম প্রকাশ ২৮ জানুয়ারি ১৮৩১ খৃ.] সকলেই পড়িতেন। বঙ্কিমবাবু, দীনবন্ধুবাবু [মিত্র, ১৮৩০-৭৩ খৃ] ও জগদীশ তর্কালংকার এই তিন জন ঈশ্বর গুপ্তের নিকট বাংলা লেখার শিক্ষানবিসি করিতেন। এই শিক্ষানবিসিতে পরিপক্ব হইয়া বঙ্কিমবাবু বাংলা নবেল লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার নবেলগুলি বাঙালি সমাজে সুপরিচিত। তাহার

মধ্যে দুই-একখানি ইংরাজির ছায়া লইয়া লিখিত হইলেও অধিকাংশই বঙ্কিমবাবুর নিজের। বঙ্কিমবাবুর নবেল হইতে বাংলার কী প্রভূত উপকার হইয়াছে, তাহার সমালোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না। কিন্তু তিনি লোকশিক্ষা দিবার জন্য, "Knowledge filtered down"[১৭] করিবার জন্য, 'বঙ্গদর্শন' [প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১২৭৯ ব.] নামে মাসিকপত্র বাহির করেন। তাহার কথা কিছু বলিব। তিনি ৪ বৎসর মাত্র এই মাসিকপত্রের সম্পাদকীয় ভার স্বহস্তে রাখিয়াছিলেন। এবং এই চারি বৎসরের বঙ্গদর্শনই বাংলা-ভাষার আদর্শ মাসিকপত্র হইয়া আজিও রহিয়াছে। তিনি যে শুদ্ধ নিজে লিখিতেন তাহা নহে, তিনি অনেককে লিখিতে শিখাইতেন। ইউনিভার্সিটির অনেক গ্রাডুয়েট তখন বঙ্গদর্শনে লিখিতে পাইলে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন। বঙ্কিমবাবুও তাঁহাদিগকে সর্বদাই উৎসাহ দিতেন, তাঁহাদের লেখা সংশোধন করিয়া দিতেন এবং বলিয়া দিতেন যে বাংলা লিখিতে গেলে দুইটি জিনিসের প্রতি দৃষ্টি করিতে হয়— clearness ও perspicuity। পুঁটলিপাকানো লেখা তিনি একেবারে দেখিতে পারিতেন না। যাহা বলিবার আছে একেবারে সোজাসুজি বলো। তোমার লেখা বুঝিবার জন্য পাঠককে মাথা ঘামাইতে হইবে কেন ? এই চারি বৎসরের পর বঙ্গদর্শন এক বৎসর বন্ধ থাকে। তারপর তাঁহার ভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্র [১৮৩৪-৮৯ খৃ] সম্পাদকের ভার লইয়া আরো ৪/৫ বৎসর বঙ্গদর্শন চালান। এ কয়েক বৎসরও বঙ্কিমবাবু বঙ্গদর্শনের প্রধান লেখক। কিন্তু এবার তিনি একটু সুর ফিরাইয়া ছিলেন। এবার তিনি নবেলে ধর্মপ্রচার আরম্ভ করেন। এই সময়ে হিন্দুধর্মকে আবার বাঁচাইয়া তুলিবার জন্য একটা চেষ্টা হয়। তাহাতে আবার দুই দল হয়। একদল একেবারে পুরানো সব ফিরাইয়া আনিতে চান ; আর-একদল বলেন, না বাপু তাহা হইবে না। খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদে হিন্দুয়ানি করিতে গেলে আর চলিবে না। কিন্তু হিন্দুয়ানিটা ফিরাইয়া আনা চাই। বঙ্কিমবাবু এই শেষোক্ত দলের কর্তা ছিলেন। সেইজন্য আপনার কর্তৃত্বাধীনে 'প্রচার' [প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১২৯১ ব.] নামক আর-একখানি মাসিকপত্র বাহির করেন। বঙ্কিমবাবুর সম্বন্ধে অনেক কথা

বলা যায়, কিন্তু আমাদের এখানে থামিতে হইবে, কারণ পুঁথি বাড়িয়া যায়।

২৪ পরগনার কথা একপ্রকার বলা হইল। কিন্তু কলিকাতার কথা সবিস্তার বলিতে গেলে অনেক volume লিখিতে হয় ; সুতরাং ছাঁটিয়া বাছিয়া কেবল মোটা কথা বলিয়াই শেষ করিতে হইবে। পূর্বেই বলিয়াছি ৪/৫ শত বৎসর পূর্বে কলিকাতা গঙ্গাতীরে একখানি গণ্ডগ্রাম বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এখানে ব্রাহ্মণ-সজ্জনের বাসও অনেক ছিল, এমন-কি উহা ব্রাহ্মণসমাজও ছিল। রাজা তোডরমল কলিকাতা নামে একটি পরগনার উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহার প্রধান নগর বলিয়াছেন কলিকাতা। সুতরাং তাঁহার সময় কলিকাতা শুদ্ধ যে গণ্ডগ্রাম ছিল তাহা নহে, একটি পরগনার মাথা হইয়া উঠিয়াছিল। ১৬৯৮ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সাবর্ণ চৌধুরীদের নিকট গোবিন্দপুর, সুতানুটি ও কলিকাতা তিনটি গ্রাম কিনিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই কলিকাতার উন্নতির সূত্রপাত। কিনিবার ছয় বৎসরের মধ্যেই কোম্পানি কলিকাতায় একটি কেল্লা নির্মাণ করেন। গঙ্গার ধার হইতে সেই কেল্লা লালদিঘি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখন সে কেল্লার চিহ্নমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না, অনেক কষ্টে উইলসন সাহেব তাহার স্থান নির্ণয় করিয়াছেন। কোম্পানির আমলেও কলিকাতায় বাঘ আসিত। এক ব্রাহ্মণ বাঘের ভয়ে রাত্রিতে এক সোনারবেনের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহার জ্ঞাতি-গোত্রেরা তাঁহাকে জাতিতে লইলেন না। তাঁহার বংশধরেরা আজিও সোনারবেনের ব্রাহ্মণ হইয়া রহিয়াছেন। আমি এ কথা ওই ব্রাহ্মণের প্রপৌত্রের নিকট শুনিয়াছি। গোবিন্দপুর, কলিকাতা ও সুতানুটিতে চিৎপুর রোড পর্যন্ত বসতি ছিল। তাহার পূর্বে কোথাও চাষ হইত। কিন্তু অধিকাংশ ছিল বন এবং জলা। ১৭৫৭ খৃ. অব্দে পলাশির যুদ্ধের পর কলিকাতা কেমন করিয়া সমস্ত বঙ্গের ও ক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষের রাজধানী হইল, সে কথা সকলেই জানেন, তাহার পুনরুক্তি বৃথা। কলিকাতার লোকসংখ্যা যত বাড়িতে লাগিল জলাভূমির মধ্যস্থলে একটি পুকুর কাটিয়া সেই মাটি দিয়া তাহার চারি পাশের জমি উঁচু করিয়া সেই উঁচু জমির উপর সকলে বাস করিতে লাগিল। ১৭৭৮ সালেও কলিকাতার অনেক জায়গায় মহারাষ্ট্র

খাতের মধ্যে চাষ হইত। ক্রমে কলিকাতা নগর এই তিনটি গ্রামের সীমা অতিক্রম করিয়া চারি দিকেই অনেক দূর অবধি গিয়াছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে লণ্ডন ছাড়া এত বড়ো শহর আর নাই। এবং এশিয়াখণ্ডেও পিকিন ছাড়া এত বড়ো শহর আর নাই। আমরা এ শহরের ইতিহাস প্রদানে অক্ষম। তবে এখানে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস কিছু কিছু দিব। পূর্বেই বলিয়াছি ১৭৩১ খৃ. অব্দে কলিকাতায় বনমালী দাস নামক এক ব্যক্তি প্রাকৃত ভাষায় অর্থাৎ বাংলায় গীতগোবিন্দ অনুবাদ করেন। সে অনুবাদখানি আমি পড়িয়াছি ; তাহার ভাষা এবং ছন্দ অতি সুন্দর। কবিবর রামপ্রসাদ কলিকাতায় কোনো সওদাগরের বাড়ি চাকরি করিতেন। সুতরাং তাঁহাকে হিসাব রাখিতে হইত। তিনি কিন্তু হিসাবের খাতার চারি পাশে কালী-বিষয়ক গান লিখিয়া রাখিতেন। একদিন সওদাগর জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। তাই তিনি অতি দুঃখে লিখিয়াছেন—

যখন ধন উপার্জন করেছিলাম
দেশ বিদেশে,
তখন ভাইবন্ধু দারা সুত
সবাই ছিল আমার বশে।
এখন ধন উপার্জন নাই
আমায় দেখে সবাই রোষে।

রামপ্রসাদের কালী-বিষয়ক কবিতাগুলি বড়োই মিষ্ট লাগে। ভিখারিরা যখন দ্বিপ্রহর বেলায় রামপ্রসাদি সুরে কালী-বিষয়ক গান করে, তখন দারুণ গ্রীষ্মেও শরীর জুড়াইয়া যায়। রামপ্রসাদের পর কলিকাতায় দিনকতক সাহিত্য যেন চুপচাপ হইয়া যায়। ইংরাজেরা তখন দেশের প্রকৃত রাজা হইয়াছেন, কিন্তু স্বহস্তে দেশ পালনের ভার লন নাই। সে সময়টাকে অরাজকতা বলা যায় না বটে, কিন্তু সেটা বড়ো ভীষণ সময়। দেশে শান্তি তো একেবারেই ছিল না, চুরিডাকাতিও যথেষ্ট ছিল। ক্রমে সর্ব প্রথমে কলিকাতায় শান্তি দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে কবিওয়ালার দল কবি গাইতে আরম্ভ করিলেন। রাম বসু [১৭৮৬-১৮২৮ খৃ.], হরুঠাকুর [হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী ১৭৪৯-১৮২৪ খৃ.] প্রভৃতির কবির লড়াই লোকে হাঁ করিয়া শুনিত। উভয় পক্ষেরই গোঁড়া

ছিল। হার-জিত কবির যত হোক না হোক, গোঁড়াদেরই হইত। গোঁড়ারা বহু-দূর হইতে কবি শুনিতে আসিত এবং হার-জিত হইলে অপর পক্ষকে খুব টিট্‌কারি দিত। কবি হইতে ক্রমে হাফ আখড়াই, তাহার পর শখের যাত্রা, তারপর পেশাদারি যাত্রা, তারপর শখের থিয়েটার, তারপর পেশাদারি থিয়েটার হইয়াছে। উত্তরোত্তর কাব্যাংশের শ্রীবৃদ্ধিই হইয়াছে। অনেকে কবিওয়ালাদের নাম শুনিলেই নাক সিঁটকাইয়া বলেন যে, উহারা কেবল খেউড় গাহিত। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। অনেক সময় উহাদের গানে যথেষ্ট রসিকতা থাকিত এবং চটপট চাপান ও উতরে যথেষ্ট প্রতিভা প্রকাশ পাইত। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে হাফ আখড়াই-এর দল বড়ো প্রবল হইয়া উঠে। ইহারা গান বাঁধিত, গান গাইত ও কতকটা কবির দলের মতো ছিল। তাহার পর শখের যাত্রার আরম্ভ হয়। আমরা বালককালে প্রথম শখের যাত্রার গল্প শুনিয়াছি। কলিকাতার বাবুরা অনেকে একত্র হইয়া একটি শখের যাত্রার দল করিয়াছিলেন, ইহার বড়োই জাঁকজমক ছিল। যাত্রার দলের ছেলেরা কিন্তু প্রায়ই মাহিনা পাইত। যাত্রার মাঝে মাঝে সঙ হইত। প্রথম সঙ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিচার। বিচারের বিষয় এটা— 'কামিনী কি যামিনী ?' এক ভট্টাচার্য মহাশয় নস্য লইয়া দীর্ঘ টিকি নাড়িয়া বলিলেন, "এটা কামিনী," আর-একজন বলিলেন, "এটা যামিনী"। ক্রমে এক হাতে ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দুই জনে আসরের দুই কোণে ছিলেন। ক্রমে ক্রমে আসরের মধ্যস্থলে আসিয়া পড়িয়া ঝুটাপুটি আরম্ভ করিয়া দিলেন। দর্শকবৃন্দ হাসিয়া অস্থির হইলেন।

পলাশির যুদ্ধের পর প্রায় ৪০ বৎসর ধরিয়া বঙ্গদেশের রাজপরিবর্তন ঘটে। অন্যান্য দেশে রাজবিপ্লবে যেরূপ বিশৃঙ্খলতা ও হাঙ্গাম-হুজ্জত হয়, এদেশে ততদূর ঘটে নাই। ইংরাজেরা এই ৪০ বৎসরের ভিতর ধীরে ধীরে প্রথমত সৈন্যসংক্রান্ত কার্যের ভার, তাহার পর রাজস্বের ভার, তাহার পর দেওয়ানির ভার, তাহার পর ফৌজদারির ভার, তাহার পর পুলিসের ভার গ্রহণ করেন। লড়াই ঝগড়া হয় নাই বলিলেই হয়; তথাপি রাজপরিবর্তন হইলেই লোকের মনে একটা ত্রাস হয়। সে ত্রাসের সময় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতেই পারে না। সে সময় যাঁহারা রাজ্য-সংক্রান্ত কার্য করেন, যাঁহারা সামাজিক শাসন করেন, তাঁহাদেরই খ্যাতি

ও প্রতিপত্তি অধিক হয়। তাই আমরা এই ৪০ বৎসরের মধ্যে বড়ো বড়ো লেখক, কবি, গ্রন্থকার দেখিতে পাই না। এ সময়কার বড়ো বড়ো লোক মহারাজা নন্দকুমার [রায়, ১৭০৫?-৭৫ খৃ.], মহারাজ নবকৃষ্ণ [দেব, ১৭৩৩-৯৭ খৃ.], দর্পনারায়ণ ঠাকুর [১৭৩১-৯৩ খৃ], নীলমণি ঠাকুর [মৃ. ১৭৯১ খৃ.], রাজা গোকুল ঘোষাল। ইঁহারা ইংরাজের চাকুরি করিয়া অথবা ইংরাজের সহিত কারবার করিয়া প্রভূত ধন, মান, পসার ও প্রতিপত্তি করিয়া গিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশের যথেষ্ট উপকার করিয়া গিয়াছেন। দশশালা বন্দোবস্তের পরও দেশে ঠিক শান্তি স্থাপিত হয় নাই, লোকের মনের ত্রাস যায় নাই। কারণ তখনো চুরি-ডাকাতি বড়োই অধিক হইত। কিন্তু তথাপি কলিকাতায় বিশেষ গোলযোগ ছিল না। এবং কলিকাতা হইতেই পাশ্চাত্য সভ্যতার জ্যোতি চারি দিকে বিকীর্ণ হইতে থাকে। সূক্ষ্ম ইতিহাসে যাইবার প্রয়োজন নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কলিকাতার প্রধান ব্যক্তি রাজা রামমোহন রায় [১৭৭২-১৮৩৩ খৃ], ইঁহার নিবাস খানাকুল কৃষ্ণনগর। ইনি চাতরার দেশগুরু ভট্টাচার্যের দৌহিত্র। কিন্তু ইনি আসিয়া কলিকাতায় বাস করেন এবং অনেক ভাষা শিক্ষা করেন। ইংরাজি ভাষা শিখিয়া হিন্দুদিগের পৌত্তলিকতার প্রতি ইঁহার আস্থা কমিয়া যায়। ইনি বেদান্ত ও উপনিষদের ধর্ম যথার্থ হিন্দুধর্ম বলিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করেন এবং বাংলায় গদ্য রচনার সূত্রপাত করেন। ইনিই প্রথম বলেন যে গবর্নমেণ্ট দেশের লোককে সংস্কৃত বা আরবি শিক্ষা না দিয়া ইংরাজি শিক্ষা দিন। ১৮১৭খৃ. গবর্নমেণ্ট যখন সংস্কৃত কলেজ [প্রতিষ্ঠা ১৮২৪ খৃ.] স্থাপনের চেষ্টা করেন, তখন ইনি ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ইনি একটি ইংরাজি স্কুল স্থাপন করেন [অ্যাংলো হিন্দু স্কুল, ১৮২২ খৃ.] এবং বাংলায় একখানি ব্যাকরণ [গৌড়ীয় ব্যাকরণ, ১৮৩৩ খৃ.] লিখেন। ইংরাজিতে অনেক গ্রন্থ এবং প্রবন্ধ থাকিলেও এ স্থলে আমরা তাহার উল্লেখ করিব না। তিনি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলে [১৮২৮ খৃ.] হিন্দুরা ধর্মলোপ হইবার ভয়ে এক ধর্মসভা স্থাপন করেন। সভায় রামমোহন রায়ের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হন গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। নৈহাটি নিবাসী প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক নীলমণি ন্যায়পঞ্চানন পূর্বাঞ্চলে নিমন্ত্রণে গিয়া একটি পিতৃ-

মাতৃহীন ব্রাহ্মণ শিশুকে বাড়ি লইয়া আসেন এবং তাহাকে ব্যাকরণ সাহিত্য ও ন্যায় শিক্ষা দেন। সেই বালকই পরিণামে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য নামে প্রসিদ্ধ হন।[১৮] নৈহাটি হইতে আসিয়া তিনি দিনকতক রামমোহন রায়ের নিকট চাকুরি করেন। পরে সে চাকুরি ছাড়িয়া দিয়া ধর্মসভার লেখক হন। রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্মের সম্বন্ধে কোনো পুস্তক লিখিলে গৌরীশঙ্কর তাহার প্রতিবাদ করিতেন। রামমোহন রায়ও আবার তাহার জবাব দিতেন। এইরূপে যে-সকল গ্রন্থ লিখিত হইত লোকে আগ্রহ সহকারে সেইগুলিই পাঠ করিত। কেহ বা রামমোহনের জয় দিত, কেহ বা গৌরীশঙ্করের জয় দিত। বলিতে গেলে বাংলায় গদ্যগ্রন্থ ও বিচার গ্রন্থের এই উৎপত্তি। গৌরীশঙ্কর 'সংবাদ ভাস্কর' নামে একখানি খবরের কাগজ বাহির করেন। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহার দেখা-দেখি 'সংবাদ প্রভাকর' বলিয়া আর-একখানি খবরের কাগজ বাহির করেন। তখন খবরের কাগজে রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্মনীতির আলোচনা হইত না। গদ্য রচনা, পদ্য রচনা এবং সে সময়কার হিন্দু-সমাজের ঘটনা লইয়া কাগজের কলেবর পূর্ণ হইত। গৌরীশঙ্কর প্রায়ই ঈশ্বর গুপ্তের প্রতি কটাক্ষ করিতেন এবং ঈশ্বর গুপ্তও গৌরীশঙ্করকে খুব গালি দিতেন। লোকে খুব আমোদ করিয়া পড়িত। 'সোমপ্রকাশ' বাহির হইবার পর এই শ্রেণীর সংবাদপত্রের প্রতিপত্তি কমিয়া আইসে।

রামমোহন রায়ের পর কলিকাতার পাশ্চাত্য-শিক্ষিত প্রধান ব্যক্তিদিগের মধ্যে রামকমল সেন [১৭৮৩-১৮৪৪ খৃ.] ও রাজা রাধা-কান্ত দেব [১৭৮৪-১৮৬৭ খৃ.]। রামকমল সেনের পিতৃনিবাস গরিফা। তিনি তথা হইতে কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজি শিক্ষা করেন এবং বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দাওয়ান হইয়া কলিকাতায় খুব পসার করিয়া ফেলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা নবকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র গোপী-মোহনের পুত্র। ইঁহারা দুই জনে দুই খানি অভিধান সংকলন করেন। রামকমল সেন বাংলায় [*A Dictionary in English and Bengalee,* ১৮৩৪ খৃ.] ও রাধাকান্ত দেব সংস্কৃতে। রামকমল সেনের পূর্বে আর-একখানি বাংলা অভিধান হইয়াছিল। সেখানি সুপ্রসিদ্ধ পাদরি কেরি সাহেব [William Carey, ১৭৬১-১৮৩৪ খৃ.] সংকলন করেন [*A Dictionary of the Bengalee Language,* ১৮১৮ খৃ]।

রামকমল সেনের অভিধানে বাংলা ভাষার প্রচলিত দেশী ও সংস্কৃত উভয়বিধ শব্দই দেখিতে প্যাওয়া যায় ; তাহার মধ্যে দেশীর ভাগই বেশি। রাধাকান্ত দেবের 'শব্দকল্পদ্রুম' [১৮১৯-৫৮ খৃ.] ইংরাজি ধরনের সংস্কৃতের প্রথম Encyclopædia। শব্দকল্পদ্রুমের পর সংস্কৃতে আরো Encyclopædia হইয়াছে, কিন্তু রাজা রাধাকান্ত দেব যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন সে-সমস্তই সেই প্রণালীতেই লিখিত। ইঁহারা দুজনেই ইংরাজি শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন এবং দেশে যাহাতে ইংরাজির বহুল প্রচার হয় সে বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্বর্গীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর [১৮২০-৯১ খৃ.] কলিকাতার একজন প্রধান ব্যক্তি। তাঁহার নিবাস ঘাঁটালের নিকটবর্তী বীরসিংহ গ্রামে। তিনি সংস্কৃত কলেজে পড়িবার জন্য কলিকাতায় আসেন, এবং তথায় ইংরাজি ও সংস্কৃতে বিলক্ষণ পারদর্শিতা লাভ করেন। তিনি ঐ কলেজের প্রিন্সিপাল হইয়াছিলেন এবং স্কুলসমূহের ইন্স্পেক্টর হইয়াছিলেন। তিনি অতি উদারচেতা. নির্ভীক ও স্বাধীনচেতা লোক ছিলেন। দয়াগুণে ও দানের প্রভাবে তিনি প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু বাংলাভাষার শ্রীবৃদ্ধির জন্য তিনি বিবিধ বিধানে চেষ্টা করিয়াছেন। যত দিন শিক্ষাবিভাগে কাজ করিয়া গিয়াছেন, তত দিন কিসে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ভালো করিয়া বাংলা লিখিতে পারেন, তিনি প্রাণপণে সে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সংস্কার ছিল সংস্কৃত ভালো করিয়া না শিখিলে ভালো বাংলা কেহ লিখিতে পারে না। এই সংস্কারের বশবর্তী হইয়া তিনি ১৮৫২ সালে সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন করেন। তখন বাংলায় একদল লেখক সৃষ্টি করা তাঁহার মূল উদ্দেশ্য ছিল। তিনি নিজে বাংলায় অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ বিষয়ক প্রস্তাবগুলি অতি সরল ভাষায় লিখিত। তিনি এইরূপ সরল ভাষায় অতি দক্ষতা সহকারে আপনার মত সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরা কেহই তাঁহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার বাংলাই ভালো বাংলা বলিয়া দেশে চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার বই পড়িয়াই অনেকে মানুষ হইয়াছেন। তাই আপামর সাধারণ সকলেই তাঁহাকে এখনো দেবতা বোধে পূজা করিয়া থাকে।

রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর [১৭৯৪-১৮৪৬ খৃ.] ব্রাহ্মসমাজের কর্তা হন। কিন্তু তাঁহার প্রতিভা সাহিত্যের দিকে বড়ো আসে নাই। রাজনৈতিক ব্যাপারে, বাণিজ্য ও ব্যবসায়ে তিনি তৎকালে বাংলার মধ্যে সর্বপ্রধান ব্যক্তি ছিলেন। রামমোহন রায়ের পর তিনি বিলাতে গিয়া যথেষ্ট আদর ও অভ্যর্থনা পাইয়াছিলেন। তাঁহার পর তাঁহার পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ [১৮১৭-১৯০৫ খৃ.] ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য হন। ব্রাহ্মধর্মে প্রগাঢ় আস্থা থাকায় ও সদাসর্বদা ঈশ্বর-চিন্তায় কালযাপন করায় লোকে তাঁহাকে মহর্ষি উপাধি দিয়াছেন। তিনি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র [প্রথম প্রকাশ ১৬ আগস্ট ১৮৪৩ খৃ.] একরকম প্রাণ ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা করিয়া, তত্ত্ববোধিনীতে নানা রূপ প্রবন্ধ লিখিয়া এবং উপনিষদগুলি বাংলায় তর্জমা করিয়া তিনি বাংলাভাষার বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরই ৺কেশবচন্দ্র সেন [১৮৩৮-৮৪ খৃ] ব্রাহ্ম-সমাজের একজন প্রধান নেতা হইয়া উঠেন। তিনি 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করিয়া স্বয়ং তাহার আচার্য পদবি গ্রহণ করেন। তিনি একজন প্রধান বক্তা ছিলেন। ইংরাজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই তিনি বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিতেন। তাঁহরো খ্যাতি-প্রতিপত্তি ভারতবর্ষ অতিক্রম করিয়া Europe ও Americaয় গিয়াছিল। তাঁহার লেখা ও তাঁহার বক্তৃতা অতি সরল ভাষায় লিখিত। উহাতে খাঁটি সংস্কৃতের ভাগ অতি কম। 'সেবকের নিবেদন' [১৮৮০-৮২ খৃ.] বলিয়া তিনি যে-কয়েক volume পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহা অতি বিশুদ্ধ বাংলায় লিখিত এবং তাহাতে তাঁহার ধর্মভাব বিলক্ষণ পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি যে নববিধান ধর্মের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন তাহাতে ভারতবর্ষীয় সকল ধর্মেরই সমন্বয় করা হইয়াছে।

এ পর্যন্ত যে-সকল প্রধান পুরুষের নামোল্লেখ করা গেল, তাঁহাদের প্রতিভা শুদ্ধ সাহিত্যে নহে, হিন্দুসমাজের আরো নানা ব্যাপারে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এখন যে-সকল ব্যক্তির নাম করিতেছি, সাহিত্যই ইঁহাদের মহারথ এবং ইঁহারাই সাহিত্যের মহারথী। ৺অক্ষয়কুমার দত্ত [১৮২০-৮৬ খৃ] এই মহারথীকুলের সর্বপ্রথম। ইনি ব্রাহ্মসমাজের ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ

ছিলেন। ইঁহার নিবাস চুপি [বর্ধমান জেলা]। ইনি বহু-দিন কলিকাতায় বাস করেন এবং জীবনের শেষাংশে গঙ্গাতীরে বালি গ্রামে বাস করেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ইঁহার সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম ও নীতি-বিষয়ক যে-সকল প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, সেইগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া বহু-কাল বঙ্গীয় বিদ্যালয়সমূহের স্কুলপাঠ্যে পরিগণিত ছিল। এই-সকল পুস্তকের বিষয় তিনি অধিকাংশই ইংরাজি হইতে সংগ্রহ করিয়া-ছিলেন। যদিও লোকে তাঁহাকে এই-সকল প্রবন্ধের জন্য অধিক চেনে, এবং তাঁহাকে মান্য করে; কিন্তু এগুলি তাঁহার প্রধান কার্য নহে। যে গ্রন্থের জন্য তাঁহার নাম ভারতবর্ষে চিরপ্রসিদ্ধ থাকিবে, তাহার নাম 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' [প্রথম ভাগ ১৮৭০, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৮৩ খৃ]। ১৮৭৯ সাল পর্যন্ত কী ইংরাজি, কী জর্মন, কী ফ্রেঞ্চ, কী লাটিন, কী বাংলায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে কোনো পুস্তক লেখা হইয়াছে, সে-সমস্তই তিনি তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়া ঐ পুস্তকের অনুক্রমণিকায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন। মূল গ্রন্থেও তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়া লিখিয়াছেন। সমস্ত ভারতবর্ষে যত প্রকার উপাসক সম্প্রদায় আছে মোটামুটি তাহাদের সকলেরই ইতিহাস, উপাসনা-প্রণালী ও ধর্মতত্ত্বের সারমর্ম লিখিয়া গিয়াছেন। অনেকে বলেন তিনি উইলসন সাহেবের [Horace Hayman Wilson, ১৭৮৬-১৮৬০ খৃ.] *Hindu Sects* [*Sketchcs of the Religious Sects of the Hindus*, ১৮৪৬ খৃ.]-নামক গ্রন্থ হইতে সকল কথাই লইয়াছেন। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। উইলসনের *Hindu Sects*-এ যাহা আছে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি কথা তাঁহার পুস্তকে আছে। প্রাচীন লোকের মুখে শুনিয়াছি যে তিনি উইলসনের *Hindu Sects* হইতে কিছুই লন নাই। তৎকালে কলিকাতায় একজন অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন। এ ব্যক্তি কলিকাতায় কী বাঙালি, কী হিন্দুস্থানি, কী উড়িয়া, কী মাড়োয়ারি সকল জাতিরই সহিত বেশ মিলিতে পারিতেন। তিনি সকল সম্প্রদায়ের সহিত মিলিয়া তাহাদের নিগূঢ় খবরগুলি আনিয়া দিতে পারিতেন। তিনিই উইলসন সাহেবেরও মুরুব্বি, তিনিই অক্ষয়কুমার দত্তেরও মুরুব্বি। সুতরাং দুইখানি পুস্তকের অনেক কথা একই রূপে লিখিত হইয়াছে। আমাকে যাঁহারা বলিয়াছেন, এই ব্যক্তির সহিত তাঁহাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত [১৮২৪-৭৩ খৃ.] হিন্দু স্কুলের ছাত্র। তিনি প্রথম হইতেই ইংরাজি শিক্ষা পাইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নিবাস সাগরদাঁড়ি। তিনি কলিকাতা সদর দেওয়ানি আদালতের উঁকিল ছিলেন। মধুসূদন হিন্দু স্কুলে পড়িতে পড়িতেই পদ্য লিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি অত্যন্ত উদ্ধত স্বভাবের লোক ও বড়োই এক-গ্‌ঁইয়া ছিলেন। তিনি পিতার সহিত বিবাদ করিয়া খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হন। পরে কলিকাতা হইতে পলাইয়া মান্দ্রাজে গিয়া এক ফিরিঙ্গি রমণীকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার সহিত ঝগড়া করিয়া পুনরায় কলিকাতায় আসিয়া পদ্য লিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি অনেক ভাষা শিখিয়াছিলেন এবং সকল ভাষা হইতেই ভালো ভালো ভাব বাছিয়া লইয়া আপনার কবিতার পুষ্টিসাধন করেন। এই সময়ে যে-কেহ পদ্য লিখিত, মিল করিয়া লিখিত। মাইকেল বলেন এরূপ মিল করিয়া লিখিতে গেলে ভাব প্রকাশের অসুবিধা হয়। তাই তিনি মিলের বন্ধন কাটাইয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিতে আরম্ভ করেন। এ সময়ে অনেকেই তাঁহাকে ঠাট্টা করিয়াছিল, এমন-কি কোনো পণ্ডিত তাঁহার 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে বিদ্রূপ করিবার জন্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে ['ছুচ্ছুন্দরীবধ', জগদ্বন্ধু ভদ্র -রচিত] নামক একখানি কাব্য রচনা করিয়া-ছিলেন। কিন্তু সে কথা অনেকেরই মনে নাই। মাইকেলের 'মেঘনাদ-বধ' [১৮৬১ খৃ.] এখন বাংলার সর্বোৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া সর্বত্র পরিচিত। তখন নাটক লিখিতে গেলে সকলেই সংস্কৃত নাটকের অনুকরণ করিত। মাইকেল ইহার বড়ো বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি নূতন ধরনে 'শর্মিষ্ঠা নাটক' [১৮৫৯ খৃ.] লিখিলেন। পাইকপাড়া রাজ-বাটীর থিয়েটারে বিপুল আয়োজনের সহিত উহার অভিনয় হইল। অভিনয় খুব জমিয়া গেল। নাটকে সংস্কৃতের অনুকরণ এই হইতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। একজন সমালোচক বলিয়াছেন—

"Michael Madhusudan Datta was wayward as a son, wayword as a husband, wayward as a father, way-ward as a student, but his waywardness in poetry alone payed."[১৯]

কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮৩৮-১৯০৩ খৃ.] মাইকেলের

কাব্যের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম মাইকেলের কাব্যের সমালোচনা করেন। মাইকেলের কাব্য পড়িয়াই তাঁহার কবিতা লিখিতে ইচ্ছা হয়। তাঁহার 'কবিতাবলী' [১৮৭০ খৃ.] সকল বাঙালিরই অতি আদরের জিনিস। বঙ্কিমবাবু তাঁহার 'বৃত্রসংহারে'র [১৮৭৫-৭৭ খৃ.] সুদীর্ঘ সমালোচনা করেন। কিন্তু বৃত্রসংহার জনসমাজে বিশেষ আদর পায় নাই। তাঁহার 'দশমহাবিদ্যা'য় [১৮৮২ খৃ.] তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। যাঁহারা দশমহাবিদ্যা পড়িয়াছেন ও বুঝিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মজিয়াছেন। কিন্তু পড়িয়া বুঝা একটু বিশেষ শিক্ষাসাপেক্ষ।

হেমবাবুর ন্যায় রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও [১৮২৭-৮৭ খৃ.] বাংলায় কবিতা লিখিয়া বিলক্ষণ যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার মহাকাব্য 'পদ্মিনী [উপাখ্যান', ১৮৫৮ খৃ.] জনসমাজে যথেষ্ট আদর পাইয়াছে।

ইঁহাদের পর আমাদের খ্যাতনামা কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮৬১-১৯৪১ খৃ]। কবিতাবলী ও গীতাবলীর মধুর স্বরে ও মধুর ভাবে কেবল বঙ্গবাসী নয় সমস্ত জগৎকে তিনি মুগ্ধ করিয়াছেন। তিনি এখানে উপস্থিত আছেন ও তাঁহার সম্মুখে তাঁহার গুণগান করা প্রণালী-বিরুদ্ধ বলিয়া ইচ্ছাসত্ত্বেও অধিক বলিতে পারিলাম না।

২৪ পরগনার কথা বলিতে গিয়া বঙ্কিমবাবু সম্বন্ধে যাহা-কিছু বলিবার ছিল বলিয়াছি। কলিকাতায় কত নভেল-লেখক ছিলেন বা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে রমেশবাবুর [রমেশচন্দ্র দত্ত, ১৮৪৮-১৯০৯ খৃ.] নাম না করিলে নিতান্ত দোষের বিষয় হইবে। রমেশবাবু বঙ্গমাতার একটি কৃতী সন্তান। ইঁহার পূর্বপুরুষেরা তিন-চারি পুরুষ ধরিয়া, এমন-কি ইংরাজ রাজত্ব আরম্ভ হইবার পূর্ব হইতে, ইংরাজিতে দক্ষ ও বৃহস্পতি ছিলেন। রমেশবাবু নিজে সিবিল সার্বিসে অনেক উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন এবং পরে বরোদা রাজ্যের দেওয়ান হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার রাজকার্যে যত প্রতিপত্তি, সাহিত্যে তত নহে। কী ইংরাজিতে কী বাংলাতে এই দুয়েই তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ঐতিহাসিক নভেল-লেখকদিগের মধ্যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। তিনি ঋগ্বেদের বাংলা তর্জমা ['ঋগ্বেদ-সংহিতা', ১৮৮৫-৮৭ খৃ.] প্রচার করিয়া বঙ্গদেশের বিশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, প্রথম প্রথম নাটকগুলি সংস্কৃতের অনুকরণে লিখিত হইত, কিন্তু অভিনয় ইংরাজি ধরনেই হইত। কারণ সেকালে হিন্দুদের যে প্রেক্ষাগৃহ বা থিয়েটার ছিল, যেরূপে সেই গৃহ নির্মিত ও সুসজ্জিত হইত, তাহা এখনো লোকে জানে না। ৮০ বৎসর পূর্বে সে কথা জানিবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। সুতরাং থিয়েটারও ইংরাজি ধরনে হইত, অভিনয়ও ইংরাজি ধরনে হইত, পট-পরিবর্তনাদিও ইংরাজি ধরনে হইত। মাইকেলও ইংরাজি ধরনে নাটক লিখিতে আরম্ভ করিলেন, থিয়েটারটা পুরা ইংরাজি ধরনের হইয়া গেল। প্রথম ২০/৩০ বৎসর থিয়েটার বড়োলোকের বাড়িতেই হইত। তাঁহারা যাঁহাদের নিমন্ত্রণ করিতেন তাঁহারাই দেখিতে পাইতেন, অন্য কেহ পাইত না। ১৮৭১/ ১৮৭২ সালে পেশাদারি থিয়েটার আরম্ভ হয়। প্রথম পেশাদারি থিয়েটার এক ভদ্রলোকের দালানে হইয়াছিল [মধুসূদন সান্যালের বাড়ির উঠানে ৭ ডিসেম্বর ১৮৭২ খৃ. 'নীলদর্পণ' অভিনয়], তারপর ইংরাজি ধরনে থিয়েটার গৃহ হইতে লাগিল। মাইকেলের পর প্রধান নাটক-লেখক দীনবন্ধু মিত্র। ইনি সামাজিক ব্যাপার লইয়াই নাটক লিখিতেন। সামাজিক ব্যাপারে ঠাট্টা করিবার ক্ষমতা তাঁহার অসীম ছিল। যদিও সেই সময়ের ব্যাপারেই তাঁহার নাটকগুলি খাটে, কিন্তু বাঙালির পক্ষে উহা চিরদিনই আমোদের বস্তু হইয়া থাকিবে। কারণ দীনবন্ধুবাবুর লেখা বড়োই সরল এবং তাঁহার ভাব বড়োই গভীর। সমাজের মধ্যে যেখানে যে দুর্নীতিটুকু ছিল, তিনি সেটুকু খুঁজিয়া দেখাইয়া দিতেন। আর লোকে হাসিয়া অস্থির হইত। তাঁহার 'নীলদর্পণ' [১৮৬০ খৃ.], 'নবীন তপস্বিনী' [১৮৬৩ খৃ.], 'লীলাবতী' [১৮৬৭ খৃ.], 'জামাইবারিক' [১৮৭২ খৃ.], 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' [১৮৬৬ খৃ.] ইত্যাদির অভিনয় আজিও হয় এবং লোকেও এই-সকল গ্রন্থ পড়িয়া বড়োই আনন্দ বোধ করে। প্রথমে ইংরাজি শিখিয়া, মদ খাইয়া, অখাদ্য খাইয়া, যে-সকল যুবক উচ্ছৃঙ্খলভাবে দিন যাপন করিত, তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিবার জন্য দীনবন্ধু মিত্র যে 'সধবার একাদশী' [১৮৬৬ খৃ.] লিখিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হাস্য-রসের নাটক আজিও বাংলায় হয় নাই। তাহারা কথায় কথায় Shakespeare quote করিত, Byron quote করিত, কেহ হিতোপ-

দেশ দিতে আসিলে ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দিত ; কাহারো কথা শুনিত না, কাহাকেও মানিত না। কিন্তু তাহাদের পরিণাম অতি বিষম হইত। দীনবন্ধুবাবু সেইটি সধবার একাদশীতে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন।' দীনবন্ধুর পর নাটককার্যদিগের মধ্যে ⁶গিরিশচন্দ্র ঘোষ [১৮৪৪-১৯১২ খৃ.] প্রধান। তিনি বহু গভীর ভাবের নাটক লিখিয়াছেন। তিনি অনেক বাংলা নভেল ও অনেক ইংরাজি নাটক অবলম্বনে বহু-সংখ্যক নাটক লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অমিত্রাক্ষর মাইকেল হইতেও বিভিন্ন। মাইকেলের লাইনে লাইনে অক্ষরগুলি মিলিত, ইঁহার তাহাও মিলিত না, কোনো লাইনে ষোলোটি অক্ষর কোনোটিতে বা মোটে তিনটি। সংস্কৃত নাট্য-শাস্ত্রকারেরা যে শান্তিরস লইয়া নাটক লিখিতে একবারে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, যে শান্তিরসকে তাঁহারা নাটক লিখিবার সময় কাব্যের নবরস হইতে একেবারে ছাঁটিয়া দিয়া গিয়াছেন, গিরিশ সেই শান্তিরস লইয়া 'বুদ্ধদেব [চরিত', ১৮৮৭ খৃ.], 'চৈতন্য [লীলা' প্রথম অভিনয় ১২৯১ ব.], 'শঙ্করাচার্য' [১৩১৬ ব.] প্রভৃতি অনেকগুলি নাটক লিখিয়া বঙ্গসমাজকে মোহিত করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত সেবকেরা এটিকে তাঁহার উচ্ছৃঙ্খলতা বলিয়া থাকেন। এই-সকল নাটক সম্বন্ধে মতামত দুই প্রকার হইলেও তাঁহার সামাজিক নাটক সম্বন্ধে কোনো মতভেদ নাই। সেগুলি অতি গভীর ভাবের সহিত লিখিত।

ইদানীং যাঁহারা সামাজিক নাটক লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অমৃতলাল বসুর [১৮৫৩-১৯২৯ খৃ.] বিশেষ উল্লেখ করিতে পারিতাম, কিন্তু অমৃতবাবু আমাদের মধ্যেই আছেন, সম্ভবত এই সভাতেই উপস্থিত আছেন। জীবিত ব্যক্তির উল্লেখ সাধ্যমতো পরিহার করিতেছি, কাহাকে রাখিয়া কাহার নাম করিব। এই কারণে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের [১৮৬৩-১৯১৩ খৃ.] নাম পরিহার করিতে পাইলে কী সুখের হইত। কিন্তু সে সুখে আমরা বঞ্চিত। তিনি গত বর্ষেই আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন ; আজিকার সভায় উপস্থিত হইয়া আনন্দসম্মিলনে তিনি যোগ দিলেন না। নবদ্বীপের [কৃষ্ণনগরের] লোক হইলেও কলিকাতা তাঁহাকে ভুলিবে না। তিনি অনেকগুলি নাটক লিখিয়া সর্বসাধারণের আনন্দ বর্ধন করিয়াছিলেন। তৎপূর্বে

তিনি হাস্যরসের রচনায় দেশের মধ্যে অদ্বিতীয় ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি সাহিত্যে যে রসের ধারা আনিয়াছিলেন, তাহা বাংলা সাহিত্যে নূতন। তাঁহার স্বদেশভক্তিমূলক গানগুলিও দেশকে মাতাইয়াছে। অদ্য বাংলার সাহিত্যসেবীদের সম্মিলনে তাঁহার অকাল-মৃত্যুর জন্য আমরা পরিতাপ প্রকাশ করিতেছি।

রামনারায়ণ পণ্ডিত মহাশয় অধ্যাপক ছিলেন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ব্যারিস্টার ছিলেন। দীনবন্ধু মিত্র ডাক বিভাগের বড়ো চাকরি করিতেন। ইঁহাদের নাটকগুলি ভালো হইলেও থিয়েটার ও অভিনয়ে বিশেষ বিজ্ঞতা না থাকায় একটু লম্বা হইয়াছে। সময়ে সময়ে একঘেয়ে হইয়া যায়, সময়ে সময়ে নরম হইয়া যায়; পড়িতে পড়িতে মনে হয় এ কথাটা এর মুখে না দিয়া ওর মুখে দিলে ভালো হইত। গিরিশবাবু আর অমৃতবাবু দুজনেই থিয়েটারের লোক। নিজেই সাজেন, নিজেই থিয়েটার সাজান, নিজেই নাট্যাচার্য, নিজেই নট, নিজেই সূত্রধর, নিজেই কুশীলব। ইঁহাদের নাটকগুলিতে ও-সকল দোষ কিছুই নাই। ইঁহারা যাবজ্জীবন প্রেক্ষাগৃহে থাকিয়া প্রেক্ষকবর্গের গতিবিধি, মনের ভাব বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া তাহাদের যাহা ভালো লাগে তাহাই দিতে শিখিয়াছেন। তবে এক মুশকিল হইয়াছে; যাহারা পয়সা দেয় ইঁহাদের টান সেই দিকেই বেশি। পয়সা দেয় মুদি বাকালি, তাহারা চায় নাচ আর গান, সুতরাং ইঁহাদিগকেও গ্রন্থের মধ্যে নাচ ও গান অধিক দিতে হয়। যদি শিক্ষিতগণের সংখ্যা প্রেক্ষকগণের মধ্যে অধিক থাকিত, ইঁহাদের পুস্তক আরো ভালো হইতে পারিত। একজন নাটক লেখক একদিন আমার কাছে বলিয়াছিলেন, "আমরা যাবজ্জীবন খাটিয়া নাটকের মর্ম কতক জানিতে পারিয়াছি; কিন্তু জানিতে পারিলে কী হয়, আমরা মুদি বাকালির জন্য লিখিব বৈ তো নয়। ভদ্রলোকের হয় পয়সা নাই, নয় তো তাঁহারা এ বিষয়ের জন্য পয়সা খরচ করিতে রাজি নন।"

কলিকাতায় যে কয়জন লোক সাহিত্য-সেবায় অত্যন্ত বড়ো হইয়াছিলেন তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিলাম। ইহা ছাড়া কলিকাতায় আর যে কত লোক আছেন, তার আর ইয়ত্তা করা যায় না। এই অল্প সময় মধ্যে তাঁহাদের সকলের নামোল্লেখ অসম্ভব। এরূপ নামোল্লেখের

আরো দোষ আছে। অনেক সময়ে রামের নাম উল্লেখ করিয়া দেখি শ্যামের নাম না করিলে চলে না, আবার শ্যামের নাম করিয়া দেখি কৃষ্ণের নাম না করিলে চলে না। রাম শ্যাম কৃষ্ণ তিনজনের নাম করিলাম, নিজের কতকটা তৃপ্তি হইল, কিন্তু যাদু মাদু রাদুরও অনেকগুলি গোঁড়া আছেন। তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন, "দেখলে, লোকটা কী একচোখো, রাম শ্যাম কৃষ্ণের নাম কল্লে, আর আমাদের যাদু মাদু রাদুর নাম কল্লে না। যাদু রাদু মাদুই কি কম।" তাই ভাবিয়া চিন্তিয়া যাঁহাদের সম্বন্ধে কোনো গোল নাই, কোনো গোল হইবার সম্ভাবনা নাই, কেবল তাঁহাদের নাম করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

কলিকাতা এতকাল ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল। আমাদের পরম ভক্তিভাজন রাজরাজেশ্বর [পঞ্চম জর্জ] আসিয়া তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের হিতার্থ ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে উঠাইয়া দিল্লি লইয়া গিয়াছেন [১২ ডিসেম্বর ১৯১১ খৃ.]। ইহাতে বাংলার অনেকে দুঃখিত, কিন্তু আমি বলি ইহাতে আমাদের বাঙালির দুঃখ করিবার কিছু নাই, বরং আনন্দিত হইবার কথা ; কারণ বিশাল ইংরাজ সাম্রাজ্যের মধ্যে কলিকাতার স্থান লণ্ডনের নিচেই। আর বিশাল আশিয়া খণ্ডের মধ্যে কলিকাতার স্থান Pekin-এর নিচে। ভারতের রাজধানী উঠিয়া যাওয়ায় কলিকাতার কিছু ক্ষতি হয় নাই। রাজরাজেশ্বর স্বয়ং বলিয়া গিয়াছেন it is the premier city in India. যে কলিকাতা সেই কলিকাতাই রহিয়াছে ও রহিবে। শিল্প বাণিজ্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানে কলিকাতা যে উচ্চপদ লাভ করিয়াছে, তাহা কিছু ভারত-গবর্নমেণ্টের রাজধানী ছিল বলিয়াই হয় নাই। সুতরাং ভারত-গবর্নমেণ্টের রাজধানী উঠিয়া গেলে কলিকাতার কিছুই ক্ষতি নাই। বরং বাংলার রাজধানী ও বাংলার নিজস্ব বলিয়া উহার উপর সকল বাঙালিরই টান অধিক হইবে। সকল বাঙালিই প্রাণপণে চেষ্টা করিবে কিসে কলিকাতার মান বজায় থাকে। দুই বাংলা এক হইয়া যাওয়ায় [বঙ্গভঙ্গ রদ— ১৯১১ খৃ.] এই টান আরো বাড়িয়া উঠিবে। বাংলার লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্নর শুধু বাঙালিরই ছিলেন না। তিনি বেহারি ও উড়িয়াদিগেরও লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্নর ছিলেন। এখন বঙ্গেশ্বর বাংলার একেশ্বর। আগে বঙ্গেশ্বর বাংলা সাহিত্যের উন্নতি সাধন করিলে বেহারিরা ও উড়িয়ারা

বলিয়া উঠিত, আমাদের দিকে বঙ্গেশ্বরের দৃষ্টি নাই। এখন আর সে কথা কেহ বলিবে না। এখন বঙ্গেশ্বর জানেন বাঙালিরাই আমার প্রজা। বাঙালিরাও জানেন বঙ্গেশ্বরই আমাদের প্রভু। ভাগের প্রভু নহেন, পুরাই প্রভু।

এই তো আমাদের নিজের কথা বলিলাম। আমাদের যাহা পুঁজিপাটা ছিল, খুলিয়া বলিলাম ও খুলিয়া দেখাইলাম। আমরা সমস্ত বাঙালিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি। তাঁহারা আসিয়া উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত সাহিত্য-চর্চা করেন, এইজন্য আমরা তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়াছি। তাঁহারাও আগ্রহের সহিত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা কে এ কথা একবার বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমার বিশ্বাস বাঙালি একটি আত্মবিস্মৃত জাতি। বিষ্ণু যখন রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন কোনো ঋষির শাপে তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন। তিনি ধরাধামে আসিয়া ঈশ্বরেরই লীলা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তিনি যে ঈশ্বর এ কথা তিনি কখনো বলেন নাই, কার্যে ও কর্মে কখনো দেখানও নাই এবং কখনো তিনি স্মরণ করেন নাই। বাঙালিও তেমনি। দেড় শত বৎসর পূর্বে একজন সাহেব বলিয়া গিয়াছেন, বাংলার জমি এত উর্বরা, বাংলায় এত শস্য উৎপন্ন হয়, বাংলায় এত বড়ো বড়ো নদী আছে, নৌকাযোগে বাংলার এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত এত সহজে যাওয়া যায়, ইহার জঙ্গলে এত অদ্ভুত পদার্থের উৎপত্তি হয়, ইহাতে এত লোক আছে, তাহারা এইরূপ পরিশ্রমী ও মিতাচারী যে বোধ হয়, বাংলা অতি প্রাচীন কালে সভ্যতার অতি উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। যে কেহ মন দিয়া বাংলার কথা ভাবিয়াছে, বাংলাকে ভালো করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহাকেই বলিতে হইবে বাংলা একটি অতি প্রাচীন সভ্যদেশ। বাংলার ইতিহাস এখনো তত পরিষ্কার হয় নাই যে, কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে বাংলা Egypt হইতে প্রাচীন অথবা নূতন। বাংলা Nineva ও Babylon হইতেও প্রাচীন অথবা নূতন। বাংলা চীন হইতেও প্রাচীন অথবা নূতন। কিন্তু এ কথা স্থির, বাংলা নূতন দেশ নহে। যখন আর্যগণ মধ্য-এশিয়া হইতে পঞ্জাবে আসিয়া উপনীত হন, তখনো বাংলা সভ্য

ছিল। আর্যগণ আপনাদের বসতি বিস্তার করিয়া যখন এলাহাবাদ পর্যন্ত উপস্থিত হন, তখন বাংলার সভ্যতায় ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহারা বাঙালিকে ধর্মজ্ঞানশূন্য এবং ভাষাশূন্য পক্ষী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। মহাভারতে বাংলাকে ঘটোৎকচের লীলাক্ষেত্র বলা হয়।

বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্বে বাঙালিরা জলে ও স্থলে এত প্রবল হইয়াছিল যে, বঙ্গরাজের একটি ত্যাজ্যপুত্র সাত শত লোক লইয়া নৌকাযোগে লঙ্কাদ্বীপ দখল করিয়াছিলেন। তাঁহারই নাম হইতে লঙ্কাদ্বীপের নাম হইয়াছে সিংহলদ্বীপ[২০]। রামায়ণে লঙ্কাদ্বীপের নাম সিংহলদ্বীপ কোথাও নাই, কিন্তু ইহার পরে উহার লঙ্কা নাম উঠিয়া গিয়া ক্রমে সিংহল নাম সংস্কৃত সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বড়ো বড়ো খাঁটি আর্যরাজগণ, এমন-কি যাঁহারা ভারতবংশীয় বলিয়া আপনাদের গৌরব করিতেন, তাঁহারাও বিবাহসূত্রে বঙ্গেশ্বরের সহিত মিলিত হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু বঙ্গদেশের শ্রীবৃদ্ধি রাজার জন্য নহে, রাজনীতিতে বঙ্গ কখনোই তত প্রবল হয় নাই। খৃস্টীয় পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ও আর-একবার খৃস্টীয় নবম শতাব্দীতে বাংলা নানা দেশ জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, এবং অনেকটা কৃতকার্যও হইয়াছিল। তাই বলিতেছিলাম বাংলার গৌরব রাজনীতিতে নহে, যুদ্ধবিগ্রহেও নহে। বাংলার গৌরব শিল্পে, বাণিজ্যে, কৃষিকার্যে এবং উপনিবেশ সংস্থাপনে। যখন লোকে লোহার ব্যবহার করিতে জানিত না, তখন বেতে-বাঁধা নৌকায় চড়িয়া বাঙালিরা নানা দেশে ধান চাউল বিক্রয় করিতে যাইত। সে নৌকার নাম ছিল 'বালাম নৌকা'। তাই সে নৌকায় যে চাউল আসিত তাহার নাম বালাম চাউল হইয়াছে ; বালাম বলিয়া কোনো ভাষার কথা আছে কি না জানি না, কিন্তু তাহা সংস্কৃতমূলক নহে। তমলুক বাংলার প্রধান বন্দর। অশোকের সময় এমন-কি বুদ্ধের সময়ও তমলুক বাংলার বন্দর ছিল। তমলুক হইতে জাহাজ-সকল নানা দেশে যাইত। ফা-হিয়েন তমলুক হইতেই গিয়াছিলেন। এ কথা সকলেই জানেন।[২১] অনেক প্রাচীন গ্রন্থেও তমলুকের নাম পাওয়া যায়। তমলুকের সংস্কৃত নাম তাম্রলিপ্ত। তাম্রলিপ্ত শব্দের অর্থ কী, সংস্কৃত হইতে তাহা বুঝা যায় না। সংস্কৃতে

তাম্রলিপ্তির মানে তামায় লেপা। কিন্তু তমলুকের নিকট কোথাও তামার খনি নাই। তমলুক হইতেই যে তামা রপ্তানি হইত তাহার কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। বহু প্রাচীন সংস্কৃতে উহার নাম দামলিপ্তী। অর্থাৎ উহা দামলজাতির একটি প্রধান নগর। বাংলায় যে এককালে দামল বা তামল জাতির প্রাধান্য ছিল, ইহা হইতে তাহাই কতক বুঝা যায়। এখনকার anthropologistsরা স্থির করিয়াছেন যে, বাংলা মঙ্গোল ও দ্রাবিড় জাতির মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে।[২২] আর্যগণ এখানে অতি অল্প দিনই আসিয়াছেন। এই কথায় অনেকেই অত্যন্ত বিরক্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। কারণ বাঙালিরা কয়েক শত বৎসর ধরিয়া যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছে, তাহাতে আপনাদিগকে আর্যজাতির বংশ বলিয়া গৌরব করে এবং আর্যদিগের গৌরবে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করে। সেদিক হইতে দেখিতে গেলে তো দেখা যায় যে, আর্যগণ আবর্তে আবর্তে সরস্বতী তীর হইতে সমুদ্রের উপকূল পর্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। যেমন নিবাতনিষ্কম্প পুষ্করিণীর জলের এক কোণে একটি ঢিল ফেলিয়া দিলে চারি দিকে আবর্ত হইতে থাকে; প্রথম আবর্ত যত উঁচু হয়, পরেরটি তাহা অপেক্ষা নিচু, তাহার পরেরটি তাহা অপেক্ষা নিচু; আর কোণে উপস্থিত হইবার সময় সে আবর্ত অতি অল্পই দেখা যায়। সেইরূপ আর্য-আবর্ত সমুদ্রের উপকূল বঙ্গদেশে অতি অল্পই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। এমন-কি অনেক আর্যগ্রন্থে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে আসিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। সেকালে শ্রাদ্ধ করিতে বসিলে সর্বাপেক্ষা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে পাত্রান্ন খাওয়াইতে হইত; অর্থাৎ তিনি যেন শ্রাদ্ধকারীর পিতৃপুরুষগণের স্থান গ্রহণ করিয়াছেন এবং পিতৃপুরুষগণকে যে-সকল খাদ্যদ্রব্যাদি দেওয়া যাইতেছে, তিনি তাহা খাইতেছেন। এখনো অনেক দেশে জীবন্ত ব্রাহ্মণ দিয়াই শ্রাদ্ধ করে। ভারতের পূর্বাঞ্চলে ঐ কার্য দর্ভময় ব্রাহ্মণের করিতে হয়। অর্থাৎ এক গোছা কুশ লইয়া তাহাকে মানুষের আকার করিয়া গাঁথিতে হয়। তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া কল্পনা করিয়া লইতে হয় এবং পিতৃপুরুষের উদ্দেশে প্রদত্ত সকল জিনিস তাঁহাকে প্রদান করিতে হয়। বলা বাহুল্য বাংলাদেশে

বহু-কাল পূর্ব হইতেই দর্ভময় ব্রাহ্মণে শ্রাদ্ধ করিতে হইয়াছিল। জীবন্ত ব্রাহ্মণে শ্রাদ্ধ করিতে হইলে ব্রহ্মাবর্তের ব্রাহ্মণই সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত। বাংলাদেশের ব্রাহ্মণ একেবারেই প্রশস্ত নহে। ইহার কারণ অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, আর্য ভিন্ন অন্য কোনো জাতি বঙ্গদেশে প্রবল ছিল। এখানে যে-সকল ব্রাহ্মণ বাস করিত তাহারা ব্রাহ্মণের মধ্যেই গণ্য হইত না। বেদে লেখা আছে, যদি কোনো ব্রাহ্মণ মগধ দেশে বাস করেন তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মণ সমাজে নিকৃষ্ট হইয়া যান। বাংলা তো আরো দূরে। এখানে বাস করিলে তিনি যে আরো নিকৃষ্ট হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

৭৩২ খৃ. অব্দে যখন যশোবর্মদেব কনৌজের রাজা, বৈদিক-চূড়ামণি ভবভূতি তাঁহার রাজকবি, সেই সময়ে বঙ্গদেশের কোনো রাজা বৈদিকযজ্ঞের জন্য তাঁহার নিকটে ব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠান। সেই যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ বাংলাদেশে আসেন, তাঁহাদের হইতেই বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হয়।[২৩] ইহার পূর্বেও অনেকবার এদেশে ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিশেষ উপকার হওয়ার কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। পঞ্চব্রাহ্মণের সন্তানসন্ততিগণ এদেশে আসিয়া প্রথম প্রথম বড়ো একটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের আসিবার পরেই বাংলাদেশে এক প্রবল বৌদ্ধ রাজবংশ স্থাপিত হয়। তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের বিদ্যা, বুদ্ধি ও নিষ্ঠাদিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের হস্তে নানাবিধ রাজকর্মের ভার দিতেন। তথাপি বৌদ্ধগণই এদেশে প্রবল ছিল। কুলগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, বৌদ্ধদিগের সহিত ব্রাহ্মণদিগের প্রাণপণ করিয়া বিচার করিতে হইত। মুসলমানেরা বৌদ্ধমঠগুলিকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবার পর এদেশে পঞ্চব্রাহ্মণ-সন্তানদিগের প্রভাব বিস্তার হয় এবং দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য দেশসমূহ হইতে অনেক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাদিগকে সাহায্য করেন।

পূর্বেই বলিয়াছি বাংলার গৌরব শিল্পে বাণিজ্যে কৃষিকার্যে ও উপনিবেশে। শিল্পশাস্ত্র সম্বন্ধে যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পুস্তক পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে খৃ. পূ. ৪র্থ শতাব্দীতে বাংলাদেশে

নানা প্রকার রেশমের কাপড় প্রস্তুত হইত। সর্বোৎকৃষ্ট পত্রোর্ণা কেবল বাংলায়ই পাওয়া যাইত। তদ্ভিন্ন নিজ বঙ্গে এবং পৌণ্ড্রদেশে অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে উৎকৃষ্ট ক্ষৌম প্রস্তুত হইত। ভারতবর্ষে অন্য দুই-একটি দেশেও রেশম ছিল, কিন্তু তাহা তত ভালো নহে। ঐ গ্রন্থেই আরো দেখিতে পাওয়া যায় যে তুলার কাপড়ও বাংলায় প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত এবং অতি উৎকৃষ্ট ছিল।[২৪]

মগধ সাম্রাজ্যে দুইটি মাত্র প্রধান বন্দর ছিল। একটি ভরতকচ্ছ ভড়োঁচি [ভরুকচ্ছ, বর্তমান ব্রোচ] ও আর একটি তমলুক। ভরতকচ্ছ হইতে আরল্‌সাগর পার হইয়া লোকে বাণিজ্য করিতে যাইত। এবং তমলুক হইতে পূর্ব উপদ্বীপ চীন ও ভারতসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে যাইত। ভরুচ্ছের সহিত আমাদের বড়ো সম্পর্ক নাই, কিন্তু বাংলা হইতে বহু-সংখ্যক লোক জাহাজে সমুদ্র পার হইয়া নানা দেশে যাইত, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধদের 'দশভূমীশ্বর'[২৫] নামক গ্রন্থে লেখা আছে, "তোমরা নির্বাণের পথে অগ্রসর হইতেছ, কর্ম করো, শীলব্রত লও, কিন্তু কিছু দিন পরে দেখিবে এ-সকলে কিছু উপকার হইতেছে না। যখন পাটলিপুত্র হইতে কেহ সমুদ্রের পারে ব্যাবসা করিতে যাইত, সে ঘোড়া গাড়ি উট বোঝাই দিয়া নানাবিধ দ্রব্য লইয়া যাইতে লাগিল; কিন্তু তাম্রলিপ্তিতে উপস্থিত হইয়া দেখিল এ-সকলে কোনো কাজই হইবে না। সমুদ্রে উটও যাইবে না, ঘোড়াও যাইবে না, গাড়িও যাইবে না। তখন নূতন প্রকার যানবাহনের আবশ্যক হইবে।" সেইরূপ কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখিল শীলব্রতাদির দ্বারা কিছুই হইতেছে না। তখন যানের আবশ্যক। এই দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে, সমুদ্রযাত্রা সেকালে অভ্যস্ত ছিল। খৃ. পঞ্চম শতাব্দীতে ফা-হিয়েন তমলুকে জাহাজে আরোহণ করিয়া স্বদেশযাত্রা করিয়াছিলেন।

'দশকুমারচরিতে' লেখা আছে, তমলুক হইতে জাহাজে গিয়া তিনি রাক্ষসদের দ্বীপে উপস্থিত হন এবং তথায় রামেষু নামক এক যবনের সহিত যুদ্ধ হয়।[২৬] অতদিনের কথায় দরকার নাই; মুসলমান অধিকারের পরে ১২৭৬ সালেও তমলুকের কয়েকজন বৌদ্ধ ভিক্ষু পেলানে [পেনাঙ্] গিয়া বৌদ্ধধর্মের সংস্কার করিয়াছিলেন। এবং

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে রামচন্দ্র কবিভারতী[২৭] সিংহলে গিয়া তথাকার বৌদ্ধ নামে চক্রবর্তী হইয়াছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে দ্বিজ বংশীদাস[২৮] লিখিতেছেন যে, চাঁদ সওদাগর সিংহল দ্বীপেরও দক্ষিণে চৌদ্দ দিনের পথ গেলে পর সমুদ্রে মহা-ঝড় উঠে। তাঁহার চৌদ্দখানি জাহাজ ছিল। ঝড়ের মধ্যে তাহার একখানিও দেখা গেল না। তখন তিনি ব্যস্ত হইয়া নাবিককে বলিলেন, আমার সর্বনাশ হইল, ইহার কিছু উপায় করো। নাবিক কতকগুলি তেলের পিপা খুলিয়া জলে ফেলিয়া দিল। অল্প সময়ের মধ্যে তেলে সমুদ্র ব্যাপ্ত হইয়া গেল। তখন দূরে দূরে দেখা গেল চাঁদের একখানিও নৌকা ডুবে নাই।

প্রাচীন কালে কৃষি বিষয়ে বাঙালির কৃতিত্বের কথা সকলেই জানেন। সে কথা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। কৃষিকার্যে শ্রীবৃদ্ধি হইলেই দেশ সুভিক্ষ হয়। সুভিক্ষ হইলেই ভিক্ষুকের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। হিউয়েন্-ৎসাঙ[২৯] বাংলার তিনটি নগরীতে দশসহস্র সঙ্ঘারাম দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি শুদ্ধ বৌদ্ধদের কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা ছাড়া হিন্দু ও জৈন ভিক্ষুও যথেষ্ট ছিল। কার্পাস তুলার চাষের জন্য বঙ্গদেশ বহু-কাল হইতেই প্রসিদ্ধ। তুঁতের চাষ ভিন্ন রেশম হয় না। তুঁতের চাষ প্রভূত পরিমাণে না থাকিলে বাংলাদেশ রেশমশিল্পে এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিত না। শণ, পাট, ধঞ্চে এখনো বাংলায় একচেটিয়া, চিরদিনই একচেটিয়াই ছিল।

সিংহলে উপনিবেশ স্থাপনের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। যাবা, বালি, মালয় উপদ্বীপ, পেগান [পেনাঙ্ ?] প্রভৃতি দ্বীপে হিন্দুদিগের যে উপনিবেশ হইয়াছিল তাহা কোথা হইতে গিয়া হইয়াছিল, ঠিক জানা যায় না। ভারতবর্ষের পূর্ব উপকূলে তিনটি প্রধান বন্দর ছিল, মাদুরা, কলিঙ্গনগর ও তমলুক ; এই তিনটির মধ্যে তমলুক অধিক প্রসিদ্ধ। তমলুক হইতে নানা দিকে জাহাজ যাইবার কথা পূর্বে বলিয়াছি। অনেকে মনে করেন সমুদ্রযাত্রা যখন এতই নিষেধ, তখন বাঙালিরা কী করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিল। কিন্তু বাস্তবিক সমুদ্রযাত্রা নিষেধ নহে। কল্পসূত্রকার ঋষি বোধায়ন[৩০] বলিয়া গিয়াছেন যে আর্যাবর্তবাসীর পক্ষে সমুদ্রযাত্রায় কোনো দোষ নাই।

যদি কোনো দোষ থাকে, সে দাক্ষিণাত্যে। সুতরাং আর্যাবর্তবাসীরা প্রাচীন কালে অবাধে সমুদ্রযাত্রা করিত এবং বিদেশে গিয়া মোকাম করিত এবং তথায় বাস করিত। প্রত্নতত্ত্বের প্রভাবে জানিতে পারা যায় যে, মগধদেশ হইতে ব্রহ্মদেশ কাম্বোডিয়া আনাম প্রভৃতি অঞ্চলে অনেকবার উপনিবেশ এমন-কি সাম্রাজ্যও স্থাপিত হইয়াছে। ফরাসি-দিগের অধিকৃত কাম্বোডিয়া ও আনামে যে-সকল প্রাচীন শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, খৃস্টীয় ৪র্থ, ৫ম শতাব্দীতেও সেখানে ব্রাহ্মণদিগের রাজত্ব ছিল এবং শৈবধর্মের প্রচার ছিল। গত বৎসর ব্রহ্মদেশের যে Archaeological Report বাহির হইয়াছে, তাহাতে পেগানে [পেনাঙ্] এককালে হিন্দুদিগের রাজত্ব ছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। Dr. Annandale বলেন যে ব্রাহ্মণেরা এক সময়ে মালয়দ্বীপে খুব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ঐ দ্বীপে ব্রাহ্মণদিগকে 'প্রা' বলিত। প্রায়েরা তাহাদিগের প্রভাবের যথেষ্ট নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। এই-সকল উপনিবেশ কোথা হইতে গিয়াছিল, ঠিক বলিতে পারা যায় না। সকলে বলে মগধ হইতেই গিয়াছিল। মগধসাম্রাজ্য বহু-দূর বিস্তৃত ছিল, বাংলা মগধের মধ্যে ছিল। সমুদ্রযাত্রায় বাংলাই অগ্রণী ছিল। সুতরাং এই-সকল উপনিবেশের অধিকাংশই যে বাঙালির দ্বারাই স্থাপিত হইয়াছিল, ইহা অনায়াসেই বিশ্বাস করা যায়।

একবার বলিয়াছি, বাঙালি আত্মবিস্মৃত জাতি। প্রাচীন কালে বাংলার যে এত প্রভাব, এত আত্মগৌরব ছিল, বাঙালিরা এখন সে কথা ভুলিয়া গিয়াছে। এখন বাঙালিই সমুদ্রে যাইতে চায় না, উপনিবেশ স্থাপন তো দূরের কথা। শিল্পবাণিজ্যেও বাঙালির যথেষ্ট অবনতি হইয়াছে। আছে কেবল চাষ, তাহাও ক্রমে একমাত্র পাট ও ধানের চাষে পরিণত হইতেছে। সাহিত্যচর্চায় যদি আবার শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি হয়, সাহিত্যসেবীগণ যদি আবার বাঙালিদিগকে শিল্পী ও বণিক করিয়া তুলিতে পারেন, সাহিত্যেরও উন্নতি হইবে, বিজ্ঞানেরও উন্নতি হইবে, শিল্পবাণিজ্যেরও উন্নতি হইবে। যদি সাহিত্যব্যবসায়ীদিগকে সংস্কৃত ব্যবসায়ীদিগের ন্যায় ভিক্ষাজীবী হইতে হয় এবং সে ভিক্ষাও না মেলে, তাহা হইলে আমরা যেমন আছি

তেমনই ভালো, সাহিত্যচর্চায় কাজ নাই। এইবার বাংলার প্রাচীন বাঙালির সাহিত্যচর্চার কথা কিঞ্চিৎ বলিব।

আবর্তে আবর্তে আর্যগণ অগ্রসর হইয়াছেন, এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। যত অগ্রসর হইয়াছেন, ততই এদেশীয়দিগের আচারব্যবহার, সমাজনীতি, রাজনীতি, সাহিত্যবিজ্ঞান তাঁহাদের সমাজে মিশিয়া গিয়াছে। ঋগ্বেদে যে খাঁটি আর্যদের কথা দেখিতে পাওয়া যায়, কিছু কাল পরে ব্রাহ্মণে এবং অন্য বেদে সে খাঁটিটুকু আর দেখিতে পাওয়া যায় না, দেখিতে পাওয়া যায় যে আর-কিছুর সঙ্গে যেন মিশিয়াছে। একটা মোটা কথা দেখুন; ঋগ্বেদে শূদ্রের কথা একটিবার মাত্র আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণাদিতে শূদ্রেরা সমাজের একটা অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ যিনি লিখিয়াছেন সেই ঋষি মহিদাস জাতিতে শূদ্র ছিলেন, কিন্তু নিজ গুণে ব্রাহ্মণ এবং ঋষি হইয়া গিয়াছেন। যদি কেহ নিপুণ হইয়া বহু-কাল ধরিয়া ঋগ্বেদ ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থ-সকলের চর্চা করে, সেই দেখিতে পাইবে যে ব্রাহ্মণে যে-সকল নূতন জিনিস প্রবেশ করিয়াছে তাহা কতটা ঋগ্বেদের পরিণাম এবং কতটা বাহির হইতে আসিয়াছে। যাহা বাহির হইতে আসিয়াছে তাহার কতটা পূর্ব হইতে আসিয়াছে, কতটা বা পশ্চিম দিক হইতে আসিয়াছে। সেই খুঁজিয়া বলিয়া দিতে পারিবে যে, আর্যেরা এতগুলি জিনিস ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট হইতে লইয়াছিলেন ও এতগুলি তাঁহাদের নিজস্ব ছিল। এইরূপে আবার দ্বিতীয় আবর্ত খুঁজিতে হইবে। ব্রাহ্মণগুলি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া ও সূত্রগুলি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিতে হইবে, ব্রাহ্মণ হইতে সূত্রে বেশি কী আছে। সে বেশির মধ্যে কোন্‌গুলি ব্রাহ্মণের পরিণাম, কোন্‌গুলি একেবারে নূতন। এই নূতন জিনিসগুলি কোথা হইতে আসিল? দেখা যায় যে অনেকগুলিই ভারতবর্ষের প্রাচীন সম্পত্তি, আর্যদিগের আনা নয়। এইরূপ আবর্তে আবর্তে ঘুরিতে ঘুরিতে দেখা যায় যে, আর্যদিগের উপর যেমন শূদ্রবর্ণ জুটিয়াছিল, তেমনি আবার ইহাদের উপর আর-একটি বর্ণ জুটিয়াছিল, তাহাদের নাম অন্ত্যজ। আর্য অভিধানে যত শব্দ ছিল নূতন অভিধানেও অনেক শব্দ জুটিয়াছে। সে-সকল শব্দ কোথা হইতে আসিল? সে-সকল ভারতবর্ষের প্রাচীন সম্পত্তি, আর্য অভিধানে প্রবেশ-

লাভ করিয়াছে। এইরূপ আচারে বলো, ব্যবহারে বলো, উপাসনায় বলো, দর্শনে বলো, ধর্মে বলো, অধর্মে বলো, আহারে বলো, অনেক নূতন নূতন জিনিস আসিয়া এই মিশ্রিত সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। এই-সকল আবর্তে ঘুরিতে ঘুরিতে যখন বাংলায় আসিয়া উপনীত হইবে, তখন দেখা যাইবে আর্যের মাত্রা বড়োই কম, দেশীর মাত্রা অনেক বেশি।

এখন যাঁহারা সিংহলে বাস করেন, এককালে তাঁহারা বাঙালি ছিলেন। আর্যগণ আবর্তে আবর্তে বাংলায় আসিয়া উপস্থিত হন। তারপর আরো অনেক জাতি বাংলায় আসিয়াছে। বাংলার ভাষা অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে। সিংহলের ভাষা বড়ো একটা পরিবর্তিত হয় নাই, এবং সিংহলি ভাষা অনেক প্রাচীন গ্রন্থে আছে। এই ভাষা সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিলে বাংলার প্রাচীন ভাষা কেমন ছিল, অনেকটা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ কার্য এখনো পুরাদস্তুর কেহ করেন নাই। সাহিত্য-সম্মিলন হইতে এই দুই ভাষার তুলনায় সমালোচনা করা আবশ্যক। যাঁহারা একটু-আধটু দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন ঐ ভাষা সংস্কৃতমূলক। কিন্তু তাঁহাদের কথার উপর আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। ভালো করিয়া এ বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক।

মধ্যে সিংহলে পালিভাষার বহুল প্রচার হইয়া গিয়াছে। পালি-ভাষা সংস্কৃতমূলক। সিংহলে পালিভাষা প্রচলিত হইবার পূর্বে যে-সকল গ্রন্থ ছিল ও সিংহলে যে ভাষায় কথোপকথন করিত, এই দুই ভাষার সমালোচনা আবশ্যক। পালিমিশ্রিত সিংহলি ভাষায় কোনো কাজ হইবে না। বাংলাদেশে আমরা আর-এক ভাষার সন্ধান পাইয়াছি, উহাতে বৌদ্ধধর্মের সংস্কৃত বা প্রাকৃত শব্দগুলি মাত্র বুঝা যায়, আর-কিছু বোঝা যায় না। ক্রিয়াপদগুলি এক অদ্ভুত রকমের। এবং ইহার বিশেষ্য শব্দগুলিও এক অদ্ভুত রকমের। এ ভাষারও বিশেষরূপ আলোচনা হওয়া আবশ্যক। অতি প্রাচীন বাংলাভাষায় কতকগুলি গান পাইয়াছি এবং কতকগুলি ছড়া পাইয়াছি; তাহার অনেক idioms বাংলাতেই আছে, অন্য দেশে নাই। এইগুলির অধিকাংশই যে বাঙালির লেখা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাঁহারা গান লিখিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে সিদ্ধাচার্য বলে। সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে যিনি আদি সেই

লুই[৩১] সিদ্ধাচার্যেরও গান পাইয়াছি। তিব্বতীয়েরা সিদ্ধাচার্যদিগের সকল গ্রন্থই আপনাদিগের ভাষায় তর্জমা করিয়া লইয়াছে এবং তাহারা সিদ্ধাচার্যদিগকে আজিও পূজা করিয়া থাকে। সিদ্ধাচার্যেরা যে ধর্ম প্রচার করেন তাহাকে সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম বলে। সহজিয়া ধর্ম কী, এখানে তাহার বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা জানিতাম যে সহজিয়া ধর্ম চৈতন্য সম্প্রদায় হইতেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই বৌদ্ধ সহজিয়ার মত চৈতন্যদেবের প্রায় আট-নয় শত বৎসর পূর্বে প্রচারিত হইয়াছিল। কারণ লুই সিদ্ধাচার্যের গ্রন্থ ক্রমে দুর্বোধ হইয়া আসিলে উহার টীকার আবশ্যক হয় এবং দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান[৩২] ১০০০ খৃ. অব্দের কাছাকাছি সময়ে উহার সংস্কৃত টীকা লিখেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বাংলা হইতে তিব্বতে গিয়া তথায় বৌদ্ধধর্ম সংস্কার করেন। সুতরাং তিনি একজন খুব বড়ো লোক ছিলেন। তিনি যখন লুইয়ের পুস্তকের টীকা করিয়াছেন তখন বুঝিতে হইবে তিনি লুইকে একজন পুরাতন ও বড়ো লোক বলিয়া মনে করিতেন। বাংলায়ও লুইয়ের নাম একেবারে লোপ হয় নাই। ময়ূরভঞ্জে এবং পশ্চিমরাঢ়ে এখনো তাঁহার উপাসনা হইয়া থাকে। দারিক[৩৩] লুইয়ের নিজের চেলা। দারিকেরও গান পাওয়া গিয়াছে এবং আরো অনেকগুলি প্রাচীন সহজিয়া কবির গান পাওয়া গিয়াছে। কৃষ্ণাচার্য[৩৪] এই মতের একজন বড়ো লেখক। তিনি সংস্কৃতে ও বাংলায় এই মতের অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। বাংলায় তাঁহাকে কানু কহে। তাঁহার গানগুলি অতি সরস ও মিষ্ট। আমাদের দেশে একটা কথা চলিত আছে 'কানু ছাড়া গীত নাই'। আমরা মনে করি এ কানু আমাদের কৃষ্ণ কানাই। যেহেতু এখন গান লিখিতে গেলেই বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলাই লিখিতে হয়। কিন্তু কৃষ্ণের এ প্রাদুর্ভাব চৈতন্যের পর ; এ প্রবাদবাক্যটি কিন্তু তত নূতন বলিয়া বোধ হয় না। সেইজন্য আমি বিবেচনা করি এ কানু সেই প্রসিদ্ধ কবি কৃষ্ণাচার্য বা কাহ্নু। সরোরুহপাদ[৩৫] বা সরহ সহজিয়া ধর্মের আর-একজন কবি। তাঁহার অনেকগুলি দোহাও পাইয়াছি। তিনি ব্রাহ্মণ মানেন না। জাতিভেদ মানেন না। ঈশ্বর মানেন না। ক্ষপণক ধর্ম মানেন না। সৌগত মত মানেন না। তিনি বলেন, বুদ্ধদেব সহজিয়া মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন ও সহজিয়া মত গুরুর মুখ ভিন্ন জানা যায় না। তাঁহার

মতে মানুষের মন সহজেই মুক্ত, ইচ্ছা করিয়া তাহাকে বদ্ধ না করিলে কে তাহাকে বদ্ধ করিতে পারে? অদ্বয়বজ্র[৩৬] তাঁহার দোহাকোষের টীকা করিয়াছেন। অভয়াকরগুপ্ত[৩৭] অদ্বয়বজ্রের গ্রন্থ হইতে অনেক স্থান উদ্ধার করিয়াছেন। অভয়াকরগুপ্ত রাজা রামপালের রাজত্বের ২৫ বৎসরে একখানি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। রামপালের রাজত্ব ৪২ বৎসর। ১০৬০ হইতে অথবা তাহার পূর্ব হইতে আরম্ভ হয়। অদ্বয়বজ্র তাঁহার পূর্বে। সরোরুহ তাঁহারও পূর্বে। সুতরাং বাংলায় মুসলমান অধিকার বিস্তার হইবার তিন-চারি শত বৎসর পূর্বে যে গান ও দোহা রচিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। এই সময়ে আরো অনেক বাংলা গীত ও ছড়া লেখা হয়। আমরা মাঝে মাঝে শুনিতে পাই 'ধান ভানতে মহীপালের গীত'। সুতরাং মহীপালের গীত বলিয়া একটা জিনিস সেকালে ছিল। পালবংশে দুইজন মহীপাল ছিলেন। তাহার মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ [প্রথম মহীপাল, ৯৮৮-১০৩৮ খৃ.], সারনাথে তাঁহার শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে (১০২৬)। মহীপালের গীত আজিও পাওয়া যায় নাই। মানিকচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রের[৩৮] গীত পাওয়া গিয়াছে। ইঁহারা দুইজনেই রাজা ছিলেন। খৃ একাদশ শতাব্দীর পরে ইঁহাদিগকে লইয়া আসা যায় না। বরং কিছু পূর্বে লইয়া যাইতে পারা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ইঁহাদের গীতগুলি যেমনটি লেখা হইয়াছিল তেমনটি পাই না। কারণ সেকালের লেখা পুঁথি পাওয়া যায় নাই। হয় যাহারা গায় তাহাদের মুখ হইতে লিখিয়া লইতে হইয়াছে, অথবা একালের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। উহাতে অনেক নূতন শব্দ প্রবেশ করিয়াছে; এমন-কি নূতন ভাবও প্রবেশ করিয়াছে এবং অনেক বিভক্তিযুক্ত শব্দ অন্যরূপ হইয়া গিয়াছে।

সৌভাগ্যক্রমে আমি যে সহজিয়া গীত গান ছড়া ও দোহার কথা উল্লেখ করিয়াছি সেগুলি বদল হয় নাই। যে পুঁথিগুলি পাইয়াছি সেগুলি মুসলমান অধিকারেরও পূর্বের লেখা। পুঁথিগুলি পাকানো তালপাতায় লেখা; সে তালপাতা প্রায় কাগজের মতো। আর অক্ষর সেই সেকালের বাংলা। পুঁথিগুলিতে তারিখ নাই। কিন্তু ঐ কালের যে-সমস্ত তারিখ-ওয়ালা পুঁথি আছে তাহার সহিত ইহাদের

বেশ মিল আছে। যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার তিব্বতি ভাষায় তর্জমা আছে। তাই মনে হয় যদি তিব্বতি ভাষার গ্রন্থ সব খোঁজা যায়, আরো অনেক বাংলা গানের তর্জমা পাওয়া যাইবে। হয়তো তিব্বত দেশে এই-সকল বাংলা গানের পুথিও আছে। সাহিত্য-সম্মিলনের একান্ত কর্তব্য যাহাতে এই-সকল বিষয়ে অন্বেষণ হয় তাহার বিষয়ে চেষ্টা করা।

পালবংশের রাজত্বকালে অর্থাৎ খৃ. ৮০০ হইতে ১২০০ পর্যন্ত বাঙালিরা যে কেবল বাণিজ্য ও ব্যবসায়ের জন্য নানা দেশে যাইত তাহা নহে, ধর্মপ্রচারের জন্যও নানা দেশে যাইত। তিব্বতে তেঙ্গুর নামে ২৫২ volume বই আছে। ইহা ভারতবর্ষীয় গ্রন্থসমূহের তিব্বতি ভাষায় তর্জমা। ইহাতে প্রায় ৩০০০ পুস্তকের তর্জমা আছে। তর্জমায় গ্রন্থকারের নাম, গ্রন্থকার কোন্ দেশের লোক তাহার নাম, তর্জমাকর্তার নাম প্রায়ই লেখা আছে। তর্জমাকর্তা প্রায়ই দুই জন থাকিতেন। একজন ভারতবর্ষীয় ও আর-একজন তিব্বতীয়। ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে বাঙালিই অধিক। এই তর্জমা সপ্তম শতাব্দীতে আরম্ভ হয় ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শেষ হয়। এই তেঙ্গুরের এখনো পুরা catalogue হয় নাই। তান্ত্রিক গ্রন্থসমূহের কিছু কিছু catalogue হইয়াছে। সেই অল্প catalogue মধ্যেই আমরা প্রায় ৫০ জন বাঙালির নাম পাইয়াছি। এই ৫০ জনের মধ্যে বৃদ্ধ-কায়স্থ টঙ্গদেব[৩৯] ধর্মপালের সমকালীন। তাহা হইলেই বুঝা গেল বৃদ্ধ কায়স্থ খৃ ৮০০ সালে বর্তমান ছিল। এইরূপে খুঁজিতে খুঁজিতে আমরা অনেক কায়স্থ তেলি ও সাহাদিগের নাম পাইয়াছি। ইঁহারা সকলেই বৌদ্ধ ছিলেন, পণ্ডিত ছিলেন এবং ধর্ম সম্বন্ধে তিব্বতীয়দিগের গুরু ছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীতে নিস্তেজ ও হীনবীর্য হইয়া পড়িলেও তাঁহারা সমস্ত তিব্বত দেশ নূতন বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন।

নেপালের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। অনেক সময় মনে হয় নেপাল আগে বোধ হয় বাঙালিরই উপনিবেশ ছিল। ইতিহাস পাওয়া যায় না, কিন্তু অনেক পুরানো কথা আছে। একটা কথা এই যে বাংলায় শান্তিপুর নামে এক নগর ছিল। তাহার তিন দিকে গড় ছিল, একদিকে মাত্র রাস্তা ছিল। সেখানে প্রচণ্ডদেব নামে এক রাজা

ছিলেন। তিনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া সিদ্ধাচার্য হন। সিদ্ধাচার্য হইলে তাঁহার নাম হয় শান্তিকর। তিনি নেপালে গিয়া স্বয়ম্ভুক্ষেত্র প্রকাশ করেন। এখন স্বয়ম্ভুক্ষেত্র নেপালি, তিব্বতি ও মঙ্গোলীয় বৌদ্ধদিগের প্রধান তীর্থস্থান। শান্তির ভণিতাওয়ালা দু-চারিটি গান পাওয়া গিয়াছে। সে শান্তিও সিদ্ধাচার্য ছিলেন। জানি না দুই শান্তি এক হইবে কি না। শান্তির গানগুলিতে ভাষার একটু বৈচিত্র্য আছে। তাঁহার ক্রিয়াবিভক্তির সহিত অন্য গানের ক্রিয়াবিভক্তি মিলে না।[৪০]

চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে নেপালে যখন রাজবিপ্লব ঘটে, তখন সেখানে রামগুপ্ত ও ধর্মগুপ্ত নামে দুইজন পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহারা বাংলা অক্ষরে পুথি লিখিতেন। সুতরাং বোধ হয় ইঁহারা বাঙালিই ছিলেন। মুসলমানেরা যখন বাংলা [র] বৌদ্ধমঠগুলিকে ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিল, সেই সময় অনেক বাঙালি বৌদ্ধ নেপালে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সঙ্গে করিয়া অনেক পুথি লইয়া যান। প্রাচীন বাংলার ইতিহাস অন্বেষণ করিতে গেলে এই-সকল পুথিই আমাদের প্রধান অবলম্বন করিতে হইবে। নেপালের নাকি জলহাওয়া ভালো, তাই সে-সকল পুথি এখনো নষ্ট হইয়া যায় নাই, এখনো খুঁজিলে অনেক তথ্য পাওয়া যাইবে।

আমার বক্তৃতা অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া উঠিল। আমি শ্রোতৃবর্গের ধৈর্য-চ্যুতির আশঙ্কা করিতেছি। শীঘ্রই শেষ করিয়া ফেলিব। এই মহা-সভায় যাঁহারা অভ্যর্থনা করিতেছেন, তাঁহারা কে ও যাঁহারা অভ্যাগত হইয়া আসিয়াছেন তাঁহারাই বা কে, তাহার পরিচয় দেওয়া গেল। আবার বলি আমরা বাঙালি আত্মবিস্মৃত জাতি ; আমাদের পূর্ব-গৌরব আমরা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। এককালে আমরা শিল্পে, বাণিজ্যে, কৃষিকার্যে ও উপনিবেশ স্থাপনে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে প্রধান জাতি ছিলাম। ধর্ম প্রচারেও বাঙালিরা বড়ো কম ছিল না। সেদিনও চৈতন্য-দেবের আবির্ভাবের পর বাঙালিরা মণিপুর, আসাম, উড়িষ্যা ও বেহার চৈতন্যধর্মে দীক্ষিত করিয়াছে এবং রাজপুতানার সুদূর মরুস্থলীতে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছে। অল্প দিন হইল বাঙালিরা ইংরাজ রাজের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া ভারতবর্ষের সর্বত্র পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার করিয়া ভারতবর্ষের ও ইংরাজ রাজের প্রভূত উপকার সাধন

করিয়াছে। তাহাদের যত্নে, অধ্যবসায়ে ও উদ্যমে বাংলা সাহিত্য ভারতীয় সাহিত্যে সর্বোপরি স্থান অধিকার করিয়াছে এবং পৃথিবীর সর্বত্র আদর প্রাপ্ত হইয়াছে। সমবেত বাঙালি লেখকমণ্ডলী সেই সাহিত্যকে সৎপথে চালিত করিয়া বাংলার পূর্বগৌরব যাহাতে পুনরুদ্ধার করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করুন। পূর্বগৌরবের প্রধান উপায় ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস অতি অদ্ভুত পদার্থ। এই ইতিহাসের মূলতত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য শুদ্ধ ঘরে বসিয়া পুঁথি পড়িলে হইবে না। নিকটবর্তী সকল দেশেই যাইতে হইবে। Burma, Cambodia, Anam, মালয় উপদ্বীপ, শ্যামদেশ, যাবাদ্বীপ, তিব্বত, মঙ্গোলীয়া এমন-কি চীনদেশ অবধি যাইতে হইবে, এবং যতই অন্বেষণ হইবে ততই বাঙালির গৌরবের নূতন নূতন কথা জানা যাইবে, বাঙালির স্বভাবের পরিবর্তন হইবে, বাঙালি বুঝিতে পারিবে যে, তাহাদের পূর্বপুরুষেরা নিতান্ত ভীরু এবং অলস ছিলেন না। দেশের মধ্যে কত কাজ পড়িয়া আছে। সিংহলবিজয়ী বিজয়সিংহের পিতা কোথায় রাজত্ব করিতেন এবং কোথায় তাঁহার রাজধানী ছিল, ইহার আমরা কিছুই জানি না। অশোকেরও পূর্বে পৌণ্ড্রবর্ধন ভারতের একটি প্রধান নগর ছিল। কিন্তু তাহা বঙ্গের কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিল, তাহার কিছুই জানি না। এই যে নাথেরা আবির্ভূত হইয়া নানা দিকে শৈবধর্ম প্রচার করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কয়জন বাঙালি কী প্রকারে ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন, কোথায়ই বা জন্মিয়াছিলেন, তাহার কিছুই জানি না। এই যে বাঙালি সিদ্ধাচার্যেরা এত কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদেরও কোনো কথা জানি না। এই যে ভারতবর্ষে, বিশেষ বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ছিল বলিয়াই শুনিয়া আসিতেছিলাম, তাহা কোথায় গিয়াছে? কেমন করিয়া গিয়াছে? তাহাই খুঁজিতেছিলাম। শেষে অল্পায়াসেই বুঝা গেল বাংলায় বৌদ্ধধর্ম এখনো লোপ হয় নাই। কয়েকজন অনুসন্ধানকারীর চেষ্টায় এখন আমরা জানিতে পারিয়াছি যে বাংলায় অন্তত বৌদ্ধধর্ম এখনো চারি দিক ব্যাপিয়া আছে। আমাদের চক্ষু নাই, তাই আমরা দেখিতে পাইতেছি না। ইতিহাসের অনেক তত্ত্ব মাটির উপরিভাগে পড়িয়া আছে। অনায়াসেই খুঁজিয়া লইতে পারা যায়। কিন্তু খুঁজিবার লোক কই? অনেকের আগ্রহ আছে শক্তি নাই, অনেকের শক্তি আছে আগ্রহ নাই; অনেকে ঘরে বসিয়া কাজ

করেন, বাহিরে ঘুরিতে পারেন না ; অনেকে বাহিরে ঘুরিতে পারেন কিন্তু তাঁহাদের চোখ পরিস্ফুট হয় নাই। আবার একদল আছেন, তাঁহারা কাজ করুন বা না করুন নিজের জয়ধ্বনি নিজে করিয়া লোকের কান কালা করিয়া দেন ; বিদ্যা থাকুক বা নাই থাকুক, বিদ্যার পুরস্কার-গুলির দিকে লোলুপ নেত্রে দৃষ্টিপাত করেন। একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখুন। ইতিহাস খুঁজিবার জন্য ভারতবর্ষে সর্বত্রই পুরাতন জায়গা সকল খোঁড়া হইতেছে। পুরুষপুর, তক্ষশিলা, শ্রাবস্তী, সারনাথ, বুদ্ধগয়া, পাটলিপুত্র প্রভৃতি স্থানে কত গূঢ়তত্ত্ব বাহির হইতেছে : কিন্তু বাংলায় এখনো এক কোদাল মাটিও উল্টানো হয় নাই। সপ্তগ্রাম একটু-আধটু খুঁড়িলে অনেক খবর পাওয়া যাইবে। নবদ্বীপের নিকটবর্তী সুবর্ণ, বিহার, বল্লালঢিপি অনেক কথা লুকাইয়া রাখিয়াছে। বলিবে এ-সকল কথা অল্প দিনের ; কিন্তু যাও-না পৌণ্ড্রবর্ধনে, যাও-না গৌড়ে, যাও-না কর্ণসুবর্ণে। এ-সকল জায়গা তো আধুনিক নহে, এ-সকল খুঁড়িলে অনেক পুরানো তত্ত্ব পাওয়া যাইবে। কিন্তু সে বিষয়ে উদ্যম কই, অধ্যবসায় কই ? এইরূপ সম্মিলন হইতেই তাহার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

তাই বলি, যখন আপনারা বাংলার সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলী একত্র হইয়াছেন, তখন যাহাতে বঙ্গীয় সাহিত্যের, বঙ্গীয় ইতিহাসের, বঙ্গীয় জীবনের গতি ফিরে, যাহাতে বাঙালি উন্নতির পথে দ্রুত গতি ধাবিত হয়, সে বিষয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করুন।

'মানসী'
বৈশাখ, ১৩২১ ॥

অভিভাষণের পরিশিষ্ট

৩৪ বৎসর পূর্বে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের সমালোচনা করিতে গিয়া আমি একবার বলিয়াছিলাম[৪১]—

"আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতেছি বঙ্গীয় সাহিত্যের পরিণাম অতিশুভ-কর, বঙ্গীয় সাহিত্যের উন্নতি অনন্ত ও উন্নতিকাল সমাগত। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি শত শত ভাবী লেখক, ভাবী প্রতিভাশালী লোক উদয় হইতেছেন; আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি শত শত মহাকাব্য বঙ্গ-বাসীকে আনন্দে ভরাইয়া ভাষান্তরিত হইয়া দেশদেশান্তরস্থ পণ্ডিতবৃন্দকে আনন্দে মগ্ন করিতেছে। আমার কর্ণে কত ভবিষ্যদ্বাণীর ও বীণার প্রতিঘাত লাগিতেছে, তাহা বলিতে পারি না। এই-সকলের পশ্চাতে আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি একটি গৌরবান্বিত মহাশক্তিমান্ মহাজাতি সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় উত্থিত হইয়া কৃতজ্ঞতা সহকারে বর্তমান পুরুষের মহামহোপাধ্যায়গণের গুণগান করিতেছে, আর মহা-আনন্দভরে দেব-নির্বিশেষে বর্তমান নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষী মহোদয়দিগকে পূজা করিতেছে।"

এই ৩৪ বৎসরে আমার ভবিষ্যদ্বাণী অনেকটা পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে; সত্য সত্যই এই ৩৪ বৎসরের মধ্যে অনেক প্রতিভাশালী লোক আবির্ভূত হইয়া বাংলাভাষা ও বাংলা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। সত্য সত্যই বাংলাভাষার অনেক গ্রন্থ নানা ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়া সভ্য-জগতে বাঙালির মান বৃদ্ধি করিয়াছে। সত্য সত্যই বাংলার রাজপ্রতি-নিধি বাংলার কবিকে "Poet laureate of Asia" বলিয়া বাংলাভাষার আদর বাড়াইয়াছেন। সুইডেনের পণ্ডিতবৃন্দ আমাদের কবিকে নোবেল প্রাইজ দিয়া এবং জগতের একজন প্রধান উপকারক বলিয়া স্বীকার করিয়া বাংলা সাহিত্যকে অতি উন্নত স্থানে উঠাইয়া দিয়াছেন। ৩৪ বৎসর পূর্বে কে ভাবিয়াছিল যে, একজন বাঙালি বাংলাভাষায় একটা প্রকাণ্ড বিশ্বকোষ বাহির করিয়া ফেলিবেন।[৪২] ৩৪ বৎসর পূর্বে কে ভাবিয়াছিল যে, বাংলা সাহিত্যের আবার একটা প্রকাণ্ড ইতিহাস আছে ও সেই ইতিহাস বাংলা ও ইংরাজিতে লিখিবার উপযুক্ত হইয়াছে। তখন কে মনে করিয়াছিল যে, হাজার বৎসর পূর্বেও বাঙালিরা বাংলাভাষায়

পুস্তক লিখিয়া ভারতবর্ষের সর্বত্র বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিত। সে ইতিহাস এখনো লেখা হয় নাই, কিন্তু লিখিবার আর বিলম্বও নাই। তখন কে ভাবিয়াছিল যে, বাঙালিরা বড়ো বড়ো সভাসমিতি করিয়া সাহিত্যের চর্চা করিবে, আপনাদের দেশের পুরাতন তত্ত্ব-সকল বাহির করিবে, আপনাদের দেশের শিল্প, বাণিজ্য, সাহিত্য প্রভৃতির মূলতত্ত্ব-সকল খুঁজিয়া খুঁজিয়া জনসমাজে প্রকাশ করিয়া দিবে ও অতীতের ইতিহাসকে সাক্ষী করিয়া দ্রুতবেগে ভবিষ্যৎ উন্নতির দিকে ধাবমান হইবে।

এই ৩৪ বৎসরে বাংলা সাহিত্যের ঘোরতর পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। তখন এমন একজনও লোক ছিলেন না, যিনি সাহিত্যমানের উপর নির্ভর করিয়া জীবিকানির্বাহ করিতেন। তখনকার সাহিত্য-সরস্বতী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবকাশ-বিনোদিনী ছিলেন। এখন সেই সরস্বতী শত শত বঙ্গীয় লেখককে কেবল যে অন্নদান করিতেছেন এমন নহে, অনেককে প্রভূত ধনদান করিতেছেন এবং তাঁহাদের যশে জগৎ পূরিয়া দিতেছেন। বাংলা সাহিত্য সত্য সত্যই মহাশক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু আমার ৩৪ বৎসর পূর্বের যে ভবিষ্যদ্বাণী সে বাণী এখনো আমার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। বহু-শত বৎসর ধরিয়া সেই ভবিষ্যদ্বাণী ক্রমেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। বঙ্গীয় সাহিত্য আর শীঘ্র অধোগতি লাভ করিবে না। ক্রমে মনুষ্যজীবনের সকল বিভাগেই ইহার প্রভাব বিস্তৃত হইতে থাকিবে। ইংরাজ রাজের পরাক্রান্ত ভুজচ্ছায়ায় বাস করিয়া আমরা বাহিঃশত্রু ও অন্তঃশত্রুর ভয় হইতে নিশ্চিন্ত থাকিয়া কেবল সাহিত্যের ও জীবনের উন্নতি করিতে থাকিব, সেই উপলক্ষেই আমরা সকলে সমবেত হইয়াছি, এবং আমরা সাহিত্যের উন্নতি, বাঙালি জীবনের উন্নতি ও বাঙালি জাতির উন্নতির জন্য যত্নবান্ হইব। আমাদের এমন সুযোগ পূর্বে কখনো উপস্থিত হয় নাই। এই সুযোগের যতদূর সদ্ব্যবহার করিতে হয়, আমরা প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিব।

'মানসী'
আষাঢ়, ১৩২১ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য।

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সময়ে রবীন্দ্রনাথ প্রতিবৎসর দেশের বিভিন্ন জায়গায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করেন। ১৩১২ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যা 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' প্রবন্ধে লেখেন—

"আমরা এই সময়ে এই উপলক্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে বাংলার ঐক্য-সাধনযজ্ঞে বিশেষভাবে আহ্বান করিতেছি। তাঁহারা পরের দিকে না তাকাইয়া, নিজেকে পরের কাছে প্রচার না করিয়া, নিজের সাধ্যমত স্বদেশের পরিচয়লাভ ও তাহার জ্ঞানভাণ্ডার পূরণ করিতেছেন। এই পরিষৎকে জেলায় জেলায় আপনার শাখাসভা স্থাপন করিতে হইবে, এবং পর্যায়ক্রমে এক-একটি জেলায় গিয়া পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন করিতে হইবে। আমাদের চিন্তার ঐক্য, ভাবের ঐক্য, ভাষার ঐক্য, সাহিত্যের ঐক্য সম্বন্ধে সমস্ত দেশকে সচেতন করিবার, এই ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আপন স্বাধীন কর্তব্য পালন করিবার, ভার সাহিত্য-পরিষৎ গ্রহণ করিয়াছেন। এখন সময় উপস্থিত হইয়াছে— এখন সমস্ত দেশকে নিজের আনুকূল্যে আহ্বান করিবার জন্য তাঁহাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে।" (র-র-বি, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬১৭-১৮)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একাদশ বর্ষের (১৩১২ ব.) কার্যবিবরণে উল্লেখ আছে, ৬ চৈত্র তারিখের কার্যনির্বাহক সমিতির বিশেষ অধিবেশনে উপস্থিত থেকে রবীন্দ্রনাথ 'পরিষদের কর্মক্ষেত্রের পরিধিবিস্তার'-এর প্রস্তাব করেন। তাঁর অভিপ্রায় ছিল শুধু বাংলাভাষা ও সাহিত্য নয় বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতি সম্পর্কে যা-কিছু জ্ঞাতব্য সমস্তই পরিষদের গবেষণার বিষয় হোক।

সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে রবীন্দ্রনাথ বলেন—

"বাঙলাদেশ এবং বাঙালী জাতি সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য হইতে পারে, সাহিত্য-পরিষৎ যদি সে সমস্ত বার্তা কেন্দ্রীভূত করিতে পারেন, তাহা হইলে পরিষদের জীবন সার্থক হইবে। এই কার্য্যের জন্য সমস্ত বাঙলা দেশ ব্যাপিয়া সমস্ত বাঙালী জাতিকে যথাসম্ভব জাগাইয়া তোলা পরিষদের সম্প্রতি মুখ্য কর্তব্য। আপাততঃ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন কলিকাতায় না করিয়া বাঙলার ভিন্ন ভিন্ন নগরে পর্য্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত করিলে কার্য্যটার সূচনা হইতে পারে।" (সা-সা-চ, ৭০ সংখ্যক, পৃ. ৫২-৫৩)

রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রাণনায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী পরিষদের পক্ষ থেকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের আয়োজন করেন। অনেক বাধার পরে ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ১৭-১৮ কার্তিক কাশিমবাজারে প্রথম অধিবেশন হয়। সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সম্মিলনে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ পাঠ এবং আলোচনার আয়োজন সাহিত্য-পরিষদের 'কর্মক্ষেত্রের পরিধি বিস্তার'-এর দৃষ্টান্ত। শেষ সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে।

সপ্তম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায় টাউন হলে ২৭-২৯ চৈত্র ১৩২০ ব.। সভাপতি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শাস্ত্রীমশায় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রূপে এই অভিভাষণ পড়েন। মূল অভিভাষণ ও পরিশিষ্ট প্রকাশিত হয়েছিল 'মানসী' পত্রিকায় ১৩২১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ ও আষাঢ় সংখ্যায়।

অভিভাষণটি 'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন' পত্রিকার তৃতীয় খণ্ড, একাদশ সংখ্যায়ও (ফাল্গুন ১৩২০ ব.) প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে 'মানসী' পত্রিকার পাঠ নেওয়া হল।

১. Lord Carmichael ১৯১২-১৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার গবর্নর ছিলেন। ১৩২০ বঙ্গাব্দের ২৭ চৈত্র তিনি সপ্তম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন উদ্বোধন করেন। ইংরেজ রাজপুরুষকে দিয়ে সম্মিলন উদ্বোধন করানোর সমালোচনা করে 'প্রবাসী' পত্রিকায় লেখা হয়, "বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের কার্য্যারম্ভ লর্ড কারমাইকেলের দ্বারা করাইবার প্রয়োজন বা সার্থকতা আমরা বুঝিতে পারি নাই। তাঁহাকে কোন প্রকার অসম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য আমরা এ কথা লিখিতেছি না। তিনি অতি সদাশয়, ভদ্র ব্যক্তি। সাহিত্য সম্মিলনে উপস্থিত থাকিবার জন্য দার্জিলিং-যাত্রা পিছাইয়া দিয়া তিনি অভ্যর্থনা-সমিতির নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছেন, এবং এই গ্রীষ্মের দিনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সভায় উচ্চারিত বাক্যাবলী সমস্ত না বুঝিয়াও ধৈর্য্যসহকারে বসিয়া ছিলেন। তাঁহাব মত নানাকার্য্যে ব্যস্ত অবসরবিহীন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির পক্ষে ইহা অপেক্ষা সৌজন্য আর কি হইতে পারে? তিনি যদিও নিজের আনন্দ এবং কর্ত্তব্যপালনের জন্য বাংলা শিখিতেছেন, তথাপি আমরা তাঁহার আমাদের মাতৃভাষা শিক্ষার প্রয়াসের জন্য তাঁহার প্রতি প্রীতি ও সম্মান প্রদর্শন করি। কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে তাঁহাকে প্রথম স্থান দিবার কোনও কারণ দেখিতেছি না।... যিনি যে রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন, তিনি জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সেই কার্য্যের উপযোগী সম্মান ও বাধ্যতা আমাদের নিকট হইতে পাইবেন। ইহার বেশী তাঁহাদের কোন পাওনা নাই, আমাদেরও কোন দেয় নাই,

লর্ড কারমাইকেলের মত লোক সম্ভবতঃ চানও না। তাহার পর অবশ্য সামাজিকতা আছে। সেখানে কিন্তু সমানে সমানে ব্যবহার। ঠিক এই আদর্শ অনুসারে আমরা যে চলিতে পারি না, সেটা আমাদের দুর্ব্বল-চিত্ততা, স্বার্থান্বেষণ বা চাটুকারিতার জন্য।

"সাহিত্যে যিনি বড়, তিনি সাহিত্যিক সভায় উচ্চ আসন পাইবেন। এখানে অন্য কোনও কারণের প্রাধান্য হওয়া অবাঞ্ছনীয়। হালহেড্ বা তাঁহার মত আর কোনও ইংরেজের পুনরাবির্ভাব হইলে আমাদের এবম্বিধ আপত্তির কারণ হইত না। ইংরেজ বা শাসনকর্ত্তা হইলেই তাঁহার সর্ব্ববিষয়িণী যোগ্যতা জন্মে না।

"সত্য বটে লর্ড মর্লী যে, সকলেই রাজার সমান-প্রজা, বলিয়াছেন, কার্য্যক্ষেত্রে তাহার এখনও সর্ব্বত্র পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু আমরা চাকরীর বেলায় যে বৈষম্যের তীব্র প্রতিবাদ করি, ভারতবাসীর জন্ম-ও-জাতিগত নিকৃষ্টতা ধরিয়া লওয়ায় ক্ষুণ্ণ হই, আমরা সামাজিক নানা ব্যাপারে এবং সাহিত্যক্ষেত্রে নিজে উপযাচক হইয়া প্রকারান্তরে কেন সেই নিকৃষ্টতা নিজেদের ঘাড়ে তুলিয়া লই ? দেড়শত বৎসর পূর্ব্বেকার রাষ্ট্রীয় পরাজয়, জীবনের সর্ব্ববিভাগব্যাপী পরাভব নহে।

"বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ গবর্ণমেণ্ট হইতে কিছু টাকা পাইয়া থাকেন বটে। তাহা লওয়া বাঞ্ছনীয় কি না, তাহার আলোচনা এখানে করিব না। কিন্তু সাহিত্যপরিষৎ এবং সাহিত্যসম্মিলন এক জিনিষ নয়। সুতরাং কৃতজ্ঞতার দিক্ দিয়াও কোনও রাজপুরুষকে রাজপুরুষ বলিয়া সাহিত্য সম্মিলন যজ্ঞে পৌরোহিত্যে বৃত করিবার কারণ দেখিতেছি না। আমাদের বিবেচনায় লর্ড কারমাইকেলকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া হইয়াছে।" (প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২১ ব., পৃ. ২৪)

২. মহাযান বৌদ্ধদর্শনের ঐতিহ্যে 'প্রজ্ঞাপারমিতা-সূত্র' আদি গ্রন্থ। এই নামে প্রচলিত বহু গ্রন্থের মধ্যে 'অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা-সূত্র'কে মূল সূত্র-গ্রন্থ মনে করা হয়। ১৭৯ খৃস্টাব্দে একখানি প্রজ্ঞাপারমিতা-সূত্র চীনা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। মহাযান বৌদ্ধ মতে দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য, ধ্যান ও প্রজ্ঞা— এই ছয়টি পারমিতা বোধিসত্ত্বের সাধনীয়। এর মধ্যে প্রজ্ঞা শ্রেষ্ঠতম। প্রজ্ঞা অর্থ শূন্যতার জ্ঞান। শত সাহস্রিকা, পঞ্চ-বিংশতি সাহস্রিকা, দশ সাহস্রিকা, অষ্ট সাহস্রিকা প্রভৃতি নানা আয়তনের প্রজ্ঞাপারমিতা-সূত্র পাওয়া গেছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র এশিয়াটিক সোসাইটির বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা সিরিজে 'অষ্ট-সাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা' প্রকাশ করেন (১৮৮৭-৮৮ খৃ.)।

৩. পঞ্চদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণভক্তি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান প্রবর্তক মাধবেন্দ্র পুরীর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ প্রিয়তম শিষ্য ঈশ্বর পুরী। ১৫০৮ খৃস্টাব্দে গয়ায় ইনি নিমাইকে দশাক্ষর গোপালমন্ত্রে দীক্ষা দেন। শ্রীরূপ গোস্বামীর 'পদ্যাবলী' সংকলনে ১৮, ৬২, ৭৫ -সংখ্যক শ্লোক ঈশ্বর পুরীর রচনা। তাঁর 'কৃষ্ণলীলামৃত' কাব্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। পুথি আবিষ্কৃত হয় নি।

৪. চৈতন্যের অন্যতম আদি ভক্ত শ্রীবাসের অন্য তিন ভাইয়ের নাম শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীকান্ত বা শ্রীনিধি। এঁদের একজনের মেয়ে নারায়ণী 'চৈতন্যভাগবত' রচয়িতা বৃন্দাবনদাসের মা। শ্রীবাসরা চার ভাই-ই চৈতন্যের কৃপাপাত্র ছিলেন।

৫. রাঘব পণ্ডিত সম্পর্কে নানা বৈষ্ণব গ্রন্থে উল্লেখ থাকলেও পূর্ণ পরিচয় কোথাও নেই। তিনি পানিহাটিতে বাস করতেন, দময়ন্তী দেবী নামে তাঁর এক বিধবা বোনের নাম পাওয়া যায়। এঁরা দুজনই চৈতন্যের সেবক ছিলেন। রাঘবের ঘরে চৈতন্য বিশ্রাম করেন। চৈতন্যের জন্য দময়ন্তীর হাতে তৈরি খাবার থলি ভরে নিয়ে রাঘব অদ্বৈত আচার্য, শ্রীবাস আচার্যদের সঙ্গে নীলাচলে যাচ্ছেন, 'চৈতন্য চরিতামৃতে'র অন্ত্যলীলা, দশম পরিচ্ছেদে এই বর্ণনা আছে।

৬. শ্রীমদ্ভাগবতের ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত অনুবাদ 'কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'র লেখক বরাহনগরের রঘুনাথ পণ্ডিত। প্রচলিত মতে চৈতন্য এঁর নাম দেন ভাগবতাচার্য। কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী নগেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদনায় ১৩১২ এবং বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় ১৩১৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।

৭. কালুরায় এবং দক্ষিণরায় বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য ছিলেন, এই অনুমানের পরিপোষক কোনো তথ্য নেই। দক্ষিণ-বাংলার এই দুই লৌকিক দেবতার যৌথ বা একক পুজো আজও প্রচলিত আছে। এঁরা বনের রক্ষক, বাঘ-কুমিরের অধিদেবতা। মতান্তরে কৃষি-সম্পৃক্ত লৌকিক দেবতা। দুই দেবতারই পূর্ণ মূর্তি শ্রী ও বীরত্বময়। কালুরায়ের বাহন বাঘ, দক্ষিণরায়ের ঘোড়া। তবে পূর্ণ মূর্তির চেয়ে 'বারা' বা শুধু মুণ্ড পুজোর চলন ব্যাপক। 'বারা' পুজোয় নরবলি ও নরমুণ্ড পুজোর স্মৃতি রয়ে গেছে এমনও অনুমান করা হয়। বিশেষ 'জাঁতাল' পুজোর তিথি মকর সংক্রান্তি। পশুপাখি বলি দেওয়া, মদ-মাংস উৎসর্গ করা রীতি। বন-

ঝাউয়ের ফুল কালুরায়ের পুজোর নিত্য-উপচার। অঞ্চল বিশেষে পূজারী ব্রাহ্মণ হলেও ব্রাহ্মণেতর জাতির মানুষ পুরোহিতের কাজ করেন।

৮. বয়নুদ্দীন এবং মোহম্মদ খাতের রচিত বন-বিবির 'জহুরনামা' বা মাহাত্ম্য-পাঁচালি পাওয়া গেছে।

"বন-বিবির পাঁচালী গাঁথা হয়েছে সুন্দরবনের 'মউল্যা' অর্থাৎ মধু-মোম-সংগ্রাহকদের বিশিষ্ট অধিদেবতাকে উপলক্ষ্য করে। হিন্দু ব্যাধ-কাঠুরে-পশুপালকের অধিদেবতা বন-দুর্গার বা মঙ্গলচণ্ডীর রূপান্তর ইনি। পূর্বতন দক্ষিণরায়, বড়-খাঁ গাজী ও কালু-শাহার বিরোধকাহিনীর অনু-বৃত্তি পাই বন-বিবির উপাখ্যানে। অস্ট্রিক-মোঙ্গল জাতির অন্যতম উপাস্য ব্যাঘ্রমানব অপদেবতা কালক্রমে দক্ষিণবঙ্গের জাঙ্গল-অনূপ প্রান্তে দক্ষিণরায় ঠাকুরে পরিণত হলেন। বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে বড়-খাঁ গাজী হলেন দক্ষিণের অধীশ্বর। দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির বিরোধ-মিলনের একটু ইতিহাস রয়ে গেছে দক্ষিণরায় বড়-খাঁ গাজীর গল্পের মধ্যে। হিন্দু কবির লেখা কাহিনীর বিশিষ্ট নাম 'রায়মঙ্গল', মুসলমান কবির লেখা সাধারণত 'গাজী সাহেবের গান' নামে প্রসিদ্ধ।" (ই-বা-সা, পৃ. ৯৫)

"তবে হিন্দুদের পুরাণ-পাঁচালির প্রভাবে মুসলিম-মানসে একটা ভিন্ন প্রতিক্রিয়াও জেগেছিল। ফলে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার জন্যে অনেকেই ভেতরে ভেতরে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। ধর্মস্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সচেতনতা আর দেশীয় সংস্কার মিলে লৌকিক দেবদেবীর মুসলমান প্রতিরূপ সৃষ্টি এবং হিন্দু দেবদেবীর জায়গায় তাঁদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস দেখা দিয়েছিল। মুঘল আমলে উত্তর-ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে এবং ইরানী বাস্তুত্যাগীদের আবির্ভাবের ফলে বাংলায় বহু ধর্মনেতা ও পীর ফকীর দেখা দেন। তাঁদের শিক্ষা ও প্রেরণা এবং পূর্ববর্তী পীর-মুর্শিদদের স্মৃতি ধর্ম নিয়ে প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হতে বাংলার মুসলমানকে প্ররোচনা দিল। তাই উগ্রতা কিংবা অলৌকিকতা অথবা বাস্তব লাভালাভ দেখিয়ে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করায় যে প্রচেষ্টা ইতঃপূর্বেই শুরু হয়েছিল, তা এবারে ব্যাপক আকার ধারণ করল।" (মু-মা-বা-সা, পৃ. ১১২)

৯. গোরাচাঁদ পীরের প্রকৃত নাম হজরত শাহ্ সৈয়দ আব্বাস আলী। আরবে, ১৩১৫ খৃস্টাব্দে। চিরকুমার আব্বাস আলী আরবি-ফারসিতে সুপণ্ডিত ছিলেন, বাংলাদেশে এসে বাংলাভাষা আয়ত্ত করেন। গৃহত্যাগী

সিদ্ধপুরুষ ২১ জন আউলিয়া সঙ্গে নিয়ে দিল্লি থেকে সিলেট হয়ে ২৪ পরগনার বালাণ্ডা পরগনায় হাড়োয়াতে আস্তানা স্থাপন করেন। এখনো হাড়োয়ায় প্রতি বৎসর ১১ ফাল্গুন থেকে তিন দিন পীরের ওর্স-শরিফ উপলক্ষে উৎসবে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ মানুষ সমবেত হন। দ্র. অশোক মিত্র সম্পাদিত, 'পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা', তৃতীয় খণ্ড, দিল্লি ১৯৭১ খৃ., পৃ. ৪৯-৫১।

১০. হরিদাস ঠাকুরের জন্ম যশোর জেলার বূঢ়ন পরগনার ভাট-কলাগাছি গ্রামে। বেনাপোলের জঙ্গলে নির্জন কুটিরে বাসকালে প্রতিদিন তিন লক্ষ হরিনাম করতেন, তুলসী সেবা করতেন। বেনাপোলের জমিদার বৈষ্ণবদ্বেষী রামচন্দ্র খান জনপ্রিয় সাধক হরিদাসের চরিত্রে কলঙ্ক দেবার জন্যে এক বেশ্যাকে পাঠান। এই যুবতী পর পর তিন রাত্রি হরিদাস ঠাকুরকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে তাঁর কাছে উদ্ধার প্রার্থনা করেন। হরিদাস তাঁকে রোজ তিন লক্ষ হরিনাম করতে উপদেশ দিয়ে বেনাপোল ছেড়ে যান।

প্রচলিত মতে হরিদাস জাতিতে মুসলমান ছিলেন। কিন্তু সতীশ-চন্দ্র মিত্র গোঁসাই গোরাচাঁদ রচিত 'শ্রীশ্রীসংকীর্তন বন্দনা'র বিবরণের ভিত্তিতে হরিদাসকে ব্রাহ্মণ সন্তান বলেছেন। ('যশোহর-খুলনার ইতিহাস' প্রথম খণ্ড, কলকাতা ১৯৬৩ খৃ., পৃ. ৩৯৮-৪১১)।

১১. "The catalogue [*Catalogue of Palm leaf and Selected paper Mss. belonging to the Durbar Library, Nepal,*—Vol. II, 1915] contains the description of a magnificent encyclopædia by Bhuvanānanda Kavikaṇṭhābharaṇa, the son of Rām Khān and the grandson of Vāgīśvara. The family was patronized by a Muhammadan Sultan who from Bengal conquered Oudh and Delhi and gave much land to Brāhmaṇs in these provinces. The encylopædia is entitled Visvapradipa, of which one part only, that on music, is to be found in the Durbar Library, Nepal. Another part has been described by Eggeling in the catalogue of the India Office Library. The work professes to be an encyclopædia of the eighteen vidyās or Sciences of the

Hindus ; two of them so far have been discovered. The description of the Bengal Sultan given in Eggeling's catalogue applies with great force to Sher Shah, and the work seems to have been compiled under his patronage. The father's name of the author is given as Rām Khān or Rām Bala or Śāntidhara. In Bengal, Brāhmaṇs and even learned Brāhmaṇs often obtained from Bengal Ṣultans the title of Khān. A discovery of the other parts of the encylopædia would be exceedingly interesting, because in the two parts already brought to light, the author shews a masterly grasp of his subject, and his Library seems to have been a very comprehensive one." (Shastri, *Report On The Search For Sanskrit Manuscripts, 1906-07 to 1910-11*, Asiatic Society 1911, pp. 3-4.) দ্র. সতীশচন্দ্র মিত্র, 'যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাস' প্রথম খণ্ড, ১৯৬৩, পৃ. ৪১৬।

১২. 'দেশাবলি বিবৃতি' এবং অনুরূপ অন্যান্য পুথি সম্পর্কে 'Gazetteer Literature in Sanskrit' নামক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধে শাস্ত্রীমশায় লিখেছেন, "The work written at Patna is really a gazetteer. It was written under the patronage of a Chouhan Jāgirdār of four parganas round Patna on both sides of the Ganges. He employed a learned Brāhmaṇ, named Jagamohan, to give him a description of the fifty-six countries in which the then known world of the Hindus was divided. The work is in the form of an interlocution between Dulāla Vaijala or Deva Vaijala, the patron, and Jagamohan, the compiler. The patron died in the year 1650 A.D.... It may be supposed that by that time the gazetteer of fifty-six countries was either complete or very nearly so. But the death of Vaijala was followed by disorder and the work was neglected. Some parts were lost

and the whole was in confusion.... Many years after his death, the Maga-Brāhmaṇas or the Magii or the Sākadvīpī Brāhmaṇas of the village, which was the home of the Vaijala family, recompiled and revised the fragments available, and in doing so they added the history of the intervening period. They took ten years to revise the work and the dates when reduced to Christian Era come to 1718 and 1728.

"...It is written for the use of contemporaries and contains much useful information about trade, commerce, manufacture, agriculture, history, geography, etc., of the countries." (*JBORS*, March 1918, pp. 14-15.). দ্র. Shastri, *Magadhan Literature*, Patna 1923, p. 132.

১৩. এই বইয়ের ১৭৯ পৃষ্ঠায় টীকা ১ দ্র.

১৪. কৃষ্ণরাম দাসের জন্ম আনুমানিক ১৬৫৬ খৃস্টাব্দে, কলকাতা পরগনার নিমতায়। বাবা ভগবতী দাস। কৃষ্ণরাম কালিকামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, রায়মঙ্গল, শীতলামঙ্গল ও কমলামঙ্গল রচনা করেন। ২০ বৎসর বয়সের প্রথম রচনা কালিকামঙ্গল। রায়মঙ্গল তাঁর তৃতীয় রচনা, রচনাকাল ১৬৮৬-৮৭ খৃ.। দ্র. এই বইয়ে সংকলিত 'কবি কৃষ্ণরাম' প্রবন্ধ।

১৫. Lord William Cavendish Bentinck, বাংলার শেষ গবর্নর জেনারেল ১৮২৮-৩৩ খৃ. এবং ভারতের প্রথম গবর্নর জেনারেল ১৮৩৩-৩৫ খৃ.।

১৬. যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১২০১-৮৭ ব.) ১৮১২ খৃস্টাব্দে যাজপুরে নিমক মহলের দারোগা নিযুক্ত হন। ১৮৩৮-এ তিনি ডেপুটি কালেক্টারের পদ পান, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নয়। "Although by a regulation of 1833 (Regulation IX of that year) the posts of Deputy Collectors were created, it was not till ten years later (1843) that posts of Deputy Magistrates were established."—N. K. Sinha ed.,

The History of Bengal (1757-1905), University of Calcutta 1967, p. 147.

১৭. "এক্ষণে একটা কথা উঠিয়াছে, এডুকেশন 'ফিল্‌টর ডৌন্‌' করিবে। একথার তাৎপর্য্য এই যে, কেবল উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা সুশিক্ষিত হইলেই হইল, অধঃশ্রেণীর লোকদিগকে পৃথক শিখাইবার প্রয়োজন নাই; তাহারা কাজে কাজেই বিদ্বান হইয়া উঠিবে। যেমন শোষক পদার্থের উপরি ভাগে জলসেক করিলেই নিম্নস্তর পর্য্যন্ত সিক্ত হয়, তেমনি বিদ্যারূপ জল, বাঙ্গালি জাতিরূপ শোষক-মৃত্তিকার উপরিস্তরে ঢালিলে, নিম্নস্তর অর্থাৎ ইতরলোক পর্য্যন্ত ভিজিয়া উঠিবে। জল থাকাতে কথাটা একটু সরস হইয়াছে বটে, ইংরাজি শিক্ষার সঙ্গে এরূপ জলযোগ না হইলে আমাদের দেশের উন্নতির এত ভরসা থাকিত না। জলও অগাধ, শোষকও অসংখ্য! এত কাল শুষ্ক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা দেশ উচ্ছন্ন দিতেছিল, এক্ষণে নব্য সম্প্রদায় জলযোগ করিয়া দেশ উদ্ধার করিবেন। কেননা তাঁহাদিগের ছিদ্র গুণে ইতর লোক পর্য্যন্ত রসার্দ্র হইয়া উঠিবে। ভরসা করি, বোর্ডের মণি সাহেব এবারকার আবকারি রিপোর্ট লিখিবার সময়ে এই জলপানা কথাটা মনে রাখিবেন।

"সে যাহাই হউক, আমাদিগের দেশের লোকের এই জলময় বিদ্যা যে এতদূর গড়াইবে, এমত ভরসা আমরা করি না। বিদ্যা জল বা দুগ্ধ নহে যে, উপরে ঢালিলে নীচে শোষিবে। তবে কোন জাতির একাংশ কৃতবিদ্য হইলে তাহাদিগের সংসর্গগুণে অন্যাংশেরও শ্রীবৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু যদি ঐ দুই অংশের ভাষার এরূপ ভেদ থাকে যে, বিদ্বানের ভাষা মূর্খে বুঝিতে পারে না, তবে সংসর্গের ফল ফলিবে কি প্রকারে?" ("পত্রসূচনা", 'বঙ্গদর্শন', বৈশাখ ১২৭৯, পৃ. ৩-৪)

বঙ্কিমচন্দ্র এই মন্তব্য করেন ১৮৭২ খৃস্টাব্দে, কিন্তু 'filtration theory'র উদ্ভব হয়েছিল আরো আগে, লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের রাজত্বের সময়ে (১৮২৮-৩৫ খৃ.)। তখন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার নিয়ামক ছিল 'কমিটি অব পাব্‌লিক ইন্‌স্ট্রাকশন'। এই কমিটির সদস্যদের মধ্যে একদল সংস্কৃত-আরবি-ফারসির মাধ্যমে পুরানো দেশীয় শিক্ষা চালু রাখার পক্ষে ছিলেন, অন্য দল চাইতেন পুরানো শিক্ষাধারা রদ করে ইংরেজির মাধ্যমে ইউরোপীয় শিক্ষা প্রচলিত হোক। সরকারি তহবিল থেকে যে সামান্য টাকা বরাদ্দ ছিল তাতে ব্যাপক ইংরেজি-শিক্ষা সম্ভব ছিল না। অ্যাংলিসিস্টরা বলতেন, কিছু মানুষ

ইংরেজি-শিক্ষা পেলে তাদের অর্জিত জ্ঞান দেশীয় সাহিত্যের মাধ্যমে জনমনে ক্রমে চারিয়ে যাবে। ১৮৩৪-এ টমাস ব্যাবিংটন মেকলে কমিটি অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাক্‌শনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন এবং তাঁর প্রভাবে ইংরেজি-পন্থীরা জয়ী হয়, ফিল্‌ট্রেশন-তত্ত্ব সরকারি নীতি হয়ে ওঠে।

১৮. গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য নামে প্রসিদ্ধ। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য তর্কবাগীশের (১৭৯৯-১৮৫৯ খৃ.) জন্ম ইটার পঞ্চগ্রামে। বাবা জগন্নাথ। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের 'জ্ঞানান্বেষণ' (১৮৩১ খৃ.) পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সাংবাদিক জীবন শুরু করেন। তাঁর নিজের পরিচালনায় প্রকাশিত পত্রিকা 'সম্বাদ ভাস্কর' (১৮৩৯ খৃ.), 'সম্বাদ রসরাজ' (১৮৩৯ খৃ.) এবং 'হিন্দুরত্নকমলাকর' (১৮৫৭ খৃ.)। নৈহাটির চতুষ্পাঠীতে গৌরীশঙ্কর শাস্ত্রীমশায়ের ন-ঠাকুরদা নীলমণি ন্যায়-পঞ্চাননের ছাত্র ছিলেন। শাস্ত্রীমশাই লিখেছেন—

"...মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহাশয় যখন কলিকাতায় পণ্ডিত-মণ্ডলীর অগ্রগণ্য, সেই সময় আমার ন-ঠাকুরদাদার এক ছাত্র আসিয়া তাঁহার সহিত জোটেন। ইঁহার নাম গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য বা গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য। ন-ঠাকুরদাদা গুড়গুড়ে ভট্টাচার্যকে পালন করেন। কিছু দিন রামমোহন রায়ের সঙ্গে থাকিয়া অনেক বিষয়েই তাহাকে সাহায্য করিয়া তিনি উঁহাকে ত্যাগ করেন ও ব্রাহ্মসভার বিরোধী যে ধর্মসভা ছিল, তাহাতেই উপস্থিত হন ও তাহার কর্তা নন্দলাল ঠাকুরের দক্ষিণহস্ত হইয়া ওঠেন। গৌরীশঙ্কর বা গুড়গুড়ে ভট্টাচার্যের নাম আপনাদের অনেকেরই নিকট সুপরিচিত। তিনি সম্বাদভাস্কর, রসরাজ প্রভৃতি বাংলা কাগজের সম্পাদক হইয়া খুব খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ও অর্থ উপার্জন করিয়া গিয়াছেন। গৌরীশঙ্করের গুরুভক্তির বিশেষ অভাব ছিল না। আমাদের বাড়ির কেহ কখনো কলিকাতায় আসিলে তিনি মহা-সমারোহে তাহাকে কলিকাতার বাড়িতে লইয়া যাইতেন ও বৎসর বৎসর ৺পূজার সময় আমার ন-ঠাকুরমাকে ৺পূজার প্রণামীর টাকা ও কাপড় পাঠাইয়া দিতেন।" ("খানাকুল কৃষ্ণনগর : পঞ্চদশ সাহিত্য সম্মিলনীর মূল সভাপতির সম্বোধন", 'মানসী ও মর্মবাণী', কার্তিক ১৩৩১ ব., তৃতীয় অনুচ্ছেদ)

১৯. এই সমালোচক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ১৮৯৩-এর বেঙ্গল লাইব্রেরির রিপোর্টে যোগেন্দ্রনাথ বসুর 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত' সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করেন। এখানে উদ্ধৃতিটি ঈষৎ পরিবর্তিত।

"...The great services of Michael M. Dutta to Bengali literature are (1) the introduction of blank verse into Bengali, thereby giving Bengali poetry a life and vitality which it lacked before ; (2) elevating the tone of Bengali drama by throwing off the shackles of slavish imitation under which it had for a long time laboured. The pandits of Bengal never ventured to go beyond ancient Pauranic stories for their subjects, and in the manner of their writing they always followed the conventional rules of later Sanskrit dramatists— not the very best models to follow. For the first time in Bengal, Michael selected a subject of his own choice and dramatised it in his own fashion. While the motto of the Pandits was 'convention', his motto was 'nature', and the first appearance of his drama cast the whole body of pandits into the shade. All these facts have been very carefully recorded in the biography. Born in the family of a rich orthodox Hindu, receiving the highest education available in his day, and gifted with talents of the highest order, Michael Madhusūdan nevertheless ended his miserable life in a charitable hospital. The life of such a man cannot be without its lessons, or rather warnings. He has none to thank for all his sufferings, all his misery, but himself. He was wayward as a schoolboy, wayward as a son, wayward as a husband, and wayward as a man. His waywardness bore good fruit in literature alone." (*RBL*, 1893, pp. 1-2.)

২০. বিজয় সিংহের কাহিনী আছে সিংহলের পালি গ্রন্থ দীপবংশ এবং মহাবংশে। 'লাঢ়' দেশের রাজা সিংহবাহুর ছেলে বিজয়। অশিষ্ট ব্যবহারের জন্য ৬৯৯ জন অনুচর সহ সিংহবাহু তাঁকে নির্বাসিত করেন। নৌকায় ভাসতে ভাসতে বিজয় লঙ্কায় পৌঁছন বুদ্ধদেবের

পরিনির্বাণের দিনে (৪৮৩ বা ৪৮৬ খৃ. পূ.)। সিংহলে তিনি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই কাহিনীর সত্যাসত্য নির্ণয়ের মতো কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় নি। 'লাঢ়'কে বাংলার 'রাঢ়' অনুমান করে বিজয় সিংহকে বাঙালি বলা হয়। ভিন্ন মতে লাঢ় লাট, অর্থাৎ গুজরাট।

২১. ফা-হিয়েনের জন্ম চতুর্থ খৃস্টাব্দে, চীনের শান্-সি অঞ্চলের উ-ইয়াংয়ে। তাঁর গুরু বৌদ্ধ ভিক্ষু তাও-আন্-এর প্রভাবে ভারত পরিদর্শনে উদ্বুদ্ধ হন। চার জন সঙ্গী নিয়ে ৩৯৯ খৃস্টাব্দে মধ্য এশিয়ার পথে ভারতের উদ্দেশে যাত্রা করেন। তখন উত্তর ভারতের সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য (রাজত্বকাল আ. ৩৮০-৪১৫ খৃ.)। ফা-হিয়েন উত্তর ভারতের প্রধান বৌদ্ধতীর্থগুলি দেখেন। পাটলিপুত্রে তিন বছর ছিলেন। পরে তাম্রলিপ্তিতে আসেন। এখানে তিনি ২২টি সঙ্ঘারাম দেখেছিলেন। তাম্রলিপ্তিতে বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চা, পুথি নকল, বুদ্ধমূর্তির নকশা আঁকায় দু বছর কাটিয়ে এখান থেকে সমুদ্রপথে যবদ্বীপে যান। যবদ্বীপ থেকে ৪১৪ খৃস্টাব্দে স্বদেশে ফেরেন। ফা-হিয়েন সংস্কৃত শিখে ৬ খানি বৌদ্ধশাস্ত্র অনুবাদ করেন। এ ছাড়া 'ফো-কুয়ো-কিং' নামে ভারতভ্রমণ বৃত্তান্ত রচনা করেন।

২২. শাস্ত্রীমশায় এখানে H. H. Risley-র মত অনুসরণ করেছেন। এই মত পরবর্তী গবেষণায় অগ্রাহ্য হয়ে গেছে। দ্রাবিড় কোনো নরগোষ্ঠীর নাম নয়, ভাষাগোষ্ঠীর নাম। বাঙালিদের মধ্যে গোল মাথার প্রাধান্য মোঙ্গল প্রভাবজাত— রিজলের এই ধারণার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ নেই। দ্র. বা-ই, পৃ. ৩৮-৪০।

২৩. আদিশূর নামে কোনো রাজা কনৌজ থেকে পাঁচ জন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনিয়েছিলেন, এই কাহিনী পাওয়া যায় কুলশাস্ত্রে। কুলজিকে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক দলিল মনে করা হয় না। বিভিন্ন কুলজিতে ব্রাহ্মণ আনার তারিখ ভিন্ন ভিন্ন— ৬৫৪, ৬৭৫, ৮০৪, ৮৫৪, ৮৬৪, ৯১৪, ৯৫৪, ৯৯৪, ৯৯৯ শকাব্দ। ফলে কুলশাস্ত্র অনুসারেও আদিশূরের সময় ঠিক করা সম্ভব নয়। দ্র. *HB*-I, pp. 580-81, 625-26; বা-ই, পৃ. ২৬৩-৬৫; বাঙ্গা-ই-১, পৃ. ২৩০-৩৫।

২৪. দ্র. শাস্ত্রী, 'প্রাচীন বাংলার গৌরব' এবং "Contributions of

Bengal to Hindu Civilization", *JBORS*, 1919 Part III & IV, 1920 Part I.

২৫. মহাযান-সূত্রগ্রন্থের মধ্যে অন্যতম দশভূমীশ্বর বা দশভূমক গ্রন্থে বোধিসত্ত্ব বজ্রগর্ভের মুখে বিবৃত হয়েছে বুদ্ধত্ব অর্জনের দশ ভূমি বা দশ পর্যায় সম্পর্কে তত্ত্ব। ২৯৭ খৃস্টাব্দে এই গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল।

২৬. আনুমানিক সপ্তম খৃস্টাব্দের মানুষ দণ্ডী রচিত 'দশকুমারচরিত'-এর 'মিত্রগুপ্তচরিতং নাম ষষ্ঠোচ্ছ্বাস'। 'রামেবুনাম্নে নাবিকনায়কায়…' ইত্যাদি।

২৭. ১০৭ স্তবকে সম্পূর্ণ গৌতম বুদ্ধের প্রশস্তিমূলক সংস্কৃত কাব্য 'ভক্তি-শতক'-এর লেখক রামচন্দ্র কবিভারতী। এই বাঙালি ব্রাহ্মণ রাহুল বাচিস্সর সঙ্ঘরাজের কাছে পড়াশুনো করার উদ্দেশ্যে সিংহলে যান এবং রাহুল তাঁকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দেন। রামচন্দ্র তাঁর কাব্য চতুর্থ পরাক্রমবাহুকে (রাজত্বকাল ১৪১২-৬৭ খৃ.) উৎসর্গ করেন। প্রীত রাজা কবিকে একটি সোনার পদক উপহার দেন এবং বুদ্ধাগম-চক্রবর্তী উপাধি দিয়ে অন্যতম মন্ত্রী করে নেন। দ্র. Sastri, "English Translation of Bhaktiśataka with Sanskrit text", *JBTS* 1893, part 2., pp. 21-43.

২৮. দ্বিজ বংশীদাসের জন্ম ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার পাতুয়ারি গ্রামে। নিশ্চিতভাবে এঁর কাল নির্ণীত হয় নি। আনুমানিক জীবৎকাল সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ।

২৯. মহাযানপন্থী বৌদ্ধ ভিক্ষু হিউএন-ৎসাঙ (৬০০-৬৪ খৃ.) বা ইউয়ান-চুয়াঙের জন্ম চীনের হো-নান প্রদেশের কু-শিহ্ শহরের কাছে ছেন্-পাও-কু গ্রামে। ৬২৯ খৃস্টাব্দে মধ্য-এশিয়ার উত্তর দিক দিয়ে ভারতে আসেন এবং ১৪ বছর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভ্রমণ করেন। নালন্দায় ৫ বছর অধ্যক্ষ শীলভদ্রের কাছে যোগাচার ও বিজ্ঞানবাদ অধ্যয়ন করেন। তাঁর রচিত বইয়ের সংখ্যা ৭৬ খানি, এর মধ্যে ভারতবর্ষ বিষয়ে লেখা 'সি-য়ু-কি' সমকালীন ভারতের ইতিহাস বিষয়ে এক মূল্যবান আকর। ভারতীয় বৌদ্ধপণ্ডিত সমাজে তাঁর নাম হয়েছিল মোক্ষাচার্য ও মহাযানদেব। ৬৪৫ খৃস্টাব্দে তিনি দেশে ফিরে যান।

৩০. "The Smṛti had its origin in the Vaidika Schools, Śākhās or Parṣads, each Śākhā, to preserve the integrity of the Vedic traditions prevailing among its followers, wrote works on the Six-Vedāṅgas, namely (1) Phonetics ; (2) Sacrificial and other Laws ; (3) Grammar ; (4) Philology ; (5) Prosody, and (6) Astronomy. Of the six Vedāṅgas the second called *Kalpa* is broadly divided into two Sections, Śrauta and Smārta. Śrauta deals with Sacrificial rules and serves as a commentary and a supplement to the Brāhmaṇas, while the Smārta deals with domestic and social regulations which derive their authority from the memory of and tradition among the sages. There are many schools which have preserved their *Kalpas* intact, but the majority have left only fragments of their *Kalpas* ; of the former class are the schools of Āpastamba, Baudhāyana, Hiraṇya-Keśin, Āśvalāyana and Kātyāyana ; of the latter, *i.e.*, those whose *Kalpas* we get only in a fragmentary and incomplete condition are Bharadvāja, Maśaka, Goutama, Vaśiṣṭha and so forth. (*Shastri-Cat.*, Vol. III, Smṛti Manuscripts, Preface, pp. vi-vii)

৩১. আদি সিদ্ধাচার্য লুই বাংলা সাহিত্যের প্রথম কবি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কার চর্যাগীতির প্রথম পদ 'কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল' লুইয়ের রচনা। তাঁর লেখা আর-একটি পদ 'ভাব ন হোই অভাব ণ জাই' (২৯ সংখ্যক)। লুইপাদ, লূয়ীপাদ, লূয়ীচরণ— এইভাবেও তাঁর উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলাদেশে মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিবর্তিত শাখা সহজ-যানের সাধকদের মধ্যে লুইয়ের নাম অগ্রগণ্য, ইনি তিব্বতে আদি সিদ্ধাচার্য রূপে স্বীকৃত। এঁর জীবৎকাল সম্পর্কে মতান্তর আছে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ বলেন, সিদ্ধাচার্যদের আবির্ভাবকাল সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে। তিব্বতি ভাষায় অনূদিত লুইয়ের পাঁচ-খানি বইয়ের নাম পাওয়া যায় : ১. 'বজ্রসত্ত্বসাধন', ২. 'বুদ্ধোদয়',

৩. 'ভগবদভিসময়', ৪. 'অভিসময়বিভঙ্গ', ৫. 'তত্ত্বস্বভাবদোহাকোষ-গীতিকাদৃষ্টি'। অভিসময়বিভঙ্গ বইটির সহ-রচয়িতা এবং তিব্বতি ভাষায় অনুবাদক রূপে দীপঙ্করশ্রী জ্ঞানের নাম থাকায় লুইকে তাঁর বর্ষীয়ান্ সমকালীন মনে করা যায়। দীপঙ্করশ্রীর জন্ম ৯৮২ খৃস্টাব্দে। এই সূত্র অনুসারে লুই একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বর্তমান ছিলেন ধরে নেওয়া যায়। লুই নামটির তিব্বতি রূপান্তর মৎস্যান্ত্রাদ, মৎস্যোদর, মচ্ছয়নাথ, মচ্ছেন্দ্র। পূর্ণতর তথ্যের জন্য দ্র. *HB*-I, pp. 337-51 ; *ORC*, pp. 41-45, 444-45 ; *SM*-II, pp. xxxviii-ix ; *BE*, p. 69 ; বা-ই, পৃ. ৭২০ ; চ-গী-প, ভূমিকা।

৩২. বাংলার বৌদ্ধ ঐতিহ্যে দশম-একাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম মনীষী দীপঙ্করশ্রী জ্ঞান অতিশ-এর জন্ম ৯৮২ খৃস্টাব্দে। বিক্রমণিপুর বা বিক্রমপুরের, মতান্তরে বজ্রাসনের পুবে জাহোর বা সাহোরের রাজা কল্যাণশ্রী ও প্রভাবতীর মেজো ছেলে। ছেলেবেলার নাম চন্দ্রগর্ভ। অল্প বয়সে তিনি আচার্য জেতারির সংস্পর্শে আসেন। তাঁর সময়ে ভারতে বৌদ্ধদর্শনের মাধ্যমিক ও যোগাচার শাখার প্রতিপত্তি অম্লান ছিল, অন্য দিকে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা সূচিত হয়েছিল। চন্দ্রগর্ভ কৃষ্ণগিরি বিহারে রাহুল গুপ্তর কাছে তান্ত্রিক তত্ত্ব শেখেন, তাঁর নাম হয় গুহ্যজ্ঞানবজ্র। কিন্তু তান্ত্রিক আচারে আবদ্ধ না থেকে তিনি হীনযান ও মহাযান ধারার এবং ন্যায়, বৈশেষিক, সাঙ্খ্য ও যোগ দর্শনের পূর্ণ জ্ঞান আয়ত্ত করেন। ওদন্তপুরী বিহারের মহাসাঙ্ঘিক আচার্য তাঁর নাম দেন দীপঙ্করশ্রী জ্ঞান। কল্যাণশ্রীর নামের সাদৃশ্যে দীপঙ্করশ্রী নামই স্বাভাবিক, জ্ঞান সেকালের পণ্ডিতদের প্রচলিত উপাধি। মহিলা পণ্ডিতের উপাধি হত জ্ঞান-ডাকিনী। দীপঙ্করশ্রীর উদ্দেশে রচিত স্তোত্রে তাঁর প্রধান তিব্বতি শিষ্য হ্‌ব্রোম্-স্তোন্-পা (Ḥbrom-ston-pa) তাঁকে দীপঙ্করশ্রী নামেই উল্লেখ করেছেন (দ্র. *AT*, pp. 371-76)। তিব্বতে এবং মঙ্গোলিয়ায় তাঁর অতিশ বা অতীশ নাম প্রচলিত। তিব্বতে বলা হয় জো-বো-র্জে (Jo-bo-rje)-অতিশ, মহাপ্রভু অতিশ। অতিশ সংস্কৃতমূলক শব্দ, সম্ভবত 'অতিশয়' অর্থে প্রযুক্ত। তিব্বতি প্রতি-শব্দ ফুল-হ্‌ব্যুঙ্, (phul-ḥbyuṅ), তুরীয় দশাপ্রাপ্ত। ভারতে থাকতেই দীপঙ্করশ্রী অতিশ নামে পরিচিত ছিলেন। নগ্-ছো লো-চা-বা (Nag-tsho lo-tsā-ba) বিক্রমশীল মহাবিহারে ভিখারি বালকদের 'ভালা হো ও নাথ অতিশ' সম্বোধন শুনে তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন (দ্র. *IPLS*, p. 65)। অতিশ ১২ বৎসর বিক্রমশীল মহাবিহারে

দ্বার-পণ্ডিত নারো-পার এবং ২ বৎসর বজ্রাসনে মহাবিনয়ধর শীল-রক্ষিতের ছাত্র ছিলেন। তারপরে সুবর্ণ দ্বীপে (আধুনিক সুমাত্রা) যান সমকালীন বৌদ্ধজগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ধর্মকীর্তি বা ধর্মপালের কাছে পাঠ নিতে। মহাযান বৌদ্ধদর্শনের বিভিন্ন শাখায় গভীরতর জ্ঞান উপার্জন করে ১২ বৎসর পরে দেশে ফেরেন। তখন তাঁর বয়স ৪৪ বৎসর। দেশে ফেরার কিছু দিনের মধ্যে রাজা মহীপালের আহ্বানে ১০২৫/২৬ খৃস্টাব্দে বিক্রমশীল মহাবিহারে মহাচার্য পদে যোগ দেন। ধর্ম সংস্কারের জন্য তিব্বতের রাজা য়ে-শেস্ হওদ্ (Ye-śes ḥod)-এর প্রতিনিধি অতিশকে তিব্বতে নিয়ে যাবার চেষ্টায় ব্যর্থ হন। য়ে-শেস্-এর মৃত্যুর পরে তাঁর ভাইপো ব্যঙ্-ছুব্ হওদ্ (Byaṅ-chub ḥod) রাজা হয়ে নগ্-ছো লো-চা-বা-কে পাঠালেন। তাঁর চেষ্টায় অতিশ তিব্বতে যেতে রাজি হলেন। অতিশ দেশ ছেড়ে যাবেন জেনে মহাবিহারের স্থবির রত্নাকরশান্তি বলেছিলেন, "ভারতীয়দের পক্ষে অতিশ চোখের মতো। সে চলে গেলে আমরা অন্ধ হয়ে যাব।" ১০৪০ খৃস্টাব্দে অতিশ নেপালের উদ্দেশে যাত্রা করলেন, তখন নয়পালের রাজত্বকাল। এক বৎসর নেপালে থেকে ১০৪২য়ে তিব্বতে পৌঁছলেন। জীবনের শেষ ১৩ বৎসর কঠোর পরিশ্রম করে তিনি তিব্বতের ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের পত্তন করেন। তিব্বতে তাঁর মূল কাজ 'বুদ্ধ-শিক্ষা' বা ব্কহ-গ্দমস্-পা (Bkaḥ-gdams-pa) নামে নতুন ধর্ম-সম্প্রদায় গঠন এবং এই সম্প্রদায়ের শাস্ত্রগ্রন্থ 'বোধিপথ-প্রদীপ' রচনা। এই গ্রন্থে তিনি হীনযান, মহাযান ও তান্ত্রিক দর্শন এবং সাধন পদ্ধতির সমন্বয় সাধন করেন। "By systematizing the vital principles of all Buddhist Scriptures into a whole, by combining the ways of cultivation of the two main schools, the one known for its profundity (the School of the Noumenal) and the other for its extensiveness (the School of the Phenomenal), and by synthesizing the teachings of Nāgārjuna, Asaṅga and Śāntideva, this *Śāstra* provides a unique broad path for obtaining good births and emancipation ; and it is the key to the essentials of all sūtras and *Śāstras*". (*EB*, Vol. III, p. 216.)। অতিশ এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ শিষ্যমণ্ডলীর প্রভাবে সমগ্র তিব্বতে ক্রমে শুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম গৃহীত হয় এবং তিনি পূজ্য দেবতার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন।

তেঙ্গুরের তালিকায় লেখক ও অনুবাদক রূপে একাধিক দীপঙ্করের নাম মিশে আছে। যেমন দীপঙ্কর-ভদ্র, ইনি একজন তান্ত্রিক লেখক। দীপঙ্কর-রাজ বা দীপঙ্কর-চন্দ্রও ভিন্ন লেখকের নাম। অতিশের রচনা বলে চিহ্নিত করা যায় ১৯৪ খানি বই। এর মধ্যে ৩৮ খানিতে তাঁর নাম আছে শুধু লেখক রূপে, তিনি লিখেছেন এবং অনুবাদও করেছেন ৭৯ খানি বই। আর অন্য লেখকের বই অনুবাদ করেছেন ৭৭ খানি। ভারতে লুপ্ত হয়ে যাওয়া অনেক বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ তিনি তিব্বতে আবিষ্কার করেন। বৌদ্ধবিদ্যা-চর্চার ইতিহাসে এই সমন্বয়পন্থী মনীষীর মূল রচনা, অনুবাদ ও টীকা বিশিষ্ট সম্পদ।

১০৫৪ খৃস্টাব্দে নবম চান্দ্র মাসের ১৮ তারিখে লাসার কাছে স্ঞে-থঙ্‌য়ে (Sñe-thań) তাঁর মৃত্যু হয়।

অতিশের উদ্দেশে নিবেদিত একটি তিব্বতি প্রশস্তি-শ্লোক—

মান্যবর আসেন নি যত দিন
তিব্বতের মানুষ বাস করত আঁধারে, দৃষ্টিহীনের মতো ;
যে-ক্ষণে এলেন তিনি, সেই প্রজ্ঞাবান্ মহাজ্ঞানী,
জ্ঞানসূর্যের উদয় হল এদেশে।

৩৩. চর্যাগীতির ৩৪ সংখ্যক পদ 'সুনকরুণরি অভি ন-চারেঁ কাঅবাক্‌চিঅ' দারিকের রচনা। শাস্ত্রীমশাই নেপালে এক লামার কাছ থেকে এঁর আর-একটি পদ 'ফোইরে বংশা বাজিরে বীণা' সংগ্রহ করেছিলেন। দারিক নিজেকে লুইপাদের 'পাঅপএ'— শ্রীচরণের অনুগ্রহে দ্বাদশ ভুবনে লব্ধ— বা সিদ্ধ বলেছেন। তেঙ্গুরের তালিকায় তাঁর লেখা 'কালচক্রতন্ত্ররাজস্য-সেকপ্রক্রিয়াবৃত্তি বজ্রপাদউদ্‌ঘাটিনীনাম', 'চক্রসম্বর-সাধনতত্ত্বসংগ্রহনাম', 'চক্রসম্বরমণ্ডলবিধিতত্ত্ব-অবতারনাম', 'চক্রসম্বরস্তোত্র-সর্বার্থসিদ্ধিবিশুদ্ধচূড়ামণিনাম', 'যোগানুসারিণীনাম-বজ্রযোগিনীটীকা', 'বজ্রযোগিনীপূজাবিধি', 'কংকালতারণসাধন', 'ওড্ডিয়ানবিনির্গত-মহা-গুহ্যতত্ত্ব-উপদেশ', 'সপ্তমসিদ্ধান্ত', 'তথতাদৃষ্টি', 'প্রজ্ঞাপারমিতাহৃদয়-সাধন'— এই এগারোখানি বইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'ওড্ডিয়ান-বিনির্গত-মহাগুহ্যতত্ত্ব-উপদেশ' বইয়ের নামের সঙ্গে দারিককে লীলা-বজ্রের শিষ্য বলে উল্লেখ করা আছে। লীলাবজ্র বজ্রযোগিনী-সাধনের অন্যতম প্রবর্তক, 'অদ্বয়সিদ্ধি'র লেখিকা লক্ষ্মীঙ্করার শিষ্য।

৩৪. কৃষ্ণাচার্য, কৃষ্ণপাদ বা কাহ্নর ১৩টি গান চর্যাগীতিতে সংকলিত। ভণিতায়

নাম আছে কাহ্ন, কাহ্নু, কাহ্ন্, কাহ্নি, কাহ্নিল, কাহ্নিলা। ৩ সংখ্যক গানে নামান্তর বিরুআ। 'বৌদ্ধগান ও দোহা'য় শাস্ত্রীমশায় কৃষ্ণাচার্যের 'দোহাকোষ' প্রকাশ করেছেন। এ ছাড়াও তেঙ্গুরের তালিকায় 'আলি-চতুষ্টয়', 'কায়াপরীক্ষাভাবনাকর্ম', 'কুরুকুল্লাসাধন', 'কূর্মপাদীবারাহী-সাধন', 'কৃষ্ণযমারিবুদ্ধসাধন', 'গণচক্রবিধি', 'গণপতিবলিবিধি', 'চণ্ডালীযন্ত্র', 'চৈত্যবিধি', 'ডাকিনীবজ্রপঞ্জরনামমহাতন্ত্ররাজকল্পমুখবন্ধ' প্রভৃতি বইয়ের লেখক কৃষ্ণ বা কাহ্ন। সব বই একজনের নয়। সব গবেষকই একাধিক কৃষ্ণাচার্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

৩৫. সরহ নামে একাধিক বৌদ্ধ তান্ত্রিক-সাধক ছিলেন। চুরাশি সিদ্ধাচার্যের তালিকায় সরহ ওরফে রাহুলভদ্রের নাম আছে। অন্যত্র তাঁর নামান্তর সরোজবজ্র, 'সরোরুহবজ্র, পদ্মবজ্র। শাস্ত্রীমশায় 'বৌদ্ধগান ও দোহা'য় সরোজবজ্রের 'দোহাকোষ' প্রকাশ করেছেন। তেঙ্গুরের তালিকায় সরহের নামে দোহাকোষ, গীতিকা ও বজ্রযানসাধনা বিষয়ক ২১ খানি বইয়ের নাম আছে। যেমন 'দোহাকোষগীতি', 'দোহাকোষনামচর্যাগীতি', 'দোহাকোষনামমহামুদ্রা-উপদেশ', 'বসন্ততিলকদোহাকোষগীতিকা', 'বাক্‌কোষরুচিরস্বরবজ্রগীতা', 'ত্রৈলোক্যবশংকরঅবলোকিতেশ্বরসাধন'—ইত্যাদি। সব বই একজনের লেখা নয়। তিব্বতি লেখক সুম্‌পা তাঁর 'পাগ্‌-সাম্‌-জোন্‌-জাং' বইয়ে একজন সরহের পরিচয় দিয়েছেন। প্রাচ্য দেশের রজ্ঞী শহরে এঁর জন্ম। কোনো ব্রাহ্মণ ও ডাকিনীর ছেলে। চন্দনপাল নামে কোনো রাজার আমলের এই সরহ ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ বিদ্যায় পারংগম ছিলেন। ইনি রাজা রত্নপাল ও তাঁর মন্ত্রীদের ধর্মান্তরিত করেন। নালন্দায় মহাচার্য হন। ওড়িশায় মন্ত্রযান শেখেন এবং মহারাষ্ট্রে গিয়ে এক যোগিনীর সঙ্গে সাধনা করে 'সিদ্ধ' হয়ে সরহ নামে পরিচিত হন। তিব্বতি ঐতিহাসিক তারনাথ দুজন সরহকে চিহ্নিত করেন। বয়সে যিনি বড়ো তিনি রাহুলভদ্র এবং যিনি ছোটো তিনি শাবরি। নেপালে নকল করা 'দোহাকোষ'-এর প্রাচীনতম পুথির তারিখের হিসাবে দোহাকার সরহ একাদশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে বর্তমান ছিলেন অনুমান করা যায়। দ্র. *SM*-II, pp. xliv, cxvi ; *HB*-I, pp. 339-42, 348-49 ; বৌ-গা-দো, পৃ. ২৬-২৭ ; চ-গী-প, পৃ. ১৯-২০।

৩৬. শাস্ত্রীমশায় 'বৌদ্ধগান ও দোহা'য় সরোজবজ্রের দোহাকোষের সঙ্গে অদ্বয়বজ্রের সংস্কৃত টীকা প্রকাশ করেছেন। এ ছাড়া বরোদা থেকে তাঁর

সম্পাদনায় 'কুদৃষ্টিনির্ঘাতনম্', 'মূলাপত্তয়ঃ', 'তত্ত্বরত্নাবলী', 'পঞ্চতথাগত-মুদ্রা-বিবর্ণনম্' ইত্যাদি অদ্বয়বজ্রের ২১টি ছোটো রচনা 'অদ্বয়বজ্র-সংগ্রহ' নামে প্রকাশিত হয় (দ্র. *G.O.S.* No. XL, 1927)। সাধনমালায় 'সিংহনাদ', 'বজ্রবারাহী', 'সপ্তাক্ষরা' নামে তাঁর তিনটি রচনা সংকলিত হয়েছে। তেঙ্গুরের তালিকায় তাঁর লেখা ও অনুবাদ করা বইয়ের সংখ্যা ৫৪ খানি ; নামের সঙ্গে পণ্ডিত, মহাপণ্ডিত, আচার্য, অবধূত, উপাধ্যায় প্রভৃতি বিশেষণ যুক্ত এবং বাঙালি বলে অভিহিত। তারনাথের উল্লেখ অনুসারে অদ্বয়বজ্র পালরাজ মহীপালের (রাজত্বকাল ৯৮৮-১০৩৮ খৃ.) সমসাময়িক।

৩৭. অভয়াকরগুপ্তের জন্ম বাংলাদেশে, শিক্ষা-দীক্ষা মগধে। তারনাথের বিবরণ অনুসারে রাজা রামপাল (রাজত্বকাল ১০৭৭-১১২০ খৃ.) তাঁকে বজ্রাসন বিহারের উপাধ্যায় নিয়োগ করেন। পরে তিনি বিক্রমশীল মহা-বিহারের উপাধ্যায় নিযুক্ত হন। তিব্বতি ভাষা ভালো জানতেন। তেঙ্গুরের তালিকায় তাঁর লেখা ও অনুবাদ করা বইয়ের সংখ্যা ২৪ খানি। এ ছাড়া একটি রচনা 'সাধনমালা'য় সংকলিত হয়েছে। দ্র. *Tāranāth*, pp. 313-15 ; Bénoytosh Bhattacharyya ed., *NIṢPANNAYOGĀVALĪ*, Baroda 1949.

৩৮. জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়র্সন (১৮৫১-১৯৪১ খৃ.) উত্তরবঙ্গ থেকে মানিকচন্দ্র ও গোপীচন্দ্রের গান সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। (*JASB*, Vol. XLVII : 1, 1878, pp. 135-238 ; Vol. LIV : 1, 1885, pp. 35-55)। তারপর থেকে এই ধারার আরো অনেক গান সংগ্রহ করেন শিবচন্দ্র শীল, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য প্রভৃতি। নলিনীকান্ত ভট্টশালীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় 'ময়নামতীর গান' (১৯১৪ খৃ.)। 'গোপীচন্দ্রের গান' নামে ২ খণ্ডে (১৯২২-২৪ খৃ.) কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে পূর্ণতর সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল দীনেশচন্দ্র সেন ও বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায়। সংগৃহীত পুথিগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীর, তবে এই গানের ঐতিহ্য অনেক পুরানো। দ্র. Sukumar Sen, "The Nāth Cult", *CHI*, Vol. IV, pp. 280-90 ; কল্যাণী মল্লিক, 'নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনপ্রণালী', কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫০ খৃ.।

৩৯. পাণ্ডুভূমি বিহারে রচিত 'সুবিশদ-সম্পুট' নামে হেবজ্র-তন্ত্রের টীকার

লেখক বৃদ্ধ-কায়স্থ টঙ্কদাস বা ডঙ্গদাস। তেঙ্গুরের তালিকায় উল্লেখ আছে ইনি বাংলার রাজা ধর্মপালের সমকালীন।

৪০. চুরাশি সিদ্ধাচার্যের অন্যতম রত্নাকর শান্তি বিক্রমশীল মহাবিহারের পুব-দুয়ারের দ্বার-পণ্ডিত ছিলেন। ইনি দীপঙ্করশ্রী জ্ঞানের অন্যতম গুরু এবং তিব্বতি সূত্র অনুসারে দীপঙ্করশ্রী যখন বিক্রমশীল থেকে তিব্বতের উদ্দেশে যাত্রা করেন (১০৪০ খৃ.) তখন রত্নাকর এই বিহারের ভারপ্রাপ্ত স্থবির ছিলেন। রত্নাকর সম্ভবত মগধের মানুষ এবং ৭ বৎসর সিংহলে ধর্মপ্রচার করেন। তেঙ্গুরের তালিকায় তাঁর লেখা 'হেবজ্র-পঞ্জিকা (মুক্তিকাবলী-নাম)', 'সুখদুঃখদ্বয়পরিত্যাগদৃষ্টি', 'বজ্রতারাসাধন' প্রভৃতি ১৮ খানি বইয়ের নাম পাওয়া যায়। এ ছাড়া তিনি 'অন্তর্ব্যাপ্তি-সমর্থন' নামে ন্যায়শাস্ত্রের ও 'ছন্দোরত্নাকর' নামে ছন্দের বই লেখেন। তাঁর 'বজ্রতারা-সাধনম্' সাধনমালায় প্রকাশিত হয়েছে। শাস্ত্রীমশাই অনুমান করেন চর্যাগীতির ১৫ সংখ্যক (সঅ সম্বেঅণ সরুঅ বিআরেঁতে···) ও ২৬ সংখ্যক (তুলা ধুণি ধুণি আঁসুরে আঁসু) পদ দুটির কবি শান্তিপাদ এবং রত্নাকর শান্তি একই ব্যক্তি। তাঁর উপাধি ছিল কলিকালসর্বজ্ঞ। দ্র. *IPLS*, p. 63 ; *2500 years*, pp. 202-03 ; *SM*-II, pp. cxi-xii ; *Tāranāth*, p. 295 ; বৌ- গা- দো, পৃ. ২৮, শাস্ত্রী, 'রত্নাকর শান্তি', সা-প-প, ১ম সংখ্যা ১৩৩৮ ব.।

৪১. দ্র. এই সংকলনে 'বাংলা সাহিত্য : বর্তমান শতাব্দীর' প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদ।

৪২. 'বিশ্বকোষ' প্রকাশের আয়োজন শুরু করেন রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় এবং প্রথম খণ্ড সম্পাদনা করেন তাঁর ভাই ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯ খৃ.)। নগেন্দ্রনাথ বসু (১৮৬৬-১৯৩৮ খৃ.) এই উদ্যোগ সম্পূর্ণ করেন ২৭ বৎসরের পরিশ্রমে। ২২ খণ্ড বিশ্বকোষের শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৩১৮ বঙ্গাব্দে। ১৮৯৪-এর বেঙ্গল লাইব্রেরির রিপোর্টে শাস্ত্রীমশায়ের মন্তব্য, "The Bengali encyclopedia entitled *Vishvakosh* is steadily raising in public estimation. Babu Nagendra Nāth Basu, who single-handed has issued four volumes of the work in the course of three or four years, deserves very high praise. He has embodied in

his encyclopedia not only the results of modern researches in Science and Archæology, but has himself discovered a very large number of interesting inscriptions and manuscripts. Fully alive to the importance of Hindu customs and Sanskrit literature, he sets a very high value on the researches of European Oriental scholars." দ্র. *RBL* 1894, pp. 4-5.

২. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির অভিভাষণ : ১৩২১

'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ' এই তিনটি শব্দের ব্যাখ্যা আবশ্যক। বঙ্গীয় অর্থ কী, সাহিত্য শব্দের অর্থ কী, পরিষৎ শব্দের অর্থ কী ও এই তিনটি জড়াইয়াই বা অর্থ কী ?

বঙ্গীয় শব্দের কী অর্থ, তাহা আমি জানি না, শব্দটি বাংলাভাষায় চলিত নাই। চলিত যে শব্দ আছে, তাহা বাঙ্গালা। বাঙ্গালা সাহিত্য বলিলে বুঝিতে পারি, হয় বাঙ্গালা দেশের, না-হয় বাঙ্গালা ভাষার সাহিত্য। কারণ, বাঙ্গালা শব্দে বাংলাদেশও বুঝাইতে পারে, ভাষাও বুঝাইতে পারে। বঙ্গীয় শব্দটি কিন্তু সেরূপ নহে, বঙ্গ শব্দের উত্তর ঈয় প্রত্যয় করিয়া ও গকারের সঙ্গে যে অ-কার ছিল, তাহাকে লোপ করিয়া বঙ্গীয় শব্দ হইয়াছে। বঙ্গ শব্দের উত্তর ঈয় প্রত্যয় সংস্কৃতে দেখি নাই। বঙ্গীয় শব্দ সংস্কৃত নহে। সংস্কৃত ব্যাকরণের মতে সব শব্দের উত্তর ঈয় প্রত্যয় হইতে পারে, তাই বলিয়া আমরা বাঙালি, বাংলাভাষায় কথা কই, বাংলার ব্যাকরণ লইয়া নাড়াচাড়া করি, বাংলার জন্য, বাংলা-ভাষার উপকারার্থ বঙ্গ শব্দের উত্তর ঈয় প্রত্যয় করিতে আমাদের কতদূর অধিকার আছে, জানি না। যদি সংস্কৃতের মতো বাংলায় ঈয় প্রত্যয়ের পুরা মাত্রায় অধিকার থাকিত, তাহা হইলে খালীয়, নালীয়, রেলীয়, মেলীয়, ডেঙ্গীয়, গাছীয়, লতীয় প্রভৃতি কত কথাই আমরা তৈয়ার করিয়া লইতে পারি। বঙ্গীয় কথাটা দোআঁশলা হইয়া গিয়াছে। নামের মধ্যে হইয়া গিয়াছে, এখন আর শুদ্ধ করার উপায় নাই। এই নাম ২০ বৎসর চলিয়া গিয়াছে, ইহার আবার কত শাখা-প্রশাখা হইয়াছে, এখন আর বদল করা পোষায় না। কিন্তু মানে তো একটা করিতে হইবে ? বঙ্গ বলিতে সংস্কৃত ভাষায় কোন্ দেশ বুঝাইত ? অনেক সময় মনে হয়, সারা বাংলাই বুঝাইত। কিন্তু অনেকের মত যে, ও শব্দে শুধু পূর্ববাংলা বুঝাইত, ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট। কালিদাস বঙ্গ শব্দে গঙ্গার দুই ধার বুঝিয়াছেন। লোকে যখন অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, বলে, তখন এখন-কার সমস্ত বাংলাই বুঝায়, কিন্তু বঙ্গাল শব্দ নিতান্ত নূতন নয়, দু-চার খানি প্রাচীন পুঁথিতে এবং দু-চার খানি শিলাপত্রে বঙ্গাল শব্দ দেখা

গিয়াছে। যখন বঙ্গাল শব্দটা বাঙ্গালা রূপ ধারণ করিয়া খুব চল্‌তি হইয়া গেল. তখন বঙ্গ বলিতে শুদ্ধ পূর্ববাংলা বুঝায়। বল্লাল সেনের [রাজত্বকাল ১১৫৮-৭৯ খৃ] রাজত্বে পাঁচটি ভাগ ছিল— বঙ্গ, বাগড়ি, রাঢ়, বরেন্দ্র. মিথিলা। এ বঙ্গ বলিতে গেলে পূর্ববাংলা ভিন্ন আর-কিছু বুঝায় না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কিন্তু কেবল পূর্ববাংলার নয়, সারা বাংলারই সাহিত্য-পরিষৎ। সুতরাং আমাদের বঙ্গীয় শব্দের অর্থ সারা বাংলা করিয়া লইতে হইবে। আর এই সারা বাংলা বলিতে বর্ধমান, প্রেসিডেন্সি, রাজশাহি, ঢাকা, চট্টগ্রাম ডিভিসন ও তাহার উপর সিলেট, গোয়ালপাড়া এবং পুর্নিয়া, ভাগলপুর ও ছোটোনাগপুরের খানিকটা বুঝিতে হইবে। বাদ পড়িবে প্রায় সমস্ত দারজিলিংটা। বঙ্গীয় শব্দের অর্থ এই হইল।

এখন সাহিত্য শব্দের অর্থ কি ? সাহিত্য শব্দটা সংস্কৃত বটে, কিন্তু বড়ো বেশি পুরানো সংস্কৃত শব্দ বলিয়া বোধ হয় না। সহিত শব্দের উত্তর 'ষ্ণ্য' করিয়া সাহিত্য শব্দ হইয়াছে ; কিন্তু কিসের সহিত ? বোধ হয়, ব্যাকরণের সহিত পড়া হইত বলিয়া কাব্য, নাটক, অলংকার প্রভৃতিকে সাহিত্য নাম দেওয়া হইয়াছে। সংস্কৃতে সাহিত্য শব্দে স্মৃতি, জ্যোতিষ. বেদ. দর্শন. এ-সকল কিছুই বুঝায় না, কেবল বুঝায়. কাব্য, নাটক ও অলংকার। যাঁহাদের হাতে ৬০/৭০ বৎসর আগে বাংলা-ভাষার ভার পড়িয়াছিল, তাঁহারা সংস্কৃতে সাহিত্য বৈ আর জানিতেন না ; সুতরাং সাহিত্য শব্দটার অর্থ বাড়াইয়া লিটারেচার শব্দের সমান করিয়া তুলিয়াছেন। এখন লিটারেচার শব্দের অথ কী ? লিটারেচার শব্দের প্রথম অর্থ ছিল— কাব্য, নাটক. অলংকার ; কিন্তু পরে দাঁড়াইয়াছে যাহা-কিছু লেখা হইয়াছে, তাহাই লিটারেচার। দিনকতক আগে বিজ্ঞান ও দর্শনে লিটারেচার শব্দের প্রয়োগ হইত না. এখন তাহাও হইতেছে। এখন গবর্নমেণ্টের ফসলের রিপোর্ট দিতে হইলেও সে সম্বন্ধে যাহা-কিছু লেখা আছে. সব পড়িতে হয়, সে সম্বন্ধে সব লিটারেচার পড়িতে হয়। জেলেদের মাছ ধরা সম্বন্ধেও এখন মস্ত লিটারেচার হইয়াছে। আমাদেরও এখানে সাহিত্য শব্দের এইরূপ মুলুক-জোড়া অর্থ লইতে হইবে। যদি ইহার অর্থ সংকোচ করিতে হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞান ও দর্শনকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে বাহির করিয়া দিতে হয়। এ পরিষদে

হেমবাবু, যতীন্দ্রবাবু [যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, ১২৬৯-১৩৩২ ব.], হীরেনবাবু [হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৮৬৮-১৯৪২ খৃ.] রামেন্দ্রবাবুর [রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ১৮৬৪-১৯১৯ খৃ.] স্থান থাকে না। ইংরাজিতে লিটারেচার শব্দ যেমন সংস্কৃতে সেইরূপ একটি শব্দ আছে। লিটারেচার অর্থ বরং সংকুচিত, কিন্তু সে শব্দের সংকোচ কোথাও নাই, সেই শব্দ 'বাঙময়'। ইংরাজি লিটারেচার অর্থে যাহা-কিছু লেখা হইয়াছে, তাহাই বুঝাইবে, কিন্তু যাহা লেখা হয় নাই, সেখানে ও শব্দ যাইবে না ; 'বাঙময়' লেখাই হোক, না লেখাই হোক, সর্বত্র যাইবে। মানুষের মুখ হইতেই হোক, আর কলমের মুখ হইতেই হোক, বাক্ হইলেই বাঙময়ের অধিকার আসিয়া যাইবে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মধ্যে যে সাহিত্য শব্দ আছে, তার অর্থ কোনোরূপ সংকোচ না করিয়া বাঙময় অর্থেই লইতে হইবে, নহিলে পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের আলেখ্য ছড়াগুলি, মাঝিদের সারি গান এবং অনেক ধর্মের ছড়া ইত্যাদি জিনিসগুলি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অধিকারের মধ্যে আসিতে পারে না।

এখন পরিষৎ শব্দের অর্থ কী ? পরি পূর্বক সদ্ ধাতু ক্বিপ্ করিয়া পরিষদ্ শব্দ হইয়াছে। ইহার অর্থ চারি দিকে বেড়িয়া বসা। অতি পূর্বকালে বেদের এক-একটি শাখা যাঁহারা অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহাদিগকে চরণ বলিত। এক-এক জায়গায় এক-এক চরণের যতগুলি লোক হইত, তাঁহাদের লইয়া এক-একটি পরিষৎ হইত। কতগুলি লোক লইয়া পরিষৎ হইবে, তাহা ঠিক ছিল না। ক্রমে পরিষৎ শব্দ রাজসভায় উঠিল, সেখানে পরিষদে কতকগুলি মেম্বর হইবে, তাহা ঠিক হইয়া গেল। ক্রমে যাহারা রাজ পরিষদে যায়, তাহারা পারিষদ হইল, ক্রমে পারিষদ শব্দে খোশামুদে বুঝাইতে লাগিল। পরিষৎ পারিষদ দুই শব্দই ক্রমে উঠিয়া গেল, ক্রমে সভা, সভ্য ও সদস্য শব্দ অধিক ব্যবহার হইতে লাগিল। পণ্ডিত লোকের সভাকে বরাবরই লোকে পরিষৎ বলিয়া আসিয়াছে। কালিদাসও বলিয়াছেন— "অভিরূপভূয়িষ্ঠা পরিষৎ।" এইরূপ একরূপ কার্যে বা একরূপ লেখাপড়ায় বা একরূপ ব্যবসায়ে যাহারা দক্ষ, তাদের লইয়া ইউরোপে যে সভা হইত তাহার নাম ছিল ইউনিভার্সিটি। তখন জুতাওয়ালার ইউনিভার্সিটি ছিল, জুতা সেলাইওয়ালার ইউনিভার্সিটি ছিল, দরজির ইউনিভার্সিটি ছিল, ময়রার, ছাতাওয়ালার

ইউনিভার্সিটি ছিল, জেলের ইউনিভার্সিটি ছিল। এখন অন্য ব্যবসায়ের ইউনিভার্সিটির নাম হইয়াছে guild, ইউনিভার্সিটি নামটা ক্লারিক [cleric] অর্থাৎ লেখাপড়ার ব্যাবসা যাঁরা করেন, তাঁদেরই একচেটিয়া হইয়া গিয়াছে। পরিষৎ শব্দটাও সেইরূপ বৈদিক চরণ ছাড়িয়া, রাজসভা ছাড়িয়া সাহিত্যেরই একচেটিয়া হইয়া যাইতেছে। দশ জনে মিলিয়া একত্র কাজ করিলে পরিষৎ হইবে, দুই জনে করিলে হইবে না।

তাহা হইলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ শব্দে আমরা কী বুঝিব ? বুঝিব এই যে, বাংলাদেশবাসী দশ জন লোক একত্র হইয়া, বাংলা সাহিত্যের আলোচনা যেখানে করে, তাহার নাম বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। এখানে একটা কথা নূতন আছে, বাংলাদেশবাসী। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, এই তিনটি শব্দের মধ্যে বাংলাদেশবাসী বুঝায়, এমন কোনো শব্দ নাই। কিন্তু ঐটি ঊহ্য না করিলে মানেই হয় না। কারণ, চীনের লোক দশ জনে যদি বাংলা সাহিত্যের আলোচনা করেন, তাহা হইলে আপনারা সেই দশ জনকে কি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বলিবেন ? যদি চীন দেশের লোক কলিকাতা আসিয়া আপনাদের মেম্বর হয়, তাঁহাকে মেম্বর করিতে আপনাদের কোনো আপত্তি হইতে পারে না। বঙ্গদেশবাসী বলিতে গেলে বঙ্গদেশবাসী খৃস্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, ইহুদি, জৈন সব বুঝাইবে। সুতরাং ইহাদের বাঙ্ময় সব পরিষদের অধিকারে আসিবে। পৃথিবীর কিছুই বাকি থাকিবে না। কিন্তু এখনো সবাই আসে নাই। যাহারা আসিয়াছে, তাহারা অধিকাংশ— এমন-কি, শতকরা ৯৯ জন হিন্দু, এক-জন মুসলমান। মুসলমানেরা যাহাতে সাহিত্য-পরিষদের মেম্বর হন, সেটি বড়োই বাঞ্ছনীয়। কারণ, গত ৭০০ সাত শত বৎসর ধরিয়া মুসলমান ছাড়িয়া বাংলার কোনো কাজই হইতেছে না। অনেকে মনে করেন, মুসলমানেরা আরবি পারসি লইয়া থাকেন, বাংলার জন্য তাঁহাদের মায়া নাই, তাঁদের দৃষ্টি পশ্চিমের দিকে। কিন্তু সে কথা তো সম্পূর্ণ সত্য নহে, অনেক বাংলা বই তাঁহারা লিখিয়াছেন। তাঁহারা বাংলায় একটা নূতন ভাষা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, নূতন অক্ষরের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সে ভাষার নাম মুসলমানি বাংলা, ঠিক যেন বাংলা দেশের উর্দু। তাঁহারা যে বাংলা অক্ষর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তার নাম ফুলনাগরি বা কাঠনাগরি, এখনো সিলেটের মুসলমানেরা অত্যন্ত পবিত্র বলিয়া তাঁহাদের

যত-কিছু বাংলা ধর্মপুস্তক সেই অক্ষরে লিখিয়া থাকেন। মুসলমানের সহিত বাংলাভাষার সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ, তাহা এক দৃষ্টান্তে বুঝা যাইবে। কোনো জাতি আপনার ব্যাকরণের বিভক্তিগুলি পরের ভাষা হইতে লয় না, কিন্তু মুসলমানেরা আমাদের সমস্ত বিভক্তিগুলি দিয়াছেন। আমরা প্রথমার বহুবচনে যে 'রা' বলি, সেটা আমরা মুসলমানদের নিকট পাইয়াছি। আমাদের 'দিগকে', 'দিগের', 'দের' প্রভৃতি বিভক্তিও পারসি হইতে লওয়া।[১] সুতরাং বাংলা সাহিত্যের উন্নতি করতে গেলে মুসলমানের সহায়তা ভিন্ন হইতেই পারে না। আমাদের অভিধানের এক-তৃতীয়াংশ কথা মুসলমানি। আমাদের দেশের জনকয়েক লেখক মনে করিয়াছিলেন যে, বাংলা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন : সুতরাং সংস্কৃত ছাড়া শব্দ ব্যবহার করিব না, পারসি শব্দ সব উঠাইয়া দিব। কিন্তু তাঁদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। পারসি শব্দ এখনো অবাধে চলিতেছে। আরো এক কথা, যদি আপনারা বাংলা-সাহিত্য-পরিষৎ নাম দিতেন, তাহা হইলে মুসলমানদিগকে কতক পরিমাণে বাদ দিতে পারিতেন। যাঁহারা বাংলা লিখিতেছেন, তাঁহাদিগকে লইতেন, যাঁহারা না লিখেন, তাঁহাদিগকে লইতেন না। কিন্তু আপনারা নাম দিয়াছেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এবং বাঙালি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য যে-সকল সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার উপর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অধিকার বিস্তার করিতে যাইতেছেন, তবে বাংলায় বসিয়া যাঁহারা ফারসি, উর্দু ও মুসলমানি বাংলায় বহু-সংখ্যক পুস্তক লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বাদ দেন কী করিয়া ? সেও তো বঙ্গীয় সাহিত্য !

আমার বোধ হয়, প্রথম হইতেই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অধিকার একটু সংকোচ করিয়া লইলেই ভালো হইত। এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন করিবার সময় স্যার উইলিয়ম জোন্‌স বলিয়াছিলেন যে, এশিয়ার চতুঃসীমার মধ্যে স্বভাবে যাহা সৃষ্টি করিয়াছে, অথবা মানুষে যাহা সৃষ্টি করিয়াছে, সমস্তই এ সভার অধিকারভুক্ত হইবে।[২] অর্থাৎ সমস্ত জিনিসই অধিকারভুক্ত হইবে, তবে এশিয়ার বাহিরে নয়, এশিয়ার মধ্যে চাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ইহাকে ছাড়াইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন, এখন তাঁহারা যদি কখনো দশ জন ফ্রেঞ্চ মেম্বর পান, সেই ফ্রেঞ্চ মেম্বরদের অনুরোধে সমস্ত ফরাসি সাহিত্য আসিয়া পড়িতে পারে। এতটা বাড়া-

বাড়ি না করিলেই ভালো হয়। বাংলার বাহিরে যাবার বন্দোবস্তটা না করিলেই ভালো হয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রসার যখন এত বড়ো, আশা যখন এত উচ্চ, দৌড় যখন এত দূর, তখন কোন্ কাজে ইহার বিশেষ অধিকার, তাহা বলা বড়ো কঠিন। যদি বলি, বিজ্ঞানেই অধিকার, তবে ভাষা-তত্ত্বওয়ালারা চটিয়া যাইবেন। যদি বলি, বৈষ্ণবদের কীর্তনের উপরেই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অধিকার বেশি, তাহা হইলে ব্রাহ্মণেরা বলিবেন, আমাদের কথাটা সাহিত্য-পরিষদে উঠিবে না। তাই ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলাম, কোন্ বিষয়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বেশি অধিকার বা বিশেষ অধিকার, সে বিষয়ে মাথা ঘামাইবার আমার দরকার নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রকাণ্ড অধিকারের মধ্যে কোন্ বিশেষ বিষয়ে আমার দুটা কথা কহিবার অধিকার আছে, তাহারই কথা কহিব এবং স্থির করিলাম, সে কথাটি পুঁথি খোঁজা।

ছাপাখানা আমাদের দেশে বেশি দিন হয় নাই। যাঁহারা বড়ো পুরানো খবর জানেন, তাঁরা হয়তো বলিবেন যে, হাল্‌হেড সাহেব ১৭৭৯ [১৭৭৮ খৃ.] সালে হুগলিতে ছাপাখানা খুলিয়াছিলেন।[৩] সে-সকল তো পুরাণের কথা : আসল কথা এই যে, ছাপাখানাটা ৬০/৭০ বৎসর হইল, খুব বেশি পরিমাণে হইয়াছে; তাহার আগে সকলেই হাতে লিখিয়া পড়িত, আমিও দুই-একখানি পুঁথি হাতে লিখিয়া পড়িয়াছি। সবই লেখা হইত হাতে, একখানা হাতের লেখা পুঁথি দেখিয়া দশ জন নকল করিয়া লইত। লোকের যাহা-কিছু বিদ্যা-বুদ্ধি, সাহিত্য-বিজ্ঞান ছিল, সব হাতের লেখা পুঁথিতেই থাকিত। ক্রমে যখন ইংরাজি পড়া-শুনা খুব আরম্ভ হইল, ছাপা বহি খুব চলিতে লাগিল, লোকে আর পুঁথির তত আদর করিত না। ভট্টাচার্য মহাশয় পুঁথি পড়িয়া পণ্ডিত হইয়াছিলেন, পৈতৃক পুঁথিগুলিকে প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় দেখিতেন, সর্বদা সেগুলিকে ঝাড়া-ঝুড়া করিতেন, পুরু কাপড়ে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখিতেন। ভাদ্র মাসে পুরা রৌদ্র পাইয়া তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না— সেই দিন পুঁথিগুলিকে রৌদ্রে দিতেন। সমস্ত দিন নিজে পাহারা দিতেন, পাছে হঠাৎ জল হইলে পুঁথিগুলি ভিজিয়া যায়। সন্ধ্যার পূর্বে সেইগুলিকে পেতেনে সাজাইয়া রাখিয়া তবে ভট্টাচার্য মহাশয়

নিশ্চিন্ত হইতেন। তাঁহার ছেলে ইংরাজি স্কুলে পড়িতে গেল, ক্রমে চাকরি করিতে গেল, বাবার বড়ো আদরের জিনিস পুঁথিগুলিকে রক্ষা করিল, ফেলিয়া দিল না। ভট্টাচার্য মহাশয়ের পৌত্র অল্প ইংরাজি লেখাপড়া শিখিল, তার পরে চাকরি করিতে গেল ; পুঁথি-পাঁজির কোনো ধারও ধারিল না। পৌত্রবধূ বাড়ি আসিয়া দেখিলেন, এক জায়গায় কত আবর্জনা রহিয়াছে। ছেঁড়া ময়লা কালো ন্যাকড়ায় জড়ানো কতকগুলা কাগজ রহিয়াছে, তিনি সেইগুলিকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন। হয়তো রাঁধিবার সময় কাঁচা কাঠে ফুঁ দিতে দিতে সেই ধোঁয়ায় চোখ জ্বলিতে লাগিল, তখন পুঁথি অথবা তাহার পাটার কথা মনে পড়িল ; সুবিধা পাইলেন তো একখানা পুঁথি উনানে দিয়া ফেলিলেন অথবা পুঁথির পাতাগুলি ফেলিয়া দিয়া বহু-কালের শুষ্ক কাঠের পাটা দুখানি উনানে দিয়া সেদিনকার রান্না সারিয়া লইলেন। ১৯০৪ সালে একবার নবদ্বীপ গিয়াছিলাম ; দেখিলাম, একজনের বাড়ির পিছনে রাস্তার ধারে রাশী-কৃত পুঁথির পাতা পচিতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, যে পাটাগুলি পোড়ানো হইয়াছে। বাড়ির গিন্নি মা সরস্বতীকে পোড়াতে চান না, তাই পুঁথিগুলি বাড়ির বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছেন। যে বাড়ির গিন্নির মা সরস্বতীর উপর অতটুকু কৃপা নাই, তাঁহারা পুঁথির পাতা লইয়া কী করেন, অনায়াসে বুঝা যায়।

এইরূপে চারি দিকে হাতের লেখা পুঁথি নষ্ট হইতেছে দেখিয়া অনেকের মনে অত্যন্ত ক্ষোভ হয়, পঞ্জাবের সিংহ মহারাজ রণজিৎ সিংহের [১৭৮০-১৮৩৯ খৃ.] পুরোহিত মধুসূদনের অনেক পুঁথি ছিল। তাঁহার পুত্র রাধাকিষণ লর্ড লরেন্সের [Sir John Lawrence, ভারতের বড়োলাট ১৮৬৪-৬৮ খৃ.] একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তিনি ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে লর্ড লরেন্সকে ভারতবর্ষের সর্বত্র পুঁথিরক্ষার জন্য এক পত্র দেন। লর্ড লরেন্স সেই পত্র ভিন্ন ভিন্ন গবর্নমেণ্টের নিকট পাঠাইয়া দেন এবং সেই-সকল গবর্নমেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া পুঁথিরক্ষার বন্দোবস্ত করেন। ইণ্ডিয়া গবর্নমেণ্ট এইজন্য ২৪০০০৲ টাকা বৎসর বৎসর খরচ করেন। বাংলার ভাগে ৩২০০৲ টাকা পড়ে। সে সময়কার সকল গবর্নমেণ্টই কিছু কিছু পান। পঞ্জাব গবর্নমেণ্টের টাকা অনেক দিন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যুক্তপ্রদেশের

টাকা অনেক দিন বন্ধ ছিল, এখন দুই ভাগ হইয়াছে; একভাগ সংস্কৃত পুথির জন্য, আর-এক ভাগ নাগরি পুথির জন্য দেওয়া হয়। মান্দ্রাজে ঐ টাকার এক অংশ আরকিওলজিকাল ডিপার্টমেণ্টকে দেবার চেষ্টা হয়, কিন্তু সে চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। বোম্বাইয়ে ঐ টাকায় পুথি খরিদ হয় ও ঐ পুথি দেকান কলেজের লাইব্রেরিতে রাখা হয়। বাংলায় ঐ টাকা এশিয়াটিক সোসাইটির হাতে দেওয়া হয়, তাঁহারা ঐ টাকা খরচের ভার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের [১৮২২-৯১ খৃ.] হাতে দেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর আমাকে পুথি খোঁজার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন।[৪]

বাংলায় প্রায় ১১০০০ হাজার পুথি সংগ্রহ হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশে প্রায় ৮০০০ পুথি সংগ্রহ হইয়াছে। বোম্বাইয়ে ৮০০০ এবং মান্দ্রাজে ১৪০০০ সংগ্রহ হইয়াছে। মান্দ্রাজে প্রথম ভার থাকে অপার্ট সাহেবের[৫] উপর। ইনি কোন্ পণ্ডিতের বাড়ি কী কী পুথি আছে, তাহারই তালিকা ছাপাইয়াছেন। তারপর হুল্‌চ্ সাহেব[৬] তিনখানি রিপোর্ট দিয়াছেন. তাহার ভূমিকায় নূতন পুথি সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। ঐ রিপোর্টে কেনা পুথির একটি তালিকা আছে। তাহার মধ্যে ভালো ভালো পুথিগুলিতে ইতিহাসের কথা যাহা পাওয়া যায়, সব তুলিয়া দেওয়া হয়। হুল্‌চ্ সাহেবের পর শেষগিরি শাস্ত্রী[৭] কিছু দিন এই কার্য করেন এবং তাঁহার রিপোর্টগুলি অতি সুন্দর হইয়াছে। তিনি যে-কয়খানি পুস্তকের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন, তাহা হইতে অনেক নূতন খবর পাওয়া যায়। এখন মহারাজ রাজশ্রী রঙ্গাচার্য রাও বাহাদুর[৮] এই কার্য করিতেছেন। তিনি এই অল্প দিনের মধ্যে ১৩/১৪ ভলিউম বহি ছাপাইয়াছেন।

বোম্বাইয়ের টাকা দুই ভাগ হয়। এক ভাগের কর্তা হন স্যার রাম [কৃষ্ণ] গোপাল ভাণ্ডারকর[৯], আর-এক ভাগের কর্তা পিটার্‌সন সাহেব [Peter Peterson, ১৮৪৬-৯৯ খৃ.]। দুই জনেই ছয় ভলিউম করিয়া রিপোর্ট লেখেন, রিপোর্টের ভূমিকায় অনেক নূতন নূতন শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক নূতন নূতন তত্ত্ব বাহির হয়। জৈন-সাহিত্য এইখান হইতেই প্রথম প্রচার হইতে থাকে। ভাণ্ডারকর বেদ, স্মৃতি, দর্শন ও জ্যোতিষ সম্বন্ধে যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার মূল্য

অনেক। স্যার রামগোপাল এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছেন, এ কাজের ভার তাঁহার পুত্র শ্রীধর ভাণ্ডারকরের উপর অর্পিত হইয়াছে। বোম্বাইয়ের প্রত্যেক রিপোর্টের সহিত কেনা পুথির একটি তালিকা দেওয়া থাকে এবং ভালো ভালো পুথি হইতে ইতিহাসের কথা তুলিয়া দেওয়া হয়।

লাহোর, অযোধ্যা ও যুক্তপ্রদেশ হইতে কেবল কেনা পুথির তালিকা বাহির হয়। ঐ তালিকায় গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকারের নাম, লেখার সময় প্রভৃতি কতকগুলি প্রয়োজনীয় খবর থাকে। উহার সঙ্গে রিপোর্ট আদি কিছুই থাকে না।

বাংলায় যে-সকল পুথি খরিদ হইত, তাহার একটি তালিকামাত্র ছাপা হইত এবং সোসাইটির পণ্ডিতেরা সমস্ত দেশ ঘুরিয়া যে-সকল নূতন পুথির বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আনিতেন, সেইগুলি ছাপা হইত এবং সেই-সকল পুথি হইতে যে-সকল ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাওয়া যাইত, তাহা ইংরাজিতে লিখিয়া দেওয়া হইত ও পাঁচ বৎসর অন্তর একটি রিপোর্ট দেওয়া হইত। আমার সময়ে আমি রিপোর্টকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র করিয়াছি এবং প্রত্যেক ভলিউমের গোড়ায় ঐ ভলিউমে যত পুস্তক আছে, ইংরাজিতে তাহার একখানি ইতিহাস লিখিয়া দিই।

ইহাতে একটু অসুবিধা হইত। পরের বাড়ির পুথির বিবরণ ছাপা হইত, নিজের বাড়ির পুথির বিবরণ একেবারে ছাপা হইত না। তাই সোসাইটি বলিয়া দিয়াছেন যে, যত দিন নিজের বাড়ির পুথির বিবরণ ছাপা না হইতেছে, তত দিন আর অন্য কোনো কাজ হইবে না।

এতক্ষণ লর্ড লরেন্সের দেওয়া টাকা হইতে যে কাজ হইতেছে বা হইয়াছে, তাহারই কথা বলিলাম। এতদ্ভিন্ন কাশ্মীর, আলবার, নেপাল, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি স্থানেও অনেক নূতন পুথি বাহির হইয়াছে এবং তাহার রিপোর্ট ও তালিকা ছাপা হইতেছে। এ-সকলই সংস্কৃত পুথি লইয়া, কেহ কেহ তাহার সহিত প্রাকৃতও যোগ করিতেছেন, কেহ বা কথিত ভাষার প্রাচীন পুথিও যোগ করিতেছেন। কথিত ভাষার পুথি সংগ্রহের জন্য বড়ো একটা চেষ্টা হয় নাই। যুক্তপ্রদেশে নাগরি-প্রচারিণী সভা লর্ড লরেন্সের দেওয়া টাকার অর্ধেক খরচ করিতেছেন এবং বৎসর বৎসর তাহার রিপোর্ট দিতেছেন।

রাজপুতানায় ভাট ও চারণদের পুথি সংগ্রহের জন্য ইণ্ডিয়া গবর্নমেণ্ট বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ঐ গবর্নমেণ্ট ঐ বিষয়ে বন্দোবস্তের ভার এশিয়াটিক সোসাইটির উপর দেন। সোসাইটি সে ভার আমার উপর দেন, আমি বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছি, কার্য এখনো পুরাদস্তুর আরম্ভ হয় নাই।[১০]

ভাট-চারণের পুথি সমস্ত ভারতবর্ষের ব্যাপার লইয়া। তাই ইণ্ডিয়া গবর্নমেণ্ট নিজেই সে-সকল পুথি সংগ্রহ ও ছাপাইবার ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু অন্য কোনো চলিত ভাষার সম্বন্ধে তাঁহারা কিছু বন্দোবস্ত করিবেন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, সেই-সকল ভাষা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে চলিত। যে দেশের ভাষা, সেই দেশের গবর্নমেণ্টের তাহার জন্য চেষ্টা করা উচিত। যেমন আসামি পুথির জন্য বোম্বাই টাকা খরচ করিতে পারে না, করিলে অন্যায় হয়; যেমন তেলুগু পুথির জন্য লাহোর টাকা খরচ করিতে পারে না, করিলে অন্যায় হয়। যদি বাংলা গবর্নমেণ্ট বাংলা পুথির জন্য টাকা খরচ না করেন, যদি আসামের জন্য আসাম-গবর্নমেণ্ট টাকা খরচ না করেন, তাহা হইলেও অন্যায় হয়। বাংলা গবর্নমেণ্ট বাংলাভাষার উন্নতির জন্য নানারূপে চেষ্টা করিতেছেন, আমাদেরও প্রাচীন বাংলা পুস্তক ছাপাইবার জন্য বিশেষ সাহায্য করিতেছেন। তজ্জন্য বাঙালি মাত্রেই বাংলা গবর্নমেণ্টের নিকট কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। এখন দেখা যাউক, বাংলা পুথি খোঁজার জন্য বাঙালি কী করিয়াছে।

যখন প্রথম চারি দিকে বাংলা স্কুল বসানো হইতেছিল এবং লোকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের [১৮২০-৯১ খৃ.] 'বর্ণপরিচয়' [১৮৫৫ খৃ.], 'বোধোদয়' [১৮৫১ খৃ.], 'চরিতাবলী' [১৮৫৬ খৃ.], 'কথামালা' [১৮৫৬ খৃ.], পড়িয়া বাংলা শিখিতেছিল, তখন তাহারা মনে করিয়াছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ই বাংলাভাষার জন্মদাতা। কারণ, তাহারা ইংরাজির অনুবাদ মাত্র পড়িত, বাংলাভাষার যে আবার একটা সাহিত্য আছে এবং তাহার যে আবার একটা ইতিহাস আছে, ইহা কাহারো ধারণাই ছিল না। তারপর শুনা গেল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আবির্ভাবের পূর্বে রামমোহন রায় [১৭৭২-১৮৩৩ খৃ.] ও গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য [গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য তর্কবাগীশ ১৭৯৯-১৮৫৯ খৃ.]

বাংলার অনেক বিচার করিয়া গিয়েছেন এবং সেই বিচারের বহিও আছে। ক্রমে রামগতি ন্যায়রত্ন [১৮৩১-৯৪ খৃ.] মহাশয়ের বাংলা ভাষার ইতিহাস ['বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব,' ১ম ভাগ ১৮৭২ খৃ.] ছাপা হইল। তাহাতে কাশীদাস, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি কয়েকজন বাংলাভাষার প্রাচীন কবির বিবরণ লিখিত হইল। বোধ হইল, বাংলাভাষায় তিন শত বৎসর পূর্বে খানকতক কাব্য লেখা হইয়াছিল ; তাহাও এমন কিছু নয়, প্রায়ই সংস্কৃতের অনুবাদ। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের দেখাদেখি আরো দুই-চারিখানি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বাহির হইল, কিন্তু সেগুলি সব ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ছাঁচেই ঢালা। এই-সকল ইতিহাস সত্ত্বেও খৃস্টাব্দের ৮০ কোটায় লোকের ধারণা ছিল যে, বাংলাটা একটা নূতন ভাষা, উহাতে সকল ভাব প্রকাশ করা যায় না, অনুবাদ ভিন্ন উহাতে আর-কিছু চলে না, চিন্তা করিয়া নূতন বিষয় লিখা যায় না, লিখিতে গেলে কথা গড়িতে হয়, নূতন কথা গড়িতে গেলে হয় ইংরাজি, না-হয় সংস্কৃত-ছাঁচে ঢালিতে হয়, বড়ো কটমট হয়।

১৮৮৬ খৃস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি এইরূপ মনের ভাব লইয়া আমি বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হইলাম, কিন্তু সেখানে গিয়া আমার মনের ভাব ফিরিয়া গেল। কারণ, সেখানে গিয়া অনেকগুলি প্রাচীন বাংলা পুস্তক দেখিতে পাই। সে কালের ব্রাহ্মণেরা বৈষ্ণবদের একেবারে দেখিতে পারিত না। বিশেষ চৈতন্যের দলের উপর তাহাদের বিশেষ দ্বেষ ছিল। স্মার্ত ব্রাহ্মণের বাড়ি বৈষ্ণবের বহি একেবারে দেখা যাইত না। নৈয়ায়িকেরা তো আরো চটা ছিল। সুতরাং আমার অদৃষ্টে বৈষ্ণবদের বহি একেবারে পড়া হয় নাই। বেঙ্গল লাইব্রেরিতে আসিয়া দেখিলাম, বৈষ্ণবদের অনেক বহি ছাপা হইতেছে : শুধু গানের বহি আর সংকীর্তনের বহি নয়, অনেক জীবন-চরিত ও ইতিহাসের বহিও ছাপা হইতেছে। বাংলাদেশে যে এত কবি, এত পদ ও এত বহি ছিল, কেহ বিশ্বাস করিত না। তাই ১৮৯১ সালে কম্বুলেটোলার লাইব্রেরির বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে একটি প্রবন্ধ পড়ি।[১১] ঐ প্রবন্ধে প্রায় ১৫০ জন কবির নাম এবং তাঁহাদের অনেকের জীবন-চরিত ও তাঁহাদের গ্রন্থের কিছু কিছু

সমালোচনা করি। সভায় গিয়া দেখি, আমিও যেমন বাংলা সাহিত্য ও তাহার ইতিহাস সম্বন্ধে বড়ো কিছু জানিতাম না, অধিকাংশ লোকই সেইরূপ, বাংলায় এত বহি আছে শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য হইয়া গেলেন, অথচ আমি যে-সকল বহির নাম করিয়াছিলাম, তাহা প্রায় সকলই ছাপা বহি, কলিকাতায়ই কিনিতে পাওয়া যাইত। একজন সমালোচক বলিলেন, "আমি প্রবন্ধ সমালোচনা করিব বলিয়া বাংলা সাহিত্যের সব কয়খানি ইতিহাস পড়িয়া আসিয়াছি, কিন্তু আমি এ প্রবন্ধ সমালোচনা করিতে পারিলাম না।" আর-একজন প্রসিদ্ধ লেখক ঢাকা হইতে লিখিয়াছিলেন, "আমি যেন একটা নূতন জগতে প্রবেশ করিলাম।"

এই-সকল সমালোচনায় উৎসাহিত হইয়া আমি ভাবিলাম, যদি ছাপা পুঁথির উপর প্রবন্ধেই এত নূতন খবর পাওয়া গেল, হাতের লেখা পুঁথি খুঁজিতে পারিলে না জানি কত কী নূতন খবর দিতে পারিব। সুতরাং বাংলা পুঁথি খোঁজার জন্য একটা উৎকট আগ্রহ জন্মিল। সেই সময়ে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের [১৮২২-৯১ খৃ.] দেহান্ত হইল এবং বাংলা, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যার পুঁথি খোঁজার ভার আমার উপর পড়িল, আমি সেইসঙ্গে বাংলা পুঁথি খুঁজিতে লাগিলাম. ট্রাবেলিং পণ্ডিতদেরও বলিয়া দিলাম, তোমরা বাংলা পুঁথির সন্ধান আনিবে এবং পারো তো কিনিবে। নানা কারণে আমার সংস্কার হইয়াছিল যে, ধর্ম-মঙ্গলের ধর্মঠাকুর বৌদ্ধধর্মের পরিণাম। সুতরাং ধর্মঠাকুর সম্বন্ধে কোনো পুঁথি পাইলে তাহার সন্ধান করা, কেনা ও কপি করা একান্ত আবশ্যক, এ কথাটা আমি বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলাম। শুদ্ধ তাই নয়, যেখানে ধর্মঠাকুরের মন্দির আছে, সেইখান হইতে মন্দির ও মন্দিরের দেবতার বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইবে এবং ধর্মঠাকুর সম্বন্ধে চলিত ছড়াও সংগ্রহ করিবে। প্রথমেই তাঁহারা মানিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল আনিয়া দিলেন। পুঁথির মালিক ছাড়িয়া দিতে চায় না, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সেজো ভাই শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন জামিন হইয়া মাসিক ১০৲ দশ টাকা ভাড়ায় আমাকে ঐ পুঁথি পাঠাইয়া দেন, আমি বাড়ি বসিয়া তাহা কপি করাই। খাঁটি ব্রাহ্মণের ছেলে, ন্যায়শাস্ত্রের পড়ুয়া ধর্মঠাকুরের বহি কেন লেখে এবং কেমন লেখে, জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল,

তাই এইরূপ কঠোর নিয়মে আবদ্ধ হইয়া সে পুথিখানি ধার করিয়াছিলাম। সে পুথি বহু-দিন হইল. সাহিত্য-পরিষদে ছাপা হইয়া গিয়াছে।[১২] আর-একখানি পুথি পাইয়াছিলাম— শূন্যপুরাণ, রামাই পণ্ডিতের লেখা। ধর্মঠাকুরের পূজা-পদ্ধতি অনেক আছে এবং তাহার শেষে 'নিরঞ্জনের উষ্মা' নামে একটি রামাই পণ্ডিতের লম্বা ছড়া আছে।[১৩] সে ছড়া পড়িলে ধর্মঠাকুর যে হিন্দু ও মুসলমানের বার, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। ব্রাহ্মণের অত্যাচারে অত্যন্ত প্রপীড়িত হইয়া ধর্মঠাকুরের সেবকগণ তাঁহার নিকট উদ্ধার কামনা করিল। তিনি যবনরূপে অবতীর্ণ হইয়া ব্রাহ্মণদের সর্বনাশ করিলেন। রামাই ঠাকুরের ছড়াগুলি নিশ্চয় মুসলমান অধিকারের পরে লেখা হইয়াছিল। বেশি পরেও নয়। মুসলমানরা ব্রাহ্মণদের জব্দ করিয়াছিল দেখিয়া ধর্মঠাকুরের দল খুশি হইল. অথবা ইহাও হইতে পারে, তাহারাই মুসলমানকে ডাকিয়া আনিয়াছিল। 'শূন্যপুরাণ' সাহিত্য-পরিষদের জন্য নগেনবাবু [নগেন্দ্রনাথ বসু, ১৮৬৬-১৯৩৮ খৃ.] ছাপাইয়াছেন [১৩১৪ ব.]। আর-একখানি পুস্তক পাইয়াছিলাম, অনেক কষ্টে. অনেক পরিশ্রমের পর ময়ূরভট্টের ধর্মমঙ্গল ; সেখানি বোধ হয়. পঞ্চদশ শতাব্দীর লেখা : কারণ. তাহাতে রাঢ়দেশে বর্ধমান ও মঙ্গলকোট প্রধান জায়গা। আর-একখানি পুস্তক পাইয়াছিলাম. তাহা না-বাংলা. না-সংস্কৃত, এক অপরূপ ভাষায় লিখিত। মঙ্গলাচরণ-শ্লোকের শেষে আছে, "বক্তি শ্রীরঘুনন্দনঃ।" অর্থাৎ যিনি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তিনি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে চান যে. তাহা রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের এক তত্ত্ব ; সুতরাং হিন্দুদিগের একখানি প্রমাণ-গ্রন্থ। উহাতে ধর্মঠাকুরের ও তাঁহার আবরণ-দেবতাগণের উল্লেখ ও তাঁহাদের পূজাপদ্ধতির ব্যবস্থা আছে। এই পুথিখানি হইতে আরো বুঝিতে হইবে যে, রঘুনন্দনেরও পরে বাংলাদেশে এত বৌদ্ধ ছিল যে, তাহাদের জন্য একখানি তত্ত্ব লেখাও আবশ্যক হইয়াছিল।

আমি যখন এইরূপে বাংলা পুথি সংগ্রহ করিতেছি, তখন নগেনবাবুও আমার মতো পুথি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুথি সংগ্রহ অন্যরূপ, তিনি ঘরে বসিয়া পুথি কিনিতেন। যাহারা পাড়াগাঁয়ে বটতলার বহি বেচিতে যায়, তারা বইয়ের বদলে পুথি লইয়া আসিত,

নগেনবাবু তাহাদের নিকট পুথি কিনিতেন। তিনি কত পুথি কিনিয়াছিলেন, জানি না ; তবে তাঁহার পুথিগুলি এখন ইউনিভার্সিটিতে আছে। আমি প্রায় পাঁচশত পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এশিয়াটিক সোসাইটির জন্যই সংগ্রহ করিয়াছিলাম, এশিয়াটিক সোসাইটিতে আছে।

এই সময়ে বাংলা পুস্তক-সংগ্রহ-বিষয়ে আমার একজন সহায় জুটিয়াছিলেন। কুমিল্লা স্কুলের হেডমাস্টার শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র সেন বি. এ. [১৮৬৬-১৯৩৯ খৃ.] বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখিবেন বলিয়া এশিয়াটিক সোসাইটির সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং সোসাইটি তাঁহার চিঠি আমাকে পাঠাইয়া দেন। ইহাতে পূর্ববাংলায় পুথি খোঁজার সুবিধা হইবে বলিয়া আমি আমার ট্রাবেলিং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ মহাশয়কে এক বৎসরের জন্য দীনেশবাবুর কাছে রাখিয়া দিই এবং দীনেশবাবুর কথামতো বাংলা পুথি খরিদ করিতে বলি। আরো বলিয়া দিই যে, দীনেশবাবু উহা যত দিন ইচ্ছা রাখিতে পারেন। দীনেশবাবুর সাহায্যে পরাগলির মহাভারত, ছুটিখাঁর অশ্বমেধ পর্ব প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ খরিদ হয়।

যখন ধর্মঠাকুর সম্বন্ধে অনেকগুলি পুথি সংগ্রহ হইল এবং অনেক বৃত্তান্ত পাওয়া গেল, তখন ধর্মঠাকুর যে বৌদ্ধ, আমি একটি বাংলা প্রবন্ধে সেইটি লিপিবদ্ধ করিলাম। এইরূপ লিপিবদ্ধ করার প্রধান কারণ এই যে, ঐ সম্বন্ধে বাংলায় যাহা-কিছু পাওয়া গিয়াছে, তাহার একটা ইতিহাস লিখিয়া রাখিয়া নেপালে হিন্দুরাজার অধীনে বৌদ্ধধর্ম কিরূপ চলিতেছে, দেখিতে যাইলাম। সে প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। প্রবন্ধটি যখন লিখিতেছি, তখন নগেনবাবু আমার নৈহাটির বাড়িতে যান। কথা ছিল, তিনি আমার সঙ্গে যাইবেন ; তাঁহার যাওয়া হইল না, সেই কথা বলিবার জন্য তিনি নৈহাটি যান এবং সেখান হইতে সাহিত্য-পরিষদে দিব বলিয়া প্রবন্ধটি লইয়া আসেন। আসিয়া শুনিলাম, আমার অনুপস্থিতে এই প্রবন্ধ পড়া হয়, তখন অনেকে ঘোরতর আপত্তি করিয়াছিলেন। একজন বলিয়াছিলেন— ছিঃ ! জেলে মালারা যে ধর্মঠাকুরের পূজা করে, সে ধর্মঠাকুর কি না বৌদ্ধ ! ছিঃ !

যা হোক, আমি নেপাল হইতে আসিয়া *Discovery of Living Buddhism in Bengal* [১৮৯৭ খৃ.] নামে একটি ইংরাজি প্রবন্ধ ছাপাই। এইবার প্রকাশ্যে বলিয়া দিই, ধর্মঠাকুরের পূজাই বৌদ্ধধর্মের শেষ।

আমি মনে করি, বাংলা পুথি খোঁজার এইটি প্রথম ও প্রধান সুফল। ইহার দ্বারা আমরা বেশ জানিতে পারি যে, কেন ১২০০ শত বৎসর পূর্বে আদিশূর রাজা[১৪] বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ আনাইবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছিলেন, কেন ব্রাহ্মণদিগকে গ্রাম দান করিয়া বসাইবার জন্য রাজারা এত ব্যস্ত হইয়াছিলেন এবং কেন বাংলাদেশে কতকগুলি জাত আচরণীয় এবং কতকগুলি জাত একেবারে অনাচরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

এইরূপ বাংলা পুথি খোঁজার আর-একটি সুফল হইয়াছে। ইংরাজি ১৮৯৭-৯৮ খৃস্টাব্দে যখন আমি দুইবার নেপালে যাই, তখন কতকগুলি সংস্কৃত পুস্তক দেখিতে পাই। উহার মধ্যে মধ্যে একরূপ নূতন ভাষায় কিছু কিছু লেখা আছে : হয় সেগুলি সংস্কৃতে যাহা লেখা আছে, তাহারই প্রমাণস্বরূপ, অথবা মূলটাই সেই ভাষায় লিখিত, টীকা সংস্কৃত। 'ডাকার্ণব' নামে একখানি পুস্তক আছে, ইহার মাঝে মাঝে এইরূপ নূতন ভাষায় অনেক লেখা আছে। ডাকার্ণব নাম শুনিয়াই আমি মনে করিলাম, সেগুলি ডাকপুরুষের বচন হইবে এবং তাই মনে করিয়া উহার একখানি নকল লইয়া আসি। পড়িয়া দেখি, সে বাংলা নয়, কী ভাষায় লিখিত, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। আর-একখানি পুস্তক পাইলাম, তাহার নাম 'সুভাষিত-সংগ্রহ', উহারো মধ্যে মধ্যে একটি নূতন ভাষায় কিছু কিছু লেখা আছে এবং আর-একখানি পুস্তক দেখিলাম— 'দোহাকোষ-পঞ্জিকা'।

'সুভাষিত-সংগ্রহ'খানি বেণ্ডল [Cecil Bendall, ১৮৫৬-১৯০৬ খৃ.] সাহেব নকল করিয়া লইলেন এবং 'দোহাকোষ-পঞ্জিকা'খানি আমি নকল করিয়া লইলাম। বেণ্ডল সাহেব সুভাষিত-সংগ্রহখানি ছাপাইয়াছেন এবং ছাপাইবার সময় আমার দোঁহাকোষ-পঞ্জিকাখানি লইয়া যান, আমি সেখানি আর ফিরিয়া পাই নাই। পরে নেপালে শুনিতে পাইলাম, যে পুথিখানি হইতে আমার দোহাকোষ-পঞ্জিকা নকল হইয়াছিল, তাহা জাপানে চলিয়া গিয়াছে। ১৯০৭ সালে আবার

নেপালে গিয়া কয়েকখানি পুথি দেখিতে পাইলাম। একখানির নাম 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়', উহাতে কতকগুলি কীর্তনের গান আছে ও তাহার সংস্কৃত টীকা আছে। গানগুলি বৈষ্ণবদের কীর্তনের মতো, গানের নাম 'চর্যাপদ'। আর-একখানি পুস্তক পাইলাম— তাহাও দোহাকোষ, গ্রন্থকারের নাম সরোরুহবজ্র[১৫], টীকাটি সংস্কৃতে, টীকাকারের নাম অদ্বয়বজ্র[১৬]। আরো একখানি পুস্তক পাইলাম, তাহার নামও দোঁহা-কোষ, গ্রন্থকারের নাম কৃষ্ণাচার্য[১৭], উহারো একটি সংস্কৃত টীকা আছে।

বেণ্ডল যে সুভাষিত-সংগ্রহ ছাপাইয়াছেন, তাহার পরিশিষ্টে এই নূতন ভাষার আটাশটি দোহা টীকাটিপ্পনী সমেত দিয়াছেন। তিনি বলেন— ঐ ভাষা একটি প্রাচীন অপভ্রংশ ভাষা, তাহার দুই-একটি দোহা এখানে দিতেছি।

গুরু উবএসে৷ অমিঅ রস হর্বাহিং ন পিঅ উর্জেহি।
বহু সহ মরুত্থলিহি' তিসি এ মরিথউ তেহি।

প্রফেসর বেণ্ডল তাঁহার প্রথম পরিশিষ্টে একবার বলিয়াছেন, অপভ্রংশ ভাষা, আর-একবার বলিয়াছেন, বৌদ্ধ-প্রাকৃত ভাষা এবং চতুর্থ পরিশিষ্টে শুদ্ধ প্রাকৃত শব্দে উহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং এ ভাষাটি যে কী, তিনি স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। বাস্তবিক প্রাকৃত অপভ্রংশ পালি প্রভৃতি শব্দের কোনো নির্দিষ্ট অর্থ নাই। সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইলেই তাহাকে প্রাকৃত বলে। অশোকের শিলালিপিও প্রাকৃত, পালিও প্রাকৃত, জৈন-প্রাকৃতও প্রাকৃত, নাটকের প্রাকৃতও প্রাকৃত, বাংলাও প্রাকৃত, মারহাট্টাও প্রাকৃত। প্রাকৃত ব্যাকরণে যে ভাষা কুলায় না, তাহাকে অপভ্রংশ বলে। দণ্ডী কাব্যাদর্শে বলিয়াছেন— ভাষা চার রকম : সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও মিশ্র। দণ্ডী কোন্ কালের লোক, তাহা জানি না, তবে তিনি যে ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।[১৮] তিনি মহারাষ্ট্রভাষাকে ভালো প্রাকৃত বলিয়াছেন এবং সেই ভাষায় লিখিত 'সেতুবন্ধ কাব্যে'র উল্লেখ করিয়াছেন। ভরত-নাট্যশাস্ত্রে ভাষার আর-একরকম ভাগ আছে। তিনি বলেন— সংস্কৃত ছাড়া দুইটা ভাষা আছে, ভাষা আর বিভাষা। তিনি মহারাষ্ট্র ভাষার নাম করেন না, দাক্ষিণাত্য, অবন্তী, মাগধী, অর্ধ-মাগধী প্রভৃতিকে ভাষা বলেন, আর আভিরী, সৌবিরী প্রভৃতিকে

বিভাষা বলেন। তিনি প্রাকৃত একটা ভাষা বলেন না, উহাকে পাঠ বলেন। সংস্কৃত পাঠ ও প্রাকৃত পাঠ। সুতরাং যখন নাট্যশাস্ত্র লেখা হয়, অর্থাৎ খৃ. পূ. ২/৩ শতাব্দীতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত ছিল, ভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ভাষা, যেগুলি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন নয়, সেগুলি বিভাষা। তিনি বলিয়াছেন— বিভাষাও নাটকে চলিতে পারে, কিন্তু অন্ধ্র, বাহ্লীক প্রভৃতি ভাষা একেবারে চলিবে না। ভরত-নাট্যশাস্ত্রে ও দণ্ডীর কাব্যাদর্শে ভয়ানক মতভেদ দেখা যায়। বররুচি 'প্রাকৃত-প্রকাশে'[১৯] মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী ও পৈশাচী চারিটি ভাষা প্রাকৃত বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে মহারাষ্ট্রীর প্রকৃতি সংস্কৃত, শৌরসেনীর প্রকৃতি মহারাষ্ট্রী, পৈশাচীর প্রকৃতি শৌরসেনী। আরো অনেক প্রাকৃত ব্যাকরণ আছে। যিনি যখন প্রাকৃত ব্যাকরণ লিখিয়াছেন, কতকগুলি প্রাকৃত বহি লইয়া একখানি ব্যাকরণ লিখিয়াছেন এবং যাহার সহিত মিলিবে না, তাহাকে অপভ্রংশ বলিয়াছেন। এইরূপে যে কত অপভ্রংশ ভাষা হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। তাই রাগ করিয়া বুঁদির রাজার চারণ সূরজমল[২০] বলিয়া দিয়াছেন, যে ভাষায় বেশি বিভক্তি নাই, সে-ই অপভ্রংশ। ভারতবর্ষে অধিকাংশ চলিত ভাষায় বিভক্তি নাই, তারা সবই অপভ্রংশ। প্রফেসর বেণ্ডল এই নূতন ভাষাকে অপভ্রংশ বলিয়াছেন বলিয়াই আমরা এত কথা বলিলাম। আমার বিশ্বাস, যাঁরা এই ভাষা লিখিয়াছেন, তাঁরা বাংলা ও তন্নিকটবর্তী দেশের লোক। অনেকে যে বাঙালি ছিলেন, তাহার প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। যদিও অনেকের ভাষায় একটু একটু ব্যাকরণের প্রভেদ আছে, তথাপি সমস্তই বাংলা বলিয়া বোধ হয়। এ-সকল গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় তর্জমা হইয়াছিল এবং সে তর্জমা তেঙ্গুরে আছে। প্রফেসর বেণ্ডল দুই-চারি জায়গায় ঐ তর্জমা ব্যবহার করিয়াছেন। ইংরাজি ৭ হইতে ১৪ শতের মধ্যে তিব্বতিরা সংস্কৃত বহি খুব তর্জমা করিত, শুদ্ধ সংস্কৃত কেন, ভারতবর্ষের সকল ভাষার বহি তর্জমা করিত, অনেক সময়ে তাহারা তর্জমার তারিখ পর্যন্ত লিখিয়া রাখিয়াছে। তাহা হইলে এই বাংলা বহিগুলি ৭ শত হইতে ১৪ শতের মধ্যে লেখা হইয়াছিল ও তর্জমা হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ৮/৯/১০ শতে এই-সকল বহিগুলি লেখা

হইয়াছিল বলা যায়। প্রফেসর বেণ্ডল কয়েকটি দোহা মাত্র পাইয়াছিলেন, আমি দুইখানি দোহাকোষ পাইয়াছি. একখানিতে তেত্রিশটি দোহা আছে, আর-একখানিতে প্রায় একশতটি আছে। শেষোক্ত দোহাখানির সর্বত্র মূল নাই। টীকার মধ্যে অনেকস্থলে পুরা দোহাটি ধরিয়া দেওয়া আছে, অনেক স্থলে কেবল আদ্যক্ষর ধরিয়া দেওয়া আছে। তবে ১০০ একশতের অধিক হইবে তো কম হইবে না। দোহাগুলিতে গুরুর উপর ভক্তি করিতে বড়োই উপদেশ দেয়। ধর্মের সূক্ষ্ম উপদেশ গুরুর মুখ হইতে শুনিতে হইবে, পুস্তক পড়িয়া কিছু হইবে না। একটি দোহায় বলিয়াছে, গুরু বুদ্ধের অপেক্ষাও বড়ো। গুরু যাহা বলিবেন, বিচার না করিয়া তাহা তৎক্ষণাৎ করিতে হইবে। সরোরুহপাদের দোহাকোষে এবং অদ্বয়বজ্রের টীকায় ষড়্দর্শনের খণ্ডন আছে। সেই ষড়্দর্শন কী কী ? ব্রহ্ম. ঈশ্বর, অর্হৎ. বৌদ্ধ. লোকায়ত ও সাংখ্য। জাতিভেদের উপর গ্রন্থকারের বড়ো রাগ। তিনি বলেন— ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে হইয়াছিল ; যখন হইয়াছিল. তখন হইয়াছিল. এখন তো অন্যও যেরূপে হয়, ব্রাহ্মণও সেইরূপে হয়. তবে আর ব্রাহ্মণত্ব রহিল কী করিয়া। যদি বলো, সংস্কারে ব্রাহ্মণ হয়. চণ্ডালকে সংস্কার দাও, সে ব্রাহ্মণ হোক : যদি বলো, বেদ পড়িলে ব্রাহ্মণ হয়. তারাও পড়ুক। আর তারা পড়েও তো, ব্যাকরণের মধ্যে তো বেদের শব্দ আছে! আর আগুনে ঘি দিলে যদি মুক্তি হয়, তাহা হইলে অন্য লোকে দিক-না। হোম করিলে মুক্তি যত হোক না হোক, ধোঁয়ায় চক্ষের পীড়া হয়, এই মাত্র। তাহারা ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান বলে। প্রথম তাহাদের অথর্ববেদের সত্তাই নেই, আর অন্য তিন বেদের পাঠও সিদ্ধ নহে. সুতরাং বেদেরই প্রামাণ্য নেই। বেদ তো আর পরমার্থ নয়. বেদ তো আর শূন্য শিক্ষা দেয় না। বেদ কেবল বাজে কথা বলে।

যাহারা ঈশ্বর, ধর্ম মানে, তাহাদের সম্বন্ধে সরোরুহবজ্র বলেন, ঈশ্বরপরায়ণেরা গায়ে ছাই মাখে. মাথায় জটা ধারণ করে, প্রদীপ জ্বালিয়া ঘরে বসিয়া থাকে, ঈশান কোণে বসিয়া ঘণ্টা চালে. আসন করিয়া বসে, চক্ষু মিট্‌মিট্ করে, কানে খুস্‌খুস্ করে ও লোককে ধাঁধা দেয়। অনেক 'রণ্ডী' 'মুণ্ডী' এবং নানা বেশধারী লোক এই গুরুর মতে চলে। কিন্তু যখন কোনো পদার্থই নাই, যখন বস্তুই বস্তু নয়, তখন

ঈশ্বরও তো বস্তু, তিনি কেমন করিয়া থাকেন ? ব্যাপকের অভাবে তো ব্যাপ্য থাকিতে পারে না। বলিবে, কর্তা বলিয়া ঈশ্বর আছেন, যখন বস্তুই নাই, তখন ঈশ্বর কী করিবেন ?

ক্ষপণকদের সম্বন্ধে বলিতেছেন, ক্ষপণকেরা কপট মায়াজাল বিস্তার করিয়া লোক ঠকাইতেছে, তাহারা তত্ত্ব জানে না, মলিন বেশ ধারণ করিয়া থাকে এবং আপনার শরীরকে কষ্ট দেয়। নগ্ন হইয়া থাকে এবং আপনার কেশোৎপাটন করে। যদি নগ্ন হইলে মুক্তি হয়, তাহা হইলে শৃগাল-কুকুরের মুক্তি আগে হইবে। যদি লোমোৎপাটনে মুক্তি হয়, তাহা হইলে অনেক পদার্থের মুক্তি হইবে। ময়ূরপুচ্ছ গ্রহণ করিলে যদি মুক্তি হয়, তাহা হইলে হাতি-ঘোড়াকে তো ময়ূরপুচ্ছ দিয়া সাজায়, তাহা হইলে তাদের আগে মুক্তি হওয়া উচিত। সরোরুহপাদ আরো বলেন, ক্ষপণকদের যে মুক্তি, সে আমার কিছুই বলিয়া মনে হয় না। তাহারা তত্ত্ব জানে না, তাহারা জীব বলিয়া যে পদার্থ মানে, সে জীব জীবই হইতে পারে না, সকলই কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, সকলই ভ্রান্তি। তাহারা বলে, মোক্ষ নিত্য, কিন্তু এ কথা হইতেই পারে না, কারণ, তাহারা বলে, ব্রহ্মাণ্ডের উপর মোক্ষ ছত্রাকারে ছিয়াশি হাজার যোজন ব্যাপিয়া আছে, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড তো অনিত্য, তাহার তো নাশ আছে, ব্রহ্মাণ্ড নাশ হইলে ছত্র কোথায় থাকিবে ? মোক্ষ লোপ হইয়া যাইবে।

শ্রমণদের সম্বন্ধে সরোরুহ বলেন— যে বড়ো বড়ো স্থবির আছেন, কাহারো দশ শিষ্য, কাহারো কোটি শিষ্য, সকলই গেরুয়া কাপড় পরে, সন্ন্যাসী হয় ও লোক ঠকাইয়া খায়। যাহারা হীনযান, তাহাদের যদি শীলভঙ্গ হয়, তাহারা তৎক্ষণাৎ নরকে যায়। যাহারা শীল রক্ষা করে, তাহাদের না-হয় স্বর্গই হউক, মোক্ষ হইতে পারে না। যাহারা মহাযান আশ্রয় করে, তাহাদেরও মোক্ষ হয় না, কারণ, তাহারা কেহ কেহ সূত্র ব্যাখ্যা করে, কিন্তু তাহাদের ব্যাখ্যা অদ্ভুত, সে-সকল নূতন ব্যাখ্যায় কেবল নরকই হয়। কেহ পুস্তক লেখে, কিন্তু পুস্তকের অর্থ জানে না, সুতরাং তাহাদের নরকই হয়। সহজ পন্থা ভিন্ন পন্থাই নাই। সহজ পন্থা গুরুর মুখে শুনিতে হয়।

এখানে পুথির একটি পাতা না থাকায় সরোরুহ কী প্রকারে লোকায়ত ও সাংখ্যমত খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা জানা যায় না। তিনি

বলেন, সহজ-মতে না আসিলে মুক্তির কোনো উপায়ই নাই। সহজ-ধর্মে বাচ্য নাই, বাচক নাই এবং ইহাদের সম্বন্ধও নাই। যে যে-উপায়ে মুক্তির চেষ্টা করুক-না কেন, শেষ সকলকে সহজ পথেই আসিতে হইবে।

তিনি বলেন, মানুষ আপনার স্বভাবটাই বুঝে না। ভাবও নাই, অভাবও নাই, সকলই শূন্যরূপ অর্থাৎ ভব ও নির্বাণে কোনো প্রভেদ নাই। দু-ই এক, সুতরাং সহজিয়ারা অদ্বয়বাদী। মানুষের স্বভাব যদি এই হইল, তখন তাহাকে বন্ধ করে কে? সরোরুহপাদের শেষ দুইটি দোহা এই—

পর অপ্পান ম ভন্তি করু সঅল নিরন্তর বুদ্ধ।
এহু সো নিম্মল পরম পাউ চিত্ত স্বভাবে শুদ্ধ॥

আপনি ও পর, এ ভ্রান্তি করিও না (দু-ই এক); সকলই নিরন্তর বুদ্ধ, এই সেই নির্মল পরমপদ্মরূপ চিত্ত স্বভাবতই শুদ্ধ।

অদ্বঅ চিত্ত তরুঅর হরউ তিহুঅনে বিস্থা
করুণা ফুল্লিন্য ফল ধরই নামে পর উআর।

অদ্বয় চিত্ত-তরুর অবস্থা ত্রিভুবন হরণ করেন, তখন করুণার ফুল ফোটে এবং ফল ধরে, সে ফলের নাম পর-উপকার।

যতদূর সংক্ষেপে পারিলাম, সরোরুহবজ্রপাদের দোহা ও অদ্বয়বজ্রের টীকার মূল কথাগুলি বলিয়া দিলাম। সহজিয়াধর্মের যত বই আছে, সকলেরই মূল কথা ঐ এক, কিন্তু ইহাতে একটি মুশকিল আছে; সেটি এই যে, সহজিয়াধর্মের সকল বই-ই সন্ধ্যা ভাষায় লেখা। সন্ধ্যা ভাষার মানে, আলো-আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না[২১] অর্থাৎ এই-সকল উঁচু অঙ্গের ধর্মকথার ভিতরে একটা অন্য ভাবের কথাও আছে। সেটা খুলিয়া ব্যাখ্যা করিবার নয়। যাঁহারা সাধন-ভজন করেন, তাহারাই সে কথা বুঝিবেন, আমাদের বুঝিয়া কাজ নাই। আমরা সাহিত্যের কথা কহিতে আসিয়াছি, সাহিত্যের কথাই কহিব।

এখন এই যে ভাষা, যাহাকে আমি বাংলা বলিতেছি, ইহা বাংলা কি না?[২২] সরোরুহবজ্রের দুইটা দোহা দিয়াছি, একটা গান দিই। এই গানটি চর্যাচর্যবিনিশ্চয় নামক সহজিয়া গ্রন্থে আছে। সরোরুহ শব্দের বাংলায় সরহ হয়, এই গানের ভণিতায়ও সরহ আছে।

সুইণা হ অবিদারঅরে নিঅমন তাহোরেঁ দোসে
গুরুবঅন বিহারেরেঁ থাকিব তই ঘুণ্ড কইসে ॥ ধ্রু ॥
অকট হুঁ ভবই অণা
বঙ্গে জায়া নিলেসি পরে ভাগেল তোহার বিণাণা ॥ ধ্রু ॥
অদঅভুর ভব মোহারো দিসই পর অপ্যণা
এ জগ জলবিম্বকারে সহজেঁ সুণ অপণা ॥ ধ্রু ॥
অমিয়া আছন্তেঁ বিস গিলেসি রে চিঅ পসর বস অপা
ঘারেঁ পারেঁ কা বুঝ্‌ঝিলে মরে খাইব মই দুঠ কুণ্ডরাঁ ॥ ধ্রু ॥
সরহ ভণন্তি বর সুণ গোহালি কিমো দুঠ্য বলন্দেঁ
একেলে জগ আলিঅ রে বিরহুঁঈ ছন্দ্রেঁ ॥ ধ্রু ॥

হে মন! তোমার অবিদ্যা-দোষ হেতু এবং স্বপ্নেও লোভ থাকায় গুরুবচন ত্রৈলোক্য ছাইয়া ফেলিল, এখন তুমি কোথায় লুকাইয়া থাকিবে? হুংকার-বীজ অত্যন্ত আশ্চর্য, তুমি গগনে প্রবিষ্ট হইলে, এক্ষণে তোমার অবিদ্যা নাশ হইবে। তুমি বঙ্গদেশে স্ত্রীগ্রহণ করিলে, তোমার বিজ্ঞান পলাইয়া গেল। ভবের মোহ অদ্ভুত, যেহেতু তাহাতে আপন পর দেখা যায়। সহজমতে এ জগৎ জলবিম্বের ন্যায় এবং আত্মা শূন্যস্বরূপ। অমৃত আশে রে চিত্ত, তুই বিষ খাইতেছিস, তুই কর্মের নিতান্ত বশ, তুই ঘরে পরে কী বুঝিলি, আমি দুষ্ট কুণ্ডকে মারিয়া খাইব। সরহ বলেন— রে গোয়ালিনী, দুষ্ট বলদ লইয়া আমি কী করিব? একলাই জগৎ বিনাশ করিয়া স্বচ্ছন্দে ত্রিভুবনে বিহার করিব।

কাঅ ণাবড়ি খাণ্টি মণ কেড়ুআল
সদগুরু বঅনে ধর পতবাল ॥ ধ্রু ॥
চীঅ থির করি ধহুরে নাহী
অন উপায়ে পার ণ জাই ॥ ধ্রু ॥
নৌবাহী নৌকা টাগুঅ গুণে
মেলি মেল সহজেঁ জাউ ণ আণেঁ ॥ ধ্রু ॥
বাট অভঅ খাণ্ট বি বলআ
ভব উলোলেঁ ষঅ বি বোলিআ ॥ ধ্রু ॥
ফুল লই ঘরে সোন্তে উজাঅ
সরহ ভণই গণে পাআএঁ ॥ ধ্রু ॥

দেহ নৌকা, মন তাহার দাঁড়, সদ্‌গুরু-বচন এ নৌকার হাল হউক। চিত্ত স্থির করিয়া নৌকাটিকে রক্ষা করো, পারে যাইবার অন্য উপায় নাই, অন্য নৌকায় যেমন গুণ টানিয়া যায়, এ নৌকা সেরূপ নহে। এ নৌকা ত্যাগ করিয়া সহজ পথে যাও, অন্য উপায়ে যাইবার জো নাই। পথে কোনো ভয় নাই, বলদ দুটিও খাটিতে পারে। ভব-সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিয়াছে, খরস্রোতে কূল উজাইয়া যাইতেছে। সরহ বলেন—আমি প্রমাদ গণিতেছি।

অপণে রচি রচি ভবনির্বাণা
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপনা ॥ ধ্রু ॥
অম্হে ন জাণঁহু অচিন্ত জোই
জাম মরণ ভব কইসণ হোই ॥ ধ্রু ॥
জইসো জাম মরণ বি তইসো
জীবন্তে মঅনেঁ নাহি বিশেষো ॥ ধ্রু ॥
জাএথু জাম মরণে বিসঙ্কা
সো করউ রস রসাণেরে কংখা ॥ ধ্রু ॥
জে সচরাচর তিঅস ভমন্তি
তে অজরামর কিম্পি ন হোন্তি ॥ ধ্রু ॥
জামে কাম কি কামে জাম
সরহ ভণতি অচিন্ত সো ধাম ॥ ধ্রু ॥

লোক মিথ্যা মিথ্যা আপনার মনে মনে ভব ও নির্বাণ রচনা করিয়া করিয়া আপনাকে বন্ধ করিতেছে। আমরা কিন্তু অচিন্ত্য যোগী, আমরা জানি না, জন্ম-মরণ এবং ভব কিরূপ হয়। জন্মও যেমন, মরণও তেমনি, জীবন্ত ও মরণে কিছুমাত্র বিশেষ নাই; এ ভবে যাহার জন্ম ও মরণের শঙ্কা আছে, সে-ই রস ও রসায়নের চেষ্টা করুক। যে-সকল যোগীরা সমস্ত চরাচরে ও স্বর্গে ভ্রমণ করে, তাহারা অজর এবং অমর কিছুই হইতে পারে না। সরহ বলে— জন্ম হইতে কর্ম হয়, কি কর্ম হইতে জন্ম হয়, সে ধর্ম স্থির করা যোগীদিগের পক্ষে অচিন্তনীয়।

সরহপাদের সময় সম্বন্ধে আমরা এইমাত্র জানি যে, দোহাকোষের টীকাকার অদ্বয়বজ্রের গ্রন্থ হইতে অভয়াকর গুপ্ত[২৩] অনেক জিনিস লইয়াছেন। অভয়াকর গুপ্ত বরেন্দ্রের রাজা রামপালদেবের রাজত্বের

পঁচিশ বৎসরে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। অদ্বয়বজ্রের এই কয়খানি পুস্তক তেঙ্গুরে তর্জমা হইয়াছে। 'তত্ত্বদশক', 'যুগনদ্ধপ্রকাশ', 'মহাসুখ-প্রকাশ', 'তত্ত্বপ্রকাশ', 'সেককার্য্যসংগ্রহ', 'সংক্ষিপ্তসেকপ্রক্রিয়া', 'প্রজ্ঞোপায়', 'দয়াপঞ্চক', 'মহাযানবিংশতি', 'অমন সিকারতত্ত্ব', 'মহাযানবিংশতি', 'দোহাকোষ-পঞ্জিকা' অর্থাৎ যে দোহাকোষের কথা আমরা এতক্ষণ বলিতেছিলাম। অদ্বয়বজ্রকে তেঙ্গুরে কোথাও মহাপণ্ডিত, কোথাও আচার্য, কোথাও অবধূত বলিয়াছে।

সরহপাদেরও কয়েকখানি পুস্তক তেঙ্গুরে তর্জমা আছে; যথা—'বুদ্ধকপালতন্ত্র-পঞ্জিকা', 'জ্ঞানবতীনং', 'বুদ্ধকপালসাধনং', 'সর্বভূতবলি-বিধি', 'শ্রীবুদ্ধকপালনামমণ্ডলবিধিক্রমপ্রদ্যোতন'।

এশিয়াটিক সোসাইটির পুথিখানায় ৯৯৯০ নম্বরে তিনখানি তাল-পাতা আছে, উহাতে শান্তিদেবের জীবন-চরিত দেওয়া আছে। তাল-পাতাগুলি নেওয়ারি অক্ষরে লিখিত, অক্ষরের আকার দেখিয়া বোধ হয়, ইংরাজি ১৪ শতাব্দীতে লেখা হইয়াছিল। শান্তিদেব একজন রাজার ছেলে, যে দেশের রাজা, সে দেশের নামটি পড়া যায় না। রাজার নাম মঞ্জুবর্মা। তারনাথ বলেন— শান্তিদেব সৌরাষ্ট্রের রাজার ছেলে। বেণ্ডল সাহেবও তাহাই বলিয়াছেন। এ কথা কিন্তু আমার ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। কারণ পরে প্রকাশ হইবে। রাজা শান্তিদেবকে যুবরাজ করিবার ইচ্ছা করিলেন। শান্তিদেবের মা উঁহাকে বলিলেন, তুমি যুবরাজ হও ও পরে রাজা হও, ক্রমেই পাপে ডুবিবে। তুমি যদি ভালো চাও, নিজের উন্নতি চাও, যে দেশে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বেরা আছেন, সেই দেশে যাও। তুমি যদি মঞ্জুবজ্রের কাছে উপদেশ লইতে পারো, তোমার ধর্মে উন্নতি হইবে। এই কথা শুনিয়া শান্তি একটি সবুজ ঘোড়ায় চড়িয়া আপন দেশ ত্যাগ করিলেন। কয়েক দিন ধরিয়া তিনি ঘোড়ার উপরেই রহিলেন, আহার-নিদ্রা এক প্রকার বন্ধ হইয়া গেল। একদিন একটি নিবিড় বনের মধ্যে একটি সুন্দরী বালিকা তাঁহার ঘোড়ার লাগাম ধরিল এবং তাঁহাকে নামিতে বলিল। সে তাঁহাকে ভালো জল খাইতে দিল এবং পাঁঠার মাংস খাওয়াইয়া দিল। পরিচয়ে জানা গেল, সে মেয়েটি মঞ্জুবজ্রসমাধির শিষ্যা। মঞ্জুবজ্রের নাম শুনিয়াই শান্তিদেব শিহরিয়া উঠিলেন; বলিলেন, আমি উঁহারই নিকট উপদেশ লইতে

আসিয়াছি। তখন উভয়ে মঞ্জুবজ্রের নিকট গেলেন। শান্তিদেব তাঁহার নিকট বারো বৎসর রহিলেন এবং মঞ্জুশ্রী সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিলেন। বারো বৎসরের পর তাঁহার গুরু বলিলেন, তুমি মধ্যদেশে যাও। শান্তি-দেব মধ্যদেশে গিয়া মগধের রাজার রাউত হইলেন। রাউত শব্দ এখন প্রচলিত নাই। পূর্বে এ কথাটি বেশ চলিত ছিল, উহার অর্থ সেনা-পতি। আমাদের দেশের গন্ধবেনেদের চারটি আশ্রম আছে, তাহার মধ্যে একটি রাউত আশ্রম অর্থাৎ রাউতাশ্রমের বেনেরা শুধু ছাউনিতে মসলা বিক্রয় করে। অনেক বড়ো বড়ো নগরে রাউতপাড়া নামে একটি পাড়া থাকিত। রাউত হইয়া শান্তিদেবের নাম হইল অচলসেন। তাঁহার একখানি দেবদারু কাঠের তরবারি ছিল, তিনি সে তরবারি কাহাকেও দেখাইতেন না। ক্রমে তিনি রাজার একজন প্রধান প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন, অন্যান্য রাউতেরা তাঁহার হিংসা করিতে লাগিল। ক্রমে তাহারা টের পাইল যে, অচলসেনের তরবারি কাঠের। তাহারা রাজাকে বলিল, আপনি অচলসেনকে এত ভালোবাসেন, ওর তরবারি তো কাঠের, ও কী করিয়া যুদ্ধ করিবে ? তাই শুনিয়া রাজা একদিন হুকুম দিলেন, আমি সকলের তরবারি পরীক্ষা করিব। সকলেই তরবারি দেখাইল, অচলসেন কিছুতেই রাজি হইল না। রাজা জিদ করিতে লাগিলেন। তখন সে বলিল, আমার তলোয়ারের তেজে আপনি অন্ধ হইয়া যাইবেন। যদি নিতান্ত দেখিতে চান, একটি চক্ষু বাঁধিয়া রাখুন, অপর চক্ষে দেখুন। রাজা তাহাই করিলেন, তাঁহার একটি চক্ষু কানা হইয়া গেল। রাজা খুব খুশি হইলেন এবং অচলসেনের খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন; কিন্তু অচলসেনের আর রাউতগিরি করা হইল না। সে পাথরের উপর আছড়াইয়া তলোয়ারখানি ভাঙিয়া ফেলিল, রাউতের বেশ ত্যাগ করিল এবং নালন্দায় গিয়া ভিক্ষু হইল। সে নালন্দার এক-প্রান্তে একখানি কুঁড়ে করিল এবং সেইখানেই বাস করিতে লাগিল। সে ত্রিপিটকের ব্যাখ্যা শুনিত এবং যোগ করিত। সে সর্বদা শান্তভাবে থাকিত, তাই লোকে তাকে শান্তিদেব বলিত। নালন্দার সঙ্ঘে তাহার আর-একটি নাম হইয়াছিল ভূসুকু, কারণ, ভুঞ্জানোপি প্রভাস্বরঃ সুপ্তোপি কুটীং গতোপি তদেবেতি ভূসুকুসমাধিসমাপন্নত্বাৎ ভূসুকুনাম খ্যাতিং সঙ্ঘেঽপি। অর্থাৎ ভোজনের সময় তাঁহার মূর্তি উজ্জ্বল থাকিত,

শয়নের সময় উজ্জ্বল থাকিত এবং কুটিতে বসিয়া থাকিলেও উজ্জ্বল থাকিত।[২৪]

এইরূপে বহু-দিন যায়। শান্তিদেব কাহারো সহিত বড়ো একটা কথা কহিতেন না, আপন মনে আপন কাজ করিয়া যাইতেন, কিন্তু ছেলেগুলা তাঁহার সহিত দুষ্টামি আরম্ভ করিল। অনেকের সংস্কার হইল, তিনি কিছু জানেন না, সুতরাং একদিন তাঁহাকে অপ্রস্তুত করিতে হইবে। নালন্দায় রীতি ছিল, জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাষ্টমীতে পাঠ ও ব্যাখ্যা হইত, নালন্দার বড়ো বিহারের উত্তর-পূর্ব কোণে এক প্রকাণ্ড ধর্মশালা ছিল, পাঠ ও ব্যাখ্যার জন্য সেই ধর্মশালা সাজানো হইত, সব পণ্ডিতেরা সেখানে আসিতেন এবং অনেক লোক শুনিতে আসিত। যখন সভা বসিয়াছে, পণ্ডিতেরা আসিয়াছেন, সব প্রস্তুত, ছেলেরা ধরিয়া বসিল, শান্তিদেব! তোমায় আজ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতে হইবে। শান্তি যতই গররাজি হন, ছেলেরা ততই জিদ করিতে লাগিল। শেষে তাঁহাকে ধরিয়া বেদিতে বসাইয়া দিল। তাহারা মনে করিল, এ একটি কথাও কহিতে পারিবে না, আমরা হাসিব ও হাততালি দিব। শান্তিদেব গম্ভীরভাবে বসিয়া বলিলেন, "কিম্ আর্ষং পঠামি অথার্ষং বা।" শুনিয়াই পণ্ডিত সকল স্তব্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহারা আর্ষ শুনিয়াছেন, অথার্ষ শুনেন নাই। তাঁহারা বলিলেন— এ দুয়ে প্রভেদ কী? শান্তিদেব বলিলেন, পরমার্থজ্ঞানীর নাম ঋষি অর্থাৎ তিনি বুদ্ধ এবং জিন; তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আর্ষ। যদি বলো, সুভূতি প্রভৃতি শিষ্যেরা উপদেশ দিয়াছেন যে-সকল গ্রন্থে, তাহা কেমন করিয়া আর্ষ হইল? তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, যুবরাজ আর্য মৈত্রেয় বলিয়া গিয়াছেন—

যদর্থবদ্ধধর্ম্মপদোপসংহিতং ত্রিধাতুসংক্লেশনিবর্হণং বচঃ।
ভবে ভবেচ্ছান্ত্যনুশংসদর্শকং তদ্বৎ ক্রমার্ষং বিপরীতমন্যথা ॥[২৫]

অতএব আর্ষ গ্রন্থ হইতে আর্য পণ্ডিতগণ যাহা আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন, তাহাই অথার্ষ আর সুভূতি প্রভৃতির যে উপদেশ, তাহা আর্ষ, যেহেতু ভগবান্ তাহার অধিষ্ঠাতা। পণ্ডিতেরা বলিলেন, আমরা আর্ষ অনেক শুনিয়াছি, তোমার কাছে কিছু অথার্ষ শুনিব।

ইতিপূর্বেই শান্তিদেব 'বোধিচর্যাবতার', 'শিক্ষা-সমুচ্চয়' ও 'সূত্র-সমুচ্চয়' নামে তিনখানি অথার্ষ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ

ধ্যান করিতে লাগিলেন, শেষ বোধিচর্যাবতার পাঠ করিতে লাগিলেন। প্রথম হইতেই পাঠ আরম্ভ হইল, বোধিচর্যার ভাষা অতি সুললিত, যেন বীণার সুরে বাঁধা, ভাব অতি গভীর, সংক্ষিপ্ত ও মধুর। পণ্ডিতেরা স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। ছেলেরা মনে করিয়াছিল, লোকটাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবে, তাহারা ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া উঠিল। ক্রমে যখন পাঠ জমিতে লাগিল, যখন মহাযানের গূঢ়তত্ত্ব ব্যাখ্যা হইতে লাগিল, যখন শান্তি মধুর স্বরে—

যদা ন ভাবো নাভাবো মতেঃ সন্তিষ্ঠতে পুরঃ।
তদান্যগত্য ভাবেন নিরালম্বঃ প্রশাম্যতে ॥[২৬]

ঐ শ্লোক ব্যাখ্যা করিতেছেন, হঠাৎ স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল, আর উজ্জ্বলবর্ণ বিমানে চড়িয়া, শরীর-প্রভায় দিগন্ত আলোকিত করিয়া মঞ্জুশ্রী নামিতে লাগিলেন। ব্যাখ্যা শেষ হইল, তিনি শান্তিদেবকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বিমানে তুলিয়া স্বর্গে লইয়া গেলেন। পর দিন পণ্ডিতেরা তাঁহার কুটিতে গিয়া বোধিচর্যাবতার, শিক্ষা-সমুচ্চয় ও সূত্র-সমুচ্চয় তিনখানি পুথি পাইলেন ও তাহা প্রচার করিয়া দিলেন। এই তিনখানির দুইখানি পাওয়া গিয়াছে, কেবল সূত্র-সমুচ্চয় পাওয়া যায় নাই। যে দুইখানি পাওয়া গিয়াছে, তাহা ছাপানোও হইয়াছে। শান্তিদেব ও ভুসুকু যে এক ব্যক্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্বে যেমন সরহপাদের কতকগুলি গান দিয়াছি, সেইরূপ ভুসুকুপাদেরও কতকগুলি গান আছে। গানের ভুসুকু ও শান্তিদেব এক কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহ। কারণ, গানগুলি সহজযানের ও পুথিগুলি মহাযানের। কিন্তু শিক্ষা-সমুচ্চয়ের ভূমিকায় বেণ্ডল সাহেব বলিয়াছেন যে, এ পুস্তকে তান্ত্রিক মতের অনেক কথা আছে। এশিয়াটিক সোসাইটির পুথিখানায় ৪৮০১ নম্বরের যে পুথি আছে, তাহাও ভুসুকুপাদের লেখা। এই পুথিখানি সম্পূর্ণ নহে, সাতটি মাত্র পাতা, কিন্তু এখানি পুরামাত্রায় সহজযানের পুথি। ইহাতে সহজিয়াদিগের কুটি-নির্মাণ, ভোজন-বিধি, শয়ন-বিধি প্রভৃতি নানা বিধি আছে। ইহাতে মদ খাওয়া ও তাহার আনুষঙ্গিক ব্যাপারেরও ত্রুটি নাই। ইহাতেও বাংলা গান আছে, এই পুথির অক্ষরও খুব প্রাচীন। ইহা হইতে একটি বাংলা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

রবিকলা মেলহ, শশিকলা বারহ বোণি বাট বহন্ত।
তোড়হ সমস্তা সমরস জাউ ন জায়তে কাগণ জগফলা খায় ॥
আরো—
অম্বু পসরতু চন্দন বারহ অরুহেঠ কমল করি শয়ন অরু।
সুরচাপি শশি সমরস জায় রাউত বোলে জরমরণ ভয়
বেঅদণ্ড চউন্দ চর্য্যহ সূরকায় ছাড়ি ন যাই
সো দুর যোগীঞ ন জানহ খোজ গুরু নিন্দা করি ধুরুন্তি যোগ।

এই পুস্তকের ভূসুকুও রাউত। শান্তিদেবও ভূসুকুও বটে, রাউতও বটে। আর বাস্তবিকও শান্তিদেব যখন অভিধর্মের বই একখানি লিখিলেন, সূত্রান্তের বই একখানি লিখিলেন, শিক্ষার বই একখানি লিখিলেন, বিধির বই একখানি না লিখিলে তাঁহার বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থ পুরা হইল কই? শান্তিদেব যে শান্তিদেব নামেই একখানি বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রমাণ আমরা তেঙ্গুর হইতে পাইয়াছি। সে গ্রন্থখানির নাম 'শ্রীগুহ্যসমাজমহাযোগতন্ত্রবলিবিধি'। এইখানে লেখা আছে, শান্তিদেবের বাড়ি ছিল জাহোর। জাহোর কোথায়, জানা যায় না। কিন্তু রাউত ভূসুকুর বাড়ি যে বাংলায় ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে ভূসুকুর একটি গান আছে; সেটি এই—

বাজ ণাব পাড়ী পঁউআ খালে' বাহিউ
অদঅ বঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউ ॥ ধ্রু ॥
আজি ভূসু বঙ্গালী ভইলী
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী ॥ ধ্রু ॥
ডহি জো পঞ্চধাট লই দিবি সংজ্ঞা ণঠা
ন জানমি চিঅ মোর কঁহি গই পইঠা ॥ ধ্রু ॥
সোন তরুঅ মোর কিম্পি ন থাকিউ
নিঅ পরিবারে মহাসুহে থাকিউ ॥ ধ্রু ॥
চউকোড়ী ভণ্ডার মোর লইআ সেস
জীবন্তে মইলে' নাহি বিশেষ ॥ ধ্রু ॥

বজ্রনৌকা পাড়ি দিয়া পদ্মখালে বাহিলাম, আর অদ্বয় যে বঙ্গাল দেশ, তাহাতে আসিয়া ক্লেশ লুটাইয়া দিলাম। রে ভূসু, আজ তুমি

সত্য সত্যই বাঙালি হইলে, যেহেতু নিজ ঘরিণীকে (চণ্ডালী) করিয়া লইলে।

সহজ-মতে তিনটি পথ আছে— অবধূতী, চণ্ডালী, ডোম্বি বা বঙ্গালি। অবধূতিতে দ্বৈতজ্ঞান থাকে, চণ্ডালীতে দ্বৈতজ্ঞান আছে বলিলেও হয়, না বলিলেও হয়, কিন্তু ডোম্বিতে কেবল অদ্বৈত ; দ্বৈতের ভাঁজও নাই। বাংলায় অদ্বৈত মত অধিক চলিত, সেইজন্য বাংলা অদ্বৈত মতের যেন আধারই ছিল। গ্রন্থাকার এখানে বলিতেছেন— রে ভূসুকু, তোমার নিজ ঘরিণী যে অবধূতী ছিল, তাহাকে চণ্ডালী করিয়াছিলে, এইবার তুমি বাঙালি হইলে অর্থাৎ পূর্ণ অদ্বৈত হইলে।

তুমি মহাসুখরূপ অনলের দ্বারা পঞ্চস্কন্ধাশ্রিত সমস্ত দগ্ধ করিয়াছ। তোমার সংজ্ঞাও নষ্ট হইয়াছে। এখন জানি না, আমার চিত্ত কোথায় গিয়া পহুঁছিল, আমার শূন্য তত্ত্বর কিছুই রহিল না। সে আপন পরিবারে মহাসুখে থাকিল, আমার চার কোটি ভাণ্ডার সব লইয়া গেল, এখন জীবনে ও মরণে কিছুই বিশেষ নাই। জাহোর কোথা না জানিলেও এ গানে বেশ বোধ হয়, রাউত ভূসুকু ও শান্তিদেব বাঙালি। রাউতের আর-একটি গান এই—

আইএ অণুঅনাএ জগরে ভাংতি এ'সো পড়িহাই
রাজসাপ দেখি জো চমকিই যারে কিং তং (কং)
রোড়ো খাই ॥ ধ্রু ॥
অকট জোইআরে মা কর হথা লোহ্না
আইস সভাবেঁ জই জগ বুঝষি তুট বাষণা তোরা ॥ ধ্রু ॥
মরু মরীচি গন্ধনইরীদাপাতি বিম্বু জইসা
বাতাবত্তেঁ সো দিট ভইআ অপেঁ পাথর জইসা ॥ ধ্রু ॥
বাঁঝি সুআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিধখেড়া
বালুআএল' সসবসিংগে আকাশ ফুলিলা
রাউতু ভনই কট ভূসুকু ভনই কট সঅলা অইস সহার
জইতো মূঢ়া অছসি ভান্তী পুচ্ছতু সদ্‌গুরু পাব ॥ ধ্রু ॥

জগৎ যে অনুৎপন্ন, পরমার্থজ্ঞ যাঁরা, তাঁরা এ কথা জানেন। তাঁহারা জানেন যে জগৎকে সৎ বলা ভ্রান্তি মাত্র। দড়িকে রাজসাপ বলিয়া যাহারা চমকিয়া উঠে, সত্য সত্যই বোড়া সাপে কি তাহাদের খায় ? ভ্রম

গেলেই সত্য প্রকাশ হয়। কী আশ্চর্য, হে বালযোগিন্, ইহাতে হাত বুলাইও না, যদি জগতের শূন্যস্বভাব অবগত হও, তাহা হইলে তোমার বাসনা দূর হইবে। মরীচিকা, গন্ধর্ব-নগর, দর্পণ-প্রতিবিম্ব যেরূপ, জগৎও সেইরূপ। বাতাবর্তে দৃঢ় হইয়া জল যেমন পাথর হয়, জগৎও সেইরূপ। জগৎ বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের ন্যায়, তিনি পুত্রবতীর ন্যায় কেলি করেন ও বহুবিধ খেলা দেখান। বালি হইতে তেল বাহির করেন, শশকের শৃঙ্গ বাহির করেন ও আকাশে ফুল ফোটান। রাউতু বলেন— কী আশ্চর্য, ভূসুকু বলেন— কী আশ্চর্য ! সকলেরই একই স্বভাব। রে মূর্খ ! তোর যদি ভ্রান্তি থাকে, তবে সদ্‌গুরুর কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা কর।

এই প্রস্তাবে স্থির হইল যে, শান্তিদেব, রাউতু ও ভূসুকু এক।[২৭] তিনি মহাযান ও সহজযান, উভয় যানেরই লোক, তিনি সংস্কৃত ও বাংলা দুই ভাষাতেই লিখিয়াছেন এবং তাঁহার বাড়ি বাংলায়ই ছিল। এখন তিনি কোন্ কালের লোক ? প্রফেসর বেণ্ডল একবার বলিয়াছিলেন যে, শিক্ষাসমুচ্চয় ইংরাজি সনের সপ্তম শতে লেখা হইয়াছিল। আবার বলিয়াছেন যে, না, শ্রীহর্ষের মৃত্যুর পর ও তিব্বতের ক্রিদ সোঁসান রাজার রাজত্বের পূর্বে তাঁহার প্রাদুর্ভাব হয়। যদি শ্রীহর্ষের পূর্বে তিনি বর্তমান থাকিতেন, তাহা হইলে হিউএন্-ৎসাঙ[২৮] তাঁহার নাম উল্লেখ করিতেন। পূর্বোক্ত তিব্বত-রাজের রাজত্বকালে তাঁহার পুস্তক তিব্বতি ভাষায় তর্জমা হইয়াছিল, সুতরাং পুস্তকগুলি তাহার পূর্বেই লেখা হইয়াছিল। সুতরাং ৬৪৮ খৃস্টাব্দ হইতে ৮১৬ সালের মধ্যে তাঁহার গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

কৃষ্ণাচার্যের একখানি পুস্তক আছে, তাহার নাম দোহাকোষ। উহাতে তেত্রিশটি দোহা আছে। প্রথম দোহাটি এই—

লোঅহ গব্ব সমুব্বহই পরমথ পবিস
কোটিহ মাহ এক জত হোই নিরঞ্জন লীন ॥

২য়— আগম বেঅ পুরাণে পণ্ডিত মান বহন্তি
পক্ক সিরি ফলঅ অলি জিম বাহেরিত ভূমযন্তি ॥

৩য়— যোহি চিঅ রঅ ভূষিঅ ফুজ্জোহেঁসি হুউ
পোকঅর বীঅ সহাবসুহু নিঅ দেহ হি দিধউ ॥

৩৩শ— ওঁ বুঝিঅ বিরল সহজসুন কাহি বেঅ পুরাণ
তোপো তোসিঅ বিষয় বিরপ্য জগুরে অশেষ পরিমান ॥

৩১শ— জে কিঅ নিচ্চল মন রঅন পিঅ ঘরণী লই এথো ।
সো বাজির নাহুরে মরি বুত্তত পরমরো ॥

চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে কাহ্নুপাদের অনেকগুলি গান আছে—

জো মন গোএর আলা জালা
আগম পোথী ইষ্টা মালা ॥ ধ্রু ॥
ভণ কই সেঁ সহজ বোল বা জায়
কাঅবাক্চিঅ জসু ন সমায় ॥ ধ্রু ॥
আলে গুরু উএসই সীস
বাক্পথাতীত কাহিব কীস ॥ ধ্রু ॥
জে তই বোলী তে তবি টাল
গুরু বোধসে সীসা কাল ॥ ধ্রু ॥
ভণই কাহ্নু জিনরঅণ কিকসইসা
কালে' বোব সংবোহিঅ জইসা ॥ ধ্রু ॥

যে-সকল বিকল্পজাল মনের গোচর, আগম, পুঁথি ইষ্টদেবের মালা মনের গোচর, সে মন কেমন করিয়া সহজকে বুঝাইয়া দিবে ? কারণ, কায়, বাক্, চিত্ত সে সহজের ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হয় না । গুরু যদি শিষ্যকে সহজ সম্বন্ধে উপদেশ দেন, তাহা বৃথা, কারণ, যে জিনিস বাক্-পথাতীত, তাহাকে কেমন করিয়া কথায় বুঝাইব ? যে সে-বিষয়ে কিছু বলে, সে টালিয়া দেয় মাত্র । গুরু বুঝিল, শিষ্য কালা, সুতরাং তাহাকে বুঝানো যায় না । কাহ্নু বলেন— কালা যেমন বোবাকে বুঝায়, সেইরূপে জিনরত্ন বুঝিতে হয় ।

আলি এ' কালি এ' বাট রুন্ধেলা ।
তা দেখি কাহ্নু বিমন ভইলা ॥
কাহ্নু কহি-সই করিব নিবাস ।
যো মন গোঅর সো উআস ॥
তেতিনি তেতিনি তিনি হো ভিন্না ।
ভনই কাহ্নু ভব পরিচ্ছিন্না ॥
জে জে আইলা তে তে গেলা ।
অবণা গবণে কাহ্নু বিমন ভইলা ॥

হেরি সে কাহি নিআড়ি জিনউর বটুই।
ভণই কাহ্ন মোহি অহি ন পই সই ॥

আলি কালি এক করিয়া, অবধূতি-মার্গ রোধ করিয়া, চণ্ডালীমার্গে গিয়া কৃষ্ণাচার্য আনন্দিত হইলেন। ওহে কাহ্ন, তুমি কোথায় গিয়া বাস করিবে? যাহারা বড়ো যোগী, তাহারাও এ ধর্মে উদাসীন। যে তিনটি তিনটিকে ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, বাস্তবিক দেখিতে গেলে তাহারা ভিন্ন নয়। ভিন্ন নয় বুঝিলেই ভবচ্ছেদ হয়। যে যে উৎপন্ন হয়, সেই সেই বিলয় প্রাপ্ত হয়, ইহাদের আনাগোনা দেখিয়া কাহ্ন আনন্দিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, জিনপুর অতি নিকটেই আছে। তিনি বলিতেছেন, এখানে মোহ প্রবেশ করিতে পারে না।

এই কৃষ্ণাচার্য এককালে বাংলার একজন অদ্বিতীয় নেতা ছিলেন, তাঁহার বিস্তর গ্রন্থ আছে। তাঁহার দোহাকোষ পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, তাঁহার গানগুলির কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, তিনি হেরুক-হেবজ্র প্রভৃতি দেবতার তান্ত্রিক উপাসনা সম্বন্ধে অনেক বহি লিখিয়াছেন ও তাহার টীকা লিখিয়াছেন। ইনি একজন সিদ্ধাচার্য ছিলেন। কিন্তু এই সিদ্ধাচার্যদিগের যিনি আদি, তাঁহার কথা না বলিলে আমার এ প্রবন্ধ সম্পূর্ণ হইবে না। তিব্বত দেশে এখনো সিদ্ধাচার্যগণের পূজা হইয়া থাকে। তাঁহাদের সকলেরই দাড়ি আছে ও মাথায় জটা আছে এবং প্রায় উলঙ্গ থাকে। চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের মতে লুই[২৯] সর্বপ্রথম সিদ্ধাচার্য। ঐ গ্রন্থে তাঁহার অনেকগুলি গান আছে, একটি দিলাম—

কা আ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল ॥
দিট করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুছিঅ জাণ ॥
সঅল সমাহিঅ কাহি-করিআই।
সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরি আই ॥
এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস।
সুনুপাখ ভিতি লাহুরে পাস ॥
ভনই লুই আমৃহে সানে দিঠা।
ধমণ চমণ বেণি পাণ্ডি বইণ ॥

দেহ তরুবর, তাহাতে পাঁচটি ডাল আছে। চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবেশ করিল ; লুই বলেন, মহাসুখের পরিমাণ দেখিয়া উহা কী, গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া লও। যত রকম সমাধি আছে, তাহার দ্বারা কী হইবে? সে-সকল সমাধি করিলে সুখ ও দুঃখে নিশ্চয়ই মারা যাইবে। ছন্দের বন্ধন ও করণের পরিপাটি পরিত্যাগ করিয়া শূন্যপক্ষরূপ ভিত্তিকে লইয়া আইস। লুই বলিতেছেন, আমি পণ্ডিতের বচনানুসারে দেখিয়াছি, ধমণ ও চমণ অর্থাৎ আলি ও কালি এই উভয়ে আসন করিয়া আমার দেবতা বসিয়া আছেন।

তেঙ্গুরে যতটুকু ক্যাটালগ বাহির হইয়াছে, তাহাতে লেখা আছে, লুই বাংলাদেশের লোক, তাঁহার আর-একটি নাম মৎস্যান্ত্রাদ। রাঢ়দেশে যাহারা ধর্মঠাকুরের পূজা করে, তাহারা এখনো তাঁহার নামে পাঁঠা ছাড়িয়া দেয়। ময়ূরভঞ্জেও তাঁহার পূজা হইরা থাকে। লুইয়ের সময় ঠিক করিতে হইলে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট যে, তাঁহার কোনো কোনো গ্রন্থের টীকা প্রজ্ঞাকর শ্রীজ্ঞান [দীপঙ্করশ্রী জ্ঞান][৩০] করিয়াছেন। প্রজ্ঞাকর শ্রীজ্ঞান ১০৩৮ সালে বিক্রমশীল বিহার হইতে ৭০ বৎসর বয়সে তিব্বত যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার আর-একখানি গ্রন্থের টীকা করিয়াছেন রত্নকীর্তি।[৩১] রত্নকীর্তি প্রজ্ঞাকর শ্রীজ্ঞানেরও পূর্ববর্তী লোক। বোধ হয়, শান্তিদেব ও লুই একই সময়ের লোক, বরং তিনি কিছু পূর্বে হইতে পারেন। [পাঠ-প্রসঙ্গ দ্র.]

লুই আচার্যের শিষ্যপরম্পরায় সিদ্ধাচার্য হইতেন, তন্মধ্যে দারিক[৩২] নামে একজন লুইকে আপনার গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

সুন করুণরি অভিন বারেঁ কাঅবাকচিঅ।
বিলসই দারিক গঅনত পারিমকুলে ॥
অলক্ষলখচিতা মহাসুহে।
বিলসই দারিক গঅনত পারিমকুলে* ॥
কিন্তো মন্তে কিন্তো তন্তে কিন্তোরে ঝাণবখানে।
অপইঠান মহাসুহলীনে দুলখ পরমনিবানে ॥
দুঃখে* দুঃখে* একু করিআ ভুঞ্জই ইন্দীজানী।
স্বপরাপর ন চেবই দারিক সঅলানুত্তর মানী ॥

রাআ রাআ রাআরে অবর রাঅ মোহেরা বাধা।
লুই পাঅপএ দারিক দ্বাদশ ভুঅনে' লধা ॥

সিদ্ধাচার্য লুইপাদের বংশে তিলপাদ নামে আর-একজন সিদ্ধাচার্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিও সহজিয়া গান লিখিয়া গিয়াছেন। যে-সকল গান পূর্বে তুলিয়াছি, তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, এগুলি কীর্তনেরই পদ। সেকালেও সংকীর্তন ছিল এবং সংকীর্তনের গানগুলিকে পদই বলিত। তবে এখনকার কীর্তনের পদকে শুধু পদ বলে, তখন 'চর্যাপদ' বলিত। এতক্ষণ যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহা হইতে আপনাদের বোধ হইবে যে, বৌদ্ধেরাই বুঝি সেকালে গান লিখিত, কিন্তু নাথেরাও সেকালে বাংলা লিখিত। মীননাথের একটি কবিতা পাইয়াছি, এখানে তুলিয়া দিলাম—

কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট
কর্ম্ম কুরঙ্গ সমাধিক পাঠ
কমল বিকসিল কহিহ ণ জমরা
কমল মধু পিবিবি ধোকে ন ডমরা ॥

এ বাংলা কবিতাটি মীননাথের। অন্যান্য নাথেরা যে বাংলায় বহি লিখিয়াছিলেন, তাহারো প্রমাণ আছে।[৩৩] তবে এই দাঁড়াইল যে, খৃস্টীয় ৮ শতাব্দীতে বৌদ্ধাদিগের মধ্যে লুই সহজ-ধর্ম প্রচার করেন। সেই সময় তাঁহার চেলারা অনেকে সংকীর্তনের পদ লেখে ও দোহা লেখে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই অথচ তাহার একটু পরেই নাথেরা নাথপন্থ নামক ধর্ম প্রচার করেন, তাহারো অনেক বহি ও কবিতা বাংলায় লেখা। নাথও অনেকগুলি ছিলেন, কেহ বৌদ্ধধর্ম হইতে নাথপন্থ গ্রহণ করেন, কেহ কেহ হিন্দু হইতে নাথপন্থ গ্রহণ করেন। যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম হইতে নাথপন্থ গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে গোরক্ষনাথ একজন। তারনাথ বলেন, গোরক্ষনাথ যখন বৌদ্ধ ছিলেন, তখন তাঁহার নাম ছিল অনঙ্গবজ্র। কিন্তু আমি বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছিলাম, তখন তাঁহার নাম রমণবজ্র। নেপালের বৌদ্ধেরা গোরক্ষনাথের উপর বড়ো চটা। উঁহাকে তাহারা ধর্মত্যাগী বলিয়া ঘৃণা করে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাহারা মৎস্যেন্দ্রনাথকে অবলোকিতেশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করে। মৎস্যেন্দ্র-নাথের পূর্ব নাম মচ্ছঘ্ননাথ অর্থাৎ তিনি মাছ মারিতেন। বৌদ্ধাদিগের

স্মৃতিগ্রন্থে লেখা আছে যে, যাহারা নিরন্তর প্রাণীহত্যা করে, সে-সকল জাতিকে অর্থাৎ জেলে মালা কৈবর্তদিগকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করিবে না। সুতরাং মচ্ছঘ্ননাথ বৌদ্ধ হইতে পারেন না। কৌলদিগের সম্বন্ধে তাঁহার এক গ্রন্থ আছে ['কৌলজ্ঞান নির্ণয়'], তাহা পড়িয়া বোধ হয় না যে, তিনি বৌদ্ধ ছিলেন, তিনি নাথপন্থীদিগের একজন গুরু ছিলেন অথচ তিনি নেপালি বৌদ্ধদিগের উপাস্য দেবতা হইয়াছেন।

সহজযান, নাথপন্থ, বজ্রযান, কালচক্রযান, যামল, ডামর, ডাকপন্থ প্রভৃতি লোকায়ত ধর্ম ছিল, ইদানীন্তন লোকে তাহার প্রভেদ বুঝিতে না পারিয়া সমুদয়গুলিকে তন্ত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। এই যে-সকল ধর্মের নাম করিলাম, ইহাদের মধ্যে আবার পরস্পর মেশামেশি হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে ঐ ভুলটা পাকিয়া গিয়াছে। আবার ইদানীন্তন লোকে না বুঝিয়া ঐ-সকল ধর্মের গ্রন্থকে প্রমাণ বলিয়া সংগ্রহ-গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে ভুলটা আরো পাকিয়া গিয়াছে। এখন দরকার হইতেছে যে, কতকগুলি লোক ধীরে ধীরে বহু-কাল ধরিয়া এই-সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইহাদের উৎপত্তি, স্থিতি, মেশামেশি ও লয়ের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া দেয়। যতদিন সে ইতিহাস না হয়, ততদিন আমরা আমাদিগকে চিনিতে পারিব না, আমাদের কোথায় গলদ আছে, ধরিতে পারিব না, আমাদের কোথায় কী গুণ আছে, বুঝিতে পারিব না। কোন্ বিষয়ে আমাদের সংস্কার আবশ্যক, তাহা জানিতে পারিব না। কিন্তু এরূপ ধীর ভাবে বহু-দিন ধরিয়া পড়িবার লোক কই ? যাহাদের বয়স অল্প, তাহারা অর্থাগমের উপায় লইয়াই ব্যস্ত, পেটের জ্বালায় পড়াশুনাই করিতে পারে না, যাহাদের সে জ্বালা নিবৃত্তি হইয়াছে, তাহাদের সেরূপ করিয়া পড়িবার সামর্থ্য নাই, সুতরাং আমাদের ইতিহাস যে-অন্ধকারে আছে, সেই অন্ধকারেই থাকিবে। মাঝে মাঝে সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা হইবে, কিন্তু না বুঝিরা না জানিয়া কোনো কাজ করিতে গেলে যাহা হয়, তাহাই হইবে, সে চেষ্টা বৃথা হইয়া যাইবে। তাহাতে আমাদের ক্ষতি বৈ বৃদ্ধি হইবে না।

পুথি খোঁজার কথা বলিতে বলিতে অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। বাংলা পুথি খোঁজা হইতে পঁচিশ বৎসরের মধ্যে এই কয়টি উপকার

হইয়াছে— ১. বাংলা দেশে আজিও যে বৌদ্ধধর্ম জীয়ন্ত আছে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। ২. মুসলমান আক্রমণের বহু-পূর্বে যে বাংলা ভাষায় একটা প্রকাণ্ড সাহিত্য ছিল, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। ৩. সে সাহিত্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু, দুই ধর্মেরই উন্নতি হইয়াছিল, তাহাও বুঝিতে পারিয়াছি। ৪. অন্ধকারাচ্ছন্ন বাংলার ইতিহাসের মধ্যে কিঞ্চিৎ আলো প্রবেশ করিয়াছে। পুথি কিন্তু ভালো করিয়া খোঁজা হয় নাই। কত দিকে কত দেশে কত রকম পুথি যে পড়িয়া আছে, তাহার ঠিকানা নাই। নিউটন বলিয়াছেন, আমরা সমুদ্রের ধারে ঝিনুক কুড়াইতেছি মাত্র। আমরা এই পুথি-সমুদ্রে ততটুকুও করিতে পারি নাই। পঁচিশ বৎসরের মধ্যে একটা জিনিস হইয়াছে, ইতিহাস জানিবার জন্য দেশের মধ্যে একটা উৎকট আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছে। সে আগ্রহ কাব্য, ব্যাকরণ, ভাষা-জ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি জানিবার জন্য যে আগ্রহ, তাহাকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছে। এখন লোকে ইতিহাসের কথা বলিলেই শুনে, অন্য কথা বলিলে বড়ো একটা শুনিতে চায় না। জিনিস কিন্তু ঠিক। সকলের আগে আমি কী, সেটুকু চেনা চাই, সেই চেনার জন্য আগ্রহ হইয়াছে। সেই আগ্রহটিকে ঠিক পথে চালানো আমাদের বড়োই দরকার। সে বিষয়ে চেষ্টারও অভাব নাই, অর্থেরও অভাব নাই। বঙ্গদেশের ধনীগণ ইহার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেছেন, অর্থ ব্যয় করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন। অভাব কেবল দুই জিনিসের : যাহারা পথ দেখাইয়া দিবে, তাহার অভাব ও যাহারা সেই পথে চলিয়া কাজ করিবে, তাহার অভাব।

এত উৎকট আগ্রহের উপরও যদি পথ দেখাইবার ও কাজ করিবার লোক না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কপাল মন্দ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। যেরূপ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে যদি শিক্ষিত লোক সকলে নিত্য এক ঘণ্টা কাল ইতিহাস আলোচনা করেন, অনেক নূতন নূতন পথ বাহির হইবে, নানা উপায়ে আমরা আমাদিগকে, আমাদের সমাজকে, আমাদের ধর্মকে, আমাদের দেশকে, আমাদের সাহিত্যকে এবং পূর্ববৃত্তান্ত কী, তাহা বুঝিতে পারিব। যতদিন তাহা না বুঝিতে পারি, ততদিন আমাদের উন্নতির পথই দেখিতে পাইব না। আপনাকে জানিতে

হইলে দেশের পুথি খোঁজার দরকার। তাহাতে পরিশ্রমকে পরিশ্রম মনে করিলে চলিবে না, অর্থকে অর্থ মনে করিলে চলিবে না। কায় মন চিত্ত লাগাইয়া পুথি খুঁজিতে হইবে ও পুথি পড়িতে হইবে।

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'
প্রথম সংখ্যা, ১৩২১ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. সূত্র

শাস্ত্রীমশায় প্রথমবার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন ১৩২০ বঙ্গাব্দে। ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিষদের বিংশ বার্ষিক অধিবেশনে এই সভাপতির অভিভাষণ পড়েন। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৩২১ বঙ্গাব্দের প্রথম সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য়। পরে এই প্রবন্ধের ১৮ অনুচ্ছেদ থেকে অনেকটা অংশ 'বৌদ্ধগান ও দোহা'র (১৩২৩ ব.) মুখবন্ধ রূপে ব্যবহার করেন। এখানে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পূর্ণ অভিভাষণটি ছাপা হল। বৌদ্ধগান ও দোহার মুখবন্ধে ছাপার সময়ে কোথাও কোথাও পরিবর্তন করেছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলি পাঠ-প্রসঙ্গ পর্যায়ে দেখানো হল।

১. শাস্ত্রীমহাশয় 'সমস্ত বিভক্তি' বলতে নিশ্চয়ই বহুবচনের বিভক্তিগুলি মনে করেছেন। 'দিগর' বিভক্তিটি যে আরবি-ফারসি থেকে নেওয়া সে কথা সুনীতিবাবুও স্বীকার করেছেন। তবে 'দের' বিভক্তি তাঁর মতে তৎসম 'আদি + কের' থেকে হয়েছে। সুনীতিবাবুর সে ব্যুৎপত্তি খাটে না। 'দিগর' যেমন আসলে শব্দ ছিল, পরে বিভক্তি হয়েছে, 'দের'ও ঠিক তাই। আমার দিগর > আমার দের > আমাদ্দের (এখনো যশোর অঞ্চলে বলে, উনিশ শতকের গোড়ার দিকে সাধু ভাষাতেও চলত) > আমাদের। 'দের' এসেছে 'দিগর' (digar, দিঘর) থেকে। সুতরাং এটিও আরবি-ফারসি।

শাস্ত্রীমহাশয় বহুবচনের 'রা'কে ধরেছিলেন ফারসি বিভক্তি বলে। একটু বাধা হচ্ছে যে ফারসি বিভক্তিটি প্রথমায় চলে না। তবে বাংলায় এটির প্রথমায় extension হতে বাধা নেই। আমার মতে 'রা' বিভক্তির উদ্ভবে দেশী ও বিদেশী দুই রকম শব্দ অথবা বিভক্তির মিশ্রণ আছে। একদিক দিয়ে দেশী— ষষ্ঠীর -'র' থেকে, অন্য দিক দিয়ে আরবি-

ফারসি 'রা'— 'রাইয়ৎ' থেকে, সেইসঙ্গে ফারসি 'রা' বিভক্তিরও যোগ থাকতে পারে।

মোট কথা শাস্ত্রীমহাশয় এখানে শব্দবিদ্যায় অপ্রস্তুত বিচক্ষণতা ও সাহস দেখিয়েছেন।

শ্রীসুকুমার সেন।

কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৮৪ খৃস্টাব্দের ১৫ জানুয়ারি। প্রতিষ্ঠা-অনুষ্ঠানে স্যার উইলিয়াম জোন্স (১৭৪৬-৯৪ খৃ.) তাঁর ভাষণে এশিয়াটিক সোসাইটির কাজের পরিসীমা বিষয়ে বলেন—

"You have realized that hope, gentlemen, and even anticipated a declaration of my wishes, by your alacrity in laying the foundation of a society for inquiring into the history and antiquities, the natural productions, arts, sciences, and literature of *Asia*....

"It is your design, I conceive, to take an ample space for your learned investigations, bounding them only by the geographical limits of *Asia* ; so that, considering *Hindustan* as a centre, and turning your eyes in idea to the North, you have on your right, many important kingdoms in the Eastern peninsula, the ancient and wonderful empire of *China* with all her *Tartarian* dependencies, and that of *Japan*, with the cluster of precious islands, in which many singular curiosities have too long been concealed : before you lies that prodigious chain of mountains, which formerly perhaps were a barrier against the violence of the sea, and beyond them the very interesting country of *Tibet*, and the vast regions of *Tartary*, from which, as from the *Trojan* horse of the poets have issued so many consummate warriors, whose domain has extended at least from the banks of Ilissus to the mouths of the *Ganges* : on your left are the beautiful and celebrated provinces of *Iran* or *Persia*, the unmeasured and perhaps unmea-

surable deserts of *Arabia*, and the once flourishing Kingdom of *Yemen*, with the pleasant isles that the *Arabs* have subdued or colonized ; and farther westward, the *Asiatick* dominions of the *Turkis* sultans, whose moon seems approaching rapidly to its wane. By this great circumference the field of your useful researches will be inclosed ; but, since *Egypt* had unquestionably an old connexion with this country, if not with *China*, since the language and literature of the *Abyssinians* bear a manifest affinity to those of *Asia*, since the *Arabian* arms prevailed along the *African* coast of the *Mediterranean*, and even erected a poweful dynasty on the continent of *Europe*, you may not be displeased occasionally to follow the streams of *Asiatick* learning a little beyond its natural boundary ; and, if it be necessary or convenient, that a short name or epithet be given to our society, in order to distinguish it in the world, that of *Asiatick* appears both classical and proper, whether we consider the place or the object of the institution, and preferably to *Oriental*, which is in truth a word merely relative, and though commonly used in *Europe*, conveys no very distinct idea.

"If now it be asked, what are the intended objects of our inquiries within these speacious limits, we answer, *Man* and *Nature* ; whatever is performed by the one, or produced by the other." (Sibdas Chaudhuri ed., *Proceedings of the Asiatic Society*, Vol. I, Calcutta 1980, pp. 2-4.)

৩. Nathaniel Brassey Halhed (২৫ মে ১৭৫১ - ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০ খৃ.) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাকরি নিয়ে ভারতে আসেন। তাঁর লেখা 'বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং' বা *A GRAMMAR OF*

THE BENGAL LANGUAGE ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে লেখা ভদ্র শৈলীর বাংলা ভাষার প্রথম সম্পূর্ণ ব্যাকরণ, হুগলিতে ১৭৭৮ খৃস্টাব্দে ছাপা হয়। ইংরেজিতে লেখা এই বইয়ে বাংলা দৃষ্টান্তগুলি খোদাই করা বাংলা হরফে ছাপা। ছাপা বাংলার এটাই প্রথম দৃষ্টান্ত। ভূমিকায় হ্যালহেড বলেন, চার্লস উইলকিন্স (Charles Wilkins ১৭৪৯/৫০-১৮৩৬ খৃ.) একক প্রচেষ্টায় বাংলা হরফ তৈরি করে দেওয়ায় বইটি ছাপা সম্ভব হয়, "The advice and even solicitation of the Governor General prevailed upon Mr. Wilkins, a gentleman who has been some years in the India Company's civil service in Bengal, to undertake a set of Bengal types. He did, and his success has exceeded every expectation. In a country so remote from all connexion with European artists, he has been obliged to charge himself with all the various occupations of the Metallurgist, the Engraver, the Founder and the Printer. To the merit of invention he was compelled to add the application of personal labour. With a rapidity unknown in Europe, he surmounted all the obstacles which necessarily clog the first rudiments of a difficult art, as well as the disadvantages of solitary experiment ; and has thus singly on the first effort exhibited his work in a state of perfection which in every part of the world has appeared to require the united improvements of different projectors, and the gradual polish of successive ages." (M. B. Halhed, *A Grammar of the Bengal Language*, unabridged facsimile edition, Ananda Publishers, Calcutta, pp. xxiii-xxiv.)

৪. ভারতবর্ষময় পুথি সন্ধান ও পুথি সংরক্ষণের বিবরণের জন্য দ্র. Sastri, *Sanskrit Culture in Modern India*, Presidential Address, Fifth Indian Oriental Conference, Lahore 1928.

৫ Gustav Salomon Oppert (১৮৩৬-১৯০৮ খৃ.). *On the ancient commerce of India*, Madras 1879 ; *Contribution to the history of Southern India*, Part I, Madras and London 1882 ; *Text and Translation of Sukraniti-Sara*, 1882 ; *List of Sanskrit manuscripts in private libraries of Southern India*, Madras 1880-85 ; *On the classification of languages*, 1879 ; *On the original inhabitants of Bharatbarsa*, 1893. —ইত্যাদি এ'র কাজ।

৬. Eugen Julius Theodor Hultzch (১৮৫৭-১৯২৭ খৃ.) ১৮৮৭-১৯০৩ পর্যন্ত ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের মাদ্রাজ শাখায় লিপিতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ রূপে কাজ করেন। ভারতীয় লিপি বিষয়ে প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা ছাড়া বোধায়ন ধর্মশাস্ত্র সম্পাদনা (১৮৮৪ খৃ.), জর্মান ভাষায় শিশুপালবধ (১৯২৬ খৃ.) অনুবাদ এ'র উল্লেখযোগ্য কাজ।

৭. মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃত ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক শেষগিরি শাস্ত্রী সম্পাদিত *A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts of the Government Oriental Manuscripts Library, Madras,* Vol-I, (Vedic) First Part 1901.

৮. *A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts of the Government Oriental Manuscripts Library, Madras,* Vol-I, (Vedic) Second Part, *1904*-এর সম্পাদক শেষগিরি শাস্ত্রী এবং রঙ্গাচার্য রাওবাহাদুর। রঙ্গাচার্যও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃত ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন।

৯. রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের (১৮৩৭-১৯২৫ খৃ.) মৃত্যুতে ২ নভেম্বর ১৯২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত এশিয়াটিক সোসাইটির মাসিক সাধারণ সভায় শাস্ত্রীমশায় এই শোক-নিবন্ধটি পড়েন—

"The death of Sri R. G. Bhandarkar removes an ardent and earnest worker in the field of Oriental research and Sanskrit scholarship. He was the

connecting link between the great savants of the past generation, like Max Müller, Hofrath Buhler, Bhawanilal Indraji, Raja Rajendra Lal Mitra, and the scholars of the present generation. He held his own in the generation in which he lived and he inspired awe and veneration. The Bombay people are grateful to him for his school and college books which did a great deal to make that difficult language, Sanskrit, easy of access. But his fame rests on more solid work of scholarship. Six volumes of his catalogues of Sanskrit MSS. will ever remain a monument of hard scholarly work. They brought to light not only hundreds of valuable MSS. but also several branches of Sanskrit literature hitherto but imperfectly known. He was always accurate in his research and authoritative in his opinions. His Wilson Lectures rendered a service to Indian philology, the value of which can scarcely be overrated. Every one of his numerous papers in the Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society contained a pronouncement on some disputed point of Indian History, Indian Literature or Indian thought. His history of the Deccan is the earliest work on modern lines on Indian History and its value as a piece of research will never be diminished." (*PASB* 1925, pp. clxv-xvi.) ১৯০৪ খৃস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির অনারারি মেম্বার পদে ভাণ্ডারকরের মনোনয়ন উপলক্ষে শাস্ত্রীমশায় এই লিখিত মন্তব্য করেন—

"Dr. Ramkrishna Gopal Bhandarkar, M. A., first distinguished himself by literary and archaeological controversies with distinguished European scholars, and researches in the Geography of Panini and of Alexander's invasion. He was one of the principal contributors to the Indian Antiquary from

its foundation in 1873. His history of Deccan is a master-piece of accurate scholarship, and his fame depends chiefly on the volumes, six in number, which he has written in connection with the search of Sanskrit manuscripts in India, which are regarded as models of descriptive catalogues.

"He joined the Education Service shortly after he left college and retired eleven years ago. Shortly after he was made the Vice-Chancellor of the Bombay University, and is at the present moment a member of the Imperial Legislative Council of India, and an honorary member of numerous Oriental Societies." (*PASB* Feb., 1904.)

১০. এই বইয়ের পৃ. ২২৫-২৭ সূত্র ১-৩ দ্র

১১. *VERNACULAR LITERATURE OF BENGAL BEFORE THE INTRODUCTION OF ENGLISH EDUCATION* প্রবন্ধটি পরিশিষ্টে ছাপা হল।

১২. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল', বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ ১৩২২ ব.

১৩. দ্র. শাস্ত্রী, "রমাই পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গল" সা-প-প, প্রথম সংখ্যা ১৩০৪ ব.।

১৪. এই বইয়ের পৃ. ২৯৬ সূত্র ২৩ দ্র.

১৫. এই বইয়ের পৃ. ৩০২ সূত্র ৩৫ দ্র.

১৬. এই বইয়ের পৃ. ৩০২ সূত্র ৩৬ দ্র.

১৭. এই বইয়ের পৃ. ৩০১ সূত্র ৩৪ দ্র.

১৮. আনুমানিক খৃ. সপ্তম শতাব্দীতে দণ্ডী 'কাব্যাদর্শ' নামে অলংকারশাস্ত্রের বই লেখেন। কাব্যাদর্শে (১, ৩৪) 'রাবণবধ' বা 'সেতুবন্ধ' কাব্যের উল্লেখ আছে।

'সেতুবন্ধ' মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে লেখা ১৫ সর্গে সম্পূর্ণ মহাকাব্য। বিষয় সীতা উদ্ধারের জন্য রামচন্দ্রের অভিযান ও রাবণবধ। লেখক সম্ভবত কাশ্মীরের দ্বিতীয় প্রবরসেন অথবা তাঁর কোনো সভাকবি। সুশীলকুমার দে অনুমান করেন, এই প্রবরসেনের রাজত্বকাল খৃ. পঞ্চম শতাব্দী। *HIL*, Vol. III, pt. I, pp. 15, 78; *HSL*, p. 119. দণ্ডী সম্পর্কে আলোচনার জন্য দ্র. *Shastri-Cat.*, Vol. VI, pp. clxxxvii-cciii.

১৯. একাধিক লেখক-সংকলকের বই বররুচির নামে প্রচলিত। ভারতীয় জ্ঞানচর্চার ঐতিহ্যে বররুচি নামটির প্রতিষ্ঠা সম্ভবত পাণিনি-সূত্রের বার্তিক-পাঠের জন্য। বার্তিকের লেখক বররুচি-কাত্যায়ন। এঁ'র সম্পর্কে শাস্ত্রীমশায় লিখেছেন, "Kātyāyana is said to have been an inhabitant of Kauśāmbī about 30 miles to the west of Allahabad, on the southern bank of the Yamunā, now called Kosam. He belonged to a powerful family, distinguished for writing authoritative works on the Vedas....

"The relation between Pāṇini and Kātyāyana is often misunderstood. Some people think that Kātyāyana was a captious and a hostile critic and others think that he was more learned than Pāṇini. But my idea is that, Pāṇini belonged to Western India and Kātyāyana to Eastern India. Pāṇini belonged to the 5th or 6th century B. C. and Kātyāyana was much later. So Pāṇini's sūtras were open to criticism by an Eastern scholar younger by two or three or more generations... Kātyāyana did not write an independent work as he found it more convenient to append vārttikas, *i.e.*, his criticisms, to certain rules of Pāṇini. Kātyāyana was very respectful to Pāṇini, sometime calling him even 'Bhagavān'." (*Shastri-Cat.*, Vol. VI, pp. xix-xx.) প্রাচীনতম প্রাকৃত-ব্যাকরণ 'প্রাকৃত-প্রকাশ'ও বররুচির নামে প্রচলিত। প্রাকৃতপ্রকাশে ৯টি অধ্যায়ে মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে এবং একটি অধ্যায়ে পৈশাচী, মাগধী ও শৌরসেনীর বৈশিষ্ট্য

আলোচিত। বররুচিকে কাতন্ত্র বা কলাপ ব্যাকরণের কৃৎ-প্রকরণ অংশের লেখক মনে করা হয়। কাশ্মীরি 'বৃহৎকথা' এবং সোমদেবের 'কথাসরিৎ-সাগর'-এ বররুচিকে পাণিনির প্রতিদ্বন্দ্বী ও রাজা নন্দের একজন মন্ত্রী বলা হয়েছে। আর-একটি ঐতিহ্যে তাঁকে রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার অন্যতম রত্ন বলা হয়। তিব্বতি ঐতিহাসিক তারনাথ তাঁকে এক রাজা উদয়নের সভা-পুরোহিত বলে উল্লেখ করেছেন, এঁর কাছে উদয়ন ব্যাকরণ পড়েন। *HIL*, Vol. III, pt. II, pp. 427-28, 431-32 ; *Tāranath*, p. 111 ; Shastri, *Magadhan Literature*, Patna 1923, pp. 37-40.

২০. বুঁদির রাজা মহারাব রামসিংহের (১৮১১-৮৯ খৃ.) আনুকূল্যে চারণ কবি সূরজমল মিশ্রণ (১৮১৫-৬৮ খৃ.) 'বংশ-ভাস্কর' কাব্য রচনা করেন। এই বইয়ের পৃ. ২৩৫ সূত্র ৮ দ্র.।

২১. "একথা ঠিক নয়। 'সন্ধ্যা' (বা 'সন্ধা') ভাষার কোন সম্পর্ক নাই দিবারাত্রির মোহানার সঙ্গে। শব্দটিতে 'ধ্যৈ' (বা 'ধা') ধাতুর অর্থ প্রকট আছে। যে ভাষায় বা যে শব্দে অভীষ্ট অর্থ অনুধ্যান করিয়া অর্থাৎ মর্মজ্ঞ হইয়া বুঝিতে হয় (সম্ + ধ্যৈ), অথবা যে ভাষায় বা শব্দে অর্থ বিশেষভাবে নিহিত (সম্ + ধা) তাহাই 'সন্ধ্যা' (অথবা 'সন্ধা') ভাষা। একটি চর্যার (১২) ব্যাখ্যার প্রারম্ভে মুনিদত্তের উক্তিতে এই কথারই সমর্থন আছে।— 'পুনরপি তমেবার্থং দ্যূতক্রীড়া-ধ্যানেন প্রকথয়ন্তি কৃষ্ণাচার্যপাদাঃ।'

"সন্ধ্যাভাষা যে বৌদ্ধ যোগীদের রচনারই বৈশিষ্ট্য ছিল এ দাবি তাঁহারা করেন নাই। অদ্বয়বজ্র এমনও বলিয়াছেন যে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা বৈদিক মন্ত্রের সন্ধ্যা-ভাষার্থ না জানিয়া পশু আলম্ভন করায় তাহাদের পাপ সঞ্চিত হয়। 'তয়া শ্বেতচ্ছাগানিপাতনয়া নরকাদিদুঃখমনুভবন্তি। সন্ধাভাষমজানানত্বাৎ চ।" (চ-গী-প. পৃ. ৩১-৩২।) প্রবোধচন্দ্র বাগচী দেখিয়েছেন 'সন্ধাভাষা'ই ঠিক প্রয়োগ, 'সন্ধ্যাভাষা' নয়। দ্র. "The Sandhābhāṣā and Sandhāvacana", *Studies In The Tantras*, pt. I, University of Calcutta 1975.

২২. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'হাজার বছরের / পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় / বৌদ্ধগান ও দোহা' (১৩২৩ ব.) বইয়ে 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' 'সরোজবজ্রের দোহাকোষ', 'কাহ্নপাদের দোহাকোষ' এবং 'ডাকার্ণব' ছাপা হয়। দোহা-

কোষ দুটি অপভ্রংশ (প্রাকৃত) ও বাংলার মধ্যবর্তী ভাষার সাহিত্যিক ছাঁদ অবহট্‌ঠে লেখা। ডাকার্ণব বৌদ্ধতন্ত্রের বই, পুরো নাম 'ডাকার্ণব মহাযোগিনী-তন্ত্র-রাজ্য'। এতে সংস্কৃত শ্লোকের মাঝে মাঝে অপভ্রংশে লেখা সূত্র ও পদ আছে। পুথি-লেখকের অজ্ঞতায় ভাষা ত্রুটিময়, পুথিও খুব পুরানো নয়। ভাষার ভিত্তি শৌরসেনী অপভ্রংশ। বাংলার সঙ্গে ডাকার্ণবের ভাষার সম্পর্ক সুদূর। দ্র. *ODBL*, Vol. I, London 1970, pp. 110-11.

"সহজ বুদ্ধিতে বুঝিয়া হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাগীতির ভাষা বাঙ্গালা বলিয়াছিলেন। বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে বিচার করিয়া শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালা বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং ভাষা-বিজ্ঞানীসব সে সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়াছেন। চর্যাগীতির ভাষায় কিছু কিছু শব্দ ও পদ আছে যাহা পরবর্তী কালের ভাষায় চলিয়া আসে নাই। এগুলিতে সুনীতিবাবু শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রভাব দেখিয়াছেন এবং দুইটি ক্রিয়াপদ ('ভণথি', 'বোলথি') মৈথিলী হইতে আগত বলিয়াছেন। এইখানেই গোলমালের সূত্রপাত। সুনীতিবাবুর ইঙ্গিত বুঝিতে না পারিয়া এবং নিজ নিজ প্রাদেশিক ভাষার গৌরব বাড়াইতে গিয়া বাঙ্গালার প্রতিবেশীরা এখন চর্যাগীতি লইয়া রীতিমত মামলা বাধাইয়াছেন।··· এই দাবিদারেরা জানেন না, কিংবা জানিয়াও জানেন না যে নবীন ভারতীয় আর্যভাষার প্রথম স্তরে সর্বত্র মোটামুটি একটা মিল ছিল, এবং এক আধটি শব্দ বা পদ লইয়া বিচার করিলে প্রথম স্তরের যে কোন ভাষাকে অপর ভাষা বলিয়া দেখানো খুব সহজ।···

"সুনীতিবাবু যে সব শব্দ ও পদ শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রভাবজাত বলিয়াছেন সেগুলি সূক্ষ্ম বিচারে অবহট্‌ঠের। (পাদটীকা : যেমন 'কিউ', 'চালিউ', 'কিমো', 'কিম্পি', 'তিম', 'জিম', 'দো', 'জো', 'সো', 'জইস', 'তইস', 'ভইঅ', 'মা'—নিষেধে, 'তঁহি', 'করিঅই' ইত্যাদি।···) যখন চর্যাগীতি রচিত হইতেছিল তখন অবহট্‌ঠ সমগ্র আর্যভাষী ভারত-বর্ষের অন্যতম সাধুভাষা, সংস্কৃতের পরেই তাহার মর্যাদা। চর্যাগীতি-কবিদের মধ্যে অন্তত দুইজন সরহ ও কাহ্ন, এই সাধুভাষাতেই দোহা রচনা করিয়াছিলেন। চর্যাগীতির সঙ্গে মিলাইয়া পড়িলে দেখা যাইবে অবহট্‌ঠের সঙ্গে চর্যাগীতির ভাষার সম্বন্ধ কত নিকট। ছন্দ তো প্রায় একই। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষার সেই শিশুকালে অবহট্‌ঠের শব্দ ও পদ না থাকাই বিস্ময়ের বিষয় হইত এবং চর্যাগীতির অকৃত্রিমত্বে সন্দেহ জাগাইত।" (চ-গী-প, পৃ. ৪৭-৪৯)

২৩. এই বইয়ের পৃ. ৩০৩ সূত্র ৩৭ দ্র.

২৪. অনুবাদ : ভোগ করবার সময়েও প্রচণ্ড সমুজ্জ্বল, ঘুমিয়ে পড়লেও তাই, কুটীর মধ্যে থাকলেও তাই। তাই তিনি (সর্বদা)— ভু (জ্ঞান) অবস্থায়, সু (প্ত) অবস্থায় এবং কু (টীর মধ্যগত) অবস্থায় সমাধিস্থ থাকতেন বলে ভুসুকু নামে খ্যাত হয়েছিলেন সঙ্ঘের মধ্যেও।

২৫. অনুবাদ : ধর্মপদে সংকলিত [সম্ভাব্য শুদ্ধপাঠ 'যদর্থবদ্ধর্ম্ম'] অর্থবান্, ত্রিধাতুর সমস্ত ক্লেশ দূরকারী বাক্য (যেমন), সেইরূপ ঋষিপথ অনুসারী, অন্য পথের বিপরীত (এই গ্রন্থ) সংসারে শান্তির উপদেশ প্রদর্শক হবে।

২৬. অনুবাদ : যখন ভাব (অর্থাৎ অস্তি) এবং অ-ভাব (অর্থাৎ নাস্তি) চিত্তের গোচরে থাকে না, তখন গত্যন্তর না থাকায় অবলম্বনহীন (চিত্ত) প্রশান্ত হয়।

২৭. শাস্ত্রীমশায় শান্তিদেব সম্পর্কে এখানে যে কাহিনী লিখেছেন, প্রায় অনুরূপ কাহিনীই আছে তারনাথে। তারনাথ বলেন, শান্তিদেব সৌরাষ্ট্রের রাজার ছেলে। রাজ্যাভিষেকের আগের রাত্রেই ঘর ছেড়ে যান। একুশ দিন পায়ে হেঁটে পৌঁছন এক অরণ্যে। সেখানে যোগী মঞ্জুশ্রীর কাছে সম্যক-উপদেশ পান, সমাধি লাভ করেন এবং ধ্যানে অসীম জ্ঞান অর্জন করেন। তারপরে যান পুব দিকে। এবারে যে রাজার আশ্রয়ে সম্মান পেলেন তারনাথ অনুসারে তাঁর নাম পঞ্চমসিংহ। এখান থেকে যান মধ্যদেশে, উপাধ্যায় জয়দেবের শিষ্য হন। জয়দেবই তাঁর নাম দেন শান্তিদেব। (*Tāranāth*, pp. 215-20)

তিব্বতি সূত্র অনুসারে শান্তিদেবের সময় খৃ. অষ্টম শতাব্দী। বাবার নাম রাজা কল্যাণবর্মন।

ভুসুকুর লেখা চর্যাগীতির সংখ্যা ৮। দুটিতে পদবি বা নামান্তর রাউতু। 'বোধিচর্যাবতার' ও 'শিক্ষা-সমুচ্চয়'-এর লেখক শান্তিদেবের প্রসঙ্গে 'ভুসুকু সমাধি' লাভের উল্লেখ আছে। কিন্তু এই উল্লেখের উপরে নির্ভর করে চর্যাগীতির কবি ভুসুকু এবং শান্তিদেবকে একই ব্যক্তি মনে করা যায় না।

শান্তিদেবের 'শিক্ষাসমুচ্চয়' মহাযান-তত্ত্বের সংক্ষিপ্তসার, তাঁর ব্যাপক অধ্যয়নের প্রমাণ, কিন্তু মৌলিকত্ব বর্জিত। তাঁর শ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বময়

কাজ 'বোধিচর্যাবতার' সম্পূর্ণ শ্লোকে রচিত, দশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। বোধিচিত্ত-ভাবনার মহিমা বর্ণনায় শুরু, তারপরে অধ্যায়ে অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে প্রজ্ঞাপারমিতা অর্জনে বোধিসত্ত্বের সাধনার বিভিন্ন স্তর। নাগার্জুনের সময়ে মহাযান মতবাদ বিরুদ্ধবাদী দর্শনের সঙ্গে বিচার-বিতর্কে সীমিত ছিল। মহাসাঙ্ঘিকরা এই গণ্ডি পেরিয়ে মহাযানকে ব্যাপক জনজীবনে প্রতিষ্ঠিত করেন, একটা ধর্ম-আন্দোলন জাগিয়ে তোলেন। এই আন্দোলনে 'বোধিচর্যাবতার' অন্যতম প্রধান শাস্ত্রগ্রন্থের মর্যাদা পায়। এর বহু টীকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রজ্ঞাকরমতির লেখা 'বোধিচর্যাবতার-পঞ্জিকা'।

তেঙ্গুরের তালিকায় শান্তিদেবের 'কেবলী', 'শিক্ষাসমুচ্চয়কারিকা', 'সরস্বতীপূজাবিধি' প্রভৃতি বইয়ের নাম পাওয়া যায়। দ্র. Shastri, "Santideva", *IA*, 1913, pp. 49-52 ; Shastri, Bodhi-charyāvatāram, *JBTS*, 1894, pt. I ; Vidhusekhar Bhattacharya ed., *Bodhicharyāvatāra* of Sāntideva, Asiatic Society, Calcutta 1960 ; সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতার', বিশ্বভারতী ১৩৫৪ ব.।

২৮. এই বইয়ের পৃ. ২৯৭ সূত্র ২৯ দ্র.

২৯. এই বইয়ের পৃ. ২৯৮ সূত্র ৩১ দ্র.

৩০. এই বইয়ের পৃ. ২৯৯ সূত্র ৩২ দ্র.

৩১. দীপঙ্করশ্রীর গুরু সুবর্ণদ্বীপের (আধুনিক সুমাত্রা) আচার্য চক্রবর্তী ধর্মপাল বা ধর্মকীর্তির ছাত্রদের অন্যতম রত্নকীর্তি। তেঙ্গুরের তালিকায় রত্নকীর্তির লেখা 'যোগচতুর্বেদস্তোত্র', 'প্রজ্ঞাপারমিতামণ্ডলবিধি', 'বজ্রবিধারণীসাধন', 'অভিসময়অলংকারবৃত্তিকীর্তিকাল' প্রভৃতি বইয়ের উল্লেখ আছে।

৩২. এই বইয়ের পৃ. ৩০১ সূত্র ৩৩ দ্র.

৩৩. 'নিসিঅ অন্ধারী মুসার চারা' ভুসুকপাদ রচিত চর্যাগীতির ২১-সংখ্যক পদের টীকায় মুনিদত্ত মীননাথের নামে এই বাংলা পদটি উদ্ধৃত করেছেন। অষ্টম শতাব্দী বা তারও আগে থেকে বাংলাদেশে তান্ত্রিক ভাবের দুটি ধর্মমত পাশাপাশি চলে এসেছে। একটি বৌদ্ধ সহজ মত,

অন্যটি শৈব নাথ মত। নাথপন্থী সন্ন্যাসীরা নিজেদের যোগী বা কাপালিক বলিতেন। দুই ঐতিহ্যেই মৎস্যেন্দ্রনাথের নাম পাওয়া যায়। এ'র নামান্তর মীননাথ, তিব্বতে ইনি লুই নামে পরিচিত। নাথ সিদ্ধ-পুরুষদের নিয়ে রচিত কাহিনীগুলির এক ভাগের বিষয় নারী মোহগ্রস্ত গুরু মীননাথকে শিষ্য গোরক্ষনাথ উদ্ধার করলেন— এই কাহিনী। বিশিষ্ট নাম 'মীনচেতন'। অন্য ভাগের বিষয় জালন্ধরিপাদের শিষ্য রানী ময়নামতীর ছেলে গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়ার করুণ কাহিনী। মীনচেতনের বিষয় নিয়ে লেখা সবচেয়ে পুরানো রচনা বিদ্যাপতির 'গোরক্ষাবিজয় নাটক' নেপালে পাওয়া গেছে। তেঙ্গুরের তালিকায় গোরক্ষের 'বায়ুতত্ত্ব-ভাবনা-উপদেশ' নামে একটি বইয়ের উল্লেখ আছে। আজও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে গোরক্ষনাথের ব্যাপক প্রভাব দেখা যায়। ১৯০১ খৃস্টাব্দের আদমশুমারে ভারতের নাথযোগীদের সংখ্যা দেখানো হয়েছিল ৪৫,৪৬৩ জন। দ্র. এই বইয়ের পৃ. ৩০৩ সূত্র ৩৮ এবং *Tāranāth*, p. 227।

২. পাঠ-প্রসঙ্গ

এই প্রবন্ধের ১৮ অনুচ্ছেদ থেকে অনেকটা অংশ 'বৌদ্ধগান ও দোহা'র (১৩২৩ ব.) মুখবন্ধ রূপে ছাপা হয়েছিল। তখন পাঠে কিছু পরিবর্তন করা হয়। 'বৌদ্ধগান ও দোহা'র প্রথম সংস্করণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলি নিচে দেখানো হল।

মুখবন্ধে ব্যবহৃত অংশে উদ্ধৃত চর্যা ও দোহার পাঠে যা পরিবর্তন করা হয়েছিল সেগুলি এখানে দেখানো হয়েছে। অন্য উদ্ধৃতির পাঠ সংশোধন করা হয় নি। চর্যার পাঠ নির্ণয়ের ইতিহাস বিষয়ে যাঁরা উৎসুক, এই আদি-পাঠগুলি তাঁদের কাজে লাগতে পারে।

উদ্ধৃতির শুরুতে ব্যবহৃত সংখ্যা দুটির প্রথমটিতে এই বইয়ের পৃষ্ঠা-সংখ্যা এবং দ্বিতীয়টিতে ছত্র-সংখ্যা বোঝানো হয়েছে।

৩১৭/১৯ : "ধর্মমঙ্গলের ধর্মঠাকুর বৌদ্ধধর্মের পরিণাম।" বৌদ্ধগান ও দোহার মুখবন্ধের পাঠ : "ধর্মমঙ্গলের ধর্মঠাকুর বৌদ্ধধর্মের শেষ।"

৩২১/১২ : বৌদ্ধগান ও দোহার মুখবন্ধে এই দোহার সংশোধিত পাঠ—

গুরু উবএসো অমিঅরসু হবহিং ন পিঅউ জেহি।
বহুসত্থমরুত্থলিহি' তিসিএ মরিথউ তেহি। (পত্রাঙ্ক ১০২)

৩২২/২৫ : "ইংরাজি ৭ হইতে ১৪ শতের মধ্যে··· ।" বৌদ্ধগান ও দোহার পাঠ : "ইংরাজি ৭ হইতে ১৩ শতের মধ্যে··· ।"

৩২৩/২৬ : "মাথায় জটা ধারণ করে, প্রদীপ জ্বালিয়া ঘরে বসিয়া থাকে, ঈশান কোণে··· ।" বৌদ্ধগান ও দোহার পাঠ : "মাথায় জটা ধরে, প্রদীপ জ্বালিয়া ঘরে বসিয়া থাকে, ঘরের ঈশান কোণে··· ।"

৩২৫/৯ : বৌদ্ধগান ও দোহার মুখবন্ধে সরোরুহপাদের এই দোহা সংশোধিত পাঠ—

"পর অপ্পাণ ম ভন্তি করু সঅল নিরন্তর বুদ্ধ ।
এহুসো নিম্মল পরম পউ চিত্ত সহাবেঁ সুদ্ধ ॥"

"অদ্ব অচিত্ত তরুঅর ফরাউ তিহুঅণে বিত্থা(র)
করুণা ফুল্লিঅ ফল ধরই ণামে পর উআর । (পত্রাঙ্ক ১১৯)

৩২৫/১৫ : অদ্বয়চিত্ততরুর অবস্থা ত্রিভুবন হরণ করেন, ··· । পাঠান্তর, "অদ্বয়চিত্ততরু ত্রিভুবনে বিস্তৃত হইয়া স্ফূর্তি পায়, ··· ।"

৩২৬/১ : "সুইণা হ অবিদারঅরে" এবং এর পরের উদ্ধৃতি "কাঅ ণাবড়ি খাণ্টি মণ কেডুআল" বৌদ্ধগান ও দোহার মুখবন্ধে বর্জিত ।

৩২৭/২৮ : "সরহপাদের সময় সম্বন্ধে আমরা এইমাত্র জানি যে··· " এই অনুচ্ছেদ এবং পরের অনুচ্ছেদ বৌদ্ধগান ও দোহার মুখবন্ধে বর্জিত ।

৩৩০/২৫ : "অতএব আর্য গ্রন্থ হইতে আর্য পণ্ডিতগণ··· ।" বৌদ্ধগান ও দোহাব মুখবন্ধের পাঠ : "অতএব আর্য গ্রন্থ হইতে পণ্ডিতগণ··· ।"

৩৩১ ৯ : "তদান্যগত্য ভাবেন নরালম্বঃ প্রশাম্যতে ।" বৌদ্ধগান ও দোহার মুখবন্ধের পাঠ : "তদান্যগত্যভাবেন নিরালম্বঃ প্রশাম্যতি ।"

৩৩১/২০ : "··· এ পুস্তকে তান্ত্রিক মতের অনেক কথা আছে ।" পাঠান্তর "এ পুস্তকে তান্ত্রিক মতের কথা আছে । কিন্তু সে অতি অল্প ।"

৩৩১/২৯ : "ইহাতেও বাংলা গান আছে,··· ।" বৌদ্ধগান ও দোহার পাঠ : "ইহাতেও বাংলা ছড়া আছে,··· ।"

৩৩২/৭ : "সো দুর যোগীঞ ন জানহ খোজং গুরু নিন্দা করি ধুরুন্তি যোগ।" বৌদ্ধগান ও দোহার মুখবন্ধের পাঠ : "সো দুর যোগীএ ন জানহ খোজ গুরু নিন্দা করি যোগ।"

৩৩২/৪ : "এই পুস্তকের ভূসুকুও রাউত।··· তাহার বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থ পুরা হইল কই।" বৌদ্ধগান ও দোহায় বর্জিত।

৩৩২/২৩ : "ডাহি জো পঞ্চধাট লই দিবি সংজ্ঞা ণঠা।" বৌদ্ধগান ও দোহার মুখবন্ধের পাঠ : "ডাহিজো পঞ্চধাটণ ইঁদিবিসংজ্ঞা ণঠা।"

৩৩৩/১১ : "তোমার সংজ্ঞাও নষ্ট হইয়াছে।" বৌদ্ধগান ও দোহার পাঠ : "তোমার ইন্দ্রিয়বিষয় ও সংজ্ঞাও নষ্ট হইয়াছে।"

৩৩৩/১৪ : "জাহোর কোথা··· শান্তিদেব বাঙালি।" বৌদ্ধগান ও দোহায় এই অংশ বর্জিত।

৩৩৩/১৮ : "রাজসাপ দেখি জো চমকিই যারে কিং তং (কং) রোড়ো খাই।" বৌদ্ধগান ও দোহার মুখবন্ধের পাঠ : "রাজসাপ দেখি জো চমকিই যারে কিং তং বোড়ো খাই।"

৩৩৩/২৫ : "বালুআঅেলঁ সসবসিংগে আকাশ ফুলিলা।" বৌদ্ধগান ও দোহার মুখবন্ধের পাঠ : "বালুআতেলেঁ সসরসিংগে আকাশ ফুলিলা।"

৩৩৩/২৬ : "রাউতু ভনই কট ভূসুকু ভনই কট সঅলা অইস সহার।" বৌদ্ধগান ও দোহার মুখবন্ধের পাঠ : "রাউতু ভণই কট ভূসুকু ভণই কট সঅলা অইস সহাব।"

৩৩৪/১ : "··· ইহাতে হাত বুলাইও না,···।" বৌদ্ধগান ও দোহার মুখবন্ধের পাঠ : "···ইহাতে হাত লোনা করিও না,···।"

৩৩৫/১০ : "এই প্রস্তাবে স্থির হইল যে,··· তাঁহার গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।" এই অনুচ্ছেদ বৌদ্ধগান ও দোহায় বর্জিত।

৩৩৪/২৩ : "লোঅহ গব্ব সমুব্বহই পরমথ পবিস।" বৌদ্ধগান ও দোহার মুখবন্ধের পাঠ : "লোঅহ গব্ব সমুব্বহই হউ পরমথে পবিন।"

৩৩৪/২৭ : "যোহি চিঅ··· দেহ হি দিধউ ॥" এই তৃতীয় দোহাটি বৌদ্ধ-গান ও দোহায় বর্জিত।

৩৩৪/২৯ : "ওঁ বুঝিঅ বিরল··· অশেষ পরিমান ॥" বৌদ্ধগান ও দোহার মুখবন্ধে সংশোধিত পাঠ—

"৩০শ— বুঝি অবিরল সহজ সুণ কাহি বেঅপুরাণ
তোনো তোলিঅ বিষয় বিঅপ্প জগু রে অশেষ পরিমাণ ॥"

৩৩৫/১ : "জে কিঅ নিচ্চল··· পরমরো ॥" বৌদ্ধগান ও দোহার মুখবন্ধে সংশোধিত পাঠ—

"৩১শ— জে কিঅ নিচ্চল মণ রঅণ পিঅ ঘরণী লই এথো।
সো বাজিরণাহুরে মরি বুত্ত পরমথো ॥ [পত্রাঙ্ক ১৩২]"

৩৩৫/৪ : "জো মন··· জাল।"। বৌদ্ধগান ও দোহার মুখবন্ধে সংশোধিত পাঠ : "জো মণ গোএর আলাজালা"।

৩৩৫/৬ : "ভণ কই সেঁ" বৌদ্ধগান ও দোহার মুখবন্ধে সংশোধিত পাঠ : "ভণ কইসে"···"

৩৩৫/২২ : "অলি এং কালি এং বাট বুন্ধেলা" এই পদটি বৌদ্ধগান ও দোহার মুখবন্ধে বর্জিত।

৩৩৬/১১ : "এই কৃষ্ণাচার্য এককালে বাংলার···।" বৌদ্ধগান ও দোহার পাঠ : "এই কৃষ্ণাচার্য এককালে এ অঞ্চলের···।"

৩৩৬/১৮ : "তাঁহাদের সকলেরই দাড়ি আছে ও মাথায় জটা আছে এবং প্রায় উলঙ্গ থাকে।" বৌদ্ধগান ও দোহার পাঠ : "তাঁহাদের সকলেরই মাথায় জটা আছে এবং তাঁহারা প্রায় উলঙ্গ থাকে।"

৩৩৬/২৪ : "লুই ভণই গুরু পুছিঅ জাণ ॥" বৌদ্ধগান ও দোহার মুখবন্ধের পাঠ : "লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ. জাণ ॥"

৩৩৬/২৫ : "সঅল সমাহিঅ কাহি করিআই।" বৌদ্ধগান ও দোহার মুখবন্ধের পাঠ : "সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই।"

৩৩৬/৩০ : "ধমণ চমণ বেণি পাণ্ডি বইণ ॥" বৌদ্ধগান ও দোহার মুখবন্ধের পাঠ : "ধমণ চমণ বেণি পাণ্ডি বইঠা ॥ (পত্রাঙ্ক ১)"

৩৩৭/১২ : "লুইয়ের সময় ঠিক করিতে হইলে··· তিব্বত যাত্রা করিয়াছিলেন।" বৌদ্ধগান ও দোহার পাঠ : "লুইয়ের সময় ঠিক করিতে হইলে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট যে, তাঁহার একখানি গ্রন্থে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সাহায্য করিয়াছেন। সে গ্রন্থখানির নাম অভিসময়বিভঙ্গ। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ১০৩৮ সালে বিক্রমশীল বিহার হইতে ৫৮ বৎসর বয়সে তিব্বত যাত্রা করিয়াছিলেন।"

৩৩৭/১৬ : "তাঁহার আর-একখানি গ্রন্থের টীকা··· কিছু পূর্বে হইতে পারেন।" বৌদ্ধগান ও দোহায় বর্জিত।

৩৩৭/২৩ : "সুন করুণরি অভিন বারেঁ কাঅবাক্‌চিঅ।" পদটির বৌদ্ধগান ও দোহার মুখবন্ধে সংশোধিত পাঠ—

"সুন করুণরি অভিন বারেঁ কাঅবাক্‌চিঅ।
বিলসই দারিক গঅণত পারিম কুলে ॥
অলক্ষলখচিত্তা মহাসুহে।
বিলসই দারিক গঅণত পারিম কুলেঁ ॥
কিন্তো মন্তে কিন্তো তন্তে কিন্তো রে ঝাণবখানে।
অপইঠান মহাসুহলীণে দুলখ পরমনিবাণেঁ ॥
দুঃখেঁ সুখেঁ একু করিআ ভুঞ্জই ইন্দীজানী।
স্বপরাপর ন চেবই দারিক সঅলানুত্তরমাণী ॥
রাআ রাআ রাআরে অবর রাঅ মোহেরা বাধা।
লুই পাঅপএ দারিক দ্বাদশ ভুঅণেঁ লধা ॥ (পত্রাঙ্ক ৫২)"

৩৩৮/১৫ : "কমল মধু পিবিবি ধোকে ন ভমরা ॥" বৌদ্ধগান ও দোহার মুখবন্ধের পাঠ : "কমল মধু পিবিবি ধোকে ন ভমরা ॥ (পত্রাঙ্ক ৩৮)।"

৩৩৮/১৮ : "তবে এই দাঁড়াইল যে খৃস্টীয় ৮ শতাব্দীতে··· বৌদ্ধগান দোহার পাঠ : "তবে এই দাঁড়াইল যে, খৃস্টীয় ৯ শতাব্দীতে···।"

৩৩৮/১৯ : "··· এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই অথচ তাহার একটু পরেই নাথেরা নাথপন্থ নামে···।" বৌদ্ধগান ও দোহার পাঠ : "··· এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই অথচ তাহার একটু আগেই নাথেরা নাথপন্থ নামক···।"

৩৩৯/৮ : "সহজযান, নাথপন্থ, বজ্রযান… " এই অনুচ্ছেদ থেকে প্রবন্ধের অবশিষ্ট অংশ বৌদ্ধগান ও দোহার মুখবন্ধে বর্জিত। পরিবর্তে ২১তম বছরের সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির 'সম্বোধন'-এর (দ্র. এই বইয়ে পৃ. ৩৮০) ৪৯ অনুচ্ছেদের সপ্তম বাক্যথেকে অবশিষ্ট অংশ মুখবন্ধের শেষ পাঁচটি অনুচ্ছেদে ছাপা হয়েছিল।

৩. অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের সাহিত্য-শাখায় সভাপতির সম্বোধন

আজ আমরা মহা-সম্মিলনের সাহিত্য-শাখায় মিলিত হইয়াছি। যাঁহারা ইতিহাস, বিজ্ঞান বা দর্শন ভালোবাসেন, আজ তাঁহারা আমাদের এখানে আসেন নাই। যাঁহারা কেবলমাত্র বাংলা-সাহিত্যসেবী তাঁহারাই এখানে উপস্থিত আছেন। এখানে আমরা মন খুলিয়া কথা কহিতে পারি। এখানে সকলেই এক ব্যবসায়ী, সকলেরই সুখ ও দুঃখ এক। ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যে আর-কী আছে? আছে পদ্য, কাব্য, নাটক, নবেল, রচনা, জীবনচরিত, কাব্যের দোষগুণ-পরীক্ষা ইত্যাদি। এ-সকল বিষয়ে আমরা এত দিন কী করিয়া আসিয়াছি, তাহার একটা বিবরণ চাই। সেই সংক্ষেপ বিবরণ পাইলে, তাহার কোথায় কী ভালো আছে ও কোথায় কী মন্দ আছে, তাহা দেখিতে পাইব, দেখিতে পাইলে মন্দটি ছাড়িয়া ভালোটি লইতে পারিব এবং ভালোকে আরো ভালো করিতে পারিব।

আমাদের পদ্যের ও কাব্যের ইতিহাস অতি প্রাচীন, দীনেশবাবু যত-দূর দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা আরো পাঁচ শত বৎসরের প্রাচীন। দীনেশবাবুর মতে শূন্যপুরাণ সকলের চেয়ে পুরানো। কিন্তু সেও মুসলমান-আক্রমণের পরে লেখা। কারণ, উহাতে 'নিরঞ্জনের উষ্মা' নামে যে ছড়া আছে, তাহাতে মুসলমান-আক্রমণের বর্ণনা আছে। কিন্তু আমাদের দেশের নাথ-পন্থের যোগীরা খৃস্টের অষ্টম শতকের বাংলায় ছড়া লিখিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যেরাও সেই কালেরই লোক। তাঁহারা অনেক দোহা লিখিয়া গিয়াছেন, গীতিকা লিখিয়া গিয়াছেন, ছড়াও লিখিয়া গিয়াছেন। দোষগুণ বিচার করিতে গেলে বলিতে হয়, এ-সকল ছড়া বা গীতিকা খুব উচ্চ অঙ্গের না হইলেও রস ও ভাবে পরিপূর্ণ। সে রস ও সে ভাব এখনকার রুচিসিদ্ধ নয়, কিন্তু তথাপি বাংলার প্রাচীন কাব্য বলিয়া তাহার আদর আছে। উহাতে আমরা আমাদের ভাষা হাজার বৎসর পূর্বে কী অবস্থায় ছিল, তাহা বেশ দেখিতে পাই। প্রাচীন কাব্যের একটা দোষ এই যে, যত লোকে ঐ ছড়া কাপি করে তাহারা অবুঝ অংশ সোজা করিয়া লয়। যে-সকল পুরানো কথার

অর্থ বুঝে না, নূতন কথা দিয়া সেগুলিকে বদলাইয়া ফেলে। ক্রিয়াপদ-গুলিকে তো একেবারে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেয়। এইরূপে গোবিন্দ-চন্দ্রের গীত ও মানিকচন্দ্রের গীত এত বদলাইয়া ফেলিয়াছে যে, তাহাকে আর প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। সিদ্ধাচার্যদের গীতগুলি কিন্তু সেই কালের লেখায় সেই কালের টীকার সহিত পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে পরিবর্তন হয় নাই, সুতরাং হাজার বৎসর পূর্বে বাংলাভাষার যে অবস্থা ছিল, তাহার একটা ঠিক ফোটোগ্রাফ পাওয়া গিয়েছে। উহাতে পারসি কথার লেশমাত্র নাই। বড়ো বড়ো সংস্কৃত কথা একেবারেই নাই। সে-কালের ভদ্রলোকে যে ভাষায় কথাবার্তা কহিত, ঠিক সেই ভাষায় লেখা। সুতরাং উহার দ্বারা বাংলাভাষায় যথেষ্ট উপকার হইতে পারে। সেকালে বাংলাভাষার কিরূপ গতি ছিল, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। গোবিন্দচন্দ্রের গীত অনেক বদল হইয়া গেলেও উহাও মুসলমান-বিজয়ের পূর্বে লেখা। তখন লোকে কিরূপে সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়া যাইত, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি।

মুসলমান-বিজয়ের পর যখন দেশে অনেকেই মুসলমান হইয়া যাইতে লাগিলেন, তখন ব্রাহ্মণেরা দেখিলেন ভাষায় রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি না লিখিলে এ মুসলমানি স্রোত রোধ করা যাইবে না। তাই তাঁহারা ঐ-সকল গ্রন্থ বাংলা করিতে লাগিলেন। কাব্যের দোষগুণ সংস্কৃতে যাহা ছিল, বাংলাতেও তাহাই রহিল, বেশির মধ্যে বাঙালির মনে যাহা লাগে, তাহাই উহাতে ঢুকাইয়া দিলেন। বাঙালি হাস্যরসে পটু, তাই উহাতে হাসির জিনিস বেশি করিয়া আসিল। বাঙালি কথাকাটা-কাটি ভালোবাসে। উহাতে কথাকাটাকাটি বেশি আসিয়া ঢুকিল। এই-জন্যই অঙ্গদ-রায়বারে, লবকুশের যুদ্ধে কথাকাটাকাটি আসিল। বাঙালি বড়ো ভক্ত, তাই রামায়ণে দুর্গোৎসব আসিল। এইরূপে রামায়ণ, মহা-ভারত ও পুরাণগুলি বাঙালি আকারে, বাংলাভাষায় বিরাজ করিতে লাগিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ-ঠাকুরেরা মনসা, মঙ্গলচণ্ডীর গান আপনাদের মতো করিয়া বাংলা করিয়া লইলেন। অনেক ব্রাহ্মণ, পাকা বৌদ্ধ যে ধর্মঠাকুরের গান,[১] তাহাও সংস্কৃত কাব্যের রসভাব দিয়া লিখিতে লাগিলেন।

এমন সময় চৈতন্যদেবের [১৪৮৬-১৫৩৩ খৃ.] আবির্ভাব হইল।

কাব্য ও নাটকই তাঁহার ধর্মের প্রাণ। অলংকারের রস ও ভাবই তাঁহাদের দেবতা। নয় রস, বিয়াল্লিশ ভাব ও আটটি সাত্ত্বিক ভাব লইয়াই তাঁহাদের কীর্তন। পদকর্তারা দেখিতেন এই এই ভাবের গান আছে, এই এই ভাবের গান নাই, সেইগুলি তাঁহারা জুড়িয়া দিতেন। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, এক গানে একজন যে ভাব দিয়া গিয়াছেন, আর-একজন তাহাতে অন্য ভাব লাগাইলেন। নানা ভাবে নানা রসের সংকীর্তনের গান হইতে লাগিল। তাহার পর অনেক গান জমিয়া গেলে সংগ্রহ আরম্ভ হইল। সংগ্রহে পূর্বরাগ হইতে আরম্ভ করিয়া বিরহ ও মিলন পর্যন্ত গানগুলি একটির পর একটি করিয়া সাজানো হইল। অনেকগুলি সংগ্রহ হইলে শেষে একজন মহাকবি সেই গানগুলি ভাঙিয়া একখানি মহাকাব্য রচনা করিলেন। বহু-কাল পূর্বে যেমন কুশীলবের গানগুলি একত্র করিয়া বাল্মীকি মুনি রামায়ণ করিয়াছিলেন, আমাদের মহাকবি রঘুনন্দন[২] সেইরূপ সংকীর্তনের পদ ভাঙিয়া 'রাধামাধবোদয়' নামে এক মহাকাব্য রচনা করিলেন। রঘুনন্দনের 'রামরসায়ন' লোকে পড়ে, কিন্তু রাধামাধবোদয় লোকে বড়ো পড়ে না। কিন্তু সংকীর্তনের সহিত যদি রাধামাধবোদয় পড়ে, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, কবি কিরূপ অদ্ভুত কারিকুরি করিয়া গিয়াছেন। আমার এক-একবার মনে হয়, রাধামাধবোদয়ই বৈষ্ণব ধর্মের একখানা বড়ো মহাকাব্য।

বৈষ্ণবদের এই মহাকাব্যের পর আমরা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের কতকগুলি বাংলা কাব্য দেখিতে পাই। সেগুলি ঠিক সংস্কৃত কাব্যের ছাঁচে ঢালা। এই-সকল কাব্যের মধ্যে বিদ্যাসুন্দরের গল্প প্রধান। গল্পটি সোজা, উহাতে ঘটনা অধিক নাই, কিন্তু সেই সামান্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া রস, ভাব ও অলংকারের ছড়াছড়ি করা হইয়াছে। ইংরাজি যুগের পূর্বে বাঙালির কাব্যের বিশেষত্ব এই যে, বাঙালিরা একটি বিষয় লইয়া অনেকে কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। এক রামায়ণেরই অনেক রূপ বাংলা আছে, মহাভারতেরও আছে। মঙ্গলচণ্ডী, মনসা ও ধর্মঠাকুরের গানের তো কথাই নাই। সত্যপীরের পাঁচালি যে কত আছে, গণিয়া ঠিক করা যায় না। সব বাড়িতেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সত্যপীরের গান আছে।

প্রায় একশত বৎসর পূর্ব হইতে ইংরাজি শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে, আমাদের কাব্যে ও গানে ইংরাজি ভাব আসিয়া ঢুকিয়াছে। এই ইংরাজি

ভাবের প্রধান মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ' [১৮৬১ খৃ.]। কাব্যের বিষয় আমাদের দেশের, কাব্যের নায়ক-নায়িকা আমাদের দেশের, রস ও ভাব অনেকটা আমাদের দেশের, কিন্তু আর-সবই বিলাতি। মাইকেল মধুসূদন দত্ত [১৮২৪-৭৩ খৃ.] নানা ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন, নানা ভাষা হইতে উপমা সংগ্রহ করিয়াছেন, ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন ও সংস্কৃত কাঠামোয় সেগুলি সব সাজাইয়াছেন। মহাকাব্যখানি ভালোই হইয়াছে। কারণ, ঐ কাব্য দেখিয়া ও ঐ কাব্য পড়িয়া যখন অনেকেই কাব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ও কবি হইয়াছিলেন, তখন উহা যে শিক্ষিত সমাজকে বিশেষ রূপে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ কী? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তাহার পর আর এইরূপ মহাকাব্য হইল কই? যদি বলো, মহাকাব্য কি রোজ রোজ হয়? হয় না সত্য, কিন্তু সে দিকে চেষ্টা কই? ও পথটা যেন লোকে ছাড়িয়াই দিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এখন মনে হয় যেন, বেশি দিন ভাবিয়া, বেশি দিন চিন্তিয়া বড়ো একখানা কাব্য লিখিয়া জীবন সার্থক করিব— সে চেষ্টাই লোকের মনে নাই। চটক্‌দার দু-চারটা গান লিখিয়া চট করিয়া নাম লইব, সেই চেষ্টাই যেন অধিক। গানের দিকে, ছোটো ছোটো কবিতার দিকে, চুট্‌কির দিকেই লোকের ঝোঁক বেশি। উহাদের কবি আছে— চিরকালই থাকে, আমাদের দেশেও আছে। চুট্‌কিতে সময় সময় মুগ্ধও করে, কিন্তু চুট্‌কিই কি আমাদের যথাসর্বস্ব হইবে? বড়ো জিনিস কি আর হইবে না? আমাদের সাহিত্যের খুব শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে আমরা আনন্দিত। বাংলায় যত বই বাহির হয়, ভারতবর্ষের আর-কোনো ভাষায় তত হয় না। এটা আমাদের আনন্দের বিষয়। বাংলার যত বই অন্য ভাষায় তর্জমা হয়, এত ভারতবর্ষের অন্য ভাষার হয় না। ইহাও আমাদের আনন্দের বিষয়। রবিবাবু [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৮৬১-১৯৪১ খৃ] 'নোবেল প্রাইজ' পাইলেন [১৯১৩ খৃ.], বাংলাভাষার জয়জয়কার হইল ; ইহাতে কে না আনন্দিত। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, ভবিষ্যতের কী হইতেছে? ঝোঁক যদি চুট্‌কির উপর হয়, ক্রমে সে চুট্‌কিও যে খারাপ হইয়া যাইবে। কালিদাস ও ভবভূতির পর চুট্‌কি আরম্ভ হইয়াছিল ; কেননা, শতক, দশক, অষ্টক, সপ্তশতী— এই-সব তো চুট্‌কি-সংগ্রহ ছাড়া কিছুই নয়।

তাই আমার ভয় হয় পাছে বাংলার কাব্যটা চুট্‌কিতেই অবসান হইয়া যায়।[৩]

পদ্য ও কাব্যের ইতিহাস খুব প্রাচীন হইলেও বাংলা নাটকের ইতিহাস তত প্রাচীন নয়। ছাপাখানা হইবার অনেক পরে নাটক আরম্ভ হয়। নাটকের মহারথীগণ একে একে অস্তগত হইয়াছেন। যাঁহারা আছেন, তাঁহারাও প্রাচীন হইয়াছেন। কিন্তু এখানেও দেখিতেছি ঐ ব্যাপার— লোকে যেন বেশি দিন ভাবিয়া বই লিখিতে চান না। বই পড়িলেই বোধ হয়, তাড়াতাড়ি করিয়া ছাপাইয়া নাম লইবার চেষ্টা। একজন প্রাচীন নাটককার বলিলেন, "আমি দশ বৎসর ধরিয়া 'রত্নাবলী'-খানিকে বাংলা করিবার চেষ্টা করিতেছি, ঠিক মনের মতো হইয়া উঠিতেছে না।" কিন্তু আবার দেখিতেছি, অনেকে তিন মাস অন্তর একখানি করিয়া নাটক থিয়েটারে যোগান দিতেছেন। এক-একবার মনে হয় যেন, কিছু দিন নাটক লেখা বন্ধ করিলে ভালো হয়।

নবেলেও সেইরূপ দেখিতে পাইতেছি। নবেলের ইতিহাসও বেশি প্রাচীন নয়। কিন্তু এখানেও ঐ ভাব হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমবাবু [বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৮৩৮-৯৪ খৃ] দুই বৎসরের কমে একখানি নবেল লিখিতেন না। কিন্তু এখন হু হু করিয়া নবেল বাহির হইতেছে। এখানেও দেখিতে পাই, চুট্‌কিই অধিক। চুট্‌কি যে মন্দ, তাহা বলিতেছি না। অনেক চুট্‌কি অতি সুন্দর, বেশ মনে লাগে। অনেক সময় চুট্‌কিতে বেশ গুণপনাও প্রকাশ পায়। কিন্তু ভাবি চুট্‌কিই কি আমাদের যথাসর্বস্ব হইবে। চুট্‌কির একটি দোষ আছে— যখনকার তখনই, বেশি দিন থাকে না। একখানা বই পড়িলাম, অমনি আমার মনের ভাব আমূল পরিবর্তন হইয়া গেল, যত দিন বাঁচিব তত দিন সেই বইয়ের কথাই মনে পড়িবে এবং সেই আনন্দেই বিভোর হইয়া থাকিব— এরকম তো চুট্‌কিতে হয় না। তাই চুট্‌কির চেয়ে কিছু বড়ো জিনিস চাই। সেই আকাঙ্ক্ষাতেই এত কথা বলিতেছি।

বাংলায় রচনার বই বড়ো কম, নাই বলিলেও হয়। যে ক'খানি সেকেলে বই আছে, প্রায়ই তর্জমা। বাঙালি নানা বিষয়ে ভাবিয়া চিন্তিয়া হেল্প সাহেবের[৪] মতো বা এডিসন সাহেবের[৫] মতো রচনা লিখিতেছে— এ তো দেখা যায় না। যাহা-কিছু আছে এক কমলা-

কান্তের দপ্তরে— অতুল্য, অমূল্য ; আর তো দেখি না। আমাদের দেশের লোক এ পথটা কেন ছাড়িয়া দিতেছে, বুঝিতে পারি না।

জীবনচরিতে দিন-কতক বাঙালিরা খুব পটুতা দেখাইয়াছিল। কতকগুলি জীবনচরিত বাস্তবিক মহামূল্য রত্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু আরো চাই। এখনো জীবনচরিত ঠিক জীবনচরিত হয় নাই। দু-চারখানি জীবনচরিতে দেখিতে পাই, কেবল জীবনের ঘটনাগুলি পর পর সাজানো আছে। কিন্তু তাহাকে জীবনচরিত বলে না। ঐ সাজানো ঘটনাগুলির কার্যকারণ-ভাবগুলি সব দেখাইতে হইবে। সমাজটি বেশ করিয়া বুঝিতে হইবে। ইতিহাস ভালো করিয়া জানা চাই। তবে তো ভালো জীবনচরিত হইবে। একজন মানুষের জীবনচরিত দেখাইতে গিয়া তিনি যত দিন বাঁচিয়াছিলেন, তত দিন তাঁহা দ্বারা সমাজের, সাহিত্যের, ব্যবসায়ের, বাণিজ্যের কত পরিবর্তন হইয়াছে— সেগুলি সব দেখানো চাই। এরূপ দেখাইবার চেষ্টা অনেক বার হইয়াছে, যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য ও ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বঙ্কিমবাবুর ভালো জীবনচরিত আজিও বাহির হইল না ! যিনি ত্রিশ বৎসর ধরিয়া বাংলা সাহিত্যের 'আদিত্য-স্বরূপ' ছিলেন, তাঁহার একখানি ভালো জীবনচরিত আজিও বাহির হইল না। এ সম্বন্ধে একটা কথা বলা যাইতে পারে। মানুষ মরিলেই তাঁহার জীবনচরিত বাহির হওয়া অনেক সময় ঠিক নয়। কারণ, মানুষ থাকিলেই তাঁহার সম্বন্ধে 'সুবিধা', 'কুবিধা' দুই থাকে। যাহারা সুবিধা তাহারা শতমুখে তাঁহার সুখ্যাতি করিবে, যাহারা কুবিধা তাহারা শতমুখে নিন্দা করিবে— দোষ ছাড়া কিছুই দেখিতে পাইবে না। তাই মরিবার বিশ-ত্রিশ বৎসর পরে জীবনচরিত লিখিলে ভালো হয়। কিন্তু তাহাতে আবার আর-এক দোষ হয়। অনেক ঘটনা লোকে ভুলিয়া যায়। জীবন-চরিত সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় [১৮২০-৯১ খৃ.] বড়োই ভাগ্যবান, কারণ তাঁহার মৃত্যুর পরই তাঁহার ভাই তাঁহার এক প্রকাণ্ড জীবনচরিত লেখেন। তাহার পর অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার আরো দুইখানি জীবন-চরিত বাহির হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে ঘটনা ছাড় হইবার সম্ভাবনা কম। তবে পক্ষপাতশূন্য হইয়া তাঁহার জীবনচরিত লিখিবার সময় এখনো আসে নাই।

কাব্যের দোষগুণ-পরীক্ষা এখনো আরম্ভ হয় নাই বলিলেই হয়। বঙ্কিমবাবু ও ভূদেববাবু [ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ১৮২৭-৯৪ খৃ] এ বিষয়ে দু-চারিটি রচনা লিখিয়া গিয়াছেন। সে রচনা কোনো কাব্যের কোনো বিশেষ অংশ ধরিয়া। পুরা কাব্যখানি পড়িয়া, তাহা সম্পূর্ণরূপে হজম করিয়া, তাহার দোষগুণ দেখানো এখনো হয় নাই। বঙ্কিমবাবুর নবেলের দোষগুণ-পরীক্ষা দুই-তিনবার হইয়া গিয়াছে, তিনি বাঁচিয়া থাকিতেই দুই-একবার হইয়া গিয়াছে। দুই-একটা রচনা পড়িয়া তিনিও অত্যন্ত খুশি হইয়াছিলেন। মাইকেলের দোষগুণও অনেকে পরীক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু সব কাব্য পড়িয়া মাইকেলের কবিতা বুঝাইবার চেষ্টা হয় নাই। এ বিষয়ে বাংলার একটা মস্ত অভাব আছে। সে অভাব দূর করিবার ভার একা দীনেশবাবুর ঘাড়ে চাপাইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। এই একটা ব্যাপারে অনেকেই দেশের ভালো কাজ করিতে পারেন। কিন্তু নির্ভয়ে দোষগুণ দুই-ই দেখাইয়া দেওয়া দরকার। বঙ্কিমবাবু 'বঙ্গদর্শনে' একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার পর সে চেষ্টা আর দেখি নাই। এখন সংবাদপত্রে ও মাসিকপত্রে যে-সব দোষগুণ-পরীক্ষা হয়, সেটা যেন বিজ্ঞাপন দেওয়ার মতো। 'ওগো অমুক এই বই লিখিয়াছেন, তোমরা কেনো।' —এই যেন সে বিচারের মানে। অনেক মাসিকপত্র ও সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা বলেন, "আমাদের পড়িবার সময় নাই। গ্রন্থকারেরা আপনার গ্রন্থের দোষগুণ দেখাইয়া দিলে আমরা ছাপাইতে পারি।" এ কথাটা যে নিতান্ত মিথ্যা তাহা নহে, কিন্তু এরূপ দোষগুণ-বিচার আমরা চাহি না। আসামি জজ হইয়া বিচার করিবে, এটা বোধ হয় কেহই চাহিবেন না?

বাংলা সাহিত্যের গতি যতদূর সংক্ষেপে পারিলাম দেখাইয়া দিলাম। কোথায় কী গুণ আছে, কোথায় কী অভাব আছে, তাহাও দেখাইবার চেষ্টা করিলাম। কোন্ মন্দ জিনিস ত্যাগ করিতে হইবে, কোন্ ভালো জিনিস আরো ভালো করিতে হইবে, তাহাও দেখাইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও একটা গুরুতর কথা আছে— সেটা বাংলাভাষার গতি।

অনেকের সংস্কার বাংলাভাষা সংস্কৃতের কন্যা। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার [১৮৪৬-১৯১৭ খৃ.] মহাশয় সংস্কৃতকে বাংলাভাষার ঠানদিদি

বলিয়াছেন। আমি কিন্তু সংস্কৃতকে বাংলার অতি-অতি-অতি-অতি-অতি-অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহী বলি। পাণিনির সময় সংস্কৃতকে ভাষা বলিত অর্থাৎ পাণিনি যে সময় ব্যাকরণ লেখেন, তখন তাঁহার দেশে লোকে সংস্কৃতে কথাবার্তা কহিত। তাঁহার সময় আর-এক ভাষা ছিল, তাহার নাম 'ছন্দস্'— অর্থাৎ বেদের ভাষা। বেদের ভাষাটা তখন পুরানো, প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। সংস্কৃত ভাষা চলিতেছে। পাণিনি কত দিনের লোক তাহা জানি না, তবে খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ, সপ্তম শতকের বোধ হয়।[৬] তাহার অল্প দিন পর হইতেই ভাষা ভাঙিতে আরম্ভ করে। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পরই তাঁহার চুলার ছাই কুড়াইয়া এক পাথরের পাত্রে রাখা হয়। তাহার গায়ে যে ভাষায় লেখা আছে, সে ভাষা সংস্কৃত নয়; তাহার সকল শব্দই সংস্কৃত হইতে আসা, কিন্তু সে ভাষা সংস্কৃত হইতে অনেক তফাত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পরই অশোকের শিলালেখের ভাষা। তাহার পর মিশ্রভাষা, ইহার কতক সংস্কৃত ও কতক আর-একরকম। একটি বাক্যে দুরকমই পাওয়া যায়। এ ভাষায় বইও আছে, শিলালেখও আছে। তাহার পর সুঙ্গ ও খারবেলাদিগের শিলালেখের ভাষা। তাহার পর সাতকর্ণিদের শিলা-লেখের ভাষা। তাহার পর পালিভাষা। তাহার পর নাটকের প্রাকৃত। সকল প্রাকৃতের সহিত আমাদের সম্পর্ক নাই। মাগধীর ও ওড্র মাগধীর সহিত আমাদের কিছু সম্পর্ক আছে। তাহার পর অনেক দিন কোনো খবর পাওয়া যায় না। তাহার পর অষ্টম শতকের বাংলা। তাহার পর চণ্ডীদাসের বাংলা। তাহার পর বৈষ্ণব কবিদের বাংলা। সব শেষে আমাদের বাংলা।

সুতরাং সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক অনেক দূর। যাঁহারা বাংলাকে সংস্কৃতের পথে চালাইতে চান, তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনাও খুব কম। সংস্কৃতের গতি একরূপ ছিল, এতদিনে বাংলার গতি আর-একরূপ হইয়া গিয়াছে। এখন এই বাংলাকে সংস্কৃতের দিকে চালাইবার চেষ্টা, আর গঙ্গার স্রোতকে হিমালয়ের দিকে চালাইবার চেষ্টা একই রকম। সাত শত বৎসর মুসলমানের সহিত একত্র বাস করিয়া বাংলা মুসলমান হইতে অনেক জিনিস লইয়া ফেলিয়াছে। সে-সব জিনিস বাংলার হাড়ে মাসে জড়িত হইয়াছে। এখন তাহাকে বাহির

করিয়া দিবার চেষ্টা কিছুতেই সফল হইবে না। মুসলমানেরা বাংলা-ভাষাকে যেমন বদলাইয়া দিয়াছে, ভারতবর্ষের আর-কোনো ভাষাকে সেরূপ পারে নাই। আমাদের বাংলার বিভক্তি 'রা' ও 'দের' মুসলমানদের কাছ হইতে লওয়া।[৭] সে বিভক্তি তুমি ভাষা হইতে তাড়াইবে কী করিয়া ? অথচ আমাদের পণ্ডিত লেখক মহাশয়েরা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা মুসলমানি শব্দ ব্যবহার করিবেন না। যে-সকল শব্দ একেবারে আপামর সাধারণের ভিতর চলিয়া গিয়াছে, লিখিবার সময় সেগুলি তাঁহারা ব্যবহার করিবেন না। 'কলম' মুসলমানি শব্দ, তাঁহারা কলমের বদলে 'লেখনী' শব্দ ব্যবহার করিবেন, অথচ 'লেখনীর' অর্থ— উড়েদের তালপাতায় আঁচড় কাটিবার লোহার খুন্তি, তাহাতে কালি লাগে না। 'কলম' ও 'লেখনি' দুটি একেবারে ভিন্ন জিনিস। 'দোয়াত' মুসলমানি কথা। দোয়াত লেখা হইবে না, 'মস্যাধার' লিখিতে হইবে। 'পাট্টা' মুসলমানি কথা। পাট্টা লিখিবেন না, 'ভোগবিধায়ক পত্র' লিখিবেন। 'আদালত' লিখিবেন না, লিখিবেন— 'বিচারালয়'। এইরূপে তাঁহারা বাংলাকে শুদ্ধ বা মার্জিত করিয়া লইতে চান। তাঁহাদের সে চেষ্টা কখনোই সফল হইবার নয়।

আবার একদল আছেন, তাঁহারা চলিত কথা দেখিলেই নাক সিঁটকাইয়া উঠেন : বলেন— "ওটা ইতুরে কথা।" উহার বদলে তাঁহারা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে চান। আমরা বলি, "সময় আর কাটে না", তাঁহারা বলেন, "কাটে না, ছি !— ইতুরে কথা।" বলেন, "সময় কর্তন হয় না।" আমরা কথায় বলি, "বাড়িয়ে গুছিয়ে লও।" তাঁহারা বলেন, "ছি ! ও ইতুরে কথা। পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করিয়া লও।" আমরা বলি, "দল বাঁধিয়া কাজ করিতে হয়", তাঁহারা বলেন, "দলবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে হয়।" আমরা কথায় বলি, "এটা গালগল্প", তাঁহারা বলেন, "স্বকপোলকল্পিত।" আমরা বলি, "ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল", তাঁহারা বলেন, "কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইল।" এইরূপে তাঁহারা কেতাবের ভাষাকে কথা কওয়ার ভাষা হইতে অনেক দূরে আনিয়া ফেলিয়াছেন। এখন ইংরাজি ও সংস্কৃত পড়িতে যত কষ্ট হয়, তাঁহাদের সাধুভাষা পড়িতেও তত কষ্ট হয়।

আর-একদল আছেন, তাঁহারা পড়েন ইংরেজি, ভাবেন ইংরাজিতে,

লিখিতে চান বাংলায়— সে এক রকম সাহেবি বাংলা হইয়া পড়ে। যথা—

"সিঙ্গিবাসী যুবকগণ মহোৎসাহ-সহকারে এই কথা প্রচার করিয়া সত্যকে লুপ্ত করিবার মধ্যে আনিয়াছেন।"

"সুতরাং যদি পাশ্চাত্য শিক্ষা যদি কিছু অনিষ্ট করিয়া থাকে তাহার জন্য আমরা নিজ অদৃষ্টকেই ধন্যবাদ দিতে পারি।"

"যে যে ক্ষেত্রে তিনি কার্য করিয়াছেন, সেই সকল ক্ষেত্রেই প্রায় তিনি সমসাময়িকগণের বহু পূর্ববর্তী ছিলেন্।"

"দেশের লোকের চিন্তা তাহার চিন্তা হইতে তখন কত পশ্চাদ্বর্তী ছিল।"

"দেখিলাম গরম পোলাও ও মাংস আমার আহারের অপেক্ষা করিতেছে।"

"হরমোহিনী এখন সুচরিতাকে তাহার পূর্বের সমস্ত পরিবেষ্টন হইতে ছাড়াইয়া লইয়া সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্ত করিতে চান।"

আর-অধিক তুলিয়া ভিজা কম্বল ভারি করিব না। মোট কথা দাঁড়াইতেছে এই যে, বাংলা যখন একটা ভালো ভাষার মধ্যেই দাঁড়াইতেছে, তখন উহা কিছু পরিমাণে শিক্ষা করা আবশ্যক। উহার একটা স্বতন্ত্র ব্যাকরণ আছে, স্বতন্ত্র পদ-যোজনার প্রণালী আছে, পদ বাছিয়া লইবার প্রণালী আছে। সেগুলি নিপুণ হইয়া দেখার দরকার, তবে তো বাংলা লেখক হইবে। নহিলে বাংলা আমার মাতৃভাষা, আমি যাহাই লিখিব তাহাই বাংলা— এই বলিয়া রাশি রাশি ইংরাজি ও সংস্কৃত শব্দ বাংলা অক্ষরে লিখিয়া দিলে, তাহাকেও কি বাংলা বলিব? তাহা হইলে তো এটি খাসা বাংলা—

"আমি ল্যাণ্ডো গাড়িতে ড্রাইভ করিতে করিতে হাওড়া স্টেশনে পহুঁছিয়া বেনারসের জন্য বুক করিলাম। ফার্স্ট ক্লাসে লোয়ার বার্থ ভেকান্ট ছিল না, আপার বার্থে বেডিংটা স্প্রেড করিয়া একটু শর্টন্যাপ দিবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় হুইসিল দিয়া ট্রেন স্টার্ট করিল"। ইহাকে কি আপনারা বাংলা বলিবেন?

দেশের লোকে যে-সকল শব্দ বুঝে অথচ সত্য সত্য ইতুরে কথা নয়, যে-সব কথা ভদ্র লোকের কাছে কহিতে আমরা লজ্জিত হই না, সেই-

সকল কথায় মনের ভাব ব্যক্ত করিলে লোকে সহজে বুঝিতে পারিবে, ভাষাও ভালো হইবে। 'গালগল্প' লিখিতে আপত্তি কী ? গালগল্পে যেমন অর্থ বোধ হয় 'স্বকপোলকল্পিত' বলিলে কি সে অর্থ বোধ হয়, না সকলে সহজে বুঝিতে পারে ? সুতরাং এই-সকল সোজা কথা ছাড়িয়া দিয়া তাহার জায়গায় অপ্রচলিত, কঠিন— অনেক সময় অশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করার কী দরকার ? একবার রবিবাবু বলিয়াছিলেন, "লেখ না সংস্কৃত ! বাজারে তোমার বই কাটিবে না। তাহাতে তোমার কী ক্ষতি হইবে ? পোকায় তো কাটিবে ?" বাস্তবিকই বেশি সংস্কৃতওয়ালা বাংলা বই পোকাতেই কাটে !

এখন বাংলাকে এই সংস্কৃত ও ইংরাজির হাত হইতে মুক্ত করিয়া সহজ করা, মিষ্ট করা ও সরল করা আবশ্যক হইয়াছে। এতদিন পণ্ডিত মহাশয়েরা ইচ্ছামতো পারসি শব্দকে তাড়াইয়া দিতে পারিয়াছেন, কারণ বাংলার মুসলমানেরা বাংলা সাহিত্যে লিখিতে আরম্ভ করেন নাই। এখন তাঁহারা বলিতেছেন, "চলিত মুসলমানি শব্দ তোমরা তাড়াইবে কেন ? তাড়াইবার তোমাদের কী অধিকার আছে ? যে-সকল শব্দ তিন, চার, পাঁচ শত বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাদের তো ভাষায় থাকিবার কায়েমি স্বত্ব জন্মিয়া গিয়াছে। তোমরা সে স্বত্ব হইতে তাড়াইবার কে ?" শুধু যে এই কথা বলিয়া নিশ্চিন্ত আছেন তাহা নয়, তাঁহারা আরো বলিতেছেন, "তোমরা যদি মুসলমানি শব্দ তাড়াইয়া বড়ো বড়ো সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করো, আর যদি বুঝিতে আমাদের বেশি কষ্ট হয়, তবে আমরা বড়ো বড়ো পারসি শব্দ, আরবি শব্দ ব্যবহার করিব ; আমাদের ভাষা স্বতন্ত্র করিয়া লইব— তোমাদের মুখাপেক্ষা করিব না।" সুতরাং ভাষার সমস্যাটি এখন বড়ো কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ বিষয়ে নবাব আলি চৌধুরী মহাশয় "বাঙ্গালা ভাষার গতি"[৮] নামে ঢাকায় যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, সেটি সকলেরই মন দিয়া দেখা উচিত। বাংলায় যখন অর্ধেক মুসলমান, তখন তাহারা যে হিন্দুরা যাহা বলিবে তাহাই করিবে— এরূপ আশা করা যায় না। এখন উভয়ে মিলিয়া বাংলা কী হইবে স্থির করিয়া লওয়া উচিত। উহার একটা ব্যাকরণ ও অভিধান স্থির করিয়া লওয়া উচিত। লেখকদিগের স্বেচ্ছাচারিতার উপর ভাষার উন্নতি আর নির্ভর করিতে পারে না। যত দিন যাইতেছে

কথাটা ক্রমেই শক্ত হইয়া দাঁড়াইতেছে। আমি বলি, যাহা চল্‌তি, যাহা সকলে বুঝে— তাহাই চালাও ; যাহা চল্‌তি নয়, তাহাকে আনিও না। যাহা চল্‌তি, তাহা ইংরাজিরই হউক, পারসিই হউক, সংস্কৃতই হউক —চলুক। তাহাকে বদলাইয়া শুদ্ধ সংস্কৃত করিবার দরকার নাই। 'রেলওয়ে'কে 'লৌহবর্ত্ম' করিয়া লইবার প্রয়োজন নাই। একজন সেদিন বড়োরাস্তাকে 'রাজমার্গ' ও বাঁশ লইয়া যাওয়াকে 'বংশপরিচালনা' লিখিয়া বড়োই বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আর-একজন শ্বশুর শব্দটাকে ইতুরে মনে করিয়া তাহার বদলে 'শ্বশ্রূ মহাশয়' লিখিয়া বিপদগ্রস্ত হইয়া-ছিলেন। এরূপ করা বড়োই অন্যায়।

ভাষাকে সোজা পথে চালানো উচিত এই তো গেল এক কথা। তাহার পরে আর-একটা কথা আছে— এই আমার শেষ কথা, সেটা নূতন কথা গড়া। বাংলার সমাজ এখন আর নিশ্চল নয়। যেভাবে বহু-শত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, সেভাবে এখন আর কাটিতেছে না। নানা দেশ হইতে নানা ভাব আসিয়া বাংলায় জুটিতেছে। যে-সকল ভাব প্রকাশ করিবার কথা বাংলায় নাই, তাহার জন্য কথা গড়িতে হইতেছে। যাহাদের চলিতভাষার কথা লইয়াই গোলযোগ, নূতন ভাবে নূতন কথা গড়িতে তাহাদের আরো কষ্ট পাইতে হইবে, আরো বেগ পাইতে হইবে —সে বিষয়ে আর সন্দেহ কী। পূর্বে দেশে 'মিউজিয়াম' ছিল না, এখন হইয়াছে। মিউজিয়ামকে কী বলিব ? সংস্কৃত পণ্ডিত বলিলেন, 'চিত্রশালিকা'। কথাটা কেহ বুঝিলও না, মিউজিয়ামের ভাবও উহাতে প্রকাশ হইল না। চিত্রশালিকা বলিলে ছবির ঘর বুঝায়, সুতরাং মিউ-জিয়াম বুঝাইল না। এ জায়গায় 'মিউজিয়াম' শব্দ লইতে দোষ কী ? দেশের লোকে কিন্তু চট্‌ করিয়া উহার একটি নাম দিয়া বসিয়াছে। তাহারা উহাকে 'যাদুঘর' বলে। সুদূর পশ্চিমে উহাকে 'আজবঘর' বলে। চিত্রশালিকার চেয়ে এ দুটা কথাই ভালো। উহার একটা চালাইলে দোষ কী ? বাংলায় আকাশে তারা মাপিবার যন্ত্রঘর ছিল না। যখন কলিকাতায় সেই ঘর হইল, পণ্ডিত মহাশয়েরা তাহার তর্জমা করিলেন 'পর্যবেক্ষণিকা'। কথাটা একে তো চোয়ালভাঙা, তাহাতে আবার কঠিন সংস্কৃত— শুদ্ধ কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ। হিন্দুস্থানি গাড়োয়ানেরা অত শত বুঝে না— তাহারা উহার নাম রাখিল 'তারা-ঘর', মোটামুটি

উহার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিল, কথাটি শুনিতেও মিষ্ট। তবে উহা চালাইতে দোষ কী? এইরূপ অনেক নূতন জিনিস, নূতন ভাব নিত্যই আসিতেছে; তাহাদের জন্য কথা গড়া একটা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমার বোধ হয়, বাংলা হইতেই ঐ সমস্যার পূরণ হওয়া ভালো, বাংলা কথা দিয়াই নূতন কথা গড়া উচিত। নিতান্ত না পারিলে, আসামি, উড়িয়া ও হিন্দি খুঁজিয়া দেখা উচিত; তাহাতেও না হইলে যে ভাষার ভাব, সেই দেশের কথাতেই লওয়া উচিত। আমরা তো চিরকালই তাহাই করিয়া আসিতেছি, নহিলে 'বাতাবি লেবু', 'মর্তমান কলা', 'চাঁপা কলা' কোথা হইতে পাইলাম? সেইরূপ এখনো সোজা বাংলায়, সোজা কথায় এই-সকল নূতন জিনিসের নাম দেওয়া ও নূতন ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা উচিত; নহিলে কতকগুলা দাঁত-ভাঙা কট্‌কটে শব্দ তৈয়ার করিয়া লইলে ভাষার সঙ্গে তাহা খাপ খাইবে না। যে দিকেই হউক, ভাষা লইয়া স্বেচ্ছাচারিতা করাটা ঠিক নয়। ফরাসিরা যেমন একটা একাডেমি করিয়া কোন্ কোন্ শব্দ ভাষায় চলিবে, কোন্ কোন্ শব্দ চলিবে না ঠিক করিয়াছিলেন, আমাদেরও সেইরূপ একটা করিয়া লওয়া উচিত; নহিলে কথার সংখ্যায় আমাদের অভিধান অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবে এবং কথার ভারে ভাষা অতল জলে ডুবিয়া যাইবে।

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'
চতুর্থ সংখ্যা ১৩২১ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

বর্ধমানে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ২০-২২ চৈত্র ১৩২১ ব.। শাস্ত্রীমশায় মূল সম্মিলনে এবং সাহিত্য-শাখার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ২২ চৈত্র, ৪ এপ্রিল ১৯১৫ রবিবার সকাল ৮টায় সাহিত্য-শাখার অধিবেশনের সূচনায় এই সভাপতির অভিভাষণ পড়েন। সম্মিলনের কার্যবিবরণে উল্লেখ আছে, "যথাসময় সাহিত্য-শাখার অধিবেশন আরম্ভ হয়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি, আই, ই, মহাশয় এই শাখার সভাপতি নির্দ্দিষ্ট ছিলেন। তিনি যথাসময়ে কাজ আরম্ভ করিয়া নিজের অভিভাষণ পড়িয়া শুনাইলেন। বর্দ্ধমানের উকীল শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ বসু এম্ এ, বি এল্ এই বিভাগের সম্পাদকের কাজ করিতে লাগিলেন।"

এই অধিবেশনে পড়া সমস্ত রচনা সম্মিলনের কার্যবিবরণের অংশ-রূপে ছাপা হয়েছিল ১৩২২ বঙ্গাব্দে। শাস্ত্রীমশায় সাহিত্য-শাখার রচনা-সংকলনের একটি ভূমিকা লিখে দেন। ভূমিকাটিতে লেখকদের রচনা সম্পর্কে অবলোকনে এই অধিবেশনের মূল প্রবণতা যেভাবে ধরিয়ে দিয়েছেন তার সঙ্গে নিজের অভিভাষণটির বক্তব্যের বেশ মিল আছে। ভূমিকার প্রাসঙ্গিক অংশ—

"গদ্যে যে-সকল প্রবন্ধ পঠিত হয়, তাহার মধ্যে অনেকগুলি বাংলাভাষার গতি লইয়া লেখা। ইংরাজি শিক্ষার প্রাদুর্ভাব এবং বাংলা শিক্ষার অভাবে সেকালের সুপ্রচলিত অনেক বাংলা কথা এখন উঠিয়া যাইতেছে এবং তাহার বদলে যে-সকল কথা গড়া হইতেছে সেগুলি না শুনিতে মিষ্ট না মনের ভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ। পণ্ডিত মহাশয়েরা পারসি শব্দ ব্যবহার করিতে চান না, তাহাতে কতকগুলি আভাঙা সংস্কৃত শব্দ বাংলায় ঢুকিতেছে। সে-সকল শব্দ সংস্কৃত অভিধানেও পাওয়া যায় না। যাঁহারা ইংরাজিতে ভাবেন তাঁহারা ইংরাজি কথার তর্জমা করিতে গিয়া নানা অলৌকিক সংস্কৃত শব্দের সৃষ্টি করিয়া বসেন। প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত বাবু শীতলচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত বাবু শশাঙ্কমোহন সেন, শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়লাল দত্ত, শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি মহোদয়গণের প্রবন্ধে বাংলা ভাষা কী পথে চালাইলে ভালোরূপে চলিতে পারে, তদ্বিষয়ে অনেক সুপরামর্শ পাওয়া যাইতে পারে।...

"শ্রীযুক্ত ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকির 'হিন্দু-মুসলমান' নামক প্রবন্ধটি সকলেরই মন দিয়া পাঠ করা উচিত। তিনি বলিয়াছেন, 'যদি প্রকৃতপ্রস্তাবে দেশের মঙ্গলচিন্তা কাহারো হৃদয়ে বলবৎ হইয়া থাকে তবে তিনি সর্বপ্রথমে হিন্দু-মুসলমানের সৌহার্দ্য-বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করুন। কিন্তু এই মিলন এই সৌহার্দ্য রাজনীতি-চর্চার সভার সাহায্যে সম্ভবে না। তবে কি হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কোনো সদুপায় নাই? আছে। সে উপায় মাতৃভাষার সেবায়, সে উপায় বাণীমাতার সাধনায় এবং সে উপায় বঙ্গ-সাহিত্যের চর্চায়। এখানে স্বার্থ, দ্বন্দ্ব, কোলাহল নাই, আছে কেবল জ্ঞানের পিপাসা।" দ্র. 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, অষ্টম অধিবেশনের কার্যবিবরণ', বর্ধমান ১৩২২ ব.।

শাস্ত্রীমশায়ের এই অভিভাষণ ১৩২১ বঙ্গাব্দের চতুর্থ সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়', সম্মিলনের কার্য-বিবরণে (১৩২২ ব.) এবং ১৩২২-এর বৈশাখ সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকায় 'সাহিত্য সম্মিলন', ১৩২২-এর বৈশাখ সংখ্যা 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের গতি' ও ১৩২২-এর 'বিজয়া' পত্রিকায় 'সাহিত্য শাখার সভাপতি মহোদয়ের সম্বোধন' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পাঠ অনুসরণ করা হয়েছে।

১. দ্র. শাস্ত্রী, "রমাই পণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গল" সা-প-প, ১ম সংখ্যা ১৩০৪ ব.।

২. রঘুনন্দন গোস্বামীর জন্ম ১৭৮৬ খৃস্টাব্দে, বর্ধমান জেলার মাড়ো গ্রামে। 'শ্রীমদ্রামরসায়ন' বা 'রামরসায়ন' লেখেন আনুমানিক ১৮৩১ খৃস্টাব্দে। তাঁর 'রাধামাধবোদয়' কৃষ্ণলীলাকাব্য, রচনাকাল ১৮৪৯ খৃ.। এঁর সংস্কৃত রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'সদাচার-নির্ণয়', 'গোবিন্দ-চরিত', 'ভক্তলীলামৃত', 'গোবিন্দমাধবোদয়' ইত্যাদি। এই বইয়ে 'রাধামাধবোদয়' প্রবন্ধ দ্র.।

৩. সমকালীন সাহিত্য সম্পর্কে শাস্ত্রীমশায়ের এই মন্তব্যে, বিশেষ করে 'চুটকি' শব্দটি ব্যবহারে সাহিত্যিক মহলে বিতর্ক দেখা দেয়। অনেকে মনে করেন, এই শব্দ ব্যবহার করে তিনি রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাওয়ার সম্মান লাঘব করেছেন। ১৩২২-এর বৈশাখ সংখ্যা প্রবাসীতে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'অ!' নামে এক ব্যঙ্গ কবিতায় লেখেন—

"দেখ চুটকি সূত্র গোটা সত্তর
লিখিল সাঙ্খ্যকার,
তাই কন্‌ফারেন্সে ডায়াসের পরে
চেয়ার পড়েনি তার।

দাদা তিনটি ভালুমে লিখিলে মালুম
হইত এলেম যত,
আর দর্শন-শাখে হত যোগে-যাগে
শাখা-পতি অন্তত।...
ছিছি চুট্‌কি ঘৃণ্য দৈন্যের ধ্বজা
দুটি শুধু তার ভালো,
ওগো পণ্ডিত-শির নারীর চরণ
চুট্‌কিতে করে আলো!
ওরে এ দুটি চুট্‌কি রক্ষা করিয়া
রণে আগুয়ান হ,
আর চুট্‌কি-নিধনে চ' রে ভাই জিভে
দিয়ে খরশান।"

প্রবাসীর এই সংখ্যাতেই অভিভাষণটির সম্পর্কে দীর্ঘ মন্তব্য ছিল। তার 'চুট্‌কী ও বড়ো জিনিষ' উপশিরোনামে একটি অনুচ্ছেদ—

"আমরা চুট্‌কী সম্বন্ধে শাস্ত্রীমহাশয়ের কথায় সায় দিতে পারি। তবে ক্ষুদ্র রচনা মাত্রকেই চুট্‌কী বলিয়া অল্প-আদর বা অনাদর করিতে ইচ্ছা করি না। ভয়ে ভয়ে ইহাও বলি যে, যে কাব্যে বা যে রচনায় অনেক শব্দ নাই, যাহা বেশ লম্বা চৌড়া নয়, তাহা যে 'বড় জিনিষ' হইতে পারে না, এমন মনে করি না। এক গাদা খড়ের চেয়ে একটি ছোট প্রদীপের শিখা নানা অর্থে বড় হইতে পারে।"

হয়তো 'চুট্‌কি' শব্দটি ব্যবহারের জন্যেই ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল। না-হলে শাস্ত্রীমশায় যে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কখনোই বিরূপ ছিলেন না এই সংকলনের 'আশীর্বচন' ও 'বাংলা সাহিত্য, বর্তমান শতাব্দীর' মতো রচনায় তার প্রমাণ আছে। এ প্রসঙ্গে 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ' প্রথম খণ্ডের 'প্রারম্ভ-বচন'-এ শ্রীসুকুমার সেনের মন্তব্য দ্র.।

প্রবাসীর এই লেখারই 'রচনার বই' অংশে ক্ষোভের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ তোলা হয়—

"কমলাকান্তের দপ্তরে 'অতুল্য অমূল্য' জিনিষ থাকিতে পারে। কিন্তু পরিহাস ও তৎসদৃশ রসে ভরা অন্য ধরণের ভাল রচনা বাংলায় আরও আছে। কোন গ্রন্থ বা রচনাকে ভাল হইতে হইলে স্বদেশী বা বিদেশী আর কোনটির মত হইতে হইবে, এরূপ মনে হয় না।

"জীবিত লেখকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম করিতে সাহস হয় না; যদিও তাঁহার অনেক গদ্য রচনা খুব মূল্যবান্, অনুবাদেও সমজদার বিদেশীরাও তাহার মূল্য বুঝিয়াছেন। কেননা বঙ্গদেশে

রবিবাবুকে তুচ্ছজ্ঞান না করিলে বিজ্ঞ হওয়া যায় না। এইজন্য তাঁহাকে বাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করি, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ও কি ভাবিয়া চিন্তিয়া রচনা লিখেন নাই ?"

৪. ইংরেজ লেখক Sir Arthur Helps (১৮১৩-৭৫ খৃ.)। প্রাবন্ধিক এবং ঐতিহাসিক। রচিত বই *Thoughts in the Cloister and the Crowd* (১৮৩৫ খৃ.), *Essays Written in the Intervals of Business* (১৮৪১ খৃ.), *Conversations on War and General Culture* (১৮৭১ খৃ.)।

৫. ইংরেজি সাহিত্যের বিখ্যাত প্রাবন্ধিক Joseph Addison (১৬৭২-১৭১৯ খৃ.)। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তরের সঙ্গে Sir Roger de Coverly চরিত্র নিয়ে লেখা এডিসনের প্রবন্ধাবলীর সাদৃশ্যের সূত্রে এখানে এই বিদেশী লেখকের নাম শাস্ত্রীমশায়ের মনে এসে থাকবে।

৬. প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী, পৃথিবীর সমস্ত ভাষার ব্যাকরণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রচনা অষ্টাধ্যায়ীর লেখক পাণিনির জীবৎকাল অনিশ্চিত। বিভিন্ন গবেষকের সিদ্ধান্ত ধরে ঊর্ধ্বতম এবং নিম্নতম কালসীমা নির্দেশ করা যায় ৭০০ এবং ৩৫০ খৃস্টপূর্বাব্দ। পাণিনির জন্ম বর্তমান পশ্চিম-পাকিস্তানে আটক্-এর কাছে শালাতুর-এ। হিউএন-ৎসাঙ শালাতুরে পাণিনির মূর্তি প্রতিষ্ঠিত দেখেছিলেন। পাণিনির মায়ের নাম ছিল দাক্ষী। নানা প্রসঙ্গে শাস্ত্রীমশায় পাণিনি বিষয়ে আলোচনা করেছেন কিন্তু তাঁর সময় সম্পর্কে কোনো স্থির সিদ্ধান্ত করেন নি। দ্র. Shastri, *Birds' Eye View of Sanskrit Literature*, Calcutta 1917, p. 7. ; Shastri, *Magadhan Literature*, Lecture II, Patna 1923 ; *Sastri-Cat.*, Vol. VI, Preface, pp. xvi-xx.

৭. এই বইয়ের পৃ. ৩৪২ সূত্র ১ দ্র.

৮. সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরীর 'বঙ্গভাষার গতি' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৩২১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা 'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন' পত্রিকায়। ১৩২১-এর আষাঢ় সংখ্যা 'প্রবাসী'তে 'কষ্টিপাথর' পর্যায়ে এই প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছিল। প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক অংশ 'প্রবাসী' থেকে উদ্ধৃত হল—

"...আরবী, পারসী প্রভৃতি ভাষা হইতে যে সমস্ত শব্দ বঙ্গভাষায়

প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহাদের প্রায় সবগুলিই এখনও পরগাছার মত বঙ্গভাষার দেহে লাগিয়া আছে। আমাদের সাহিত্যের ও ভাষার গতি ও প্রকৃতি এক হইলে, বাংলাদেশের হিন্দু ও মুসলমানের সাহিত্য ও ভাষার মধ্যে কোন পার্থক্য না থাকিলে, ভাবের আদানপ্রদানের পক্ষে যে সুবিধা হইবে, তাহাতে অনেক প্রকৃত বা কল্পিত বিরোধ বিপ্লব যে কমিয়া যাইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

"মুসলমানের আদব কায়দা, ধর্ম্ম এবং সম্পর্কসূচক কয়েকটি শব্দ ত্যাগ করিলে মুসলমানের কথিত বাংলাও যা, হিন্দুরও তাই ; যা কিছু প্রভেদ কৃত্রিম ভাষায়, মাতৃভাষায় নহে ; যেখানে মুসলমান বা হিন্দু মাতৃভাষা না লিখিয়া পারসী বা সংস্কৃত-পড়া বিদ্যা ফলান সেখানে।

"...বঙ্গভাষার প্রসাধনের জন্য সংস্কৃতের একান্ত দরকার। কিন্তু বঙ্গভাষা তাহা দাসীর মত হাত পাতিয়া লইবে না ; সে তাহা তাহার আত্মমর্য্যাদার দিকটা বজায় রাখিয়াই লইবে। তেমনি মুসলমানও পারসী আরবী শব্দের বেলা করিবেন।... তাই বলিতেছিলাম যে বাংলা-ভাষাকে একদিকে সংস্কৃতাত্মিকা ও অপরদিকে পারসীশব্দবহুল করিবার চেষ্টাটা কিছু বেশী দূরে গড়াইয়াছে। মুসলমান রাজত্বের অবসানকালে লিখিত ভাষার মধ্যে বহু আরবী ও পারসীমূলক শব্দ প্রবেশ করিয়াছিল, কথিত ভাষায় ত কথাই নাই। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বের আরম্ভ হইতে যখন বঙ্গভাষার পুনর্গঠন হইতে থাকে, তখন আরবী ও পারসীমূলক শব্দগুলির দুর্দশা আরম্ভ হয়। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে রবিবাবু প্রমুখ প্রতিভাশালী লেখকগণ কথিত ভাষার প্রচুর শব্দ লিখিত ভাষায় প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাতে বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইয়াছে অথচ উচ্চভাব প্রকাশের কোন বাধা নাই। অধিকন্তু, লিখিত ও কথিত ভাষার পার্থক্য অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে।... সংস্কৃত-বহুল শব্দ যে-বাংলার আদর্শ, তাহা সংস্কৃতজ্ঞ হিন্দু পণ্ডিতের নিকট সহজ ও সরল বলিয়া বোধ হইলেও, সংস্কৃতানভিজ্ঞ মুসলমানের নিকট উহা পরের ভাষাই রহিয়া যায়। এই জন্যই কথিত ভাষাকে একটু মার্জ্জিত করিয়া আজকাল যে রচনা-রীতির প্রচলন হইতেছে তাহাই আমাদের নিজের ভাষা বলিয়া স্নেহপুষ্পাঞ্জলির অধিকারী। বঙ্গদেশের কোন কোন সহরে উর্দ্দুভাষী মুসলমান থাকিলেও, বিশাল বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের মাতৃ-ভাষা নিশ্চয়ই বাংলা।... ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে বঙ্গীয় মুসলমানের মধ্যে অল্প সংখ্যকই বিদেশাগত বংশসম্ভূত। অবশিষ্ট মুসলমানগণের পূর্ব্বপুরুষ এই বঙ্গেরই অধিবাসী হিন্দু ছিলেন।... অতএব বঙ্গভাষা তাহার আবির্ভাব-কাল হইতেই অধিকাংশ বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা

রূপে অধিষ্ঠিতা আছেন। বাঙ্গালী মুসলমানেরা বিদেশী মুসলমানদিগের সহিত আদানপ্রদান ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদি পাঠের ফলে বাংলাভাষার সহিত আরবী পারসী শব্দ মিশ্রিত করিতে আরম্ভ করেন ; অধিকন্তু সেকালে পারসী ভাষা জানার পরিচয় দেওয়া ভদ্রতার লক্ষণ ছিল ; ··· মুসলমান বাদশাহদিগের আমলে হিন্দুগণও আরবী ও পারসী ভাষার বিস্তর আলোচনা করিতেন। এই কারণে তাঁহাদেরও কথিত ভাষায়, এবং ক্রমে লিখিত ভাষাতেও প্রচুর আরবী ও পারসী শব্দ দাখিল হইয়া গিয়াছিল।···

"এই মিশ্রিত ভাষাতেই অনেক মুসলমান গ্রন্থকার ষোড়শ শতাব্দী হইতে গ্রন্থ রচনা করিয়া আসিয়াছেন। আলাওলের পদ্মাবতীর ভাষা যেমন কৃত্রিম, হিন্দুলেখকগণের ভাষাও তেমনি কৃত্রিম। কিন্তু হিন্দু পণ্ডিতগণ কথিত ভাষা হইতে ইহাদিগকে তাড়াইতে না পারিলেও, লিখিত ভাষা হইতে অসাধু বা 'যাবনিক' বলিয়া বর্জ্জন পূর্ব্বক বাংলা-ভাষাকে একরূপ মুসলমানী গন্ধশূন্য করিয়া তুলিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।··· হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্ম সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং আচার ব্যবহারেও অনেক প্রভেদ। অতএব উভয়ের মনের ভাব ব্যক্ত করিবার ধারায়ও পার্থক্য আছে ; এবং উভয়ের ভাষার গতি স্বতন্ত্র পথে ধাবিত হওয়াও বিচিত্র নহে। কিন্তু স্বতন্ত্রপথে ধাবিত হওয়ার জন্য ইহাদের মধ্যে যে উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়, তাহার সংযম সাধন করিয়া বাংলাদেশে, আমাদের মাতৃভূমিতে একই ভাষা প্রচলন করা একান্ত কর্ত্তব্য ; কেননা এই ভাষাসমন্বয়ের উপরই আমাদের ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করিতেছে।

"বঙ্গভাষাকে হিন্দু মুসলমানের উপযোগী করিতে হইলে তাহাদের এই কৃত্রিমতা দূর করিতে হইবে। মুসলমানের সামাজিক বা ধর্ম্মজীবনে বিশেষ বিশেষ ভাব প্রকাশার্থ আমরা এখন যে-সব শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিতেছি যাহা ভাষান্তরিত করা যায় না, এবং যাহা আমরা কোনরূপেই ত্যাগ করিতে পারি না, কেবল সেইগুলিকেই বাংলাভাষার বুকে স্থান দেওয়া ; এবং হিন্দুগণ যে-সব মুসলমানী শব্দ পূর্ব্ব হইতেই কথিত ভাষায় ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, বিচার ও বিবেচনা পূর্ব্বক তাহা লিখিত ভাষায় প্রচলিত করিয়া বাংলাভাষার সার্ব্বভৌমত্ব রক্ষা করা—ইহার বেশী আর কিছু আবশ্যক হইবে না।

"আমরা হিন্দু বাংলাও চাহি না, মুসলমানী বাংলাও চাহি না ; আমরা চাই খাঁটি বাংলা, যাহা বাংলার হিন্দু মুসলমান উভয়ে বুঝে। আমরা আরও কিছু চাই। আমরা চাই ভাষায় সরলতা।··· যে-সকল

ভাব প্রকাশের উপযুক্ত শব্দ বাংলায় প্রচলিত নাই, তাহা আমাদিগকে অবশ্যই সংস্কৃত বা অন্য কোন ভাষা হইতে ধার করিতে হইবে। তবে কথা এই, আমরা অযথা ধার করিব না। যেমন একই মালমসলা লইয়া পাকা ও আনাড়ি দুই মিস্ত্রি সুন্দর ও কুৎসিত দুই রকম ইমারত গড়ে, সেইরূপ লেখকের শক্তিভেদে এই সরল ভাষা দ্বারা সুন্দর বা কর্কশ রচনার সৃষ্টি হইবে। রচনা যদি অসুন্দর হয়, তাহা সরল ভাষার দোষ নহে।

"আর এক কথা। শব্দের অন্যায় বাড়াবাড়ি যেমন খারাপ, অক্ষরেরও তাই। বাংলায় যখন শ, ষ এবং হস্ত স্রাব ইত্যাদি শব্দে ছাড়া স-এর, ণ ন-এর, ঙ, এবং ঞ, ং এর উচ্চারণে কোন তফাৎ নাই, তখন সেগুলিকে রাখিয়া ছেলেপিলের অনর্থক মাথা খাওয়া কেন, তাহা বুঝি না। যখন প্রাকৃতে উচ্চারণ অনুসারে বানান হয়, তখন তাহার কন্যা বাংলায় কেন হইবে না?" ('প্রবাসী', আষাঢ় ১৩২১, পৃ. ৩৬১-৬৩)

৪. সম্বোধন

এবারকার সম্বোধনে আমি পুরানো বাংলার কথা কহিব। মুসলমান-দিগের বাংলায় আসিবার পূর্বে বাঙালিরা যে-সকল গান, ছড়া, দোহা লিখিয়াছিলেন, তাহারই কথা বলিব। গত বৎসর এই-সকলের কতক আভাস দিয়াছি, চারি জন পদকর্তার নাম, জীবনচরিত ও পদের বিষয়ে কিছু কিছু বলিয়াছি, এবার তাহাই একটু বিস্তার করিয়া বলিব। গত বৎসর যে দুই-একটা ভুল-ভ্রান্তি হইয়াছে, এবার তাহা শুদ্ধ করিয়া দিব। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি এখন যাহা বলিব, তাহা সবই একেবারে ঠিক ; কারণ, আমাদের সামগ্রী অল্প, পুথিপাঁজি অল্প পাওয়া গিয়াছে, পুথিপাঁজির খোঁজও অল্প হইয়াছে। অধিক পুথিপাঁজি হাতে আসিলে, অধিক খোঁজ হইলে এখন যাহা ঠিক বলিয়া মনে হইতেছে, তাহার অনেক বদলাইয়া যাইতে পারে।

যে-সকল পুথিপাঁজি পাওয়া গিয়াছে অথবা যে-সকল পুথিপাঁজির খোঁজ হইয়াছে, তাহাকে তিন ভাগ করা যাইতে পারে ; এক ভাগ সংকীর্তনের পদ, এক ভাগ দোহা ও এক ভাগ গাথা। গত বৎসর সংকীর্তনের চারি জন পদকর্তার নাম দিয়াছিলাম, তাঁহাদের জীবন-চরিতের কিছু কিছু ঘটনা দিয়াছিলাম ও তাঁহাদের গানের নমুনা দিয়া-ছিলাম। এবার তেত্রিশ জনের নাম দিব এবং তাঁহাদের জীবনচরিত সম্বন্ধে যাহা-কিছু জানা যায় দিব, এবং সম্ভব হইলে তাঁহাদের গানেরও নমুনা দিব।

গত বৎসর অনেকে সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, আমার তোলা গান-গুলি সব বাংলা নাও হইতে পারে। আমার যে সেরূপ সন্দেহ ছিল না, তাহাও নহে। সেইজন্য এ বৎসর আমি দুইটি কার্য করিয়াছি। একজন ফরাসিস্ পণ্ডিত তেঙ্গুরের ১০৮ হইতে ১৭৯ বাণ্ডিলে যত তন্ত্রের পুথি আছে, তাহার এক তালিকা দিয়া গিয়াছেন। ঐ তালিকায় গ্রন্থকারের নাম, তর্জমাকারের নাম, অনেক স্থলে যে স্থানে বসিয়া তর্জমা হয়, সেই স্থানের নাম এবং কয়েক স্থলে যাঁহারা এই তর্জমা শোধন করিয়াছেন, তাঁহাদেরো নাম দিয়া গিয়াছেন। যে ফরাসিস্ পণ্ডিত এই তালিকাটি ছাপাইয়াছিলেন, তাঁহার নাম P. Cordier[১]— তিনি

ফরাসডাঙার ডাক্তার সাহেব ছিলেন, তাঁহার সহিত আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি অনেক সময় আমার বাড়ি আসিতেন, আমিও অনেক সময় তাঁহার বাড়ি যাইতাম। তিনি এখান হইতে পাঁওচেরির ডাক্তার সাহেব হইয়া যান, সেখান হইতে প্যারি নগরে কিছু কাল বাস করিয়া আবার পূর্ব উপদ্বীপে ফরাসিদের যে রাজ্য আছে, তাহার ডাক্তার সাহেব হইয়া আসেন। অল্প দিন হইল, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ভারতবর্ষীয় ও তিব্বতীয় পুথিপাঁজির অনেক খোঁজ রাখিতেন। বৈদ্য-শাস্ত্রের পুথির উপর তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল। তিনি প্রায় চারি-পাঁচ শত বৈদ্য শাস্ত্রের পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার তালিকাতে যত গ্রন্থকার, তর্জমাকার, শোধক ও স্থানের নাম পাওয়া গিয়াছে, আমি তাহার একটি অকারাদিক্রমে সূচি প্রস্তুত করিয়াছি। সে সূচিতে যাঁহাকে বাঙালি অথবা বাংলাদেশের লোক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহার যদি বাংলা সংকীর্তনের পদ থাকে, সে পদ যে খাঁটি বাংলা, তাহা আমি নিশ্চয় করিয়া লইয়াছি। পরে তাঁহার সেই পদগুলিতে যত শব্দ পাওয়া গিয়াছে, অকারাদিক্রমে তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া সেকালের বাংলা ও একালের বাংলায় কী তফাত, তাহা দেখিয়া লইয়াছি। তাহাতে সেকালের বাংলার ব্যাকরণ ও অভিধান সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা হইয়াছে। সেই ধারণা লইয়া অন্য যে-সকল পদ পাইয়াছি, তাহারো অকারাদিক্রমে সূচি করিয়া লইয়া মিলাইয়াছি। তাহাতে যে-সকল পদ বাংলা বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহাকে বাংলা বলিতে কুণ্ঠিত হই নাই। একজন পদকর্তার বাড়ি উড়িষ্যা দেশে, তাঁহার গানটিও উড়িয়া ভাষায় লিখিত। তাহাতে বাংলায় যেখানে ক্রিয়ার শেষে 'ল' থাকে, তাহাতে সেখানে 'ড়' আছে ; যেমন 'গাহিল'— 'গাহিড়'। সে পদটিকে আমি উড়িয়া ভাষার পদ বলিয়া স্থির করিয়াছি। এইরূপে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে ফল হইয়াছে, তাহাই আজ আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি। অকারাদিক্রমে প্রতি পদকর্তার গানের প্রত্যেক কথার সূচি প্রস্তুত করিতে আমি দুই জন লোকের নিকট বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি। একজন শ্রীযুক্ত বাবু ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার ভ্রমণকারী পণ্ডিত, আর-একজন সাহিত্য-পরিষদের পুথিখানার মালিক, শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ [১৮৬৫-১৯৫২ খৃ.]।

বসন্তবাবুর বয়স কত জানি না, কিন্তু তাঁহার দাড়ি সব পাকিয়া গিয়াছে ; কিন্তু এ বয়সেও যেরূপ উৎসাহের সহিত সূচি প্রস্তুত বিষয়ে আমার সহায়তা করিয়াছেন, তাহা ভাবিলেও আশ্চর্য হইতে হয়। তিনি পরিষৎ হইতে ছুটি লইয়া রাত্রি দশটা এগারোটা পর্যন্ত আমার ওখানে কাজ করিয়াছেন। প্রাকৃত ভাষায়, উড়িয়া, হিন্দি, আসামি প্রভৃতি ভাষায় তাঁহার যে ব্যুৎপত্তি আছে, তাহাতেও আমার বিশেষ উপকার হইয়াছে।

১. লুইপাদ

একটু পুনরুক্তি-দোষ হইলেও গত বৎসর যে চারি জন পদকর্তার কথা কহিয়াছি, এবারেও তাঁহাদের কথা কিছু কিছু বলিতে হইবে। সে দোষ আপনারা লইবেন না। যে তেত্রিশ জন পদকর্তার নাম করিব, তাঁহাদের প্রথমেই লুইপাদের[১] নাম করিতে হয় ; কারণ তেঙ্গুরে বাঙালি বলিয়াই তাঁহার উল্লেখ আছে। তাঁহার সম্বন্ধে আর যে যে খোঁজ পাওয়া গিয়াছে, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি, সুতরাং এখানে বলিবার দরকার নাই। আমি স্থির করিয়াছি যে, তিনি রাঢ়দেশের লোক ছিলেন। তিনি এক নূতন সম্প্রদায় চালাইয়া যান। তাঁহাকে আদি সিদ্ধাচার্য বলে। তাঁহার সম্প্রদায়ের লোক সকলেই সিদ্ধ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তিনি যে বাঙালি, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। সংস্কৃতে তাঁহার চারিখানি পুস্তক আছে। একখানির নাম 'বজ্রসত্ত্ব-সাধন'— এখানি পুরুতের পুথি। একখানি 'বুদ্ধোদয়'— এখানি অতি ছোটো। তাঁহার নিজের মতে কী প্রকারে বুদ্ধের জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহারই কথা। বাকি দুখানি অভিসময়ের পুথি— একখানি 'শ্রীভগবদভিসময়', আর-একখানির নাম 'অভিসময়বিভঙ্গ'। দুখানিই বড়ো পুথি। অভিসময় বলিতে গেলে অভিধর্ম অর্থাৎ দর্শনশাস্ত্রের পুথি বুঝায়। হীনযানে যাহাকে অভিধর্ম বলে, মহাযানে তাহাকেই অভিসময় বলে। লুইপাদের অভিসময়ের পুস্তক দুখানি তাঁহার নিজের দর্শনশাস্ত্রের মত। এই দুইখানি ছাড়া তিনি একখানি বাংলা পুথি লিখিয়াছিলেন, তাহার নাম 'তত্ত্বস্বভাবদোহাকোষগীতিকাদৃষ্টি'। এ পুস্তকখানি আমরা পাই নাই, কিন্তু এখানি যখন দোহাকোষ, তখন

এখানি নিশ্চয় বাংলা। এতদ্ভিন্ন 'লুহি পাদগীতিকা' নামে তাঁহার একখানি বাংলা সংকীর্তনের পদাবলী আছে। উহার দুইটি পদ আমরা পাইয়াছি। উহাতে তিরানব্বইটি কথা আছে। উহার মধ্যে ষোলোটি সংস্কৃত শব্দ— সবগুলি আজও বাংলায় চল্তি আছে— যথা 'আগম', 'উদক', 'উহ', 'করণক', 'কাল', 'চণ্ডল', 'চিহ্ন', 'তরু', 'ন', 'পঞ্চ', 'পরিমাণ', 'বর', 'বোণি', 'ভাব', 'রে', 'সুখ'। চুয়াল্লিশটি বাংলা শব্দের প্রাচীন অবস্থা দেখাইতেছি ; যথা—'অচ্ছম', 'আহ্মে', 'আস', 'এড়িএউ', 'করিঅ', 'করিঅই', 'কাআ', 'কাহি', 'কাহেরে', 'কিষ', 'কীষ', 'কো', 'চান্দ', 'ছান্দক', 'জা', 'জাই', 'জাহের', 'জিম', 'তাহের', 'দিট', 'দিবি', 'দিস্' 'দুখেতেঁ', 'পতিআই', 'পাথ', 'পুচ্ছিঅ', 'বইঠা', 'বখানী', 'বট', 'বান', 'বান্ধ', 'বিলসই', 'ভণই', 'ভণি', 'ভাইব', 'ভিতি', 'মরিআই', 'মিচ্ছা', 'লই', 'লাহু', 'সাচ', 'সাণে', 'সো', 'হোই'। আটটি চলিত বাংলা— 'জান', 'জানি', 'ডাল', 'দুলকৃথ', 'পাটের', 'পাস', 'লাগে', 'সুনু', এই আটটি। প্রাকৃত শব্দ কুড়িটি— 'অইস', 'কইসে', 'চীএ', 'ণ', 'ণা', 'তীঅধাএ', 'দিঠা', 'নিচিত', 'পইঠো', 'পাণ্ডি', 'পিরিচ্ছা', 'বি', 'বিণাণা', 'বেএঁ', 'মই,' 'মহাসুহ', 'রায়', 'সংবোহেঁ', 'সঅল', 'সমাহিঅ', 'সুহ'। লুই ও লূই দুইটিই পদকর্তার নাম। 'ধমন' আর 'চমন' কী কথা, জানি না ; পারিভাষিক শব্দ বোধ হয়।

লুইয়ের গানে সম্বন্ধ-পদ 'র' দিয়াও হয়, আবার 'ক' দিয়াও হয়, যথা— 'করণক', 'পাটের'। অধিকরণ 'একার' দিয়াও হয়, 'তেঁ' দিয়াও হয়, যথা— 'চীএ', 'সাণে' ও 'দুখেতেঁ' ; 'এঁ' দিয়াও হয়, যথা— 'সম্বোহেঁ'। কর্তা ও কর্মে কোনো বিভক্তি নাই। 'পইঠো কাল' কোনো বিভক্তি নাই। 'সুনু পাখ ভিতি লাহুরে পাস'। 'গুরু পুচ্ছিঅ' ইত্যাদি।

২. কিলপাদ

লুইয়ের একজন বংশধর কিলপাদ। তিনি আচার্য এবং সিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার এক পুস্তক আছে 'দোহাচর্য্যাগীতিকাদৃষ্টি', এ পুস্তক আমরা পাই নাই, কিন্তু ইহা যে বাঙালির লেখা ও বাংলায় লেখা, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

৩. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের[৩] বাড়ি বাংলা দেশে। তিনি যে 'একবীরসাধন' ও 'বলিবিধি' নামে দুইখানি বই লিখিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট করিয়া বাঙালি বলিয়া তাঁহার নাম আছে। এক জায়গায় তিনি আচার্য, পিণ্ডপাতিক, বাঙালি, আর-এক জায়গায় তিনি মহাচার্য, ভিক্ষু ও বাঙালি। দুই জায়গায়ই তাঁহার ভুটিয়া নাম 'অতিশ' দেওয়া আছে। কিন্তু অনেক স্থলে তাঁহাকে ভারতবাসী বলিয়াও উল্লেখ করা আছে। যে-সকল জায়গায় ভারতবাসী বলিয়া তাঁহার নাম আছে, তাহার অনেক স্থানেও তাঁহার ভুটিয়া নামও দেওয়া আছে। অনেক স্থানে তাঁহাকে হয় কেবল আচার্য, কেবল উপাধ্যায় বা কেবল পণ্ডিত বলিয়া বলা আছে; সেখানে ভারতবাসীও নাই, বাঙালিও নাই। ইহাতে মনে হয় যে, দুই জন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ছিলেন। একজন সামান্য পণ্ডিত বা উপাধ্যায় ছিলেন, আর-একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন। ইনি বিক্রমশীল বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইঁহাকেই তিব্বতরাজ ১০৩৮ [১০৪০ খৃ.] সালে বিক্রমশীল হইতে তিব্বতে লইয়া গিয়াছিলেন। তথায় ইনিই বৌদ্ধধর্মের সংস্কার এবং বন-পা ধর্মের পুরোহিতদের প্রভাব খর্ব করিয়া দেন। ইনি একজন প্রকাণ্ড পুরুষ ছিলেন, অসাধারণ পণ্ডিত এবং অসাধারণ শক্তিশালী ছিলেন। তিব্বতে গিয়া ইঁহারই নাম 'অতিশা' হইয়াছিল। ইঁহাকেই কোনো কোনো তর্জমায় বঙ্গবাসী বলিয়াছে, কোনো কোনো তর্জমায় বা ভারতবাসী বলিয়াছে। কারণ, দুই ব্যক্তির ভারতবর্ষীয় নাম দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ও তিব্বতীয় নাম অতিশা হওয়া অনেকটা অসম্ভব। তাই আমরা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে বাঙালি বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। তাঁহার অনেকগুলি সংকীর্তনের পদাবলী ছিল। একখানির নাম 'বজ্রাসনবজ্রগীতি', একখানির নাম 'চর্য্যাগীতি' এবং একখানির নাম 'দীপঙ্করশ্রীজ্ঞানধর্ম্মগীতিকা'। আমার এই কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বঙ্গসাহিত্যের সৌভাগ্য বড়ো কম ছিল না। এত বড়ো প্রকাণ্ড পণ্ডিতও মাতৃভাষায় পদ রচনা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। আর আমাদের বাংলা গ্রন্থকারদের মধ্যে যদি সত্য সত্যই আমরা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের মতো জগদ্বিখ্যাত লোক পাই, সেটা কি আমাদের আনন্দের ও গৌরবের বিষয় নহে?

৪. শান্তিদেব

'শান্তিদেব' বা 'ভুসুকু' বা 'রাউতু'[৪] যে একজন লোক, তাহা আমি গত বৎসর প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। যে শান্তিদেব 'বোধি-চর্য্যাবতার', 'সূত্রসমুচ্চয়' ও 'শিক্ষাসমুচ্চয়' লিখিয়াছেন, তিনিই ভুসুকু, তিনিই ভুসুকু নামে একখানি বৌদ্ধস্মৃতি লিখিয়াছিলেন এবং তিনিই কতকগুলি চর্যাপদ লিখিয়াছিলেন। তিনি একটি চর্যাপদে লিখিয়াছেন—

"আজি ভুসু বাঙ্গালী ভইলী।
ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী ॥"

একটি চর্যাপদে তাঁহার এই পদটি দেখিয়া আমি তাঁহাকে বাঙালি বলিয়াছিলাম। আমাদের তেঙ্গুরের সূচিতে ভুসুকুর নাম নাই। শান্তি-দেবের নাম তিন জায়গায় আছে। 'শ্রীগুহ্যসমাজমহাযোগতন্ত্রবলিবিধি' নামক পুস্তকে তাঁহাকে 'সাহোর' নামক স্থানের লোক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। 'চিত্তচৈতন্যশমনোপায়' নামক একখানি পুস্তক তাঁহারই বংশধর মেকলের মত অনুসারে লেখা হয়। 'সহজগীতি' নামে তাঁহার একখানি কীর্তনের পদাবলী আছে। ইহাতে তাঁহাকে যোগীশ্বর বলিয়াছে। আমার বোধ হয়, আমরা ভুসুকুর নামে যে আটটি চর্যাপদ পাইয়াছি, তাহা এই যোগীশ্বর শান্তিদেবের 'সহজগীতি' হইতেই লওয়া হইয়াছে। এ শান্তিদেবের বাড়ি সাহোর বা জাহোর কোথায়, জানি না।[৫] তিনি "আজি ভুসু বাঙ্গালী ভৈলী" বলাতেই আমরা তাঁহাকে বাঙালি বলিয়া মনে করিয়াছি। জাহোর বা সাহোর বাংলারই কোনো অজ্ঞাত নগর হইবে। তাঁহার আটটি গান তাঁহার নাম ভুসুকু বাদে ৩২৩টি কথা আছে। ইহার মধ্যে ৩৭টি সংস্কৃত; ৬৮টি বিকৃত সংস্কৃত, ১৮৬টি পুরানো বাংলা ও ৩২টি চলিত বাংলা।

সাঁইত্রিশটি সংস্কৃত শব্দের মধ্যে 'সমরস', 'সহজানন্দ' ও 'বিরমানন্দ' বৌদ্ধধর্মের শব্দ, বাকিগুলি ঠিক এইভাবে আজিও চলিতেছে। কেবল 'উহ' চলে না, কিন্তু 'উহ্য' চলে; 'খ' চলে না, 'কিং' চলে না, 'মা' চলে না। বাকিগুলি বেশ চলে। বাংলা বত্রিশটি তো চলেই, বাংলার পূর্বাভাষ যে ১৮৬টি কথা আছে, তাহা সেকালের বাংলায় চলিত। বাকি যে ৬৮টি কথা, ভুসুকু তাহার সংস্কৃত উচ্চারণ বদলাইয়াছেন, তাহারো অধিকাংশ প্রাচীন বাংলায় চলিত। ইহার মধ্যে অনেকগুলি

কেবল বানান বদলানো মাত্র— যেমন 'ষষহর', 'ষহজ', 'সসর', 'সেস'। এগুলি লেখকের ভুল হইতে পারে, অথবা সেকালের লোক বানানটা বড়ো গ্রাহ্য করিত না। সম্বন্ধের বিভক্তি 'র', অধিকরণের বিভক্তি 'এ' বা 'এঁ' সম্পূর্ণ বাংলা। 'হিঅহিঁ', 'রহিঁ' মাগধীর অধিকরণ কারক। 'অচ্ছসি'র মধ্যমপুরুষের একবচনে 'সি' প্রাচীন বাংলায় ব্যবহার হইত। অনুজ্ঞায় 'অচ্ছহু'র 'হু'ও প্রাচীন বাংলায় দেখা যায়, 'জানমি'র উত্তম পুরুষের 'মি'ও প্রাচীন বাংলায় অনেক স্থলে দেখা যায়। সুতরাং ভুসুকুর ভাষা আমরা অনায়াসেই প্রাচীন বাংলা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

৫. কৃষ্ণপাদ

কৃষ্ণপাদ, কৃষ্ণাচার্য, কৃষ্ণবজ্র বা কাহ্নুপাদ[৬] সর্বসুদ্ধ ৫৭খানি বই লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার মধ্যে দুইখানি বাংলা, একখানি দোহাকোষ, আর-একখানি 'কাহ্নুপাদ-গীতিকা'। আমরা কৃষ্ণাচার্যের ১২টি সংকীর্তনের পদ পাইয়াছি। কিন্তু তিনি কোন্ দেশের লোক. তাহা লইয়া বিশেষ গোল আছে। তেঙ্গুরে পনেরো জায়গায় তাঁহাকে ভারতবাসী বলিয়া গিয়াছে। কেবল এক জায়গায় লেখা— তিনি ব্রাহ্মণ, উড়িষ্যা হইতে আগত, সেও আবার তর্জমাকার মহাপণ্ডিত কৃষ্ণ, তিনি গ্রন্থকার নহেন। সুতরাং তেঙ্গুরের লেখা হইতে পদকর্তা কৃষ্ণের বাসস্থান নির্ণয় হইবে না। তাহার পর আবার কৃষ্ণ, কানু অনেক লোকের নাম হইতে পারে। এই যে ৫৭খানি গ্রন্থের গ্রন্থকার একই কৃষ্ণ, তাহাই বা কে বলিতে পারে? কোনো জায়গায় কৃষ্ণকে মহাচার্য বলা হইয়াছে, কোনো জায়গায় মহাসিদ্ধাচার্য, কোনো জায়গায় উপাধ্যায়, কোনো জায়গায় মণ্ডলাচার্য বলা হইয়াছে। এক জায়গায় আবার তাঁহাকে ছোটো কৃষ্ণ বলা হইয়াছে। পাঁচ জায়গায় তাঁহাকে কৃষ্ণাচার্য বা কাহ্নুপাদ বলা হইয়াছে। সুতরাং তেঙ্গুর হইতে যখন তাঁহার বাড়ি ঠিক হইল না, তখন তাঁহার ভাষা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিতে হইবে। তাঁহার গানগুলিতে সর্বসুদ্ধ ৪৩৮টি শব্দ আছে। ইহার মধ্যে সংস্কৃত শব্দ ৬৮টি। তাহার মধ্যে চারটি বৌদ্ধ শব্দ, যথা— 'এবংকার', 'তথতা', 'তথাগত' আর 'দশবল'। আর তিনটি কথা বাংলায় চলিত নাই, যথা— 'উ', 'মা' ও 'ভবপারিচ্ছিন্না', বাকি ৬০টি

শব্দ এখনো বাংলায় চলিতেছে। ৫৫টি চলিত বাংলা কথা বাংলাতেই চলে, অন্য কোনো নিকটবর্তী ভাষায় চলে না। ১৮৬টি শব্দ আমরা বাংলা পুরানো পুথিতে দেখিতে পাই— এখনকার বাংলায় এই-সকল শব্দ হইতে উৎপন্ন শব্দ চলিতেছে, যেমন— 'বোব্'=বোবা, 'বোল'= বুলি, 'ভলি'=ভাল, 'দেহু'=দে, 'মালী'=মালা ইত্যাদি। সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, অথচ বাংলায় প্রচলিত নাই, এমন ১২৯টি শব্দ আছে। উহার মধ্যে কতগুলি শব্দ যথা— 'আইস', 'কৈসন', 'কইসেঁ' ইত্যাদি পুরানো বাংলায় চলিত ছিল, কিন্তু তাহা হইতে উৎপন্ন কোনো শব্দ এখন বাংলায় চলিত নাই, বরং নিকটবর্তী ভাষায় চলিত আছে।

এই-সকল দেখিয়া পদকর্তা কৃষ্ণপাদ বা কাহ্নুপাদের ভাষা বাংলা বলিতে কুণ্ঠিত হইবার কারণ দেখি না। চলিত বাংলার মধ্যে 'ছিনালী', 'জৌতুক', 'টাল' প্রভৃতি শব্দ একেবারেই বাংলা ভিন্ন ব্যবহার হয় না।

আলি এঁ কালি এঁ বাট রুন্ধেলা।
তা দেখি কাহ্নু বিমন ভইলা॥
কাহ্নু কহিঁ গই করিব নিবাস।
জো মন গোঅর সো উআস॥...

জে জে আইলা তে তে গেলা।
অবণা গবণে কাহ্নু বিমন ভইঈলা॥

কৃষ্ণাচার্য বা কাহ্নুপাদের বংশধরেরা অনেকেই বাংলায় গান ও দোহা লিখিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে সরহ, ধর্মপাদ, ধেতন, মহীপাদের বাংলা গান আমরা পাইয়াছি।

৬. ধামপাদ বা ধর্মপাদ

ধামপাদের আর-এক নাম গুণ্ডড়ীপাদ। মূল গানে ধামপাদ থাকিলেও পুথিতে তাঁহার গানের মাথায় তাঁহাকে গুণ্ডড়ীপাদ বলা হইয়াছে। তাঁহার গানের মধ্যে আমরা দুইটি পদ পাইয়াছি।[৭] এই দুইটিতেই ৯২টি শব্দ আছে। তার মধ্যে ২১টি সংস্কৃত, ইহার মধ্যে একমাত্র 'মণিকুল' শব্দটি বৌদ্ধ, আর সবগুলিই বাংলায় চলিত আছে। সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ১৪টি শব্দ আছে। সে-সকল শব্দ বাঙালির বুঝিবার কোনো ক্লেশ হয় না, যথা— ধুম=ধূম, ণবগুণ=নবগুণ,

মুহ=মুখ, বাম্ম=ব্রাহ্ম, সুজ=সূর্য ইত্যাদি ; কেবল একটু বানানের পরিবর্তন। ৪৪টি পুরানো বাংলা কথা আছে, তার মধ্যে 'কুন্দুরে' একটি বৌদ্ধ শব্দ, বাকিগুলি পুরানো বাংলায় পাওয়া যায়। তেরোটি চলিত বাংলা, সবগুলি কথাবার্তায় চলে। ধর্মপাদের বাংলা বইয়ের নাম 'সুগতদৃষ্টিগীতিকা'।

জোইণি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি ॥

এইগুলিতে যেন বৈষ্ণব কবির ঝংকার পাওয়া যায়।

৭. ধেতন বা ঢেণ্‌ঢণ

ভোটবাসীরা ঢেণ্‌ঢণ উচ্চারণ করিতে পারে না বলিয়া ধেতন বলিয়াছে। ইঁহার একটি গান পাওয়া গিয়াছে— তাহাতে ৪৩টি শব্দ আছে। তাহার মধ্যে ৩টি সংস্কৃত, উহা আজও চলিত আছে, ৩টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, বেশ বুঝা যায়। ২৪টি পুরানো বাংলা এবং ১৩টি চলিত বাংলা, কথাবার্তায় চলে।

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেশী।
হাড়ীত ভাত নাহিঁ নিতি আবেশী ॥
বেঙ্গ সংসার বড্‌হিল জাঅ।
দুহিল দুধু কি বেণ্টে ষামায় ॥
বলদ বিআএল গবিআ বাঁঝে।
পিটা দুহিএ এ তিনা সাঁঝে ॥
জো সো বুধী সো ধনি বুধী।
জো ষো চৌর সোই সাধী ॥
নিতে নিতে ষিআলা ষিহে ষম জুঝঅ।
ঢেণ্ঢণ পাএর গীত বিরলে বুঝঅ ॥

৮. মহীধর বা মহীপাদ

ইঁহার একটি গান পাওয়া গিয়াছে, উহাতে ৬৩টি কথা আছে। তার মধ্যে ১৪টি সংস্কৃত, সবগুলি বাংলায় চলে। সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ১৩টি শব্দ। পুরানো বাংলা ৩৪টি এবং এখনকার চলিত

বাংলা ৩টি শব্দ আছে। ইঁহার গ্রন্থের নাম 'বায়ুতত্ত্বগীতিকা' [বায়ুতত্ত্বদোহাগীতিকা']।

তিনি এ' বাটে লাগেলি রে অণহ কসণ ঘণ গাজই।
তা সুনি মার ভয়ঙ্কর রে সঅ মণ্ডল সএল ভাজই ॥

৯. সরহ বা সরোরুহবজ্র

ইনি সরোজবজ্র, পদ্ম, পদ্মবজ্র ও রাহুলভদ্র নামে পরিচিত।[৮] ইঁহার অনেকগুলি দোহাকোষ ও গীতিকা আছে। একখানির নাম 'দোহাকোষগীতি', একখানির নাম 'দোহাকোষচর্য্যাগীতি', একখানির নাম 'দোহাকোষউপদেশগীতি'। 'দোহাকোষমহামুদ্রোপদেশ', 'ভাবনা-দৃষ্টিচর্য্যাফলদোহাকোষগীতিকা', 'মহামুদ্রোপদেশবজ্রগুহ্যগীতি', 'ডাকিনী-বজ্রগুহ্যগীতি', 'তত্ত্বোপদেশশিখরদোহাগীতি' পুথিগুলিও তাঁর।

আমরা ইঁহার ৪টি চর্যাগীতি পাইয়াছি। ২৪টি সংস্কৃত শব্দ আছে, সবগুলিই বাংলায় চলিতেছে। সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ৩৫টি শব্দ আছে, তাহার অল্পবিস্তর বানান বদলাইলেই সংস্কৃত হইয়া যায়। ৯৫টি পুরানো বাংলা কথা আছে ও ২৮টি চলিত বাংলা শব্দ আছে।

অপণে রচি রচি ভবনির্বাণা।
মিছে লোঅ বন্ধাবএ অপনা ॥
অম্হে ন জাণহু' অচিন্ত জোই।
জাম মরণ ভব কইসণ হোই ॥
জইসো জাম মরণ বি তইসো।
জীবন্তে মঅলেঁ ণাহি বিশেসো ॥
জাএথু জাম মরণে বিসঙ্কা।
সো করউ রস রসানেরে কংখা ॥

সরোরুহবজ্রের দোহাকোষের কথা আমরা গত বৎসর বলিয়াছি, তাই এ বৎসর বলিব না। কিন্তু তিনি যে একখানি দোহাকোষ লিখিয়াছিলেন, এমন নহে; তিনি অনেকগুলি দোহা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার একখানি দোহার নাম 'কখস্য দোহা' ইহার টীকাও তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কয়েকটি গাথাও আছে। ইনি সেকালে অনেক বই লিখিয়া গিয়াছেন, সংস্কৃতে ইঁহার তান্ত্রিক পুস্তক অনেকগুলি আছে।

১০ কম্বলাম্বরপাদ

ইঁহাকে কখনো কখনো শুদ্ধ কম্বল এবং বাংলায় কামলি বলিয়া থাকে।[৯] ইনি 'প্রজ্ঞাপারমিতাউপদেশ' নামে একখানি মহাযানের পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ইঁহার অধিকাংশ পুস্তকই বজ্রযান-সম্প্রদায়ের জন্য লেখা। ইনি নিজে যুগনদ্ধ হেরুকের উপাসনা করিতেন এবং ঐ উপাসনাক্রম লিখিয়া গিয়াছেন। ইঁহার বাংলা পুস্তকের নাম 'কম্বলগীতিকা'। আমি ইঁহার একটি গান পাইয়াছি; তাতে ৪টি সংস্কৃত শব্দ আছে; 'করুণ', 'বহু', 'বাস', 'সদগুরু'; সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন শব্দ চারিটি আছে— 'উই', 'কইসে', 'গঅণ', 'মহাসুহ'। চলিত বাংলা ৯টি— 'উপাড়ি', 'কি', 'কে', 'গেলি', 'চাপি', 'নাহি', 'মেলিল', 'মেলিমেলি', 'মিলিল'। আর পুরানো বাংলা ২২টি।

খুণ্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছি।
বাহতু কামলি সদগুরু পুচ্ছি ॥

কম্বলাম্বরের এক শিষ্যের নাম প্রজ্ঞারক্ষিত, ইনিও কম্বলের মতানুসারে বজ্রযানের অনেক পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন।

১১. কঙ্কণ

ইনি কম্বলাম্বরের বংশধর; 'চর্য্যাদোহাকোষগীতিকা' নামে ইঁহার একখানি পুথি আছে। ইঁহার একটি গান পাইয়াছি, তাতে চারিটি সংস্কৃত শব্দ, ৮টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ১৯টি পুরানো বাংলা ও ৮টি চলিত বাংলা কথা আছে। উহার মধ্যে বিহাণ=প্রাতঃকাল, থাকি, সুন=শূন্য।

১২. বিরূপ

ইনি সিদ্ধাচার্য ও যোগীশ্বর ছিলেন।[১০] ইনি বজ্রযান ও কালচক্রযানের পুস্তক লিখিয়াছেন। ইঁহার একখানি পুস্তকের নাম 'ছিন্নমস্তাসাধন', আর-একখানির নাম 'রক্তযমারি-সাধন'। ইঁহার চারখানি গানের বই আছে; 'বিরূপগীতিকা', 'বিরূপপদচতুরশীতি', 'কর্ম্মচণ্ডালিকাদোহাকোষগীতি', 'বিরূপবজ্রগীতিকা'। ইঁহার একটি মাত্র গান পাইয়াছি; তাতে ৬টি সংস্কৃত শব্দ, ২টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন,

১৯টি পুরানো বাংলা ও ১২টি চলিত বাংলা কথা আছে। গানের নমুনা—

এক সে শুণ্ডিণি দুই ঘরে সান্ধঅ।
চীঅণ বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ ॥
সহজে থির করি বারুণী সান্ধে।
জেঁ অজরামর হোই দিট কান্ধে ॥
দশমি দুআরত চিহ্ন দেখইআ।
আইল গরাহক অপণে বহিআ ॥

১৩. শান্তি

সিদ্ধাচার্য শান্তির[১১] আমরা দুইটি গান পাইয়াছি। তেঙ্গুরে অনেকগুলি শান্তির নাম আছে, তিনি যে কোন্ শান্তি, তা বলিতে পারি না। একখানি 'সহজগীতি' আছে, সেখানি শান্তিদেবের। এই শান্তিদেবই যে ভুসুক বা রাউতু, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই; কারণ, একখানি অতি পুরাতন তালপাতার পুঁথিতে তাঁহাকে ভুসুকু ও রাউতু এই দুইটি নাম দিয়াছে। সুতরাং সিদ্ধাচার্য শান্তি কে, আমরা স্থির করিতে পারি না। দশম শতকে রত্নাকরশান্তি নামে একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিলেন, তিনি বিক্রমশীলার দ্বার রক্ষা করিতেন। তাঁহার অনেক পুস্তক আছে। ন্যায়শাস্ত্রের অতি গূঢ় কথা যে অন্তর্ব্যাপ্তি, তিনি তারও উপর বই লিখিয়া গিয়াছেন। বজ্রযান ও কালচক্রযানের উপর তাঁহার অনেক পুস্তক ছিল। সহজযানের উপরও তিনি 'সহজ-রতিসংযোগ' ও 'সহজযোগক্রম' নামে দুইখানা বই লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি যদি আমাদের পদকর্তা শান্তি হন, তবে পদকর্তাদের মধ্যে আমরা আর-একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত পাইলাম। ইনি যে রত্নাকরশান্তি, তাহা মনে করিবার কারণ এই যে, 'সুখদুঃখদ্বয়পরিত্যাগদৃষ্টি' নামে তেঙ্গুরে যে সহজযানের গ্রন্থের উল্লেখ দেখিতে পাই, তাতে সিদ্ধাচার্য শান্তিকেই রত্নাকরশান্তি বলা হইয়াছে। শান্তির দুইটি গানে অতি সহজ সংস্কৃত শব্দ ১৩টি, সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ১৯টি, প্রাচীন বাংলা ৫৫টি, আর চলিত বাংলা ১৩টি শব্দ আছে।

তুলা ধুণি ধুণি আঁসুরে আঁসু।
আঁসু ধুণি ধুণি ণিরবর সেসু ॥

তউষে হেরুঅ ণ পারি অই।
শান্তি ভণই কিণ সভাবি অই॥
তুলা ধুণি ধুণি সুনে অহারিউ
পুণ লইআঁ অপনা চটারিউ।
বহল বট দুই মার ন দিশঅ
শান্তি ভণই বালাগ ন পইসঅ॥
কাজ ন কারণ জএহু জঅতি
সঁ এ॰ সঁবেঅণ বোলথি সান্তি॥

এই গানে একটি 'বোলথি' শব্দ আছে। আমরা যতগুলি গান পাইয়াছি, তার মধ্যে এক জায়গায় মাত্র এই কথাটি পাই। 'থি' দিয়া আর একজন মাত্র ক্রিয়াপদ করিয়াছেন।

১৪. সবরপাদ বা শবরীশ্বর[১২]

ইঁহার অনেকগুলি সংস্কৃত পুঁথি আছে। ইঁহার একখানি পুঁথির নাম 'বজ্রযোগিনীসাধন', উড়িষ্যার রাজা ইন্দ্রভূতি বজ্রযোগিনীর উপাসনা প্রচার করেন। তাঁহার কন্যা লক্ষ্মীঙ্করা[১৩] এই বিষয়ে তাঁহাকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃতে অনেক পুস্তক লিখিয়াছিলেন। শবরীশ্বর বা সবর সেই দলেরই লোক ছিলেন। তিনি বজ্রযোগিনী সম্বন্ধে পাঁচখানি বই লিখিয়াছিলেন; গীতি-সম্বন্ধে তাঁর দুই খানি পুস্তক আছে; একখানির নাম 'মহামুদ্রাবজ্রগীতি' আর-একখানির নাম 'চিত্তগুহ্যগম্ভীরার্থগীতি'। 'শূন্যতাদৃষ্টি' নামে তাঁর আর-একখানি বই আছে। আমরা তাঁহার দুইটি বড়ো বড়ো গান পাইয়াছি। এই দুইটি গানে ২৩টি সংস্কৃত শব্দ আছে, ১৭টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ৮৫টি পুরানো বাংলা ও ২৫টি নূতন বাংলা কথা আছে।

উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরীমালী॥
উমত সবরো পাগল শবরো মা কর গুলা গুহাডা তোহোরি।
ণিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দারী॥
ণাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী॥

১৫. চাটিল

চাটিলের[১৪] নাম তেঙ্গুরে নাই, অথচ তাঁর একটি সুন্দর গান পাইয়াছি। উহাতে ১১টি সংস্কৃত, ৮টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ২৫টি পুরানো বাংলা ও ২টি চলিত বাংলা শব্দ আছে।

ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দুআন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী॥
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গটই।
পারগামি লোঅ নিভর তরই॥

১৬. আর্যদেব

আর্যদেব নামে মহাযান-মতের একজন বড়ো লেখক ছিলেন। তিনি খৃস্টীয় তিন শতকে অনেকগুলি সংস্কৃত বই লিখিয়া মহাযান-মতকে উচ্চ হইতে অতি উচ্চে তুলিয়া গিয়াছেন। আমাদের আর্যদেব তিনি নন। আমরা আর্যদেবের একটি গান পাইয়াছি। উহাতে ২টি সংস্কৃত, ৯টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ২৫টি পুরানো বাংলা ও দুইটি চলিত বাংলা কথা আছে। আমাদের আর্যদেব (বা আজদেব) কাণেরিন্ বা বৈরাগীনাথ নামে অনেক স্থলে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার 'কাণেরীগীতিকা' নামে একখানি বই আছে। নমুনা—

চান্দরে চান্দকান্তি জিম পতিভাসঅ।
চিঅ বিকরণে তহি টলি পইসই॥
ছাড়িঅ ভয় ঘিণ লোআচার।
চাহন্তে চাহন্তে সুণ বিআর॥

১৭. দারিক

দারিক[১৫] কালচক্র, চক্রশম্বর, বজ্রযোগিনী, কঙ্কালিনী প্রভৃতি দেবদেবী সম্বন্ধে অনেকগুলি বই লিখিয়াছেন। তথতাদৃষ্টি শ্রীপ্রজ্ঞা-পারমিতার উপরও তাঁর পুস্তক আছে। তিনি একটি গানে লুইকে প্রণাম করিতেছেন, তাতে মনে হয়, তিনি লুইয়ের শিষ্য ছিলেন।

ঐ গানটিতে ১০টি সংস্কৃত, ১২টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ২৮টি পুরানো বাংলা ও ২টি চলিত বাংলা শব্দ পাইয়াছি।

সুন করুণরি অভিন বারেঁ কাঅবাক্ চিঅ
বিলসই দারিক গঅণত পারিমকুলেঁ।...
রাআ রাআ রাআরে অবর রাঅ মোহেরা বাধা।
লুইলাঅ পএ দারিক দ্বাদশ ভুঅণেঁ লধা॥

১৮. জয়নন্দী

জয়নন্দীর নাম তেঙ্গুরে নাই। উঁহার একটি গান পাইয়াছি; উহাতে ৭টি সংস্কৃত, ১২টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ও ২৩টি পুরানো বাংলা শব্দ আছে।

চিঅ তথাতা স্বভাবে ষোহিঅ।
ভণই জঅনন্দি ফুড় অণ ণ হোই॥

১৯. তাড়কপাদ

ইঁহার আমরা একটি গান পাইয়াছি: তাতে ৮টি সংস্কৃত, ২১টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ২১টি পুরানো বাংলা ও ৫টি চলিত বাংলা কথা আছে। গানের নমুনা—

অপণে নাহিঁ সো কাহেরি শঙ্কা।
তা মহামুদেরী টুটি গেলি কংখা॥
অনুভব সহজ মা ভোলরে জোই।
চৌকোটি বিমুকা জইসো তইসো হোই॥

২০. ডোম্বী

ডোম্বী হেরুক[১৬] নামে মগধের একজন রাজা ছিলেন, তিনি সন্ন্যাসী হইয়া যান। তাঁহাকে কখনো আচার্য, কখনো মহাচার্য ও কখনো সিদ্ধ বলা হইয়াছে। তিনি বজ্রযান ও সহজযান সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়াছেন। 'ডোম্বীগীতিকা' নামে তাঁহার এক সংকীর্তনের পদাবলী আছে। আমরা তাঁহার একটি মাত্র গান পাইয়াছি। তাতে

৬টি সংস্কৃত, ৬টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ৪০টি পুরানো বাংলা ও ৯টি চলিত বাংলা কথা আছে।

তিনি ভুথণ মই বাহিঅ হেলেঁ।
হাঁউ সুতেলি মহাসুহ লাড়েঁ॥
কইসণি হালো ডোম্বী তোহোরি ভাভরিআলী।
অন্তে কুলিণ জণ মাঝেঁ কাবালী॥

২১. ভাদেপাদ[১৭]

আমরা ইঁহার একটি গান পাইয়াছি ; তাতে ৪টি সংস্কৃত, ৭টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ২৪টি পুরানো বাংলা ও ৫টি চলিত বাংলা কথা আছে।

এত কাল হাঁউ অচ্ছিলেঁ স্বমোহেঁ।
এবেঁ মুই বুঝিল সদ্‌গুরুবোহেঁ॥
এবেঁ চিঅরাঅ মকুঁ ণ ঠা।
গণ সমুদে টলিআ পইঠা॥

২২. বীণাপাদ[১৮]

ইনি বিরূপের বংশধর। ইনি বজ্রডাকিনী দেবীর গুহ্য পূজার পুস্তক লিখিয়াছেন। আমরা ইঁহার একটি গান পাইয়াছি। উহাতে ১০টি সংস্কৃত, ৫টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ২৪টি পুরানো বাংলা ও ৫টি চলিত বাংলা কথা আছে। ইনি 'সন্ধ্যাভাষায়' বীণা অবলম্বনে এই গানটি লিখিয়াছেন।

সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।
অণহা দাণ্ডী বাকি কিঅত অবধুতী॥
বাজই অলো সহি হেরুঅ বীণা।
সুন তান্তি ধনি বিলসই রুণা॥

২৩. কুক্কুরীপাদ[১৯]

ইনি মহামায়ার উপাসক ছিলেন এবং অনেকগুলি বজ্রযানের পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার দুইটি গান পাইয়াছি ;

তাতে ৯টি সংস্কৃত, ৭টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন. ৫৯টি পুরানো বাংলা ও ১৪টি চলিত বাংলা কথা আছে। আমরা যে-সকল ক্রিয়াপদের শেষে 'ল' বলি, ইনি প্রায় সে সমস্ত স্থলে 'ড়' ব্যবহার করিয়াছেন এবং 'ভণতি'র স্থলে 'ভণথি' করিয়াছেন।

দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই।
রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ॥
আঙ্গন ঘরপণ সুন ভো বিআতী।
কানেট চৌরি নিল অধরাতী॥
অইসন চর্য্যা কুক্করী পাএ গাইড়।
কোড়ি অ মাঝে জতএকু সনাইড়॥

২৪. অদ্বয়বজ্র২০

ইঁনি অনেকগুলি বাংলা বই লিখিয়া গিয়াছেন; ইঁহার বাড়ি বাংলায় ছিল। ইহার প্রধান বাংলা গ্রন্থ 'দোহানিধিকোষপরিপূর্ণগীতি-নামনিজতত্ত্বপ্রকাশটীকা', 'দোহাকোষহৃদয়অর্থগীতাটীকানাম', 'চতুরবজ্র-গীতিকা'। সুতরাং অদ্বয়বজ্র বৌদ্ধসংকীর্তনের একজন পদকর্তা ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা এ পর্যন্ত তাঁহার একটি বাংলা গানও পাই নাই।

২৫. লীলাপাদ

ইঁনি 'বিকল্পপরিহারগীতি' নামে বৌদ্ধকীর্তনের একখানি পদাবলী তৈয়ারি করিয়াছেন। গ্রন্থখানির অনুবাদ তেঙ্গুরে আছে।

২৬. স্থগণ

ইঁনি কার্ণেরিন্ বা আর্যদেবের বংশধর। ইঁনি রত্নাকরশান্তি লিখিত একখানি সহজযানের গ্রন্থের টীকা লিখিয়াছেন। এ'র বাংলা বইয়ের নাম 'দোহাকোষতত্ত্বগীতিকা'।

২৭. মৈত্রীপাদ

'গুরুমৈত্রীগীতিকা' নামে ইঁহার একখানি বাংলা পদাবলী আছে।

২৮. গুরুভট্টারক ধৃষ্টিজ্ঞান

ইঁহার দুইখানি বাংলা পদাবলী আছে। একখানির নাম 'বজ্র-গীতিকা', আর-একখানির নাম 'গীতিকা'।

২৯. মাতৃচেট

ইনি মহাযান-সম্প্রদায়ের একজন বড়ো গুরু। তাঁহার 'কণিকলেখ' ইতিহাস প্রসিদ্ধ। আমরা যে মাতৃচেটের কথা বলিতেছি, ইনি তাঁহার অন্তত সাত শত বৎসরের পরের লোক। ইঁহার বৌদ্ধসংকীর্তনের পদাবলীর নাম 'মাতৃচেটগীতিকা'।

৩০. বৈরোচন

বৌদ্ধদিগের মধ্যে বৈরোচন নাম প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহাদিগের মধ্যে একজনের 'আচার্য্য বৈরোচনগীতিকা' নামে পদাবলী আছে।

৩১. নাড় পণ্ডিত

নাড় পণ্ডিতকে[২১] ভুটিয়ারা নারো বলে। ভুটিয়ারা ইঁহাকে সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া পূজা করিয়া থাকে। ওয়াডেল সাহেব তাঁহার ভুটিয়া বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে নাড় পণ্ডিতের চেহারা দিয়াছেন। গোঁফ-দাড়ি কামানো, মাথায় লম্বা চুল, ঠিক যেন আমাদের এখনকার বাউল-সম্প্রদায়ের লোক। ইনি হেরুক ও হেবজ্র প্রভৃতি যুগনদ্ধমূর্তির উপাসক ছিলেন। ইঁহার প্রভাব এক কালে ভারতবর্ষ ও তিব্বতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইঁহার তিনখানি পদাবলী আছে, দুইখানির নাম 'বজ্রগীতিকা', আর-একখানির নাম 'নাড়পণ্ডিতগীতিকা'।

৩২. মহাসুখতাবজ্র

ইনি 'শ্রীতত্ত্বপ্রদীপতন্ত্রপঞ্জিকারত্নমালা' নামে তত্ত্বপ্রদীপের একখানা টীকা লেখেন। ইঁহার পদাবলীর নাম 'মহাসুখতাগীতিকা'।

৩৩. নাগার্জুন[২২]

মহাযান-সম্প্রদায় প্রবর্তক এবং শূন্যবাদের প্রধান আচার্য ইতিহাস-

খ্যাত নাগার্জুন খৃস্টের তিন শতকে বর্তমান ছিলেন। আমাদের নাগার্জুন তাঁহার অনেক পরের লোক। অল্-বীরূনী[২] বলেন যে, তাঁহার একশত বৎসর পূর্বেও একজন নাগার্জুন ছিলেন। নেপালে একটি গুহা আছে, উহার নাম নাগার্জুন গুহা। উহা চন্দ্রগড়ি পাহাড়ের একটি দুর্গম অংশে অবস্থিত। আমাদের নাগার্জুন বোধ হয়, বীরূনী-কথিত শেষ নাগার্জুন। ইঁহার সংকীর্তনের পদাবলীর নাম 'নাগার্জ্জুনগীতিকা'।

এতদ্ভিন্ন আরো অনেকগুলি পদাবলীর নাম আমরা পাইয়াছি। যথা—'যোগিপ্রসরগীতিকা', 'বজ্রডাকিনীগীতি', 'চিত্তগুহাগম্ভীরার্থগীতি'।

চৈতন্যদেবের অন্তত ৬ শত বৎসর পূর্বে বাংলা ও পূর্বভারতে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ সংকীর্তনের গান বাঁধিয়া ও নানা রাগ-রাগিণীতে ঐ-সমস্ত গান গাহিয়া ভারতবাসীর মন বৌদ্ধধর্মের দিকে আকৃষ্ট করিতেন। তাঁহারা সচরাচর যে-সমস্ত রাগিণীতে গান গাহিতেন তাদের নাম—পটমঞ্জরী, গবড়া, অরু, গুঞ্জরী, দেবক্রী, দেশাখ, ভৈরবী, কামোদ, ধানশী, রামক্রী, বরাড়ি, শীবরী, বলাড্ডি, মল্লারি, মালশী, কহ্নগুঞ্জরী, বাংলা ইত্যাদি।

বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যেরা গীতিকা ভিন্ন দোহা রচনা করিয়াছেন। এক-এক সময় মনে হয় যে, এই দোহা হইতেই পয়ারের সৃষ্টি হইয়াছে। সরহপাদের 'কথস্য দোহা' তন্ত্রের মন্ত্র নির্মাণের উপযোগী। সরহপাদের এক দোহাকোষ আমরা পাইয়াছি। সহজযানের মূল তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যা করাই এই দোহাকোষের উদ্দেশ্য এবং তাই করিতে গিয়া তিনি ব্রাহ্মণদিগের, ঈশ্বরবাদীদিগের, সাংখ্যের সৌগতদিগের, এমন-কি, মহাযানেরও মত-সকলের দোষ দিয়াছেন, সে কথা আমি পূর্বে বলিয়াছি। ইহা ছাড়া তাঁর আরো দোহাকোষ ছিল, একখানির নাম 'দোহাকোষ-নামচর্য্যাগীতি'; একখানির নাম 'দোহাকোষ উপদেশগীতি'। কৃষ্ণাচার্যের 'দোহাকোষ' আমরা পাইয়াছি। উহাও সহজযানের পুস্তক। উড়িষ্যানিবাসী তৈলিপের একখানি দোহাকোষ ছিল। বিরূপেরও একখানি দোহাকোষ আছে। তাহার পুষ্পিকায় লেখা আছে, উহা একখানি সংগ্রহ মাত্র। বিরূপ, কৃষ্ণ, শান্দিকপাদ, পূরপাদ এবং

শ্রীবৈরোচন এই কয়জনের দোহা লইয়া উহাতে সংগ্রহ করা হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা অনেক সময় গাথা রচনা করিতেন। গাথা রচনার জন্য একটি স্বতন্ত্র ভাষা ছিল। রাজেন্দ্রলাল [মিত্র, ১৮২২-৯১ খৃ.] উহাকে 'গাথাভাষা'ই বলিয়া গিয়াছেন। সেনার [Emile Charles Marie Senart, ১৮৪৭-১৯২৮ খৃ] উহাকে মিশ্র সংস্কৃত বলিয়া গিয়াছেন। ঐ ভাষায় যে বহু-দিন পর্যন্ত গাথা রচনা হইতেছিল, এ কথা কিন্তু কেহই জানিতেন না। 'শতসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা রত্ন-সঞ্চয়গাথা' খৃস্টের অন্তত ছয় শতকে লেখা হয়। কারণ, পাঁচ শতকের পূর্বে শতসাহস্রিকাই ছিল কিনা, সন্দেহ। এই ভাষা ক্রমে চলিত ভাষার সঙ্গে মিশিয়া অনেক নরম হইয়া আসিয়াছে, অনেকটা চলিত ভাষার মতনই দাঁড়াইয়াছে।[২৪]

সরহপাদের 'দ্বাদশোপদেশগাথা' নামে একখানি গাথা আছে। সরহপাদের গীতি বাংলা, দোহাও বাংলা : গাথাও যে বাংলা হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর-একখানি গ্রন্থ আছে, তার নাম 'সার্দ্ধপঞ্চ-গাথা' ; সংগ্রহকারের নাম নাগার্জুন গর্ভ। উহাতে শ্রীগিরি, সবর, কর্মপাদ ও নাড়পাদের গাথা আছে। এরূপ গাথা আরো অনেকে লিখিয়া গিয়াছেন।

আমার নিজের সংগ্রহে ও তেঙ্গুরে যে-সকল গীতি, গাথা ও দোহার নাম পাইয়াছি, তাহাদের মোটামুটি একটা বিবরণ দিলাম। কিন্তু ইহা ছাড়াও আরো অনেক গীতি, গাথা ও দোহা আছে ; কারণ, আমি গাথা ও গীতির যে কয়খানি টীকা পাইয়াছি, তাহাতে কয়েকজন দোহা ও গীতিকারের নাম পাইয়াছি, যাহা এই দুইয়ের কোনো সংগ্রহেই নাই। আর আমি নেপাল হইতে যে-সমস্ত বৌদ্ধ বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান ও মহাযানের পুস্তক আনিয়াছি, তাহাতেও মধ্যে মধ্যে বাংলা গীতি ও দোহা পাইয়াছি।

'ডাকার্ণব' নামে একখানি পুস্তকে অনেক চলিত ভাষার গান আছে। সে গানগুলি কী ভাষায়, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, আমি সেই অংশগুলি ছাপাইয়া ইউরোপে পাঠাইব স্থির করিয়াছি এবং ছাপাইয়াছি। কিন্তু যুদ্ধের জন্য পাঠাইতে

পারিতেছি না। তাহারো শেষ দোহাগুলি আমার বাংলা বলিয়া মনে হয়।

রম রম পরম মহাসুখ রজ্জু।
প্রজ্ঞোপাঅই সিজ্জউ কজ্জু॥
লোঅণ করুনাভাব হু তুম্ম।
সঅল সুরাসুর বুদ্ধহু জিম্ম॥
জরণ মরণ পড়িহাস ন দিসই।
ইবোহ করহু চিত্ত জিণ ন হই॥

ইহার উপর আরো একটা কথা বলিয়া রাখি। মীননাথের একটি বাংলা পদ গত বৎসর দেখাইয়াছি। আমাদের দেশে প্রবাদ আছে যে, মীন ও মৎস্যেন্দ্র চন্দ্রদ্বীপের লোক। চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের টীকায় বহিঃ-শাস্ত্রের বলিয়া আরো দুই একটি বাংলা পদ তুলিয়াছে। তাহাতে বোধ হয় যে, নাথপন্থের নাথদিগেরও অনেক গ্রন্থ বাংলায় লেখা হইয়াছিল।

সুতরাং মুসলমান-বিজয়ের পূর্বে বাংলা দেশে একটা প্রবল বাংলা সাহিত্যের উদয় হইয়াছিল। তাহার একটি ভগ্নাংশ মাত্র আমি অদ্য আপনাদের কাছে উপস্থিত করিতেছি। ভরসা করি, আপনারা যেরূপ উদ্যম সহকারে বৈষ্ণব-সাহিত্য ও অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধার করিয়াছেন, ঐরূপ উৎসাহে বৌদ্ধ ও নাথ-সাহিত্যের উদ্ধার সাধন করিবেন। ইহার জন্য আপনাদিগকে তিব্বতি ভাষা শিখিতে হইবে, তিব্বত ও নেপালে বেড়াইতে হইবে, কোচবিহার, ময়ূরভঞ্জ, মণিপুর, সিলেট প্রভৃতি প্রান্তবর্তী দেশে ও প্রান্তভাগে ঘুরিয়া গীতি, গাথা ও দোহা সংগ্রহ করিতে হইবে। ইহাতে অনেক পরিশ্রম করিতে হইবে, অনেক বার হতাশ হইয়া ফিরিতে হইবে। কিন্তু যদি সংগ্রহ করিতে পারেন, তবে দেখিতে পাইবেন যে, যাঁহারা এ পর্যন্ত কেবল আপনাদের কলঙ্কের কথাই কহিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা একেবারেই সত্য কথা কহেন নাই।

পুরানো বাংলার সম্বন্ধে আমার যাহা বলার ছিল, বলিয়াছি। এক্ষণে আমার নিজের সম্বন্ধে দু চারিটা কথা বলিতে হইবে। নিজের সম্বন্ধে কোনো কথা না বলাই ভালো। কিন্তু আমার এ কয়টি কথা

না বলিলে অন্যের উপর অবিচার হয়, নতুবা বলিতাম না। আমার নিজের বা আমার পুস্তকের নাম জাহির করিবার জন্য বলিতেছি না। এই পুরানো বাংলা সাহিত্যের একখানি ইতিহাস ও এই বাংলায় যে-কয়েকখানি পুস্তক পাইয়াছি, তাহা আমি ছাপাইতেছি ও অবিলম্বে প্রকাশ করিব। যে-সকল পুস্তক ছাপাইতেছি, তাহার মধ্যে দুইখানি নেপাল দরবারের। সে-সকল পুঁথি ছাপা হইবার পর তাঁহারা লইয়া গিয়াছেন। আমি তাঁহাদের অনুমতি লইয়া পুঁথির অনেকগুলি পাতা ফোটোগ্রাফ করিয়া রাখিয়াছি এবং আমার পুস্তকের সঙ্গে প্রকাশ করিব। অপর দুইখানি পুঁথি আমার নিজের অথবা নিজের হইতেও অধিক প্রিয়, কারণ, নেপালের পুঁথিখানার সুব্বাসাহেব বিষ্ণুপ্রসাদ রাজভাণ্ডারী[২৫] আমাকে প্রীতি-উপহার স্বরূপ ঐ দুইখানি প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বপুরুষেরা চব্বিশ পুরুষ ধরিয়া নেপালের মল্লরাজাদের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার প্রপিতামহ শেষ নেওয়ার রাজার সহিত কাশীবাস করিয়াছিলেন এবং পরে গোর্খা পর্বতে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার পিতা জঙ্গবাহাদুরের সহিত এক পাঠশালায় পড়িয়াছিলেন, কিন্তু জঙ্গবাহাদুর যখন ১৮৪৬ সালে কোতের হত্যাকাণ্ডের পর গোর্খরাজের সহিত বন্দোবস্ত করিলেন— "রাজ তুম্‌হারি, হুকুম হমারি", তখন তিনি গোর্খা রাজ্যে তাঁহার যে উচ্চ পদ ছিল, তাহা ত্যাগ করিয়া ঘরে গিয়া বসিলেন। জঙ্গবাহাদুর তাঁহাকে পুনর্বার পদ গ্রহণ করাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই লইলেন না; বলিলেন, "আমি নেওয়ারদের নুন খাইয়া গোর্খাদের সঙ্গে মিলিয়াছিলাম, যথেষ্ট পাপ হইয়াছে। এখন আবার গোর্খাদের নুন খাইয়া তোমার সহিত মিশিব না।" জঙ্গবাহাদুর তাঁহার পুত্রকে উচ্চ রাজপদ দিতে চাহিলে বিষ্ণুপ্রসাদ বলিলেন, "যাহাতে অস্ত্র ধারণ করিতে হয়, এমন পদ আমি লইব না।" তাই তাঁহাকে পুঁথিখানার অধ্যক্ষ করা হয়। তিনি পুঁথি-খানায় বসিয়া ক্রমাগত তন্ত্রের বহি পড়িতেন এবং তন্ত্রের অনেক খবর রাখিতেন। নেপালে যেখানে যে পুঁথি আছে, তাহা তাঁহার নখদর্পণে ছিল। তিনি একদিন কয়েকখানি প্রাচীন তালপাতার পুঁথি লইয়া আমার বাসায় আসিয়া বলিলেন, "তুমি ব্রাহ্মণ, আমার দেশে আসিয়াছ ও পুঁথি খুঁজিতেছ। তোমায় কী উপহার দিব, অনেক দিন ভাবিয়া

ভাবিয়া এই পুস্তক কয়খানি আনিয়াছি। আমি জানি, তুমি ইহার সদ্ব্যবহার করিবে।” আমি দেখিলাম, তাহার মধ্যে সরোরুহবজ্রের দোহাকোষ ও তাহার অদ্বয়বজ্রের টীকা আছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম, আপনার নিকট হইতে আমি আমার দেশের ইতিহাসের একটা প্রধান সরঞ্জাম পাইলাম, আমি নিশ্চয় এটি ছাপাইব। ছাপাইয়া আমি যদি তাঁহাকে ইহার এক কপি দিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার আনন্দের সীমা থাকিত না। কিন্তু ঠিক দুই বৎসর হইল, তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

কৃষ্ণাচার্যের দোহাকোষ ও তাহার টীকা, তাঁহারই উপদেশমতো পুথিখানার লেখকেরা লিখিয়া আমায় উপহার দিয়াছিলেন, তাহাও আমি ছাপাইয়াছি। ইহার মূল পুথি এখন কোথায় আছে, জানা যায় না।

১৯০৭ সালে আমি নেপালে গিয়াছিলাম। তখন যে-সকল পুস্তক পাইয়াছিলাম, তাহার একটা বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং তখনই আমি বলিয়াছিলাম, বাংলা পুস্তকগুলি আমি ছাপাইব। ছাপাইতে বিলম্ব অনেক হইয়াছে। ইহাতে অনেক ‘সাহিত্যামোদী’ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন ; অনেকে বলিয়াছিলেন, “আমায় কেন দাও-না, আমি ছাপাইয়া দিতেছি।” অনেকে বলিয়াছিলেন, “শাস্ত্রীমহাশয় যক্ষের ধনের মতো এই-সকল অমূল্য রত্ন লুকাইয়া রাখিয়াছেন, কাহাকেও দেখিতে দিবেন না।” কিন্তু এই-সকল ছাপাইতে যে কী পরিমাণ কাঠ-খড় দরকার, আমার মনে হয়, তাঁহারা তত জানিতেন না, তাই অত ব্যস্ত হইয়াছিলেন। অনেকে আছেন, একটা নূতন কথা পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহা ছাপাইয়া দিয়া নাম করেন। আমার সে প্রবৃত্তি নাই। তাই আমি মনে করিয়াছিলাম, বরং ছাপাইব না, তথাপি তাড়াতাড়ি করিয়া জিনিসটা নষ্ট করিব না। ভ্যাসিলিয়েফ [Vasily Pavlovich Vasilyev, ১৮১৮-১৯০০ খৃ.] বলিয়াছিলেন যে, অপভ্রংশ ভাষায় অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থ আছে। প্রোফেসার বেণ্ডল [Cecil Bendal, ১৮৫৬-১৯০৬ খৃ.] ‘সুভাষিতসংগ্রহ’ নামে একখানি পুস্তক ছাপাইয়াছিলেন, তাহাতে অপভ্রংশ ভাষার কতকগুলি দোহা ছিল। আমি দেখিয়াছিলাম, সে দোহাগুলি পুরানো বাংলা। তাঁহারা দুজনেই বলিয়াছিলেন যে, তেঙ্গুরে এই-সকল অপভ্রংশ পুস্তকের তর্জমা আছে। কিন্তু ভুটিয়া

শিখিয়া তেঙ্গুর পড়িয়া পুস্তক ছাপানো আমার পক্ষে অসাধ্য হইয়াছিল। সুখের কথা, কয়েক বৎসর হইল, কাঁডিয়ার সাহেব ঠিক যে অংশে ঐ-সকল পুস্তকের কথা আছে, তাহার তালিকা ছাপাইয়া দিয়াছেন। তাহাতে আমার বিস্তর উপকার হইয়াছে, এ তালিকা না পাইলে বোধ হয় আমার পুস্তক ছাপা[illegible] সাহস হইত না।

পুস্তক ছাপাইতে অনেক বিলম্ব হওয়ায় আমার কোনো কোনো আত্মীয় মনে করিয়াছিলেন, টাকার জন্যই আমি পুস্তক ছাপাইতে পারিতেছি না। তাই তাঁহারা লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়সাহেবের নিকট এই পুস্তক ছাপাইবার খরচের জন্য বলেন। বাংলা সাহিত্যের প্রতি রাজাসাহেবের অনুরাগ অসীম। তিনি শুনিবামাত্র সাহিত্য-পরিষদে যে টাকা দিয়া থাকেন, তাহা হইতে উহার খরচ দিতে রাজি হন এবং উহা সাহিত্য-পরিষৎ-পুস্তকাবলীর মধ্যে লইবেন বলিয়া স্থির হয়। কিন্তু ইহার মধ্যে আবার এক গোল উঠিল। আমি সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি নিযুক্ত হইলাম। সভাপতি হইয়া সাহিত্য-পরিষদের খরচায় বই ছাপাইব, ইহা আমার ভালো লাগিল না। আমি রাজা-সাহেবকে সে কথা জানাইলাম। তখন রাজাসাহেব স্বতন্ত্র ভাবে ঐ পুস্তক ছাপাইতে দিবেন এবং তাহার খরচ দিবেন, স্বীকার করিলেন। তিনি টাকা না দিলে এ পুস্তক এখন যেভাবে ছাপা হইতেছে, এত ভালো কাগজে, এত ভালো ছাপায়, এত বেশি ফোটোগ্রাফ দিয়া, এত অনুক্রমণিকা দিয়া ছাপা হইত না। পুরানো বাংলা সাহিত্যের যেরূপ সরঞ্জামে সদরে বাহির হওয়া উচিত, সেরূপ সরঞ্জাম আমার দ্বারা হইয়া উঠিত না। সুতরাং এই খরচ দিবার জন্য আমিও তাঁহার নিকট চির-দিন ঋণী থাকিব। বাংলা সাহিত্যও বোধ হয়, এ ঋণ শুধিতে পারিবে না। এ পুস্তক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুস্তকাবলীর ভিতর গণ্য হইবে।

সূচি

পদকর্তা	গীতের সংখ্যা
আর্যদেব	৩১
কম্বলাম্বর	৮
কাহ্ন বা কৃষ্ণ	৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৮, ১৯, ৩৬, ৪০, ৪২, ৪৫
কুক্কুরী	২, ২০
কৌঙ্কণপাদ	৪৪
গুণ্ডরী বা ধামপাদ	৪, ৪৭
চাটিল	৫
জয়নন্দী	৪৬
ডোম্বী	১৪
ঢেণ্ঢণ	৩৩
তাড়কপাদ	৩৭
দারিক	৩৪
ভাদেপাদ	৩৫
ভুসুকুপাদ	৬, ২১, ২৩, ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩, ৪৯
মহীধর	১৬
লুই	১, ২৯
বিরূবা	৩
বীণাপাদ	১৭
শান্তি	১৫, ২৬
সরহ	২২, ৩২, ৩৮, ৩৯
শবরপাদ	২৮

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

আর্যদেব ॥

সংস্কৃত :	করুণা ভয়
সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন :	ইন্দিয় চিঅ ণ পবণ বিআর বিকরণে মণ লোআচার সঅল
পুরানো বাংলা :	অকট অপা কোঁহি গই ঘিণ চান্দকান্তি চান্দরে চাহন্তে ছাড়িঅ জঁহি জাণমি জিম ডমরুলি ণঠা তহি নিবারিউ নিরাসে পইঠা পইসই পতিভাসঅ বাজঅ বিহরিউ রাজই সুন হো
প্রচলিত বাংলা :	টলি দুর

কম্বলাম্বর

সংস্কৃত :	করুণা বহু বাম সদ্গুরু
সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন :	উই কইসেঁ গঅণ মহাসুহ
পুরানো বাংলা :	উবেসেঁ কাচ্ছি কেঁ কেড়ুআল খুণ্টি চউদিশ চন্হিলে চাহঅ জাম ঠাবী থোই দাহিণ নাবী পারঅ পুচ্ছি বাটত বাহতু বাহবকে ভরিতী মহিকে মালা মাংগত রূপা সঙ্গ সোনে
প্রচলিত বাংলা :	উপাড়ী কি কে গেল চাপী নাহি মিলিমিলি মিলিল মেলিলি

কাহ্ন বা কৃষ্ণ ॥

সংস্কৃত :	অনুদিন অন্তে অবশ আগম আভরণে আলি আসব এক এবংকার কণ্ঠ কপালী করণ্ড করুণা কারণ কালি কুঠার কুণ্ডল গন্ধ গুরু ঘণ্টা চণ্ডালী চরণে ডমরু
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ডোম্বী তথতা তথাগত তরঙ্গ তরু দশবল দৃঢ় দেহ ন- নগর নলিনীবন নিবাস নির্ব্বাণে পঞ্চ পরম বরগুরু বল বহল বা বাক্ বাক্‌পথাতীত বিদ্যা বিবাহে বীরনাদে বেণী (ণি) ভব ভবজলধি ভাবাভাব ভাবে মা মূঢ় মূল মোক্ষ মোহ যোগী রবি রাগ রে শক্তি শশী সদ্‌গুরু সম্ভাবে সম সহজ সুফল

বিকৃত সংস্কৃত : অকিলেসেঁ অণহা অবর অলিএঁ অহির্নিশি আইস আনতু আবই আলে আসা ইন্দি ইষ্টামালা উ উআস উএস উইজঅ উএসই উন্মত্তো একারেঁ এসু কইসনি কইসেঁ কণ্ণহার কবালী কশালা (?) কহিঁ কাঅ কাঅর কাপালী কিউ কিস্ গঅণ গঅবরেঁ গোএর চঙ্গতা (?) চিঅ চেঅণ ছেব ছেবই ছেবহ জইসা জইসোঁ জসু জাম জিণউর জোই জোইণিজালে ণ ণাবী তইসোঁ তরিত্তা তসু তহিঁ তান্তি তিশরণ তিহুবণ তৈলোএ দাহ দিঠ দুন্দুহি দেশ ধাম নঅ নঅরী নড় নিঅ নিংদ নিঅড় নিঅড়ি নিঘিণ নিদালু নিবিতা পইঠ পড়হ পাণ্ডিআচাএ পদমা পবণ পরিচ্ছিন্না পরিনিবিত্তা পসঙ্গে পাণ্ড পাণ্ডজনা পাত্র পুণ পেখই বঅণে বট্টই বলাগ বাম্ভ বি বিআপক বিদুজন বিবিহ বিরুআ বিসন্না বেঅন বোহেঁ ভিন্না ভুঅণ ভেব মই মণ মণগোএর মমু মহাসুহ মাঅ মাআজাল মাদেসি মুত্তিহার মূঢ়া, মোলাণ রঅণ রএণি রত্তো লোঅ সংপুন্না সংবোহিঅ সঅল সপরবিত্তালা সরবর সসহর

সহাবে সা সাঅর সীস সুইনা সুভাসুভ সুরঅ সুহে সূধা

পুরানো বাংলা : অচ্ছন্তে অচারে অঠক অন্তরে অবণাগবণে অহারিউ অহারী আইলা আলাজালা আম্মে উছলিআঁ এড়ী করিআ করিণা করিনিরে করিবে কাজন কান্ধ কাল কালিএ' কালে' কাহরি কাহিব কিঅ কুঠারে কুড়িআ কুলিন কেড়ুয়াল কেহো কোই খট্টে খণহ খাঅ খেলহু' গই গাইতু ঘালিলি ঘুমই ঘোরিঅ ঘোলিউ চলিআ চেবই ছইছোই ছড়গই ছাড়অ ছাড়ি ছিজঅ ছুধ জঅ-জঅ জাঅ জাণই জাসি জিতা জিতেল জিম জো টালিউ টালিউ ণচ্ছন্তে তআগলি তআরি তঁই তবি তরঙ্গ তিনি তিম তে তো তোএ তোড়িআ তোড়িউ তেড়ে' তোলিয়া তোহোর তোহোরি দশদিশেঁ দমকুঁ দিট দুআ দেখই দেহু ধরিঅ নণন্দা নাচঅ নাঠ নাড়িআ নাবেঁ নেউর পইসই পইসি পড়িআঁ পমাই পরসর পরিমাণই পহারী পহিলেঁ পাখি পাখুড়ী পিহাড়ী পুছমি পোহাঅ ফরই ফলাহা ফীটউ বড়িআ বরিসঅ বাখোড় বাজএ বাটই বাহ্মণ বাপুড়ী বারিহিরে বাহ বাহঅ বাহিঅ বিকণয় বিকসই বিবাহিআ বিয়োএ বিলসঅ (ই) বিহরএ বিহল বিহুনে বোধসে বোব বোল বোলই বোলী ভইঅ ভইলা ভইঙ্গলা ভণই ভণ্ডার ভলি ভাগ ভাঙ্গীয় ভাভরিআলী ম মঅ মঝ মতিএ' মমু মরাড়িইউ মাঙ্গে মাঝে'

মাণই মাদলা মারমি মারিঅ মারী মালী
মেলঈ মোএ মোড্ডিউ মোরি মোহিঅই
রাহঅ রিসঅ রুন্ধেলা লবএ লাইএ লাগ
লাঙ্গা লাড়ে' লেমি লেহু' শাখি শাসু
শুনমে সাঁড়ি সমায় সাঙ্গ সাঙ্গে সাদ
সাহা সুণ সুণত সুতেলি সো সোধই
স্বপণ হরিঅ হাঁউ হাঁউ হেলেঁ হো
হোহি

চলিত বাংলা আলো কপালী করি করিব কাম কি
কোঠা গল গুণিয়া গেলা ঘরে চউষঠ্‌ঠি
চড়ি চলিল চৌষঠ্‌ঠি ছার ছিণালী জ
জউতুক জণ জাই জায় জে টাল
ঠাকুর ডাল তা তু দেখি দেখিল
দুধ না নাড়ি নাহি নিআ পরাণ প্যাণী
পাত পোথী পোহায় বাট বাহ বিমনা
ভণ ভর মাতা যাই লো শালী সঙ্গে
সুন সে হাড়েরি হালো হেরি হেরী

কুক্কুরী ॥

সংস্কৃত : অন্ত খ চর্য্যা ন ভব ভো মন মূল

সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন : অইসন এথু নিদ নিরাসী বাসন সেব সো

পুরানো বাংলা : অধরাতী অহিঁ আঙ্গন উঁড়ি একুড়ি কহন
কা কাড়ই কাণেট কামরু কোড়ি খাঅ
গই গাইড় চোরি জা জাঅ জাই
জাগঅ জান জো জোবন তেন্তলি থিরা
দিবসই দুলি দুহি ধরণ নখলি পণ
পাহিল পিটা পুড় ফেটলিউ ফিটলেসু
বাপুড়া বাহাম বহুড়ী বিআতী বিআরন্তে
বিগোআ বীরা বুঝএ' ভইলে ভইলেসি

ভতারে ভণথি ভাঅ মাএ মাগঅ মাঝ
মোহোর বুখের সংঘারা সনাইড় সি
সুন সুসুরা হাঁউ

প্রচলিত বাংলা : কুম্ভীরে গেল গো ঘর চাহি চোরে ডরে
নাড়ি নাহি নিল পূরা বাপ বিআণ
মোর রাতি

কৌঙ্কণপাদ ॥

সংস্কৃত : তথা তথতা মাসং সর্ব

সংস্কৃত হইতে
উৎপন্ন : অণুঅর ণাদ ধাম নিরোহ বি বোহী সঅল
সংবোহী

পুরানো বাংলা : অচ্ছু অণ আইলোসিঁ উইম্না কলএল চাহন্তে
জথাঁ জবেঁ ণঠা ণহি তবেঁ পৈঠা বিচ্ছুরিল
বিদু ভণই মিলিআ সাদেঁ সুন সুনে

প্রচলিত বাংলা : আণ এ চৌখন জান থাকি বিহাণ মাঝ হু

গুণ্ডরী বা ধামপাদ ॥

সংস্কৃত : অঙ্ক কমল কমলরস কুলিশ চণ্ডালী
ডোম্বী ন ন নারী পণ্ড বোণি মণিকুলে
মেরু রে লেপন শাসন শিখর স
সমতা হর হরি

সংস্কৃত হইতে
উৎপন্ন : গঅণ চান্দ চীরা জালা জীবমি জোইনি
জোএ নবগুণ ধূম নউ পীবমি বাম্ন
মুহ সুজ হিঁ

পুরানো বাংলা : অন্ধে আগি উভিল ওড়িআণে করহু
কুন্দুরে কোণ্ডা খণহিঁ খেপহু গাঅ ঘাণ্ট
ঘালি জলিঅ জানী ডাহ তাল তুই
তিম্বুড়া তো দিসই নরঅ নালেঁ পইসই

পখা ফাটই ফাল ফীটা ফুড় বহিআ
বালী বিআলী বিণু বীরা ভইম ভণই
মঝেঁ মাঝে মিঅলী লাগেলি লেঙ্গ্‌
সগায় সিণ্চহুঁ সহষলি সাসু

প্রচলিত বাংলা : উঠে খর গেল ঘরে চাপি চুম্বী
জায় দে পড়া পাণী ভরা লই হইঁ

চাটিল

সংস্কৃত : অনুত্তর গম্ভীর গহণ দূর ন পারগামী
বাম ভব মা মোহতরু হে

সংস্কৃত হইতে
উৎপন্ন : আদঅ জই ধামার্থে নিবানে নিভর বোহি
ম লোঅ

পুরানো বাংলা : আন্তে কোহিঅ গটই চিখিল জাহী
জোড়িঅ ণই তরই তুম্নে থাহী দাহিণ
দিটি দুআন্তে নয়ড়ী পটি পুচ্ছতু
ফাড্ডিঅ বাহী বেগেঁ মাঝেঁ সাঙ্কম
সাঙ্কমত সামী হোইব হোহী

প্রচলিত বাংলা : চড়িলে টাঙ্গী

জয়নন্দী।

সংস্কৃত : অন্তরালে তথাতা ন বোণি মোহ মোহে
স্বভাবে

সংস্কৃত হইতে
উৎপন্ন : অদশ কাঅ চিঅ ছাঅ জই জইস্ম
ণ তইসা ন নো মাআ সুঅনে

পুরানো বাংলা : অণ অবণা-গবণা ছিজই তবেঁ তিমই
তুটই দাটই পাখেঁ পেখ, পেখই পেখু
ফুড় বলি-বলি বাঝই বিণা বিমুক্কা ভণই
মাণা মোঅ ষোহিঅ সমাণা সোই হোই

ডোম্বী।

সংস্কৃত — গঙ্গা ন বাম রে সংহার সদ্‌গুরু

সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন — গঅণ চন্দ জউনা জো জিনউরা সৃজ্জ

পুরানো বাংলা : উছারা করেই কবড়ী কাচ্ছী কুলেঁ-কুল কেড়ুআল চকা ছন্দা জাই তঁহি তু দাহিন দুখোলেঁ নাই পইসই পড়ন্তে পাঅপঞ পাঞ্চ পিটত পুণু পুলিন্দা পোইআ বহই বাহবাণ বাটত বান্ধী বাহতু বুড়ই বুড়িলী বোড়ী ভইল মাতঙ্গি মাগ মাংগে মাঝে লালে বেরই সান্ধি সিঞ্চহু সিঠি সুচ্ছড়ে

প্রচলিত বাংলা — চড়িলা জাইব দুই পানী পার বাহ রথে লেই লো

ঢেণ্ঢণ ॥

সংস্কৃত — গীত চোর সংসার

সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন — গবিআ বুধি ষম

পুরানো বাংলা : আবেশী জাঅ জুঝঅ জো টালত তিনা গুহিয়ে নিতে পড়বেষী পিটা বড়্‌হিল বাঁঝে বিআএল বুঝঅ বেঙ্গ বেঁণ্টে ষামায় ষিআলা ষিহে ষো সাধী সেহ সোই হাড়ীত

প্রচলিত বাংলা — এ কি ঘর দুধু দুহিল ধনি নাহি নিতি বলদ বিরলে ভাত মোর সাঁঝে

তাডকপাদ ॥

সংস্কৃত — অনুভব অবকাশ মা রে শঙ্কা স সহজ

সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন — অপণে কংখা জইসনে জইসো জো জোই জোঈ তই বিমুকা ভান্তি সো

~ ~

পুরানো বাংলা : অছিলে অচ্ছ এথু কাহেরি কাহিঁ গলপাস গলেঁ চৌকোট্টি জাণী তইছন তা নাহিঁ পিথক বখানী বাণ্ডকুরু বুঝই ভণই মহামুদেরি সন্তারে হোই হো

প্রচলিত বাংলা : গেলি টুটি তা বাস ভোল

দারিক ॥

সংস্কৃত : অনুত্তর কিং দ্বাদশ ন পরম পরাপর বাক্ মহাসুখ রে স্ব

সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন : অপইঠান অবর অভিন অলকৃখ কাঅ চিঅ চিত্তা ঝাল নিবাণে মহাসুহ মহাসুহে সঅল

পুরানো বাংলা : ইন্দীজানী একু কারিআ করুণারি কুলেঁ গঅণত চেবই তন্তে দুঃখেঁ দুলখ পএ পাঅ পারিম বখানে বারেঁ বিলসই ভুঅণে ভুঞ্জই মন্তে মানী মোহেরা রাঅ রাআ লঅলধা লানে সুখেঁ সুন

প্রচলিত বাংলা : তো বাধা

ভাদেপাদ।

সংস্কৃত : কাল ন পাপ মোহ সদ্‌গুরু

সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন : কথু গণ চিঅ চিঅরাঅ দহ দিহ পুন্ন

পুরানো বাংলা : অচ্ছিলে অভাগে অহার অহারিল এবেঁ কএলা গঅণত টলিআ ণঠা পইঠা পানিআঁ পেখনি বাজুলে বিহুন্নে বোহেঁ ভণই ভণিআ মই মকুঁ লইআ সমুদে স্বমোহেঁ হাঁউ

প্রচলিত বাংলা : এত দিল বুঝিল শূন সর্ব্বই

ভুসুকুপাদ ॥

সংস্কৃত অঙ্গ আকাশ কমল করুণ কলা কিং কেলি ক্লেশ খ চণ্ডল চণ্ডালী তম্ ন নাশক নিরন্তর পৃচ্ছতু বিরমানন্দ বিলক্ষণ বিশেষ বুধ ভব ভাবাভাব মন মরণ মরু মহাতরু মা মাংসে রে সংজ্ঞা সদ্গুরু সম সমরসে সহজ সহজানন্দ হ হরিণী

সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন : অঅণা অইস অণুঅনা অণুঅনাএ অদঅ অধ্যাতা অধরাতি অন্ধকারা অবধূই অমণধাণ আই আইএ আইস আহারা ইঁদিবি ইন্দিয়াল উইত্তা উহ উহুসিউ এথু কমলিনি কিম্পি কীস গঅণ গঅণহ গঅণে গন্ধনইরী চীঅ জই জইসা জাম জোই জোইআ জোইণী ণ তরঙ্গন্তে তেলএ তৈলএ থাতী দাপতী দিঠ নিহুরে পঁউআ পণ্ডজণা পণ্ডধাউন পদ্মবণ পবণা বণ বহুবিহ বাষণা বি বুঝিঝ্অ মরিচী মহাসুহ মহাসুহে মাআজাল মাআহরিণী মূঢ়া মেহ রঅণহু রাজ ষষহর ষহজে সএলা স্বভাবে সহাব সুসার সেস

পুরানো বাংলা : অকট অচ্ছসি অচ্ছহু অদভুআ অন্ধারি অপণা অপেঁ অবণা-গবণা অমিঅ অহেই আবই উণ্ডল-পাণ্ডল উজলি উলাস একুমণা এঁসো এহ কট করঅ করই কলিআ কাঁহি কাহেই কা কাহি কাহেরি কোএ কোড়ি খণঅ খণহ খাই খালেঁ খেড়া খেলই গই গউ

~ ~

গাতী ঘরিণী ঘিণি চৌ চমকিই চরঅ
চা চান্দে চারা চালিউঅ চৌদিশ ছাড়অ
ছাড়ী ছুপই জগ জগরে জবেঁ জাঅ
জাই জাইবেঁ জাণমে জাণী জাসু জিম
জীবন্তে জে'ণ টলিআ টুটু টুটুঅ টুটুই
ডাহি ণঅণি ণঠা ণার ণাহি ণিঅ
তংহি তবসে তবেঁ তবুঅ তসু তিণ
তিম তুম্হে তেলেঁ তো তোরা থাকিউ
দিণি' দীসঅ দে দন্দল ধাণ নলনীবন
নিঅ নিচ্চল নিবাণে নিশিঅ নীলঅ
পইঠা পইসঈ পইসন্তে পইঅহিনি পড়অ
পাড়িহাই পঁণালে পসারিউ পাণিআ পাব
পিবই পেখ ফরিঅ ফিটঅ ফুলিলা
বঙ্গালী বঙ্গালে বতিস বহই বাজ বাণ
বাণত বাতাবন্তে' বাঁদ্ধি বাঁধেলি বালুআ
বাহিউ বিকসিউ বিনু বিন্দারঅ বিম্বু
বিশুদ্ধি' বিসঅ বিসারা বুঝঈ বুঝষি
বুঝিঅ বোঁটিল বোড়ো বোলঅ বোহে
বোহেঁ ভইআ ভইলি ভখঅ ভণঅ
ভণই ভণ্ডার ভাণ্ডি ভাণ্ডী ভাণ্ডো ভেড়
ভেলা মই মইলে মএল মাগে মাঝে'
মারিহসি মুষা মুষাএর মুসা মেলেঁ রাউতু
লইআ লুড়িউ লেলী লোলেঁ লোহ্না
ষারে সপরেলা সমঅ সবুআ সসর
সারে সুধ সুআ সুক সুন সুনন্তে সোন
স্বভাবেঁ হআ হণ হরিআ হরিণা হরিণার
হরিণির হিঅহি হেন্তই হোহিসি হোহু

প্রচলিত বাংলা : আজি আনন্দে আরে উঠি এ এত
কর করিহ খুর জলে দলিয়া দেখি
নাহি পরিবারে পাড়ী পাণী পাথর

বান্ধন বিহাণ বুঝি বৈরী ভর মার
মাঁসে মেলি মোর রাতি সাপ সিংগে
সে হাক হোরি

মহীধর।

সংস্কৃত : কিরণ খর ন নিরন্তর পণ্ড পাপ পুণ্য
বেণি ভয়ঙ্কর মণ্ডল মহারস মার রবি রে

সংস্কৃত হইতে
উৎপন্ন : কিম্পি কো গঅণন্ত গঅণাঙ্গণ গঅন্দা
ঘণ চিত্তা চীঅ ণিবানা তিহুঅন বী
সঅ সএল

পুরানো বাংলা : অণহ উএখী এং এথু কসন খন্তা
গঅণটাকলি গই গাজই ঘোলই ঠানা
তিড়িঅ তিলিএং তুসেঁ দিঠা দেখী
ধাবই নায়করে পইঠ পইঠা পাটে
বিপখ বিষয়ারে বুড়ন্তে ভণন্তি ভাজই
মই মাতেল মোড়িঅ লাগিলি সন্তাপেরে
সিঅল সুনি

প্রচলিত বাংলা : তা পানে লাগি

লুই ॥

সংস্কৃত : আগম উদক উহ করণক কাল চঞ্চল
চিহ্ন তরু ন পণ্ডত পরিমাণ বর বেণি
ভাব রে সুখ

সংস্কৃত হইতে
উৎপন্ন : অইস কইসে চমণ চীএ তিঅধাএ দিঠা
দুলকৃখ ধমন নিচিত পইঠো পান্তি
পিরিচ্ছা বি বিণানা বেঁএ মই মহাসুহ
রূব সঅল সংবোহেঁ সমাহিঅ সুহ

~ ~

পুরানো বাংলা : অচ্ছম আম্‌হে এড়িএউ করিঅ করিঅই কাআ কাহি কাহেরে কিষ কীষ কো চান্দ ছান্দক জা জাই জাহের জিম ণা তাহের দিট দিবি দিস্ দুঃখেতেঁ পাতিআই পাখ পুচ্ছিঅ বইঠা বখানী বট বান বান্ধ বিলসই ভণই ভণি ভাইব ভিতি মরিআই মিচ্ছা লই লাহু সাচ সানে সো হই

প্রচলিত বাংলা : আস জান জানি ভাল পাটের পাস লাগে সুনু

বিরুবা ॥

সংস্কৃত : অজরামর এক চিহ্ন বারুণী স সহজে

সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন : দশমি-দুআরত দিট

পুরানো বাংলা : করী কান্ধ গরাহক ঘাড়িএ চউশঠী চীঅন জে দেখইলা দেট নিসারা পইঠেল বহিআ বাকলঅ বান্ধঅ ভণন্তি শুণ্ডিনি সান্ধঅ সান্ধে হোই

প্রচলিত বাংলা : আইল করি ঘরে চাল ডুলি থির দুইঘরে নাল নাহি পসারা সরুই সে

বীণাপাদ ॥

সংস্কৃত : অবধূতী আলি কালি দেবী নাটক বীণা বুদ্ধ বোণি সমরস হেরুক

সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন : অনহা গঅবর রুণা বিআপিউ সহি

পুরানো বাংলা : করহকলে করহা কিঅত গান্তি গুণিআ চাপিউ তান্তি দাণ্ডী ধনি বতিস বাকি বাজই বাজিল বিলসই বিসমা সএল সসি সান্ধি সুজ সুন সুনেআ হোই

প্রচলিত বাংলা : আলো জবে লাউ লাগেলি সারি

শান্তি ॥

সংস্কৃত : অস্ত উহ এষা ন নো পুন বহুল
বাম বাল মহাসিদ্ধি মা রাজপথ রে

সংস্কৃত হইতে
উৎপন্ন : অট অলকৃথ গুমা ঘাটন ণ নিরবর তউষে
বাকু বালাগ ভাঁও ভাঁও মাআ লকঁথন
সঅ সভাবি সমুদারে সম্বেঅন সবুঅ সঁঞ
পুরানো বাংলা : অনাবাটা অপণা অহারিউ আঁসু উজু একু
এহু ক'ঢরা কাজন-কারণ কিণ কুলেঁ-কুল
খড়তড়ি চটারিউ চ্ছাড়ী জ জআতি জাঅন্তে
জাইউ জান্তে থাহা দাহিন দিসঅ দিসই
দীসঅ নাব নাহা পইসথ পাবিঅই
পান্তর পুচ্ছসি বাটা বাটে বাসসি বিআরতে
বুজিঅ বুজসি বুলথেউ বোলথি ভইলা
ভণই ভূলহ ভৈলি ম্বার মূঢ়া মোহা
লইআঁ সংকেলিউ সংসারা স'বেঅন সিমএ
শূণা শূণে সেসু সোই হোই
প্রচলিত বাংলা : আখি আগে গেলা জাই জে তুলা
দুই দো ধূনি বট ভিণ ভেলা

সরহ ॥

সংস্কৃত : অজরামর অরে গুরু জায়া তে ন
নাদ নৌকা নৌবাহী পর পার বাম
বিন্দু ভব মরণ মা রবি রস রে
সচরাচর সদ্‌গুরু হ

সংস্কৃত হইতে
উৎপন্ন : অচিন্ত অদভুয় কইসন কইসে কাঅ
কিম্পি চিঅ চিঅরাঅ চীঅ ছান্দ্র জইসো
জলবিম্বকারে জোই ণ তইসো তিঅশ

থির দাপণ দুজ্জন দোসে ধাম নিঅমন
নির্ব্বাণা বর বি বিনানা বিসেসো বিস
বাহি ভঅ মন রসানেরে লীক্ক লোঅ
শশীমণ্ডল সঙ্কা সহাবে

পুরানো বাংলা : অকট অণ অণা অপণা অপণে অপনা
অপা অপ্যণা অবসরি অবিদার অচ্ছে
আচ্ছন্তে আগে॰ উঁজায় উজু উলোলেঁ
একেলে কখা করউ কা কিমো কুণ্ডবাঁ
কেড়ুআল খালবিখলা খান্ট খাণ্টি গঅণে
গজিই গিলেসি গোহালিব ঘারে ঘুণ্ড
জগ জা জাউ জানহু . জাম জাহু জো
টাণ্ডঅ ণাবড়ি ণাহি তই তোহোর
তোহোরে॰ দাহিন দিসই দুট দুঠ্য ধহু
নাশিঅ নাহি নিঅহি নিলেসি পতবাল
পমাএ॰ পসর পারউআরে পারে বঅণ
বঙ্ক বন্ধাবএ বপা বলআ বলন্দেঁ বস
বাট বাটঅ বিরহু॰ঈ বিহারে বুঝিঝলে
বোলিআ ভণই ভণীত ভণীন্ত ভর্মান্ত
ভাইলা ভাগেল মঅণে মই মরে মিছেঁ
মোকল মোহারো লেহু লোউ ষঅ
সহজে সাঙ্গে সুইলা সুণ সো সোই
সোন্তে হোই হোন্তি

প্রচলিত বাংলা : অমিয় ই . উপাএ এ করি কাম কি
কুল খর খাইব গুণে ছাড়ি জাই
জীবন্তে জে তু থাকিব ধর পরে বঙ্গে
বুঝ মেন মেলি রচি লই হাথে

সবরপাদ।

সংস্কৃত : কর্ণ কুণ্ডল খসমে গিরিবর গুরুবাক তরুবর
ন পরম বজ্রধারী বালী বিষমে ভব

মহাসুখে মা রসে রে রোষে
সগুণ সহজ সমতুলা হ হে

সংস্কৃত হইতে
উৎপন্ন : অণুদিন এসেরে কইসে কিম্পি ণাণা
ণামে ণিঅ দহাদিহে ধাউ পাবত বণ
মণে মহাসুহে মাআ সিহর সবরী ছিঅ

পুরানো বাংলা : অকাশ-ফুলিআ অন্ধারি উমত একেল
কপানু কান্দশ কাপুর কুরাড়ী গঅণত
গিবত গরুআ গুলী গুঞ্জরী গুহাড়া চঞ্চলা
চেরই ছাইলা ছাড়ু জাগন্তে জোহ্না ডালা
ণইবমানি ণেরামণি তইলা তহিঁ তাঁবোলা
তাএলা তিঅ তোলি তোহোরি দারী
দিআঁ দিধলি দুন্দোলা নিবাণে নিরামণি
নিরেসবন পইসন্তি পরহিণ পাঁসের পীচ্ছু
পুণ্ডআ পাকেলা পেক্ষ পোহাইলি ফিটেলি
ফিটেলি বসই বলী বাড়্হী বাণে বালি
বালী বিন্ধ বিন্ধহ বিলসন্তি ভাইলা ভেলা
মত্তা মহাসুহে মাতেলা মালী মোরি মেহেলি
মোরাঙ্গি মোহা মোলিল লইআ লাগেলি
লোড়িব শরসন্ধানে ষবরালি ষুকড় ষে
সান্ধি সুন সুনমে সুন্দরী হকএলা হিণ্ডই
হেণ্ডে হেরল

প্রচলিত বাংলা : উচা উপাড়ী এ একে কঙ্গুরি কণ্ঠে কব
খাই খাট ঘরিণী চারিবাসে ছাড় পাড়িলা
পাগল পোহাই ফুটিলা বাড়ির বাড়ী
মারিল রাতি শিয়ালা শুন সে সেজি হেরি

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'
দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩২২ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. সূত্র

১৩২২ বঙ্গাব্দের দ্বিতীয় সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রকাশিত এই 'সম্বোধন' পরিষদের ২১তম বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ, ১৩২১-এর সভাপতির অভিভাষণের পরিপূরক রচনা। অভিভাষণ দুটি 'বৌদ্ধগান ও দোহা'র "মুখবন্ধ" ও "পদকর্ত্তাদের পরিচয়" রূপে ব্যবহৃত। এই প্রবন্ধের সূচনা ও শেষের কিছু অংশ মুখবন্ধে যোগ করা হয়, বাকি অংশ ছাপা হয় পদকর্তাদের পরিচয় রূপে। শাস্ত্রীমশায় প্রথম বিবেচনায় চর্যাপদের যে পাঠ স্থির করেছিলেন তা ১৩২১-এর সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির অভিভাষণ এবং এই 'সম্বোধন' থেকে বোঝা যায়। এইজন্য পদকর্তাদের নাম, উদ্ধৃতি এবং শব্দপঞ্জী আমরা সংশোধন করি নি। বইয়ে নেবার সময়ে চর্যাগীতি থেকে উদ্ধৃতি এবং আলোচনায় যা পরিবর্তন করা হয়েছিল সেগুলি পাঠ-প্রসঙ্গে দেখানো হল।

১. Palmyr Cordier ফরাসি সেনাবাহিনীর ডাক্তার ছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধে ৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৪ খৃ. তার মৃত্যু হয়। কর্দিয়ে সংকলিত *Catalogue Du Fonds Tibètain de la Bibliotheque Nationale* কাতালগ্ দ্যু ফঁ তিবেতেঁ দ্য লা বিব্লিওথেক্ নাতিওনাল নামে পারির জাতীয় গ্রন্থাগারের তিব্বতি-সংগ্রহের তালিকা এশিয়ার মহাযান ও পরবর্তী বৌদ্ধতত্ত্বের আলোচনায় অনন্য সহায়। এই সংকলন ১৯০৯-১৫ খৃস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়। তিব্বতে অনূদিত ভারতীয় বইয়ের দুই ভাগ। যেসব বইয়ে বুদ্ধের বচন আছে সেগুলিকে বলা হয় কেঙ্গুর বা কাঙ্গুর (bka'-'gyur) এবং অন্য সব বইকে বলা হয় তেঙ্গুর বা তাঙ্গুর (bsTan-'gyur)। তিব্বতি লামা বুঁ-তোন ত্রয়োদশ শতকে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুবাদের একটি তালিকা তৈরি করেন, যার নাম তেঙ্গুর। কর্দিয়ে ৬ বৎসরের পরিশ্রমে ফরাসি ভাষায় তেঙ্গুরের তালিকা সংকলন সম্পূর্ণ করেন।

২. এই বইয়ের পৃ. ২৯৮ সূত্র ৩১ দ্র.

৩. এই বইয়ের পৃ. ২৯৯ সূত্র ৩২ দ্র.

৪. এই বইয়ের পৃ. ৩৫২ সূত্র ২৭ দ্র.

৫. তেঙ্গুরের তালিকায় ‘গুহ্যসমাজমহাযোগতন্ত্রবলিবিধি’ বইয়ের লেখক শান্তিদেবকে জাহোর-এর অধিবাসী বলা আছে। জাহোর এবং সাহোর অবশ্য একই জায়গার নামান্তর। কিন্তু জাহোর বা সাহোর কোথায় ছিল তা অনির্দিষ্ট। শাস্ত্রীমশায় পুব বাংলার ঢাকা জেলার সাভারকে সাহোর বলেছেন। বিনয়তোষ ভট্টাচার্য নলিনীকান্ত ভট্টশালীর উপরে নির্ভর করে এই মতই সমর্থন করেন। A. H. Francke বলেন জায়গাটি উত্তর-পশ্চিম ভারতের মণ্ডি। ওয়াডেল পদ্মসম্ভবের কাহিনীতে Zahor-এর পাশে বন্ধনীর মধ্যে ‘? Zahor’ লিখেছেন। তিব্বতি লেখক সুম্‌পা তাঁর ‘পাগ্‌-সাম্‌-জোন্‌-জাং’ বইয়ে শান্তরক্ষিতকে একবার বলেছেন বাঙালি, আর-একবার বলেছেন সাহোরের রাজপরিবারের ছেলে। জাহোর বা সাহোরকে যাঁরা বাংলাদেশের কোনো জায়গা বলেন, তাঁদের পক্ষেও কিছু তথ্য ও যুক্তি আছে। দ্র. বা-ই, পৃ. ৭০৯ ; *BH*-I, pp. 331, 672-73 ; *BLT*, p. 382 ; *BE*, p. 44.

৬. এই বইয়ের পৃ. ৩০১ সূত্র ৩৪ দ্র.

৭. গুণ্ডরী ভণিতা আছে ৪ সংখ্যক চর্যাপদে। ৪৭ সংখ্যক পদে রাগ-নির্দেশের পাঠ ‘রাগ গুঞ্জরী ধামপাদানাং’ শাস্ত্রীমশায় পড়েছিলেন, ‘গুঞ্জরীপাদানাং’ এবং এই ভ্রান্তির বসে সিদ্ধান্ত করেন ধামপাদের আর-এক নাম গুণ্ডরীপাদ।

৮. এই বইয়ের পৃ. ৩০২ সূত্র ৩৫ দ্র.

৯. ‘দি ব্লু অ্যানাল্‌স’ বইয়ে কম্বলপাদ সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। মহাযোগিনী-তন্ত্র বা গুহ্যসমাজ-তন্ত্র প্রচারের বিবরণে উড্ডীয়ান-রাজ ইন্দ্রভূতির সঙ্গে কম্বলের নাম জড়িত। জ্ঞানলাভের জন্যে ইন্দ্রভূতির প্রাসাদের দরজায় কম্বল তিন বছর ঘুমিয়েছিলেন, তাই তাঁর নাম হয় ঘুমোনো-ভিক্ষু। বোধ হয় ধরনা দিয়ে পড়ে ছিলেন। আবার ‘সহজ-

সিদ্ধিপদ্ধতিনাম' টীকার উল্লেখের উপরে নির্ভর করে ইন্দ্রভূতি ও কম্বলপাদকে একই ব্যক্তি বলা হয়েছে। নারো-পার বোন নিগু-মা বলেন, তিনি এবং কম্বলপাদ ভিন্ন আর কেউ মন্ত্রযান জানেন না। পরে আর-এক জায়গায় উল্লেখ রয়েছে নাগার্জুন এবং তাঁর শিষ্যরা মহাযোগ-তন্ত্র আয়ত্ত করে দক্ষিণ থেকে প্রচার করেন। তার পরে কম্বলপাদ এবং অন্যরা উড্ডীয়ানে যোগিনী-তন্ত্র আবিষ্কার করেন এবং মধ্যদেশে প্রচার করেন। (*BA*, pp. 362, 731, 753.)

তেঙ্গুরের তালিকায় কম্বলপাদের নামে 'প্রজ্ঞাপারমিতাউপদেশ', 'চক্রশম্বরঅভিসময়টীকা', 'সাধননিদাননামশ্রীচক্রসম্বরপঞ্জিকা', 'কম্বল-গীতিকা' প্রভৃতি ১৩ খানি বইয়ের নাম আছে।

১০. তারনাথ দুই বিরূ-পার কথা বলেন। বড়ো বিরূ-পা দেবীকোটে ডাকিনীদের হাতে পর্যুদস্ত হন। শ্রীপর্বতে গিয়ে আচার্য নাগবোধির কাছে যমারি-সাধন শেখেন এবং ফিরে এসে যমারি-মণ্ডলের সাহায্যে ডাকিনীদের পরাস্ত করেন। বজ্র বারাহীর আশীর্বাদে তিনি যমারি-সাধনায় সিদ্ধি অর্জন করেন। এই যোগী সমগ্র তন্ত্র শিক্ষা দিতে পারতেন। এঁর এক শিষ্য ডোম্বী-হেরুক। ছোটো বিরূ-পা পশ্চিমের কচ্ছ দেশের রাজা বিভরট্ট-এর তৈরি মন্দিরের দেবতাদের 'আইস আইস' বলে ডেকে এনে দু-ভাগে ভাগ করে দেন। (Tāranāth, pp. 214-15, 245, 261-62.)

তেঙ্গুরের তালিকায় বিরূ-পার নামে 'রক্তযমারিসাধন', 'বলিবিধি', 'ছিন্নমুণ্ডাসাধন', 'অমৃতঅধিষ্ঠান', 'শ্রীবিরূপপদচতুঃঅশীতি', 'দোহা-কোষ' ইত্যাদি ২০ খানি বইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। কাহ্নপাদের রচনা ১৮ সংখ্যক চর্যাগীতিতে আছে, 'কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই।' বিরুআ বা বিরূ-পা কাহ্নপাদের নামান্তর মনে করার পক্ষে যুক্তি আছে। দ্র চ-গী-প, পৃ. ১১-১২।

১১. এই বইয়ের পৃ. ৩০৪ সূত্র ৪০ দ্র.

১২. তান্ত্রিক বৌদ্ধ ঐতিহ্যে সবর ৮৪ সিদ্ধাচার্যের অন্যতম। ইনি সম্ভবত বজ্রযোগিনী সাধন-পন্থার প্রবর্তক। তেঙ্গুরে এঁর নামান্তর শবরী, শবরীশ্বর বা শবরেশ্বর। সাধনমালায় তাঁর দুটি রচনা 'সিতকুরুকুল্লাসাধন' ও 'বজ্রযোগিন্যারাধনবিধি' সংকলিত হয়েছে। তেঙ্গুরের তালিকায় ১৬টিব ইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি বই 'মহামুদ্রাবজ্রগীতি'।

'দি ব্লু অ্যানাল্‌স'-এর উল্লেখ অনুসারে সরহ প্রথম মহামুদ্রা-সাধন প্রবর্তন করেন। ভারতে এই মহামুদ্রা-সাধনের ধারক ও বাহক প্রভু শবরপাদ। বোধিচিত্তকে সিদ্ধির দিকে চালিত করার জন্য যোগ-সাধনায় ক্রমান্বয়ে কর্ম-মুদ্রা, ধর্ম-মুদ্রা, মহা-মুদ্রা ও সময়-মুদ্রার ভেতর দিয়ে এগোতে হয়। মহা-মুদ্রা স্তরের উপলব্ধি জ্ঞেয়াবরণ-ক্লেশাবরণ মুক্ত, শরতের মধ্যদিনের মতো পরিচ্ছন্ন, ভব ও নির্বাণের মিলনে মহাসুখের উপলব্ধি। 'পাগ্‌-সাম্‌-জোন্‌-জাং'-এ সুম্‌পা এক শবরী-পাদের পরিচয়ে বলেন, তিনি ছিলেন বঙ্গাল দেশের পাহাড়ি ব্যাধ। তাঁকে এবং লোকি ও গুনি নামে তাঁর দুই স্ত্রীকে নাগার্জুন তন্ত্রধর্মে দীক্ষা দেন। ২৮ এবং ৫০ সংখ্যক চর্যাগীতি টীকাকার মুনিদত্ত শবরপাদের রচনা ধরে নিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন, শাস্ত্রীমশায়ও বলেছেন শবরের রচনা। কিন্তু পদ দুটিতে শবর নামটি ভণিতায় নেই। শবর-শবরীর বিরহ-মিলনের রূপক ব্যবহার করা হয়েছে। দ্র. *BA*, p. 841 ; *HB*-I, pp. 340-41 ; *SM*-II, pp. cxiv-xv ; *ITB*, pp. 174-75 ; চ-গী-প, পৃ. ২১-২২।

১৩. তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের অন্যতম উদ্ভবস্থান 'মহাযোগ পীঠ' উড্ডীয়ানের রাজা ইন্দ্রভূতি এবং তাঁর মেয়ে, মতান্তরে বোন লক্ষ্মীঙ্করা। হরপ্রসাদের মতে উড্ডীয়ান ওড়িশার কোনো জায়গা। ওয়াডেল বলেন, আফগানিস্তান ও কাশ্মীরের মাঝে স্বাত-উপত্যকায়। বিনয়তোষ বাংলাদেশে হওয়াও সম্ভব মনে করেন। ইন্দ্রভূতি ও লক্ষ্মীঙ্করা সম্ভবত অষ্টম (বিনয়তোষ) মতান্তরে নবম (Shendge) শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তেঙ্গুরের তালিকায় ইন্দ্রভূতির লেখা 'সিদ্ধবজ্রযোগিনীসাধন', 'জ্ঞানসিদ্ধিনাম-সাধনোপায়িকা', 'সহজসিদ্ধি', প্রভৃতি ২৩ খানি বইয়ের নাম পাওয়া যায়। ইন্দ্রভূতি ও লক্ষ্মীঙ্করা বজ্রযোগিনী-সাধন প্রবর্তন বা প্রচার করেন। বজ্রযান-সাধনার ধারায় অসংকোচে এক অভিনব মতবাদ প্রবর্তনের দিক থেকে লক্ষ্মীঙ্করার 'অদ্বয়সিদ্ধি' গুরুত্বপূর্ণ বই। উপবাস, ধর্মকর্ম, স্নান-শৌচ বর্জনীয়। কাঠ-পাথর-মাটির দেবতা বন্দনা করার প্রয়োজন নেই। নিত্য সমাহিত হয়ে দেহেরই পূজা করবে। লক্ষ্মীঙ্করার এই মতবাদ সম্পর্কে বিনয়তোষ বলেন, "...What Lakṣmīṁkarā advocates was quite out of the way and strange, even though since her time this new teaching has gradually won for it many adherents who are styled Sahajayānists, and who are still to be met with among Nāḍhā Nāḍhīs of Bengal and especially among Bāuls. (*SM*-II, p. lv)

Shendge লিখেছেন, "This short work [অন্বয়সিদ্ধি] has one unique feature *i.e.*, it is written by a woman who practised and preached Tantraism. From this point of view I expected some unique doctrines but in reality all her teachings in no way differ from those preached by the male practicants of the doctrine *e.g.*, those preached by Indrabhūti or Anaṅgavajra ['প্রজ্ঞোপায়বিনিশ্চয়সিদ্ধি' রচয়িতা, ইন্দ্রভূতির গুরু]. So naturally the question poses itself— whether there can at all be any such difference in the Sādhana prescribed for man and for woman ?' (Miss. Malati J. Shendge ed. *ADVAYASIDDHI*, Oriental Institute, Baroda, 19 , p. 11). দ্র. *BLT*, p. 197 ; *SM*-II, pp. xxxvii-xxxix, xlii.

১৪. তিব্বতী পরম্পরায় চাটিল নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ৫ সংখ্যক পদটি আদৌ চাটিলের লেখা কিনা সন্দেহ, কারণ, অন্য কোনো চর্যায় কোনো কবি নিজেকে অনুত্তরস্বামী (পুচ্ছতু চাটিল অনুত্তরসামী), অর্থাৎ যার চেয়ে শ্রেষ্ঠ গুরু নেই— বলেন নি। চাটিলের কোনো শিষ্যের লেখা হতে পারে। দ্র. চ-গী-প, পৃ. ১৩, ২৫।

১৫. এই বইয়ের পৃ. ৩০১ সূত্র ৩৩ দ্র.।

১৬. 'বু অ্যানাল্‌স'-এ ডোম্বী-হেরুককে বিরূ-পার শিষ্য বলা হয়েছে। বিরূ-পার সিদ্ধি অর্জনের দশ বছর পরে ডোম্বী সিদ্ধি অর্জন করেন। কুরুকুল্লাকল্প ও অরল্লিতন্ত্র ইনি প্রচার করেন। তেঙ্গুরের তালিকায় ডোম্বী হেরুকের লেখা 'গুহ্যবজ্রতন্ত্ররাজবৃত্তি', 'শ্রীসহজসিদ্ধি', 'সস্তোত্রকুরুকুল্লাসাধন' প্রভৃতি বইয়ের নাম পাওয়া যায়। গুহ্যবজ্রতন্ত্রের লেখক পরিচিতিতে তাঁকে মগধের রাজা বলা হয়েছে। দ্র. *BA*, p. 206 : *Tāranāth*, p. 222, 225.

১৭. ভাদের নামান্তর ভাণ্ডারিন্। তেঙ্গুরের তালিকায় তাঁর 'সহজআনন্দ-দোহাকোষগীতিকাদৃষ্টি' বইয়ের নাম আছে।

১৮. তেঙ্গুরের তালিকায় 'গুহ্যঅভিষেকপ্রক্রিয়া' নামে বীণাপাদের একখানি

বইয়ের নাম আছে। টীকাকার মুনিদত্ত এই পদটি বীণাপাদের রচনা বলেছেন, কিন্তু তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে 'বীণা' শব্দ যেভাবে আছে তা কবির ভণিতা মনে হয় না। পদটিতে বীণা যন্ত্রের গড়নের ও নাচগানের রূপক ব্যবহার করা হয়েছে। দ্র. চ-গী-প, পৃ. ১৯।

১৯. 'বৌদ্ধগান ও দোহা'য় কুক্কুরীপাদের 'দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই' (২) এবং 'হাঁউ নিরাসী খমণভতারে' (২০) ঐই দুটি পদ সংকলিত হয়েছিল। ৪৮ সংখ্যক পদটিও কুক্কুরীপাদের, পুথির পাতা না থাকায় পাওয়া যায় নি। প্রবোধচন্দ্র বাগচী তিব্বতি থেকে পদটি সংস্কৃতে অনুবাদ করে দিয়েছেন—

[রাগঃ পটহঃ কুক্কুরীপাদানাম্‌।]
কুলিশাব্জযুদ্ধং প্রবিষ্টাঃ।
সমতাযোগস্য সৈনিকসমূহাঃ ॥ ১ ॥
বিষয়েন্দ্রিয়গ্রামানহন্‌।
শূন্যতারাজ্যো মহাসুখনামা ॥ [ধ্রুবপদ] ॥
তূর্যশব্দঃ শঙ্খধ্বনির্‌ অপ্রতিহতনাদং নদতি।
মোহভববলানি দূরাতীতানি ॥ ২ ॥
সুখপুরং শিখরে সংস্থাপ্য সর্বম্‌ আকৃষ্টং (সংগৃহীতং বা)।
অঙ্গুলিম্‌ ঊর্ধ্বং ক্ষিপ্ত্বা কুক্কুরীপাদো বদতি ॥ ৩ ॥
অয়ং ত্রৈলোক্যে মহাসুখেন জয়তি
তত্ত্বস্যার্থং শব্দান্তরেণ কুক্কুরীপাদেন কথিতং ॥ ৪ ॥

(*C-G-K*, p. 157)

তেঙ্গুরের তালিকায় এঁর নামান্তর কুকুর-রাজ। 'শ্রীবজ্রসত্ত্বগুহ্যঅর্থধর-ব্যূহ', 'বজ্রসত্ত্বসাধন', 'মোহতরুণকল্প' প্রভৃতি তাঁর ১৪ খানি বইয়ের নাম আছে। 'সাধনমালা'য় ২৪০ সংখ্যক 'মহামায়াসাধনোপায়িকা' রচনায় কুক্কুরীপাদ হেরুকসাধনার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেছেন। এই রচনায় একটি বজ্রগীতি আছে যা চর্যা দুটির মতোই 'নারী-ভাষিত'। তিব্বতি ঐতিহ্য মতে ইনি পুবদেশ কপিলশত্রুর (রাহুল সাংকৃত্যায়ন বলেন কপিলাবস্তুর) ব্রাহ্মণ। চুরাশি সিদ্ধাচার্যের অন্যতম এবং মন্ত্রযানের (হেরুকসাধন) প্রবর্তক। তারনাথ এঁকে ইন্দ্রভূতি, সরোরুহবজ্র ও ললিতবজ্রের সমকালীন বলেন। দিনের বেলায় ইনি কুকুরের ছদ্মরূপে উপদেশ দিতেন। রাত্রে শ্মশানে গুণচক্র সাধন করতেন। ১২ বছরের সাধনায় মহামুদ্রাসিদ্ধি অর্জন করেন। দ্র. *SM*-II, p. cii ; *Tāranāth*, pp. 240-41, *HB*-I, p. 342.

২০. এই বইয়ের পৃ. ৩০২ সূত্র ৩৬ দ্র.

২১. চুরাশি সিদ্ধাচার্যের অন্যতম, বৌদ্ধ তান্ত্রিক-সাধক। ন্যাড়, নাড়-পাদ, নাড়োপা, নাঢ়, নরোত্তম-পাদ, নারো প্রভৃতি নামে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। নাড় বা ণাড় শব্দের অর্থ জ্ঞানী। জ্ঞাতক > জ্ঞাট > ণ্নাট > ণাড়। জন্ম বরেন্দ্রভূমিতে। বিখ্যাত নৈয়ায়িক জেতারির ছাত্র। নাড় পণ্ডিতকে রাজা নয়পালের (আ. ১০৩৮-৫৫ খৃ.) সমসাময়িক মনে করা হয়। মগধের ফুল্লহরিতে তিনি তন্ত্র-সাধনা করেন। পরে বিক্রমশীল মহাবিহারের উত্তর-দ্বারের দ্বার-পণ্ডিত নিযুক্ত হন। নবাগত শিক্ষার্থীদের বিদ্যাবুদ্ধি পরীক্ষা, করে নির্বাচনের দায়িত্ব থাকত দ্বার-পণ্ডিতদের উপরে। নাড় দীপঙ্করশ্রী জ্ঞানের অন্যতম শিক্ষাগুরু। তিব্বতের বিখ্যাত সিদ্ধাচার্য মার-পা তাঁর ছাত্র। তেঙ্গুরের তালিকায় তাঁর 'বজ্রগীতি', 'নাড়পণ্ডিতগীতিকা', 'একবীরহেরুকসাধন', 'গুহ্য-সমাজউপদেশপঞ্চকর্ম', 'বজ্রযোগিনীগুহ্যসাধন' ইত্যাদি বইয়ের নাম আছে। হরপ্রসাদ বলেন, যোগী হলেও নাড় পণ্ডিত গৃহাশ্রমে ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম নিগু, উপাধি জ্ঞানডাকিনী (শব্দটি বিদুষী অর্থে ব্যবহার হত)। এঁরা দুজনেই হেবজ্রের উপাসক ছিলেন।

নিগু নাড় পণ্ডিতের স্ত্রী— এই তথ্যের সূত্র হরপ্রসাদ উল্লেখ করেন নি। তবে তেঙ্গুরের তালিকায় জ্ঞানডাকিনী নিগু বা নিগু-মার 'উপায়-মার্গচণ্ডালিকাভাবনা', 'চক্রসম্বরমণ্ডলবিধি', 'প্রণিধানরাজ', 'মহামরজ্ঞান' প্রভৃতি বইয়ের নাম আছে। দ্র. *HB*-I, pp. 419-20 ; *BE*, pp. 65-66 ; *2500 years*, pp. 200-01 ; *BLT*, p. 16.

২২. শূন্যবাদী মাধ্যমিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা নাগার্জুন দ্বিতীয় খৃস্টাব্দের শেষ ভাগের মানুষ— এই অনুমান নিরাপদ। (দ্র. *HIL*, Vol. II, p. 342).

বৌদ্ধ-তান্ত্রিক নাগার্জুন সরহপাদের শিষ্য, নালন্দায় তন্ত্রধর্মে তাঁর অভিষেক সম্পন্ন হয়। সাধন ও তন্ত্রের একজন প্রধান লেখক রূপে নাগার্জুনের প্রতিষ্ঠার প্রমাণ তেঙ্গুরের তালিকায় তাঁর বহু বইয়ের উল্লেখ। 'বজ্রতারাসাধনম্' (৯৬) ও 'একজটাসাধনম্' (১২৭) নামে দুটি রচনা 'সাধনমালা'য় সংকলিত। (*SM*-I)

২৩. আবু'ল রৈহান্ মহম্মদ্ ইব্‌ন্ আহ্‌মদ অল্‌-বীরূনীর (৯৭৩-১০৪৮ খৃ.) জন্ম তুর্কিস্তানের খোয়ারিজ্‌ম অঞ্চলে। গজনির সুলতান মামুদ খোয়া-

রিজ্‌ম জয় করে অল্‌-বীরূনীকে পরাজিত পক্ষের অন্যতম প্রতিভূ রূপে ১০১৭ খৃস্টাব্দে গর্জনিতে নিয়ে যান এবং ভারতে মামুদের সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে তিনি ভারতে আসার সুযোগ পান। নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত অল্‌-বিরূনী সংস্কৃত ভাষা শিখে হিন্দু শাস্ত্র ও ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে গভীর চর্চা করেন। মূল রচনা ও অনুবাদ নিয়ে তাঁর ২৭ খানি বই আজও পাওয়া যায়, অন্য বহু রচনা লুপ্ত হয়ে গেছে। ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা, ৮০টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত 'তহকীক্‌ মা লি'ল-হিন্দ্‌ মিন্‌ মক্কাল মক্কবুল ফি'ল অক্ল্‌ অও মর্ধূ'ল' বা সংক্ষেপে তারীখ্‌-উল্‌ হিন্দ্‌' একাদশ শতাব্দীর ভারত সম্পর্কে একটি প্রামাণ্য বই।

২৪. বৌদ্ধ সংস্কৃত বা বৌদ্ধ লেখকদের সংস্কৃত ভাষার তিন শ্রেণী। ১. অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত', 'সৌন্দরনন্দ' প্রভৃতি রচনার ভাষা। ২. 'ললিত-বিস্তর', 'দিব্যাবদান', 'অবদানশতক', 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক' প্রভৃতি রচনার গদ্য অংশের ভাষা। ৩. 'মহাবস্তু' এবং 'ললিতবিস্তর' ও 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক'এর-কাব্যাংশের ভাষা। প্রথম শ্রেণীর রচনার ভাষার সঙ্গে পাণিনীয় সংস্কৃতের অমিল সামান্য। বেশি অমিল দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনার ভাষায়। অল্পস্বল্প ব্যাকরণ-দুষ্ট ও উপভাষাগত প্রয়োগ এবং মধ্যভারতীয় আর্যভাষার রীতি অনুযায়ী পদ প্রয়োগ আছে। তৃতীয় শ্রেণীর রচনার ভাষাকেই যথার্থ বৌদ্ধ-সংস্কৃত বলা যায়। সাধারণভাবে একে একদা বলা হত 'গাথা-ভাষা' এখন বলা হয় 'মিশ্র সংস্কৃত'। ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে এ ভাষার গুরুত্ব আছে, কারণ, সংস্কৃতে অপ্রচলিত হয়ে যাওয়া আদি-ভারতীয় আর্যভাষার বাক্‌রীতির অনেক ছাঁটছোঁট ও নব্য-ভারতীয় আর্যভাষার বাগ্‌ধারার অনেক নবাঙ্কুর এতে স্বীকৃত হয়েছে। দ্র. Sukumar Sen, "An outline syntax of Buddhistic Sanskrit", *Journal of the Department of Letters*, Vol. xvii, Calcutta University Press, 1928; শাস্ত্রী, 'হিন্দু ও বৌদ্ধে তফাত', সা-প-প, দ্বিতীয় সংখ্যা ১৩৩১ ব. এবং 'বুদ্ধদেব কোন্‌ ভাষায় বক্তৃতা করিতেন', সা-প-প, দ্বিতীয় সংখ্যা ১৩৩৩।

শ্রীসুকুমার সেন।

২৫. "Subba Viṣṇuprasād Rājbhaṇḍārī was descended from a long line of hereditary Prime Minister of the Newar Rājās of Nepal. His grandfather did his best

to support the cause of the Newar Rājās against the Gurkha invaders. Unsuccessful in his attempt he went to voluntary exile with the Rājā at Benares and died on the bank of the Gaṇḍak where it is said that he was turned into a hillock. Viṣṇuprasād's father was a class friend of Jung Bahadur and was the Governor of Western Nepal. When Jung made himself master of Nepal by the events of 1846, Viṣṇuprasād's father retired from state service and trained his son for literary profession. Jung Bahadur made him Librarian of the Durbar Library— a post which eminently fitted him. Viṣṇuprasād was an ardent student of Tantra and thorough believer in its doctrines. He has made a large collection of Tantric works and Tantric charts and pictures which has made that Library a unique source of information on Tantric subjects. His death is mourned by a large circle of friends and admirers both among the Newars and Gurkhas of Nepal." (Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, March 1914. Mm. Haraprasad Shastri, C.I.E., Vice President in the chair.) দ্র. *JASB* New Series, Vol. X, p. Lxxxi. ১৯১৬ খৃস্টাব্দে শাস্ত্রীমশায়ের অনুমোদনে প্রকাশিত '*Mahamahopadhaya Haraprasad Shastri, M.A., C.I.E., F.A.S.B.*' পুস্তিকায় এই শোক-নিবন্ধ তাঁর রচনাপঞ্জীতে গৃহীত।

২. পাঠ-প্রসঙ্গ

বর্তমান মুদ্রণে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পাঠ অনুসরণ করা হয়েছে।

'বৌদ্ধগান ও দোহা'য় (১৩২৩ ব.) এই অভিভাষণের তৃতীয় অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় বাক্য, "একজন ফরাসিস পণ্ডিত তেঙ্গুরের..." থেকে তৃতীয় অনুচ্ছেদের শেষ বাক্য পর্যন্ত 'মুখবন্ধ'-এর ৩০ অনুচ্ছেদে (পৃ. [১৬]) রাখা হয়। এবং এই অভিভাষণের ৪৯ অনুচ্ছেদের সপ্তম বাক্য, "যে-সকল পুস্তক ছাপাইতেছি, ..." থেকে শেষ পর্যন্ত 'বৌদ্ধগান ও দোহা'র 'মুখবন্ধ'-এর ৩১-৩৪ অনুচ্ছেদে (পৃ. [১৭]-[১৯]) রাখা হয়। পাঠ ঈষৎ পরিবর্তিত।

অভিভাষণটির ৪-৪৮ অনুচ্ছেদ 'বৌদ্ধগান ও দোহা'য় মুখবন্ধের পরে "পদকর্ত্তাদের পরিচয়" শিরোনামে ছাপা হয়েছিল। বইয়ে নেবার সময়ে যে-সব পরিবর্তন করেন তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখানে দেখানো হল। চর্যাগীতি থেকে তোলা অংশগুলির পাঠ কোথাও কোথাও শাস্ত্রীমশায় সংশোধন করেন। শুধু সেই সংশোধন পাঠান্তরে দেখানো হয়েছে। অন্যত্র কোনো পরিবর্তন করা হয় নি।

নিচের উল্লেখগুলির শুরুতে ব্যবহৃত সংখ্যা দুটির প্রথমটিতে এই বইয়ের পৃষ্ঠা-সংখ্যা এবং দ্বিতীয়টিতে ছত্র সংখ্যা নির্দেশ করা হয়েছে।

৩৮৫/২: "শান্তিদেব বা ভুসুকু বা রাউতু যে একজন লোক··· ৩২টি চলিত বাংলা।" 'বৌদ্ধগান ও দোহা'য় এই অংশের পরিবর্তিত রূপ: "বোধিচর্যাবতার প্রভৃতি মহাযানগ্রন্থের কর্তা শান্তিদেবকে তাঁহার জীবনচরিতকার রাউতু বা ভুসুকু বলিয়া গিয়াছেন। তিনি ৬৪৮ হইতে ৮১৬ খৃঃ অব্দের মধ্যে তাঁহার বইগুলি লিখেন। তাঁহার বাড়ি কোথায় ছিল জানা যায় না। তারানাথ বলিয়াছেন, তাঁহার বাড়ি সৌরাষ্ট্রে ছিল। জীবনচরিতকার তাঁহার দেশের যে নামটি দিয়াছেন, তাহা পড়া যায় না, কিন্তু অনেক দিন মগধ ও নালন্দায় ছিলেন ও তিনি মঞ্জুবজ্রের নিকট উপদেশ পাইয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয় ইনি ভারতের পূর্বাঞ্চলের লোক হইবারই অধিক সম্ভাবনা।

"আর একজন শান্তিদেব, উপাধি যোগীশ্বর, দুইখানি তন্ত্রের পুথি লিখিয়াছেন। একখানির নাম 'শ্রীগুহ্যসমাজমহাযোগতন্ত্রবলিবিধি', আর এক-খানির নাম 'সহজগীতি'। ইহারই বংশধর মেকলের মত-অনুসারে আর একখানি তন্ত্রের পুস্তক লেখা হয়। উহার নাম 'চিত্তচৈতন্যশমনোপায়'। তেঙ্গুরে বলে ইঁহার বাড়ি 'জাহোর'। একজন ভুসুকু সোসাইটির ৪৮০১ নম্বরের পুথিখানি লিখিয়াছেন। ঐ পুস্তকে তান্ত্রিক বৌদ্ধদিগের কুটীনির্মাণ শয়ন-ভোজন-পান ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে। ঐ গ্রন্থেও আবার কয়েকটি বাংলা দোহা আছে।

"আমাদের সিদ্ধাচার্য রাউতু ভুসুক চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের ৮টি পদ লিখিয়া গিয়াছেন। প্রথম ভুসুক শান্তিদেবের সহিত তাঁহার যে কোনো সম্পর্ক আছে, এমন বোধ হয় না, কারণ শান্তিদেব অনেক পূর্বের লোক। আমাদের ভুসুক লুই সিদ্ধাচার্যের পরের লোক। কারণ, লুই আদিসিদ্ধাচার্য ও তাঁহার সময় ৯৫০ হইতে ১০৫০ এর মধ্যে। আমাদের ভুসুকু যখন একজন সিদ্ধাচার্যমাত্র তখন তিনি যে লুইয়ের পরবর্তী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

"তবে কি তিনি তান্ত্রিক শান্তিদেবের সহিত এক। এ কথা বলিবার এই-মাত্র কারণ দেখিতে পাই যে, শান্তিদেব 'সহজগীতিকা' নামে পুস্তক লিখিয়াছেন, আর ভুসুকুও সহজিয়া মতের গান লিখিয়াছেন।

"যে ভুসুকু সোসাইটি ৪৮০১ নম্বরের পুথিখানি লিখিয়াছেন তিনি ও আমাদের সিদ্ধাচার্য ভুসুকু কি এক ? এক হইতেও পারে, কারণ দুজনেই বাংলা লিখিয়াছেন। কিন্তু আরো অধিক খবর না পাইলে ইঁহারা এক কিনা বলা যায় না। আমাদের ভুসুকু যে বাঙালি ছিলেন, তাহা তাঁহার গানেই প্রকাশ। তিনি বলিয়াছেন—

আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী।
ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী॥

"তাঁহার আটটি গানে তাঁহার নাম ভুসুকু বাদে ৩২৩টি কথা আছে। ইহার মধ্যে ৩৭টি সংস্কৃত, ৬৮টি বিকৃত সংস্কৃত, ১৮৬টি পুরানো বাংলা ও ৩২টি চলিত বাংলা।"

৩৮৮/৬ : "জোইণি তঁই বিনু… "। পাঠান্তর : "জোইনি তঁই বিনু…"।

৩৮৮/১৫ : "টালত মোর ঘর নাহি পড়বেশী"। পাঠান্তর : "টালত… পড়বেষী"।

৩৮৯/৩ : "তিনি এ° বাটে… " ছত্রটির পাঠান্তর "তিনি এ° পাটে° লাগেলি রে অণহ কসণ ঘণ গাজই।"

৩৮৯/১৭ : "মিছে লো অ বন্ধাবএ অপনা।" পাঠান্তর : "মিছে… আপনা।"

৩৮৯/২৪ : "সরোরুহবজ্রের দোহাকোষের কথা… এ বৎসর বলিব না।"
পাঠান্তর : "সরোরুহবজ্রের দোহাকোষের কথা একবার বলা হইয়াছে, কিন্তু তিনি…।"

৩৯১/৫ : "সহজে থির করি…।" পাঠান্তর : "সহজে থির করী…।"

৩৯১/১২-১৬ : "একখানি 'সহজগীতি' আছে,… আমরা স্থির করিতে পারি না।" এই অংশ 'বৌদ্ধগান ও দোহা'য় বর্জিত।

৩৯২/২২ : "১৭টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন।" সংশোধিতপাঠ : "৭৭টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন।"

৩৯২/২৬ : "উমত… গুলা গুহাডা… ।" পাঠান্তর : "উমত… গুলী গুহাডা…।"

৩৯৫/৩ : "তিনি ভুথণ··· মাঝেঁ কাবালী।" পদের পরিবর্তে উদ্ধৃত—

"গঙ্গা জউনা মাঝেঁরে বহই নাঙ্গ।
তহিঁ বুড়িলী মাতঙ্গি পোইআ লীলে পার করেই ॥
বাহ তু ডোম্বী বাহলো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা।
সদ্‌গুরু পাঅপএ জাইব পুণু জিণউরা ॥" [পত্রাঙ্ক ২৫]

৩৯৫/১২ ; "এবেঁ মুই··· ।" পাঠান্তর : "এবেঁ মই··· ।"

৩৯৫/২২ : "অণহা দাণ্ডী··· অবধুতী।" পাঠান্তর : "অণহা দাণ্ডী··· অবধূতী।"

৩৯৮/১ : "··· নাগার্জুন খৃস্টের তিন শতকে বর্তমান ছিলেন।" পাঠান্তর : "··· নাগার্জুন খৃস্টের দুই শতকে বর্তমান ছিলেন।"

৪০০/৩ : "রম রম··· রজ্জু।" পাঠান্তর : "রম রম··· বজ্জু।"

৪০০/৫ : "লোঅণ করুনাভাব হু তুম্ম।" পাঠান্তর : "লোঅণ করুনা ভাবহু তুম্ম।"

৪০০/১২ : "তাহাতে বোধ হয় যে, নাথপন্থের নাথদিগেরও অনেক গ্রন্থ বাংলায় লেখা হইয়াছিল।" এই অনুচ্ছেদের পরে 'বৌদ্ধগান ও দোহা'য় সংযোজন—

"নাথদিগকে সিদ্ধও বলিত, বর্ণনরত্নাকরে তাঁহাদের একটি তালিকা দেওয়া আছে। বর্ণনরত্নাকর এশিয়াটিক সোসাইটির একখানি তালপাতার পুথি নং ৪৮/৩৪— অক্ষর, বাংলা— লিপিকাল, ল০ সং ৩৮৮। গ্রন্থকার, কবিশেখরাচার্য জ্যোতিরীশ্বর, মিথিলার রাজা হরিসিংহদেবের সভায় একজন কবি ছিলেন। হরিসিংহদেবের রাজত্বকাল খৃঃ অঃ ১৩০০-১৩২১।

"পুস্তকে নানাবিধ বর্ণনা দেওয়া আছে ; যথা :—

নগরবর্ণনো নাম প্রথমঃ কল্লোলঃ।
নায়িকাবর্ণনো নাম দ্বিতীয়ঃ কল্লোলঃ।
আস্থানবর্ণনো নাম তৃতীয়ঃ কল্লোলঃ।
ঋতুবর্ণনো নাম চতুর্থঃ কল্লোলঃ।
প্রয়াণবর্ণনো নাম পঞ্চমঃ কল্লোলঃ।
ভট্টাদিবর্ণনো নাম ষষ্ঠঃ কল্লোলঃ।

শ্মশানবর্ণনো নাম সপ্তমঃ কল্লোলঃ।

"অথ চৌরাসীসিদ্ধ বর্ণনা—

গ্রন্থকার চৌরাসীসিদ্ধের বর্ণনা করিতেছেন; কিন্তু মাত্র ৭৬টি নাম পাওয়া যায়।

"১ মীননাথ, ২ গোরক্ষনাথ, ৩ চৌরঙ্গীনাথ, ৪ চামরীনাথ, ৫ তন্তিপা, ৬ হালিপা, ৭ কেদারিপা, ৮ ধোঙ্গপা, ৯ দারিপা, ১০ বিরূপা, ১১ কর্পালী, ১২ কমারী, ১৩ কাহ্ন, ১৪ কনখল, ১৫ মেখল, ১৬ উন্মন, ১৭ কাণ্ডলি, ১৮ ধোবী, ১৯ জালন্ধর, ২০ টোঙ্গী, ২১ মবহ, ২২ নাগার্জুন, ২৩ দৌলী, ২৪ ভিষাল, ২৫ অচিতি, ২৬ চম্পক, ২৭ ঢেণ্টস, ২৮ ভুম্বরী, ২৯ বাকলি, ৩০ তুজী, ৩১ চর্পটী, ৩২ ভাদে, ৩৩ চান্দন, ৩৪ কামরী, ৩৫ করবৎ, ৩৬ ধর্মপাপতঙ্গ, ৩৭ ভদ্র, ৩৮ পাতলিভদ্র, ৩৯ পলিহিহ, ৪০ ভানু, ৪১ মীন, ৪২ নির্দয়, ৪৩ সবর, ৪৪ সান্তি, ৪৫ ভর্তৃহরি, ৪৬ ভীষণ, ৪৭ ভটী, ৪৮ গগনপা, ৪৯ গমার, ৫০ মেণুরা, ৫১ কুমারী, ৫২ জীবন, ৫৩ অঘোসাধব, ৫৪ গিরিবর, ৫৫ সিয়ারী, ৫৬ নাগবালি, ৫৭ বিভবৎ, ৫৮ সারঙ্গ, ৫৯ বিবিকিধজ, ৬০ মগরধজ, ৬১ অচিত্ত, ৬২ বিচিত, ৬৩ নেচক, ৬৪ চাটল, ৬৫ নাচন, ৬৬ ভীলো, ৬৭ পাহিল, ৬৮ পাসল, ৬৯ কমল-কঙ্গারি, ৭০ চিপিল, ৭১ গোবিন্দ, ৭২ ভীম, ৭৩ ভৈরব, ৭৪ ভদ্র, ৭৫ ভমরী, ৭৬ ভুরুকুটী।

"সুতরাং মুসলমান-বিজয়ের পূর্বে বাংলা দেশে একটা প্রবল বাংলা সাহিত্যের উদয় হইয়াছিল। তাহার একটি ভগ্নাংশ মাত্র আমি বাঙালি পাঠকের কাছে উপস্থিত করিতেছি। ভরসা করি, তাঁহারা যেরূপ উদ্যম সহকারে বৈষ্ণব-সাহিত্য ও অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধার করিয়াছেন, ঐরূপ উৎসাহে বৌদ্ধ ও নাথ-সাহিত্যের উদ্ধার সাধন করিবেন। ইহার জন্য তাঁহাদিগকে তিব্বতি ভাষা শিখিতে হইবে, তিব্বত ও নেপালে বেড়াইতে হইবে, কোচবিহার, ময়ূরভঞ্জ, মণিপুর, সীলেট প্রভৃতি প্রান্তবর্তী দেশে ও প্রান্তভাগে ঘুরিয়া গীতি, গাথা ও দোহা সংগ্রহ করিতে হইবে। ইহাতে অনেক পরিশ্রম করিতে হইবে, অনেক বার হতাশ হইয়া ফিরিতে হইবে। কিন্তু যদি সংগ্রহ করিতে পারেন, তবে দেখিতে পাইবেন যে, যাঁহারা এ পর্যন্ত কেবল আপনাদের কলঙ্কের কথাই কহিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা একেবারেই সত্য কথা কহেন নাই।"

লুইপাদ

কঙ্কালীপাদ

কুক্কুরীপাদ
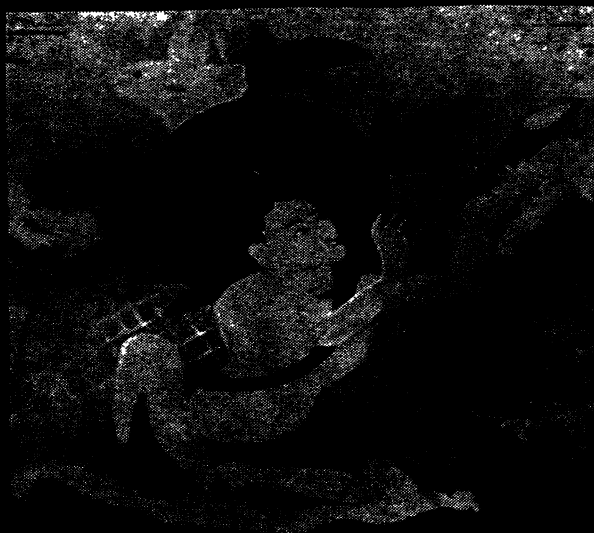
নাগার্জুনপাদ

৫. সভাপতির অভিভাষণ

রীতি আছে, বার্ষিক অধিবেশনের দিন সভাপতিকে একটা বক্তৃতা করিতে হয়। কিন্তু সাহিত্য-পরিষদে কাজ এতই বাড়িয়া গিয়াছে যে, সেদিন আর সভাপতির অভিভাষণ কিছুতেই হইতে পারে না। তাই গত বৎসর আমার বক্তৃতা হয় নাই। বৎসরের মধ্যে বক্তৃতার জন্য চেষ্টা হইয়াছিল, কখনো আপনারা সময় করিয়া উঠিতে পারেন নাই, কখনো আমি পারি নাই। সুতরাং হয় নাই। আমার সে দেনাটা শোধ করা দরকার। তাই আজিকার আয়োজন।

কিন্তু বলিব কী? গত বৎসরে ইচ্ছা ছিল, বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের কথা বলিব। আপনাদেরও তাই ইচ্ছা ছিল। শুধু সামাজিক ইতিহাসের কথা বলিতে গেলেই জাতির কথা বলিতে হয়। জাতির উপর এখন বড়ো রাগ। ওটা একটা পুরানো জিনিস; কখনো হয় তো উহাতে কিছু উপকার হইয়াছিল, এখন কেবল অপকার— কেবল অপকার; ভারতের সর্বনাশের কারণই জাতি। জাত ভাঙো— সব একত্রে খাও— পরস্পর বিয়ে করো— অনাচরণীয়দের আচরণীয় করে নাও, তাদের সঙ্গে খাও দাও, তাদের সঙ্গে বিয়ে-থা দাও— সব একাকার হয়ে যাক— সব ডিমক্রাসি হয়ে যাক। এ সব তো বেশ কথা— ভালো কথা, উন্নতির কথা। কিন্তু জাতির কথা উঠিলেই সবাই চটিয়া যায়। এমন চটা নয়— একেবারে চটিয়া লাল। সেবার বাংলার গৌরবের কথা বলিতে গিয়া, কায়স্থ ব্রাহ্মণের কিছু সুখ্যাতি করিয়াছিলাম। তাই বৈদ্য মহাশয়েরা আমার উপর চাবুকের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কাল একজন জাতি-সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ লেখক আমায় লিখিয়াছেন, 'আমি' অমুকের জাতিকে তাঁহার মনের মতো করিয়া বড়ো করিতে পারি নাই, তাই তাঁহার সঙ্গে আমার পত্র-ব্যবহার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাই আমি আর ও গোলযোগের ভিতরে যাইতে চাহি না। আর-একটা কিছু বলিতে চাই। কী বলিব? এক বৎসর ধরিয়া ভাবিলাম। শেষ স্থির করিলাম, বাংলার গৌরবের আর-একটা অধ্যায় বাড়াইয়া দিব। বাংলা সাহিত্যে আর-একটা অতি প্রাচীন পাত উল্টাইয়া দিব। বাংলার একটা পুরানো কাহিনী বলি।

হ. ২।২৮

নগেনবাবু [নগেন্দ্রনাথ বসু, ১৮৬৬-১৯৩৮ খৃ.] ও দীনেশবাবু [দীনেশচন্দ্র সেন, ১৮৬৬-১৯৩৯ খৃ.] দুজনেই মনে করিয়াছিলেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ইংরেজি ১১ শতকে আরম্ভ। তাঁহাদের প্রমাণ শূন্য-পুরাণ আর ধর্মমঙ্গল।[১] শূন্যপুরাণ রামাই পণ্ডিতের লেখা। নিরঞ্জনের উষ্মা নামে রামাই পণ্ডিতের একটি ছড়া আছে। সে ছড়ায় রামাই পণ্ডিতের ভণিতা দেওয়া আছে। সুতরাং সেটি যে রামাই পণ্ডিতের, তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই। সে ছড়াটি কিন্তু বাংলাদেশের কোনো জায়গায় মুসলমান আক্রমণের ছড়া। সুতরাং মুসলমান আক্রমণের অনেক পরে লেখা। অনেক পরে বলি কেন? যেহেতু সে তো নবদ্বীপ অধিকারের কথা নয়, গৌড় অধিকারেরও কথা নয়। একটা কোনো ছোটো গ্রাম, নগর বা জায়গা অধিকারের কথা। এটা এখন স্থির যে, মুসলমানেরা একেবারে সারা বাংলাটা দখল করিতে পারেন নাই। তাঁহাদিগকে ধীরে ধীরে অধিকার করিতে হইয়াছিল। সুতরাং এ 'উষ্মা' গৌড় ও মালদহ অধিকারের বেশ-একটু পরে হইয়াছিল। শ-খানেক বৎসর বলিলে বোধ হয়, বেশিও বলা হয় না, কমও বলা হয় না। কারণ, প্রথম একশো বৎসরের ইতিহাসে দেখিতে পাই, মুসলমানরা আপনা আপনি লড়াই-ঝগড়া করিতেছেন। সুতরাং 'উষ্মাটা' ইংরাজি ১৪ শতকের লেখা বলিয়াই বোধ হয়। ১১ শতকের নহে। উহাকে ও শূন্যপুরাণকে ১১ শতকের লেখা বলিলে একটু বেশি পুরানো বলা হয়।

ধর্মমঙ্গলের গল্পটা একটু পুরানো বটে। ধর্মপালের ছেলে— নাম দেওয়া নাই, গৌড়ের রাজা। কিন্তু ধর্মমঙ্গল বইখানা তত পুরানো নহে। "হাকন্দপুরাণমতে ময়ূর ভট্টের পথে" উহা রচিত হইয়াছে। হাকন্দ-পুরাণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। ময়ূরভট্টের পুথি পাওয়া গিয়াছিল। ময়ূরভট্ট যে বেশি পুরানো লোক, তাহা বোধ হয় না। তাঁহার পুথিতে বর্ধমান মঙ্গলকোট রাঢ়দেশের প্রধান জায়গা। সেটা ১৪ শতকের বেশি আগে হইবে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং শূন্যপুরাণে ও ধর্মমঙ্গলে প্রমাণ হয় না যে, বাংলা সাহিত্য ১১ শতকে আরম্ভ হইয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্বে আমি কতকগুলি বৌদ্ধগান ও দোহা ছাপাইয়া-

ছিলাম। সেগুলি খৃস্টের ১০ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া ১১র শেষ পর্যন্ত আসিয়াছিল বোধ হয়। সেগুলি সিদ্ধাচার্য-সম্প্রদায়ের গান। লুই[২] আদি সিদ্ধাচার্য। লুই ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান[৩] দুজনে 'লুই অভি-সময়' নামে একখানি সংস্কৃত বই লিখিয়াছিলেন। হীনযানে যাহাকে 'অভিধর্ম' বলে, মহাযানে তাহাকে 'অভিসময়' বলে— অর্থাৎ দর্শনশাস্ত্র। লুই যে ধর্ম প্রচার করেন, লুই ও শ্রীজ্ঞান দুজনে মিলিয়া তাহার দর্শন-শাস্ত্র প্রস্তুত করেন। লুইয়ের সময় জানা নাই। শ্রীজ্ঞানের সময় জানা আছে। তিনি ৯৮০ [৯৮২ খৃ] সালে জন্মান, ৫৮ বৎসর বয়সে ১০৩৮ [১০৪০ খৃ.] সালে ভোটের রাজার অনুরোধে ভোটদেশে যান। সেখানে ১৪ বৎসর ধর্মপ্রচার করিয়া ১০৫২ [১০৫৪ খৃ] সালে মরেন। সুতরাং লুই যখন একটা ধর্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে বাংলা গান লেখা হইয়াছে, তখনই শ্রীজ্ঞানের আবির্ভাব। শ্রীজ্ঞান নাড় পণ্ডিতের[৪] শিষ্য এবং লুইয়েরও শিষ্য। কাজেই লুইয়ের যখন অনেক বয়স হইয়াছে, তখন শ্রীজ্ঞানের বয়স অল্প। 'লুই অভিসময়' যদি ১১ শতকের প্রথম ভাগে লেখা হয়, তাহা হইলে লুইয়ের গানগুলি তার আগে লেখা হইয়াছিল। তাই বলিতেছিলাম, সিদ্ধাচার্যদের গানগুলি ১০ম শতকে আরম্ভ হইয়া ১১শ শতকে শেষ হইয়াছে।

অনেকে বলেন যে, সিদ্ধাচার্যদের গানগুলি বাংলা নয়। কেহ বলেন উহা অপভ্রংশ ভাষা, কেহ বলেন, উহা প্রাকৃত, কেহ বলেন, উহা বৌদ্ধ-প্রাকৃত ; আবার একজন আছেন ; তিনি বলেন, উহা ভাষাই নয় ; নানা ভাষা হইতে কথা সংগ্রহ করিয়া কোনো রকমে সাজাইয়া দিয়াছে মাত্র। আরংজীবের সময় যেমন একটা তৈরি ভাষায় কোরান লেখা হইয়াছিল, সে ভাষাটাই তৈয়ারি ; এও সেই রকম। আমি বলি, তা হয় হউক ; আমার তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু লুই বাঙালি ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ; তাঁহার চেলারাও অনেকে বাঙালি ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেই কালে বাংলাদেশে চলিত ভাষায় গান লেখা হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে ভাষাকে বৌদ্ধ-প্রাকৃতই বলো, প্রাকৃতই বলো, অপভ্রংশই বলো, আর যা-ই বলো ; ওটা তো নাম দেওয়া মাত্র। আমি না-হয়, বাংলাদেশের ভাষাকে বাংলা নাম দিলাম, তাহাতেই বা দোষ কী ?

কিন্তু এ বিষয়ে কাশীদাস আমার বড়ো সাহায্য করিয়াছেন। তিনি মহাভারতের গোড়াতেই বলিয়াছেন—

শ্লোকচ্ছন্দে সংস্কৃত রচিলেন ব্যাসে।
গীতচ্ছন্দে কহি তাহা সুন অনায়াসে॥

এখানে 'গীতি' শব্দ বাংলা গান অর্থে ব্যবহার হইয়াছে। তাহার উল্টা —সংস্কৃত কবিতা অর্থে 'শ্লোক' শব্দ ব্যবহার হইয়াছে। শ্লোক ও গীতি যখন এক জায়গায়ই ব্যবহার হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে, একটা সংস্কৃত ও একটা বাংলা ছন্দ। তাহা হইলে গীতি শব্দটার অর্থ —বাংলা ছন্দ। গীতি শব্দ কাশীরাম দাস এই অর্থে অনেক জায়গায় ব্যবহার করিয়াছেন। যে পুথিখানি হইতে আমরা এ কথা বলিতেছি, সে পুথিখানি বাংলা ৯৮৫ সালে লেখা, অর্থাৎ খৃ. ১৫৭৯।[৫] তাহা হইলে আমাদের বুঝিতে হইবে, ১৬ শতে বাংলায় 'গীতি' শব্দ বাংলা গান অর্থে ব্যবহার হইত। সিদ্ধাচার্যদের গানের বইয়ের নাম— গীতি। চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের নাম চর্যাগীতি। অনেকগুলি সিদ্ধাচার্যের 'গীতি' আছে। সুতরাং আমরা এই 'গীতি'কে বাংলা গান বলিতে কুণ্ঠিত হইব কেন?

যাহা হউক, এতক্ষণ যাহা বলিলাম, সবই পুরানো কথা। পাঁচ বৎসর আগে বলিয়াছি, তাহাই আবার আপনাদের মনে করিয়া দিবার জন্য বলিলাম। 'বৌদ্ধগান ও দোহা'য় [১৩২৩ ব.] ৫০টি গান আছে, ২টি দোহা-সংগ্রহ আছে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, বৌদ্ধদের মূল তন্ত্রের বই-ই হউক, তাহার টীকাই হউক বা তাহাদের তন্ত্রসংগ্রহই হউক, পড়িতে পড়িতে মাঝে মাঝে এই ভাষায় এইরূপ গান, এইরূপ দোহা বা এইরূপ গাথা পাওয়া যায়। যেখানে পাইয়াছি, আমি টুকিয়া টুকিয়া রাখিয়াছি। এবার নেপালে গিয়া দেখিলাম ও শুনিলাম যে, প্রত্যেক বিহারেই ২/৪টি করিয়া এই ভাষায় এইরূপ গান হয়। একজন বলিলেন, ৩০০/৪০০ গান এখনো চলিত আছে। আমি যখন গানগুলি সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম, তাঁহারা বলিলেন, পাইবেন না। কারণ, ওগুলি গুহ্য। আমরা অর্থাৎ বৌদ্ধেরা অতি অন্তরঙ্গ ভিন্ন আর-কাহাকেও শুনাই না। যেখানে একটিও শিবমার্গী থাকে, সেখানে গাই না। কেবল তান্ত্রিক পূজায় এ-সকল গানের ব্যবহার হয়। আমি

বলিলাম— সে কথা তো সত্য। আমি তো ৫০টা গান ছাপাইয়া দিয়াছি। আর তোমাদের অতি গুহ্য যে হেবজ্রতন্ত্র, তাহাতে ২/৪টি গান পাইয়াছি। একটি যথা—

রাগ ভৈরবী।

শূন্য নিরঞ্জন পরম প্রভু শূন্যমায় সহাবে
ভাব চিঅ সহাব উ।
নো জো ভাবই মন ভাবই সো পর সোহই কজ্জ ॥
ন উদ্ভবউ নির্ব্বাণ তহি এহু সো মহাসুখবজ্জ।
জো ভাবই মন ভাবই সো পর সো হই কজ্জ ॥
অকৃখরু মন্ত নিবদ্ধ জো নো সোধিন্দু ন চিত্ত।
এহু সো পরম মহাসুহনো জো ভেদি ন চিত্ত ॥
জিম পদি বিন্দু সহাবউ তিমি ভাবই মন ভাবে।
শূন্য নিরঞ্জন[১] পরম প্রভু নো তই পুণ্য ন পাউ ॥
জিম জল মাঝে চন্দ্র সহি নো সোছ ন মিচ্ছ।
তিমি সো মণ্ডল চক্র উ তণয় সহাবে সচ্চ ॥

আরো একটি দিলাম—

রাগ বলাড়ি।

কল্লই রে ট্ঠিঅ বোলা মুম্মুনি রে কক্কোলা।
ঘণ কি পি দিহো কজ্জই করুণো কিঅনে রোলা ॥
এহি বলু খাজ্জই নাটেমঅ না পিজ্জই।
হলে একা লিঞ্জন পাণি অহি ইন্দু রুতহি বজ্জিঅই ॥
চউ সম কস্তুরি সিহ্লা কর্পূর লাই।
অই মা লেই ইন্ধন সালি অতহি মরু খাই ॥
অহি পেখনে খেট্‌ট করন্তে সুদ্ধাসুদ্ধ মুনি অই।
নিরংসুঅ অঙ্গ চউবিঅই জসরাব শনিআই ॥
মলয়াজ কুন্ডুর বাট্টেটই ডিণ্ডিম তহি ন বজ্জি অই ॥[৩]

এই দুইটি গান হেবজ্রতন্ত্রে আছে। হেবজ্রতন্ত্রখানি বুদ্ধবচন। বুদ্ধ তো নিজে কোনো বই লেখেন নাই। সুতরাং বুদ্ধবচনের বইগুলি তাঁর কোনো চেলায় লিখিয়াছে। এখন যেমন চেলারা গুরুর বই চুরি করিয়া

নিজ নামে প্রকাশ করে, তখনকার চেলারা তত সেয়ানা ছিল না। তাই তারা বই লিখিতে হইলেই গুরুর দোহাই দিত; বলিত, "এবং ময়া, শ্রুতমেকস্মিন্ সময়ে ভগবান্ শ্রাবস্ত্যাং বিহরতি স্ম জেতবনে অনাথ-পিণ্ডদস্যারামে সার্দ্ধত্রয়োদশভিঃ ভিক্ষুশতৈঃ"[৭] ইত্যাদি। তারা গুরুর মুখ দিয়াই বলাইত। ইদানীং যখন তন্ত্র আরম্ভ হইল, ক্রমে মহাযান, তন্ত্রযান, সহজযান, বজ্রযান, কালচক্রযানে আসিয়া পড়িল, তখনো ঐ এক কথা— একটু বিশেষ আছে। তখন লিখিত— "এবং ময়া শ্রুত-মেকস্মিন্ সময়ে ভগবান্ কায়বাক্‌চিত্তযোগযোগিনীভগেষু বিজহার।"[৮]

যেহেতু হেবজ্রতন্ত্র বুদ্ধ বচন, সেইজন্য ঐ দুইটি গানে কোনো কবির ভণিতা নাই। দুটিই বাংলা। শূন্য নিরঞ্জন বেশ বোঝা যায়। 'কল্লই রে ট্ঠিঅ' মোটেই বোঝা যায় না। কিন্তু না বোঝা যাওয়ার দোষ আমারও নয়, এখনকার বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরও নয়, দোষ পুঁথি-লেখকের। পুঁথি-লেখকেরা বৌদ্ধ, তারা জানে না— এটা কী ভাষা। জিজ্ঞাসা করিলে বলে— ঐ এক রকম সংস্কৃত। তাহাদের যে গুরুপুস্তক, তাহাও অশুদ্ধ কন্থা। তালপাতার পুরানো বাংলা অক্ষরে লেখা পুঁথি পাওয়া যায় না। সুতরাং ইহার যে কোনো কালে উদ্ধার হইবে, তাহা বোধ হয় না। কিন্তু 'কল্লই রে ট্ঠিঅ' অনেক বিহারে প্রায়ই গায়। আমাদের সামগানের মতন হইয়া গিয়াছে— মানে বোঝা যায় না, কিন্তু হাত নাড়াটি ঠিক আছে, সুর দেওয়া ঠিক আছে, স্তোভ দেওয়া ঠিক আছে।

আমি হেবজ্রতন্ত্রের এই দুইটি গান তাহাদিগকে দেখাইয়া দিলে একজন ৫/৭টি গান আমায় লিখিয়া আনিয়া দিল। কিন্তু বড়ো সাবধান, অন্য কোনো বৌদ্ধ যেন টের না পায়। কিন্তু অতি নির্জনে একটি গান ঠিক রাগ-রাগিণী দিয়া, সকলরূপ মুদ্রা দেখাইয়া, গাইয়াও দিল। এবং আশা দিল যে, ডাকের চিঠিতে এক-আধটি গান আমি ঢাকায় বসিয়া পাইব।

যে ৫০টি গান ছাপা হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটি একজন গান করিল। 'তিঅড্ডা চাপি দে অহ্মবালি,' কিন্তু তারা 'তিঅড্ডা' বলিল না— 'তিঅণ্ডা' বলিল। ভণিতায় আমাদেরই গানের ভণিতা দিল। [৪ সংখ্যক, গুণ্ডরীপাদ রচিত]।

একজন বলিল— প্রত্যেক বিহারেই একটা করিয়া বংশাবলী আছে এবং বংশাবলীর অনেকগুলি এক-একজন সিদ্ধাচার্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমি কিন্তু কোনো বংশাবলীই দেখিবার সময় পাই নাই। তাহারা বলে— যে প্রসিদ্ধ ৮৪ জন সিদ্ধ ছিলেন, তাঁহাদের অনেকের বংশ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ভিতর পাওয়া যায়। এখন ভিক্ষু বলিতে গেলে সন্ন্যাসী একেবারেই বুঝায় না— সকলেই 'প্রজ্ঞা' লয় অর্থাৎ বিবাহ করে। তাহাদের ছেলেপিলেদের ৫ বছরে একটা দীক্ষা হয়, দীক্ষা হইলেই তাহারা ভিক্ষু হয়। ১৭ বছরে আর-একটা দীক্ষা লয়, এ দীক্ষা লইলে তাহারা পূর্ণমাত্রায় পুরুতের কাজ করিতে পারে। তাহাদের বংশাবলীগুলি ভালো করিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, তাহাদের অনেকে বাংলাদেশ হইতে নেপালের ললিতপত্তনে গিয়া বাস করিয়াছে। তাহারা এই ৮৪ জন সিদ্ধাচার্য ছাড়া আরো কয়েকজন সিদ্ধাচার্যের নাম করে। তাহারা বলে, ৮৪ সিদ্ধা ১০০০ বছরের লোক ; বাকি সিদ্ধারা ৫০০ বছরের লোক। এই-সব নূতন সিদ্ধাদের নামে বজ্র শব্দ প্রায়ই আছে— বাগ্‌বজ্র, সুরত-বজ্র ইত্যাদি। ৫০০ বৎসর পূর্বে একজন বজ্রনামধারী সিদ্ধ পুরুষ কাঠমুণ্ডা হইতে ৫ ক্রোশ উত্তরে শাঁখু শহরের দুই মাইল দূরে একটু উঁচু পাহাড়ের উপর বজ্রযোগিনীর মন্দির স্থাপনা করেন।

৮৪ সিদ্ধা নাম লইয়া খুব গোলে পড়িয়াছি। ১৩২৫ সালে মিথিলার রাজা হরিসিংহের সভাপণ্ডিত জ্যোতিরীশ্বর কবিশেখরাচার্য তাঁহার বর্ণনরত্নাকর[৯] নামক গ্রন্থে ৮৪ সিদ্ধার নাম দিয়াছেন। গণিয়া ৮৪টি পাইলাম না— ৭৬টি পাইলাম। সংপ্রতি হল্যাণ্ড হইতে যাভা দ্বীপের ৮৪ সিদ্ধার নাম বাহির হইয়াছে। মিলাইয়া দেখিলাম, ১৬টি কি ১৭টি মিলিল। শ্রীযুক্ত ভন ম্যানন সাহেব [Johan Van Manen] এই হল্যাণ্ডের বইখানি এবং ইহা হইতে তিনি যে তালিকা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা দিয়া বিশেষ উপকার করিয়াছেন। আমি যে তেঙ্গুর হইতে ৩৩ জন গীতিকারের নাম দিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে ২৪টি মিলিল, বাকি মিলে না।

যাভা দ্বীপের সিদ্ধগণের নাম :

১. লুইপাদ— ইঁহার ২টি গান পাওয়া গিয়াছে।

২. লীলাপাদ— ইনি 'বিকল্পপরিহারগীতি' লিখিয়াছেন।

৩. বিরূপা— ইঁহার ১টি গান পাওয়া গিয়াছে। ইঁহার নাম বর্ণনরত্নাকরে আছে। নং ১০।

৪. ডোম্বী— ইঁহার ১টি গান পাওয়া গিয়াছে।

৫. শবরী— ইঁহার ২টি গান পাওয়া গিয়াছে। বর্ণনরত্নাকরে ইঁহার নাম পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু সেখানে তাঁহার নাম শবর।

৬. সরহ— অনেকগুলি গান পাওয়া গিয়াছে। ১খানি দোহাকোষও পাওয়া গিয়াছে, অদ্বয়বজ্র তাহার টীকা করিয়াছেন।

৭. কঙ্করী।

৮. মীনপাদ— বর্ণনরত্নাকরে ইঁহার নম্বর ১।

৯. গোরক্ষ— বর্ণনরত্নাকরে ইঁহার নম্বর ২।

১০. চৌরঙ্গী— বর্ণনরত্নাকারে ইঁহার নম্বর ৩।

১১. বীণাপাদ— ইঁহার ১টি গান পাওয়া গিয়াছে।

১২. শান্তিপাদ— ইঁহার ২টি গান পাওয়া গিয়াছে। ইঁহার আর-এক নাম রত্নাকর শান্তি। বর্ণনরত্নাকরে ইঁহার নম্বর ৪৪। কিন্তু সে বিষয়ে একটু সন্দেহ আছে। শুধু শান্তি বলিলে শান্তিদেবও বুঝাইতে পারে।

১৩. তান্তীপাদ— বর্ণনরত্নাকরে ইঁহার নম্বর ৫।

১৪. চামার— বর্ণনরত্নাকরে ইঁহার নম্বর ৪। সেখানে তাঁর নাম চমরীপাদ।

১৫. খড়্গ।

১৬. নাগার্জুন— ইঁহার 'নাগার্জুনগীতিকা' আছে। বর্ণনরত্নাকরে ইঁহার নম্বর ২২।

১৭. কৃষ্ণাচার্য বা কাহ্নু— ইঁহার ১২টি গান পাওয়া গিয়াছে। বর্ণনরত্নাকরে ইঁহার নং ১৩। ইঁহার একখানি দোহাকোষ পাওয়া

গিয়াছে। ইনিই 'যোগরত্নমালা' নামে হেবজ্রতন্ত্রের একখানি টীকা লিখিয়াছেন।

১৮. কর্ণারি।

১৯. স্থগন— ইঁহার একখানি বই আছে— 'দোহাকোষতত্ত্বগীতিকা'।

২০. নাড় পণ্ডিত— ইঁহার আরো নাম আছে— জ্ঞানসিদ্ধি, জ্ঞানসিংহ, যশোভদ্র। ইঁহার স্ত্রীর নাম নিগু ও জ্ঞানডাকিনী। ইঁহার একখানি বই আছে 'বজ্রগীতিকা', আর-একখানি 'নাড়পণ্ডিত-গীতিকা'।

২১. শালি।

২২. তিলোপা বা তৈলিপো।

২৩. ছত্র— ইঁহার আর-এক নাম কমল। কমল কঙ্গারি নামে বর্ণনরত্নাকরে ৬৯।

২৪. ভাদে অথবা ভদ্র— ভাদেপাদের ১টি গান পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু বর্ণনরত্নাকরে ভাদে ৩২, ভদ্র ৩৭, আবার ভদ্র ৭৪।

২৫. খণ্ডী অথবা ধোখণ্ডী।

২৬. অযোগী।

২৭. কাল।

২৮. ডোম্বী— ৪ নম্বরে একবার গিয়াছে। ডোম্বী হেরুক নামে মগধ দেশের একজন রাজা ছিলেন। তিনি কী?

২৯. কঙ্কণ— একটি গান পাওয়া গিয়াছে।

৩০. কম্বল— আমরা কম্বলাম্বরপাদের ১টি গান পাইয়াছি।

৩১. দিঙ্ক।

৩২. ভাঙ্কে অথবা ভাণ্ডারী।

৩৩. তাঙ্কে বা তন্ত্রপাদ।

৩৪. কুকুরী— ২টি গান পাইয়াছি।

৩৫. কুশী।

৩৬. ধাম— আর এক নাম গুণ্ডরী। ২টি গান পাইয়াছি।

৩৭ মহী— ১টি গান পাইয়াছি।

৩৮. অচিন্ত্য— বর্ণনরত্নাকরে ৩৫এ আছে অচিতি, ১০তে আছে অচিত।

৩৯. ভবহি— বর্ণনরত্নাকরের ২১এ মবহ।

৪০. মলিন।

৪১ ভুসুকু— আর-এক নাম শান্তিদেব ও আর-এক নাম রাউতু। ৮টি গান পাইয়াছি। বর্ণনরত্নাকরে ৪৪ নম্বরের নামে একটু সন্দেহ আছে।

৪২. ইন্দ্রভূতি— ইনি উড়িষ্যার রাজা ছিলেন। বৌদ্ধ তান্ত্রিক-মহলে ইঁহার খুব খাতির।

৪৩. মেক বা মেঘ।

৪৪. কোটালি বা উদ্দালিপাদ।

৪৫. কম্পারি।

৪৬. জালন্ধরী— বর্ণনরত্নাকরে ইনি ১৯।

৪৭. রাহুল।

৪৮. ধর্ম— বর্ণনরত্নাকরে ইনি ধর্মপা পতঙ্গ হইতে পারেন। আমাদের ধর্মপা কি ইনি ?

৪৯. ধোকাড়ি।

৫০. মেধিন বা মেদিনী।

৫১. শঙ্খজ বা পঙ্কজ।

৫২. ঘণ্টাপাদ।

৫৩. যোগী।

৫৪. চলুক।

৫৫. গোবুড় বা বাগুরি।

৫৬. লুচিক বা লুণ্ডক।

৫৭. নগুণ।

৫৮. জয়ানন্দ। আমরা জয়নন্দীর ১টি গান পাইয়াছি।

৫৯. পর্চরি।

৬০. চম্পক। ইনি বর্ণনরত্নাকরে ২৬।

৬১. ভিক্ষণ বা বিষাণ। বর্ণনরত্নাকরে ২৪এ আছে ভিষাণ, ৪৬এ আছে ভীষণ।

৬২. তেলি।

৬৩. কুমারি বা কুম্ভকার। বর্ণনরত্নাকরে ১২ কমারি, ৫১ কুমারি।

৬৪. চর্পাড় বা চর্পটি।

৬৫. মণিভদ্র।

৬৬. মেখলা। ইনি বর্ণনরত্নাকরে ১৫।

৬৭. কনখলা-- ইনি বর্ণনরত্নাকরে ১৪।

৬৮. কল কল।

৬৯. কন্থলি, কন্দালি বা কন্থারি। ইনি বর্ণনরত্নাকরে ১৭।

৭০. ধহুতি।

৭১. উধিতি।

৭২. কপালি। ইনি বর্ণনরত্নাকরের ১১।

৭৩. কিরব (কিলপাদ)। ইঁহার এক পুস্তক আছে— 'দোহচর্যাগীতিকাদৃষ্টি'।

৭৪. সকর, সাগর, পুষ্কর বা সরোরুহ।

৭৫. সর্বভক্ষ।

৭৬. নাগবোধি। ইনি কি বর্ণনরত্নাকরের ৫৬ নাগবলি ?

৭৭. দারিক— ইঁহার ১টি পদ আছে। বর্ণনরত্নাকরে ইনি দারিপা।

৭৮. পর্টলি বা পুত্তলি— ইনি বোধ হয়, বর্ণনরত্নাকরের ৩৮ পাতলিভদ্র।

৭৯. পনহ বা উপানহী।

৮০. কঁকিলী।

৮১. অনঙ্গ।

৮২. লক্ষ্মীঙ্করা শ্রীমতী। ইনি ইন্দ্রভূতির কন্যা। ইনি 'অদ্বয়সিদ্ধি' নামে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন।

৮৩. সমুদ, সমুদ্র বা সিংহল।

৮৪. ব্যালি।

বর্ণনরত্নাকরের বেশি নাম :

৬. হানিপা। ৭. কেদারিপা। ৮. ধোঙ্গপা। ১১. উন্মন। ১৮. ধোবী। ২০. টৌঙ্গী। ২৩. দৌলি। ২৭. ঢেণ্ঢণ। ইঁহারই নাম ধেতন। ইঁহার ১টি গান পাওয়া গিয়াছে। ২৮. ডুম্বরি। ২৯. বাকলি। ৩০. টুঙ্গী। ৩৩. চান্দন। ৩৪. কামরি। ৩৫. করবৎ। ৩৯. পলিহীহ। ৪০. ভানু। ৪১. মীন। ৪২. নির্দয়। ৪৫. ভর্তৃহরি। ৪৭. ভাঁটি। ৪৮. গগনপা। ৪৯. গমার। ৫০. মেনুরা। ৫২. জীবন। ৫৩. অঘোসাধব। ৫৪. গিরিবর। ৫৫. সিয়ারি। ৫৭. বিভবৎ। ৫৮. সারঙ্গা। ৫৯. বিবিকিবজ। ৬০. মগরধ্বজ। ৬২. বিচিত। ৬৩. নেচক। ৬৪. চাটল। ইনি চাটিলও হইতে পারেন। চাটিলের ১টি গান পাইয়াছি। ৬৫. নাচন। ৬৬. ভীলো। ৬৭. পাহিল। ৬৮. পাশল। ৭০. চিপিল। ৭১. গোবিন্দ। ৭২. ভীম। ৭৩. ভৈরব। ৭৫. ভমরি। ৭৬. ভুরুকুটি।

আমি যে-সকল গীতিকারের নাম সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে এইগুলি ৮৪ সিদ্ধার নামের মধ্যে নাই :

৩. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। ইঁহার পুস্তক 'বজ্রাসনবজ্রগীতি', 'চর্যাগীতি', 'ধর্মগীতিকা'।

১৬. আর্যদেব বা আয়দেব বা বৈরাগী নাথ। ইঁহার ১টি গান আমরা ছাপাইয়াছি।

১৯. তাড়ক পাদ।

২৪. অদ্বয়বজ্র— ইঁহার 'চতুরবজ্রগীতিকা' নামে এক গীতিপুস্তক আছে। ইনি সরোরুহবজ্রের দোহাকোষের টীকা করিয়াছেন। ইঁহার ছোটো ছোটো ২১ খানি বৌদ্ধগ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে।

২৭. মৈত্রীপাদ— ইঁহার গীতিকার নাম— 'গুরুমৈত্রীগীতিকা'।

২৮. ধৃষ্টিজ্ঞান— ইঁহার ১খানি গীতিকা আছে, ১খানি বজ্রগীতিকা আছে।

২৯. মাতৃচেট— ইঁহার গীতিকার নাম— 'মাতৃচেটগীতিকা'।

৩০. বৈরোচন— ইঁহার গীতিকার নাম— 'বৈরোচনগীতিকা'।

৩২. মহাসুখতাবজ্র।

আমার বোধ হয় অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়েই বহু-সংখ্যক সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। নাথপন্থ যোগীদিগের মধ্যে এইরূপ অনেকগুলি সিদ্ধ পুরুষের নাম পাইয়াছি। তাই মনে হয় যে, ৮৪ সিদ্ধা একটা পুরানো কথা মাত্র। কোনো সম্প্রদায়েই এত সিদ্ধ পুরুষ থাকা সম্ভব নয়, সকল সিদ্ধ পুরুষের তালিকায়ই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আসিয়া জুটিয়াছে। তাই একটি তালিকা আর-একটি তালিকার সঙ্গে মেলে না। এই-সব তালিকা সংশোধন অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার। কখনো হইয়া উঠিবে বলিয়া বোধ হয় না।[১০]

আমি নেপালে একটি ভুটিয়া ছবি দেখিয়াছিলাম। উহাতে ৮৪ সিদ্ধার ছবি আছে এবং আরো কিছু বেশি আছে। ছবির ফোটোগ্রাফ আনিয়াছি। বড়ো জিনিস ছোটো করিতে গিয়া ফোটোগ্রাফ বিশেষ স্পষ্ট হয় নাই। নামগুলি ভুটিয়া অক্ষরে ভুটিয়া ভাষায় লেখা, সংস্কৃত তর্জমা এখনো করিয়া উঠিতে পারি নাই। প্রথমেই লুইপাদের চিত্র। লুইপাদের আর এক নাম মৎস্যান্ত্রাদপাদ। তিনি একটি বড়ো মাছের পেট চিরিয়া, তাহাতে একটা পা দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমি আবার তাঁহার নেওয়ারি ছবিও আনিয়াছি। তাঁহার পাশে অনেকগুলি বড়ো বড়ো রুই মাছ পড়িয়া আছে। উহার একটির পেট চিরিয়া তিনি কাঁচা নাড়ি খাইতেছেন। দুটিই কল্পনার চিত্র। নামের মানে হইতে চিত্র কল্পনা করা হইয়াছে। মৎস্যান্ত্রাদপাদ, সুতরাং মাছের পোটায় পা

দেওয়া হইয়াছে। অথবা পা দিয়া মাছের পোটা খাইতেছেন। নেওয়ারিরা মৎস্যান্ত্রাদ মানে করিয়াছে, মাছের আঁতারি কাঁচা খায়। দুটি দেশই পাহাড়ের উপরে, মাছের সঙ্গে লোকের বড়ো সম্পর্ক নাই ; মাছ কেমন করিয়া খাইতে হয়, জানে না। নামের ব্যাখ্যায় এক অদ্ভুত চিত্র তৈয়ার করিয়াছে। আমরা মাছ খাই, আমাদের দেশে মাছ অনেক আছে। আমরা মৎস্যান্ত্রাদের অর্থ করিয়াছি— মাছের পোটা এবং মাছের পোটায় তৈরি তরকারি খাইতে ভালোবাসিতেন।

কুক্কুরীপাদ[১১]— একটা কুকুর লইয়া বসিয়া আছেন। এটাও নামের মানে হইতে ছবির কল্পনা করা মাত্র। কিন্তু কুক্কুরীপাদের মুখের চেহারাটা ঠিক উড়েদের মতো। টেঙ্গুরে বলে, তিনি উড়ে ছিলেন। তাঁহার গানের শব্দ দেখিয়া আমার তো বোধ হয়, তিনি উড়ে ছিলেন।

নেওয়ারিতে ৮৪ সিদ্ধার ছবি পাইলাম না— অষ্টসিদ্ধার ছবি আনিয়া দিল। তাহার মধ্যে ৪ জন সিদ্ধ পুরুষ ঠিক। কিন্তু আর ৪ জন মহারাজিকগণের মহারাজা। বৈশ্রবণ, ধৃতরাষ্ট্র, বিরূপাক্ষ, বিরূঢ়ক। সুতরাং এ সিদ্ধের ছবি আমরা পরিত্যাগ করিলাম। আবার আর-এক সেট আনিয়া দিল। এবার সবগুলিই সিদ্ধ পুরুষ। আমরা সবগুলিরই ফোটোগ্রাফ লইয়া আসিয়াছি। কিন্তু ছাপাইয়া উঠিতে পারি নাই। ছাপাইলেও তাহাতে চারি জনের নাম আছে, আর চারি জনের নাম নাই। এ-সব ফোটোগ্রাফ ছবি হইতে হইয়াছে। একখানি মাত্র ফোটোগ্রাফ পাথর হইতে আনিয়াছি— সেখানি দারিক সিদ্ধার। ফোটোগ্রাফ লইতে বড়োই কষ্ট হইয়াছিল। অন্ধকার মন্দিরের মধ্যে দারিক[১২] বসিয়া আছেন। মূর্তিও খুব পুরানো। দারিকের একটি গান আমাদের ছাপা আছে। [বৌ-গা-দো, ৩৪ সংখ্যক]। আর একটি দিতেছি—

কোই রে বংশা বাজি রে বীণা।
অনুহত সর্বদেব তিহুঅন রিণা ॥
অনুপম বুজি রে দারক লইঁআ।
ভেদি রে রিদ্ধি সিদ্ধি রোহি প্রসাদা ॥
গঙ্গা যমুনাএ দইরন্তি সখি রে
রবি শশি গগন দুআরে।

উদিগের চন্দ্রা রবি অষ্টাঙ্গে
গগন শেখর মাঝে পবন হেওারে ॥
পবন পঞ্চাশত একুরে বন্ধা ।
বিপরীত করণে দারক সিদ্ধা ॥

আপনারা দেখিবেন, কোনো কাজটাই পুরা হয় নাই। বহু-সংখ্যক গানও সংগ্রহ হয় নাই। বংশাবলীও সংগ্রহ হয় নাই, ছবিও সংগ্রহ হয় নাই। কিন্তু পূর্ণমাত্রায় সংগ্রহ হইবার আশা আছে। তবে আমার এইমাত্র বলার কথা যে, খৃ. ১০ম ১১শ শতে বাংলা সাহিত্যটা খুব বিস্তৃত ছিল। লেখকদের জীবনচরিত লেখার রীতি ছিল। তাঁহাদের চিত্র রক্ষার রীতি ছিল। কিন্তু আমরা সে-সব ভুলিয়া গিয়াছি। নেপালে বৌদ্ধ নেওয়ারদিগের নিকট খুঁজিলে সবটাই মিলিতে পারে। খোঁজাটা বড়ো দরকার। বাংলা, বেহার, উড়িষ্যার সাহিত্যের ইতিহাস এখন নেওয়ারদিগের হাতেই বেশি আছে। নেওয়ারি ভাষায় কী আছে, জানি না। কারণ, নেওয়ারি শিখি নাই। সংস্কৃত ভাষাতেই অনেক আছে। কৃষ্ণাচার্য হেবজ্রতন্ত্রের টীকা করিয়াছেন, হেবজ্রতন্ত্রেই বাংলা গান অনেক রহিয়াছে। সুতরাং সেগুলি কৃষ্ণাচার্য এবং হেবজ্রতন্ত্র, দুইয়েরই আগে ;— কত আগে জানি না ; অন্তত ১০০ বছর আগে তো হবে। তাহা হইলেই সাহিত্যটা গিয়া খৃ. নবম শতে পড়িল। এইরূপ অভয়াকর গুপ্ত[১৩] বুদ্ধকপালতন্ত্রের টীকা করিয়াছেন। তিনি যখন টীকা লেখেন, তখন পালবংশের রামপালদেব ২৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া ২৫ বৎসরে পড়িয়াছেন। তিনি অনেকগুলি বাংলা গান তুলিয়াছেন। এক জায়গায় খানিকটা বাংলা তুলিয়া সংস্কৃতে তাহার টীকা করিয়াছেন। সুতরাং এটা বুদ্ধকপালতন্ত্রেরই বাংলা। তাহা হইলে বুদ্ধকপালতন্ত্র লেখার পূর্বেই সেটা ছিল, নহিলে যে তন্ত্রটা লিখিয়াছে, সে বুদ্ধের মুখে সে কথা দিতে পারিত না।

আর-একটা কথা। মহাকৌলজ্ঞানবিনির্ণয়[১৪] নামে একখানি বই আছে। বইখানি মৎস্যেন্দ্রপাদাবতারিত। শিব পার্বতীকে অতি গোপনে সম্ভোগকালে যে-সব গূঢ় কথা বলিয়াছিলেন, সে তো আর-কেহ শুনিতে পায় নাই। কেবল উভয়ের ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতারাই শুনিয়া-

ছিলেন। তাঁহারাই ইহা অবতারিত করিয়াছিলেন, অর্থাৎ কৈলাস হইতে পৃথিবীতে নামাইয়া আনিয়াছিলেন। মৎস্যেন্দ্রনাথ তাঁদেরই একজন। মৎস্যেন্দ্রনাথের আর-একটা নাম মচ্ছঘ্ননাথ। আমি ভাবিলাম —তবে কি তিনি কৈবর্ত ? শেষ পড়িতে পড়িতে দেখি, তিনি সত্য সত্যই কৈবর্ত ছিলেন— তাঁহাকে অনেক জায়গায় কেয়ট পর্যন্ত বলা হইয়াছে, ধীবরও বলা হইয়াছে। পার্বতী একবার মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন— তুমি কেওটের বাড়ি কেন গেলে ? বইখানি পড়িতে পড়িতে আমার মনে হইল, কোনো ব্রাহ্মণের ছেলে যতই মূর্খ হউক, এরূপ সংস্কৃত লিখিবে না। শেষ দাঁড়াইল যে, উহা কেওটের লেখা। তার পর আবার দেখি, মৎস্যেন্দ্রের বাড়ি চন্দ্রদ্বীপে ছিল। চন্দ্রদ্বীপ হইতে সাগর বেশি দূর নয়। এ-সব কথাই পুথিতে লেখা আছে। এ চন্দ্র-দ্বীপ যে বরিশালের চেঁদো, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ করিবার কারণ নাই। ইঁহাদের গ্রন্থেও অনেক সময় বাংলা পাওয়া যায়। সে বাংলাও সিদ্ধাচার্যদের আগে, বৌদ্ধতন্ত্রগুলিরও আগে ; কত আগে, জানা যায় না। নাথদের তারিখ ওয়াশীলজু[১৫] ৮০০ খৃ. বলিয়া গিয়াছেন। আমি বলি, বরং আগে হইবে তো পরে নয়। কারণ, চন্দ্রদ্বীপ অনেক কাল হইতে তান্ত্রিকদের একটা বড়ো আড্ডা এবং উহারই নিকটে নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলার গ্রামকে গ্রাম লইয়া নাথপন্থী যোগীরা বাস করে।

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'
প্রথম সংখ্যা, ১৩২৯ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৮ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে সভাপতির এই অভিভাষণ শাস্ত্রীমশায় পড়েন 'অধিবেশনের পূর্বদিবস' ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ১২ আষাঢ়। ১৩২৯-এর প্রথম সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১. দ্র. শাস্ত্রী, "রমাই পণ্ডিতের ধর্ম-মঙ্গল", সা-প-প, প্রথম সংখ্যা ১৩০৪ ব.।

২. এই বইয়ের পৃ. ২৯৮ সূত্র ৩১ দ্র.

৩. এই বইয়ের পৃ. ২৯৯ সূত্র ৩২ দ্র.

৪. এই বইয়ের পৃ. ৪২৬ সূত্র ২১ দ্র.

৫. এই বইয়ের 'মহাভারত : আদিপর্ব' প্রবন্ধ দ্র.

৬. গান দুটির ভাষা ঠিক বাংলা নয়। প্রথমটির ভাষা বাংলা-ঘেঁষা অবহট্‌ঠ। এটির পাঠে ছন্দে গোলমাল এবং অন্য অশুদ্ধি আছে। শাস্ত্রীমশায়ের পাঠ অক্ষুণ্ণ রেখে প্রথম পদটির এই রকম অনুবাদ করা যায়—

> শূন্য নিরঞ্জন পরমপ্রভু, শূন্যময়
>   স্বভাবে ভাবচিত্ত-স্বভাব (স্বভাবক:)।
> যে ভাবে না মনের ভাবে সে পরম কার্য
>   শোধন / সাধন (শুধ্যতে / সাধয়তি) করতে পারে ॥
> (তিনি) উদ্ভূত হন নি, নির্বাণও (নেই) তাঁর
>   এই তিনি মহাসুখ বজ্র।
> যে ভাবে না মনের ভাবে সে পরম কার্য
>   শোধন / সাধন করতে পারে ॥

অক্ষর মন্ত্র নিবদ্ধ যা, তা চিত্ত শোধন করতে পারে না।
এই সেই পরম মহাসুখ, যার চিত্ত ভেদপ্রাপ্ত হয় না॥
যেমন প্রতিবিম্ব তেমনি স্বভাব
তিনি ভাবেন মনের ভাবে।
শূন্য নিরঞ্জন পরমপ্রভু
তাঁর না পুণ্য না পাপ (পাপঃ)॥
যেমন জল মধ্যে চন্দ্র (= চন্দ্র প্রতিবিম্ব)
সখি, তিনি সত্যও নন মিথ্যাও নন।
তেমনি সেই মণ্ডলচক্র
… স্বভাবে স্বচ্ছ॥

দ্বিতীয় গানটির ভাষাও অবহট্‌ঠ, তবে বাংলা-ঘেঁষা নয় এবং এতে বহু শব্দ দ্বর্থে, অর্থাৎ 'সন্ধা শব্দ' রূপে ব্যবহৃত হওয়ায় অবোধ্য হয়ে পড়েছে। তার উপর পাঠ-বিকৃতি প্রচুর। গানটির কিছু পাঠান্তর প্রবোধচন্দ্র বাগচী উদ্ধার করেছিলেন। সেই পাঠ মিলিয়ে নিলে শুদ্ধ পাঠ এই রকম দাঁড়ায়—

কোল্লই রে ঠিঅ বোলা মুম্মুনি রে কক্কোলা
ঘন কিবিড় হো বাজ্জই করুণে কিঅই ন রোলা।
তহি বল খাজ্জই গাঢ়ে মঅণা পিজ্জই
হলে কালিঞ্জর পণিঅই দুন্দুরু বজ্জিঅই।
চউসম কস্তুরি সিহ্লা কর্পূর লাই
মালই-ইন্ধন সালি ভতহি ভরু খাই।
পেংখণে খেট করন্তে সুদ্ধাসুদ্ধ ণ মুণিঅই
নিরংসুঅ অঙ্গ চড়াই তঁহি জসরাব সুণিঅই
মলয়জ কুন্দুর বাটই ডিণ্ডিম তহি ন বাজিঅই॥

অনুবাদ : ওরে কোলে (?) স্থিত বোলা (বজ্র)… ওরে কক্কোল (পদ্ম); কৃপীট (ডমরু) ঘন বাজে, করুণা রোল করছে না। সেখানে বল (মাংস) খাওয়া হয়, গাঢ়ভাবে মদন (মদ) পান করা হয়। ওলো, কালিঞ্জর (ভব্য লোক) প্রশংসিত হয়, দুর্দ্দর (অভব্য লোক) বর্জিত হয়। চতুঃসম (বিষ্ঠা), কস্তূরী (মূত্র), সিহ্লক (স্বয়ম্ভূ, অর্থাৎ আর্তব) ও কর্পূর (শুক্র) নেওয়া হল। মালতীন্ধন (ব্যঞ্জন) ভাত ভর (-পুর) খাওয়া হল। প্রেক্ষণে (আগমনে) খেট (গমন) করা হলে শুদ্ধাশুদ্ধ জানা যায় না, নিরংশুক (অস্থি-আভরণ) অঙ্গে চড়ালে তখন যশধ্বনি শোনা যায়। মলয়জ (মহামাংস) কুন্দুরু (দ্বীন্দ্রিয়যোগে) বাটা হয়,

তখন ডিণ্ডিম (অনাহত) বাজে না। (দ্র. বা-সা-ই, পূর্বার্ধ, পৃ. ৫১)
বর্ণনা যুগনদ্ধ মণ্ডলচক্রের। সুতরাং যারপর নাই অশ্লীল।

শ্রীসুকুমার সেন।

৭. অনুবাদ : এই রকম আমি শুনেছি। এক সময়ে ভগবান্ শ্রাবস্তীতে বিহার করছিলেন— জেতবনে অনাথপিণ্ডদের উদ্যানে— সাড়ে তেরোশো ভিক্ষু সমভিব্যাহারে।

৮. অনুবাদ : এই রকম আমি শুনেছি। এক সময়ে ভগবান্ কায়বাক্‌চিত্ত-যোগ রূপ যোগিনী যোনিসমূহে উপগত হয়েছিলেন।

৯. কর্ণাট বংশীয় রাজা নান্যদেবের উত্তরাধিকারী মিথিলার শেষ স্বাধীন শাসক হরিবর্মদেব। এঁর রাজধানী ছিল সিমরাওনগড়। বাংলাদেশ মুসলমান অধিকারে চলে যাবার একশো বছর পরেও পূর্বভারতে হরিসিংহদেব হিন্দু রাজত্ব অটুট রাখতে পেরেছিলেন। ১৩২৪ খৃস্টাব্দে ইনি নেপাল-রাজ জয়রুদ্রমল্লকে পরাস্ত করে ক্রমে সমগ্র উপত্যকায় নিজের অধিকার বিস্তৃত করেন। দিল্লির সুলতান ঘিয়াস-উদ্-দীন্ তুঘ্‌লুগের সঙ্গে শেষ সংঘর্ষে ১৩২৪ খৃস্টাব্দে মিথিলা হরিসিংহদেবের হাতছাড়া হয়ে যায়। (*AHI*, pp. 316, 389)

সমকালীন সাহিত্যে হরিসিংহদেবের সংগীত ও সাহিত্যপ্রীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। এঁর সভাসদ জ্যোতিরীশ্বর কবিশেখরাচার্যের 'বর্ণ(ন)রত্নাকর' মৈথিলি গদ্যে লেখা কবি-কথকদের একটি কোষগ্রন্থ। কথকতায় দরকার হয় এমন শব্দ, প্রতিশব্দ ও বাঁধাধরা বর্ণনা পরিচ্ছেদ ভাগ করে সাজানো। পূর্বভারতের আঞ্চলিক ভাষায় গদ্য রচনার পুরানো দৃষ্টান্ত হিসাবে বইখানির মূল্য আছে। বাবুআ মিশ্র ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৯৪০ খৃস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত।

১০. চুরাশি সংখ্যাটির সম্ভবত কোনো ঐতিহাসিক গুরুত্ব নেই। এই সংখ্যা নানা সাধক সম্প্রদায়ের কোনো গূঢ় তত্ত্ব-ধারণার প্রতীক। এ বিষয়ে শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন—

"We are not, however, prepared to give any historical credit to the list of these eighty-four Siddhas or even to the tradition of the eighty-four

Siddhas. If we just examine the lists of these eighty-four Siddhas it will appear that they are anomalous lists containing names of many Buddhist Siddhācāryas who flourished during some time near about the tenth to the twelfth century A. D., and within the list of these Buddhist Siddhācāryas the names of the most reputed Nāthas have been incorporated for reasons discussed before. This tradition of the eighty-four Siddhas is occasionally referred to in the Nātha literature of Bengal as well as in the Santa literature and Sūfī literature of Western and Northern India. It has been rightly held by some scholars that this number eight-four is rather a mystic than a historical number, and for ourselves we have sufficient reason to be convinced of the purely mystic nature of this number. The significant mention of this number eightly-four is found in the belief of the Ājīvikas, who believed that soul must pass through eighty-four hundred thousand stages before attaining the human stage. In the *Maitrāyaṇī Upaniṣat* we find mention of eighty-four thousand states of birth. In some of the Tantras and Purāṇas also we find reference to the eighty-four lacs of *yonis* or births in different states. The number of the Buddhist dhammakhandas, (*i.e., dharma-skandha* or branches of doctrines, division of the *dharma* or scripture) is eighty-four, or rather eighty-four thousand. It has been said in the Pāli text *Gaṁdha-vaṃsa* that those scholars, who will write commentaries, notes etc. on the Pāli texts containing the eighty-four thousand *dhamma-kkhandas*, or will cause others to write such works, will gather immense merit equal to the merit derived from building eighty-four thousand shrines, constructing

eighty-four thousand images of Buddhas, establishing eighty-four thousand monasteries. It has further been said that he, who makes a good collection of the sayings of Buddha, or causes others to do it, and who scribes, or causes to be scribed the sayings of Buddha in the form of a manuscript, and who gives or causes others to give materials for preparing such a manuscript and to preserve it, will amass immense virtue equal to that, which is gathered by building eighty-four thousand shrines and erecting eighty-four thousand monasteries. Statements of similar nature are also found in later Buddhistic texts. In the Pāli text *Anāgata-vaṁsa* we find that when Maitreya, the future Buddha, will renounce the world, moved by universal compassion, eighty-four thousand friends, kinsmen and princesses will follow him, and eighty-four thousand Brahmins, versed in the Vedas, will also accompany him. The mystic nature at the number eighty-four will also appear from the fact that the commonly accepted number of the yogic postures (*āsana*) is said to be eighty-four in the Yogic and Tāntric texts ; and it has sometimes been held that the number of the yogic postures are eighty-four million because of the fact that the number of the different stages in the evolution of a creature is eighty-four million,— and of these eighty-four million only eighty-four are prominent, and so they are described in detail. As a matter of fact, we do not find even these eighty-four *Āsanas* described anywhere, only a few of them being described in the Yogic and Tāntric literature. We may also note that sometimes the number of the beads in the rosary of a Kānphaṭ yogin is also eighty-four. In the *Skanda-purāṇa* we

have detailed description of the eighty-four *Siva-liṅgas* (*i.e.* phallic symbols of lord Śiva) in eighty-four consecutive chapters. All these taken together will convince one of the mystic nature of the number eighty-four, and this will justify the doubt about the historical nature of the tradition of the eighty-four Siddhas. (*ORC*, pp. 234-36.)

১১. এই বইয়ের পৃ. ৪২৫ সূত্র ১৯ দ্র.

১২. এই বইয়ের পৃ. ৩০১ সূত্র ৩৩ দ্র.

১৩. টীকার নাম 'বুদ্ধকপালমহাতন্ত্ররাজটীকা অভয়পদ্ধতি'। অন্য তথ্যের জন্য এই বইয়ের পৃ. ৩০৩ সূত্র ৩৭ দ্র.

১৪. প্রবোধচন্দ্র বাগচী মনে করেন 'কৌলজ্ঞাননির্ণয়' একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের রচনা। দ্র. P. C. Bagchi ed. *Kaulajṇana-nirṇaya and some minor texts of the school of Matsyendranāth*, Calcutta Sanskrit Series, Calcutta 1934.

১৫. Vasily Pavlovich Vasilyev (১৮১৮-১৯০০ খৃ.) জর্মান-এ এঁর নামের বানান লেখা হয় Wassiljew. তিব্বতি ঐতিহাসিক তারনাথের বিখ্যাত বই rGya-gar-chos-'byuṅ বা 'ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস' রুশ ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর অনুবাদ A. Schiefner-এর জর্মান অনুবাদের সঙ্গে সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে।

৬. সভাপতির অভিভাষণ

আমি এবার আসিয়াছি আপনাদের নিকট শেষ বিদায় লইতে। আমার সভাপতির কাজের ৫ বৎসর পূর্ণ হইল। আপনাদের নিয়মানুসারেই আমাকে যাইতেই হইবে ; কিন্তু আমি দুই-তিন বার গিয়া গিয়াও যাই নাই, সেইজন্য এইবার বলিতেছি— শেষ বিদায়।

তিন কারণে আমায় শেষ বিদায় লইতে হইতেছে।

১. আমি তিন খেপে ১৩ বৎসর আপনাদের সভাপতির কাজ করিয়াছি। এত দীর্ঘকাল সভাপতির কাজ করা ঠিক উচিত হয় নাই। ইহাতে অনেকের আশা ও আকাঙ্ক্ষার পথে, বোধ হয়, বাধা দিয়াছি ; কিন্তু সেজন্য আপনারাই দায়ী।

২. আমার বয়স অনেক হইয়াছে। এ বয়সে কোনো কাজের ভার মাথায় রাখা ঠিক উচিত নয়।

৩. দুই বৎসর হইল আমার পায়ের হাড় ভাঙিয়া গিয়াছে ; আমি একরূপ চলচ্ছক্তিরহিত হইয়াছি। পরিষৎ মন্দিরে আমার যতবার আসা উচিত, তাহার শতাংশের এক অংশও আসিতে পারি না। গত বৎসর আমি ছাড়িতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু আপনারা দেন নাই। তাই বলিতেছি, এই তিন কারণে আমার শেষ বিদায়। আমি শেষ বিদায় লইতেই আসিয়াছি, নহিলে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিবার কোনো দরকার ছিল না।

এই যে ১৩ বৎসর আমি এখানে সভাপতির কাজ করিয়াছি, ইহাতে আমার কোনোই স্বার্থ ছিল না— ইহাতে আমি টাকাকড়িও পাই নাই, আমার পদ-প্রতিপত্তিও বাড়ে নাই। এই ১৩ বৎসরের মধ্যে আমি অনেকবার লাঞ্ছিত, অবমানিত এবং বিতাড়িতও হইয়াছি, এবং অনেক-বার পূজিত, অভিনন্দিত এবং সংবর্ধিতও হইয়াছি ; কিন্তু সকল সময়ে সমান ভাবেই আমি সাহিত্য-পরিষদের সেবা করিয়াছি, কোনো সময়েই ইহার প্রতি আমার আস্থা একটুও কমে নাই। ইহার কারণ কি জানেন ? আমার বিশ্বাস, বাঙালি ইংরাজি শিখিয়া যত কাজ করিয়াছে, সে সকলই ভালো-মন্দ-জড়িত। দেশের মধ্যে সাহেবিয়ানা ঢোকানো অনেক কাজেরই উদ্দেশ্য। শিক্ষিত লোকে যাহাকে সংস্কার বলে, বাজে লোকে

তাহাকে ছারখার বলে— যত কাজ হইয়াছে, সকলেরই দুই রকম ব্যাখ্যা আছে। একটা ব্যাখ্যা ইংরাজিওয়ালাদের— সেটা ভালো, আর-একটা ব্যাখ্যা বাংলা ও সংস্কৃতওয়ালাদের— সেটা মন্দ ; কিন্তু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সম্বন্ধে দুই রকম ব্যাখ্যা নাই এবং হইতেও পারে না। ইহা যদিও ইংরাজিওয়ালারাই স্থাপন করিয়াছেন, তথাপি ইহাতে দুই রকম ব্যাখ্যা নাই। ইহা খাঁটি বাংলার খাঁটি মঙ্গলের জন্য জন্মিয়াছে এবং খাঁটি বাংলার খাঁটি মঙ্গল করিতেছে। সকল বাঙালিরই ইহাতে যোগ দেওয়া উচিত এবং দিতেছেনও অনেকে— ইংরাজিওয়ালাও দিতেছেন, সংস্কৃতওয়ালাও দিতেছেন, আরবি-পারসিওয়ালাও দিতেছেন। এখানে হিন্দু-মুসলমান ভেদ নাই, আচরণীয় অনাচরণীয় ভেদ নাই, স্পৃশ্য অস্পৃশ্য ভেদ নাই। ইহার উদ্দেশ্য, বাংলার সীমার মধ্যে মানুষ যাহা-কিছু করিয়াছে, সেইগুলি বাহির করা এবং তাহার একটা উজ্জ্বল ব্যাখ্যা দেওয়া— ইহাতে মঙ্গল বৈ অমঙ্গল হইবে না— এরূপ খাঁটি মঙ্গলময় ব্যাপারে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারিলেও সেটা আমি ধর্ম বলিয়া মনে করি। আপনারা যদি ধর্ম অধর্ম না মানেন, আমি সেটা পুণ্য বলিয়া মনে করি, আপনারা যদি পাপপুণ্য না মানেন, আমি সেটা ভাগ্য বলিয়া মনে করি— আপনারা মানুন আর নাই মানুন, আমি ইহাকে ধর্ম, পুণ্য ও ভাগ্য, এই তিন বলিয়াই মানি এবং আমার পরম সৌভাগ্য যে, আমি এরূপ পুণ্যময় অনুষ্ঠানের সহিত এত দীর্ঘকাল জড়িত ছিলাম।

এখন সাহিত্য-পরিষদের সম্বন্ধে আমার বলিবার গোটাকয়েক কথা আছে। প্রথম— সাহিত্য-পরিষদের টাকাকড়ি সম্বন্ধে, দ্বিতীয়— সাহিত্য-পরিষদের কাজ সম্বন্ধে।

সাহিত্য-পরিষদের টাকাকড়ি সম্বন্ধে অবস্থা ভালো নয়। আমি যখন প্রথম সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি হই, তখন অবস্থা আরো খারাপ ছিল। গচ্ছিত তহবিলগুলি সব প্রায় সংসার-খরচে গিয়াছে। যে-সকল কাজের জন্য গচ্ছিত ছিল, সে-সকল কাজ হইতেছে না। সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরটি পড়ো-পড়ো, রমেশ-ভবনের বাড়িটি তৈয়ার হইয়াছে বটে, কিন্তু আমাদের ধার শোধ হয় নাই। যাহাই হউক, সাহিত্য-পরিষদের মুরুব্বিরা কয়েক বৎসর গুরুতর পরিশ্রম করিয়া গচ্ছিত তহবিল

প্রায় শোধ করিয়াছেন, বাড়িটিও এমন ভাবে মেরামত করা হইয়াছে যে, ২০ বৎসর আর উহাতে হাত দিতে হইবে না। রমেশ-ভবনের কন্ট্রাক্টারদের টাকা শোধের ব্যবস্থাও হইয়াছে। এই-সকল কাজের জন্য আমরা অনেকের কাছে বিশেষ বাধিত হইয়াছি। প্রথম— কলিকাতা করপোরেশন ও তাহার সজ্জনচূড়ামণি মেয়র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন-গুপ্ত [১৮৮৫-১৯৩৩ খৃ.], দ্বিতীয়— লর্ড লিটন [Lord Lytton the Second, বাংলার গবর্নর ১৯২২-২৭ খৃ.] ও তাঁহার মন্ত্রী ব্যোমকেশ চক্রবর্তী [১৮৫৫-১৯২৯ খৃ.], তৃতীয়— শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সরকার ইঞ্জিনিয়ার. ইনি বিশেষ পরিশ্রম করিয়া আমাদের মেরামতি কাজ দেখিয়া দিয়াছেন এবং যাহাতে বাড়িটি অধিক দিন টিকে, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

যদিও সাহিত্য-পরিষদের এই-সকল উন্নতি হইয়াছে, তথাপি ইহার টাকাকড়ির অবস্থা ভালো নয়। সদস্যদের চাঁদায় যে টাকা আয় হয়, তাহাতে পরিষদের সংসার-খরচ কুলায় না। প্রতি বৎসরই ঢাকে ও ঢোলে দেনা করিতে হয়. সে দেনাও সব সময়ে শোধ যায় না। ইহার এক উপায় সদস্য বাড়ানো। সদস্য বাড়ানোর একমাত্র উপায়, যাহা আপনারা সময়ে সময়ে করেন, সেটা হচ্ছে ধরাপাকড়া, উপরোধে ঢেঁকি গেলানো। যাঁহারা এইরূপে সদস্য হন, তাঁহারা প্রায়ই শীঘ্র ছাড়িয়া দেন অথবা চাঁদা না দেওয়ার দরুন তাঁহাদের নাম কাটা যায়। ধরাপাকড়া কতকটা না করিলেও চলে না এবং কতকটা করিতেও হইবে ; কিন্তু আসল কথা, পরিষদের দিকে লোকের যাহাতে টান হয়, তাহা করিতে হইবে, পরিষদের নাম যাহাতে জাহির হয়, তাহা করিতে হইবে। টান হইবার এক উপায়, পত্রিকাখানিকে এমন ভাবে লিখিতে হইবে, যাহাতে অন্তত ২/৩টিও প্রবন্ধ পড়িয়া সাধারণ লোকে সহজে বুঝিতে পারে। পত্রিকার প্রবন্ধগুলি প্রায়ই সব পণ্ডিতের জন্য লেখা, পাদটীকা ও উদ্ধৃত অংশের টীকায় পরিপূর্ণ, সাধারণ পাঠকে পড়িতে পারে না— তাহাদের জন্য গল্পের মতো করিয়া লেখা উচিত, তাই বলিয়া নভেল ও গল্প দিয়া পুরাইতে বলিতেছি না। পত্রিকা যদি মুখরোচক হয়, তাহা হইলে অনেকে সদস্য হইতে চাহিবেন, নহিলে চাহিবেন না। সময়ে সময়ে পরিষদে উৎসবাদির দরকার এবং সেই-সব উৎসবে বাহিরের

লোক নিমন্ত্রণ করা দরকার। পরিষদের জন্মতিথি উপলক্ষে পরিষৎ মন্দিরে যে উৎসব হইবার কথা হইয়াছে, তাহা খুব ভালোই হইয়াছে। সাম্বৎসরিক অধিবেশনেও একটি উৎসব হইলে ভালো হয়। অন্তত সেই বৎসরে যে-সকল মূর্তি, তাম্রপাত্র, সিক্কা, নূতন পুথি, পুরানো বই পাওয়া গিয়াছে, সেই সবগুলি এক জায়গায় জড়ো করিয়া দেখানো উচিত। তাহার একটি প্রদর্শনী করা উচিত।

আর্থিক দিকে আমাদের দোষ-ত্রুটিও আছে। টাকা আদায়ের, বিশেষ চাঁদার টাকা আদায়ের ব্যবস্থা ভালো নয়— অনেকে বলেন, আমাদের কাছে তাগাদাই হয় না, আমরা কী করিয়া টাকা দিই। শুধু যে আদায়-বিভাগের বন্দোবস্ত ভালো নয়, তাহা নহে ; কোনো বিভাগের বন্দোবস্তই ভালো নয়। যাঁহারা বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাঁহারা পণ্ডিত লোক, জ্ঞানী লোক, আপনাদের বুদ্ধিমতো বন্দোবস্ত করিয়াছেন ; কিন্তু কাজে দাঁড়াইয়াছে— শক্ত বাঁধন, ফস্‌কা গেরো। এইজন্য আমার ইচ্ছা, দিন-কতক একজন অপণ্ডিত বিষয়ী লোক আমাদের বন্দোবস্তের ভার লন। এশিয়াটিক সোসাইটি, আমি যত দিন দেখিতেছি, প্রথম ছিল শিক্ষা-বিভাগের লোকের হাতে, তাহার পর যায় মিউজিয়ামের লোকের হাতে, তাহার পর যায় ইউনিভার্সিটির লোকের হাতে। সবই পণ্ডিত, বন্দোবস্তও পাণ্ডিতি হইয়াছিল, সভ্য-সংখ্যা কমিয়া গিয়াছিল, এমন-কি, কোনো বন্দোবস্তও ছিল না। তখন কথা উঠিল, বিষয়ী লোকের হাতে সোসাইটি ছাড়িয়া দিতে হইবে। স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে [১৮৫৪-১৯৩৬ খৃ.] ধরা হইল। তিনি প্রথমে আসিয়াই একজন বিষয়ী লোককে ধনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন এবং মাহিনা দিয়া একজন সেক্রেটারি নিযুক্ত করিলেন। দুই-তিন বৎসরের মধ্যে সোসাইটির চেহারা ফিরিয়া গেল— এখন সভ্য-সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে— বই বিক্রি হইতে তিন গুণ আয় হইতেছে— সোসাইটির যে সম্পত্তি ছিল, যাহা হইতে কিছুই পাওয়া যাইত না, এখন তাহা হইতে অনেক টাকা পাওয়া যায়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তো ৩৬ বৎসর পণ্ডিতের হাতে আছে, এখন একজন বিষয়ীর হাতে কিছু দিন থাকিলে ভালো হয়। ইহা আমার একটা বলিবার কথা ছিল, বলিলাম। আয়-

বৃদ্ধি এবং ব্যয় কমানো— দুইটাই দরকার, কিন্তু তাই বলিয়া পরিষদের কাজের প্রসার বন্ধ করা উচিত নয়।

পরিষদের আয়-ব্যয়ের কথা বলা হইল। এখন পরিষদের লেখা-পড়ার কথা কিছু বলিতে চাই। পূর্বে দেখিয়াছি, পরিষদে পড়িবার মতো প্রবন্ধ পাওয়া যাইত না। প্রবন্ধের অভাবে পত্রিকাও বাহির হইত না। পরিষদের সদস্যগণ আপনাদের প্রবন্ধ অন্যত্র দিতেন— তাহাতে কাজের বড়ো বিশৃঙ্খলা হইত। কিন্তু এখন সৌভাগ্যক্রমে অনেক নূতন লেখক আসিয়া জুটিয়াছেন। তাঁহাদের লেখাও বেশ ভালো হইতেছে এবং প্রবন্ধও রীতিমতো পাওয়া যাইতেছে। কবি রবীন্দ্রনাথও [১৮৬১-১৯৪১ খৃ.] পরিষদের উপযুক্ত প্রবন্ধ লিখিলে, তাহা পরিষদে পাঠাইতেছেন। আমাদের পুরানো সুদক্ষ লেখকেরাও প্রবন্ধ পাঠাইতেছেন। তাঁহারা এখন অনেকে আপনার কার্যক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়া কেবল লেখাপড়ার কার্য করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে রায়সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব [১৮৬৬-১৯৩৮ খৃ.], শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় [১২৭৩-১৩৩৮ ব] রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর [১৮৫৯-১৯৫৬ খৃ.], শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সান্যাল নিজ নিজ কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কেবল লেখাপড়ার চর্চা করিতেছেন ও প্রবন্ধ লিখিতেছেন। ইঁহারা আমাদের যে সহায়তা করিতেছেন, ইহার জন্য আমরা সকলেই ইঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। ভরসা করি, ইঁহারা দীর্ঘজীবী হইয়া অনেক দিন পর্যন্ত আমাদের সহায়তা করিবেন। আমাদের পুরানো দক্ষ লেখকেরাও আমাদের মধ্যে মধ্যে সাহায্য করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র-নাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম. এ., বি. এল. [১৮৬৮-১৯৪২ খৃ.] আছেন, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ [১৮৭৭-১৯৪০ খৃ.] আছেন, ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. [১৮৮৫-১৯৩০ খৃ.] ছিলেন, শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার [১৮৭৫-১৯৩৬ খৃ.] আছেন, শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল আছেন, ৺নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য ছিলেন, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ [১৮৬৫-১৯৫২ খৃ.] এবং শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম. এ. আছেন। ইঁহারাও আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন। কিন্তু আমরা এই দুই-তিন বৎসর ধরিয়া বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি কতগুলি তরুণ লেখকের

নিকট। ইঁহারা সকলেই পণ্ডিত এবং এক-এক বিষয়ে দক্ষ বৃহস্পতি এবং খুব মন দিয়া নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ও ডক্টররা আছেন, বিলাতি বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ও ডক্টররা আছেন, টোলের পণ্ডিত মহাশয়েরা আছেন। কতকগুলি সম্পন্ন লোক আছেন, লেখাপড়ায় তাঁহাদের খুব শখ এবং কতকগুলি লোক আছেন, লেখাপড়াই তাঁহাদের জীবনের এক-মাত্র উদ্দেশ্য। ইঁহাদের লেখায় আমাদের পত্রিকার খুব গৌরব হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইঁহাদের সকলের লেখা আলোচনা করি, তেমন শক্তিও আমার নাই, সামর্থ্যও আমার নাই এবং আমার অভিভাষণ এবার দীর্ঘ না হয়, ইহাও অনেকের ইচ্ছা— আমারও দীর্ঘ অভিভাষণ পড়িবার সামর্থ্য নাই ; কিন্তু সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার সামর্থ্য আছে এবং সকলকে আশীর্বাদ করিবারও সামর্থ্য আছে— তাই দুই-চারি জন মাত্র লোকের নাম উল্লেখ করিয়া, তাঁহাদের লেখার আলোচনা করিব। যাঁহাদের নাম উল্লেখ না হইবে, তাঁহারা যেন মনে না করেন যে, তাঁহাদের লেখার প্রতি আমার অনুরাগ কম।

১. শ্রীমান্ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম. ডি., এম. এস-সি. [মৃ. ১৩৪১ ব], ইঁহার ব্যাবসা ডাক্তারি— ইনি মেডিকেল কলেজের একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক, তথাপি ইনি অন্য অনেক শাস্ত্রের চর্চা রাখেন, বিশেষ ঋগ্-বেদের দেবতারা কোথা হইতে আসিল, তাহার সন্ধান করিতেছেন এবং জ্যোতিষের চর্চা করিতেছেন। তাঁহার সংস্কার, ঋগ্‌বেদের দেবতারা অনেকেই জ্যোতিষ হইতে আসিয়াছেন, কোন্‌টি তারা, কোন্‌টি নক্ষত্র, কোন্‌টি গ্রহ, কোন্‌টি বা ঋতু, আমাদের অয়নাংশ। বেদ ভিন্ন তিনি আরো অনেক শাস্ত্রের চর্চা করিতেছেন এবং সকল শাস্ত্রেরই দুই-একটি প্রবন্ধ আমাদের দিতেছেন, প্রাণীবিজ্ঞানের কথাও দিতেছেন।

২. শ্রীমান্ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়[১]— ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিতেছেন, ইংরাজিতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও স্থিতি সম্বন্ধে দুই খণ্ড বই লিখিয়া খুব নাম করিয়াছেন, এবং বাংলা ভাষার ও বাঙালিদের খুব উপকার করিয়াছেন। তিনি আমাদের এখানে ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি ভালো ভালো প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে কেহ কিছু বলিলে তাহাও আলোচনা করিয়া থাকেন।

তিনি কয়েক বৎসর আমাদের পত্রিকাধ্যক্ষ থাকিয়া পত্রিকার বিশেষ উন্নতি করিয়াছেন। সুনীতিকুমার দুই-একটি ভালো চেলা তৈয়ার করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীমান্ সুকুমার সেন [জ. ১৯০০ খৃ.] একটি। তিনি আমাদের শব্দ-শাস্ত্র ও বৈষ্ণব-সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ দিয়াছেন।

৩. শ্রীমান্ প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী এম. এ., ডি. লিট. [১৮৯৮-১৯৫৬ খৃ.], প্রফেসর সিল্‌ভ্যান্ লেভির [Sylvain Levi, ১৮৬৩-১৯৩৫ খৃ.] সহিত পৃথিবীর অনেক দেশ দেখিয়া আসিয়াছেন। চীনা-ভাষা খুব শিখিয়াছেন এবং চীনার একখানি অভিধানও লিখিতেছেন—সেটা একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার [*Deux Lexique : Sanskrit-Chinois*]। আমরা কয়েক বৎসর পূর্বে নেপাল হইতে কয়েকখানি বাংলা নাটক পাইয়াছিলাম ও শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়া সাহিত্য-পরিষৎ হইতে তাহা ছাপাইয়াছিলাম ['নেপালে বাঙ্গালা নাটক', ১৩২৪ ব.]। ডক্‌টর বাগচী সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া আরো অনেক সেইরূপ বই সংগ্রহ করিয়াছেন এবং "নেপালে ভাষানাটক" [তৃতীয় সংখ্যা ১৩৩৬ ব.] নাম দিয়া আমাদের পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ দিয়াছেন—প্রবন্ধটি অতি উত্তম হইয়াছে। ডক্‌টর বাগচীর পড়াশুনা যথেষ্ট আছে এবং নানা স্থানে তিনি নানা প্রবন্ধ লিখিতেছেন এবং নানা তত্ত্বের আবিষ্কার করিতেছেন।

৪. শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ লাহা এম. এ., বি. এল , পি-এইচ. ডি [১২৯৩-১৩৭২ ব] নিজে ইংরাজিতে *Indian Historical Quarterly* [প্রথম প্রকাশ ১৯২৫ খৃ.] নামে একখানি পত্রিকা সম্পাদন করিতেছেন এবং সে পত্রিকা এখন খুব পসার করিয়া লইয়াছে— বোধ হয়, ভারত সম্বন্ধে এমন সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ কোনো পত্রিকায় পাওয়া যায় না, তথাপি আমাদের উপর তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ আছে। এখানে অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে একটি ভালো প্রবন্ধ দিয়াছেন এবং অনেক দিন আমাদের পত্রিকার অধ্যক্ষ থাকিয়া [১৩৩১-৩৫ ব.] যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে একজন দোহার পাইয়াছেন, তাঁহার নাম শ্রীমান্ নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিও আমাদের দুইটি প্রবন্ধ দিয়া বাধিত করিয়াছেন— দুইটিই অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে।

৫. শ্রীমান চিন্তাহরণ চক্রবর্তী এম. এ. [১৯০০-১৯ ২ খৃ.] সকল কাগজেই অনেক প্রবন্ধ লিখিতেছেন এবং পরিষদের উপযুক্ত প্রবন্ধগুলি এখানে পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। তিনি বাংলায় বর্গির হাঙ্গামার প্রাচীনতম বিবরণ লিখিয়া বাংলার ইতিহাসের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। তাঁহার লেখা অতি প্রাঞ্জল ও পরিষ্কার।

৬. শ্রীমান্ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ [১৮৮৫-১৯ খৃ.] বহু-কাল কলিকাতা ছাড়িয়া গিয়াছেন, তথাপি সাহিত্য-পরিষৎকে ভুলিতে পারেন নাই। মাঝে মাঝে আমাদের প্রবন্ধ দিতেছেন। তিনি সাহিত্য-পরিষদের বৌদ্ধগান ও দোহা নামক পুস্তক হইতে দুইখানি দোহাকোষ ফরাসি ভাষায় তর্জমা করিয়া খুব নাম করিয়াছেন। তিনি ঐ দুইখানি দোহাকোষ ভোট-ভাষার তর্জমার সহিত মিলাইয়া, উহার যে-সকল অপূর্ণ অংশ ছিল, তাহা পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। বৌদ্ধগান ও দোহায় দুইটি পাতা ছিল না, ভোট তর্জমা হইতে তাহা উদ্ধার করিয়াছেন এবং উহার ভাষা সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন।

৭. শ্রীমান্ গণপতি সরকার মহাশয় বিস্তর খরচপত্র করিয়া জ্যোতিষ ও নীতিশাস্ত্রের বই পড়িয়াছেন ও তাহার বাংলায় তর্জমা করিয়াছেন। আমাদের এখানে তিনি অনেকগুলি ভালো ভালো প্রবন্ধ দিয়াছেন— একটি জ্যোতিষ, বিবাহ-বৈধব্য সম্বন্ধে, আর-একটি প্রজানিয়মনে ও সুপ্রজাবর্ধনে জ্যোতিষের প্রভাব বিষয়ে।

৮. শ্রীমান্ সত্যচরণ লাহা এম. এ., বি. এল. পাখির সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার একটি পাখিশালা আছে, তিনি দিনের মধ্যে অনেক সময় সেইখানেই কাটান। তিনি পুরুলিয়ার পাখি সম্বন্ধে আমাদের উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ দিয়াছেন।

৯. শ্রীমান্ মণীন্দ্রমোহন বসু এম. এ. সহজিয়া ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। ইনি মনে করেন, চণ্ডীদাস নামে অনেক কবি ছিলেন, তাহার মধ্যে দীন চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের অনেক পরের লোক এবং তাঁহারই পদাবলী বেশি।

১০. শ্রীমান্ রমেশ বসু এম. এ. অনেক বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতেছেন। তাঁহার প্রাচীন ধুয়া-সংগ্রহ অতি সুপাঠ্য হইয়াছে।

তিনি সম্প্রতি একখানি লক্ষ্মণসেনের তাম্রলিপির পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতে বেশ গুণপনা দেখাইয়াছেন।

১১. শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ দত্ত— ইনি গণিতবিদ্যার ইতিহাস, বিশেষত ভারতের গণিতের ইতিহাস লইয়া কতকগুলি অতি উপযোগী প্রবন্ধ দিয়াছেন, এবং এরূপ আরো প্রবন্ধ ইঁহার নিকট হইতে আমরা আশা করি।

১২. শ্রীমান্ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় [১৮৯০-১৯৭৫ খৃ]— বৈষ্ণব-সাহিত্য-আলোচনায় অগ্রণী, ইঁহার কতকগুলি মৌলিক প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকার গৌরব-বৃদ্ধি করিয়াছে।

সকলের কথা বলিতে পারিলাম না, তাহাতে কেহ যেন দুঃখিত না হন। এই যে তরুণগণ আমাদের অকাতরে উপকার করিতেছেন, ইঁহাদের উৎসাহ দিবার জন্য এখনো কিছুই করিতে পারি নাই। এফ. এ. এস. বি.-র মতো কোনো একটা উপাধি সৃষ্টি করিয়া ইঁহাদের উৎসাহ বর্ধন করিলে হয় না? এফ. এ. এস. বি.-র উপাধিতে এশিয়াটিক সোসাইটির বেশ উপকার হইয়াছে। অনেক পণ্ডিত উহার জন্য এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সৃষ্টি ৩৬ বৎসর হইয়া গিয়াছে। নানা রূপ বাধা, বিঘ্ন, বিপত্তি সত্ত্বেও এই ৩৬ বৎসরের মধ্যে পরিষৎ দুইটি বড়ো বড়ো বাড়ি করিয়াছে, অনেক পাথরের মূর্তি সংগ্রহ করিয়াছে, কাজ-করা ইট সংগ্রহ করিয়াছে, বাংলা ও সংস্কৃতপুথি সংগ্রহ করিয়াছে, ভুটিয়া পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছে, ছবি সংগ্রহ করিয়াছে, ছাপা পুথির বড়ো বড়ো লাইব্রেরি সংগ্রহ করিয়াছে— তাহার মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয়কুমার দত্তের লাইব্রেরি প্রধান। কিন্তু দুঃখের কথা . এই যে, এই-সকল বই, পুথি, চিত্রাদি লইয়া এখনো কেহ কাজ করিতে আসে নাই। আমাদের এখানে যে ভুটিয়া পুথি আছে, তেমন ভালো ছাপা পুথি কলিকাতায় আর-কোথাও নাই। তেঙ্গুর সংগ্রহে প্রায় দশ হাজার সংস্কৃত পুথির তর্জমা আছে— সে-সকল সংস্কৃত পুথি লোপ হইয়াছে। পুথি দু-একখান গুজরাট হইতে ও বোধ হয়, খানপঞ্চাশেক নেপাল হইতে পাওয়া গিয়াছে, বাকি সম্বল ঐ ভুটিয়া তর্জমা। উহা হইতে ভারতবর্ষের, বিশেষ বাংলার নানাবিধ ইতিহাসের

মালমসলা সংগ্রহ করা যাইতে পারে, কিন্তু এ পর্যন্ত উহা লইয়া খাটিবার লোক পাওয়া গেল না। বাংলা বই প্রায় ত্রিশ হাজার আছে। ১৭৭৮ সালে প্রথম ছাপা বাংলা ব্যাকরণ [Nathaniel Brassey Halhed, *A Grammar of The Bengal Language*, Hoogly.] হইতে এ পর্যন্ত যত বই ছাপা হইয়াছে, প্রায়ই সব আছে ; কিন্তু ইহা লইয়া খাটিবার লোক হইতেছে না। আমাদের সিক্কাগুলির একখানা বই আজও তৈয়ারি হয় নাই। মূর্তিগুলির বই দু-একখানি হইয়াছে, কিন্তু সে বই বাহির হইবার পর আরো মূর্তি বাহির হইয়াছে, তাহা লইয়াও কেহ নাড়াচাড়া করে নাই। এক পণ্ডিত শ্রীমান্ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয় সংস্কৃত ও বাংলা পুথিগুলি লইয়াই নাড়াচাড়া করিতেছেন ; কিন্তু পুথিগুলির একটা ভালো তালিকাও তৈয়ার হয় নাই : ছাপা পুথিগুলির তালিকাও হয় নাই। এই-সকল কাজে শিক্ষানবিশি করিবার লোক পাওয়া যায় না, কিন্তু শিক্ষানবিশের অভাব হইলে চলিবে না। পূর্বে আমাদের শিক্ষা-নবিশদের বসিতে দিবার জায়গা ছিল না, এখন অনেক জায়গা হইয়াছে, কিন্তু লোক কই ? এই-সকল জায়গায় শিক্ষানবিশ পাইলে এবং দুই-তিন বৎসর কাজ করিলে তবে তো লোকে পণ্ডিত হইবে, তবে তো তাহারা নিজে নিজে প্রবন্ধ লিখিতে শিখিবে, তবে তো সাহিত্য-পরিষদের পসার-প্রতিপত্তি হইবে। কিন্তু সে বিষয়ে এখনো কাহারো দৃষ্টি পড়ে নাই— পড়া অত্যন্ত উচিত, নহিলে রাশীকৃত জিনিস সংগ্রহ হইয়া পচিতে থাকিলে চলিবে না— তাহার ভালো ব্যবহার হওয়া চাই— তবে তো দেশের উপকার হইবে— তবে তো তাহার দ্বারা সাহিত্যের প্রসার বৃদ্ধি হইবে, তবেই তো ইতিহাসের অন্ধকার ছুটিবে। দেশসুদ্ধ লোক ইতিহাসের জন্য পাগল হইয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ইতিহাসের কথা জিজ্ঞাসা করিবার লোক ছিল না। এখন অনেক লোক হইয়াছে। কিন্তু ইঁহাদের সম্বল ইংরাজি, ফ্রেঞ্চ বা জর্মন। নিজে খাটিয়া নিজের দেশ হইতে নিজের দেশের ইতিহাস সংগ্রহ করার চেষ্টা অতি অল্প দিন আরম্ভ হইয়াছে এবং তাহাও খুব ধীরে ধীরে হইতেছে। ইহার ধীরগতি দ্রুত হওয়া চাই। ইতিহাসের জন্য লোকের চোখ তৈয়ার হওয়া চাই। এই যে প্রকাণ্ড শহর কলিকাতা, ইহার প্রতি গলিতে ইতিহাসের প্রচুর মালমশলা পড়িয়া আছে। কিন্তু সেই ইতিহাস সংগ্রহের জন্য সাহিত্য-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

পরিষৎ কোনো উপায় করিয়াছেন কি ? এই কলিকাতায় বসিয়াই উইলসন্ সাহেব [Horace Hayman Wilson, ১৭৮৬-১৮৬০ খৃ.] হিন্দু-ধর্ম-সম্প্রদায়ের ইতিহাস [*Sketches of the Religious Sects of the Hindus.*] সংগ্রহ করিয়াছিলেন, অক্ষয়কুমার দত্ত [১৮২০-৮৬ খৃ.] ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের [প্রথম ভাগ ১৮৭০, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৮৩ খৃ] মালমসলা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা তাহা করি না— আমরা ঘরে ইলেক্‌ট্রিক পাখার নিচে বসিয়া বই পড়িয়া যাহা পারি, তাহাই করি— বেশি কিছু করিতে পারি না। একটু বাহির হইয়া কলিকাতায় ঘুরিলে, যদি ঠিক চোখ থাকে, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার অন্তত পাঁচ বৎসরের খোরাক সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু সে বিষয়ে কাহারো আগ্রহ দেখিতে পাই না। এই-সকল বিষয়ে যাহাতে আগ্রহ হয়, পরিষদের সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। পরিষদের মুরুব্বিরা সকলেই সম্ভ্রান্ত লোক, তাঁহাদের একটু নজর থাকিলেই তাঁহারা কটাক্ষে বহু-সংখ্যক শিক্ষার্থিবর্গের দ্বারা এই-সকল কাজ করাইয়া লইতে পারেন, তাহাতে বাঙালির প্রভূত উপকার হয়। কলিকাতার বাঙালিদের ইতিহাস একেবারেই লেখা হয় নাই। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর [১৮৫৭-১৯৪৬ খৃ.], ধীরে ধীরে নানাবিধ চেষ্টা করিয়া এই-সকল সংগ্রহ করিতেছেন। তাঁহাকে সাহিত্য-পরিষদে আনিয়া, তাঁহার দ্বারা কতকগুলি ছাত্র-সভ্য তৈয়ারি করিয়া, ঐ কার্জটি অনায়াসেই করা যাইতে পারে।

বাংলার ইতিহাসের দুই-চারিটি সমস্যার কথা বলিয়া আমার এই সংক্ষিপ্ত অভিভাষণ শেষ করিব। আমি সমস্যাগুলি বলিতে পারি, কিন্তু সমস্যাগুলি পূরণ করিবার ক্ষমতা আমার নাই। যীশু খৃস্টের অন্তত হাজার বৎসর পূর্বে ঐতরেয় আরণ্যক সংগ্রহ হয়। উহার প্রথম আরণ্যকে মহাব্রত নামে এক যজ্ঞের কথা আছে, দ্বিতীয় আরণ্যকে ঋগ্‌বেদের মন্ত্ররাশি ও তাহার শিক্ষা, ব্যাকরণ প্রভৃতির কথা আছে। কিন্তু উহার প্রথমেই লেখা আছে, "তৎ উক্তং ঋষিণা প্রজা হ তিস্রঃ" ইত্যাদি। ঐতরেয় আরণ্যক একজন ঋষির বাক্য বলিয়া এইটি তুলিয়াছেন ; সুতরাং এটি ঐতরেয় আরণ্যক লেখার পূর্বে লেখা। ঐতরেয় আরণ্যক ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন— তিন প্রজা অর্থাৎ বঙ্গ, বগধ ও চেরোপাদ, ইহারা
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ধর্মের বাহিরে। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, আমাদের বাংলায় বঙ্গ, বগধ ও চেরো নামে তিনটি জাতি ছিল। বঙ্গ জাতি কোথায় গেল, অনেকে অনেক রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কোনোটাই মনের মতো হয় না, অথচ দেশটা তাহাদেরই নামে আজিও চলিতেছে। এই বঙ্গেরা কোথায় গেল, ইহা একটা সমস্যা। বঙ্গের পর বগধ, বগধের পর চেরো —চেরো মানে কেরল জাতীয় লোক। ইহারা এখনো ছোটোনাগপুরে বাস করিতেছে। বগধ কোথায় গেল ? আমার সন্দেহ হয়, ইহারা রাঢ় দেশের বাগ্‌দি। বাগ্‌দিরা একটি জাতি, যাহাকে ইংরাজিতে 'এথ্‌নোস বলে। উহাদের ভিতর অনেক জাতি আছে। নামে বাগ্‌দি, কিন্তু সেই বাগ্‌দিদের ভিতর ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিবাহ আদি নাই। উহাদের সামাজিক অবস্থাও ভিন্ন ভিন্ন, কেহ বড়ো, কেহ ছোটো। উহারা প্রায়ই শুদ্ধাচারী। উহাদের ভিতর বিধবা-বিবাহ একেবারে নাই। এখন উহারা বাংলাই বলে, বাংলাদেশের অন্য নানা জাতির মতো। কিন্তু এককালে বোধ হয় বলিত না। কিন্তু বাংলার অনেক কথা এই ভাষা হইতে আসিয়াছে। এই বাগ্‌দি জাতি বাংলার ইতিহাসের একটি সমস্যা। ইহারাই বাংলার সিপাহি ছিল। রাঢ়ে অনেক জায়গায় বাগ্‌দি রাজার কথা শুনা যায়। লোকে বলে, বিষ্ণুপুরের রাজারা বাগ্‌দি ছিলেন। বাগ্‌দিদের ভিতর ঢুকিয়া উহাদের ইতিহাস সংগ্রহ করিতে পারিলে বাংলার ইতিহাসের একটি মস্ত সমস্যা পূরণ হইবে।[২]

যোগী জাতি বাংলার আর একটি সমস্যা। 'কৌলজ্ঞাননির্ণয়'[৩] নামে এক বইয়ে আছে, মহাদেব চন্দ্রদ্বীপে গিয়া মৎস্যেন্দ্রনাথকে মন্ত্র দেন —তাহা হইতেই কৌল ধর্মের উৎপত্তি। এখনো দেখা যায়, নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় গ্রামকে গ্রাম কৌল জাতিতে পরিপূর্ণ। ইহাদের ইতিহাস বাংলার ইতিহাসের এক প্রধান অঙ্গ— কিন্তু সে ইতিহাস একটি সমস্যা। আমার বোধ হয়, বাংলায় মাছধরা, নৌকাচালানো প্রভৃতি কৈবর্ত জাতির কাজ ছিল। ব্রাহ্মণেরা কৈবর্তদিগকে দস্যু বলিত। যেমন শকেরা দস্যু, যবনেরা দস্যু, পহ্লবেরা দস্যু, মেদেরা দস্যু, ভীলেরা দস্যু, তেমনি কৈবর্তেরাও দস্যু অর্থাৎ তাহারা আর্যসমাজের বিরোধী কোনো এক জাতি। এখনো বাংলার সেন্‌সাসে দেখা যায়, হিন্দুদের ভিতর কৈবর্তের

সংখ্যা সব চেয়ে বেশি। ব্রাহ্মণেরা তাহাদের লইতেন না, যেহেতু তাহারা দস্যু, বৌদ্ধেরা তাহাদের লইতেন না, যেহেতু তাহারা নিরন্তর প্রাণীবধ করে— তাই মহাদেব তাহাদের এক নূতন ধর্ম দিয়াছেন। কিন্তু এটি আমার কথা মাত্র। আমি যোগী জাতি, কৌল ধর্ম ও কৈবর্ত জাতি বাংলার তিনটি মহা সমস্যা বলিয়া মনে করি। এ-সকল সমস্যা পূরণের জন্য সাহিত্য-পরিষদের সর্বতোভাবে যত্ন করা উচিত।

আমার অনুরোধ এই-সকল সমস্যা পূরণের জন্য যত্ন করিবেন। আমাদের তরুণেরা এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিবেন। আমার দ্বারা এ-সকল কাজ আর হইবে না। আমি আপনাদের নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি, বিদায় লইয়া যাই। বিদায়ের পূর্বে বলিয়া যাই যে, আপনাদের ভবিষৎ খুব গৌরবময়। এখনকার তরুণেরা এবং তাঁহারা বৃদ্ধ হইলে যে-সকল তরুণেরা আসিবে তাহারা বাংলার ইতিহাসের সমস্ত সমস্যা পূরণ করিয়া দিবে। সাহিত্য-পরিষৎ বাংলা ভাষার ও বাঙালি জাতির মুখ উজ্জ্বল করিবে। এখন আমরা দুইটি বাড়ি করিয়াছি বলিয়া গৌরব করিতেছি, তখন ইহাদের আশ্রম খালধার পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে— পরিষদের কার্য নানা শাখায় বিভক্ত হইবে, প্রত্যেক শাখা হইতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পত্রিকা বাহির হইবে। কলিকাতার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও তাহার মিউজিয়ম পৃথিবীর অন্যান্য পরিষৎ ও মিউজিয়মকে ছাড়াইয়া উঠিবে, কারণ বাংলা অতি প্রাচীন দেশ। এইরূপ নদীমাতৃক দেশেই সভ্যতার প্রথম উৎপত্তি— বাংলার সভ্যতা যে কত প্রাচীন তাহা বলিয়া উঠা যায় না।

বিদায়কালে আরো এক কথা বলি, এই সুদীর্ঘ তেরো বৎসরের মধ্যে কার্যক্ষেত্রে যদি কাহারো মনে কোনো কষ্ট দিয়া থাকি, তাহা হইলে তিনি আমাকে ক্ষমা করিবেন, যদি আমার দ্বারা কাহারো অনিষ্ট হইয়া থাকে, তিনিও আমাকে ক্ষমা করিবেন, কারণ আমি নিঃস্বার্থভাবে যথা-সাধ্য সাহিত্য-পরিষদের সেবা করিয়াছি।

আমার আর যাহা-কিছু বলিবার ছিল, তাহা সম্পাদক মহাশয় বার্ষিক বিবরণীতে বলিয়াছেন। আমার বলার মধ্যে এ বৎসর আমাদের বড়োই ক্ষতি হইয়াছে, যেহেতু মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী [১৮৬০-১৯৩০ খৃ.] যিনি আমাদিগকে শৈশবাবস্থা হইতে পুত্রনির্বিশেষে পালন

করিয়া আসিয়াছিলেন তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। আর বাংলার পুরাতত্ত্বের একনিষ্ঠ সেবক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন।

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'
দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৩৭ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

৩২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩৬ বার্ষিক অধিবেশনে বিদায়ী সভাপতি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই অভিভাষণ পড়েন। পরিষদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের সূচনা ১৩০৩ বঙ্গাব্দে, সাধারণ সদস্য রূপে। পর বৎসরই সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন। সহকারী সভাপতি ছিলেন ১৩০৪-০৯, ১৩১৮-১৯, ১৩২৩-২৬, ১৩৩১ এবং ১৩৩৭-৩৮। প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন ১৩২০ বঙ্গাব্দে। সভাপতি ছিলেন ১৩২০-২২, ১৩২৬-৩০, ১৩৩২-৩৬। ১৩০৯ থেকে ১৩১৫ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে পরিষদের সম্পর্ক ছিল না। ১৩০৯ বঙ্গাব্দে তাঁর 'মেঘদূত ব্যাখ্যা' বইটি প্রকাশিত হয়। "কিন্তু প্রকাশ হওয়া মাত্র ঝড় উঠল— অত্যন্ত অশ্লীল বই। প্রায় তাঁর চাকরি নিয়ে টানাটানির উপক্রম হয়েছিল।... সরকারের কাছে হরপ্রসাদকে কৈফিয়ত দিতে হয়েছিল।" (দ্র. 'স্মারকগ্রন্থ', পৃ. ১৩৬)। এই সময়ে পরিষদে তাঁর সহকর্মী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং আরো কেউ কেউ বইটিকে 'অশ্লীলতার অমার্জনীয় দোষে দুষ্ট' বলেন। ক্ষুব্ধ শাস্ত্রীমশায় পরিষদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। আবার তাঁকে পরিষদে ফিরিয়ে আনেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। সেই-সব পুরানো তিক্ততার স্মৃতি এই অভিভাষণে ছায়া ফেলেছে।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৯০-১৯৭৭ খৃ.) *The Origin and Development of the Bengali Language* (১৯২৬ খৃ.) প্রকাশের পরে শাস্ত্রীমশায় নিজের বাড়িতে এক ঘরোয়া বন্ধু-সমাবেশে তাঁকে সংবর্ধিত করেন। এ বিষয়ে শ্রীসুকুমার সেনের মন্তব্য দ্র. 'প্রারম্ভ-বচন', হ-র-সং, প্রথম খণ্ড।

১৩২৯ বঙ্গাব্দের ১৬ পৌষ শাস্ত্রীমশায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পরিষদের চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে সুনীতিকুমার 'ব্রিটিশ মিউজিয়মের কতকগুলি বাঙ্গালা কাগজপত্র' নামে একটি প্রবন্ধ পড়েন। পরিষদের কার্য-বিবরণের খাতায় শাস্ত্রীমশায়ের এই মন্তব্য পাওয়া যায়—

"সভাপতি মহাশয় বলিলেন, সুনীতিবাবু যখন বিলেতে যান, তখনো তিনি এখানে বিশেষ নাম ও খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

বিলাতে গিয়া আরো কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তিনি যে এককালে বড়লোক হবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তৎপরে তিনি প্রবন্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে বলিলেন যে, ইংরেজেরা যখন এদেশে আসে, সেই ১৬৩৩ খৃ. হইতে দেশের ইতিহাসের সমস্ত নাম উইলসন সাহেব চেষ্টা করিয়া সংগ্রহ করেন ও দুই খণ্ডে প্রকাশ করেন। ঐ সকল নাম এক্ষণে প্রায় পাওয়া যায় না। যে দলিলে কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর দাতারাম রায়চৌধুরীর কাছ থেকে কেনা হয়, তাহাতে অনেক নাম ও তখনকার বাংলার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৫৯ খৃ. ক্যালকাটা রিভিউ পত্রে প্রাচীন কলিকাতার বিবরণে অনেক নাম ও তখনকার বাংলার নমুনা পাওয়া যায়। তার পর হতে কলিকাতার ও সঙ্গে সঙ্গে ভাষার কত পরিবর্তন হয়েছে। তার পর সুনীতিবাবু প্রসঙ্গক্রমে কেম্ব্রিজ, প্যারী প্রভৃতি নগরে যে সকল নেপালী পুঁথির সন্ধান পাইয়াছেন বলিলেন, তৎসম্বন্ধে তিনি বলিলেন যে, নেপালী যুদ্ধের পর ১৮১৬ খৃ. হজসন্ সাহেব ডাক্তার হয়ে নেপালে যান। তিনি সেখানে রেসিডেন্সির হেডপণ্ডিত অমৃতানন্দের দ্বারা বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস ও নেপালের ইতিহাস রচনা করাইয়াছিলেন। তিনি যখন ১৯০৭ খৃ. নেপালে গমন করেন— সেখানে ধর্মকোষ ব্যাখ্যা পড়েন — পড়ে দেখেন যে, উহাও সাহেবার্থে অমৃতানন্দেন লিখিতং। ১৮২৬ খৃ. বৃদ্ধ ইন্দ্রানন্দ পুঁথি সংগ্রহ করেন। ১৮৪৩ খৃ. রাইট সাহেব নেপালে গেলেন। রাজা রাজেন্দ্রবিক্রম যখন রাজ্য ছাড়িয়া পলাইতে গিয়া ধৃত হইলেন, সেই সময় রাজ্যমধ্যে রাজদ্রোহ উপস্থিত হইল এবং তিনি ইংরেজের সাহায্যে তরাইপ্রদেশে উপস্থিত হন, তথায় তিনি বৌদ্ধবিহার দখল করেন এবং মন্দির হতে বহু পুঁথি ফেলে দিলেন! রাইট্ সাহেব পুঁথিগুলি নিলেন। বেণ্ডল সাহেব সে সব পুঁথির ক্যাটলগ তৈয়ারি করেন। তৎপরে তিনি ১৮৮৪ খৃ. এদেশে আসেন। নেপালের অনেক ছোটো ছোটো পাহাড়ের মঠে বাঙালীর লিখিত অনেক গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। নেপাল ভিন্ন বাংলার ইতিহাসের উদ্ধার নাই। এত ধর্মবিপ্লব, এত নরহত্যা হইয়া গিয়াছে, তথাপি বাঙালিরা নেপালে যাইতেন এবং তাঁহাদের কীর্তি তথায় রাখিয়া গিয়াছেন। এ-সকল দেখবার চোখ তৈয়ার করা দরকার। কাটমুণ্ড হইতে ১০/১২ মাইল দূরে সাঁকু শহরের মাইল খানেক দূরে বজ্রযোগিনীর মন্দিরে বৌদ্ধ গান ও দোহার মতো পাঁচ-ছয় শত গান রহিয়াছে। বঙ্গদেশ হতে অনেক সিদ্ধপুরুষ তথায় যাইতেন। ছয় শত পঞ্চাশ বছর আগে ঠাকুর আনন্দবজ্র তথায় থাকতেন। ঢাকার বজ্রযোগিনী একটি বিখ্যাত স্থান। সেখানে সব ঠাকুর ছিল ; তথায়

কুলীন ব্রাহ্মণদের বাস। বোধ হয় পূর্বে সে স্থানটি বৌদ্ধদের গ্রাম ছিল। বজ্রযোগিনীর ধ্যান হিন্দুদের দেব-দেবীর ধ্যানের মতো। এইরূপে কত প্রাচীন ভাষার ও সাহিত্যের নমুনা নানা দেশে বিদেশে বাংলা দেশে ও বাঙালির দ্বারা ছড়াইয়া পড়িয়াছে ও পরে বিদেশীয়গণ কর্তৃক উক্তরূপে উদ্ধার হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সুনীতিবাবু যে এই বিষয়ে পরিশ্রম করিতেছেন, তজ্জন্য তিনি সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র।"

২. "প্রজা হ তিস্রো অত্যায়মান্" ঋগ্‌বেদীয় এই শ্লোকাংশের ব্যাখ্যায় ঐতরেয় আরণ্যকে (২-১-১-৫) বলা হয়েছে, "যা বৈ তা ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায়মায়ংস্তানীমানি বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ", এই যে তিনটি জীবজাতি নষ্ট হয়েছিল, তারা এই-সব পাখি— বঙ্গেরা, বগধেরা, চেরপাদেরা (অথবা / এবং ইরপাদেরা)।

বঙ্গ-বগধ-চের বিষয়ে এর আগেও শাস্ত্রীমশায় আলোচনা করেছেন। ১৯২০-২১ খৃস্টাব্দে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয়টি বক্তৃতা দেন, তার প্রথম বক্তৃতা 'Original Inhabitants of Magadha'-এ এই প্রসঙ্গে বলেন—

"The country is called Magadha in the Kauṣītakī Āraṇyaka[1] and that the Kauṣītakīs had a close connection with this country will be explained later. The Atharva-Veda has Magadhas, the plural denoting a tribe.[2] This tribe was not very friendly to the Vedic Aryans as the Atharva-Veda thinks that Malarial Fever should be driven away to Magadhas as beyond the pale of Vedic civilization. One Śākhā of the Veda joins the Aṅgas with the Magadhas and the other Śākhā joins the Kāśis with them. It is from this tribe, that in the Kauṣītakī Āraṇyaka we get the name of the country as Magadha. Some think that Bagadha mentioned with Baṅga and Chera in the Aitareya Āraṇyaka[3] is only another from of Magadha. But this does not seem to be tenable. For, between Baṅga and Chera or the Dravidian people in Chutia-Nagpur, the

1. VII. 13. 2. V. 22. 14. 3. II. 1. 1.

whole country— now Burdwan Division— has in it a powerful ethnical race still called Bāgdīs, which is another form of Bagadha. They form altogether an ethnos with peculiar features and peculiar colour. They are tall, stout, robust and war-like. They had a government of their own and I have reason to think, that they had a language of their own, too. So, from the tribe Magadhas, the country received the name Magadha. The word Māgadha means an inhabitant of Magadha, not necessarily belonging to the tribe of Magadhas. The Māgadhas are neither Brahmanas nor Śūdras (Vāja. Saṁ. 30. 22), and they are to be sacrificed in the Puruṣamedha to the god Atikruṣṭa ("Loud Noise")[1]. The humour of the thing lies in the fact that the Māgadhas made loud noise in their songs. The word Māgadha later meant minstrels, who lived by singing loudly the praise of kings; and the Bhāṭs of Rajputānā and other provinces who claimed their descent from the Māgadhas make a huge noise when they sing the praises of the donors of gifts. The noise is often intolerable." (*Magadhan Literature*, Patna 1923, pp. 2-3).

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় "Bengal, Bengalees. Their manners, customs and Literature" নামে শাস্ত্রীমশায়ের একটি অপ্রকাশিত প্রবন্ধের তথ্য ব্যবহার করেছিলেন। রাখালদাসের লেখা থেকে বোঝা যায় এই প্রবন্ধে বঙ্গ-বগধ-চের প্রসঙ্গ ছিল। দ্র. বাঙ্গা-ই, পৃ. ২৬।

শাস্ত্রীমশায়ের ইঙ্গিত অনুসরণ করে এ বিষয়ে ব্যাপক বিচার-বিবেচনা করেন অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধ 'চেরোজাতি' (পৌষ, ১৩২৮ ব.), 'বগধ জাতি' (অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ ব.)।

৩. এই বইয়ের পৃ. ৪৫৪ সূত্র ১৪ দ্র.।

1. Vāj Saṃ XXX. 5. 22.

বাংলা বাঙ্ময়

ইস্কুল ছাড়িয়া কালেজে ঢুকিবামাত্র ইংরেজি, বাংলা ও সংস্কৃত তিন ভাষার রাশি রাশি সাহিত্য বঙ্গীয় যুবকের সম্মুখে বিস্তারিত হইল। চসার, স্পেনসার, শেকস্‌পীয়র, মিল্টন, ড্রাইডেন, পোপ, শেলি, বায়রন, ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থ, টেনিসন; কালিদাস, ভবভূতি, ভারবি, মাঘ, নৈষধ, ভট্টী; বাল্মীকি, বেদব্যাস, বেদপুরাণ, কাশীদাস, কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র, মাইকেল, হেমচন্দ্র প্রভৃতি কবি; এডিসন, গোল্ডস্মিথ, স্কট, লিটন, ডিকুইন্সি, থ্যাকারে; দণ্ডী, বাণভট্ট, বিষ্ণুশর্মা; হুতোম, দীনবন্ধু, বঙ্কিম; প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লেখকের গ্রন্থে তাঁহার প্রবেশ অধিকার হইল। দিনকত তিনি এই অগাধ সাহিত্যকাননে যদৃচ্ছ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন কিন্তু যতই

যান কাননের শেষ নাই, সকল বৃক্ষই সুমিষ্ট সকলেই আনন্দিত। যুবক-হৃদয়— সংসারের ভাবনা নাই। জগতের সৌন্দর্য মাত্র তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত। হৃদয়ের বৃত্তি-সকল এখনো বিকৃত হয় নাই— এখনো পাকিয়া শক্ত হয় নাই। তিনি ক্রমে সকল প্রকার সাহিত্যেরই আস্বাদ গ্রহণ করিলেন কিন্তু এই অগাধ সমুদ্রমধ্যে তিন জন লোকই তাঁহার অধিকতর প্রিয় হইল। এই তিন জনই তাঁহার চরিত্র-নির্মাণে নীতিশিক্ষাদানে তাঁহার সহায়তা করিল। ধর্মপ্রচারকের রাশি রাশি বক্তৃতা, শিক্ষকের ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ, পিতামাতার লালনপালন ও তাড়ন এই-সমস্ত একত্র হইয়া যাহা না করিতে পারিয়াছে তিন জন লোক (যাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার কোনো উপায় নাই) সেই নীতিশিক্ষাদান কার্য সম্পন্ন করিল। তাঁহাদের গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া তাঁহার মন ফিরিল, তাঁহার চিত্ত মথিত হইল, তিনি মনুষ্যের জন্য ভাবিতে, দুঃখ করিতে, সহানুভূতি করিতে শিখিলেন ; কালেজের চারি-পাঁচ বৎসরে এই তিন মহাত্মার স্পিরিট তাঁহাকে যেরূপ গড়িয়া পিটিয়া দিল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তাহাই থাকিবেন। সংসারে কত যন্ত্রণা পাইতে হইবে কত কত কষ্টে পড়িতে হইবে তাঁহার কত পরিবর্ত হইবে কিন্তু আদত তিনি যাহা ছিলেন তাহাই থাকিবেন।

ভারতবর্ষে ইংরেজি-বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ হইবার পূর্বে, বঙ্গসাহিত্যের বর্তমান উন্নতি হইবার আগে রামায়ণ ও মহাভারত যুবকদিগের চরিত্র নির্মাণ করিয়া দিত। কথকের মুখ হইতে, গুরুমহাশয়ের পাঠশালা হইতে, কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে বঙ্গীয় যুবক যে উপদেশ পাইতেন তাহা তাঁহার অস্থিমজ্জায় বিঁধিয়া থাকিত। আমরণ তিনি রাম বা যুধিষ্ঠিরকে দেবতা বলিয়া মনে মনে উপাসনা করিতেন ও উঁহাদিগেরই চরিত্র অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিতেন। বৃদ্ধ বয়সে পুত্রপৌত্রদিগকে নিজ উপাস্য দেবতার মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া দিয়া যাইতেন। রামায়ণ ও মহাভারত হইতে তিনি দেবতাব্রাহ্মণকে ভক্তি করিতে পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করিতে ভাইকে ভালোবাসিতে প্রচলিত ধর্ম যে পথে চালায় সেই পথে চলিতে শিখিতেন। ঐ দুই অগাধ সাহিত্যসমুদ্র মন্থন করিয়া আপনার কার্যপ্রণালী নিরূপণ করিতেন। আজিকার বঙ্গীয় যুবক রামায়ণ ও মহাভারত পড়েন না। যদিও পড়েন তো রাম বা যুধিষ্ঠিরকে তাঁহাদের উপর সম্পূর্ণ

আধিপত্য করিতে দেন না। যাঁহারা তাঁহাদের হৃদয়ে একা আধিপত্য করেন তাঁহাদের নাম বায়রন, কালিদাস ও বাবু বঙ্কিমচন্দ্র। তিন জনই যুবকদিগের চিত্ত আকর্ষণে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিবিশেষ; তাঁহাদের গ্রন্থাবলী পাঠকালে যুবকহৃদয় এমনি গলিয়া যায় যে শেষে তাঁহারা যে পথে উহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য ইচ্ছা করেন সেই পথেই উহা ধাবিত হয়।

রামায়ণ ও মহাভারত যে সময়ে লিখিত হইয়াছিল তখন পারিবারিক বন্ধন অত্যন্ত প্রবল। এইজন্য রামায়ণ ও মহাভারতের প্রধান উপদেশ সৌভ্রাত্র ও পারিবারিক প্রেম। রামায়ণ ও মহাভারতের রচনাকালে মনুষ্য দৌরাত্ম্যময় অসভ্যাবস্থা হইতে সবেমাত্র স্থির সামাজিক অবস্থায় উপস্থিত হইতেছে। সুতরাং তৎকালীন সমাজের উপর বিশ্বাস ও ভক্তি উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের দ্বিতীয় উপদেশ, তৎসমাজের বিঘ্নকারীদিগের প্রতি বিদ্বেষভাব তৃতীয়। মনুষ্যগণের দুর্দমনীয় ইন্দ্রিয়গণের দমন করিয়া শান্তিভাব ধারণ করানোই উক্ত কাব্যরত্নদ্বয়ের মূলমন্ত্র। বাল্মীকি ও বেদব্যাস অথবা তাঁহাদের অনুবাদক কাশীদাস ও কৃত্তিবাস আপন আপন উদ্দেশ্য সাধনে এতদূর কৃতকার্য হইয়াছিলেন যে বঙ্গীয় যুবক প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত তাঁহাদের একান্ত ভক্ত ও নিতান্ত অনুগত ছিলেন। অসভ্যতা পশ্বাচার তাঁহার হৃদয় হইতে দূরীভূত হইয়াছিল। তাঁহারা তিন-চারি পুরুষ পর্যন্ত একান্নবর্তী থাকিতে ভালোবাসিতেন। দেবতা-ব্রাহ্মণের তাঁহারা গোলাম হইয়াছিলেন, পরধর্মাবলম্বীর প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ভাব ভায়ানক প্রবল ছিল। পরধর্মের লোক তাঁহার শান্তিময় সমাজের যত কেন উপকারী হউক না তিনি তাহাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। কিন্তু পশ্বাচার ও অসভ্যতা কমিতে কমিতে তাঁহাদের শক্তিরও হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল। যাহা দমন করিবার জন্য বাল্মীকি বেদব্যাস হৃদয়বিদ্রাবিণী উন্মাদিনী কবিতাবলী রচনা করিয়াছিলেন সেই পদার্থ সেই শক্তি লোপ হইয়াছিল। দৌরাত্ম্যপ্রিয় উৎপাতপ্রিয় তেজস্বী আর্য যুবক কবিতার মোহিনীবলে মেষশাবকবৎ নিরীহ হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের শক্তি স্বাধীনতা তেজ গিয়া উহা কারখানার একটি একটি কলের মতো হইয়াছিল। যেমন বাষ্পীয় বলপ্রভাবে সহস্র সহস্র নলী একই ভাবে সকালে ছয়টা হইতে সায়াহ্নে ছয়টা পর্যন্ত চলে তেমনি

বঙ্গীয় সহস্র সহস্র লোক জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত একই ভাবে চলিত। চালাইত কে? কোন্ বাষ্পীয় যন্ত্রের এরূপ অসীম শক্তি? হিন্দু সমাজের দমনশক্তি। যেমন মধুর সংগীতে বনের মত্ত হস্তী পোষ মানিয়া চালকের বশে চলে তেমনি বাল্মীকি ও বেদব্যাসের মনোমোহিনী বীণার বশ হইয়া দুরন্ত শূরজবংশীয়েরাও দমন হইয়াছিল; বাঙালি তো কোন্ ছার।

আদিম অবস্থার সমাজ শাসনের প্রধান বিঘ্ন এই যে মনুষ্য কেহ কাহার অধীন হইতে চাহে না এবং সকলেই যাহা খুশি তাই করিতে চায়, সমাজবন্ধন করিতে গেলে obedience প্রথম প্রয়োজন। এইজন্য যাঁহারা প্রথম সমাজবন্ধন করিয়াছিলেন তাঁহারা ঐটি শিক্ষা দিবার জন্য চেষ্টা করেন। এক পুরুষে সকল উদ্ধত স্বভাব লোককে শাসনাধীন করা যায় না এইজন্য ১০/১৫ পুরুষ পর্যন্ত এক নিয়মে থাকিয়া সমাজ-মধ্যবর্তী সমস্ত লোককে বশ্যতা স্বীকার করানো চাহি। রামায়ণ ও মহাভারত এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্মিত। বহু-কাল অবধি হিন্দুরা রাম ও যুধিষ্ঠিরের চরিত্রানুকরণ করত সমাজশাসনের অধীন হইয়াছেন। সমাজও উত্তমরূপে দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু শুদ্ধ সমাজবন্ধনই তো মনুষ্যের উদ্দেশ্য নহে, সমাজবন্ধন পথ। এই পথে মনুষ্য সভ্যতাসোপানে আরোহণ করিবে; ক্রমে জড়জগতের উপর আধিপত্য করিবে, আপন জাতির সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিবে। প্রথম আপন জাতির, ক্রমে আপন দেশের, তাহার পর সমস্ত মনুষ্যের, তাহার পর সমস্ত জীবলোকের উপকার করিবে। যাহাতে জীবলোক জড়ের সহায়তায় দীর্ঘকাল আনন্দ অনুভব করিয়া বিনাক্লেশে দেহত্যাগ করিতে পারে তাহার চেষ্টা করিবে তবে তো পথ সার্থক হইবে, নচেৎ বনমধ্যে পথ কাটিয়া রাখিলে তাহাতে লাভ কি?

সমাজ বদ্ধ হইল কিন্তু সমাজের উদ্দেশ্য কিছু রহিল না। যেমন রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন দেখিয়া মনুষ্য শান্ত হইল সেইরূপ শান্ত হইয়া কী করিবে বুঝিতে পারিল না। তাহাতে এই হইল যে কতক লোক ভোগে আসক্ত হইল আর কতক এ জন্মের ভোগ ত্যাগ করত পরলোকের ভোগের জন্য ব্যস্ত হইল। কতক সুন্দরী রমণীসহবাসে বিচিত্র সুরাপানে রত হইয়া শীতে উষ্ণগৃহমধ্যে, গ্রীষ্মে প্রমোদ কাননে নির্ঝরগৃহে, জ্যোৎস্নায়

ছাদোপরি, রৌদ্রে পুষ্করিণীমধ্যে বিহার করাই জীবনের উদ্দেশ্য মনে করিল। আবার অনেকে অগ্নিকুণ্ডোপরি ঊর্ধ্বপদে অধঃশিরে তপ করত পরলোকে নন্দনকাননে উর্বশী মেনকা পরিবৃত হইয়া ইন্দ্রিয়সুখে অনন্তকাল কাটানোই মনুষ্য হওয়ার সুখ ভাবিলেন। কেহ দানে স্বর্গ, কেহ স্নানে স্বর্গ, মনে করিলেন। ইন্দ্রিয়সুখই সকলের উদ্দেশ্য হইল— কাহারো ইহলোকে কাহারো পরলোকে। কেহই এ কথা বুঝাইয়া দিল না যে মনুষ্যসমাজের প্রধান উদ্দেশ্য জড়জগতের উপর মনুষ্যজাতীয় আধিপত্য বিস্তার, তুমি আমি এমন-কি আমার সমসাময়িক যে-কোনো ব্যক্তি হউন, সমাজ ছাড়িয়া ধরিলে কেহ কিছুই নহেন। যেমন আমরা আমাদের একপুরুষ আগেকার লোকে যাহা রাখিয়া গিয়াছেন তাহা ভোগ করিতেছি, এইরূপ আমাদের পরে যাহারা আসিবে তাহাদের জন্য আমাদের পূর্বাপেক্ষা কিছু বেশি রাখিয়া যাওয়া অর্থাৎ জড়জগতের কিছু আধিপত্য বিস্তার করিয়া যাওয়া কর্তব্য। মনুষ্য সমাজবৃক্ষের পত্র। যেমন পত্র আকাশস্থ বায়ু আকর্ষণ করিয়া বৃক্ষের আয়তন বৃদ্ধি করে পরে আপনার সময় আসিলে পড়িয়া যায় এবং পরবর্তী পত্রসকল যাহাতে একটু উচ্চ ও পুষ্ট হয় তাহা করিয়া যায় সেইরূপ মনুষ্য সমাজ-বিস্তার করিয়া সমাজ পরিবর্ত ও সমাজ-সংস্কার করিয়া নূতন আবিষ্ক্রিয়া করিয়া দেহত্যাগ করে। তাহাদের সন্তানেরা এই-সকলের ফলভোগ করত আরো অধিকতর ক্ষমতা প্রকাশ করে।

এ কথা আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে কেহ বুঝাইয়া দেন নাই সুতরাং সেই শান্তভাবে সেই রামায়ণ ও মহাভারত শুনিয়া একই ভাবে চলিয়া আসিতেছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের উদ্দেশ্য সাধন হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু উহাদের পরিবর্তে গ্রহণ করা যায় এমন কোনো গ্রন্থ হয় নাই। এইজন্য উহারাই জাতীয় কাব্য বলিয়া পরিগণিত ছিল।

চল্লিশ বৎসর পূর্বে যখন ইংরেজি বিদ্যার চর্চা আরম্ভ হইল তখন অবধি রামায়ণ ও মহাভারতের নীতিশিক্ষা সেকেলে বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। সমালোচকেরা বাল্মীকির অদ্বিতীয় কবিত্বশক্তির প্রশংসা করুন প্রত্নতত্ত্ববিদেরা রামায়ণ হইতে তৎসাময়িক বৃত্তান্ত রচনা করুন রামায়ণ পাঠ করিয়া শত শত লোক আনন্দসাগরে মগ্ন হউক কিন্তু রামের চরিত্র আর-কেহ অনুকরণ করিতে যাইবে না। যুধিষ্ঠিরের তো কথাই নাই।

পূর্বে লোকে রামায়ণ ও মহাভারত হইতে যে শিক্ষা পাইত এখন শিক্ষিত যুবকগণ কতক পরজাতীয় দৃষ্টান্ত দেখিয়া কতক ইতিহাস পড়িয়া কতক নানা পুস্তক ও ঘটনাবলী পর্যালোচনা করিয়া সেই শিক্ষা লাভ করেন। সুতরাং এরূপ সভ্য অবস্থায় একজন লোকের বা একখানি পুস্তকের যুবকচরিত্র নির্মাণে সর্বতোমুখী প্রভুতা হইতে পারে না। তথাপি কোমল হৃদয় যুবকের মনে যে পুস্তক ভালো লাগে তাহা হইতেই তিনি কিছু-না-কিছু ভালো জিনিস চিরকাল মনে করিয়া রাখেন। যে-কিছু জিনিস চিরকাল মনে থাকে তাহা অনেক সময়ে কার্যে প্রকাশ পায় তাহাই তাঁহার চরিত্র নির্মাণে সহায়তা করে।

বঙ্গীয় যুবক যে-সমস্ত রাশি রাশি গ্রন্থ পাঠ করেন তাহার মধ্যে শেকস্‌পীয়র সর্বপ্রধান। কিন্তু বোধ হয় তাঁহার চরিত্র নির্মাণে শেকস্‌পীয়রের কোনো হাত নাই। কারণ শেকস্‌পীয়রের উদ্দেশ্য কেবল 'to please' তাঁহার সৎলোকও যেমন সুন্দর অসৎও তেমনি সুন্দর। এই দুই প্রকার চরিত্র পাঠ করিয়া যে-সকল ভাবের উদয় হয় তাহা পরস্পরকে কেন্‌সেল (cancel) করিয়া দেয়। মিল্টনে puritanic spirit এত অধিক যে উহা কোনো কালে লোকে অনুকরণ করিতে সাহস করিবে না। অনেকে বরং শয়তান হইতে চাহিবে তো কেহ যীশু খৃস্ট বা সামসন [মিল্টন রচিত Samson Agonistes, ১৬৭১ খৃ.] হইতে চাহিবে না। ড্রাইডেন ও পোপে অনুকরণীয় কিছু নাই। *An Essay on Criticism* [পোপ রচিত, ১৭১১ খৃ.] প্রভৃতি পুস্তক হইতে যে জ্ঞান লাভ করা যায় তাহা উপদেশ মাত্র। স্কুল মাস্টারের উপদেশ যেমন এ-কান দিয়া ঢুকে ও ও-কান দিয়া বাহির হইয়া যায় ঠিক সেইরূপ। চসার ও স্পেন্‌সারের বানান এত উল্টা রকম যে কাহারো সাহস হয় না যে পড়ে, যদিও কেহ পড়ে তো চসার সেকেলে গপ্প, একেলে লোকের ভালোই লাগে না। যাহারা বৃদ্ধ তাহাদের বরং ভালো লাগিতে পারে যুবকের কখনোই লাগিবে না। স্পেনসারের যে ideal তাহাও ইউরোপের অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন মধ্যসময়ের, এখনকার লোকে তাহা ভালোবাসে না। বিশেষ রূপকের দ্বারা যে শিক্ষা লাভ হয়, সে শিক্ষা সভ্য সময়ের নয়। শেলি চমৎকার কিন্তু শেলির লেখা এত জটিল ও উহার লেখার idealism এত উচ্চ যে তাহা অনুকরণের অতীত। টেনিসনের উদ্দেশ্য

পুরানো জিনিস ভালো করিয়া দেখানো সুতরাং তাহাতে চরিত্র নির্মাণে সহায়তা করে না। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ভালোই হউক আর মন্দই হউক নিঙড়িয়া তিতো করিয়া দেন। একটি ফুল যদি তিনি ধরিলেন তো তাহার প্রতি পাপড়ি বর্ণনা হবে, তার কেশরের বর্ণনা হবে, তাহার রেণুর বর্ণনা হবে, তবে ছাড়িলেন। বাকি বায়রন, তিনি পীড়িতের বন্ধু, পীড়কের শত্রু, প্রণয়ের আধার, যৌবন মূর্তিমান, মহা-তেজস্বী, সর্বদা চঞ্চল, আলস্যের, জনসমাজের অত্যাচারে একান্ত চটা। যৌবনের মন আকর্ষণে যা-কিছু চাই বায়রনের সব আছে। সুতরাং ইংরেজি সাহিত্যে এক বায়রনই বঙ্গীয় যুবকের চরিত্র নির্মাণে অংশী।

সংস্কৃত কাব্যের মধ্যে রামায়ণ মহাভারত তো সেকেলে। বেদ-পুরাণের চর্চা নাই। থাকিলেও এখন আর-কেহ গর্গ বিশ্বামিত্র অগস্ত্য হইতে চাহিবে না এ এক প্রকার ঠিক। সে সমাজ নাই সে কালও নাই। কালেজের ছাত্র দূরে থাক, ভট্টাচার্যদিগের টোলের ছাত্রেরাও আর বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র বেদব্যাস হইতে চাহে না। ভারবির অর্জুন ['কিরাতার্জুনীয়'], মাঘের কৃষ্ণ ['শিশুপালবধ'], নৈষধের নল [শ্রীহর্ষ রচিত 'নৈষধচরিত'], বাণভট্টের তারাপীড়, ['কাদম্বরী'], শ্রীহর্ষ সব সেকেলে, একটিও আমাদের মনের মতো নয়। ভারবি মাঘ নৈষধ প্রভৃতি গ্রন্থের বর্ণনা-প্রণালী সমালোচকেরা ভালো বলিতে পারেন, স্থানে স্থানে ভালোও আছে কিন্তু সব সেকেলে। আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি উহাদের রসবোধ করিয়া উঠিতে পারি না। করিতে পারিলেও আমাদের চরিত্র পরিবর্তন বা শোধন ভারবি পড়িয়া হয় না। বঙ্গীয় যুবক ভবভূতিকে ভালোবাসেন। ভবভূতি তাঁহাদের ভালোও লাগে, উহা তাঁহার চরিত্রেও কতক প্রকাশ পায় কিন্তু তাহা নিতান্ত অল্প বিষয়ে, কাজেই এ স্থলে গৃহীত হইল না। 'দশকুমারচরিতে'র [দণ্ডী রচিত] মধ্যে অপহারবর্মার চরিত্র সুন্দর, বড়ো চমৎকার কিন্তু তিনি চোর ডাকাত ইত্যাদি ইত্যাদি! যদি অপহারবর্মার চরিত্র হইতে বঙ্গীয় যুবক নিজে কিছু লইয়া থাকেন তাহা তিনি মানের খাতিরে লুকাইয়া রাখিবেন কখনো প্রকাশ করিবেন না। বাকি কালিদাস, কালিদাসের লেখা এমনি মধুর যে পড়িবামাত্র মন আকৃষ্ট হয়। তারপর কালিদাসের অনেকগুলি পাত্র (character) লোকে এত ভালোবাসে যে খানিকটা

সেই রকম হইয়া যায়। সুতরাং আমাদের যুবকগণের উপর কালিদাসের ক্ষমতাও অনেক অধিক।

বাংলা সাহিত্যের অনেক গ্রন্থকারেরই কিছু কিছু অংশ আমরা পাইয়া থাকি। তন্মধ্যে সর্বপ্রধান বঙ্কিমবাবু। বঙ্কিমবাবুর পুস্তকাবলী এত লোকে পাঠ করে ও এত আদরের সহিত পাঠ করে যে তাঁহার সকল পুস্তক হইতেই কিছু-না-কিছু লোকের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করে। লোকে দীনবন্ধুর ইয়ার্কি মুখস্থ করে, হুতোমের গানগুলি কণ্ঠস্থ করে, মাইকেলের কতক কতক অনুকরণ করে। কিন্তু অধিকাংশ আজগুবি কথা লইয়া ভিরকুটি করে। হেমচন্দ্রের "ভারতসঙ্গীত" সকলের কণ্ঠস্থ আছে— 'বৃত্রসংহার' পাঠে চরিত্র পরিবর্তন কতদূর হইবে আজি জানিবার উপায় নাই। ভারতচন্দ্রের অনুকরণ দূরে থাকুক এক্ষণে অনেকে লজ্জায় তাহা পড়িতেই পারে না। আরো অনেক গ্রন্থকার আছেন কিন্তু তাঁহাদের ক্ষমতা অতি সামান্য।

এখন দেখিতে হইবে এই তিন জন কবির কে কত দূর ও কিরূপ শিক্ষা দিয়া থাকেন। আমরা গ্রন্থকারদিগের দোষগুণ পর্যালোচনা করিতেছি না: কেবল শিক্ষিত যুবকদিগের চরিত্র নির্মাণে ইঁহারা কে কী প্রকার ও কী পরিমাণে মালমসলা দিয়া থাকেন তাহাই দেখিব। ইঁহারা একজন ইংলণ্ডের একজন মালবের আর-একজন বঙ্গের। এই তিন জনের মধ্যে একজন ফরাসি বিপ্লবের সময় শিক্ষিত, একজন হিন্দুদিগের গৌরব-সময়ের ব্যক্তি আর-একজন ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজ্যকালীন ইংরেজি রূপে শিক্ষিত। একজন সমাজ ভাঙিতে, সমাজের অত্যাচারী নিয়মাবলী পরিবর্তন করিতে শিক্ষা দেন, সমাজ ছাড়িয়া গেলে কিরূপ সুখ হয় তাহাই দেখান। একজন সমাজে থাকিয়া কত দূর সুখভোগ করা যাইতে পারে তাহাই দেখান আর-একজন সমাজের সহায়তায় ও উহার বিরোধে কিরূপ আনন্দ অনুভব করা যায় দেখাইয়া শেষ করেন।

তিন জনেই প্রণয়ের কবি, প্রণয়গত অবশ্য তারতম্য আছে তাহা আমাদের এখানে বলার প্রয়োজন নাই। তিন জনেই স্বভাবের সৌন্দর্য অনুভব করিতে শিক্ষা দেন। তিন জনেই নিজে স্বভাবের সৌন্দর্যে মুগ্ধ এবং তিন জনেই লোককে আপন আপন মুগ্ধতায় অংশী করিতে

পারেন। বাংলায় পর্বত নাই, পাহাড় নাই, কেবল এক হরিদ্বর্ণ শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র আর মাঝে মাঝে বিশালনিতম্বা স্রোতস্বিনী আর নির্মেঘ ও সমেঘ আকাশ। হঠাৎ মনে হইতে পারে বাংলায় স্বভাবসৌন্দর্য নাই, কিন্তু বঙ্কিমবাবুর প্রতি ছত্রে বাংলার সেই সৌন্দর্য প্রকটিত। বাংলার সৌন্দর্য তিনিই সর্বপ্রথম কবির চক্ষে দেখিয়াছেন ও আমাদের সৌভাগ্য ছিল বলিয়া আমরাও তাঁহার হৃদয়দর্পণে প্রতিফলিত সেই অপূর্ব সৌন্দর্য আরো সুন্দর বলিয়া দেখিতে পাইয়াছি। সেকালে স্বভাবের শোভানুভবের নাম দেবতার আরাধনা ছিল। প্রসন্নপুণ্যসলিলা গঙ্গা দেবতা, আকাশ ঋষিপূর্ণ, চন্দ্র দেবতা, সূর্য দেবতা; বঙ্কিমবাবু দেবতাদিগকে অন্তরিত করিয়া শুদ্ধ সৌন্দর্যমাত্র দেখাইয়াছেন ও দেখিতে বলিয়াছেন। বাংলার যে-কিছু সৌন্দর্য তাহার প্রায় কিছুই বঙ্কিমবাবু দেখাইতে ছাড়েন নাই। হীরার বাড়ির দেয়ালে পাখি আঁকা হইতে সূর্যমুখীর বিচিত্র চিত্রবর্ধিত গৃহ পর্যন্ত সবই দেখাইয়াছেন। তাঁহার চিত্রে অপরিষ্কার কিছুই নাই। সব পরিষ্কার ঝর্ঝরে।

কালিদাসের বর্ণনা ভারতময়। সিংহল দ্বীপ হইতে আরম্ভ করিয়া কৈলাসপর্বত পর্যন্ত সব কালিদাস বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা শুদ্ধ পরিষ্কার নয় বড়ো উজ্জ্বল ও চাকচিক্যময়, যেন ইলেকট্রিক আলোকে (electric light) প্রতিফলিত। স্বাভাবিক সৌন্দর্যে ভারতবর্ষ জগতের অনুকৃতি, আর কালিদাস এই সমস্ত ঘুঁটিয়া ফেলিয়াছেন। তন্ন তন্ন করিয়া দেখানো তাঁহার কর্ম নয় সেজন্য ওয়ার্ডসওয়ার্থ চাই। তাঁহার দেখানো বাছিয়া বাছিয়া, ভালো ভালো বস্তুগুলি। তাঁহার বর্ণনায় শুদ্ধ সৌন্দর্য নয় কিছু-না-কিছু অলৌকিক উহার সঙ্গে মিশ্রিত আছে। যথা রামের পুষ্পকরথ ['রঘুবংশ', ত্রয়োদশ সর্গ], মেঘের দৌত্য ['মেঘদূত']। তাঁহার ঋতুসংহারে স্বভাবের বিশুদ্ধ সৌন্দর্য অতি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত আছে। এখানকার বর্ণনায় অলৌকিকতা নাই এবং পরিষ্কার অপরিষ্কার জ্ঞানও বড়ো বেশি নাই। কিন্তু বর্ণনীয় বস্তু পরিষ্কারই হউক আর অপরিষ্কারই হউক বর্ণনায় হৃদয়গ্রাহিত্ব সমানই আছে।

বায়রনের [George Gordon Noel Byron, ১৭৮৮-১৮২৪ খৃ.] বর্ণনীয় ইউরোপ। সমস্ত ইউরোপে যা-কিছু বর্ণনযোগ্য— আল্‌পসের

চূড়া, রাইনের বিশাল জলপ্রবাহ, গ্রীসের দ্বীপমালা, মাইকেলএঞ্জিলোর [Michelangelo, Buonarroti ১৪৭৫-১৫৬৪ খৃ] চিত্র, ভিনিস ও রোমের ভগ্নাবশেষ। শিল্পে ও স্বভাবে যে-কিছু মহান ও মনোহর, সকলই তাঁহার গ্রন্থমধ্যে স্থান পাইয়াছে। তাঁহার বর্ণনামধ্যে এক জিনিস আছে যাহা আর প্রায় কাহারো নাই। ঐতিহাসিক দৃশ্যবর্ণনে বায়রনের অসাধারণ ক্ষমতা ওয়াটরলুর যুদ্ধ, ব্রুসের নিবাসস্থান, বল্ডেরের গির্জা বর্ণনায় বায়রন তাঁহার বিশাল হৃদয়ের পূর্ণ প্রতিকৃতি প্রদান করিয়াছেন। এই-সকল বর্ণনার পর তাঁহার উপদেশগুলি যুবকমণ্ডলীর অন্তঃকরণে এরূপ অঙ্কিত হয় যে তাহা আর অপনীত হইবার নহে।

পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে যুবকদিগের চরিত্র নির্মাণের কথায় স্বভাবের বর্ণনা আসিল কেন ? এ ধান ভানিতে শিবের গীত কেন ? তাহার উত্তর এই স্বভাব বর্ণনায়ও নীতিশিক্ষা আছে, আর সেটি দেখানো বড়ো সহজ এইজন্য আগে স্বভাবের শোভা বর্ণিত দেখিয়া কী শিক্ষা পাই দেখাই, তাহার পর অন্য প্রকার শিক্ষা যথাশক্তি দেখাইতে চেষ্টা করিব।

প্রথম, কালিদাসের বর্ণনায় সব শান্তিময় সব সুখময়, পড়িলে মনের শান্তিময় ভাব জন্মে। যখন ভট্টাচার্য মহাশয়েরা, পাদরি সাহেবেরা ও ব্রাহ্ম মিশনরিগণ দিনরাত জগৎ দুঃখময় পাপের ভরে ডুবল্ল ডুবল্ল বলিতেছেন, তখন ওরূপ পুস্তক পড়িলে বাস্তবিকই জগৎ দুঃখময় নহে বলিয়া বোধ হয়। এ বড়ো সামান্য শিক্ষা নহে। বঙ্কিমবাবুর স্বভাব বর্ণনায় শুদ্ধ শান্তি নয় তাহার উপর যেন একটু কিছু আছে, যেন যে আনন্দ যৌবনের বড়ো প্রিয় সেইরূপ আনন্দ যেন বেশি আছে। বায়রনের বর্ণনায় শান্তি নাই, কেবল পরিবর্ত হইতেছে, অসংখ্য পরিবর্ত, এটা ছেড়ে ওটা, ওটা ছেড়ে সেটা, যেন তৃপ্তি হইতেছে না, যেন একটু চটা চটা ভাব উদয় হইতেছে, যেন যাহার অন্বেষণে স্বভাবের শোভা দেখিতে আসিয়াছি, সে সুখটুকু পাইতেছি না, কেবল কৌতূহলতৃষ্ণায় কাতর হইয়া যাহা-কিছু সুন্দর দেখিতেছি, দেখিতে যাইতেছি, দেখিতেছি, তৃপ্তি হইতেছে, কিন্তু সে তৃপ্তি বেশিক্ষণ থাকিতেছে না।

সংক্ষেপে তিন জনের বর্ণনায় তিনরূপ উদ্দেশ্য আর-এক প্রকারে

দেখানো যায়। কালিদাস উপরে বসিয়া বিশুদ্ধ আনন্দের সহিত নিচেকার শোভা দেখিতেছেন আর দেখাইতেছেন। নিজে মনুষ্যের উপর উঠিয়া, বসিয়া মনুষ্যের কার্য আচার ব্যবহার নৃত্যগীত দেখিতেছেন। পাহাড় পর্বত কেমন ছোটো ছোটো দেখাইতেছে, নদীটি একছড়া হারের মতো কেমন পড়িয়া আছে তাই দেখিতেছেন আর কাছে কোনো ভালোবাসার জিনিস আছে তাহাকে দেখাইতেছেন। যেন সাংখ্যমতে পুরুষ নির্লিপ্ত বসিয়া প্রকৃতির রঙ্গ দেখিতেছেন। কালিদাস বলিতেছেন আগে মানুষের চেয়ে উচ্চ জীব হও, তাহার পর স্বভাবের শোভা দেখিও কত আনন্দ পাইবে। তাঁহার আশা বড়ো উচ্চ। বঙ্কিমবাবুর স্বভাব-শোভার কেন্দ্র মনুষ্য, নগেন্দ্রনাথই হউন আর অমরনাথই হউন, আর গোবিন্দলালই হউন বা স্বয়ং বঙ্কিমবাবুই হউন, তাঁহারো নির্লিপ্ত দেখা, স্বভাব শোভা মধ্যে বসিয়া স্বভাবের শোভা দেখো আর কাছে যদি কেহ থাকে দেখাও কেমন সুন্দর কেমন গভীর। পৃথিবী ও আকাশ দেখিয়া ঈশ্বরের প্রেমে শরীর পুলকিত হউক। বায়রনের তা নয়। স্বভাবের শোভা দেখিতে চাও ঘরদোর ছাড়িয়া বাহির হও যা তোমার সম্মুখে পড়িবে তাই দেখিয়া বসিয়া থাকিবে? তা নয়। চলো যেখানে সুন্দর বস্তু, সেইখানে যাইতে হইবে। তুমি নির্লিপ্ত থাকিলে সব দেখিতে পাইবে কেন? ঘরে বসিয়া দুনিয়ার কারচুপি দেখিয়া শান্তিসুখ ভোগ করিবে কেন? মনুষ্যের জীবন অল্প, ইহাতে সব দেখিয়া শুনিয়া লও, যত দেখিবে, ততই জ্ঞান বাড়িবে, আনন্দ অধিক হইবে এই আনন্দই আনন্দ, আর-সব কেবল দুঃখ আর অত্যাচার, সমাজ অত্যাচার, প্রণয় অত্যাচার, মানুষ মানুষের উপর অত্যাচার করিতে ভালোবাসে। সবই কষ্ট কেবল স্বভাবের আনন্দই পরমানন্দ।

একজন উপর হইতে স্বভাব দেখিতেছেন। একজন মধ্য হইতে দেখিতেছেন আর-একজন মাতিয়া বেড়াইতেছেন। একজনের মতে মনুষ্যজীবন অপেক্ষা অন্য জীবনে সুখ অধিক। আর-একজনের মতে এ জগতেও যথেষ্ট আনন্দ। তৃতীয়ের সবই এই জগতে।

বায়রনের জন্ম ১৯ শতাব্দীর প্রজাবিপ্লবে [ফরাসি বিপ্লব]। সুতরাং বর্তমান সমাজের উপর তাঁহার শ্রদ্ধা নাই। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস

এই যে বর্তমান সমাজে অত্যাচার ভিন্ন আর-কিছুই নাই। তাঁহার উৎকৃষ্ট মনুষ্যচিত্রগুলি সমাজের বাহিরে। সেগুলি সকলেই সমাজের উপর চটা। কেহ কেহ আবার সমাজের শত্রু; হয় দস্যু নয় মনুষ্য-বিদ্বেষী (misanthrope)। সমাজের যতগুলি নিয়ম আছে সবগুলিই তাঁহার চক্ষুশূল। কন্‌রাড, লারা, ডন্ জুয়ান প্রভৃতি পাত্রগণের বাক্যেও অপার্যে [অপার্থে ?] এই সমাজবিদ্বেষভাব প্রতি মুহূর্তে প্রকাশিত হইতেছে।

কালিদাসের সমাজ মনুর সময় হইতে একভাবে চলিয়া আসিতেছে। চুলমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। তাঁহার মত এই এরূপ সমাজে সকলই সুখ।

বঙ্কিমবাবুর সমাজ শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবকদিগের সমাজ। তিনি দেখাইয়াছেন সমাজের বিরোধী কাজ করিয়া কেহ সুখী হইতে পারেন না। এবং করিলেই শেষ আত্মদুষ্কৃতের জন্য সকলকেই অনুতাপ করিতে হয়। নগেন্দ্রনাথের অবৈধ প্রণয়ের ফল তাঁহার ঘোর আধ্যাত্মিক বিকার: শৈবলিনীর অবৈধ অনুরাগের ফল পর্বতগুহায় ঘোর প্রায়শ্চিত্ত। গোবিন্দলালের ও রোহিণীর যেরূপ অন্ত হইল তাহাতেও ঐ কথা দৃঢ়তর রূপে প্রতিপন্ন করিতেছে!

বায়রনেরও একটি মানুষ সুখী নহে, তাহাদের মধ্যে মধ্যে অলৌকিক অতিমানুষিক হৃদয়প্রমাদক আনন্দ আছে বটে কিন্তু দুঃখই সকলের স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু তাহারা ঠিক জানে যে যতদিন বর্তমান সমাজ এইভাবে চলিবে তাহাদের দুঃখের অবসান হইবে না। সুতরাং তাহারা অনুতাপ করিয়া ফিরিয়া আসিতে চাহে না। তাহাদের আমোদ সমাজের উপর অত্যাচারে। কেহ দিবারাত্র লুঠপাঠ করিতেছে, কেহ নির্জন কারাগৃহমধ্যে উচ্চে রোদন করিয়া সমাজধ্বংসের জন্য শাপ দিতেছে, কেহ সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য দিনরাত্রি ফিরিতেছে। তাহারা দুঃখী বটে কিন্তু দুঃখে কাতর নহে, তাহাদের দুঃখের কারণ মনুষ্যসমাজ, সুতরাং মনুষ্যসমাজ ও যাহারা সেই সমাজ চালায় তাহাদের উপর দাদ তোলা চাই। বায়রনের মানুষ মনুষ্যসমাজের উপর চটা। কিন্তু মনুষ্যের প্রতি, দুর্বলের প্রতি, স্ত্রীলোকের প্রতি তাহাদের সহানুভূতি বিলক্ষণ আছে। তাহারা মানুষ ভালোবাসিতে চায় কিন্তু সমাজের অত্যাচারী নিয়ম আপনার মনের মতো করিয়া ভালোবাসিতে দেয় না:

সুখে তাহারা ঘোর চটা। কালিদাসের মানুষ মানুষ হইতে কিছু উচ্চ। সব দেবতার অংশ, কেহ দেবতার অবতার, কেহ দেবতা স্বয়ং, কেহ অপ্সরা, কেহ অপ্সরার কন্যা, কেহ ঋষি, কেহ রাজা। ঋষি ও রাজা মানুষ কিন্তু বায়রনের মানুষ অপেক্ষা তাহাদের অতিমানুষিক ক্ষমতা অধিক। এই স্বর্গে যাইতেছে মুহূর্তে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে সমস্ত পৃথিবী মুহূর্তে পরিভ্রমণ করিতেছে, দেবতার সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ করিতেছে অপ্সরার সহিত প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইতেছে। কিন্তু সকলেই সেই মনু-প্রণীত সমাজের নিয়ম যত্নপূর্বক প্রতিপালন করিতেছে। মানুষের অসীম ক্ষমতা কিন্তু যথেষ্টাচার নাই।

জ্ঞানে মৌনং ক্ষমা শক্তৌ ত্যাগে শ্লাঘাবিপর্যয়ঃ।[১]

এই শ্লোকে তাহাদের চরিত্রের কতকটা আদর্শ পাওয়া যায়। তাহাদের যেমন ক্ষমতার পার নাই মনের জোরও তেমনই অধিক। সেই ক্ষমতা তাঁহারা সৎপথে চালাইতে জানেন, সুতরাং তাঁহাদের জীবনে কষ্ট নাই দুঃখ নাই। ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই, যেমন স্বভাবের নিয়ম অলঙ্ঘনীয় তেমনি তাঁহাদের মতে সমাজের নিয়মও অলঙ্ঘনীয়। লঙ্ঘনের চেষ্টাও নাই, পীড়াও নাই, অনুতাপও নাই।

বঙ্কিমবাবুর লোক সব সমাজের লোক, শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবক। শিক্ষিত যুবকের জীবন কেবল অনন্তবিবাদসঙ্কুল। তিনি দুই প্রকার শিক্ষা পান। এক প্রকার বাড়িতে আর-এক প্রকার স্কুলে। উভয় প্রকার শিক্ষা সময়ে সময়ে পরস্পর বিলক্ষণ বিরোধী। এইজন্য শিক্ষিত যুবকের চরিত্রে সময়ে সময়ে বিলক্ষণ অসামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্কিমবাবুর পাত্রগুলিতেও এই বিরোধী ভাব কতক কতক প্রকটিত আছে কিন্তু সম্পূর্ণ নহে। যেখানে আছে সেখানে অতি মনোহর। বঙ্কিমবাবুর মানুষগুলি দেশী বাঙালি, নিরীহ ভালো-মানুষ। বাঙালিরা যে স্বভাব ভালোবাসে তাহারা সকলেই ঠিক সেই স্বভাবের লোক। বুদ্ধিমান চতুর দয়ালু সামাজিক ও গুণগ্রাহী তাহাদের হৃদয়ের ভাব গভীর। এরূপ লোকের হৃদয়বৃত্তির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম সন্ধান অত্যন্ত প্রীতিপদ, তাহা হইতে আমাদের অনেক জ্ঞানলাভ হয়। বঙ্কিমবাবু ইহাদিগের সেইরূপে দেখাইয়াছেন।

রামায়ণ-মহাভারতাদি প্রাচীন পুস্তকাবলীর প্রথম শিক্ষা এই যে

পিতামাতার বশ হইবে ভাইকে স্নেহ করিবে জ্ঞাতিদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে কিন্তু আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে যে কবিত্রয় আধিপত্য করেন তাঁহাদের পিতামাতার সঙ্গে খোঁজ নাই। বংকিমবাবু একবার গোবিন্দলালের মাকে বাহির করিলেন কিন্তু পাছে কোনোরূপ গোল ঘটে চটপট উদ্যোগ করিয়া তাহাকে কাশী পাঠাইয়া দিলেন। বঙ্কিমবাবুর কোনো নায়ক বা নায়িকার ভাই নাই। দুই-একটি ভগিনী আছে। গোবিন্দলালের পিতৃব্যপুত্র হরলাল সেও কলিকাতায় থাকে। বায়রনেরও বাপ মা ভাইয়ের সঙ্গে বড়ো সম্পর্ক নাই। ডন জুয়ানের মুখে ডনা ইনেজের [Donna Inez] নামও শুনিতে পাওয়া যায় না। আজো [Azo] পারিসিনার [Parisina] কথার উল্লেখই আর প্রয়োজন নাই। কালিদাসের পুস্তকেও পিতামাতা বড়োই অল্প কিন্তু অপরদ্বয়ের ন্যায় লোপাপত্তি নাই। অনেক অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে মধ্যে দুই-একবার বিশুদ্ধ সৌভ্রাত্র পিতৃভক্তি প্রভৃতিও দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু বড়ো অল্প।

এই-সকল পারিবারিক অনুরাগের পরিবর্তে আমাদের কবিরা প্রতিনিধি দেন দাম্পত্য প্রণয়। দাম্পত্যই বা কেন বলি? বায়রন তো দাম্পত্যের কোনো ধারই ধারেন না। শুধু প্রণয় বলি। সুতরাং বায়রনের পারিবারিক অনুরাগের কিছুই নাই। বংকিমবাবুর পুস্তকে পারিবারিক অনুরাগের মধ্যে শুদ্ধ দাম্পত্যপ্রণয় আছে। অন্যান্য অনুরাগের পরিবর্তে বঙ্কিমবাবুর স্বদেশানুরাগ, বায়রনের মানবজাতির প্রতি অনুরাগ। একজন অত্যাচারপীড়িত স্বদেশের জন্য কাঁদিতে শিখাইয়াছেন আর-একজন অত্যাচারপীড়িত মনুষ্যজাতির উদ্ধারের জন্য অস্ত্রধারণ করিতে শিখাইয়াছেন। যাহার ক্ষমতাবলে অত্যাচারের হস্ত হইতে মুক্তি পায় তাহাদিগকে বাহবা দিতে শিখাইয়াছেন।

কালিদাসের সমাজ ঠিক মনু হইতে এক আকারে চলিয়া আসিতেছে। তাহার যাহা কিছু আছে সকলই শাস্ত্রসংগত যুক্তিসংগত অণুমাত্র তফাত নাই। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থে প্রলোভন নাই। পাপ পুণ্যের মধ্যে পাপ বড়ো কম সবই পুণ্য। ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থ কেবল সুখের ছবি, নিরবচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক আমোদের ছবি। বায়রন পাপ পুণ্য বলিয়া দুইটি পদার্থ স্বীকার করিতে চান না। সুতরাং

লোকে যাহাকে প্রলোভন বলে সে বস্তু তিনি স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে মনুষ্য আপন ইচ্ছায় যাহা করে তাহাই ঠিক, আপন ইচ্ছায় যাহাকে ভালোবাসে সেই প্রণয়ের পাত্র। সুতরাং মনুষ্য আপনার সুখের জন্য আত্মইচ্ছার উপর নির্ভর করে; কখনো কৃতকার্য হয় কখনো অকৃতকার্য হয়, পরের কথায় কিছুই করিতে চাহে না সমাজের যে-সকল নিয়ম আছে মানিতে চাহে না। বর্তমান সমাজের যেরূপ গঠন তাহাতে সমাজ এরূপ স্বেচ্ছাচারীদিগকে দমন করিতে চায় সুতরাং উহারা সমাজের শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। যে সমাজে ইচ্ছার প্রতিরোধ না থাকে তাহারা সেইরূপ নূতন সমাজ চাহে, তাহা পায় না বলিয়া ঘোরতর সমাজদ্বেষী হইয়া পড়ে।

বঙ্কিমবাবুর এক হাতে কালিদাস আর-এক হাতে বায়রন কিন্তু কালিদাসের আধিপত্য তাঁহার উপর অধিক। তিনি সমাজ সেই প্রাচীন রীতিতে চালাইতে যান। সেই জিতেন্দ্রিয় ভাব সেই সুখ সেই শান্তি কিন্তু ইচ্ছাশক্তি এক-এক সময়ে দুর্দম হইয়া উঠে। এইটি বায়রনের। তিনি লাগাম ছাড়িয়া দিয়া দেখান যে ইন্দ্রিয় বশ করিতে না পারিলে লোকের পদে পদে বিপদ ঘটে। তিনি একবার প্রলোভন লোকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দেন; দেখান সকলেই প্রলোভনে ভুলে কিন্তু কেহ অন্তরের ভাব অন্তরেই রাখে, দমন করে। ইহারাই জিতেন্দ্রিয় যথা প্রতাপ। কেহ বা রাখিতে পারে না দমন করিতে পারে না যথা শৈবলিনী ও নগেন্দ্রনাথ। যেই জিতেন্দ্রিয় সেই সুখী সাহসী সর্বত্র প্রশংসাপাত্র। যে অজিতেন্দ্রিয় সেই দুঃখী সাহসশূন্য এবং আত্মগ্লানিপূর্ণ।

কালিদাসের প্রলোভন নাই। বায়রনের সবই প্রলোভন কিন্তু তাহা হইতে উঠিবার ইচ্ছা নাই। বঙ্কিমবাবুর প্রলোভন আছে; তাহার দুঃখ আছে ও তাহা হইতে উদ্ধার হইলে সুখও আছে। সুতরাং আধুনিক সমাজে আমরা বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থ হইতে উচ্চতর নীতিশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

বায়রন হইতে আমরা মানবজাতির প্রতি অনুরাগ করিতে শিখি বটে কিন্তু তিনি স্পষ্ট শিক্ষা কোথাও দেন নাই। তিনি বর্তমান সমাজের অনেক নিন্দা করিয়াছেন। অত্যাচার-পীড়িতদিগের প্রতি

সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতেই তাঁহার মতলব টের পাওয়া যায়। কিন্তু বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থ হইতে আমরা যে স্বদেশানুরাগের উপদেশ পাই সে আর-একরূপ। তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে কতকগুলি মূর্তিমান স্বদেশানুরাগ আছে। যথা রমানন্দ স্বামীর। এই সকল লোকের কী আশ্চর্য গঠন। তাঁহারা যে ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাহার নাম পরহিতব্রত। পীড়িত যে ধর্মাবলম্বী হউক-না-কেন, মুসলমান হউক, হিন্দু হউক, খৃস্টিয়ান হউক, তাহার উপকারের জন্য সর্বদাই উদ্যুক্ত। ইঁহারা নিজ জীবন পরের উপকারের জন্য তৃণবৎ ত্যাগ করিতে কাতর হন না। নৈতিক উন্নতির বোধ হয় রমানন্দ স্বামীই পরাকাষ্ঠা, কালিদাস হইতে আমরা আর-এক প্রকার অনুরাগের উপদেশ পাই। তাহার নাম সর্বভূতানুরাগ। এ অনুরাগ বুদ্ধধর্মের ফল। কালিদাসের সময়ে যদিও উক্ত ধর্মের লোপাপত্তি হইয়াছিল তথাপি উহা অনেক অংশে হিন্দুদিগের মনে দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু অস্মদ্দেশীয় মাংসাশী যুবকবৃন্দ সর্বভূতে দয়ার বড়ো একটা সম্পর্ক রাখেন না। তাঁহাদের মতে মানবজাতির প্রতি অনুরাগই মুখ্য ধর্ম।

কালিদাসের শকুন্তলার লতা পাতা হরিণ মৃগ প্রভৃতির সোদরস্নেহ। আমরাও ফুলগাছ পুঁতি গোরু বাছুর পুষি কিন্তু তাহাদের উপর আমাদের সোদরস্নেহ হয় না। কিন্তু কালিদাসের হৃদয় পশুদিগের জন্যও কাঁদিত, আমাদের কাঁদে না। বঙ্কিমবাবুর নগেন্দ্রনাথ প্রজাদিগকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করেন। আমাদের স্নেহ বড়ো ঐ পর্যন্তই নামে। বায়রন সকল মানুষেরই প্রতি স্নেহ করেন। তাহার সাক্ষী তাঁহার গ্রন্থে দুর্দশাপন্ন গ্রীকদিগের জন্য গভীর রোদন ও তাহাদের দুর্গতিনাশের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লোকের মন আকৃষ্ট করা।

আর-একটি কথা। ইঁহাদের শিক্ষা দিবার প্রণালী কি একরূপ? সংস্কৃত আলংকারিকেরা বলেন যে, বেদ হইতে যে উপদেশ পাই তাহা আজ্ঞা, পুরাণ হইতে যে উপদেশ পাই তাহা বন্ধুর উপদেশের ন্যায় সুপরামর্শ, কিন্তু কাব্য হইতে যে উপদেশ পাই তাহা কান্তার উপদেশের ন্যায় ['কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে'— মম্মটভট্ট]। কান্তা যেমন নানা-প্রকার গল্পগুজব করিয়া মনটি লওয়াইয়া শেষ উপদেশটি বাহির করেন, যেটি বাহির করেন সেটি কিন্তু অমোঘ। কবি রাম-রাবণের যুদ্ধ বর্ণনা

করিলেন ; নানা রূপ বিচিত্র পদার্থ দেখাইলেন, কখনো হাসাইলেন কখনো কাঁদাইলেন, শেষ একটি উপদেশ দিলেন যে, ইন্দ্রিয়-অশ্বের লাগাম ছাড়িয়া দিলে অনেক নাতানে পড়িতে হয় শেষ রাবণের ন্যায় সপুরী বিনাশও হইতে পারে। ইঁহাদের তিন জনেরও শিক্ষাপ্রণালী মূলত তাই কেবল কিছু তারতম্য মাত্র আছে।

কালিদাসের উপদেশপ্রদানপ্রণালী ঠিকই এইরূপ। তিনি কোথাও preach করেন না। তাঁহার কাব্যের মুখে যাহা পড়ে তাহাই বলিয়া যান, কখনো উপদেশ দিব বলিয়া দোকান খুলিয়া বসেন না। বায়রনের প্রত্যেক চিত্রেই কিছু-না-কিছু উপদেশ আছে। তাঁহার যেখানে একটি সুন্দর বর্ণনা তাহার নিচেই দুটি বর্তমান সমাজের অত্যাচারের নিন্দা। যেখানে যাও, দু-পাঁচটি ব্যঙ্গাত্মক উপদেশ নিশ্চয়ই পাইবে। যেমন কোনো গোরস্থানে ভ্রমণকালে গোরস্তম্ভ দেখিতে দেখিতে তাহার নিচে যে-সকল খোদা অক্ষর দেখিলে তাহা অনেক দিন মনে থাকে, সেইরূপ বায়রনের খোদা কথা অন্তরের সঙ্গে গাঁথা থাকে। রাইনের ধারে রাইনের শোভা দেখিতে দেখিতে বা আল্‌পসের চূড়ায় আল্‌পসের শোভা দেখিতে দেখিতে অথবা হাএদী [Haidee] ও জুয়ানের নিশীথপ্রণয় দেখিতে দেখিতে বায়রন যে-সকল গভীর নৈতিক তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠক-হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে। বায়রনের মাঝে মাঝে preachingও আছে। কিন্তু বঙ্কিমবাবুর preaching বড়ো উচ্চ। তাঁহার 'কমলাকান্তের দপ্তর' একটি preaching-এর খনি। কত নীতি-শিক্ষা উহা হইতে লাভ করা যায়, তাহা বলা যায় না। তাঁহার preach করার লোকও আছে, তাঁহার সন্ন্যাসীগুলি সব নীতিশিক্ষার প্রচারক। তাঁহার নগেন্দ্রনাথ প্রভৃতির স্বগতবাণীগুলিও প্রচারক ভিন্ন কিছুই নহে। হরদেব ঘোষালের পত্র অনেক মনোবিজ্ঞানতত্ত্বের গূঢ়তত্ত্ব সত্য আবিষ্কার করিয়াছে।

লোকে মনে করেন যে বায়রন হইতে আবার কী নীতিশিক্ষা, বায়রন অতি অশ্লীল কবি। যাঁহারা এরূপ মনে করেন, তাঁহাদের বায়রন নীতি-শিক্ষা দেন না। তাঁহাদের নীতি সেকেলে, বায়রন, একেলে নীতিশিক্ষা দেন। তিনি রুসোর [Jean Jacques Rousseau, ১৭১২-৭৮ খৃ.] স্কুলে তৈয়ারি হইয়াছেন। মানুষ সব সমান। সমাজবন্ধন শুদ্ধ দু-পাঁচ

জন লোকের হাতে, অত্যাচারের ও যথেচ্ছাচারের ক্ষমতা দিয়া তাহারা অবশিষ্ট মানবমণ্ডলীকে নির্বীর্য ও নিস্তেজ করে। এ অবস্থায় পরিবর্তন প্রয়োজন। তাঁহার কাব্যেও এই ভাব নিরন্তর প্রকাশিত। তাঁহার নিজের ও তৎকল্পিত মানবগণ যদিও দেখিতে মনুষ্যবিদ্বেষী যদিও তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া যুবক ও অনেকে এই ভাবই বিলক্ষণ প্রাপ্ত হয় তথাপি একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে এটি বাহিরে মাত্র, তাঁহার বিদ্বেষ শুদ্ধ বর্তমান সমাজের উপর কিন্তু উহার নিচে মনুষ্যের জন্য সহানুভূতি পরিপূর্ণ।

বঙ্কিমবাবুর পুস্তকের পরহিতব্রত যদিও বায়রনের পরহিতব্রত অপেক্ষা কোনো অংশে ন্যূন কিন্তু উহা তাঁহার পুস্তকে অধিকাংশ স্থলেই শুদ্ধ স্বদেশানুরাগেই পর্যবসিত। এইজন্য আমরা তাঁহার পুস্তকের উদ্দেশ্য স্বদেশানুরাগই বলিলাম।

উপসংহারকালে সংক্ষেপে বলি, বঙ্কিমবাবুর উদ্দেশ্য স্বদেশানুরাগ ও সামাজিক সুখ, কালিদাসের ভূতানুরাগ ও সামাজিক সুখ, বায়রনের মনুষ্যানুরাগ (humanitarianism) ও সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘনের সুখ।

'বঙ্গদর্শন'
পৌষ, ১২৮৫ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

এই প্রবন্ধ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেছিলেন, "তুমি যেটির কথা মনে করিয়া বলিতেছ, সেটি কোনো জর্মান পণ্ডিতের লেখা বলিয়া মনে হয়।" (এই বইয়ের ২৩ পৃ. দ্র.)।

১. জ্ঞানে মৌনং ক্ষমা শক্তৌ ত্যাগে শ্লাঘাবিপর্য্যয়ঃ।
গুণা গুণানুবন্ধিত্বাত্তস্য স প্রসবা ইব॥ (রঘুবংশ, ১.২২)

'জ্ঞান বিদ্যমানেও তিনি [রাজা দিলীপ] মৌন থাকতেন, শক্তি বিদ্যমানেও ক্ষমা প্রদর্শন করতেন, ত্যাগ করে শ্লাঘা পরিত্যাগ করতেন। এমনি পরস্পরবিরোধী গুণপরম্পরা সহোদরের মতো তাঁর দেহে বিরাজিত ছিল।'
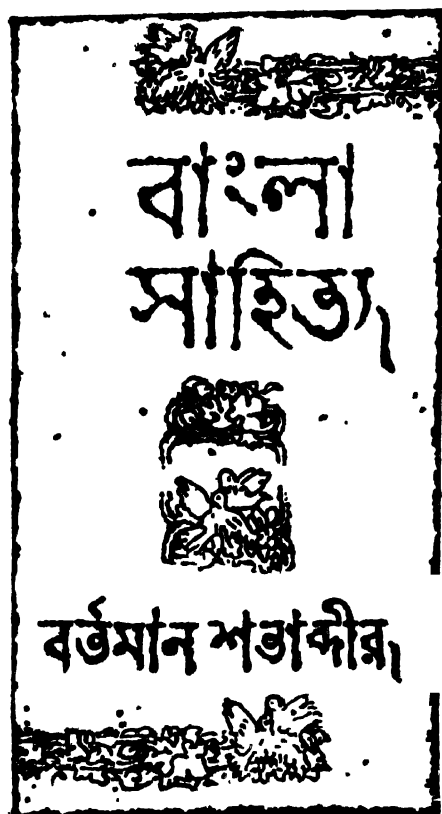
ইদানীং ইংরেজদিগের শাসনাধীনে ভারতবর্ষে নিঃশব্দে যে ঘোরতর পরিবর্তন হইতেছে, তাহা কাহারো অবিদিত নাই। নূতন ধর্মপ্রচার নাই, বলপ্রকাশ নাই, অথচ আমাদের মন ক্রমশ ফিরিয়া আর-একরূপ হইয়া যাইতেছে। এই পরিবর্তন ও বিপ্লব ভারতবর্ষে সর্বত্র চলিতেছে; কিন্তু বাংলায় সেই পরিবর্তন ও বিপ্লব যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, এতদূর আর-কোথাও হয় নাই। এই বিপ্লবের প্রধান কারণ ইংরেজি শিক্ষা, ইহার ফল— সমাজ-উন্নতি ও সাহিত্য-উৎপত্তি। ভারতবর্ষের মধ্যেও বাংলার সমাজ অধিক উন্নত ও সাহিত্য-প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। আজি সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় সাহিত্য আমাদের উপপাদ্য

প্রস্তাব। বঙ্গীয় সাহিত্যের বিষয় বলিতে গেলে, আরো অনেক কথা বলিতে হয়, কিরূপে এই বিপ্লব ঘটিয়াছে, কিরূপে লোকের মন পূর্বপথ হইতে ঘুরিয়া নূতন পথে দাঁড়াইয়াছে তাহা লিখিতে হয়। প্রত্যেক চিন্তাশীল নেতার মনোমধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার মানসিক পরিবর্ত ও তাঁহার কার্যপ্রণালীর ইতিহাস লিখিতে হয়, এবং তাঁহাদের কার্য-প্রণালীতে সমাজে কেমন করিয়া পরিবর্ত হইতে আরম্ভ হয়, তাহার ইতিহাস আলোচনা করিতে হয়। কিন্তু তাহার সময় নাই। তবে যতদূর পারা যায় চেষ্টা করিব।

১৭৯৯ সালের শেষ দিন অতীত হইল। ১৮০০ সালের প্রথম দিন উপস্থিত। ভারতবর্ষের এমন অদিন বোধ হয় আর-কখনো হয় নাই। ভারতের কোথাও সুখ নাই, কোথাও শান্তি নাই, সর্বত্র লুঠতরাজ, মারামারি, লাঠালাঠি, কাহাকেও বিশ্বাস নাই, যাহার গায়ে জোর সেই অন্যের উপর অবিবাদে অত্যাচার করিয়া যায়। সমস্ত দেশে রাজা নাই। যাঁহারা রাজা বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা লুঠেরার সর্দার। পরধন অপহরণ, পরপীড়ন, পরের প্রাণনাশ, তাঁহাদের নিত্যকর্ম। এই সময়ে ভারতবর্ষের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল তাহার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেই এ কথা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে।

কাবুলের দুরানীবংশ পতনোন্মুখ, সেখানে দুরানী ও বেরুকজিদিগের পরস্পর বিদ্বেষভাব জন্মিতেছে, দুরানীদিগের অধিকৃত ভারতবর্ষের অংশ-সকলে সুতরাং গোলযোগ চলিতেছে। ভূলোকস্বর্গ কাশ্মীর, পেশোর প্রভৃতি প্রদেশে অরাজকতার সূত্রপাত হইয়াছে। পঞ্জাবে মুসলমান ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু তথায় বহু-সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন শিখরাজ্য স্থাপিত হইয়াছে ; এই রাজগণ পরস্পরের উপর আপন প্রাধান্য স্থাপন করিবার জন্য সর্বদা যুদ্ধবিগ্রহ, মারামারি, কাটাকাটিতে ব্যতিব্যস্ত। সিন্ধুতে আমীরদিগের রাজ্য এখনো দৃঢ়বদ্ধ হয় নাই, সেখানেও মারামারি, কাটাকাটি, যুদ্ধবিগ্রহ। সর্‌হিন্দ প্রদেশে একজন ইংরেজ এই ঘোরতর অত্যাচারের সময় আপনার নামে এক রাজ্য করিয়া লইয়াছেন, এবং মুসলমানের ন্যায় বহু-সংখ্যক মুসলমান উপপত্নীতে পরিবৃত হইয়া নানা প্রকার অত্যাচার করিতেছেন। রাজপুতগণের আর সে প্রতাপ নাই ;

যে প্রতাপে তাঁহারা একদিন সমবেত মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন, এখন তাঁহাদের সে প্রতাপ নাই ; হিংসা দ্বেষ তাঁহাদের মনোমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। সিন্ধিয়া, হোলকার, যখন ইচ্ছা তাঁহাদের দেশ লুঠ করিতেছে ও যখন ইচ্ছা তাঁহাদের নিকট হইতে অগাধ টাকা লইতেছে। দিল্লির বাদশাহের নামের মোহিনী আছে, সম্ভ্রম আছে ; কিন্তু বাদশাহ্ [দ্বিতীয় শাহ্ আলম, সপ্তম মুঘল সম্রাট, ১৭৫৯-১৮০৬ খৃ.] নিজে বন্দী, শত্রুরা তাঁহার চক্ষু উৎপাটন করিয়াছে। তাঁহার দিনের অন্ন কে যোগায়— তাহারো ঠিক নাই। পেরোঁ [General Perron, ১৭৫৫-১৮৩৪ খৃ.] নামক সিন্ধিয়ার একজন ফরাসিস সেনাপতি হিন্দুস্থানের সর্বময় কর্তা। তাঁহারো শমরুর মতো কিছু নিজ উদ্দেশ্য আছে কিনা কে বলিতে পারে ? অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড একজন নবাবের করতলগত কিন্তু তাঁহার নিজের কোনো ক্ষমতা নাই, তিনি নিজ প্রাসাদে উপপত্নীপরিবৃত হইয়া বাস করেন ; সময়ে সময়ে তাঁহার প্রাসাদসম্মুখস্থ লাল বারদোয়ারি নামক অভিষেক-স্থানও বিদ্রোহীদিগের করকবলিত থাকে, তাঁহার রাজ্য অপেক্ষা অরাজকতা শতগুণে শ্রেয়। তাঁহার রাজ্যে ওমরাগণ, করদরাজাগণ, জায়গিরদার ও তালুকদারগণ যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাই করে। বিনা যুদ্ধে কেহই খাজনা দেয় না, প্রতিবারই কর আদায়ের সময় আসিলে ইংরেজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিতে হয়। অনেক টাকা না দিলে সে সাহায্যও প্রায় পাওয়া যায় না। ইংরেজেরা আরো কিছু অধিক আদায় করিবার জন্য তাঁহাকে রাজ উপাধি দিবার উদ্যোগ করিতেছেন। মধ্য ভারতবর্ষে বুন্দেলখণ্ডে ক্ষুদ্র রাজগণ যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করে। তাহারো দক্ষিণে গোন্দয়ানায় বড়ো বড়ো ডাকাইতের দল তৈয়ারি হইতেছে। ইহারা এক সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষ উলট-পালট করিয়া দিবে। সিন্ধিয়া ও হোলকার বড়ো শান্তিপ্রিয় নহেন। তাহাদের মধ্যে পরস্পর সম্প্রীতি নাই, করদলার যুদ্ধক্ষেত্রে যাঁহারা জয়ী ও যাঁহারা জিত হন, উভয় পক্ষেরই সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে। নিজাম হারিয়া অবধি হৃদয়মধ্যে ইংরেজ ও মারহাট্টাদিগের প্রতি ঘোরতর বিদ্বেষকে লালন পালন করিতেছেন। মারহাট্টারা করদলা হইতে সেই যে আপন আপন ভবনে গিয়াছে, তার পর আর একত্র হয় নাই, উহারা যে যাহার আপন

আপন রাজ্যবৃদ্ধি ও শত্রু নিপাতে কৃতসংকল্প হইয়াছে। মারহাট্টা-দিগের মধ্যে বড়ো রাজা আছেন সত্য, কিন্তু শ্রীজিরাও যেখানকার ওমরাহগণের অগ্রগণ্য ও সর্বময় কর্তা, উন্মত্ত যশোবন্তরায় যেখানকার শাসনকর্তা, নির্দয় নিষ্ঠুর অবিমৃষ্যকারী বাজীরাও যেখানকার পেশোয়া, সে রাজ্যে কি সুখ সম্ভব? সেখানে কি শান্তি থাকিতে পারে? সেখানে কি লোকের সাহিত্যানুরাগ থাকিতে পারে? মহারাষ্ট্র রাজ্যের দক্ষিণে ইংরেজ রাজত্ব সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম অংশে যেরূপ সর্বনাশ হয়, তাহা কাহারো অবিদিত নাই; তাহাতে আবার যখন টিপু[১] তৃতীয় বার হারিয়া মরিয়া হইয়াছিলেন, তখন তিনি যেরূপ ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তিনিই সর্বপ্রথমে মহীশূরে গ্রামকে গ্রাম মুসলমান করিয়া দেন, বিনাপরাধে সহস্র সহস্র লোকের প্রাণনাশ করেন। দক্ষিণে অন্যান্য স্থানে ইংরেজদিগের প্রভুত্ব ছিল সত্য, কিন্তু মান্দ্রাজে যে-সকল ইংরেজ কর্তা ছিলেন, তাঁহাদের অপেক্ষা দেশীয় জঘন্য রাজাও অনেকাংশে উৎকৃষ্ট ছিলেন। তাঁহারা কর্ণাটের নবাবের দেনা লইয়া যে জঘন্য কাণ্ড করিয়া তুলিয়া-ছিলেন, তাহার আলোচনা করিয়া ইংরেজনাম কলঙ্কিত করা আমার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। যে হিমালয় প্রদেশে, যে উত্তরাখণ্ডে, কখনো মুসলমান যাইতে পারে নাই, গোর্খাদিগের দুরাকাঙ্ক্ষায়, রাজ্যবৃদ্ধির ইচ্ছায় সেখানেও যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইয়াছে, পাহাড়মধ্যেও অরাজক। গ্রামবাসীরা লুঠের ভয়ে কম্পান্বিতকলেবর।

এরূপ অরাজক সময়ে যখন কালি কী হইবে, কেহই বলিতে পারে না, যখন পরের উপর অত্যাচারই রীতি; যখন কাহারো প্রাণ, মান, ধন রক্ষা হয় না, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতে পারে এরূপ ক্ষমতা-শালী একজনও লোক সমস্ত ভারতবর্ষে খুঁজিয়া মিলে না, তখন কি সাহিত্যের উন্নতি হইতে পারে; তখন কি লোকের চিন্তা করিবার ক্ষমতা থাকে? যখন ভয়েই লোকে অভিভূত, তখন কে লেখাপড়া শিখিবে, কে লিখিতে বসিবে? বাস্তবিক তৎকালে ভারতবর্ষে সাহিত্য লোপ হইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

অনেকে মনে করিতে পারেন বাংলা সাহিত্যের কথায় ভারতবর্ষের কথা কেন তুলিলেন? বাংলায় তো তখন সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল,

বাংলা তো তখন ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শান্তি উপভোগ করিতে-ছিল। এটি লোকের মহা-ভ্রম, ভারতবর্ষে এরূপ দারুণ গোলযোগ থাকিলে বাঙালির মনে শান্তি সম্ভবিতে পারে না ; বিশেষ বাংলা সমাজে তখনো শান্তি হয় নাই। প্রথম ইংরেজ রাজত্ব যে স্থায়ী হইবে তাহাতে কাহারো বিশ্বাস হয় নাই, তাহার পর আমরা যাহাকে এখন বাংলা বলি তখন বাংলা বলিলে ইহা বুঝাইত না। বাংলার গবর্নরের কর্তৃত্ব উড়িষ্যায় ছিল না। উড়িষ্যা মহারাষ্ট্র-করকবলিত ছিল। উড়িষ্যায় করদ ও মিত্ররাজগণ নিরন্তর মেদিনীপুর অঞ্চলে লুঠপাট করিত। বীরভূম, বরাহভূম, সবেমাত্র ইংরেজদিগের অধিকৃত হইয়াছে। আসাম, কাছাড় তখনো ইংরেজদিগের নয়। অতি অল্প পরেই মানেরা (ব্রহ্মদেশীয়গণ) অরাজক আসাম দখল করিয়া বাংলায় আসিয়া পড়িয়া-ছিল। ভুটান শত শত বৎসর ধরিয়া নিরন্তর অরাজকতায় ভুগিতেছিল। ভুটানে সুবেদারেরা, তংশো পেন্‌লো, পেরো পেন্‌লো প্রভৃতি সকলে আপন আপন ধর্মরাজা ও দেবরাজা খাড়া করিয়া আপনা আপনি কাটাকাটি করিয়া মরিত। সময়ে সময়ে তাহাদের যুদ্ধ গড়াইয়া রংপুর পর্যন্ত আসিয়া পড়িত। যদিও কেহ বাংলা আক্রমণ করিতেই আসে নাই তথাপি বাংলার সীমা প্রদেশে শান্তি সুখ একেবারে ছিল না। আর বাংলার মধ্যে সর্বপ্রকার অরাজকতা নৃত্য করিত। ১৭৫৬ খৃ. অব্দ হইতে বাংলা শ্মশানকালীর রঙ্গভূমি হইয়াছিল। যখন নবাব ও ইংরাজ উভয়ে মিলিয়া শাসন করিতেন, রণদুর্মদ ইংরেজগণ কাহাকেও মানিত না ; তাহারা না করিয়াছে এমন কার্যই নাই। বিদ্যা, বুদ্ধি, রূপ, গুণ, ক্ষমতা, কিছুতেই তাহাদের মন বিচলিত করিতে পারিত না। এই সময় যেমন ছিল, ১৭৯৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ঠিক তেমনই ছিল। ইংরেজেরা তিন-চারি বৎসর থাকিয়া অনেক ধনসঞ্চয় করত স্বদেশে ফিরিয়া যাইতেন। আর তাঁহাদের বাঙালি প্রিয়পাত্রগণও সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশীয় স্বজাতীয়গণের মুণ্ডপাত করিয়া বড়ো লোক হইয়া উঠিতেন। ৫৬ হইতে ৯৩ পর্যন্ত যাহা ছিল, ৯৩ সালে তাহার চূড়ান্ত হইয়া গেল। দেশের যা-কিছু ছিল কর্নওয়ালিস-প্রবর্তিত নিয়মাবলীতে তাহাও গেল।[২] বাংলায় মুসলমান রাজত্বে তিন শক্তি ছিল, এই তিন শক্তির মূল তিন ; মুসলমান গবর্নমেণ্ট, দেশীয় জমিদার ও ব্রাহ্মণপণ্ডিত। এই

৩৭ বৎসরে মুসলমান গবর্নমেণ্টেরও শেষ হইয়াছিল। নবাব বহু লক্ষ টাকা পেন্‌সন পাইয়া উপপত্নীগণে বেষ্টিত হইয়া নিজ প্রাসাদে বাস করিতেন ও যতদূর তাঁহার সম্পর্কের গন্ধ থাকিত ততদূর দূষিত বায়ু চরিত্রদোষরূপ সংক্রামক ব্যাধির উৎপত্তি করিয়া দিত। বড়ো বড়ো জমিদারগণ সাহেবের শোষণে অবসন্ন হইয়া আসিয়াছিলেন। মীর-কাসিম [বাংলার নবাব ১৭৬০-৬৩ খৃ., মৃত্যু ১৭৭৭ খৃ.] অনেক-গুলির মূলোচ্ছেদ করিয়া গিয়াছিলেন। ইজারা বন্দোবস্তে অনেকগুলির উচ্ছেদ হয়। দেশের লোক যাহাদিগকে আপনাদের কর্তা বলিয়া বহু-কাল আদর ও ভক্তি, মান্য ও ভয় করিয়া আসিতেছিল, যাহারা প্রথম স্বাধীন, পরে মিত্র, তাহার পর করদ, শেষ অধীন রাজ্য ছিল, তাহা-দিগের এইরূপ পরিণাম হইতে লাগিল। তারপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত [১৭৯৩ খৃ.] হইল, ইহার সংগত নাম চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নহে। ইহার আসল নাম চিরঅস্থায়ী বন্দোবস্ত, কারণ ইহাতে কেহই বলিতে পারেন না যে আমার জমিদারি স্থায়ী হইবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদার গোষ্ঠীর শেষ হইল। বড়ো বড়ো রাজপরিবার ঠিক সময়ে টাকা দিতে না পারায় জমিদারিচ্যুত হইতে লাগিলেন। কৃষ্ণনগর, নলডাঙা, নাটোর, চাঁচড়া প্রভৃতি প্রদেশের জমিদারদিগের সম্পত্তি হুহুস্বরে নিলাম হইতে লাগিল। কিনিল কে? ম্যাজিস্ট্রেটের প্রিয় মুহুরি—জাতিতে নাপিত, Foreign Department-এর নায়েব— জাতিতে সদ্‌গোপ, মিলিটারি ডিপার্টমেণ্টের কেরানি গোমস্তা ইত্যাদি। কিন্তু এ-সকলের মধ্যেও ক্রেতার সংখ্যা অধিক নহে। জমিদারের কর্মচারীরাই এ বিষয়ে বিশেষ বিজ্ঞ, তাঁহারা প্রজাদের সর্বনাশ করিয়া ধনসঞ্চয় করিতেন। দূরস্থ জমিদার তাহা দেখিতে পাইতেন না। তাহার পর জমিদারি খাজানার দায়ে নিলামে উঠাইয়া দিয়া আপনি ক্রয় করিয়া লইতেন। একস্থানে এমন হইয়াছে যে জমিদারের খাজানা লইয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ নৌকাডুবি রটাইয়া দিয়া সেই টাকায় গোমস্তা আপনি জমিদারি কিনিয়া লইলেন। একস্থানে একজন ডাকাইতের সর্দার গবর্নমেণ্টের খাজানা লুঠ করিয়া নগদ টাকার জোরে জমিদার হইলেন। অনেক স্থলে লাঠির জোরে জমিদার হইতে লাগিল। এক-জনের লাঠির জোর থাকিলে দশ-পনেরো ক্রোশের মধ্যে কাহারো রক্ষা

থাকিত না। যাহারা সাহিত্য সংসারের উন্নতি করিত, যাহারা পণ্ডিত প্রতিপালন করিত, যাহাদের কল্যাণে আমরা অনেক উত্তম উত্তম গ্রন্থ পাইয়াছি, তাহাদের এই দশা হইল। যাঁহারা তাহাদের স্থানপ্রাপ্ত হইলেন তাঁহারা আর-এক সম্প্রদায়ের লোক। তাঁহারা ঘোরতর কুসংস্কারাপন্ন, তাঁহারা গুরু পুরোহিতের একান্ত ভক্ত হইতে লাগিলেন। শাস্ত্র কচকচি তাঁহাদের চক্ষুশূল।

মুসলমান গবর্নমেণ্ট ও জমিদার ভিন্ন বাংলার আর-এক শক্তি ছিল, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। এই অরাজকের সময়, ঘোরতর অত্যাচারের সময়, ভয়া॰ক বিশৃঙ্খলার সময় যদি কেহ দেশের জন্য যথার্থ ভাবিত তবে সে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ। এই সময়ে তাঁহাদের দ্বারা যে কত উপকার হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। অত্যাচারী ইংরাজগণও ধার্মিক ইষ্টনিষ্ঠ ভট্টাচার্যকে আদর করিত, লোকে তাঁহাদিগকে হিন্দুধর্মের হিন্দুসমাজের আর্যজাতির চূড়া বলিয়া জানিত। তাঁহারাও আজিকার ভট্টাচার্যদিগের ন্যায় লোভী ক্ষমতাপ্রত্যাশী ও স্বার্থপর ছিলেন না। ধর্মবলে তাঁহারা বলীয়ান ছিলেন, তাঁহাদের সাহস ও অকুতোভয় ছিল। তাঁহাদের এই সাহসের সূক্ষ্ম হেতুও ছিল। তাঁহাদের সঙ্গে সর্বদাই ৬০/৭০ জন ছাত্র থাকিত। ছাত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত বলিষ্ঠ ও গুরুকার্যে আত্মসমর্পণেও কৃত-সংকল্প। এই সময়ের জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন [১৬৯৪-১৮০৭ খৃ.] গোঁসাই ভট্টাচার্য "বলরামশ্চ শঙ্করঃ" মানিক তর্কভূষণ প্রভৃতি লোকের নাম কাহার অবিদিত আছে? তাঁহারা এই গোলযোগের সময় ব্যবস্থাপক, বিচারপতি, অধ্যাপক ও সময়ে সময়ে সমাজের সর্বময় কর্তা হইয়াছিলেন। কত কত পরিবারকে যে তাঁহারা কত উপায়ে রক্ষা করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। যে-সকল ইংরেজ যথার্থ বিচার করিতে চাহিতেন, এই ভট্টাচার্যগণ যে তাঁহাদের কত বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন, তাহার ঠিকানা নাই। কিন্তু সাহিত্যের উন্নতি তাঁহাদের ব্যবসায় নহে। তাঁহারা বিদ্যাব্যবসায়ী, সাহিত্যব্যবসায়ী ছিলেন না। বিশেষ তাঁহাদের উপর এত কার্যভার পড়িয়াছিল যে তাঁহারা সাহিত্যের উন্নতির ইচ্ছা থাকিলেও করিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহাদেরই কী পরিণাম হইল। ১৭৯৩ সালে হুকুম হইল, আইন হইল, যে ব্রহ্মোত্তর বাজেয়াপ্ত করিতে হইবে। আবার ১৮২৮ ও ১৮৩৩ অব্দে বাজেয়াপ্ত আইন পুনরায়

বিধিবদ্ধ হইল। তাঁহাদের সম্পত্তি হস্তচ্যুত হইল। যে ব্রাহ্মণকুল নির্বিবাদে স্বাধীন উপস্বত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, যাঁহাদের তেজে সাহসে ও নির্ভীকতায় অত্যাচারী সিরাজউদ্দৌলাও [১৭৩০-৫৭ খৃ.] কাঁপিতেন, তাঁহারা এই অবধি বড়ো মানুষের আশ্রিত হইতে আরম্ভ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বড়োমানুষের সভাশোভাবিধান করিতে লাগিলেন, ক্রমে এক্ষণে তোষামোদ ভট্টাচার্যদিগের ব্যবসায়ের মধ্যে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের দেশে যে-কয়েকখানি উৎকৃষ্ট প্রাচীন বাংলা গ্রন্থ আছে, তাহাও এইরূপ ব্রহ্মোত্তরভোগীদিগের লিখিত. সুতরাং আর-নূতন ব্রহ্মোত্তর হইবে না এবং অনেক পুরাতন ব্রহ্মোত্তর বাজেয়াপ্ত হইবে, আইন করায় বঙ্গীয় বিদ্যা ও বঙ্গীয় সাহিত্যের মূলে কুঠারাঘাত হইল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বহু-দিন পর্যন্ত ভট্টাচার্যদিগের প্রাধান্য ছিল সত্য ; কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই জানিতে পারিয়াছিলেন যে, সে প্রাধান্য অধিক দিন থাকিবে না। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননাদির পর যে-সকল পণ্ডিত হইয়াছিলেন সকলেই জানেন যে, তাঁহারা উক্ত মহাত্মা-দিগের অপেক্ষায় অনেক অংশে নিকৃষ্ট ; তাহার পর আরো নিকৃষ্ট, তাহার পর আরো নিকৃষ্ট, শেষ এমনি হইয়া দাঁড়াইল যে সর্বদর্শন-সংগ্রহের [১৮৬১ খৃ.] ভূমিকায় খ্যাতনামা ৺জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন [১৮০৬-৭২ খৃ.] মহাশয় বলিলেন, যে. ভট্টাচার্যগণ চারি-পাঁচখানি ব্যতীত পুস্তক পড়েন না, এবং তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় [১৮০৬-৮৫ খৃ.] বলেন যে. আধুনিক নৈয়ায়িকেরা ন্যায়শাস্ত্রের ৬৪ ভাগের এক ভাগ মাত্র পড়িয়া পাঠ সমাপ্ত করেন। ১৯ শতাব্দীর প্রথম হইতেই ভট্টাচার্যদিগের ও সেই সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত চর্চার উচ্ছেদ হইতে লাগিল।

যে তিন শক্তিতে বঙ্গসমাজ চলিত, তিনেরই ধ্বংস হইতে লাগিল, অথচ নূতন সমাজ গঠিত হইল না। সাহিত্য একেবারে রহিল না ; ভারতচন্দ্র ১৭৬০ খৃস্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। রামপ্রসাদ সেন [আ. ১৭২০-৮১ খৃ.] এই সময়ে পরলোকগমন করেন। 'গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী'-প্রণেতা দুর্গাপ্রসাদও তাঁহাদের পশ্চাদ্‌গামী হন। ৬৫ হইতে ৭২-এর মধ্যেই প্রাচীন কবিগণ গত হন। তাঁহাদের স্থান অধিকার করে এমন লোক একেবারে হইল না, যে দুই-একজন রহিলেন,

তাঁহাদেরও প্রতিভা সম্পূর্ণ বিকাশ হইল না। তাঁহারা অতি নীচ-শ্রেণীর কবিতা লইয়া করতোপ করিতে লাগিলেন মাত্র। আপনারা কি নিধুবাবু [১৭৪১-১৮৩৮ খৃ.], রাম বসু [১৭৮৬-১৮২৮ খৃ] প্রভৃতিকে ভারতচন্দ্র [১৭১২-৬০ খৃ], রামপ্রসাদের স্থান পাইবার যোগ্য মনে করেন? ইঁহাদের মধ্যে একজন লোক ছিলেন, তাঁহার অনেক উপাসক আজিও আছেন, তাঁহার নাম হরু ঠাকুর [১৭৪৯-[১] ১৮২৪ খৃ.], ইনি কবির দল সৃষ্টি করেন; কবির দল স্থায়ী কার্য কিছুই করিতে পারেন নাই, তাঁহারা তৎকালীন হঠাৎ-অবতার জমিদার ও বাবুদিগকে প্রীত করিবার জন্য উপস্থিতমতো গান বাঁধিতেন। তাঁহাদের ক্ষমতা ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই ঘোর অত্যাচার অরাজক ও বিশৃঙ্খলার সময় তাঁহাদের প্রতিভা বিকাশ না হইয়া ঐরূপেই বাহিত হইয়াছিল। কীর্তন বাংলায় সৃষ্ট, বাঙালির গৌরবের ধন, কিন্তু কীর্তন রচয়িতা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে কেহই জীবিত ছিলেন না।

আমি অনেকক্ষণ আপনাদিগকে ভূমিকা লইয়া কষ্ট দিয়াছি; বোধ হয় আপনারা আমার সে অপরাধ মার্জনা করিবেন। এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহাতে বোধ হইবে যে, প্রাচীন বঙ্গসমাজ ভাঙিয়া গেল, প্রাচীন সাহিত্য, প্রাচীন বিদ্যা লোপ হইল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইল, এই সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় নূতন সমাজের ও নূতন সাহিত্যের সূত্রপাত হইল। কিন্তু সে সাহিত্য কে করিল? সে সূত্রপাত কে করিল? বঙ্গবাসী এইবার তোমার বড়োই লজ্জার কথা। বিদেশীয়-দিগের উৎসাহে বিদেশীয়দিগের উপকারার্থ বিদেশীয়দিগের যত্নে বিদেশীয় পণ্ডিত কর্তৃক তোমাদের সাহিত্য আরম্ভ হইল। সিবিলিয়ান-দিগের শিক্ষার জন্য সিবিলিয়ানদিগের উপকারার্থ লর্ড ওয়েলেস্‌লি [Marquess Richard Colley Wellesley, ১৭৯৮-১৮০৫ খৃ.] দ্বারা বঙ্গসাহিত্য আরম্ভ হইল, তোমাদের প্রথম গদ্যলেখক সাহেব ফরেস্টর[৩] ও কেরি [William Carey, ১৭৬১-১৮৩৪ খৃ], আর-একজন তিনি জাতিতে উড়িয়া, তাঁহার নাম মৃত্যুঞ্জয়[৪]। উড়ে ও সাহেবে বাংলায় সাহিত্য আরম্ভ করিল। আরো লজ্জার কথা এই যে, যে দুই-একজন বাঙালি এই সময় পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের পুস্তক

কদর্য ও জঘন্য বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্ররায়চরিত্র ও প্রতাপাদিত্য-চরিত্র বাঙালির লেখা। দুইখানিই অপাঠ্য[৫]।

এইরূপে বাংলায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যের সূত্রপাত হইল, সাহেবেরা নিজজাতিস্বভাবসুলভ অধ্যবসায়সহকারে বাংলার শ্রীবৃদ্ধি করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাংলায় সাহিত্যের উন্নতি হইতে এখনো অনেক বিলম্ব রহিল। ১৮০১ অব্দ হইতে ১৮১৫ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কোনো গ্রন্থ লিখিত হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বাংলা ঘোরান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। যেরূপ শান্তিস্থাপন হইলে সাহিত্য উৎপত্তি হইতে পারে, কলিকাতা ভিন্ন আর-কোথাও সেরূপ শান্তি রহিল না। যেরূপ অবস্থা হইলে লোকে কতকটা সাহিত্যের চর্চা করিতে পারে, কলিকাতা ভিন্ন আর এমন স্থান রহিল না। বাংলায় অনেক রাজধানী ছিল, বিদ্যাশিক্ষার অনেক স্থান ছিল; ক্রমে সমস্ত আসিয়া কলিকাতায় মিশিতে লাগিল। বর্গির হাঙ্গামার সময় হইতে সমস্ত বঙ্গদেশের লোক উঠিয়া গঙ্গাতীরে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, গঙ্গার দুই ধার ক্রমে সভ্যলোকে পূর্ণ হইতে লাগিল; বর্ধমান, যশোহর, ফরিদপুর, নদীয়া প্রভৃতি জেলার কত কত পরিবার যে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্তী গঙ্গাতীরস্থ স্থানে বাস করিতে লাগিল তাহার সংখ্যা নাই। ক্রমে এই কলিকাতা ও তন্নিকটবর্তী গঙ্গাতীরস্থ স্থানেই সাহিত্যের সূত্রপাত আরম্ভ হইতে লাগিল। এই স্থানে লোকে সর্বদা ইংরেজদিগের সংসর্গে আসিত, সর্বদা নানা দেশীয় লোকের সংসর্গে আসিত, তাহাদের ভাব-সকল হৃদ্‌গত করিত। ক্রমে এই-সকল দেশে সভ্যতার আবির্ভাব হইতে লাগিল; ক্রমে ব্রিটিশদিগের প্রতাপও ভারতবর্ষের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। আমরা এই সময়ের নাম transition period বা পরিবর্তন সময় বলিব। যেদিন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় [১৭৭২-১৮৩৩ খৃ] কলিকাতায় বাস করিতে আসিলেন, [১৮১৬ খৃ] সেইদিন হইতে পরিবর্তন আরম্ভ হইল, সেইদিন হইতে নূতন সৃষ্টির সূত্রপাত হইল। এই পরিবর্তন এখনো চলিতেছে। কিন্তু পরিবর্তন সময়ের যে যে দোষ গুণ তাহা আর বড়ো একটা দেখিতে পাওয়া যায় না; এখন আর ঠিক পরিবর্তন সময় নহে, এখন একটা দাঁড়াইয়া গিয়াছে, ইংরেজেরা এইজন্য

অধুনাতন সময়কে ইয়ং বেঙ্গলের সময় বলেন, আমরাও সংক্ষেপে 'ইয়ং বেঙ্গল' বলি।

পরিবর্তনসময়ে বহু-সংখ্যক মহা-ক্ষমতাশালী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি করিতে পারেন নাই। তাঁহারা দেশে যাহাতে জ্ঞানজ্যোতি, ধর্মজ্যোতি প্রকাশ হয়, যাহাতে দেশের কুসংস্কার দূরীভূত হয়, যাহাতে সমাজ নূতন পথে নির্বিবাদে চলিতে পারে, তাহাই করিয়া গিয়াছেন। এই-সকল গুরুতর কার্যে তাঁহাদের জীবন অতিবাহিত হইয়াছে, পরিবর্তনসময়ে সাহিত্যের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি না হইলেও লেখাপড়ার চর্চা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি হয়। বাংলা ও ইংরেজি এই উভয় ভাষায় লেখাপড়া আরম্ভ হয়, যে-সকল মহাত্মা এই সময় আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া যান, তাঁহাদের জনকয়েকের নাম না করিয়া, তাঁহাদের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তাঁহাদের নাম করিতে সকল বাঙালিরই মন কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র হওয়া উচিত। তাঁহারা আমাদের জাতীয় কৃতজ্ঞতারূপ করলাভের বিলক্ষণ উপযুক্ত। ইঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, ইনি ইংরেজি ও বাংলায় শত শত গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। ইনি ব্রাহ্মসমাজের [২০ আগস্ট, ১৮২৮ খৃ.] প্রথম স্থাপনকর্তা, ইনি সর্বপ্রথম সমাজ-সংস্কারক, ইনি সর্বপ্রথম ইয়ং বেঙ্গল, ইঁহার ক্ষমতা অপার, ইঁহার বিদ্যা অগাধ, ইঁহার মতো দেশহিতৈষী তৎকালে আর-কেহ ছিল না। ইনি, সমাজ যে ভাঙিয়াছে, তাহা বুঝিয়াছিলেন, সমাজ যে পথে যাইবে, তাহাও বুঝিয়াছিলেন, এবং প্রাণপণে সর্বপ্রযত্নে সমাজকে সেই পথে চালাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইনি সর্বপ্রথম উৎকৃষ্ট বাঙালি লেখক, ইঁহা হইতে বাংলা গদ্য বাঙালির অভ্যস্ত হইতে আরম্ভ হয়। পদ্য ভিন্ন সাহিত্য হইতে পারে, ইনিই সর্বপ্রথম লোককে বুঝাইয়া দেন।

দ্বিতীয়, গৌরীশঙ্কর— বাংলায় রামমোহন রায়ের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। বাংলা গদ্যের একজন শিক্ষাগুরু, রামমোহন রায়ের— তাঁহার মতের এবং তাঁহার ব্রাহ্মধর্মের— ঘোরতর বিদ্বেষী, এবং হিন্দুসমাজের মহামান্য অগ্রণী। প্রথম নাই হউক, তখনকার একখানি প্রধান বাংলা সংবাদপত্রের [সম্বাদ ভাস্কর, প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৮৩৯ খৃ.] সম্পাদক।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত [১৮১২-৫৯ খৃ.] গদ্য ও পদ্য সাহিত্যের স্রষ্টা, লেখনীচালনে অবিশ্রান্ত, তৎকালীন সর্বপ্রধান সম্বাদপত্রের সম্পাদক, [সংবাদ প্রভাকর, প্রথম প্রকাশ ২৮ জানুয়ারি ১৮৩১ খৃ.] নানা রস-পরিপূর্ণ কবিতা লেখায় চমৎকারশক্তিবিশিষ্ট, কিন্তু ইঁহার আর-এক গুণ ছিল, লেখকবর্গের সে গুণ প্রায় থাকে না : এজন্য লেখকদিগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের কীর্তিও প্রায় লোপ হয়। ইনি অল্পবয়স্ক, বিদ্যান, বুদ্ধিমান, সচ্চরিত্র ভদ্রসন্তানগণকে লেখা শিখাইতে যত যত্ন করিতেন, এত বোধ হয়, কখনো কোনো কালে কোনো লেখক করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। অধিক-কি বঙ্কিম [চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৮৩৮-৯৪ খৃ.], দীনবন্ধু [মিত্র, ১৮৩০-৭৩ খৃ], দ্বারকানাথ [বিদ্যাভূষণ, ১৮১৯-৮৬ খৃ.], ইঁহার মন্ত্রশিষ্য বলিলে অসংগত হয় না।

তাহার পর রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮১৩-৮৫ খৃ] আমাদিগের দেশের আজিকার সমাজের নেস্টর। পরিবর্তনসময়ের মূর্তিমান ইতিহাস। এই প্রাচীন বয়সেও ইঁহার যেরূপ ক্ষমতা, আর-কয়জনের তাহা আছে ? ইনি যাহাতে ইংরেজি ভাব দেশীয় লোকের মনে প্রবেশ করে, তাহার জন্য যে কত চেষ্টা করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। ইঁহার সংকলিত, রচিত ও অনুবাদিত গ্রন্থাবলী একত্রিত করিলে একটি পুস্তকালয় হয়, ইঁহার বিদ্যাকল্পদ্রুম [১৮৪৬ খৃ] একখানি cyclopedia ; বাংলা সাহিত্য ও ইংরেজি শিক্ষার উন্নতি ইঁহার জীবনের মন্ত্র। ইনি সাহিত্যব্যবসায়ীদিগের সহায়, উৎসাহদাতা, শুভাকাঙ্ক্ষী ও সুহৃদ।

তাহার পর রাজেন্দ্রলাল মিত্র [১৮২২-৯১ খৃ.] ; ইঁহার 'বিবিধার্থসংগ্রহ' [প্রথম প্রকাশ ১৮৫১ খৃ] বাংলাদেশের সর্বপ্রধান সর্বপ্রথম সাময়িক পত্রিকা। বাংলা ও ইংরেজিতে ইনি নিজে দক্ষাগ্রগণ্য, বাংলার মঙ্গলের জন্য ইঁহার চেষ্টারও কিছুমাত্র ত্রুটি নাই। ইনি বরনেকুলার লিটরেচর সোসাইটি ও স্কুল বুক সোসাইটির অন্যতম সভ্য হইয়া কত গ্রন্থকারকে যে উৎসাহ দিয়াছেন, তাহা কে বলিতে পারে। কিন্তু ইনি বাংলা ছাড়িয়া এক্ষণে ইংরেজি লইয়া অধিক ব্যস্ত হইয়াছেন, এত বড়ো লোক বাংলার লেখক হইলে বাংলার যে উপকার হইত তাহা হইল না, এজন্য আমরা দুঃখিত, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইনি

ভারতের প্রাচীনতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া বাংলার যেরূপ গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহা আর-কোনো একজন লোক বা একটি সোসাইটি দ্বারা হয় নাই।

পরিবর্তনসময়ের আর-একজন প্রধান লেখক নীলমণি বসাক [১৮০৮ ?-৬৪ খৃ] : ইঁহার পুস্তকাবলী অদ্যাপি লোকে পাঠ করিয়া থাকে, ইনি সরল গদ্যের জন্মদাতা ; যখন লোকে বড়ো বড়ো সংস্কৃত কথা ভিন্ন ব্যবহার করিতেন না সেই সময় নীলমণি বসাক সহজ গদ্য লিখিয়া খাঁটি বাংলায় কতদূর ভাব-প্রকাশ ক্ষমতা আছে, তাহা লোককে দেখাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার 'নবনারী' [১৮৫২ খৃ], আজিও বাঙালি স্ত্রীলোকের উৎকৃষ্ট পাঠ্য গ্রন্থ।

টেকচাঁদ ঠাকুর [প্যারীচাঁদ মিত্র, ১৮১৪-৮৩ খৃ] আমি জানি না, জানিবার বুঝি উপায়ও নাই , কিন্তু ইঁহার রচিত পুস্তকাবলী আমরা বাল্যকালে পাঠ করিয়া যে কত উপকার লাভ করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। পরিবর্তনসময়ের ইনিও একজন প্রধান লেখক ও সংস্কারক। ইঁহার সম্বন্ধে মহামতি বীমুস [John Beames, ১৮৩৭-১৯০২ খৃ.] বলিয়াছেন, "He has had many imitators and certainly stands very high as a novelist ; his story might fairly claim to be ranked with some of the best comic novels in our own language for wit, spirit and clever touches of nature." [*A Comparative Grammar*, p. 86-87, দ্র ৫১১ পৃষ্ঠা]

'হুতোমপেঁচা'ও এই পরিবর্তনসময়ের একটি মহার্ঘ রত্ন ; ইহাতে তৎকালীন সমাজের অতি সুন্দর চিত্র আছে, হুতোম হুতোমীয় ভাষার প্রবর্তক এবং বহু-সংখ্যক হুতোমি পুস্তকের আদিপুরুষ। বোধ হয় মৌলিকতায় তৎকালীন সমস্ত পুস্তকের শিরঃস্থানীয়।[৬]

ইঁহাদের পর সংস্কৃত কালেজের দল। মদনমোহন তর্কালঙ্কার [১৮১৭-৫৮ খৃ], তারাশঙ্কর [তর্করত্ন, ?-১৮৫৮ খৃ.], বহু-সংখ্যক উত্তম নাটকের প্রণেতা, অনুবাদক শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন [১৮২২-৮৬ খৃ.] প্রভৃতি বহু-সংখ্যক লেখক এই সময়ে সংস্কৃত কলেজ হইতে বহির্গত হন। ইঁহারা ইংরেজি ভাব বাংলায় ব্যক্ত করিতেন না। সংস্কৃত হইতে ভাবমালা সংগ্রহ করিয়া ইঁহারা বাঙালিকে উপহার

দিতেন। ইঁহাদের কত লোকের নাম করিব? সকলেই পূজ্যপাদ, সকলেরই নিকট বাংলা নানা কারণে ৰাধ্য। ইঁহারাই কালীপ্রসন্ন সিংহ [১৮৪০-৭০ খৃ.] মহোদয়ের মহাভারত অনুবাদ করিয়া আপনাদিগকে ও সিংহ মহোদয়কে চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। বাঙালি পাঠককে অগাধ রত্নরাশির অধিকারী করিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের দলের সর্বাগ্রণী এমন-কি পরিবর্তনসময়ের প্রধান নেতা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের [১৮২০-৯১ খৃ] নাম এখনো করা হয় নাই। ইনি একা একশত, ইনি যে বাঙালিকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছেন, বাংলায় শিক্ষা বিভাগ স্থাপন করিবার সময় যে গবর্নমেণ্টকে কত বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন, তাহা সমস্ত খুলিয়া লিখিতে গেলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হয়। ইনি সর্বপ্রথম বাঙালিকে বিশুদ্ধ বাংলা শিখাইয়াছেন : ইঁহার কথামালা [১৮৫৬ খৃ] 'চরিতাবলী'র [১৮৫৬ খৃ.] ভাষা যদি বঙ্গীয় সর্বপ্রধান লেখকও পড়েন, অনেক উপকার লাভ করেন। তাহার পর ইঁহার নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষিতা, ইঁহার স্বভাবনির্ভীকতা, স্বাধীনভাব, দেশীয় সমস্ত যুবকবৃন্দের আদর্শস্বরূপ হওয়া উচিত। ইঁহার 'সীতার বনবাসে'র [১৮৬০ খৃ.] ন্যায় প্রকাণ্ড কাব্য আজিও বাংলা ভাষায় দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অনেকে বলেন যে সীতার বনবাস মৌলিক গ্রন্থ নহে ; কিন্তু মৌলিক হউক, আর নাই হউক, অনুবাদ তো নয়। তাঁহার বিধবাবিবাহ বিচারের ['বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব', ১৮৫৫ খৃ.] ন্যায় বিচারগ্রন্থ বাংলায় তো আর নাই। অন্য ভাষায়ও এরূপ গ্রন্থ ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করে।

পরিবর্তনসময়ের লোকে যে, শুদ্ধ নিজে নিজে সকল কার্য করিতেন এমত নহে, তাঁহাদের সমবেত কার্যও ছিল। এই সমবেত কার্যের মধ্যে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' [১৮৩৯ খৃ.] প্রধান। তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে তত্ত্ববোধের জন্য 'তত্ত্ববোধিনী' নামক পত্রিকা [প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৮৪৩ খৃ] প্রচারিত হয়। শ্রীযুক্তবাবু অক্ষয়কুমার দত্ত [১৮২০-৮৬ খৃ.] এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়া আপনাকে চিরস্মরণীয় করিয়াছেন, ও দেশের বহুবিধ মঙ্গলসাধন করিয়াছেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তখন এখনকার মতো একটিমাত্র সভার কাগজ

হয় নাই, উহা তখন সমস্ত বাংলায় ইউরোপীয় ভাব প্রচারের মিশনারি ছিল, উহা ভারতবর্ষীয় ধর্মসমূহ সম্বন্ধে কত যে নূতন আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছে, তাহা যাঁহারা তত্ত্ববোধিনীর আদ্যোপান্ত পড়িয়াছেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন। বাঙালির ছেলেদের মধ্যে ইংরাজি ভাব প্রবেশ করানো সর্বপ্রথম অক্ষয়কুমার দত্ত দ্বারা সাধিত হয়। তিনিই বাঙালির সর্বপ্রথম নীতিশিক্ষক ; তাঁহার 'চারুপাঠ' [১৮৫৩-৫৯ খৃ], 'ধর্ম্মনীতি' [১৮৫৬ খৃ.], 'বাহ্যবস্তু' ['বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার', ১৮৫১-৫৩ খৃ.] প্রভৃতি গ্রন্থ বিজ্ঞলোকেও পাঠ করিয়া নীত্যাদি-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। বালকেরা এই-সকল গ্রন্থপাঠে কতদূর উপকৃত হয়, তাহা বলা যায় না।

এই সময় কবিওয়ালারা, যাত্রাওয়ালারা বিশেষ পাঁচালিওয়ালা দাশরথি রায় [১৮০৬-৫৭ খৃ] বাংলাভাষার পুষ্টির পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।

আমরা ক্রমে ক্রমে পরিবর্তনসময়ের প্রধান প্রধান নেতৃগণের নাম-কীর্তন করিলাম, ইঁহাদের সকলেরই উদ্দেশ্য এক ও মহৎ, ইংরেজিভাব বাঙালিকে বুঝানো ; ইংরেজিভাব বাঙালির অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করানো। একালের শিক্ষিত সম্প্রদায় এই কার্যে এত খেপিয়াছিলেন যে, একজন অতি সুশিক্ষিত যুবক— তাঁহার নাম আমার স্মরণ নাই, তিনি ইস্কুলের মাস্টার ছিলেন, এবং ইংরেজি বিদ্যায় বৃহস্পতি ছিলেন— রাস্তায় চলিবার সময় মুটে, মজুর, মুদি, ভদ্রলোক, যাহাকে দেখিতেন, তাহাকেই বলিতেন, 'গোরু খাবি', 'গোরু খাবি' ? তাহারা গালাগালি দিত। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, 'ওরা তো খাবে না জানিই, তবে রোজ রোজ শুনিতে শুনিতে শেষ ideaটা আর অত shocking হইবে না।' এইরূপে পূর্বোক্ত মহাত্মাগণ ইউরোপীয় ভাব-সকল দেশমধ্যে প্রচার করিয়া দিতেন। পরিবর্তনসময়ের লোক আজিও অনেকে জীবিত আছেন, তাঁহারা যদি সেকালের লোকের মনের কথা বলিয়া দেন, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা তাঁহারা অনেক অধিক বলিতে পারিবেন।

তবে স্থূলত পরিবর্তনসময়ের কাজ এইগুলি : ভাষার সৃষ্টি, গদ্যের সৃষ্টি, হিন্দুকালেজের ছাত্রগণ কর্তৃক ইংরেজি ভাবের প্রচার, ও সংস্কৃত কালেজের ছাত্রগণ কর্তৃক সংস্কৃত অনুবাদ প্রচার, সমাজকে নূতন

পথে চালানো, বিদ্যাশিক্ষার উৎসাহ ও উন্নতি, বাংলা সাহিত্যের কোরকের উৎপত্তি। এখন দেখা যাউক, এই-সকলের ফল কী হইল। পূর্বেই বলিয়াছি পরিবর্তন এখনো চলিতেছে; পরিবর্তনসময়, অনুবাদের সময়, শিক্ষার সময়, জিনিয়সের সময়, বড়ো বড়ো চিন্তাশীলগণের সময়, আমরা যাহা হইয়াছি ও হইতেছি তাঁহাদেরই কৃপায়, তাঁহাদেরই অধ্যবসায়ের গুণে, তাঁহাদেরই উচ্চকামনার ফলে। কিন্তু তাঁহারা যে পরিবর্তন সাধন করিয়া তুলিয়াছেন, এমন পরিবর্তন কি আর-কখনো হইয়াছিল, তাঁহারা যে সমাজ, যে সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন, এমন কি আর কখনো হইবে? যত ভাব তাঁহাদের সমবেত পরিশ্রমে বাংলায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এত কি আর-কখনো কোনো দেশে কোনো কালে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল? অদ্যকার যুবকগণ এই পরিবর্তনসময়ের দরুন যত উপকার পাইয়াছেন, এত কি কোনো দেশে কোনো কালে কোনো যুবকদল পাইয়াছেন? এরূপ আশ্চর্য পরিবর্তন ইউরোপে একবার হইয়াছিল; কিন্তু ইহার সহিত তুলনা করিলে সে অতি সামান্য। যখন ১৪৫৩ সালে রণদুর্মদ ওসমানআলি মহম্মদ [১৪২৯-৮১ খৃ.] নূতন রোম দখল করিয়া কাইসারের উত্তরাধিকারীগণকে সাম্রাজ্যচ্যুত করিল, সেণ্ট সফির গির্জাকে মসজিদ করিল, সেই সময়ে যখন নূতন রোমের পণ্ডিতবৃন্দ বিনিসসাগরপারস্থ স্বধর্মাবলম্বীদিগের নিকট নিজের বিদ্যা লইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, তখন একবার এইরূপ পরিবর্তন ইউরোপে ঘটিয়াছিল, এইরূপ নূতন ভাবে লোকে উন্মত্ত হইয়াছিল, লোকের মনে এইরূপ একটা ভীষণ গোলমাল হইয়াছিল, এইরূপ উৎসাহের সহিত লোকে নূতন বিদ্যা শিখিতে এবং নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করিতে উদ্যোগী হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের এ পরিবর্তনের সহিত তাহার তুলনা হয় না। তখন শুদ্ধ গ্রীকদিগের সাহিত্য পুনঃপ্রচার হইয়াছিল মাত্র। কিন্তু এখন বাংলায় কী হইয়াছে একবার দেখো দেখি! প্রাচ্য, পাশ্চাত্য সমস্ত বিদ্যা বাঙালির সম্মুখে আপনাদের গুপ্ত ভাণ্ডার প্রকাশ করিতেছে। এখনকার ইউরোপীয় সাহিত্যের সহিত তুলনা করিলে তখনকার গ্রীক সাহিত্য তুচ্ছ পদার্থ; তাহার উপর আবার সংস্কৃত সাহিত্যের পুনঃপ্রচার আছে, বৌদ্ধ সাহিত্যের পুনরুদ্ধার আছে। দেখো দেখি একবার কত অগাধ ভাণ্ডারের আমরা একেবারে অধিকারী হইয়াছি। এত সম্পদ কাহার ভাগ্যে

ঘটে ? এক দেশে আর-এক দেশের সাহিত্য প্রচারে মহাবিপ্লব ঘটে। ইংলণ্ডের সাহিত্য ফ্রান্সে গিয়া গত শতাব্দীতে এত কাণ্ড করাইয়াছে, আর আজি আমাদের দেশে ইংলণ্ডের, ফ্রান্সের, জর্মনির, ইতালির, প্রাচীন হিন্দুদের ও প্রাচীন বৌদ্ধদিগের সাহিত্য উপস্থিত। আমরা এক-এক সময়ে এই অগাধ সাহিত্যরাশি চিন্তা করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া পড়ি। এই-সকল সাহিত্যের সকল পুস্তক ভালো করিয়া পড়া অসম্ভব। অতএব প্রত্যেক দেশের সাহিত্যের যদি চারি-পাঁচখানি করিয়া উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বা 'মাস্টারপীস' পড়ি তাহা হইলে দশ বৎসর কাটিয়া যায়। বাস্তবিক এত সাহিত্যও কখনো একেবারে এক অন্ধতমসাচ্ছন্ন দেশে উপস্থিত হয় নাই, আর এই সাহিত্য লইয়া স্বায়ত্ত করিতে পারে, ইয়ং বেঙ্গল ভিন্ন এমন জাতিও আর-কখনো হয় নাই। আর এই-সকল নানা দেশীয় ভাব এক করিয়া নূতন সৃষ্টি করিবার বিষয়ে ইয়ং বেঙ্গলের যত সুবিধা, বোধ হয় আর-কোনো দেশের লোকের কখনো এত হয় নাই। প্রধান সুবিধা, সমস্ত দেশে শান্তি স্থাপিত আছে, কোথাও কোনো গোলযোগ নাই, প্রাণ ও ধন সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত হইয়াছে। যুদ্ধের লেশমাত্রও নাই, জমিদারের অত্যাচার নাই, কুসংস্কারাপন্ন গুরু পুরোহিতের প্রাধান্য নাই, স্বাধীন চিন্তার ব্যাঘাত দেয় এমন কিছুই নাই। স্বাধীন দেশে, দেশ শাসন, শান্তি রক্ষা, বিচারকার্য প্রভৃতিতে নিযুক্ত থাকায় কত কত মহা প্রতিভাশালী লোকের প্রতিভা বিকাশ হইতে পারে না। বাঙালির অদৃষ্টে এ-সকল কার্যের জন্য ইংরেজ আছেন। বাঙালি ইচ্ছা করিলে নির্বিবাদে নিরাপদে দেশের, সমাজের ও সাহিত্যের উন্নতিতে সমস্ত মানসিকশক্তি ব্যয় করিতে পারেন। বাংলার সর্বত্র ইংরাজি বিদ্যালয় হইয়াছে। ৩০/৪০ বৎসর পূর্বে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্তী গঙ্গাতীরস্থ প্রদেশ মাত্র সভ্য ছিল। এই প্রদেশে মাত্র নূতন সমাজের সৃষ্টি হইয়াছিল, এই স্থানে মাত্র সাহিত্যের অঙ্কুর জন্মিয়াছিল। এক্ষণে সে সভ্যতা, সে নূতন সমাজ, সে সাহিত্য সর্বত্র বিস্তারিত হইয়াছে, অতি নিভৃত জঙ্গল-মধ্যে নূতন সমাজ স্থাপিত হইয়াছে। এখন দেখিতে হইবে, বাঙালি ইয়ং বেঙ্গল এমন সুবিধার কী কার্য করিতেছেন। তাঁহারা নূতন সাহিত্য গঠনে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন, নূতন চিন্তাস্রোত কতদূর চলিয়াছে, আর যাহা হইয়াছে তাহা হইতে কতদূর আশা করা যাইতে পারে।

আমরা মাইকেলের [মধুসূদন দত্ত, ১৮২৪-৭৩ খৃ.] 'তিলোত্তমা-সম্ভব' প্রকাশ হইতে নূতন সাহিত্যের উৎপত্তি ধরিয়া লইব। যদি ইহার পূর্বে এরূপ নূতন সাহিত্যের কিছু থাকে, কেহ আমাদিগের সেই ভ্রমান্ধকার দূর করিয়া দিলে একান্ত বাধিত হইব। 'তিলোত্তমা' ১৮৬০ সালে প্রচার হয়, তাহার পর বিশ বৎসর মাত্র অতীত হইয়াছে। এই কুড়ি বৎসরে যে-সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহাকে সাহিত্য বলিতে আমরা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহি। এই সাহিত্যের যেরূপ বৃদ্ধি, যেরূপ দ্রুত উন্নতি তাহাতে ইহার পরিণাম সম্বন্ধে অসীম উন্নতি আমাদিগের স্থিরনিশ্চয়। আমাদিগের এই বালসাহিত্যকে সাহিত্য বলিয়া গর্ব করিবার ও ইহার ভাবী পরিণাম সম্বন্ধে নানারূপ আশা করিবার বিশেষ কারণও আছে, এটি শুদ্ধ আমার নিজের কথা নহে, অন্ধবিশ্বাস নহে, বৃথা আশা নহে, যখন আট বৎসর পূর্বে এই বাংলাভাষায় ইতিহাস লিখিত হইয়াছিল, তখন বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাস লিখিবার সময় হইয়াছে।[৭] তাহার আট বৎসর পরে কতই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে আমরা সেই সাহিত্যের আরো গর্ব করিব আশ্চর্য কী ? ভারতীয় আর্যভাষাসমূহের ঔপমিতব্যাকরণকার [*A Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages of India*, ১৮৭২-৭৯ খৃ.] মহামতি বীমস সাহেব দশ বৎসর পূর্বে বঙ্গীয় সাহিত্য সমালোচনান্তে বলিয়াছেন— "That the Bengalis possess the power, as well as the will to establish a national literature of very sound and good character cannot be denied." [p. 87] আরো 'পুষ্পাঞ্জলি' [১৮৭৬ খৃ.] প্রণেতা, চিন্তাশীল, শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়[৮] মহাশয় বলিয়াছেন, "ফল কথা সত্যযুগে সরস্বতীসন্তান ব্রহ্মর্ষিগণ যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন এই যুগে ভাগীরথীসন্তানদিগের প্রতিও সেই কার্য্যের ভার সমর্পিত রহিয়াছে। ইঁহাদিগেরই দেশে পূর্ব্বপিতৃগণের পুনরুদ্ধার সাধিত হইবে।"

এই কয়বৎসর মধ্যে কত নূতন পুস্তক হইয়াছে, কত নূতন পরিবর্তন হইয়াছে, এবং এই-সকল পুস্তক ক্রমেই উৎকৃষ্টতর হইতেছে, পরিবর্তনে ক্রমেই দেশের অধিক মঙ্গল হইতেছে।

আমার বোধ হয় সকলে অধীর হইয়াছেন, কিন্তু আমি তাঁহাদিগের

নিকট ধীরতা ভিক্ষা করি, আমি নিম্নে অনেক কথা ছাড়িয়া দিব স্থির করিয়াছি, যাঁহারা এই দশ বৎসর মধ্যে নানা সংস্কৃত ও ইংরেজি পুস্তক অনুবাদ করিয়াছেন, তাঁহাদের কোনো কথা বলিতে পারিব না। যাঁহারা নানাবিধ স্কুলবুক লিখিয়া তরলমতি বালকবৃন্দের মনে নানাবিধ ভাবের উদ্রেক করিতেছেন, তাঁহাদের কথা কিছু বলিতে পারিব না। যাঁহারা ইংরেজি বিজ্ঞান অনুবাদ করিয়া দেশের মহতী শ্রীবৃদ্ধি করিতেছেন, তাঁহাদের কথাও বলিতে পারিব না। যাঁহারা চিকিৎসাশাস্ত্রের নানা নূতন মত আবিষ্কার করিয়া, অনুবাদ করিয়া ও প্রচার করিয়া দেশীয়-দিগকে নানা প্রকার হিতকর এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরনিরপেক্ষ করিতেছেন, তাঁহাদের কথা বলিতে পারিব না। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি যে-সকল মহোদয়গণ বঙ্গীয় সম্বাদপত্রের সম্পাদকতা করিয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করিতেছেন তাঁহাদের নামও করিতে পারিব না। কিন্তু যেমন শিব, বিষ্ণু ও দুর্গা, লক্ষ্মী প্রভৃতি পূজার পূর্বে "আদিত্যাদি নব-গ্রহেভ্যঃ" "ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালেভ্যঃ" ফুলচন্দন দেওয়া হয়, সেইরূপ তাঁহাদের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বক্তব্য বিষয়ে অবতীর্ণ হইব। এরূপ সংক্ষেপ করিবার আরো একটি কারণ আছে; আমি ক্ষুদ্র মানব, আমি তাঁহাদের পূজাপদ্ধতিও বিশেষরূপে অবগত নহি। অতএব তাঁহাদের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আমার নিজ বক্তব্যপথে গমন করি।

আমাদিগের প্রথম লেখক মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ইঁহার জীবনে ও ইঁহার পদ্যে অনেক সৌসাদৃশ্য। জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতা, স্বাধীনতা, সমাজের প্রতি সমূহ অবজ্ঞা, গ্রন্থেও তেমনি সমস্ত কল্পনার বন্ধনচ্ছেদ। কবি আমাদিগকে তাঁহার প্রথম দুইখানি গ্রন্থের মধ্যে স্বর্গ, নরক, ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, সব দেখাইয়াছেন; উন্মত্ত কল্পনা উদ্দামভাবে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। ইনি সকল ভাষায় ব্যুৎপন্নকেশরী ছিলেন, ইঁহার মনোমধ্যে নানা জাতীয় ভাবরাশি চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইত, ইনি তাহারই মধ্যে কতকগুলি ধরিয়া কতকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাঁহার গ্রন্থ বহু-কাল কেহ অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারিবে না। তাঁহার তিলোত্তমা কি কাব্য, না মহাকাব্য, না খণ্ডকাব্য? আমি বলি উহা স্বর্গীয় কাব্য, না-হয় বলি উহা উন্মাদের

কাব্য ? তাঁহার 'পদ্মাবতী' [১৮৬০ খৃ.] ও 'কৃষ্ণকুমারী' [১৮৬১ খৃ.] অত্যুৎকৃষ্ট নাটক, তাঁহার 'বীরাঙ্গনা' ['ব্রজাঙ্গনা কাব্য', ১৮৬১ খৃ.] গীতিকাব্যে জয়দেবের সমস্থানীয়, তাঁহার 'বীরাঙ্গনা' [১৮৬২ খৃ.] বীরাঙ্গনাগণের সম্পূর্ণ যোগ্য পাত্র। পূর্বেই বলিয়াছি, দেশদেশান্তরাহৃত ভাবরাশি তাঁহার অন্তরাকাশে ঘুরিয়া বেড়াইত. তিনি তাহাদিগের কয়েকটিকে একত্র করিয়াছিলেন মাত্র। সেটি সত্য, কারণ তিনি সমস্ত কাব্য সবে দুই বৎসরের মধ্যে লিখিয়াছিলেন. আর কত কত ভাবমালা যে তাঁহার মনে ছিল, কত ভাব যে তাঁহার সাংসারিক অবস্থার জন্য মনেই মিলাইয়া গিয়াছে, কতই যে তাঁহার অকালমৃত্যু হেতু বিকাশ পায় নাই তাহা কে বলিতে পারে ? তাঁহার জীবন শোকান্ত মহাকাব্য, তাঁহার গ্রন্থগুলিও সেইরূপ শোকান্ত মহাকাব্য ; তাঁহার এক-একখানি গ্রন্থ এক-একখানি রত্ন বা রত্নখনি। কত কবিই যে উহা হইতে রত্নরাশি সঞ্চয় করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন তাহার সীমা নাই। তাঁহার প্রহসন দুইখানি আজিও প্রহসনের অগ্রগণ্য, তাঁহার ন্যায় সর্বতোমুখী প্রতিভাশালী ব্যক্তি অতি বিরল ; যখন যে দেশে এ প্রকার প্রতিভা বিকাশ হয়, তখন সেই দেশ ধন্য ও পৃথিবীস্থ জাতিসমূহমধ্যে মহামান্য হয়।

মাইকেলের সঙ্গে সঙ্গে আর-দুই জন কবি বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বল করিতেছেন। মাইকেল কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন, তাঁহারা আজিও জীবিত আছেন। হেমচন্দ্র [বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৩৮-১৯০৩ খৃ.] গীতিমালায় দেশীয় লোকের মধ্যে প্রথম উচ্চতর ভাব প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন, তাঁহার 'কবিতাবলী' [১৮৭০ খৃ.] অতুল্য পদার্থ ; উহাতে সত্য সত্যই মন গলাইয়া কবির অভিলষিত পথে চালাইয়া দেয়। তাঁহার 'বৃত্রসংহার' [১৮৭৫ খৃ.] স্বদেশহিতৈষায় পরিপূর্ণ। তিনি মাইকেলের শিষ্য, বৃত্রসংহারে মাইকেল তাঁহার আদর্শস্থল। মাইকেলের 'মেঘনাদ' অপেক্ষা তাঁহার বৃত্রসংহার কোনো কোনো অংশে নিকৃষ্ট হইলেও উহা বঙ্গবাসীর অধিকতর আদরের জিনিস, উহাতে মাইকেলের উদ্দাম কল্পনা না থাকিলেও উহার আদ্যন্ত একভাবে সুন্দররূপে গ্রন্থিত। হেমচন্দ্রের বৃত্র ও কবিতাবলী বহু-কাল বাংলার প্রধান পুস্তকমধ্যে গণ্য থাকিবে। যতদিন বাংলাভাষা থাকিবে, ততদিন উহাদের মার নাই।

হেমচন্দ্র ইংরেজি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যগুলির অনুকরণ বাংলায় করিতে এতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন যে, বোধ হয় অনেক স্থলে তিনি কাব্যগুণে তাঁহার আদর্শকে অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহার 'গঙ্গার উৎপত্তি' উদ্দাম অথচ সুগঠিত প্রতিভার সুন্দর বিকাশ। [৫ কার্তিক ১২৭৭ ব. 'এডুকেশন গেজেটে' প্রথম প্রকাশিত, পরে 'কবিতাবলী'তে সংকলিত।]

মাইকেলের সমসাময়িক দ্বিতীয় কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮২৭-৮৭ খৃ.], ইঁহার 'পদ্মিনী' [১২৬৫ ব.] উৎকৃষ্ট উচ্চ অঙ্গের ভাবমালায় পরিপূর্ণ ; উহাতে সর্ব প্রথম হিন্দুমহিলার সতীত্ব ও দেশানুরাগ পবিত্রানুরাগ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। স্বাধীনতার মোহিনী শক্তির ছটা দেখাইয়া দিয়াছেন। ইনি বহু-কালাবধি পদ্যাদি আর লিখেন না ; কিন্তু ইঁহার কবিত্বশক্তির ও কাব্যলিখনক্ষমতার কিছুমাত্র ন্যূনতা হয় নাই। ৩/৪ বৎসর হইল, বঙ্গদর্শনে [পৌষ-চৈত্র, ১২৮২ ব.] ইনি 'নীতিকুসুমাঞ্জলি' নামে কতকগুলি কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাঁহার মতো পরিষ্কার ইংরেজিতে যাহাকে smart বলে তেমন কবিতা আর-কখনো দেখি নাই। তাঁহার কবিতার দৌড় ঠিক পোপের মতো। পরিষ্কার টিকল অথচ সম্যক সম্পূর্ণ।

বাবু নবীনচন্দ্র সেন [১৮৪৭-১৯০৯ খৃ] বহু-সংখ্যক কবিতা লিখিয়াছেন, ইঁহার 'পলাশীর যুদ্ধ' [১২৮২ ব.] বীররসপূর্ণ কবিতা-মালায় পরিপূর্ণ। তাঁহার রানী ভবানীর চরিত্র আমাদিগের হৃদয় প্রস্তরে চির-অঙ্কিত থাকিবে।

ইঁহাদের পর দীনবন্ধু, ইনি ঈশ্বর গুপ্তের ছাত্র। ঈশ্বর গুপ্তের হাতের তৈয়ারি। ইঁহার উপর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যত ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন এত আর-কাহারো উপর পারেন নাই। সমাজচিত্র অঙ্কনে ইনি অদ্বিতীয় ; ইঁহার 'সধবার একাদশী' [১৮৬৬ খৃ.] ও 'জামাই বারিক' [১৮৭২ খৃ.] সমাজের উৎকৃষ্ট চিত্র। সমাজে দোষ দেখাইয়া সেই দোষকে ব্যঙ্গ করিতে হইলে যতদূর সম্ভব, ইনি ততদূর অতিরঞ্জিত করিতে পারেন। ইঁহার 'লীলাবতী' [১২৭৪ ব.] অপূর্ব পদার্থ। ইংরেজি শিখিয়া ইংরেজের উৎকৃষ্ট নিয়মাদি অনুকরণে অক্ষম হইয়া অথচ প্রাচীন সমাজের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া তৎকালের যুবকগণ কিরূপে অধঃপাতে যাইতেন, দীনবন্ধু সে-সকল বর্ণনায় অদ্বিতীয়।

তাঁহার নদের চাঁদ ও হেমচাঁদ, তাঁহার অটল ও নিমে দত্ত কল্পনার উৎকৃষ্ট সৃষ্টি। তাঁহার 'নীলদর্পণে' [১৮৬০ খৃ.] সমাজের কত উপকার করিয়াছে, কিরূপে অত্যাচারী পাপাশয় নীলকরগণের প্রতি লোকের বিদ্বেষভাব বর্ধিত করিয়াছে, তাহা কাহারো অবিদিত নাই। তাঁহার বিষয় অনেক বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা হইলে পুঁথি অত্যন্ত বাড়িয়া যায়।

ইহার পর বঙ্কিমবাবু; ইঁহার 'দুর্গেশনন্দিনী' [১৮৬৫ খৃ.], 'কপালকুণ্ডলা' [১৮৬৬ খৃ.], 'মৃণালিনী' [১৮৬৯ খৃ.], 'বিষবৃক্ষ' [১৮৭৩ খৃ.], 'চন্দ্রশেখর' [১৮৭৫ খৃ.], 'রজনী' [১৮৭৭ খৃ.], 'কৃষ্ণকান্তের উইল' [১৮৭৮ খৃ.] ও 'কমলাকান্তের দপ্তর' [১৮৭৫ খৃ.], এক-একখানি এক-এক অদ্ভুত পদার্থ। ইঁহার গ্রন্থগুলির উদ্দেশ্য যে, বঙ্গীয় পাঠকদিগের সম্মুখে এক-একটি উৎকৃষ্ট পুরুষ ও উৎকৃষ্ট নারীচরিত্র দেখানো এবং সৎপথভ্রষ্ট হইলে তাহার যে অবশ্য প্রায়শ্চিত্ত তাহারো চিত্র দেখানো। তাঁহার প্রতাপ পুরুষশিরোমণি, যেমন বুদ্ধি, যেমন বিজ্ঞতা, যেমন কর্মক্ষমতা, তেমনি উচ্চতর প্রেমাকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ, আবার তেমনি ধর্মপথে মতিমান। পূর্বে রামায়ণ ও মহাভারত বঙ্গীয় যুবককে যে-সকল শিক্ষা দিত, আজি এই পরাধীন দেশে বঙ্কিমবাবুর পুস্তকগুলি ঠিক সেই শিক্ষা দেয়; তাঁহার কমলাকান্ত আর-কেহ নহে, একজন সুশিক্ষিত চিন্তাশক্তিসম্পন্ন বঙ্গবাসীর হৃদয়স্থ অনন্ত শোকসাগরের গভীর সমুদগীরণ মাত্র। তিনি 'এস এস বঁধু এস', এই গীতের ব্যাখ্যাচ্ছলে কমলাকান্তের মুখে যে নানা রসপূর্ণ অপূর্ব কাব্যকলাপের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার স্বদেশানুরাগের প্রভূত প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার সূর্যমুখী, আয়েষা, ভ্রমরা, ললিত-লবঙ্গলতা, এমন-কি তাঁহার রূপসী, হীরা, রোহিণী হইতেও আমরা উৎকৃষ্ট নীতিশিক্ষা পাইয়া থাকি। নীতিশিক্ষা কাব্যে অতি অল্প প্রশংসা, কিন্তু উহার রুচি অতি চমৎকার, বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থে সুরুচিবিরুদ্ধ বর্ণনা অতি বিরল, নাই বলিলেও হয়। কিন্তু এই কয়খানি বই লইয়া বঙ্কিমবাবুর সমালোচনা করিলে, তাঁহার উপর শুদ্ধ অবিচার করা হয় মাত্র। তিনি যেরূপ নিজদেশের জন্য দেহ, মন, প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন, এত বোধ হয় আর কেহই করে নাই। তাঁহার 'বঙ্গদর্শন' [প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৮৭২ খৃ.] বঙ্গদেশের ও

বঙ্গসাহিত্যের যত উন্নতিসাধন করিয়াছে, এত বোধ হয় আর-কিছুরই দ্বারা কখনো হয় নাই, ইহাতেও বঙ্কিমবাবুর সব বলা হইল না। ইনিও ঈশ্বর গুপ্তের অনুকরণ করত সুশিক্ষিত যুবকবৃন্দকে বঙ্গ-ভাষায় লিখাইবার জন্য বিহিত যত্ন করেন। এখানকার লেখকবৃন্দ বঙ্কিমবাবুর নিকট যত ঋণী এত বোধ হয় আর কাহারো নিকট নহে। এই প্রাচীন বয়সে নানারূপ শারীরিক, মানসিক, সাংসারিক যন্ত্রণার মধ্যে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের গুরুতর পরিশ্রমের উপরও বঙ্গসাহিত্যের জন্য ইঁহার চিন্তা ও পরিশ্রমে বিরতি নাই। বঙ্গদর্শনে বাঙালি যে ইংরেজি শিক্ষায় কী হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বাঙালি যে চিন্তাশীলতায়, সুরুচিশীলতায়, কাব্যপ্রসঙ্গে অন্য জাতি অপেক্ষা হীন নহে, তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বঙ্কিমবাবুর কথা লইয়া আর-অধিক আন্দোলন করা আমার পক্ষে নিতান্ত অন্যায়। বঙ্কিমবাবু দেশের উপকারার্থ যে-সকল কার্য করিয়াছেন, করিতেছেন ও ঈশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘায়ু দিলে যাহা করিবেন, তাহা অন্যে বলিলে যত সাজিবে, নানা কারণে আমার বলিলে তত সাজিবে না।

বঙ্গদর্শনের দেখাদেখি আমাদের দেশে আর চারি-পাঁচখানি উৎকৃষ্ট সাময়িক পত্রিকা হইয়াছে। ইহার মধ্যে 'আর্যদর্শন' [প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৮৭৪ খৃ] কিছু দিন ধরিয়া বাঙালিদিগের বড়োই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল। আর্যদর্শনে দেশের মনে পরনিরপেক্ষতাবৃত্তি উদ্দীপনের জন্য নানা প্রকার যত্ন করা হইয়াছিল। ইহার প্রধান লেখক সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ [১৮৪৫-১৯০৪ খৃ] নিজে এবং পূর্ণচন্দ্র বসু। সম্পাদক মিল ও ম্যাট্‌সিনির জীবনচরিত[৯] লিখিয়া বঙ্গবাসীকে ইউরোপের দুই জন প্রধান নেতার মনের মধ্যে প্রবেশাধিকার দিয়াছেন। পূর্ণচন্দ্র বসু[১০] বঙ্কিমবাবুর স্ত্রীচরিত্রগুলির চরিত্র পরিষ্কার করিয়া দেখাইয়া যথার্থ উচ্চতর সমালোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন। বাংলায় দ্বিতীয় সাময়িক পত্রিকা 'বান্ধব' [প্রথম প্রকাশ জুন ১৮৭৪ খৃ.], ইহার প্রভাব আমাদের এ অঞ্চলে তত অধিক নাই, কিন্তু ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে ইহার প্রভাব অত্যন্ত অধিক। ইহার সম্পাদক মনীষাসম্পন্ন কালীপ্রসন্ন ঘোষ [১৮৪৩-১৯১০ খৃ.] বিলক্ষণ দক্ষতাসহকারে পত্রিকা সম্পাদনকার্য

সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। ইংরেজিতে যাহাকে earnest man বলে, আমাদের এ অঞ্চল অপেক্ষা পূর্বাঞ্চলে এইরূপ লোকের সংখ্যা অধিক, আর কালীপ্রসন্নবাবু এই-সকল earnest লোকের অগ্রণী। তাঁহার লেখার জীবন্ত ভাব, জলন্ত রচনা। তাঁহার সহযোগীগণকে আমরা বিশেষ জানি না ; যাহা জানি, তাহাতে আমাদের যথেষ্ট ভরসা আছে যে কালীপ্রসন্নবাবুর সহযোগীগণের মধ্য হইতে অনেক উৎকৃষ্ট লেখক উৎপন্ন হইবেন। আর-একখানি সাময়িক পত্র 'ভারতী' [প্রথম প্রকাশ ১৮৭৭ খৃ.], এখানি জোড়াসাঁকোস্থ ঠাকুরপরিবার কর্তৃক প্রকাশিত ; ইহার রুচি মার্জিত, ভাষা ললিত। ইহার কার্যপ্রণালী সুন্দর, ইহা কখনো বাকি পড়ে না, সকল কাগজ এক বৎসর দুই বৎসর বাকি পড়িয়াছে, কিন্তু ভারতীর বাকি নাই। এই পত্রের সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর,[১১] ইঁহার নিজের গ্রন্থাবলী অতি সুন্দর। 'স্বপ্ন-প্রয়াণে' [১৮৭৫খৃ], ইঁহার কল্পনাশক্তির অনেক দূর দৌড় দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিজেন্দ্রবাবুর ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে সম্পাদকতাকার্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকেন। যেখান হইতে পাঁচ-ছয় বৎসরের মধ্যে 'সরোজিনী', 'পুরুবিক্রম',[১২] প্রভৃতি দশ-বারোখানি সুরুচিসংগত সুললিত পাঠ্য ও উপাদেয় গ্রন্থ বাহির হইয়াছে, তাঁহাদিগকে অল্পক্ষমতাশালী বলিয়া বোধ হয় না।

শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[১৩] এই চারি বৎসর ধরিয়া 'ভারতী'তে যে-সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে সাহিত্যসমাজে তাঁহার বিশেষ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তাঁহার'ভানুসিংহের পদাবলী' তুলনারহিত ; তাঁহার 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' দেশভ্রমণ বিষয়ে অতি উপাদেয় গ্রন্থ। তাঁহার সকল প্রবন্ধগুলিই সুপাঠ্য। তিনি অল্প বয়সে যেরূপ মানসিক শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে পরে তাঁহার দ্বারা যে সাহিত্যের স্থায়ী উপকার হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার 'বাল্মীকিপ্রতিভা' অভিনয় [২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৮১খৃ.] দেখিয়া আমরা বাস্তবিকই মোহিত হইয়াছিলাম।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী[১৪] মহর্ষিপ্রতিম শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের [১৮১৭-১৯০৫ খৃ.] কন্যা ; তিনি অতিশয় সুশিক্ষিতা ও সুরুচি-সম্পন্না। তাঁহার স্বদেশানুরাগ তদীয় 'দীপ-নির্বাণ' [১৮৭৬ খৃ.] গ্রন্থে সম্যক বিকশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠে চিত্তের প্রসাদলাভ হয়। বাংলা সাহিত্য এই শৈশবাবস্থাতেই যখন এইরূপ প্রতিভাশালিনী

গ্রন্থকর্ত্রী প্রাপ্ত হইয়াছে তখন রমণীগণ যে, বাংলা সাহিত্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন ও ইহার বিশেষ উন্নতি সাধন করিবেন, তদ্বিষয়ে বিশেষ আশা করা যাইতে পারে। দেবী স্বর্ণকুমারী নিজেই বোধ হয় অনতিদূর ভবিষ্যৎকালমধ্যে বঙ্গের প্রধান প্রধান গ্রন্থকারগণের মধ্যে মাননীয় আসন প্রাপ্ত হইবেন।

বঙ্গদর্শনে যাঁহারা বঙ্কিমবাবুর সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে সকলেই উৎকৃষ্ট লেখকশ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইয়াছেন। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়[১৫] বাংলাদেশের সর্বোৎকৃষ্ট ইতিহাস লিখিয়াছেন। তাঁহার কবিতাগুলিও মহীয়ান চিত্রসমূহে পরিপূর্ণ। ইংরেজি, সংস্কৃত সাহিত্যে যাহা-কিছু মহান সমস্ত তাঁহার কবিতায় আছে ; তাঁহার কবিতা বিশুদ্ধ, সদ্ভাবাবলীপরিপূর্ণ। বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার[১৬] তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী, 'সাধারণী'র [প্রথম প্রকাশ কার্তিক ১২৮০ ব.] সম্পাদক ; বঙ্গদর্শনে তাঁহার কতকগুলি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আছে। দশমহাবিদ্যা, গ্রাবু প্রভৃতি যে প্রবন্ধগুলি বঙ্গদর্শনের প্রথম অবস্থায় বঙ্গীয় পাঠকবর্গকে আমোদ ও শিক্ষাদান করিত, তাহার অনেকগুলি তাঁহার লেখনীপ্রসূত। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় [১৮৪৯-১৯২২ খৃ.] সময়ে সময়ে বঙ্কিমবাবুকে সহায়তা করিতেন, এক্ষণে তিনি বাংলার একটি মোহিনীময় রচনাপ্রণালীর জন্মদাতা ; তাঁহার লিখিত 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' [১২৮২ ব.] বহু-কালাবধি বঙ্গীয় যুবকদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিবে। বঙ্গদর্শনের আধুনিক লেখকদিগের মধ্যে সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [১৮৩৪-৮৯ খৃ.] একখানি উৎকৃষ্ট গদ্যকাব্য লিখিয়াছেন, বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে এক্ষণে তাঁহার প্রধান সহায় তাঁহার ভ্রাতা বঙ্কিমবাবু, আর চন্দ্রনাথবাবু[১৭]। চন্দ্রনাথবাবু চিন্তাশীল, তিনি বহু-কাল 'কলিকাতা রিবিউ'য়ের সমালোচক ছিলেন, এক্ষণে ইংরেজি ত্যাগ করিয়া বাংলা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি বঙ্গদর্শনে অভিজ্ঞানশকুন্তলের যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা ইউরোপীয় সমালোচনা হইতে কোনো অংশেই ন্যূন নহে। আমরা আর্যদর্শনের আর-একজন লেখকের কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। ইঁহার নাম ইন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় [ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৪৯-১৯১১ খৃ], ইনি এক্ষণে সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ, ইঁহার 'কল্পতরু' [১২৮১ ব.] ও 'ভারতউদ্ধার' [১২৮৪ ব.] না পড়িয়াছে বঙ্গীয় পাঠকের মধ্যে এরূপ

লোক অতি বিরল। ইঁহার ভারতউদ্ধার নামক mock heroic কাব্য অতুল্য পদার্থ। ইনি এক্ষণে 'পঞ্চানন্দ' [প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ১৮৭৮ খৃ] নামক রহস্যপূর্ণ সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক।

আমার প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু আমি সকলের নিকট আবার একটু ধীরতা ভিক্ষা করি। এই সময়ে আমরা আর-কয়েকটি লোকের কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। বাবু উপেন্দ্রনাথ দাস[১৮] দুইখানি উৎকৃষ্ট নাটক লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার নাটক দুইখানিতে ইয়ং বেঙ্গলের দোষ ও গুণের অতি সুচারু চিত্র দেওয়া আছে। বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত[১৯] 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' লিখিতেছেন, যতদূর আমরা পাইয়াছি, তাহাতে বেশ অনুভব করিতে পারি, বইখানি সম্পূর্ণ হইলে, বাংলায় একখানি অপূর্ব পাঠ্যগ্রন্থ হইবে। তাহার পর বাবু রাজকৃষ্ণ রায়[২০] নানাবিধ গ্রন্থ লিখিয়া নিজের অসাধারণ ক্ষমতার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন ও নিজ ভাষাকে যথেষ্ট পরিমাণে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের সংখ্যা নাই। সাহিত্য বিষয়ে তাঁহার অসীম মতলবের শেষ নাই, তাঁহার বয়স অল্প বোধ হয়, তিনি অনেক লিখিয়া যাইতে পারিবেন। আর সম্প্রতি কয়েকটি যুবক 'কল্পনা' [প্রথম প্রকাশ ১২৮৭ ব] নামক একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাদের যেরূপ দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় দেখিতেছি, তাঁহারা যে কৃতকার্য হইবেন, তাহার আর বিশেষ সন্দেহ দেখিতেছি না।

বাবু ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮৫৬-৯৭ খৃ.]। ইনি তিন-চারিখানি উৎকৃষ্ট পদ্যগ্রন্থ লিখিয়াছেন ; সম্প্রতি 'যোগেশ' [১৮৮১ খৃ] নামক অপূর্ব কাব্য সৃষ্টি করিয়া বাঙালির কৃতজ্ঞতা লাভের সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র হইয়াছেন। তাঁহার মন্দা ও নর্মদা স্ত্রীচরিত্রের চরমোৎকর্ষ।

শিবনাথ শাস্ত্রীর[২১] 'নির্বাসিতের বিলাপ' [১৮৬৮ খৃ.] একখানি সুপাঠ্য বাংলা কাব্য। তাঁহার 'পুষ্পমালা'য় [১৮৭৫ খৃ.] বহু-সংখ্যক উৎকৃষ্ট কবিতা আছে ; যে কবিতায় তিনি স্বদেশের জন্য আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহার ন্যায় উচ্চতর ভাবপূর্ণ কবিতা আর দেখি নাই।

মিস্টার আর. সি. দত্ত[২২] চারি-পাঁচখানি সুন্দর ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়াছেন। তিনি নানা জাতীয় উৎকৃষ্ট চিত্র লিখিয়া

বঙ্গবাসীকে আমোদ ও শিক্ষাদান করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে, আমরা প্রাচীন বাংলার উৎকৃষ্ট সমাজচিত্র দেখিতে পাই, তাঁহার ভাষা সুললিত এবং তাঁহার গ্রন্থাবলী সর্বজনমনোরম।

শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বসুর[২৩] নাটকগুলিও অতি সুপাঠ্য। এই-সকল নাটক পাঠে রুচি মার্জিত হয়, সমাজের জ্ঞান বৃদ্ধি হয় এবং অন্তঃকরণে নির্মল আনন্দের উদয় হয়।

আর-দুইখানি গ্রন্থের কথা এস্থলে বলা আবশ্যক। দুইখানিতে গ্রন্থকার নাম দেন নাই, একখানি 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' [প্রথম খণ্ড ১৮৬৯, দ্বিতীয় ১৮৮৪ খৃ], আর-একখানি 'স্বর্ণলতা'। বঙ্গাধিপ পরাজয়ের গ্রন্থকার [প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, ১৮৪০-১৯২১ খৃ.] সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ বর্ণনায় যথেষ্ট ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন, উঁহার নরনারী চরিত্রগুলিও উত্তম। স্বর্ণলতা ইংরেজিতে যাহাকে নবেল বলে, বাংলায় সেইরূপ সর্বপ্রথম নবেল। বাঙালি সমাজের এরূপ সুন্দর চিত্র অতি বিরল।[২৪]

শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল চক্রবর্তীর [১৮৩৫-৯৪ খৃ.] কাব্যগুলি অতি সুন্দর। এত মিষ্ট কবিতা আমি কখনো পড়ি নাই। তাঁহার 'বঙ্গসুন্দরী' [১৮৭০ খৃ.] প্রত্যেক শিক্ষিতা রমণীর পাঠ করা উচিত। উহা পাঠ করিলে পুরুষেরও মন গলিয়া যায়। রমণীর মন অতি রমণীয় হইয়া উঠিবে তাহাতে কি সন্দেহ আছে? তাঁহার 'সারদা-মঙ্গল' [১৮৭৯ খৃ.] রমণীয় সৌন্দর্যের উদ্দাম বিকাশ।

হরলাল রায়ের 'হেমলতা' [১৮৭৩ খৃ.] বঙ্গীয় পুস্তকালয়ে স্থান পাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। যে-সকল গুণ থাকিলে নাটক হয়, তাহা উহাতে ভূরি পরিমাণে পাওয়া যায়।

'উদাসিনী' [১৮৭৪ খৃ.] নামে বাংলায় একখানি মিষ্ট, সুরস, করুণরসপূর্ণ কাব্য আছে। গ্রন্থকারের নায়ক-নায়িকা মিলনের সুখ-ভোগে অকৃতকার্য হইয়া যোগী ও যোগিনী হইয়াছেন। গ্রন্থকার নাম দেন নাই, কিন্তু আমরা তাঁহাকে জানিতে পারিয়াছি। [অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, ১৮৫০-৯৮ খৃ.]

আমরা এই বঙ্গীয় লেখক সমালোচনার সর্বশেষে 'পুষ্পাঞ্জলি'র সমালোচনা করিয়া মধুরেণ সমাপয়েৎ করিব। পুষ্পাঞ্জলি বঙ্গভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট মহাগ্রন্থ। ইহার ভাষা সংস্কৃতানুকরণ ভাষার

সর্বোৎকৃষ্ট। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা তাঁহার নিজের। রামগতি ন্যায়রত্ন [১৮৩১-৯৪ খৃ.] মহাশয়েরও ভাষা তাঁহার নিজের। কিন্তু ভূদেববাবুর ভাষা প্রাচীন ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও কথক সমাজে যে ভাষা কথিত হইত, তন্মধ্যে যাহা-কিছু মহীয়ান ছিল, সে সমুদয়ের সারসংগ্রহ, অনুকরণাতীত। ইহার ভাবাবলী বঙ্গবাসীর অস্থিমজ্জায় গ্রথিত থাকা উচিত। পুষ্পাঞ্জলি একখানি অদ্ভুত পদার্থ। ভূদেববাবুর 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' [১৮৫৭ খৃ] বাংলায় ইংরেজিওয়ালার লিখিত প্রথম উপন্যাস।

আমরা আর-অধিক লোকের গ্রন্থ সমালোচনা করিয়া সকলের অধীরতা বৃদ্ধি করিতে চাহি না। আমরা যাহা লিখিয়াছি, তাহাতে দেখা যাইবে চিহ্নিত সিবিল সর্বান্ট হইতে সামান্য স্কুল মাস্টার পর্যন্ত বাংলা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আগে লোকে ইংরেজি লিখিত, কিন্তু আধুনিক যুবকগণ ইংরেজি পড়িয়া বাংলা লিখিতে আরম্ভ করিতেছেন। অনেকে ইংরেজি লেখায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াও বাংলা আরম্ভ করিতেছেন। ক্রমে লোকের সংস্কার দাঁড়াইতেছে যে নানা ভাষা শিখিব, নানা দেশ দেখিব, কিন্তু লিখিব নিজ ভাষায়। ইহার প্রমাণ ভারতীতে প্রকাশিত নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের[২৫] পত্রখানি। তাঁহার পত্রাদি বাংলায় লিখিত, তাঁহার মন বাংলার জন্য আকুল। তিনি সেন্টপিটর্সবর্গ হইতে যখন বাংলা ভাষায় বাঙালির জন্য কাঁদিয়াছেন, তখন আর এ কথার বিশেষ প্রমাণ দিবার প্রয়োজন নাই। যখন সকল অবস্থাপন্ন, সকল ব্যবসায়ী লোকের মধ্যেই সাহিত্যানুরাগ প্রকাশ করিতেছে, তখন সাহিত্যের যে মহতী শ্রীবৃদ্ধি অচিরাৎ সাধিত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই।

এখনো একটি কথা বাকি আছে। যে-কেহ বাংলা সাহিত্য লিখিতেছেন, তাঁহারই অন্য ব্যবসায় আছে, কেহ চাকুরি করেন, কেহ জমিদার, কেহ উকিল, কেহ ব্যবসায় করেন অথচ পুস্তক লিখেন ; অতএব সকলেই amateur ; কিন্তু সাহিত্যের প্রকৃত উন্নতি করিতে হইলে, সাহিত্য একটি ব্যবসায় হওয়া চাই, আজিও তাহা দাঁড়ায় নাই ; এখনো শুদ্ধ সাহিত্য-ব্যবসায় করিয়া কেহ জীবননির্বাহ করিতে পারেন না। যাহাতে সাহিত্য ব্যবসায় হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা করা একান্ত

আবশ্যক। আমার বোধ হয়, বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত ও বাবু রাজকৃষ্ণ রায় ভিন্ন আর কেহই শুদ্ধ সাহিত্যের উপর জীবিকার জন্য নির্ভর করেন না। কিন্তু এরূপ অবস্থা অধিক দিন থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। আজিও গবর্নমেন্টের চাকুরিতে লাভ আছে, আজিও একজন ভালো গ্রাজুয়েট গবর্নমেন্ট চাকুরিতে যাইবামাত্র অন্তত ৭৫ কি ১০০ টাকা পাইতে পারেন। যতদিন সাহিত্য-ব্যবসায়ে প্রথম হইতেই ইহা অপেক্ষা অধিক লাভ না দেখাইতে পারে, ততদিন উৎকৃষ্ট শিক্ষিত লোক সাহিত্য-ব্যবসায়ে সর্বপ্রযত্নে পরিশ্রম করিতে চাহিবে না। এই নূতন সমাজে সমস্ত ইউরোপীয় প্রাচ্য পাশ্চাত্য সাহিত্যরাশি উদ্‌ঘাটিত হইয়াও যে বঙ্গীয় সাহিত্যের আজিও আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই, তাহার কারণ স্বাধীন সাহিত্য-ব্যবসায় না থাকা। আমাদের দেশে উৎকৃষ্ট পাঠ্যগ্রন্থ যে কেন অনবরত বাহির হয় না, যাহাও বাহির হয়, তাহাও দেরিতে দেরিতে হয়, ইহার প্রধান কারণ এই যে, পুস্তকরচনা ব্যবসায়ান্তরাবলম্বী গ্রন্থকারদিগের খুশি ও অবসরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। সাহিত্য জন্মিয়াছে, জন্মিতেছে ও জন্মিবে, কিন্তু যতদিন সাহিত্য ব্যবসায় না হইবে, profession না হইবে, ততদিন সাহিত্যের বদ্ধমূলতা হওয়া অসম্ভব। সাহিত্য-ব্যবসায় করিতে হইলে, আমাদিগের কী করিতে হইবে? কোনো ভালো নূতন পুস্তক বাহির হইলেই যদি সেগুলি কতক কতক বিক্রয় হইবার নিশ্চয় সম্ভাবনা থাকে; এবং সাহিত্যের গুণাগুণ পরীক্ষা করিতে পারে, এরূপ লোকের সংখ্যা অধিক হয়: যদি গ্রন্থের বহুল প্রচারের জন্য গ্রন্থকারগণকে অলস, মৎসর, ব্যঙ্গপ্রিয় সমালোচকের লেখনীর উপর নির্ভর না করিতে হয়, আর বহু-সংখ্যক লাইব্রেরি থাকে, যাহাতে সকল-প্রকার গ্রন্থই ক্রীত হয়, তাহা হইলে শীঘ্র শীঘ্রই সম্যক উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। এ বিষয় আমরা এক পরিবারের গুণের কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না; সে কলিকাতার ঠাকুরবাড়ি। শোভাবাজারের রাজবাড়ি যেমন ভট্টাচার্যদিগের উৎসাহদাতা, ঠাকুরপরিবারও তেমনি এই নবাঙ্কুরিত সাহিত্যের উৎসাহদাতা হইয়াছেন। নূতন সাহিত্য প্রচারের সময় অন্যান্য প্রসিদ্ধ পরিবারগণ যদি উৎসাহ দিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে স্বাধীন সাহিত্য-ব্যবসায় অচিরাৎ প্রবর্তিত হইতে পারে। সাবিত্রী লাইব্রেরির ন্যায় লাইব্রেরির সংখ্যা বাড়িয়া গেলে,

লেখকগণ স্বাধীন ব্যবসায়ে প্রবর্তিত হইলে, বঙ্গীয় সাহিত্যের যে অদ্ভুত উন্নতি হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। আমাদের সাহিত্যের প্রকাণ্ড ভাণ্ডার অচিরাৎ প্রস্তুত করিবার যেমন আশ্চর্য সুবিধা হইয়াছে এমন অল্প জাতির ভাগ্যে ঘটে। আমাদের দেশে যে-কোনো নবোৎসাহ জন্মাক, সকলেই সাহিত্যের উন্নতি হইতেছে; ব্রাহ্মদিগের নবোৎসাহে সাহিত্য-সংখ্যা যে কত বৃদ্ধি করিতেছে তাহা বলা যায় না। ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে সে সাহিত্যের বিষয় বড়ো কেহ অবগত নহেন। তাহার পর ইংরেজি আমাদের bread-winning language, আমাদের ইংরেজি পড়িতেই হইবে। সুতরাং ইংরেজি পড়ার দরুন আমাদের সাহিত্যের যে উন্নতির সম্ভাবনা তাহা একপ্রকার চিরস্থায়ী বলিতে হয়। তাহার পর আমাদের এত বিদ্যানুরাগের সময় সংস্কৃত এখনো অনেকে পড়িবে, প্রাচীন আর্য-ভাষা কোনো বাঙালি অবজ্ঞা করিতে পারিবেন না; সুতরাং সংস্কৃত পাঠ হেতু সাহিত্যের যে উন্নতি হইবার সম্ভাবনা সেও চিরস্থায়ী। এখন কেবল চিরস্থায়ী সাহিত্যমাত্র ব্যবসায়ী একদল লেখক চাই, তাহা হইলে আমরা অল্প দিনে পৃথিবীর আর-সমস্ত সাহিত্যকে কানা করিয়া দিতে পারিব। সকলকে হারাইয়া দিতে পারিব। যাহা এই বিশ বৎসরের মধ্যে হইয়াছে, অন্য দেশে তাহা দুই শত বৎসরে হয় না। আরো বিশ বৎসরে ইহা অপেক্ষা আরো অধিক হইবে, নিশ্চয়; কারণ, লেখকদিগের মধ্যে অধিকাংশই অল্পবয়স্ক, ইঁহাদের বয়োবৃদ্ধিসহকারে লেখার গুণও অধিক হইবে, আর সংখ্যাও অধিক হইবে। সাময়িক পত্রিকাগণ প্রতি বৎসরই দুই-একটি করিয়া লেখক তৈয়ারি করিয়া ছাড়িয়া দিতেছে: এই-সকল লেখক যাহাতে গবর্নমেন্ট বা অন্য সার্বিসে না গিয়া কেবল সাহিত্য লইয়া কাল কাটাইতে পারে, তাহার যোগাড় করিয়া দিলেই বাংলা সাহিত্যের জয়ধ্বনি পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইবে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি পৃথিবীমধ্যে এক মহা-জাতি বলিয়া পরিগণিত হইবে। অনেকে বলেন বঙ্গভাষার অবস্থা বড়ো হীন; কিন্তু এই বঙ্গীয় লেখকমণ্ডলীমধ্যে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের কথায় সায় দিতে পারি না।

বাংলা সাহিত্যের অবস্থা শোচনীয় নহে। যখন প্রতি তিন মাসে পাঁচ-ছয় শত নূতন পুস্তকের রেজিস্টারি হয়; যখন এক কলিকাতায়

পাঁচ শত প্রেস অনবরত চলিতেছে ; যখন উচ্চ, নীচ, বড়ো, ছোটো, ধনী, নির্ধন সকলেই বাংলা লিখিবার ও পড়িবার জন্য উৎসুক, তখন বাংলা সাহিত্যের অবস্থা শোচনীয় নহে। আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, বঙ্গীয় সাহিত্যের পরিণাম অতি শুভকর, বঙ্গীয় সাহিত্যের উন্নতি অনন্ত ও উন্নতিকাল সমাগত। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, শত শত ভাবী লেখক, ভাবী প্রতিভাশালী লোক উদয় হইতেছেন; আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, শত শত মহাকাব্য বঙ্গবাসীকে আনন্দে ভরাইয়া ভাষান্তরিত হইয়া দেশদেশান্তরস্থ পণ্ডিতবৃন্দকে আনন্দে মগ্ন করিতেছে। আমার কর্ণে কত ভবিষ্যৎবাণীর ও বীণার প্রতিঘাত লাগিতেছে তাহা বলিতে পারি না। এই-সকলের পশ্চাতে আমি দিব্য-চক্ষে দেখিতেছি, একটি গৌরবান্বিত মহা-শক্তিমান মহাজাতি সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় উত্থিত হইয়া কৃতজ্ঞতাসহকারে বর্তমান পুরুষের মহামহো-পাধ্যায়গণের গুণগান করিতেছে ; আর মহা-আনন্দভরে দেবনির্বিশেষে বর্তমান নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষী মহোদয়দিগকে পূজা করিতেছে।

'সাবিত্রী'
আশ্বিন, ১২৯৩ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. সূত্র

১২৮৭ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যা 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় (পৃ. ৪৮৯-৫১২) এই প্রবন্ধ প্রথম প্রকাশিত হয়। পাদটীকায় উল্লেখ ছিল, "সাবিত্রী লাইব্রেরীর বাৎসরিক উপলক্ষে শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই প্রস্তাবটি পাঠ করিয়াছিলেন।" ১২৮৮ বঙ্গাব্দে দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হয় পুস্তিকা আকারে, "বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত, কাঁটালপাড়া, শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।"

"বিখ্যাত সাবিত্রী লাইব্রেরীতে ছয় বৎসরের অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধাবলী এবং সাবিত্রী লাইব্রেরী হইতে পুরস্কারপ্রাপ্ত নারী-রচনা"র একটি সংকলন 'সাবিত্রী' নামে প্রকাশিত হয় ১২৯৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে। প্রকাশক গোবিন্দলাল দত্ত। সাবিত্রীতে সংকলিত বর্তমান প্রবন্ধটির প্রথম পৃষ্ঠার পাদটীকায় উল্লেখ ছিল, "৩০শে চৈত্র সন ১২৮৭ সালে সাবিত্রী লাইব্রেরীর দ্বিতীয় বাৎসরিক অধিবেশনে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক এই প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল।" প্রথম প্রকাশের ছয় বছর পরে সাবিত্রীতে সংকলনের সময়ে লেখাটিতে শাস্ত্রীমশায় কিছু পরিবর্তন-সংযোজন করেন। ভূমিকায় প্রকাশক বলেন, "ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য যে বৎসরে লিখিত হয়, তাহার পর এই কয় বৎসরের মধ্যে কয়েক জন বিখ্যাত লেখক জন্মিয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান লেখক ও কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখিকা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। ইঁহাদের পুস্তক-সমালোচনা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইল। এবং বক্তৃতা কালে বাঙ্গালা ভাষার একজন প্রধান নাটককার শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু ও প্রথমশ্রেণীর কবি শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর বিষয়ে উল্লেখ করিতে ভুল হওয়ায় এবারে সে ভ্রম সংশোধিত হইয়াছে। আর, এই প্রবন্ধ-লেখক পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একসময়ে বঙ্গদর্শনের ডান হস্ত ছিলেন; ইহার লেখকগণের প্রশংসা করিতে গিয়া তিনি যে নিজ প্রশংসায় বিরত হইয়াছেন, সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র।" (প্রকাশকস্য ভূমিকা: সাবিত্রী। পৃ. ৵০)

বর্তমান মুদ্রণে সাবিত্রীর পাঠ নেওয়া হয়েছে। উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনগুলি পাঠ-প্রসঙ্গে দেখানো হল।

১৮৮৬ থেকে ১৮৯৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত শাস্ত্রীমশায় বেঙ্গল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক ছিলেন। এই সময়ে তিনি যে বাৎসরিক বিবরণগুলি লেখেন তাতে এ প্রবন্ধে আলোচিত লেখকদের অনেকের নতুন প্রকাশিত বই সম্পর্কে মন্তব্য পাওয়া যায়। প্রাসঙ্গিক মন্তব্য সংকলন করে দেওয়া হল।

১. মহীশূরের সুলতান। রাজত্বকাল ১৭৮৩-৯৯ খৃ.। দুই বৎসর ব্যাপী তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের অবসান হয় মার্চ ১৭৯২ খৃ.। টিপু লর্ড কর্নওয়ালিসের সঙ্গে সন্ধি করেন। এই পরাজয় তিনি মেনে নেন নি। আবার ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন এবং নিজের শক্তি বাড়াবার চেষ্টা চালান। চূড়ান্ত সংঘর্ষে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধে শ্রীরঙ্গপট্টনমের প্রাকারের সামনে তাঁর মৃত্যু হয় ৪মে ১৭৯৯ খৃ.। স্বাধীন-চেতা, বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্ এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমদর্শী সুলতান সম্পর্কে ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা যে কলঙ্ক রটিয়েছিল, পরবর্তী গবেষণায় তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। সেকালের ইংরেজ ঐতিহাসিকদের প্রভাবে শাস্ত্রীমশায় টিপু সুলতান সম্পর্কে এমন বিরূপ মন্তব্য করেছেন।

২. Earl (Marquess) Cornwallis (১৭৩৮-১৮০৫ খৃ.) সেপ্টেম্বর ১৭৮৬ থেকে সেপ্টেম্বর ১৭৯৩ খৃ. পর্যন্ত বাংলার গবর্নর জেনারেল ছিলেন। জমির খাজনা আদায়ের ব্যবস্থায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করেন ২২ মার্চ ১৭৯৩ খৃ.। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য ছিল সরকারের প্রাপ্য খাজনা আদায় নিশ্চিত করা এবং অনুগত জমিদারশ্রেণী সৃষ্টি করে সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় করে তোলা। এই ব্যবস্থায় জমির উপরে চাষির স্বত্ব লোপ পায় এবং তাদের চিরস্থায়ী দুর্দশার সূত্রপাত হয়। অন্য একটি প্রবন্ধে শাস্ত্রীমশায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "পারমানেণ্ট সেট্‌লমেণ্ট যদি চুক্তি হয় তবে উহা চোরের চুক্তি আইনমতে উহার কোনো মূল্য নাই।... উহা কি যথেচ্ছাচার প্রণালীর চূড়ান্ত নিদর্শন নহে? তাহা হইলে এক কলমের ঘায় ৩ কোটি প্রজার সমস্ত জমিস্থ স্বত্ব কাড়িয়া লইয়া জন কতক ধনী লোককে ভূমিতে নির্ব্যূঢ় স্বত্ববান্ বলিয়া স্বীকার করা, ঘোর মূর্খতার কর্ম হইয়াছে। এমন পারমানেণ্ট সেট্‌লমেণ্ট যত শীঘ্র উঠিয়া যায় ততই ভালো।"...

"দশশালা বন্দোবস্ত ১৭৯৩ খৃস্টাব্দে চিরস্থায়ী হইয়াছে। আজিও একশত বৎসর পূর্ণ হয় নাই; ইহারই মধ্যে খোদকস্ত রায়তের নাম

লোপ হইয়াছে। পরগনা নিরিখ যাহার অধিক খাজনা আদায় করা চিরদিন আইনবিরুদ্ধ— প্রথাবিরুদ্ধ এবং যুক্তিবিরুদ্ধ— জমিদারেরা উঠাইয়া দিয়াছেন। সর্বত্র আইনসঙ্গত হউক আর নাই হউক, খাজনার বৃদ্ধি লইয়া টানাটানি করিয়াছেন। তাঁহাদের জ্বালায় কত প্রজা দেশ-ত্যাগ করিয়াছে। কত স্থানে গৃহদাহ গ্রামদাহ করিয়া তাঁহারা প্রজাকে উৎখাত করিয়াছেন। স্থানে স্থানে তাহাদের প্রতি এতই অত্যাচার করা হইয়াছে যে, বঙ্গদেশীয় নির্জীব, নিরীহ প্রজাগণও আর সহ্য করিতে না পারিয়া বিদ্রোহী হইয়াছে। এই কি তাঁহাদের good faith and moderation ?" ('নূতন খাজানার আইন সম্বন্ধে কলিকাতা রিবিউ-এর মত', বঙ্গদর্শন, কার্তিক ১২৮৭, ৮ ও ১০ অনুচ্ছেদ।)

৩. Henry Pitts Forster (১৭৬১-১৮১৫ খৃ.) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাজে যোগ দেন ১৭৮৩ খৃস্টাব্দে। ত্রিপুরার কালেক্টর, দেওয়ানি আদালতের রেজিস্ট্রার, কলকাতা টাঁকশালের 'মাস্টার' প্রভৃতি পদে কাজ করেন। ফরস্টার সংকলিত *A Vocabulary in two parts, English and Bengalee and vice versa* ১৭৯৯-১৮০২ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কলকাতার 'Press of Ferris and Co.' থেকে ছাপা। এই অভিধানের উপরে নির্ভর করে উইলিয়ম কেরি তাঁর বিখ্যাত অভিধান *Dictionary of the Bengali Language* (১৮১৫-২৫ খৃ.) সংকলন করেন। ফরস্টরের আর-একটি বই *Essay on the Principles of Sanscrit Grammar* (১৮১০ খৃ.)।

৪. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের জীবৎকাল ১৭৬২-১৮১৯ খৃ.। জন ক্লার্ক মার্শম্যান তাঁকে 'a native of Orissa' বলেন। উইলিয়ম কেরির জীবনী-লেখক জর্জ স্মিথ বলেন, মৃত্যুঞ্জয় বাংলা ও ওড়িয়া ভাষায় সমান ব্যুৎপন্ন ছিলেন, ওড়িয়া ভাষায় তিনি বাইবেল অনুবাদ করেন। শাস্ত্রীমশায় এঁদের অনুসরণ করে মৃত্যুঞ্জয়কে ওড়িয়া বলেছেন। তাঁর জন্ম মেদিনীপুর জেলায়, তখন মেদিনীপুর ওড়িশা প্রদেশের মধ্যে ছিল। কিন্তু তিনি চট্টোপাধ্যায়-বংশজাত বাঙালি ব্রাহ্মণ। তাঁর 'রাজাবলী' বইটির পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন বেহারিলাল চট্টোপাধ্যায়, ইনি মৃত্যুঞ্জয়ের পৌত্র। বাইবেলের ওড়িয়া অনুবাদ করেন ওড়িয়া পণ্ডিত পুরুষরাম, মৃত্যুঞ্জয় নয়।

৫. রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় রচিত 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' ১৮০৫ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত।

রামরাম বসুর (১৭৫৭-১৮১৩ খৃ.) লেখা 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ১৮০১ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত।

৬. 'হুতোম পেঁচার নকশা' ১৮৬১ খৃস্টাব্দে প্রথম খণ্ড, দুই খণ্ড একসঙ্গে ১৮৬৪ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এতদিন জানা ছিল বইটি কালীপ্রসন্ন সিংহের (১৮৪০-৭০ খৃ.) রচনা, কিন্তু সম্প্রতি প্রমাণিত হয়েছে এই গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের লেখক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। দ্র. জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়, "হুতোমের 'মালিক' ও 'লিপিকর' ", সা-প-প, যুগ্মসংখ্যা, বৈশাখ-চৈত্র ১৩৭৬-৭৮ ব., পৃ. ৩৩-৪৬।

৭. এই প্রবন্ধ লেখার ঠিক আট বছর আগে প্রকাশিত হয়েছিল রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (প্রথম ভাগ ১৮৭২ খৃ.)। "তাহার আট বৎসর পরে কতই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে আমরা সেই সাহিত্যের আরো গর্ব করিব আশ্চর্য কী?" ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের পক্ষেই প্রাসঙ্গিক। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৭৪ পৃ.)-এর কথা যদি বলে থাকেন তাহলে সময়ের তফাত হয় ৬ বছর।

৮. ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের (১৮২৭-৯৪ খৃ.) 'সামাজিক প্রবন্ধ' এবং 'আচার প্রবন্ধ' সম্পর্কে বেঙ্গল লাইব্রেরির রিপোর্টে শাস্ত্রীমশায়ের মন্তব্য—

সামাজিক প্রবন্ধ (১৮৯২ খৃ.)

"...Babu Bhūdev Mukharji's *Sāmājik Prabandha*, though dull and weary reading, is written in a style in which language seems to be labouring under the burden of thought.... In the *Sāmājik Prabandha*, Babu Bhūdev Mukharji attempts to defend the social system of India, and to prove that the western theories of social and political organization are either fallacious, or that they do not apply to india. He considers the theory of the equality of man to be unnatural ; he believes that society is never destroyed. He does not believe that the King should represent

the supreme legislative, judicial and executive power in the State. He does not believe in the progressive theory of the world. He believes that to be a progressive society which has succeeded in creating the loftiest ideal, and in following that ideal with earnestness and devotion. Hindu society, he believes, obtained its loftiest ideal in its theory of *Naiṣkarma* (duty for its own sake) ; that theory gives to society a motive for unceasing good work, but at the same time prevents it from the taint of selfishness and consequent degeneration. The people of India, he says, are by nature peaceful, and their religious and social theories, based on *Naiṣkarma*, have made them still more peaceful, and it is preposterous to think that such a society should disappear altogether, or be absorbed in another, simply because hardier nations have, by sheer dint of physical power, obtained mastery over it. This is the sum and substance of what he says, and this he has worked out with great erudition and thoughtfulness. He has carefully noted how the supremacy of the Engligh in India has influenced Hindu society, and what future results that influence will lead to. With enthusiastic earnestness he has pointed out to his countrymen the good results which might come from contact with Europeans, and also warned them against evils which are likely to result from it. He has asked them to follow their *Shāstras* with a spirit of devotion, and not to imbibe the selfishness, the worldliness, and the utilitarianism of modern Furope. Excess of anglicism at this stage, he says, would be suicidal ; the author has in many instances, used very strong language against shallow and superficial theories, promulgated by Englishmen for

the so-called regeneration ofIndia. In one sense his book serves the same purpose of interpreting ancient India to modern Bengalis, as Babu Bankim Chandra's *Krishnacharitra* but in a much wider extent and more thorough manner, and his advice has a practical bearing." (*RBL.* 1892, p. 6.)

আচার প্রবন্ধ (১৮৯৫ খৃ.)

"The great agitation produced about twelve years ago by the so-called Hindu revival moment has come to an end, and at this moment quiet prevails. The first introduction of English education into Bengal produced a strong tendency towards Christianity. The tendency continued unabated for twenty years ; then there was a rage for Brāhmoism. The missionaries were deserted, and Brāhmo pulpits began to be thronged with eager listeners from amongst people receiving English education. Brāhmoism did not satisfy the religious wants of the educated, and in twenty years the Brāhmos split themselves up into three different churches. Then came the Hindu revival movement. Though the apostle of this movement was a Brāhman who never received English education, yet it was, in the main, supported by the educated classes. The late Babu Bankim Chandra tried to give them a Hindu religion that would be acceptable to them, but they did not accept it. Pandit Shashadhar Tarkachūrāmaṇi attempted to reconcile some of the orthodox notions with modern scientific ideas, and produced a confusion that bewildered men. During all these three great religious agitations the ancient learned Brāhmaṇ families kept quite aloof. They looked

on the storm that was raging all round, with indifference and a feeling akin to contempt. Now that the storm has abated, and silence and peace have resumed their reign, some of the genuine Bengal Pandits are making their voices heard. ...Babu Bhudev Mukherji's *Āchār Prabandha* is also written from the standpoint of the ancient Pandits of Bengal. It defends the *Āchāra* or discipline which a Brāhman used to undergo to enable him to lead a spiritual life. It would not be proper to speak of the *Āchāra Prabandha* here, as the work was published after the close of 1894. It is, however, much to be regretted that death prevented the learned author from completing his work in the way he wished." (*RBL*, 1894, pp. 6-7.)

৯. যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (১৮৪৫-১৯০৪ খৃ.) রচিত 'জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবন-বৃত্ত' (১৮৭৭ খৃ.) এবং 'ম্যাট্‌সিনির জীবন-বৃত্ত' (১৮৮০ খৃ.)।

১০. পূর্ণচন্দ্র বসু (১৮৪৪ খৃ.- ?) 'কাব্য-সুন্দরী' (১৮৮০ খৃ.) বইয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সূর্যমুখী, কুন্দনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মতিবিবি, শৈবলিনী প্রভৃতি নারী-চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাঁর লেখা অন্যান্য বই— 'সাহিত্য-চিন্তা' (১৮৯৬ খৃ.), 'কাব্য-চিন্তা' (১৯০০ খৃ.), 'সমাজ-তত্ত্ব' (১৯০১ খৃ.), 'হিন্দুধর্মের প্রমাণ' (১৯০৩ খৃ.), 'সৃষ্টি বিজ্ঞান' (১৯০৪ খৃ.), 'ফলশ্রুতি' (১৯০৭ খৃ.), 'ব্রজদর্শন' (১৯৩৩ খৃ.)। মহেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে লেখেন 'সমাজ-চিন্তা' (১৮৮২ খৃ.)।

১১. দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪০-১৯২৬ খৃ.) 'আর্য্যামি ও সাহেবিআনা' (১৮৯০ খৃ.) সম্পর্কে বেঙ্গল লাইব্রেরির রিপোর্টে শাস্ত্রীমশায়ের মন্তব্য—

"*Aryyāmī O Sāhebiyānā*, Hindu bigotry and Anglicism, is the title of an essay by Babu Dvijendra Nāth Tagore, in which he disapproves of the conduct of the extreme sections both of Hindu

revivalists and of friends of progress. He thinks that there is much to learn from each, and that the union of the two is likely to lead to beneficial results for India." (*RBL*, 1891, p. 12.)

১২. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪৯-১৯২৫ খৃ.) লেখা 'পুরুবিক্রম নাটক' (১৮৭৪ খৃ.) ও 'সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক' (১৮৭৫ খৃ.) ।

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১ খৃ.) 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' ১২৯১ বঙ্গাব্দে থম প্রকাশিত হয় এবং 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' প্রকাশিত হয় ১২৮৮ বঙ্গাব্দে। 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র প্রকাশকাল ১২৮৭ বঙ্গাব্দ। বিদ্বজ্জন-সমাগম সভার ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে ১৬ ফাল্গুন ১২৮৭ ব., ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৮১ খৃ. জোড়াসাঁকোর বাড়ির তেতলার ছাদে প্রথম অভিনয় হয়। ১৯ বছরের রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকির এবং তাঁর ভাইঝি, হেমেন্দ্রনাথের ৫ বছরের মেয়ে প্রতিভা সরস্বতীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই অভিনয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। হরপ্রসাদের 'বাল্মীকির জয়'-এ এই গীতি-নাট্যের প্রভাবের কথা বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ করেছেন। দ্র. হ-র-সং-১. পৃ. ৫৬১।

রবীন্দ্রনাথের অন্য কয়েকটি বই সম্পর্কে বেঙ্গল লাইব্রেরির রিপোর্টে শাস্ত্রীমশায়ের মন্তব্য—

মায়ার খেলা (১২৯৫ ব.) ও রাজা ও রানী (১২৯৬ ব.)।

"Babu Ravīndra Nāth Tagore soars far above these realistic scenes of every-day life into the ethereal regions of love and adventure. In his *Māyār Khelā*, he paints a moody youth wandering all over the world in quest of love and returning home disappointed. The lady who loves him watches his movements unseen, and at last succeeds in winning his affections. The fairy beings, named *Māyā Kumārīs*, introduced for the first time into the Bengali drama in imitation of similar beings in Shakespeare, appear on the stage in evey scene, and direct the action of the play like the witches in Macbeth.

"*Māyār Khelā* is, however, a short work, and it is followed by a more ambitious work entitled *Rājā o Rānī.* The scenes are laid in the beautiful regions in and about Cashmere in the Middle Ages, when Rajput chivalry was at its highest. *Rājā o Rānī* has more flesh and blood, more circumstance and detail, than the previous works of Babu Ravīndra Nāth, and the interest is sustained throughout. With the increase of age and experience, Ravīndra Babu's works are becoming replete with human interest. His dramas when performed before a select audience by the members of his own family produce a powerful effect, but they are generally meant for the cultured few. They are never enacted in public theatres, and are not likely to be appreciated by their audience. *Rājā-o-Rānī* gives the history of a great revolution in which the relatives of the Queen, by their oppression and foreign manners, goad the people of Jalandhar to rebellion, while their king, enamoured of his queen, does not pay any heed to their complaints. The queen coming to know the real cause of the rising, invokes the aid of her heroic brother, and drives from Jalandhar those of her relatives who are prone to oppression. But the introduction of a foreign prince, however nearly related, is too much for the king to bear. He chases the queen's brother and the queen out of his kingdom, and out of Cashmere, her native land. They take refuge in a forest, and the king, stung with remorse, offers them terms of peace, which they accept. At the time of the appointed interview, however, the queen comes out of her palankin, bearing the head of her brother who has committed suicide at the thought of sub-

mission, and presenting it to her husband, falls down and dies. This is, in short, the plot of his work, and it fully shows the peculiarities of Rajput character, their pride, obstinacy, and heroism, their indolence in times of peace, and the keen sense of honour that will not allow them even to think ,of submission." (*RBL*, 1889, p. 2.)

বিসর্জন (১২৯৭ ব.)

"...*Bisarjan*, by Babu Rabīndra Nāth Tagore, is written with consummate art. In this work the Babu has dramatized the first few, that is, the best chapters of his wellknown novel, the *Rājarshi* ; but the plot of the drama is a great improvement upon that of the novel. A good man, Govinda Māṇikya, the Raja of Tippera, is here exhibited as surrounded by enemies, open and secret, without his caring anything about them. The sight of blood had frightened one of his favourite little boys, and he prohibited animal sacrifices of all sorts in his kingdom. The priests raise the standard of rebellion, his brothers, his ministers, and even his queen joined the priests, and yet the king was inexorable. His Generals put down the rebellion with promptitude, but it was found out at last that the goddess before whom the animals were to be sacrificed did not exist, and the king is reconciled to his queen and his family. The book is designed to prove the truth of Brāhmoism as opposed to idolatry, and the writer has attempted to show this with great cleverness." (*RBL*, 1891, p. 3.)

মানসী (১২৯৭ ব.)

"*Nirmālya*, by Miss Kāminī Sen and *Mānasī*, by Babu Ravīndranāth Tagore, are two collections of

occasional pieces by two distinguished poets of Bengal. They are on a par as regards melody of versification, sweetness of language, and purity and depth of sentiment." (*RBL*, 1891, p. 14.)

গোড়ায় গলদ (১২৯৯ ব.) ও (চিত্রাঙ্গদা ১২৯৯ ব.)

"...The other work is *Goḍāy Galad*, by Babu Ravīndra Nāth Tagore. The oddities and eccentricities of educated Bengalis is the theme of the work. The hero Nimai loved a girl, but did not know her by her proper name ; and the girl loved Nimai, but did not know him by his proper name. They are anxious to marry each other, and their fathers are also anxious to get them married. But there was a difficulty at the outset. The boy gives the girl's name, and nobody knows who she is, and the girl gives the boy's name, and nobody knows who he is. This produces infinite amusement, and the author, with a cleverness and dexterity which is his own, takes advantage of every opportunity of entertaining his audience.

"*Chitrāngadā* by the same author, though based on the Mahābhārata, is a work of a superior nature. It is a love story of great merit. The characters are only two, besides two gods, those of Love and Spring, who occasionally appear on the stage. It teaches that once, and only once in life, love influences the human mind and makes it anxious for beauty which it gets and enjoys. The price of the work is Rs. 5 per copy, as it is accompanied with neat illustrations by Babu Avanīndra Nāth Tagore, a nephew of the author." (*RBL*, 1892, pp. 2-3.)

য়ুরোপ-যাত্রীর পত্র (ডায়ারি ১২৯৮ এবং ১৩০০ ব.)

"*Yurop Yātrīr Patra* is written in the charmingly

melodious prose of Babu Ravīndra Nāth Tagore." (*RBL*, 1893, p. 9.)

ছোট গল্প (ফাল্গুন ১৩০০ ব.)

"...*Chhotagalpa* is a collection of small but very touching stories by Babu Ravīndra Nāth Tagore. It is also written in support of the same movement [reform movement]. Some of these stories will be enjoyed by the orthodox and the non-orthodox community alike." (*RBL*, 1894, p. 2.)

১৪. বেঙ্গল লাইব্রেরির রিপোর্টে স্বর্ণকুমারী দেবীর (১৮৫৫-১৯৩২ খৃ.) আরো তিনটি বই সম্পর্কে শাস্ত্রীমশায়ের মন্তব্য আছে।

গল্পস্বল্প (১৮৮৯ খৃ.)

"...*Galpa Svalpa,* by Mr. Tagore's [সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর] sister, the distinguished Svarnakumārī Devī, though designed for students of our schools, is pervaded by such a pure and elevated moral atmosphere that grown-up people may use it with profit as a moral text-book. It contains a number of interesting anecdotes of original composition, written in simple and engaging Bengali, imparting lessons of the highest morality." (*RBL*, 1889, p. 7.)

বিদ্রোহ (১৮৯০ খৃ.)

"...The historical novels of the year embrace a much wider range of subjects than in previous years. ...In *Bidroha* Svarnakumārī Devī draws her materials from her favourite work, the Annals of Rajasthan by Tod." (*RBL*, 1891, pp. 4-5.)

স্নেহলতা (১৮৯০ এবং ১৮৯৩ খৃ.)

"...*Snehalatā* and *Adrishta* are the productions of two distinguished Bengali novelists, though these

works will not add much to their reputation. Svarna-kumārī Devī's *Snehalatā* will be liked by female readers who love to dwell upon and appreciate minute details of household affairs. The description of the housewife's bed-room is the best chapter in the work, and none but a female could have written it." (*RBL*, 1892, p. 3.)

১৫. এই বইয়ের পৃ. ৮ দ্র.।

১৬. এই বইয়ের পৃ. ১৩৫-৩৬ দ্র.।
'দশমহাবিদ্যা', বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১২৮০ ব. দ্র.।
'গ্রাবু', বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১২৭৯ ব. দ্র.।

১৭. চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪-১৯১০ খৃ.) *Bengalee* ও *Calcutta Review* পত্রিকার লেখক ছিলেন। *Calcutta Review*-এ কৃষ্ণকান্তের উইলের সমালোচনা করেন (1879, No. 137, pp. xix-xxiv)। এই সমালোচনা পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে বঙ্গদর্শনে লিখবার জন্যে অনুরোধ করেন। ১২৮৭র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকে তাঁর 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' আলোচনা প্রকাশ শুরু হয়। প্রবন্ধগুলি সংশোধন করে 'শকুন্তলাতত্ত্ব' বইয়ে প্রকাশ করেন ১৮৮১ খৃস্টাব্দে।

বেঙ্গল লাইব্রেরির রিপোর্টে তাঁর চারখানি বই সম্পর্কে শাস্ত্রী-মশায়ের মন্তব্য—

প্রথম নীতিপুস্তক

"...Several good school-books have been published during the year. Of these, *Bhīshma Charita*, by Babu Rajani Kānta Gupta, *Pratham Nīti Pustak*, by Babu Chandra Nāth Basu, and *Sunīti Sandarbha*, by Pandit Chandrodaya Vidyāvinod, may be mentioned as much above the average merit. They have all been considered good moral text-books, and all teach right conduct as opposed to expediency. The word for morals being *nīti* in Bengali, and the word *nīti*

including both *Rājnīti* and *Dharmanīti, i.e.,* politics and morals, Bengali writers often confounded the two things together, and while professing to write on morality, really discoursed on politics and expediency. They have now come to a clearer understanding of the subject." (*RBL*, 1891, p. 8.)

সাহিত্য পুস্তক

"The action of the Central Text-Book Committee in unsparingly rejecting bad books has encouraged the production of many good school-books. Of these, *Sāhitya pustaka*, by Babu Chandra Nāth Basu... are worthy of special notice." (*RBL*. 1893, p. 6.)

হিন্দুত্ব (১৮৯২ খৃ.)

"*Hindutva*, by Babu Chandra Nāth Basu, is one of the most remarkable books of the year. The object of the work is to differentiate Hinduism from all other religions of the world. He has pointed out with some force that Hinduism is a singular system of religion, and that it differs from all others in the very first articles of faith. It believes in the theory of metempsychosis, a theory unknown to the Semitic religions. The theory of *Karma*, *i.e.*, man's responsibility for his own actions, is also peculiar to Hinduism. It does not believe in the mediation of a saviour— none can save man but himself. In the idea of salvation also it differs from all other creeds. Salvation, according to the Hindus, means exemption from the liability to metempsychosis. What remains after such liberation is also explained in a manner peculiar to the Hindus. It believes that the liberated soul is absorbed in the Deity. The notion

of the Deity is also peculiar. He is not a personal God dispensing justice, and alternately becoming angry and pleased with those who are its objects. He is, according to the idea of the Hindus, the very universe itself. All that we see and feel is illusion ; the reality, the *noumenon*, is He. Salvation is obtained by the knowledge of truth, *i.e.*, the knowledge of the *noumenon* as opposed to the knowledge of the *phenomenon*. *Karma* is all powerful, except as against the knowledge of truth, which destroys it as fire destroys fuel. (*RBL*, 1893, p. 6.)

নূতন পাঠ

"Of educational works, Babu Chandra Nāth Basu's *Nūtan Pāth* is a very good work. It is very methodically arranged. The subject, the language, and the method are calculated to suit the requirements of the students of lower primary schools. (*RBL*, 1894, p. 4.)

১৮. ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশকে বাংলা থিয়েটার জগতের অন্যতম প্রধান সংগঠক উপেন্দ্রনাথ দাস (১২৫৫-১৩০২ ব.)। দুর্গাদাস দাস ছদ্মনামে লেখা তাঁর 'শরৎ-সরোজিনী নাটক' (১৮৭৪ খৃ.) ও 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী নাটক' (১৮৭৫ খৃ.) গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ও দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটারে অনেকবার অভিনয় হয়। উপেন্দ্রনাথ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের ডিরেক্টর ছিলেন। জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় সপ্তম এডওয়ার্ডকে (তখন প্রিন্স অব ওয়েল্‌স) বাড়িতে নিয়ে অভ্যর্থনা করানোয় (জানুয়ারি, ১৮৭৬ খৃ.) গ্রেট ন্যাশনাল 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' নামে এক ব্যঙ্গনাটক মঞ্চস্থ করেন (১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬ খৃ.)। এই অপরাধে ৪ মার্চ অন্য একটি নাটকের অভিনয় চলার সময়ে পুলিস অন্যান্যদের সঙ্গে উপেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করে।

১৯. রজনীকান্ত গুপ্তর (১৮৪৯-১৯০০ খৃ.) 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' পাঁচ ভাগে ১৮৭৯-১৯০০ খৃস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়। পঞ্চম ভাগ

লেখকের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছিল। বেঙ্গল লাইব্রেরির রিপোর্টে তৃতীয় ভাগ সম্পর্কে শাস্ত্রীমশায়ের মন্তব্য—

"...The other historical work of any importance is in Bengali by Babu Rajani Kānta Gupta. It is the third volume of his well known work '*Sipāhijuddhēr Itihās*'. The writer is indebted for the materials of his work entirely to English writers on the Sepoy war, but he defends Nānā Sāhib, not on public, but on personal grounds. He throws the entire blame on his Muhammadan adviser, Azim-ud-dawlah, and his relatives Bābā Bhat and others. The Nānā, he says, was neither cruel nor disposed to take up arms against the English." (*RBL*, 1892, p. 4.).

২০. রাজকৃষ্ণ রায়ের (১৮৪৯-৯৪ খৃ.) প্রহসন সম্পর্কে বেঙ্গল লাইব্রেরির রিপোর্টে শাস্ত্রীমশায়ের মন্তব্য—

"*Lobhendra Gabendra*, *Jagāpāglā*, *Tāṭkā Toṭkā* and *Juju* are four satirical farces by Babu Rāj Krishna Rāy, who is regarded as the Lope de Vega of Bengal. The humour of these works is often pointless." (*RBL*, 1891, p. 3.)

২১. শিবনাথ শাস্ত্রীর (১৮৪৭-১৯১৯ খৃ.) 'ছায়াময়ী-পরিণয়' (১৮৮৯ খৃ.) সম্পর্কে বেঙ্গল লাইব্রেরির রিপোর্টে শাস্ত্রীমশায়ের মন্তব্য—

"*Chhāyāmayī-Pariṇaya*, by Pandit Shivanāth Shāstri, is an allegory on a spiritual subject. It traces the gradual development of a mind in matters spiritual. Chhāyāmayī is the daughter of an old man fond of the world, and she is brought up in the ways of the world. The old man wants to marry her to a young man of suitable rank, but she sees a vision of glory and offers herself up to the service of the great Being who thus manifests Himself to her.

She escapes before the day fixed for the marriage and goes in quest of the great Being, whom she finds at last after many serious dangers and terrible adventures. He lives beyond the river of Despair in an abode of bliss called *Ananda Dhām*." (*RBL*, 1890, p. 8.)

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ৬ অগ্রহায়ণ ১৩২৬ ব., ২২ নবেম্বর ১৯১৯ খৃ. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে "৺শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোক প্রকাশার্থ আহূত" নবম বিশেষ অধিবেশনে পরিষদের সভাপতি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন—

"শ্রদ্ধাস্পদ শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ৭৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। এরূপ মৃত্যুকে অকালমৃত্যু বলা যায় না। কিন্তু তাঁহার পিতা যেরূপ দীর্ঘজীবী ছিলেন, সে হিসাবে তাঁহার এ মৃত্যুকেও অকালমৃত্যু বলিলে চলে। তাঁহার পিতা অতিশয় দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় খুব কৌতুকপ্রিয় এবং আমোদপ্রিয় লোক ছিলেন, এটি তাঁহার পৈতৃক গুণ ; তাঁহার পিতার নিকট হইতে তিনি ইহা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বভাবগুণে তিনি কলেজের সকলের প্রিয় ছিলেন এবং সকল বিষয়েই কলেজে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। ছাত্র-জীবনের অন্তে প্রথমে তিনি হেয়ার স্কুলে একটি চাকরী গ্রহণ করেন। কিন্তু ইহা তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ কার্য্যের— ধর্ম্মের আহ্বানে এ সকল বিষয় অতি তুচ্ছজ্ঞানে ত্যাগ করিলেন। তৃণাদপি সুনীচেন ভাবে তিনি ধর্ম্মসাধনা করিয়া গিয়াছেন। শেষ বয়সে তাঁহাকে যশোহর সাহিত্য-সম্মিলনের [১৩২৩ ব.] সভাপতি করা হইয়াছিল। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ ডাক্তারদের পরামর্শে তিনি এই সম্মানকর পদ প্রত্যাখ্যান করেন।

"স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয় পরিষৎকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতি রক্ষার জন্য তিনি ৮০৲ সংগ্রহ করিয়া পরিষৎকে দান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনিই মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের মৃন্ময় মূর্ত্তি (Bust) এবং তাঁহার ব্যবহৃত পাগড়ীটি বিলাত হইতে আনিয়া পরিষৎকে দান করিয়াছেন। এই দুইটি জিনিষেই পরিষদের চিত্রশালার সমধিক গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে, সন্দেহ নাই।" (কার্য বিবরণ, সা-প-প, ১৩২৬ ব.)

~ ~

২২. রমেশচন্দ্র দত্তের (১৮৪৮-১৯০৯ খৃ.) রচনা সম্পর্কে বেঙ্গল লাইব্রেরির রিপোর্টে শাস্ত্রীমশায়ের মন্তব্য—

A History of Civilization in Ancient India (তিনখণ্ড, ১৮৮৯-৯০ খৃ.)

"...Of historical works in English, Mr. R. C. Dutt's *History of Civilization in Ancient India*, of which only the first two volumes were received during the year, is the most important as giving a connected narrative of all the facts and events relating to the Vedic and rationalistic periods of Indian History, made known to the world by the researches of oriental scholars both in India and in Europe. Up to this time the only books from which general students could gather a history of the these periods were the Histories of ancient Sanskrit Literature, the scientific and technical character of which prevented their being largely read. Mr. Dutt's book will give this class of readers a handy volume prepared with great care and written in an engaging style, containing all that is known up to the present date of the most obscure periods of the obscure History of Ancient India." (*RBL*, 1889, p. 4.)

"...The third volume of *Ancient India*, by Mr. R. C. Dutt, appeared during the course of the year. It is a careful digest of all that has been written by the school of which Sir Alexander Cunningham and Raja Rājendra Lāla Mitra were representatives. Mr. Dutt gives full information in his chapters on law, manners, customs, architecture, literature, &c. His is perhaps the only work which gives a connected narrative of the period so far as the facts are known, and as such it is a welcome contribution to the history of India. Mr. Dutt knows what he is writing

about, and has executed his work with care." (*RBL*, 1891, p. 7.)

হিন্দু শাস্ত্র. ১-৯ ভাগ ১৮৯৩-৯৭ খৃ.

"Mr. R. C. Datta, C. S. has published three parts of his *Hindu Dharma*, giving a history of Vedic *Samhitās*, *Brāhmaṇas*, *Āraṇyakas* and *Upanishad.* His work is expected to embrace the whole range of Hinduism and to be complete in eight parts." (*RBL*, 1893, p. 9.)

সমাজ, ১৮৯৪ খৃ.

"The chief event of the year is the death of the great Bengali novelist, Babu Bankim Chandra Chatterji. By his natural talents and by his constant practice in writing novels, he left his contemporaries so far behind that it will be difficult to fill his place for a long time to come. The writers who stand next to Babu Bankim Chandra as novelists are Mr. R. C. Dutt and Babu Ravīndra Nāth Tagore. Both have acknowledged their indebtedness to Babu Bankim Chandra, and both are great admirers of his genius. *Samāj*, the latest production of Mr. R. C. Dutt, is a decided improvement on his previous works in respect of language, style, characterization, and wit. It is a work in support of the Reform movement, and not favourable to the orthodox Hindu community." (*RBL*, 1894, p. 2.)

২৩. মনোমোহন বসুর (১৮৩১-১৯১২ খৃ.) 'দুলীন' (১৮৯১ খৃ.) উপন্যাস সম্পর্কে বেঙ্গল লাইব্রেরির রিপোর্টে শাস্ত্রীমশায়ের মন্তব্য—

"...*Dulin*, by Babu Monomohan Basu, the oldest and perhaps the most modest and unpretending of Bengali writers now living, gives an account of the

Court of Ranjit Sinha, the Lion of the Panjab, and of the system of his administration, with all their strong and weak points. The vast empire seems to have been held together only by the iron will of the master. But the elements of strife and discord were so many and so various that the empire fell to pieces as soon as its great organizer was removed by the hand of death. The work records the career of the son of a fugitive chief of one of the various hill states suppressed by the generals of Ranjit, and especially by Gulāb Sinha of Cashmere, who not only destroyed the ancient Kshatriya families that for centuries had ruled over these retired principalities, undisturbed by the struggles to which their more fortunate relations in the plains had succumbed long ago, but held possession of their states by striking terror into the people through his constant massacres. The fugitive Raja of Soudan was killed by the thugs, together with his wife and his faithful followers. The child of two years of age was picked up by Colonel Dowling of the British army, and reared up as his own son, as he was childless. The fair complexion, the high Aryan features and the tall and manly appearance of the prince completely concealed his birth and parentage, and he passed everywhere for a European. He received his education in England and got a commission in the Indian army. But on the death of his adoptive father, who left all his property to him, the malice of the heirs of Colonel Dowling soon discovered the secret of his son's birth, and the prince was not only deprived of all his property, but also of his office. In his chagrin he sought service under Ranjit, and the honesty, truthfulness, and moral courage which he had

acquired by his English education, enabled him to enjoy his master's confidence and to rise high in his favour. He is described as something like an oasis in the desert of dishonesty and corruption of the Lahore durbar. The work gives very interesting information about, and in fact concerns itself chiefly with, the wrecks of the small hill principalities suppressed by that durbar." (*RBL*, 1891, p. 4.)

২৪. 'স্বর্ণলতা'র (১৮৭৪ খৃ) লেখক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৮৪৩-৯১ খৃ.) 'অদৃষ্ট' (১৮৯২ খৃ.) উপন্যাস সম্পর্কে বেঙ্গল লাইব্রেরির রিপোর্টে মন্তব্য—

"*Adrishta*, by the late Babu Tārak Nāth Gānguli, is full of those realistic descriptions which were his *forte*. This work is not at all ambitious. It describes the hopes and aspirations, the struggles and miseries, the joys and sorrows of a poor compounder. His brother is a rich pleader, but his brother's wife does not like to afford a shelter to a poor relative in her house. He marries the daughter of a poor man, who marries his other daughter to a pleader. The poor compounder is at a discount at his father-in-law's house. He is keenly sensible of the inferiority of his position, but is always composed and quiet and never loses his self-respect. He is a character with whom no one can help sympathising, and the late Babu Tārak Nāth Gānguli is perhaps the first person who has successfully painted 'low life' in Bengali." (*RBL*, 1892, p. 3.)

২৫. 'রুসিয়া প্রবাসীর পত্র', 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র', ভারতী, বৈশাখ, অগ্রহায়ণ ১২৮৭ ব.। নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় (১৮৫২-১৯১০ খৃ.) লাইপ্‌ট্‌সিথ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে জর্মান, সংস্কৃত, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, ন্যায় ও দর্শন শাস্ত্রে পড়াশুনো করেন। য়ুরোপে প্রথম ভারতীয় পি. এইচ. ডি,

জুরিখ্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। সেণ্ট পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দু বছর ভারতীয় ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "ভানুসিংহ যখন ভারতীতে বাহির হইতেছিল ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখন জর্মনিতে ছিলেন। তিনি য়ুরোপীয় সাহিত্যের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের দেশের গীতিকাব্য সম্বন্ধে একখানি চটি-বই লিখিয়াছিলেন। তাহাতে ভানুসিংহকে তিনি প্রাচীন পদকর্তারূপে যে প্রচুর সম্মান দিয়াছিলেন কোনো আধুনিক কবির ভাগ্যে তাহা সহজে জোটে না। এই গ্রন্থখানি লিখিয়া তিনি ডাক্তার উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।" (র-র-বি, ১৭, পৃ. ৩৪৭)। উৎকট গবেষণা নিয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ-রচনা 'ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী'র (নবজীবন, শ্রাবণ ১২৯১ ব.) উপলক্ষও সম্ভবত নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অবশ্য বলেন, নিশিকান্তর গবেষণা-প্রবন্ধ *The Yatras or the Popular Dramas of Bengal* (London, 1882) নামক রচনায় ভানুসিংহ ঠাকুরের নাম নেই (দ্র. রবীন্দ্র জীবনী, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী ১৩৬৭ ব., পৃ. ৭০-৭১)।

ব্যক্তি নিশিকান্তের পরিচয় আছে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখায়—

"ডাক্তার নিশিকান্তের সঙ্গে সোলাপুরে আমার প্রথম আলাপ। তখন তিনি ইউরোপ হইতে সদ্য প্রত্যাগত হইয়াছেন— বৈলাতিক তীব্রবাস তাঁহার গাময় লাগিয়া আছে। বিলাত হইতে খুব নাম করিয়া আসিয়াছেন— কোন এক জর্ম্মন য়ুনিবর্সিটি হইতে Doctor of Philosophy উপাধি পাইয়াছেন— রুষিয়ায় গিয়া কি সব কাণ্ড করিয়াছেন— তাঁহাকে গুপ্তচর (Spy) সন্দেহ করিয়া ও-দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছিল, সে নির্ব্বাসনবার্ত্তাও তাঁহার গৌরব বহন করিয়া আনিয়াছে। তাঁহার উপর দেশের আশা ভরসা কতই ছিল! ইংরাজী ফরাসী জর্ম্মন রুষ— এই বিবিধ ইউরোপীয় ভাষা তাঁহার মুখাগ্রে— তাঁহার ইচ্ছা ছিল এদেশে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের অধীনে Foreign office-এ প্রবেশ করিয়া আপনার কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তাহাতে যদিও কৃতকার্য্য হইলেন না, তথাপি দেশে ফিরিয়াই মহানুভব বড়লাট রিপণের অনুগ্রহে নিজামরাজ্যে শিক্ষাবিভাগে একটা বড় কাজে নিযুক্ত হইলেন— হাইদ্রাবাদ কলেজের প্রিন্সিপাল, খুবই উচ্চপদ! দুর্ভাগ্যক্রমে সে পদ অধিক দিন রাখিতে পারিলেন না। পরে অন্য দুই এক কাজে তাঁহার আত্ম-পরিচয় দিবার সুযোগ হইল কিন্তু নিজ দোষে একে একে সব হারাইলেন। নিজামরাজ্যে তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি ক্রমে হ্রাসোন্মুখ হইতে চলিল, শেষে হাইদ্রাবাদে অপদস্থ হইয়া যথাকথঞ্চিৎরূপে দিনপাত করিতে

লাগিলেন। তাঁর একে এই আর্থিক দুরবস্থা, তার উপর আবার পারিবারিক অশান্তি! আমি হাইদ্রাবাদে একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই— তখনো তিনি মাথা তুলিয়া আছেন, Wolsey-র ন্যায় তাঁহার পতন হয় নাই। সে সময়ে নিজামৎগগনে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী বঙ্গসূর্য দীপ্তি পাইতেছে— দুই চট্টোপাধ্যায়, নিশিকান্ত ও অঘোরনাথ। এই শেষোক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বনাম অপেক্ষা তাঁহার প্রতিভাশালিনী কন্যা সরোজিনী নাইডুর নামে লোকসমাজে সমধিক পরিচিত। এইরূপে দিন যায়, পরিশেষে একদিন শোনা গেল যে, নিশিকান্ত ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া জাতিভ্রষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার আন্তরিক স্পৃহা এই ছিল কোন এক বেগমের পাণিগ্রহণ করিয়া হাইদ্রাবাদ নবাব-পরিবারভুক্ত হন— তাঁহার বিশ্বাস এই যে, তাহার গুণে সেখানকার সকলেই এমনি মুগ্ধ যে তিনি একটুকু ইঙ্গিত করিবামাত্র কত শত বেগম তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িবে। হায়, তাঁহার সে সাধ পূর্ণ হইল না। এই গোল-যোগের মধ্যেই সে-দেশে তাঁহার মৃত্যু হয়। কি আপশোষ! তাঁর মুখে একটু জল দিবার জন্য আপনার লোক কেহ কাছে নাই— তাঁহার স্ত্রী তাঁহা হইতে বহু দূরে— একটি মাত্র পুত্র অনেক দিন মারা গিয়াছে, এই শোকতাপ দুঃখযন্ত্রণায় বিদেশে প্রাণত্যাগ করেন— মনে হইলেও কষ্ট হয়!

"লোকটার বিদ্যাবুদ্ধি পাণ্ডিত্য অসাধারণ ছিল কিন্তু হইলে কি হয়, কেবলমাত্র বুদ্ধির জোরে মনুষ্যত্ব হয় না। তাঁহার চরিত্রগত কি একটা নৈতিক বিকলতা ছিল— সেই এক ছিদ্র হইতে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি পৌরুষ মানসম্ভ্রম একে একে সকলি ক্ষরণ হইয়া তাঁহাকে অপদার্থ করিয়া ফেলিল। নিশিকান্তকে দেখিলাম, তড়িতের ন্যায় তাঁর প্রকাশ, তড়িতের ন্যায় অন্তর্ধান। যাক্, ওসব কথায় আর কাজ নাই— মৃতের ভাল দিক্ দেখাই ভাল—

De mortuis nihil nisi bonum—
Of the dead nothing but good!"

(সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস, কলকাতা, ১৯১৫ খৃ., পৃ. ১৪১-১৪২)।

৩. পাঠ-প্রসঙ্গ

বর্তমান মুদ্রণে 'সাবিত্রী' সংকলনের পাঠ অনুসরণ করা হয়েছে। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার পাঠান্তর সংকলন করে দেওয়া হল।

নিচের উল্লেখগুলির শুরুতে ব্যবহৃত সংখ্যার প্রথমটিতে পৃষ্ঠা-সংখ্যা ও দ্বিতীয়টিতে ছত্র-সংখ্যা বোঝানো হয়েছে।

৪৯৮/১৬ : "যদিও কেহ বাংলা আক্রমণ করিতেই আসে নাই···।" বঙ্গদর্শন-এর পাঠ : "যদিও মুসলমানেরা ভিন্ন আর কেহ বাংলা আক্রমণ করিতেই আসে নাই···"।

৪৯৮/১৯ : "যখন নবাব ও ইংরাজ উভয়ে মিলিয়া শাসন করিতেন, রণদুর্মদ ইংরেজগণ কাহাকেও মানিত না ; ···"। বঙ্গদর্শন-এর পাঠ : "Double Government এর সময়ে রণদুর্মদ ইংরেজগণ কাহাকেও মানিত না।

৪৯৮/২২ : "এই সময়ে যেমন ছিল, ১৭৯৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ঠিক তেমনই ছিল।" বঙ্গদর্শন-এর পাঠ : "Double Government এর সময়ে যেমন ছিল, ১৭৯৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ঠিক তেমনই ছিল।"

৫০১/২৮ : "৬৫ হইতে ৭২রের মধ্যেই প্রাচীন কবিগণ গত হন।" পত্রিকার পাঠ : "Double Government এর সময়েই ৬৫ হইতে ৭২রের মধ্যেই প্রাচীন কবিগণ গত হন।"

৫০৪/২৬ : "দ্বিতীয়, গৌরীশঙ্কর— নৈহাটিস্থ ভট্টাচার্য গোষ্ঠীয় ছাত্র এবং বাংলায় রামমোহন রায়ের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী।" পত্রিকার পাঠ : "দ্বিতীয়, গৌরীশঙ্কর— বাংলায় রামমোহন রায়ের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী।"

৫০৭/১৫ : "দেশীয় সমস্ত যুবকবৃন্দের আদর্শস্বরূপ হওয়া উচিত।"— এর পরের অংশ : "ইঁহার সীতার বনবাসের ন্যায় প্রকাণ্ড কাব্য···অন্য ভাষায়ও এরূপ গ্রন্থ ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করে।" —বঙ্গদর্শনে ছিল না, এখানে নতুন সংযোজন।

৫১২/১৬ : "আমি ক্ষুদ্র মানব, আমি তাঁহাদের পূজাপদ্ধতিও বিশেষরূপে অবগত নহি।" বঙ্গদর্শন-এর পাঠ : "আমি ক্ষুদ্র মানব, আমি তাঁহাদের ও তাঁহাদের কার্যের সহিত পরিচিতও নহি ; আর আমি তাঁহাদের পূজাপদ্ধতিও বিশেষরূপে অবগত নহি।"

৫১৭/১ : "ইংরেজিতে যাহাকে earnest man বলে, "পত্রিকার পাঠ : "ইংরেজিতে যাহাকে learned man বলে"।

৫১৭/৩ : "···আর কালীপ্রসন্নবাবু এই সকল earnest লোকের অগ্রণী।" পত্রিকার পাঠ : "কালীপ্রসন্নবাবু এই সকল learned লোকের অগ্রণী।

৫১৭/১২ : "স্বপ্নপ্রয়াণে ইঁহার কল্পনাশক্তির অনেক দূর দৌড় দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিজেন্দ্রবাবুর ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে সম্পাদকতা কার্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকেন।" বঙ্গদর্শন-এর পাঠ : "স্বপ্নপ্রয়াণে ইঁহার কল্পনাশক্তির অনেক দূর দৌড় দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারও সহকারী কে কে আমরা জানি না, কিন্তু শুনিয়াছি, দ্বিজেন্দ্রবাবুর ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকেন।"

৫১৭/১৮ : "শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই চারি বৎসর ধরিয়া··· তাঁহার 'বাল্মীকি-প্রতিভা' অভিনয় দেখিয়া আমরা বাস্তবিকই মোহিত হইযাছিলাম।"— এই অনুচ্ছেদ পত্রিকায় ছিল না, এখানে নতুন সংযোজন।

৫১৭/২৬ : "শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ··· মাননীয় আসন প্রাপ্ত হইবেন"-- এই অনুচ্ছেদটি বঙ্গদর্শনে ছিল না, নতুন সংযোজন।

৫১৮/২১ : "বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে এক্ষণে তাঁহার প্রধান সহায় তাঁহার ভ্রাতা বঙ্কিমবাবু, আর চন্দ্রনাথবাবু।" এই বাক্যের পর বঙ্গদর্শনে তারকা চিহ্ন দিয়ে পাদটীকায় ছিল, "প্রস্তাব লেখকও বটে। সঃ।" পরে বর্জিত।

৫২০/২ : "শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বসুর ···আনন্দের উদয় হয়।"— এই অনুচ্ছেদ নতুন. সংযোজন, বঙ্গদর্শনে ছিল না।

৫২০/১৪ : "শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল চক্রবর্তীর ··· সৌন্দর্যের উদ্দাম বিকাশ।"— এই অনুচ্ছেদ বঙ্গদর্শনে ছিল না, নতুন সংযোজন।

৫২০/২৩ : "উদাসিনী নামে বাংলায় ···জানিতে পারিয়াছি।"— এই অনুচ্ছেদ নতুন সংযোজন ছিল, বঙ্গদর্শনে ছিল না।

৫২২/১৯ : "···এবং সাহিত্যের গুণাগুণ পরীক্ষা করিতে পারে, এরূপ লোকের সংখ্যা অধিক হয় ;" বঙ্গদর্শনের পাঠ : "এবং সাহিত্যের গুণাগুণ পরীক্ষা করিতে পারে, এরূপ বহুসংখ্যক লোক থাকে,"

৩. অনুষঙ্গ

অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'সাধারণী' পত্রিকায় এই প্রবন্ধ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়—"পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মত লেখক পাইলে, বাঙ্গালা সাহিত্যের ভরসা আছে, তাহা নিশ্চয় কথা। পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি ইঁহার বাঙ্গালা এরূপ পরিষ্কার—পরিষ্কার কেন স্বচ্ছ— যে ভাষার আবরণ আছে বলিয়াই বোধ হয় না। আর, একটি কথা সাধু বা সংস্কৃত অন্যটি অসাধু বা প্রাকৃত— অতএব এ দুইটির একত্র সংস্থান করা অকর্ত্তব্য এরূপ ফলারের জাতিভেদ হরপ্রসাদে নাই। যে যেমন কাজ করিতে পারে, শাস্ত্রী তাহার বর্ণ বিভেদ না করিয়া তাহাকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করের। তাহার উপর শাস্ত্রী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত গবেষণ পটু এবং চিন্তাশীল। তাঁহাকে পাইয়া আমাদের ভরসা আছে। সেই ভাষার কথা তাঁহারই ভাষায় নিম্নে প্রদত্ত হইল।" ('সাধারণী' শ্রাবণ ১২৮৮ ব. পৃ. ২১২)

এর পর শাস্ত্রীমশায়ের প্রবন্ধের শেষ দুটি অনুচ্ছেদ থেকে উদ্ধৃতি আছে।

'কল্পনা' পত্রিকায় সাবিত্রী সংকলন সম্পর্কে একটি বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশিত হয়। এই আলোচনায় শাস্ত্রীমশায়ের প্রবন্ধের পরিচয় দেওয়া হয়েছিল। (কল্পনা, চতুর্থ বর্ষ ১৮৮৩ খৃ., পৃ ৫৬২-৬৩)।

১৯১৬ খৃস্টাব্দে *Mahamahopadhyaya Haraprasad Shastri, M.A., C.I.E., F.A.S.B.* নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল। মুদ্রক ও প্রকাশক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, হেয়ার প্রেস, ৪৬ বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা। পুস্তিকাটিতে শাস্ত্রীমশায়ের বংশ পরিচয়, চাকরি জীবনের বিবরণ, বার্দিলন ও কার্জনের দুটি চিঠি, গবেষণার পরিচয় এবং একটি রচনাপঞ্জী আছে। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, পুস্তিকাটি তাঁর অনুমোদনে ছাপা হয়েছিল। এই পুস্তিকার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ Contribution towards the History of Bengali Literature-এ বলা হয়েছে—

"The Shastri's first contribution to the History of Bengali Literature, is a long paper in the Bangadarsan entitled, The Bengali Literature of the present (19th) Century— a paper which is still read and criticised.

"The second contribution is a pamphlet in English entitled the *Vernacular Literature of Bengal before the Introduction of English Education* in 1891, which gave for the first time an insight into the richness of the Vaisnava Literature of Bengal. This work gave an impetus to the

search of Manuscripts of Bengali Literature to which Bengal owes the works of Babu Dinesh Chandra Sen and Babu Nagendranath Basu.

"The third contribution is to be found in the Eleventh Volume of the *Notices of Sanskrit Manuscripts*, a part of the introduction of which is devoted to it. In this the Shastri for the first time informed the public that Bengali Literatue owed its origin to Buddhism.

"His last work on the subject is, Bengali Buddhist songs, thousand years old, which has just been published. It has taken the History of Bengali Literature, five or six centuries back. These songs and Dohas have all been discovered studied and edited by the Shastri single-handed and the edition is accompanied by an all-word index with meanings and an author-Index of Buddhist writers in Eastern India taken from the Tantra Section of the Tibetan Tangur." (pp. 7-8).

Vernacular Literature of Bengal before the Introduction of English Literature প্রবন্ধ এবং *Notices of Sanskrit Manuscripts* Vol. XI-এর ভূমিকা থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ পরিশিষ্টে ছাপা হল ।

যে কেহ বাংলা ভাষায় লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি জানেন যে, বাংলা ভাষায় অনেক ভাব সহজে ব্যক্ত করিতে পারা যায় না। ঐ-সকল ভাব ব্যক্ত করিতে গেলে, কী উপায় অবলম্বন করা উচিত, তাহা লইয়া নানা মতভেদ আছে। অনেকে বলেন, নূতন ভাব প্রকাশ করিবার জন্য নূতন শব্দ গঠন করা আবশ্যক। অনেকে বলেন, অন্যান্য ভাষা হইতে নূতন শব্দ আমদানি করা আবশ্যক। অনেকে বলেন, চলিত কথা দিয়া যেরূপ হউক ভাব প্রকাশ হইলেই যথেষ্ট হইল। ইংরেজিতে যে ভাব এক কথায় ব্যক্ত হয়, বাংলায় যদি তাহাই ব্যক্ত করিতে তিন ছত্র লিখিতে হয়, সেও স্বীকার, তথাপি নূতন শব্দ গঠন বা ভাষান্তর হইতে শব্দ

আনয়ন উচিত নহে। আমরা এ তিনটির কোনো মতেরই সম্পূর্ণ পোষকতা করিতে পারি না। কখনো কখনো নূতন শব্দ গঠনের প্রয়োজন হয় ; কখনো ভাষান্তর হইতে শব্দ আনয়নের প্রয়োজন হয় ; কখনো অনেক কথায় ভাবটি ব্যক্ত করিতে গেলে, লেখার বাঁধনি থাকে না, এবং ভাবটিও সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করা যায় না।

একটি উদাহরণ দিয়া পূর্বোক্ত কথাগুলি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। 'উকিলিতে আজকাল বড়োই competition'। এখন competition শব্দে যে ভাব ব্যক্ত হয়, বাংলা ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিবার কোনো কথা নাই। আমরা কী করিব ? ঐ শব্দটি কি বাংলা করিয়া লইব, না উহার পরিবর্তে সংস্কৃত ধাতুপাঠ খুঁজিয়া 'সংঘর্ষ' শব্দ গড়িয়া লইব। না বলিব উকিলিতে আজকাল অনেক লোক হইয়াছে, অতএব উহাতে পসার করা বড়োই শক্ত।

এই তিন উপায়েই দোষগুণ উভয়ই আছে। সংঘর্ষ শব্দটি হয়তো একেবারেই নূতন, যদি সংস্কৃতে থাকে এরূপ অর্থে কখনো ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং সংঘর্ষ বলিলে, যিনি শব্দটি গড়িবেন, তিনি ভিন্ন অন্য কেহ বুঝিতে পারিবেন না। কিন্তু উহার এক গুণ আছে। উহা সংস্কৃত মূলক ; সুতরাং অনেক লোক উহা ইংরেজি কথা অপেক্ষা ভালো বলিবেন, আর উহা যদি চলিয়া যায়, তবে ইংরেজের কাছে উহার জন্য দেন্দার থাকিতে হইবে না। কিন্তু এ কথা চলিবে কি ?

যাহারা ইংরেজি জানে না, Competition কথাটি তাহারা বুঝিবে না ; কিন্তু সংঘর্ষ বলিলে যত লোকে বুঝিবে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক লোকে বুঝিতে পারিবে।

'উকিলিতে অনেক লোক হইয়াছে, অতএব পসার করা শক্ত' বলিলে সকলেই বুঝিতে পারিবে, কিন্তু অল্প কথায় বলা না হওয়ায় কেমন একটু ভাসা ভাসা লাগে। হয়তো যে প্রণালীতে রচনা হইতেছে, অত কথায় বলিলে সে প্রণালীর সহিত সহচারবিরুদ্ধ হইয়া উঠে।

আমরা যে এই কথা বলিলাম, তাহার তাৎপর্য এই যে নূতন ভাব প্রকাশ করিতে গেলে প্রকাশকের বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য করা আবশ্যক। হঠাৎ যাহা হয়, একটি করিয়া ফেলা উচিত নহে। কারণ এরূপ দুরূহ কার্যে হঠাৎ কিছু করিলে ভালো না হইয়া বরং মন্দ হইবার

সম্ভাবনা। অতএব আমরা বলি নূতন ভাব প্রকাশ করিতে হইলে বা নূতন জিনিসের নাম দিতে হইলে, বাংলা, হিন্দি, উড়িয়া, সংস্কৃত প্রভৃতিতে যে-সকল কথা চলিত আছে, সেগুলি প্রণিধান পূর্বক দেখা উচিত, যদি তাহার মধ্যে কোনো কথায় ভাব প্রকাশ হয়, তাহা হইলে সেই ভাষার কথাই প্রচলিত করিয়া দেওয়া উচিত। অনেক সময় চলিত ভাষায় এবং ইতর ভাষায় এমন সুন্দর কথা পাওয়া যায় যে, তাহাতে সম্পূর্ণরূপে মনের ভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে।

প্রথম উদাহরণ॥

কাচ সহজেই ভাঙিয়া যায়। সহজে ভাঙা গুণ প্রকাশ করিবার জন্য ইতর ভাষায় একটি শব্দ আছে 'ঠুন্‌কো', কিন্তু যাঁহারা স্কুলের বই লেখেন, তাঁহারা ঐ কথাটি না জানিয়া অথবা উহা ব্যবহার করিতে ইচ্ছা না করিয়া লিখিলেন কাচ ভঙ্গপ্রবণ। যাহা সহজে ভাঙিয়া যায় তাহার নাম সংস্কৃতে ভঙ্গুর, সুতরাং ভঙ্গপ্রবণ শব্দটি না বাংলা, না ইংরেজি, না সংস্কৃত। অথচ বাংলায় প্রায় দশ লক্ষ ছাত্র গুরুমহাশয়ের বেত্রাঘাতে শিখিল কাচ ভঙ্গুর নহে, ঠুন্‌কোও নহে, উহা ভঙ্গপ্রবণ।

দ্বিতীয় উদাহরণ॥

'দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থান' বাংলায় নাই। সুতরাং উহার নামও বাংলায় নাই। কিন্তু আমার প্রয়োজন ঐ স্থানটির নাম দেওয়া। হিন্দিতে ঐ স্থানকে 'দুন' বলে। কিন্তু বঙ্গীয় গ্রন্থকারগণ ঐ কথাটি না জানিয়া অথবা উহা ব্যবহার করিতে ইচ্ছা না করিয়া লিখিলেন কী না উপত্যকা। উপত্যকা সংস্কৃতে চলিত শব্দ, কিন্তু দুঃখের মধ্যে এই যে, উহাতে পর্বতের আসন্ন ভূমি বুঝায়, দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থান বুঝায় না। সুতরাং গুরুমহাশয়ের বেত্রাঘাতে দশ লক্ষ বালক একটি 'ভুল' শিখিল।

তৃতীয় উদাহরণ॥

যেখানে বসিয়া জ্যোতির্বিদেরা গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি গণনা করেন, তাহার হিন্দি নাম মানমন্দির বা তারাঘর কিন্তু অনেকে উহার ইংরেজি নাম observatoryর তর্জমা করিয়া নাম রাখিলেন, পর্যবেক্ষণিকা। কেহ বুঝিল না, অথচ কেতাবে কেতাবে চলিয়া গেল।

চতুর্থ উদাহরণ ॥

ভারতবর্ষের উত্তর অংশের পর্বতময় প্রদেশকে লোকে উত্তরাখণ্ড বলে, কিন্তু ইংরেজিতে উহাকে Himalayan regions বলে বলিয়া বাংলা পুস্তকে উহার নাম হিমালয় প্রদেশ হইয়াছে। এরূপ উদাহরণের অভাব নাই, যথেষ্ট আছে।

তাই বলিতেছিলাম যে, নূতন ভাব প্রকাশ করিতে গেলে বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য করা উচিত। কিন্তু দুঃখের মধ্যে বাঙালি লেখকদিগের মধ্যে কাহারোই সে বিবেচনা নাই। তাঁহারা পড়েন ইংরেজি, ভাবেন ইংরেজিতে সুতরাং লিখিবার সময়ে ইংরেজিতে ভাব আসিয়া যোগায়। জাতীয় স্বভাব আলস্য বিশেষ অনুসন্ধান করিতে দেয় না। অনেকের ইচ্ছা থাকিলেও বিদ্যায় কুলাইয়া উঠে না। যাঁহারা বেশি অলস, অথচ একটু বুদ্ধি আছে, তাঁহারা ইংরেজি ঠিক রাখিয়া দেন। যাঁহাদের উহারই মধ্যে একটু হিতাহিতজ্ঞান আছে, তাঁহারা যাহা হয় একটা তর্জমা করিয়া পরেই বন্ধনীর মধ্যে ইংরেজি কথাটি রাখিয়া দেন, অর্থাৎ দেশসুদ্ধ লোককে বলিয়া দেন, আমি তর্জমা করিতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু আমার বিদ্যায় কুলাইয়া উঠিল না। অনেকে আবার শুদ্ধ তর্জমা করিয়াই রাখিয়া দেন, ইঁহাদের লেখা সময়ে সময়ে বড়োই মিষ্ট। Bear the responsibility থাকিলে ইহার তর্জমা করেন, জবাবদিহি বহন। Is appointed a lecturer তর্জমা করেন বক্তা নিযুক্ত হইয়াছেন। He seconded my proposal, আমার প্রস্তাব দ্বিতীয় করিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

সরস্বতীর বরপুত্র বা ভিক্ষাপুত্র* বলিয়া পরিচিত হইবার বাসনা বড়োই প্রবল। মনে মনে সকলেই অহম্ উত্তম পুরুষ। জ্ঞান আমি জিনিয়স। সুতরাং খাটিবার ইচ্ছা একেবারেই নাই। ইংরেজি পুস্তক যেমন দেখিলেন, অমনি তখনই তর্জমা করিয়া ফেলিলেন। প্রায় পূর্বকালের মাছিমারা কেরানিদিগের মতো যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং করিয়া ফেলিলেন। অনেক সময়ে তাঁহাদের পুস্তকে দেশী নামগুলি

* যাঁহারা পুস্তক প্রণয়ন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করেন, তাঁহাদিগকে লোকে সরস্বতীর ভিক্ষাপুত্র বলে।

চিনিয়া লওয়া ভার হয়। তাঁহারা মল্লার রায়কে 'মল্‌হর' রায় লেখেন। রাঘবকে রাঘোবা লেখেন। তাঁহাদের গ্রন্থে রাজপুত-কুল-ধুরন্ধর সংগ্রাম সিংহকে আমরা আর চিনিতে পারি না। তাঁহার নাম হয় রাণা সঙ্গ। জয়জীরাও জিজিরায় হন। তাঁতিয়া রায় টাণ্টিয়া টোপী হন। পবিত্র তীর্থ বারাণসী বেনারস হইয়া যায়। লাহোরের নিকট একটি নগর আছে, তাহার নাম গুজরানওয়ালা। কিন্তু বাংলা ভূগোলে উহাকে চিনিয়া উঠা ভার, উহার নাম গুজম্বার্লা হইয়াছে।

যাহারা দেশীয় নামের বানান পর্যন্ত ঠিক করিয়া লইতে অনিচ্ছুক তাহারা যে নূতন শব্দ প্রয়োগ করিবার পূর্বে স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবে ইহা একান্ত অসম্ভব। ইচ্ছামতো নূতন শব্দ গঠনের বড়ো বড়ো ইংরেজি কথা প্রবেশনের এবং 'জবাবদিহি বহন' গোছ তর্জমার ফল এই যে বাংলা পুস্তক প্রায়ই অত্যন্ত দুর্বোধ্য হইয়া উঠে বরং সংস্কৃত বা ইংরেজি বুঝা যায়, তথাপি বাংলা বুঝা যায় না। ইহারই জন্য শিক্ষিত মহলে বাংলার তাদৃশ আদর হয় না। ইহার আর এক ভয়ানক দোষ এই যে ভাষার কিছু স্থিরতা থাকে না। অধিকাংশ বাংলা লেখক বাংলা পড়েন না কেবল লেখেন। নূতন ভাব প্রকাশ করিতে হইলে তাঁহারা নিজের মনোমতো নূতন শব্দ গড়িয়া দেন। পূর্বে অন্য লোক সেই ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য কী কথা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহারা সন্ধান লয়েন না। এইরূপে একটি ভাব প্রকাশের জন্য রাশি রাশি নূতন কথা সৃষ্টি করা হয়। অথচ আমরা দেখিতে পাই, হয় চলিত ভাষায় না-হয় পার্শ্বস্থ দেশের চলিত ভাষায় অথবা চলিত সংস্কৃতে একটু খুঁজিলে উৎকৃষ্ট শব্দ পাওয়া যাইত।

দুই-একজন লোক এমনি আহাম্মক আছে যে ঘরে টাকা থাকিতে ধার করে। আমাদের বাঙালি লেখকও ঠিক সেইরূপ হইতেছে। বৃথা অভিধানের কলেবর বৃদ্ধি হইতেছে, অথচ ভাষার কিছুমাত্র উন্নতি হইতেছে না, এবং বাংলা ভাষা কী তাহাও ঠিক হইতেছে না। বাংলা যে সংস্কৃত হইতে স্বতন্ত্র ভাষা সংস্কৃত হইতে ইহার সত্তা স্বতন্ত্র, জীবন স্বতন্ত্র, উৎপত্তি, স্থিতি, এবং লয় এই তিনই স্বতন্ত্র, এ কথা বর্তমান লিখিত বাংলা ভাষা দেখিলে কাহারো বোধগম্য হয় না। যে পারস্য-ভাষায় প্রায় ৭০০ শত বৎসর ধরিয়া দেশের প্রধান প্রধান কার্য সম্পন্ন

হইয়াছে, ভদ্রসমাজে কথিত বাংলা ভাষায় শতকরা ৫০টি কথা যে ভাষা হইতে গৃহীত, বাংলা ব্যাকরণের হাড়ে হাড়ে যে ভাষা বিঁধিয়া আছে, যে ভাষার কথা ব্যবহার করিলে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা বুঝিতে পারে, আমরা প্রাণপণে সে ভাষার কথাগুলি লিখিত ভাষা হইতে দূর করিবার চেষ্টা করি। নালিশ বলিলে সকলে বুঝিতে পারে; কিন্তু তাহা ত্যাগ করিয়া গ্রন্থকারেরা অভিযোগ লেখেন। অথচ সংস্কৃত অভিধান খুঁজিলে অভিযোগ শব্দে আর-এক অর্থ বুঝায়, নালিশ বুঝায় না। এইরূপে আদালতে প্রচলিত সমস্ত পারসি কথা লিখিত বাংলা হইতে উঠিয়া গিয়াছে। সেই সকলের পরিবর্তে অতি দুর্বোধ্য সংস্কৃত শব্দ-সকল অসংস্কৃত অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে।

উদাহরণ— রফা বলিতে গেলে মকদ্দমা মিটাইয়া ফেলাকে বলে, মীমাংসা বলিলে সে অর্থ বুঝায় না, কিন্তু রফার জায়গায় অনেকেই মীমাংসা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

পাট্টা কবুলতি চলিত কথা, সকলেই বুঝিতে পারে, কিন্তু অনেকে উহার পরিবর্তে ভোগনিয়োগপত্র না এমনি কী একটা কথা ব্যবহার করেন তাহা আমাদের মনে থাকে না। কেহ তাহা বুঝেও না।

যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় সংস্কৃতাধ্যাপকগণ প্রথম বাংলা লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন পারস্য কথার প্রতি এরূপ বিদ্বেষ থাকা কতক সম্ভব ছিল। কিন্তু এখন লেখকগণের মধ্যে সংস্কৃত পণ্ডিত অতি বিরল। কিন্তু সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে, এ বিষয়ে উঁহাদের অপেক্ষাও ইঁহারা অধিক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু ইঁহারা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে গিয়া প্রায়ই অর্থবিষয়ে ভয়ানক ভুল করিয়া ও নানারূপ গোলযোগ করিয়া বসেন।

যে সর্বদা উচ্চ অঙ্গের শাস্ত্রতত্ত্ব ভাবিয়া থাকে তাহার নাম ইংরেজিতে thoughtful, বাংলা লেখকেরা উহার নাম রাখিয়াছেন, চিন্তাশীল। চিন্তা বলিলে বাংলায় দুর্ভাবনা বুঝায়, চিন্তিত, চিন্তাযুক্ত, চিন্তাশীল বলিলে, যে সর্বদা দুর্ভাবনাগ্রস্ত অর্থাৎ মনমরা তাহাকেই বুঝায়। সুতরাং চিন্তাশীল শব্দে গ্রন্থকার যাহা বুঝিলেন পাঠক তাহার ঠিক উল্টা বুঝিল।

উপন্যাস বলিতে গল্প বুঝায়, কিন্তু ইংরেজিতে একপ্রকার উপন্যাস

আছে তাহার নাম নবেল, তাহাতে এবং উপন্যাসে প্রণালীগত একটু ভেদ আছে, এইজন্য বাঙালি লেখকেরা উপন্যাস শব্দ ত্যাগ করিয়া নবেলের নাম নবন্যাস রাখিয়াছেন। নবন্যাস বলিতে গেলে সংস্কৃতে নূতন গচ্ছিত ধন বুঝায়, কারণ ন্যাস মানে গচ্ছিত ধন, অতএব নবন্যাস কথাটি সম্পূর্ণরূপে অপরিহার্য।

এক-একদল সৈন্যের নাম আছে column ; কিন্তু column বলিতে থাম বুঝায় আর থামের সঙ্গে সৈন্যদলের ইংরেজের চক্ষে কোনোরূপ সৌসাদৃশ্য থাকায় বোধ হয় ইংরেজে উহাকে column বলে, আমাদের সে সৌসাদৃশ্য চক্ষে লাগে না তথাপি আমাদের লেখকেরা অনায়াসে সৈন্যস্তম্ভ বলিয়া উহার তর্জমা করিয়া থাকেন।

তাই আমরা বলিতেছিলাম, লিখিতে বসিয়া ভাব প্রকাশ করিবার পূর্বে যে কথাগুলি ব্যবহার করিতে হইবে, বিশেষরূপ তদন্ত করিয়া তাহাদের অর্থ ঠিক করা উচিত। এবং নূতন শব্দ গঠনের পূর্বে বিশেষরূপ সতর্ক হওয়া উচিত।

এ-সকল অপেক্ষা আর-একটি সহজ পরামর্শ আছে। যতদিন পর্যন্ত মনোমধ্যে ভাব ইংরেজিতে উদয় হয় ততদিন যেন কেহ বাংলা লিখিতে না বসেন। বাংলা লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্বে যেন বাংলায় ভাবিতে শিখা হয়, তাহা হইলে অনেক সময় নূতন ভাব আপনা আপনিই বাংলায় প্রকাশ হইয়া পড়িবে। তাহার জন্য বেশি মাথা কুটাকুটি করিতে হইবে না।

'বঙ্গদর্শন'
জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৮ ॥

বাংলা ভাষা

বাংলা ভাষায় লিখিতে গেলে প্রথমত রচনাপ্রণালী লইয়া বড়োই গোল বাধে। একদল. জনমেজয় যেমন সর্প দেখিলেই আহুতি দিতেন, সেইরূপ পারসি কথা দেখিলেই তাহাকে তাহারা আহুতি দেন। আর-একদল আছেন, তাঁহারা সংস্কৃত কথার প্রতি সেইরূপ সদয়। কেহ ভাষার মধ্যে সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষার কথা দেখিলেই চটিয়া উঠেন, প্রবন্ধের মধ্যে হাজার ভালো জিনিস থাকুক, আর পড়েন না। আবার কেহ আছেন যেই দেখিলেন, দুই-পাঁচটি সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার হইয়াছে, অমনি সে গ্রন্থ অপাঠ্য বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন। এখন আমরা গরিব, দাঁড়াই কোথা? আমরা ইংরেজি পড়ি আমাদের অর্ধেক ভাবনা

ইংরেজিতে। আমরা কলম ধরিলেই ইংরেজি কথায় ইংরেজি ভাব আইসে। সংস্কৃত আমরা যা পড়ি, তাতে সে ভাব ব্যক্ত হয় না। বাংলার বিদ্যা বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস', আর বঙ্কিমবাবুর নবেল কয়খানি। তাতেও তো কুলায় না। নূতন কথা গড়ি এমন ক্ষমতাও নাই। তবে আমাদের কী হইবে। হয় কলম ছাড়িতে হয়, না-হয় যেরূপে পারি মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া দিতে হয়। নিজের কথায় নিজের ভাব আমি ব্যক্ত করিব, তাহাতে অন্যের কথা কহার স্বত্ব কতদূর আছে জানি না। কিন্তু পূর্বোক্ত দুই দলের লোক দুই দিক হইতে কুঠার লইয়া তাড়া করেন। সুতরাং এক এক সময়ে বোধ হয় "... তত্র মৌনং হি শোভতে", কিন্তু আবার যখন অঙ্গুলিকণ্ডূয়ন উপস্থিত হয়, তখন না লিখিয়াও থাকিতে পারি না। বিশেষ এই যে, যখন কর্তব্যবোধে কোনো কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তখন পাঁচ জনের কথায় তাহা হইতে নিরস্ত হওয়া নিতান্ত কাপুরুষের কাজ। যেকোনো ভাষাই হউক, যেকোনো রচনা প্রণালীতেই হউক, যদি দুটা ভালো কথা বলতে পারি, পাঁচ জনের ভয়ে চুপ করিয়া থাকিব কেন?

তবে ভালো কথা বলিতে যদি মন্দ কথা বলি, তাহা হইলে পাঁচ জনের গালাগালি দিবার বাস্তবিক অধিকার আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পূর্বোক্ত দুই শ্রেণীর সমালোচকগণ কথাটা ভালো-কি-মন্দ সেদিকে লক্ষ্যও করেন না। নাই করুন, কথাটা ভালো করিয়া বলা হইয়াছে কিনা, তাহাও দেখেন না। দেখেন কেবল লেখার মধ্যে বড়ো বড়ো সংস্কৃত কথা আছে কি পারসি ও ইংরেজি শব্দ আছে। মারামারি করেন কেবল তাহাই লইয়া। সুতরাং আমার মতো ক্ষুদ্র লেখকবর্গের সেই বিষয়েই দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হয়। তাহাতেও গোলযোগ। যখন দুই দল দুই দিক ধরিয়া টানাটানি করিতেছেন, তখন উভয় দলের মন রক্ষা করা অসম্ভব। অথচ যে দলের মনরক্ষা না হইবে, তিনিই কুঠার উত্তোলন করিয়া লেখকের প্রতি ধাবমান হইবেন। এ অবস্থায় লেখক বেচারা বিষম সমস্যায় পড়িয়া যায়।

এ সমস্যার কি পূরণ হয় না? এ সংকট হইতে কি পরিত্রাণের উপায় নাই? বঙ্গীয় লেখককুল কি এই প্রতিকূল বাত্যায় ভগ্নপোত হইয়া অপার সমুদ্রে ভাসিবেন? তাঁহারা কি কূলে উঠিতে পারিবেন

না ? সমালোচকদিগের এই বিষম রোগের কি উপশম হইবে না ? উপশম নাই হউক, ইংরেজিতে বলে রোগের নির্ণয় অর্ধেক উপশম। এ রোগের কারণ নির্ণয়ের কি কিছুই চেষ্টাও হইবে না।

অনেকগুলি সুচিকিৎসকের সহিত বিশেষ পরামর্শ করিয়া আমরা ইহার কতক কারণ ঠিক করিয়াছি। ঠিক করিয়াছি বলিতে পারি না। কতক অনুভব করিয়াছি। যাহা বুদ্ধিস্থ হইয়াছে, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিব। এস্থলে কুঠারের ভয় করিলে চলিবে না। যদি আর-কেহ অন্য হেতু— প্রদর্শন করিতে পারেন, নিরতিশয় আনন্দ সহকারে শ্রবণ করিব।

কথাটি এই যে, যাঁহারা এ পর্যন্ত বাংলাভাষায় লেখনী ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই বাংলাভাষা ভালো করিয়া শিক্ষা করেন নাই। হয় ইংরেজি পড়িয়াছেন, না-হয় সংস্কৃত পড়িয়াছেন, পড়িয়াই অনুবাদ করিয়াছেন। কতকগুলি অপ্রচলিত সংস্কৃত ও নূতন গড়া চোয়ালভাঙা কথা চলিত করিয়া দিয়াছেন। নিজে ভাবিয়া কেহ বই লেখেন নাই, সুতরাং নিজের ভাষায় কী আছে না আছে তাহাতে তাঁহাদের নজরও পড়ে নাই।

এখন তাঁহাদের বই পড়িয়া যাঁহারা বাংলা শিখিয়াছেন, তাঁহাদের যথার্থ মাতৃভাষায় জ্ঞান সুদূরপরাহত হইয়াছে। অথচ ইঁহারাই যখন লেখনী ধারণ করেন, তখন মনে করেন যে, আমার বাংলা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তাঁহার বাংলা তিনি এবং তাঁহার পারিষদবর্গ বুঝিল, আর-কেহ বুঝিল না। কেমন করিয়া বুঝিবে ! সে তো দেশীয় ভাষা নহে। সে অনুবাদকদিগের কপোলকল্পিত ভাষার উচ্ছিষ্ট মাত্র। দেশের অধিকাংশ লোকই উচ্ছিষ্ট ভোজনে জাতিপাতের ভয় করে অথচ লেখকমহাশয়েরা তাহাদিগকে কুসংস্কারাপন্ন মূর্খ বলিয়া উপহাস করেন। এই গেল এক দলের কথা।

আবার যখন অনুবাদকদিগের এইরূপ দীর্ঘছন্দ সংস্কৃতের "নিবিড় ঘনঘটাচ্ছন্দের" নদ, নদী, পর্বত, কন্দরের অসম্ভব বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিল, যখন সংস্কৃত, ইংরেজি পড়া অপেক্ষা বাংলা পড়ায় অভিধানের অধিক প্রয়োজন হইয়া পড়িল, তখন কতকগুলি লোক চটিয়া বলিলেন, এ বাংলা নয়। বলিয়া তাঁহারা যত চলিত কথা পাইলেন, তাহাই লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ইঁহাদের সংখ্যা অল্প, কিন্তু ইঁহারা

সংস্কৃতের সং পর্যন্ত শুনিলে চটিয়া উঠেন। এমন-কি ইঁহারা সংস্কৃত-মূলক শব্দ ব্যবহার করিতে রাজি নন। অপভ্রংশ শব্দ, ইংরেজি শব্দ, পারসি শব্দ ও দেশীয় শব্দের দ্বারা লিখিতে পারিলে সংস্কৃত শব্দ প্রাণান্তেও ব্যবহার করেন না। এই গেল আর-এক দলের কথা। সুতরাং এই উভয় দল যে পরস্পরবিরোধী হইবেন, এবং বঙ্গীয় লেখক-গণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবেন, আপত্তি কী।

আমরা যে পূর্বে লিখিয়াছি বাংলাভাষায় যাঁহারা এ পর্যন্ত লেখনী ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই বাংলাভাষা ভালো করিয়া শিক্ষা করেন নাই, ইহা অতি সত্য কথা। আমরা ইতিহাস দ্বারা এইটি সমর্থন করিব।

সকলেই জানেন অতি অল্প দিন পূর্বে বাংলাভাষায় গদ্যগ্রন্থ ছিল না, কিন্তু পদ্য প্রচুর ছিল। ইংরেজি শিক্ষা আরম্ভ হইবার পূর্বে যে-সকল পদ্য লিখিত হইয়াছিল, তাহা বিশুদ্ধ বাংলাভাষায় লিখিত। কৃত্তিবাস, কাশীদাস অনুবাদ করিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাদের গ্রন্থে দু-পাঁচটি অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ থাকিলেও উহা প্রধানত বিশুদ্ধ বাংলা। কবি-কঙ্কণ, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন প্রভৃতি কবিগণের লেখা বিশুদ্ধ বাংলা। গদ্য না থাকিলেও ভদ্র সমাজে যে ভাষা প্রচলিত থাকে তাহাকেই বিশুদ্ধ বাংলাভাষা কহে। আমাদের দেশে সেকালে ভদ্র-সমাজে তিন প্রকার বাংলাভাষা চলিত ছিল। মুসলমান নবাব ও ওমরাহদিগের সহিত যে-সকল ভদ্রলোকের ব্যবহার করিতে হইত, তাঁহাদের বাংলায় অনেক উর্দু শব্দ মিশানো থাকিত। যাঁহারা শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহাদের ভাষায় অনেক সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হইত। এই দুই ক্ষুদ্র সম্প্রদায় ভিন্ন বহু-সংখ্যক বিষয়ী লোক ছিলেন। তাঁহাদের বাংলায় উর্দু ও সংস্কৃত দুই মিশানো থাকিত। কবি ও পাঁচালি-ওয়ালারা এই ভাষায় গীত বাঁধিত। মোটামুটি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, বিষয়ী লোক, ও আদালতের লোক এই তিন দল লোকের তিন রকম বাংলা ছিল। বিষয়ী লোকের যে বাংলা তাহাই পত্রাদিতে লিখিত হইত, এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা ঐরূপ বাংলা শিখিলেই যথেষ্ট জ্ঞান করিত।

ইংরেজেরা এ দেশ দখল করিয়া ভাষার কিছুমাত্র পরিবর্তন করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহারা বহু-সংখ্যক আদালত স্থাপন করায় এবং

আদালতে উর্দু ভাষা প্রচলিত রাখায় বাংলাময় পারসি শব্দের কিছু অধিক প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল মাত্র। সাহেবেরা পারসি শিখিতেন, বাংলা শিখিতেন। দেশীয়েরা দেশীয় ভাষায় তাঁহাদের সহিত কথা কহিতেন। সুতরাং ইংরেজি কথা বাংলার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে নাই। যাঁহারা ইংরেজি শিখিতেন বা ইংরেজের সহিত অধিক মিশিতেন দেশের মধ্যে প্রায়ই তাঁহাদের কিছুমাত্র প্রভুত্ব থাকিত না।

কথক মহাশয়েরা বহু-কালাবধি বাংলায় কথা কহিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা সংস্কৃতব্যবসায়ী কিন্তু তাঁহারা যে ভাষায় কথা কহিতেন তাহা প্রায়ই বিশুদ্ধ বিষয়ী লোকের ভাষা। কেবল জমকালো বর্ণনাস্থলে ও সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যাস্থলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতি ভাষার অনুসরণ করিতেন।

আমাদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে যে সময়ে ইংরেজ মহাপুরুষেরা বাঙালি-দিগকে বাংলা শিখাইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন, সেই সময়ে যে-সকল পণ্ডিতের সহিত তাঁহাদের আলাপ ছিল তাঁহারা সংস্কৃত কালেজের ছাত্র। তখন সংস্কৃত কালেজ বাংলায় একঘরে। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা তাঁহাদিগকে যবনের দাস বলিয়া সঙ্গে মিশিতে দিতেন না। তাঁহারা যে-সকল গ্রন্থাদি পড়িতেন তাহা এ দেশমধ্যে চলিত ছিল না। এমন-কি দেশীয় ভদ্রসমাজে তাঁহাদের কিছুমাত্র আদর ছিল না। সুতরাং তাঁহারা দেশে কোন্ ভাষা চলিত কোন্ ভাষা অচলিত, তাহার কিছুই বুঝিতেন না। হঠাৎ তাঁহাদিগের উপর বাংলা পুস্তক প্রণয়নের ভার হইল। তাঁহারাও পণ্ডিতস্বভাবসুলভ দাম্ভিকতাসহকারে বিষয়ের গুরুত্ব কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া লেখনী ধারণ করিলেন।

পণ্ডিতদিগের উপর পুস্তক লিখিবার ভার হইলে তাঁহারা প্রায়ই অনুবাদ করেন। সংস্কৃত কালেজের পণ্ডিতেরাও তাহাই করিলেন। তাঁহারা যে-সকল অপ্রচলিত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন তাহারই তর্জমা আরম্ভ করিলেন। রাশি রাশি সংস্কৃত শব্দ বিভক্তি পরিবর্জিত হইয়া বাংলা অক্ষরে উত্তম কাগজে উত্তমরূপে মুদ্রিত হইয়া পুস্তকমধ্যে বিরাজ করিতে লাগিল। যিনি 'কাদম্বরী' [১৮৫৪ খৃ.] তর্জমা করিয়াছিলেন [তারাশঙ্কর তর্করত্ন, মৃ. ১৮৫৮ খৃ.], তিনি লিখিলেন, "একদা প্রভাতকালে চন্দ্রমা অস্তগত হইলে, পক্ষিগণের কলরবে অরণ্যানী কোলাহলময় হইলে, নবোদিত রবির আতপে গগনমণ্ডল লোহিত বর্ণ হইলে, গগনাঙ্গন-

বিক্ষিপ্ত অন্ধকাররূপ ভস্মরাশি দিনকরের কিরণরূপ সম্মার্জ্জনী দ্বারা দূরীকৃত হইলে, সপ্তর্ষিমণ্ডল অবগাহনমানসে মানসসরোবরতীরে অবতীর্ণ হইলে, শাল্মলীবৃক্ষস্থিত পক্ষিগণ আহারের অন্বেষণে অভিমত প্রদেশে প্রস্থান করিল।" আমরা পূর্বে যে তিন ভাষার উল্লেখ করিয়াছি, ইহার সহিত তাহার একটিরও সম্পর্ক নাই।

এতো গেল সংস্কৃত হইতে অনুবাদ। ইংরেজি হইতে অনুবাদ একবার দেখুন, "পাঠশালার সকল বালকই, বিরামের অবসর পাইলে, খেলায় আসক্ত হইত ; কিন্তু তিনি সেই সময়ে নিবিষ্টমনা হইয়া, ঘরট্ট প্রভৃতি যন্ত্রের প্রতিরূপ নির্ম্মাণ করিতেন। একদা, তিনি একটা পুরাণ বাক্স লইয়া জলের ঘড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ ঘড়ীর শঙ্কু বাক্সমধ্য হইতে অনবরতবিনির্গতজলবিন্দুপাতের দ্বারা নিমগ্নকাষ্ঠখণ্ড প্রতিঘাতে পরিচালিত হইত : বেলাববোধনার্থ তাহাতে একটী প্রকৃত শঙ্কুপট্ট ব্যবস্থাপিত ছিল।" [বিদ্যাসাগর রচিত 'জীবনচরিত', ১৮৪৯ খৃ.]। ইংরেজি পড়িলে বরং ইহা অপেক্ষা সহজে বুঝা যাইতে পারে।

এই শ্রেণীর লেখকের হস্তে বাংলাভাষার উন্নতির ভার অর্পিত হইল। লিখিত ভাষা ক্রমেই সাধারণের দুর্বোধ ও দুষ্পাঠ্য হইয়া উঠিল। অথচ এডুকেশন ডেস্‌প্যাচের কল্যাণে সমস্ত বঙ্গবাসী বালক এই প্রকারের পুস্তক পড়িয়া বাংলাভাষা শিখিতে আরম্ভ করিল। বাংলাভাষার পরিপুষ্টির দফা একেবারে রফা হইয়া গেল।

সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদিগের দেখাদেখি ইংরেজিওয়ালারাও লেখনী ধারণ করিলেন। বাংলায় সংস্কৃত কালেজের ছাত্রেরা যেমন একঘরে ছিলেন, ইংরেজিওয়ালারাও তাহা অপেক্ষা অল্প ছিলেন না। তাঁহারাও পূর্বোক্ত ত্রিবিধ বাংলাভাষার কিছুমাত্র অবগত ছিলেন না। অধিকন্তু তাঁহাদের ভাব ইংরেজিতে মনোমধ্যে উদিত হইত, হজম করিয়া নিজ কথায় তাহা ব্যক্ত করিতে পারিতেন না। নূতন কথা তাঁহাদের গড়ার প্রয়োজন হইত। গড়িতে হইলে নিজ ভাষায় ও সংস্কৃতে যেটুকু দখল থাকা আবশ্যক তাহা না থাকায় সময়ে সময়ে বড়োই বিপন্ন হইতে হইত। উৎপিপীড়িষা, জিজীবিষা, জিঘাংসা, প্রভৃতি কথার সৃষ্টি হইত। "তুষারমণ্ডিত হিমালয়, গিরিনিঃসৃত নির্ঝর, আবর্ত্তময়ী বেগবতী নদী, চিত্তচমৎকারক ভয়ানক জলপ্রপাত, অযত্নসম্ভূত উষ্ণপ্রস্রবণ,

দিক্‌দাহকারী দাবদাহ, বসুমতীর তেজঃপ্রকাশিনী সুচঞ্চল শিখা-নিঃসারিণী, লোলায়মানা জ্বালামুখী, বিংশতিসহস্র জনের সন্তাপনাশক বিস্তৃত-শাখা-প্রসারক বিশাল বটবৃক্ষ, শ্বাপদনাদে নিনাদিত বিবিধ বিভীষিকাসংযুক্ত জনশূন্য মহারণ্য, পর্বতাকার তরঙ্গবিশিষ্ট প্রসারিত সমুদ্র, প্রবল ঝঞ্ঝাবাত, ঘোরতর শিলাবৃষ্টি, জীবিতাশাসংহারক হৃৎকম্পকারক বজ্রধ্বনি, প্রলয়-শঙ্কাসমুদ্ভাবক ভীতিজনক ভূমিকম্প, প্রখররশ্মিপ্রদীপ্ত নিদাঘমধ্যাহ্ন, মনঃ-প্রফুল্লকরী সুধাময়ী শারদীয় পূর্ণিমা, অসংখ্য তারকামণ্ডিত তিমিরাবৃত বিশুদ্ধ গগনমণ্ডল ইত্যাদি ভারতভূমিসম্বন্ধীয় নৈসর্গিক বস্তু ও নৈসর্গিক ব্যাপার অচিরাগত কৌতূহলাক্রান্ত হিন্দুজাতীয়দিগের অন্তঃকরণ এরূপ ভীত, চমৎকৃত ও অভিভূত করিয়া ফেলিল যে, তাঁহারা প্রভাবশালী প্রাকৃত পদার্থ-সমুদয়কে সচেতন দেবতা জ্ঞান করিয়া সর্বাপেক্ষা তদীয় উপাসনাতেই প্রবৃত্ত থাকিলেন।" [অক্ষয়কুমার দত্ত রচিত 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' প্রথম ভাগ (১৮৭০ খৃ.), উপক্রমণিকা]। এ ভাষায় মন্তব্যপ্রকাশ নিষ্প্রয়োজন। আমরা বিশেষ যত্ন পূর্বক দেখিয়াছি যে, যে বালকেরা এই সকল গ্রন্থ পাঠ করে, তাহারা অতি সত্বরেই এই সকল কথা ভুলিয়া যায়। কারণ, এরূপ শব্দ তাহাদিগকে কখনোই ব্যবহার করিতে হয় না। আমাদের এক পুরুষ পূর্বে লোকের সংস্কার এই ছিল যে, চলিত শব্দ পুস্তকে ব্যবহার করিলে সে পুস্তকের গৌরব থাকে না। সেই জন্য তাঁহারা বরফের পরিবর্তে তুষার, ফোয়ারার পরিবর্তে প্রস্রবণ, ঘূর্ণির পরিবর্তে আবর্ত, গ্রীষ্মের পরিবর্তে নিদাঘ প্রভৃতি আভাঙা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়া, গ্রন্থের গৌরব রক্ষা করিতেন। অনেক সময়ে তাঁহাদের ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃতেও তত চলিত নহে, কেবল সংস্কৃত অভিধানে দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। ভট্টাচার্যদিগের মধ্যে যে-সকল সংস্কৃত শব্দ প্রচলিত ছিল, তাহা গ্রন্থকারেরা জানিতেন না, সুতরাং তাঁহাদের গ্রন্থে সে-সকল কথা মিলেও না। শুনিয়াছি গ্রন্থ-কারদিগের মধ্যে দুই-পাঁচ জন হয়, একখানি অভিধান, না-হয় একজন পণ্ডিত সঙ্গে লইয়া লিখিতে বসিতেন।

এই সকল কারণ বশত, বলিয়াছিলাম যে, যাঁহারা বাংলা গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাঁহারা ভালো বাংলা শিখেন নাই। লিখিত বাংলা ও কথিত বাংলা এত তফাত হইয়া পড়িয়াছে যে, দুইটিকে এক ভাষা

বলিয়াই বোধ হয় না। দেশের অধিকাংশ লোকেই লিখিত ভাষা বুঝিতে পারে না। এ জন্যই সাধারণ লোকের মধ্যে আজও পাঠকের সংখ্যা এত অল্প। এ জন্যই বহু-সংখ্যক সম্বাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা জলবুদ্বুদের ন্যায় উৎপন্ন হইয়াই আবার জলে মিশিয়া যায়।

গ্রন্থকারেরা বাংলাভাষা না শিখিয়া বাংলা লিখিতে বসিয়া এবং চলিত শব্দ সকল পরিত্যাগ করিয়া অপ্রচলিত শব্দের আশ্রয় লইয়া ভাষার যে অপকার করিয়াছেন, তাহার প্রতিকার করা শক্ত। যদি তাঁহাদের সময়ে ইংরেজি ও বাংলার বহুল চর্চা না হইত, তাহা হইলে অসংখ্য ক্ষুদ্র গ্রন্থকারদিগের ন্যায় তাঁহাদের নামও কেহ জানিত না। কিন্তু তাঁহাদের সময়ে শিক্ষাবিভাগ স্থাপিত হওয়ায়, তাঁহাদিগের প্রভাব কিছু অতিরিক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে। এবং এই কয় বৎসরের মধ্যে ইংরেজির অতিরিক্ত চর্চা হওয়ায় বহু-সংখ্যক ইংরেজি শব্দ ও ভাব, বাংলাময় ছড়াইয়া পড়ায় বিষয়ী লোকের মধ্যে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহার এত পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে যে, পূর্বে উহা কিরূপ ছিল, তাহা আর নির্ণয় করিবার জো নাই।

ভট্টাচার্য ও কথকদিগের মধ্যে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহা এখনো কতক কতক নির্ণীত হইতে পারে। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর লোক এত অল্প হইয়া আসিয়াছে যে, সেরূপ নির্ণয় করাও সহজ নহে। গ্রন্থকারদিগের বাংলা বাংলা নহে। বিশুদ্ধ বাংলা কী ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। এ অবস্থায় আমাদের মতো লেখকের গতি কী? হয়, ইংরেজি, পারসি, বাংলা, ও সংস্কৃতময় যে ভাষায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনাদি প্রসিদ্ধ ভদ্রসমাজে কথাবার্তা চলে সেই ভাষায় লেখা, না-হয়, যাহার যেমন ভাষা যোগায় সেই ভাষায় নিজের ভাব ব্যক্ত করা। এই সিদ্ধান্তের প্রতি যাঁহাদের আপত্তি আছে, তাঁহারা কিরূপ ভাষাকে বিশুদ্ধ বাংলাভাষা বলেন, প্রকাশ করিয়া বলিলে গরিব লোকের যথেষ্ট উপকার করা হয়। যত দিন না বলিতে পারেন, তত দিন কুঠার আঘাত বিষয়ে তাঁহাদের কিছুমাত্র অধিকার নাই।

'বঙ্গদর্শন' গ্রাডুএট।

শ্রাবণ, ১২৮৮॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য।

বাংলা ভাষা প্রবন্ধটিতে শাস্ত্রী মহাশয়ের যে অন্তর্দৃষ্টি প্রকাশিত হয়েছে তা আর কোনো বাংলাভাষার আলোচনাকারীদের মধ্যে দেখি নি। এমন-কি রবীন্দ্রনাথও এমন কথা বলেন নি।

রবীন্দ্রনাথকে সহজেই ক্ষমা করতে পারি। তিনি পণ্ডিত ঘরের ছেলে ছিলেন না, সুতরাং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের 'ভাষ' ও ভাষার সঙ্গে তাঁর কোনো পরিচয় ছিল না এবং প্রাচীন ধরনের কথকথা তিনি কখনো শোনেন নি। তাই সাধারণ্যে অবগত অনেক প্রচলিত বাংলা শব্দের সঙ্গে সেগুলির স্থানে ব্যবহৃত নব প্রচলিত সংস্কৃত শব্দের তুলনা করতে পারেন নি। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে তাঁর রচনায় এমন অনেক অপ্রচলিত বাংলা শব্দ আছে যা তিনি নির্বাচন করতে পেরেছিলেন স্রেফ কবি প্রতিভার বলে।

শাস্ত্রী মহাশয়ের আগে এবং পরে অনেক প্রতিষ্ঠিত বাংলা লেখক পণ্ডিত বাড়ির ছেলে ছিলেন এবং নিজেরাও চৌকস পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তাঁদের কেউই পুরানো চলিত বাংলা শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না।

এমন শব্দ যথাসম্ভব নিজের রচনায় ব্যবহার করে শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের যে জ্ঞানাঞ্জন উপহার দিয়ে গিয়েছিলেন তা আমরা এতদিন চোখে লাগাতে পারি নি। আর পারবো বলেও বোধ হচ্ছে না। তবে ভবিষ্যতে শব্দবিদ্যানুসন্ধিৎসুরা শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রদত্ত জ্ঞানাঞ্জন চোখে লাগালে দেশের ও দশের উপকার হবে।

শ্রীসুকুমার সেন।

বাংলা হিন্দু মুসলমানের দেশ। মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর প্রায় অর্ধেক। বাংলার লেপ্টেনেট গবর্নরের শাসনাধীন দেশে যত মুসলমান আছে, সমস্ত তুর্কের সাম্রাজ্যে তত আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু দুঃখের মধ্যে হিন্দুরা মুসলমানদিগের বড়ো একটা খবর রাখেন না। এই সকল মুসলমানেরা কিন্তু বাঙালি, বাংলার উপর হিন্দুদিগের যত টান, মুসলমানদিগের তদপেক্ষা কোনো মতেই কম নহে। অনেক মুসলমান লেখক বাংলা ভাষায় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিয়াছেন। মুসলমানেরা দুই-তিনখানি বাংলা সংবাদপত্র চালাইয়া থাকেন, তাহার বাংলা অন্যান্য বাংলা সংবাদপত্রের বাংলা হইতে বিশেষ বিভিন্ন নহে। মীর

মোশার্‌রফ হোসেন 'বিষাদ সিন্ধু' নামক যে পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন, তাহা বাংলার একখানি মহারত্ন।[১] উহার মহরম পর্ব ও উদ্ধার পর্ব পাঠ করিলে মহম্মদের পরবর্তী মুসলমানগণের ইতিহাস, আচার, ব্যবহার, শাসনপ্রণালী ইত্যাদি সুন্দররূপে জানিতে পারা যায় ও মুসলমানেরা সেই সময়ে নব ধর্মের উত্তেজনায় পড়িয়া যেরূপ উদ্দীপনা লাভ করিয়াছিলেন, তাহারো কিয়দংশ পাঠকগণের মনে সংক্রামিত হয়। মীর মোশার্‌রফ হোসেনের 'বসন্তকুমারী' নাটকও উৎকৃষ্ট বাংলায় লিখিত।

যে-সকল মুসলমান লেখক এই-সকল বাংলা গ্রন্থ বা বাংলা সংবাদ-পত্র রচনা করেন, তাঁহারা প্রায়ই সুশিক্ষিত লোক। কিন্তু অশিক্ষিত মুসলমানেরাও বাংলা ভাষায় বহুতর পুস্তক লিখিয়া থাকেন। তাঁহাদের পুস্তক যে ভাষায় লিখিত হইয়া থকে, তাহাকে মুসলমানি বাংলা কহে। মুসলমানি বাংলাকে একটি স্বতন্ত্র ভাষা বলিতে পারা যায় না। উহা বাংলাভাষার একটি অবান্তর ভাগ মাত্র। মুসলমান লেখক যে জেলায় বাস করেন, সেই জেলার অনেক প্রচলিত কথা তাঁহার গ্রন্থে স্থান প্রাপ্ত হয়। আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক উর্দু, আরবি ও পারসি মিশ্রিত হইয়া থাকে।

আমরা পূর্ববাংলা হইতে অনেকগুলি মুসলমানি বাংলা গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকি। শ্রীহট্টের পুস্তকগুলি 'কাটনাগরি' নামক অক্ষরে লিখিত। শিয়ালদ হাজিপাড়ায় কাটনাগরির একটি প্রেস আছে, প্রতি বৎসর সেই প্রেস হইতে অনেকগুলি পুস্তক প্রচারিত হয়; সাধারণত মুসলমানি বাংলা পুস্তক। বাংলা পুস্তক যেখানে শেষ হয়, সেইখান হইতে আরম্ভ হয়; কিন্তু দুই-একখানি পুস্তক বাংলা পুস্তকের ন্যায় আরম্ভ হইতেও দেখিয়াছি। উর্দু ও পার্সি যেরূপ প্রতিছত্র ডাইনদিক হইতে আরম্ভ করিয়া বামদিকে যায়, মুসলমানি বাংলার সেরূপ নহে। মুসলমানি বাংলার ছত্রগুলি বামদিক হইতে ডাইনদিকে যায়। কেবল কেতাবখানি আমরা যাহাকে শেষ দিক বলি, সেই দিক হইতে আরম্ভ হয়। মুসলমানি বাংলা গ্রন্থ অধিকাংশ কলিকাতা, ঢাকা ও কুমিল্লা হইতে প্রকাশিত হয়। ময়মনসিংহ জেলারও কোনো কোনো স্থানে মুসলমানি বাংলার ছাপাখানা আছে।

মুসলমানি বাংলায় বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক নাই। মুসলমানদিগের আইন ও ধর্মের পুস্তকের সংখ্যাও অতি অল্প। এই ভাষায় যত পুস্তক বাহির হয়, তাহার অধিকাংশই গল্পের বহি এবং পয়ারাদি নানা ছন্দোবন্ধে লিখিত। এই-সকল গল্পের বহি বা কেচ্ছার কেতাবে যেমন বাংলা ও পারসি শব্দ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ হিন্দুর দেবদেবীর সঙ্গে মুসলমান পীর-ফকিরের কথাও একত্রে লিখিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, হাসেন, হোসেন আলি একত্রে জড়িত হইয়া একরূপ অপূর্ব শোভা ধারণ করে। এই ভাষার একখানি পুস্তকের নাম 'শুজ্জু উজালবিবির কেচ্ছা'। এই পুস্তকের গোড়ার কয়েক পংক্তি তুলিয়া দিতেছি—

> "আল্লা আল্লা বল ভাই যত মমিনগণ,
> শুর্জ্জু উজাল বিবির কিছু শুনা দিয়া মন।
> শুর্জ্জু উজাল বিবি যদি শুজ্জু পানে চায়,
> দেখিয়া আশমানের শুর্জ্জু সেই লজ্জা পায়
> শুজ্জ উজাল বিবিএর ছাই অঙ্গনাল
> আছমানের চন্দ্র দেখে হয় ময়লাহাল।"

গল্পটি অতি সুন্দর।

মহম্মদের জামাতা আলি মহম্মদের কন্যা ফতেমাবিবির এন্তেকালের পর হনুফাবিবি নামক আর একটি কন্যা বিবাহ করেন। হনুফাবিবির পুত্রের নাম হানিফা। হানিফার পাঁচ বিবাহ।

> "পহেলা করেছে সাদি মল্লিকা আকার,
> তার পরে করে সাদি জৈগুন সুন্দর।
> সোম্বওভানে করে সাদি জোরে পাইলওয়ান,
> তার পরে করে সাদি বিবি সোণাভান।
> পবনকু-মারী বিয়া করে আপনার জোরে,
> এই পঞ্চ বিবি দেব হানিফার ঘরে।"

একদিন হানিফা পাঁচ বিবির সঙ্গে বসিয়া হাস্য পরিহাস করিতেছেন, এমন সময়ে হানুফাবিবি বলিলেন, "আজি আমার ঘরে তোমাদের খানা খাইতে হইবে।" সকলে খানা খাইতে বসিয়াছেন, হানিফা বিবিদের রূপ দেখিয়া এমতো মোহিত হইয়াছেন যে, তাঁহার

হাতের গ্রাস পাতে পড়িয়া গেল, মুখে আর উঠিল না। ইহা দেখিয়া সাদোয়ান (খানার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) আল্লার নিকটে গিয়া ফরিয়াদ করিল যে—

"ফরিয়াদ আমার এই শুন পাক সাই,
হুকুম কর আমি আজ দুনিয়া ছেড়ে যাই।
যাইয়া যে নিজপুরি রহি ছাপাইয়া,
মরুক হানিফা তবে মোরে না চিনিয়া।
আমাকে ভুলিয়া দেখে নারির ছুরত,
আমি বিনে ছুরাত রহে কেয়াছা ভাত।
আল্লা বলে সাদোয়ান থাকহ সংসারে,
সবার কেছমকে থাক মার হানিফারে।
এত যদি কহিলেন আপনি নিরঞ্জন,
জৈগুন বিবি জানিল গায়েরে তখন।"

জৈগুনবিবি আল্লা-দরবারের কথা জানিতে পারিয়া কানে কানে সোনাভানকে এই কথা বলিতেছেন, এমন সময় হানিফা বলিলেন, তোমরা কী বলাবলি করিতেছ? তখন জৈগুন বলিলেন যে, তুমি আমাদের রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়াছ, কিন্তু আমাদের অপেক্ষাও সুন্দরী এক বিবি আছে—

"এমনি ছুরত তাহে দিল বারিতালা,
চন্দ্র কে জিনিয়া তার ছুরত উজালা।"

শুনিয়াই হানিফা সেই বিবির জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন, কিছুতেই তাঁহার নিবৃত্তি হইল না। তিনি সেই রমণীর অন্বেষণে যাইতে উদ্যত হইলেন। বিবিগণ কান্দিয়া বলিতে লাগিল—

"কলেমা পড়িনু মোরা জাত মজাইয়া,
আকবত পাব বলি ভরসা করিয়া।
তাহাতে করিলে তুমি সবারে নৈরাশ,
আর না যাইব মোরা মা বাপের পাস।"

কিন্তু হানিফার কিছুতেই তৃপ্তি নাই, হানিফা আহার ত্যাগ করিল। হানুফা একদিন খানা পাকাইয়া সামনে ধরিলেন, কিন্তু সাদোয়ান ফুল

হইয়া উড়িয়া গেল, সকলে কান্দিয়া আকুল হইল। হানিফা বলিলেন—

"হানিফা বলেন আমি দানা নাহি খাব,
আল্লার নামেতে তবে ফকির হইব।
তছ্‌বি হাতে নিল মর্দ্দ ত্যাজিছিল ছেবে,
ফকির হইল মর্দ্দ আল্লার রাহা পরে।"

তখন হানিফা বারকোটে গিয়া শুর্জ উজালবিবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। আট দিন অনাহারে নিরন্তর ভ্রমণে একান্ত ক্লান্ত হইয়া হানিফা নদীতীরস্থ এক বৃক্ষতলে উপবেশন করত আল্লার নাম লইতে আরম্ভ করিলেন। আশা বৃক্ষ নদীগর্ভে পতিত হইয়া তাহার জীবলীলা সাঙ্গ করিবেন। জিবরিল তখন অত্যন্ত কাতর হইয়া আল্লার নিকট হানিফার দুর্দশার কথা বর্ণন করিলেন, তখন—

"আল্লা বলে জিবরিল শুন দিল দিয়া,
ঘোড়া খেতুর পাখী আছে আন বোলাইয়া।
হানিফার দোসর হউক যাইয়া নিকটে,
পাইবে খাইতে খানা গেলে বারকোটে।"

স্মরণমাত্র ঘোড়া খেতুর উপস্থিত হইল। আল্লাতালা তাহাকে হানিফার পথপ্রদর্শক হইয়া বারকোটে লইয়া যাইতে বলিলেন। আজ্ঞামাত্র ঘোড়া খেতুর হানিফার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বারকোটে লইয়া যাইবার কথা বলিল। বারকোটের নাম শুনিয়াই হানিফা জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ বারকোট? যেখানে শুজ্জু উজালবিবি আছেন? ঘোড়া খেতুর বলিল, হাঁ। তাহা শুনিয়া হানিফা হৃষ্টচিত্তে পক্ষীর অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া হানিফা ঘোড়া খেতুরকে বলিলেন, ভাই, তুমি একটু ডালের উপর বইস। আমি নমাজ পাড়িয়া লই। হানিফার নমাজের এক অংশ উদ্ধৃত হইল।

"এলাহি আলয়ামীন আল্লা গোন কর মাপ,
আর না সহিতে পারি সাদোয়ানের তাপ।
মাপ কর আল্লাতালা আমার তছবির,
থোরা খানা দিলাও আল্লা আমার খাতির।"

তখন খোদা হানিফার কাতরতায় কাতর হইয়া জিবরিলকে স্মরণ

করিলেন এবং বলিলেন, জিবরিল, তুমি হানিফাকে মেবামতপুরে লইয়া যাও— যেখানে আজি মেহমানি যজ্ঞ হইতেছে। তথায় উহাকে খানা খাওয়াও। জিবরিল ফকিরের বেশ ধারণ করিয়া হানিফার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মেহমানিতে উপস্থিত হইলেন। তথায় অনেক ফকির উপস্থিত ছিলেন। জিবরিল তাঁহাকে বিছানার উপর বসাইয়া রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। যথা সময়ে আদিম-গণ (পরিবেশনকারীগণ) খানা লইয়া আসিল। হানিফা বলিলেন, তোমাদের কল্যাণে আজি আমি ছয় মাসের পর খানা খাইলাম— বলিয়া আহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু খোদার নাম লইলেন না, অমনি খোদার আজ্ঞায় সমস্ত অন্ন উড়িয়া গেল। অমনি সমবেত ফকিরগণ বলিয়া উঠিল, এই দুষ্ট ফকির ভূতের সাহায্যে আমাদের অন্ন উড়াইয়া দিয়াছে। বলিয়া হানিফাকে বাঁধিয়া মারিতে উদ্যত হইল। তখন হানিফা আপন পরিচয় দিলেন, যে রূপে সাদোওমানের ফরিয়াদে তাঁহার অন্ন বন্ধ হইয়াছে, তাহাও বিবৃত করিলেন। তখন সকলে মিলিয়া তাঁহাকে দুধ ও অন্যান্য খাবার আনিয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহা হইল না, সমস্ত খাদ্য দ্রব্য উড়িয়া গেল। হানিফা কাঁদিয়া ঘোড়া খেতুরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং উভয়ে বারকোটে গেলেন। তথায় শুজ্জু উজালবিবি যে মসজিদে নেমাজ পড়েন, সেই মসজিদে গিয়া বসিয়া রহিলেন। বিবি নেমাজ পড়িয়া হানিফাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে ? হানিফা আপন পরিচয় দিল। বিবি বলিলেন, তুমি যে নবীর খানদান, তাহার পরিচয় কিসে পাইব ? আমি তোমায় কতক-গুলি সওয়াল করি, তুমি তাহার জবাব দাও। বলিয়া কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন। প্রশ্ন শুনিয়া হানিফা পরদিন প্রত্যূষে জবাব দিবেন স্বীকার করিলেন। কিন্তু তাঁহার আত্মাপুরুষ শুষ্ক হইল। তখন ঘোড়া খেতুর আসিয়া বলিল, হানিফা, তুমি বড়ো বিপদগ্রস্ত হইয়াছ। এই-সকল প্রশ্নের জবাব দেওয়া তোমার কর্ম নয়। তুমি এই কর্ম করো, একগাছা পালক দিয়া যাইতেছি, তাই লইয়া থাকো, শুজ্জু উজাল সকালে আসিয়া —তুমি জবাব দিতে না পারিলে, আওয়াজে তোমায় ভস্মরাশি করিয়া ফেলিবে। তুমি যদি এই পালক সম্মুখে ধরো, তোমার কিছুই হইবে না। আমি আল্লার নিকট তোমার জন্য দরবার করিতে যাই। বলিয়া ঘোড়া

খেতুর আল্লার দরবারে গমন করিল এবং বলিল, সাদোয়ান বিহনে হানিফার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়াছে, তাহাকে হানিফের নিকট না পাঠাইলে বিপদ উদ্ধার হয় না। আল্লা তখন সাদোয়ানকে কহিলেন, আর অভিমান করিয়া থাকিলে চলিবে না, তুমি যাও, হানিফের নিকট আবির্ভাব হও। সাদোয়ান অগত্যা তাঁহার মুখে উঠিল। হানিফার ধড়ে বুদ্ধি আসিল।

পর দিন যখন শুজ্জু উজাল উপস্থিত হইলেন এবং মনোমতো জবাব না পাইলেন, তখন ঘোরতর আওয়াজ করিলেন। পালকের বলে হানিফার কিছুই হইল না।

এ দিকে জৈগুন সেই আওয়াজ শুনিতে পাইলেন এবং স্বামীর বিপদ জানিতে পারিয়া শাশুড়ি হানিফাবিবিকে বলিলেন। হানিফা কাঁদিয়া গিয়া মক্কায় ফতেমাবিবি তাঁহার সপত্নীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বারকোটে যাইতে বলিলেন।

ফতেমা রাজি হইলেন এবং আলির অনুমতি অনুসারে বারকোট যাত্রা করিলেন।

"অতএব ফতেমাজান বারকোটে দেশে,
শুরুজ করিল বন্ধ আপন বাতাসে।
শুরুজের জেত বন্ধ করিলেন আপনি,
ঠাণ্ডা হাওয়া ছাড়িলেন পবন তাহা জানি।
মাসেকের পথ মাতা আইল তিলেকে,
তবে নিজ মূর্ত্তি মাতা হন আপনাকে।"

যখন জগন্মাতা ফতেমা বারকোটে উপস্থিত হইলেন, তখন শুজ্জু উজালের আর সন্দেহ রহিল না, তিনি হানিফাকে নবীরে খানদান জানিয়া তাহার সঙ্গে বিবাহ করিলেন, হানিফা তাঁহাকে কলমা পড়াইয়া ধর্মে দীক্ষিত করিলেন এবং শুজ্জু উজাল আপনার সমস্ত ধনসম্পদ পাড়া-পড়শিকে বিলাইয়া দিয়া শ্বশুর বাড়ি গেলেন।

মুসলমানি বাংলার একটি কেচ্ছা পাঠকবর্গকে উপহার দিয়া অদ্যকার মতো বিদায় হইলাম।

'বিভা'
ফাল্গুন, ১২৯৪ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

বেঙ্গল লাইব্রেরির রিপোর্টে মুসলমানি সাহিত্য সম্পর্কে শাস্ত্রীমশায়ের মন্তব্য—

"Musulmani Bengali is used by Mahomedans living in remote corners of Bengal, especially East Bengal. Education has not made much progress among them; they still believe in those strange events and wild stories which furnish matter for nursery tales; and writers among them show a license of imagination which is scarcely to be found among their more educated countrymen." (*RBL*, 1890, p. 5.).

১. মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২ খৃ.) রচিত 'বিষাদ-সিন্ধু' মহরম পর্ব ১৮৮৫, উদ্ধারপর্ব ১৮৮৭ এবং এজিদ-বধ পর্ব ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 'বসন্তকুমারী নাটক' প্রকাশিত হয় ১৮৭৩ খৃ.। বেঙ্গল লাইব্রেরির রিপোর্টে তাঁর কয়েকটি বই সম্পর্কে শাস্ত্রীমশায়ের মন্তব্য পাওয়া যায়।

গো-জীবন (১৮৮৯ খৃ.)

"The cow-protection movement, which has produced so much stir and excitement in other provinces of India, was not received with much enthusiasm by the Hindus of Bengal, as would appear from the complete absence of any work by Hindu writers on the subject. The only two works received are written by Muhammadans. Mir Mushāruf Hossein in his *Gojīvan* advocated on broad principles of humanity the protection of such a useful animal as the cow is

in India, while Naimuddin in his *Gokanda* quotes from the Koran and the Hadis, and proves that beef is lawful meat for Musalmans. The controversy between these two persons and their followers was carried on with some acrimony." (*RBL*-1889, p. 6)

উদাসীন পথিকের মনের কথা (১৮৯০ খৃ.)
বিষাদ-সিন্ধু, এজিদ-বধ পর্ব

"...*Udāsīn Pathiker Maner kathā* and *Bishād Sindhu*, Part III, are written in Mīr Mosharruf Hosin's usual bold and attractive style. *Bishād Sindhu*, Part III, brings the novel on the early struggles of the Saracens to an end. The account given in it differs greatly from that given by authentic history ; but the Bengal Musalmans have moulded the early history of Islam in their own peculiar way by mixing much that is mythological and miraculous with it. The last scene describes Yezid as entering into a well where he now burns in perpetual hell-fire.

"*Udāsīn Pathiker Maner kathā* gives the causes of the Indigo Riots, describes the efforts of Government to suppress them by gentle and conciliatory means, and the effects on the native population produced by the durbar held by Sir Peter Grant at Pabna. The raiyats, who lived in constant dread of the planters, felt for the first time the majesty and grandeur of the British Raj, before which the planters sank into insignificance. The effects of the durbar, together with the establishment of a number of inferior courts of first instance, completely removed the causes that led to the riots." (*RBL*, 1891, p. 5).

মৌলুদ শরীফ (১৯০৩ খৃ.)

"There are two Muhammadan writers who stand pre-eminent for their works in standard Bengali. One is Maulavi Naimuddin, whose translation of the *Korān Sharif* has made much progress. The other is Mir Masāraf Hussain, who, though he has very strong sympathy for the Hindus, is still a staunch Muhammadan. His recent work, the *Maulud-Sharif*, shows what a deep reverence he has for his ancestral religion." (*RBL*, 1894, p. 6.).

বঙ্গদেশের বড়ো দুর্ভাগ্য। আমরা দেশের লোক চিনি না। আমরা পীল, ন্যাস, ওয়েবস্টার, বোমণ্ট, ফ্লেচার, ডেবেনান্ট, ফারকুহার, কন্‌গ্রীব, সাডওয়েল, টমসন, জর্জ উইদার, জন চলখিল, জন ক্লেবলাণ্ড[১] প্রভৃতি পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর কবির কাব্য পাঠ করিয়া ও তাঁহাদের জীবন-চরিত পাঠ করিয়া আনন্দ অনুভব করি, অথচ আমাদের নিজের দেশের কবিদের কথা কিছুই জানি না। দেশের মধ্যে কয় জন লোক বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, লোচনদাস, নরোত্তম দাস, যদুনন্দন দাস, চূড়ামণি দাস প্রভৃতি প্রধান প্রধান বৈষ্ণব কবিগণের নাম অবগত আছেন? দুই-চারি জন বরং বৈষ্ণব কবিগণের দুই-পাঁচটি নাম জানিতে পারেন,

কিন্তু অবৈষ্ণব কবিগণ এদেশে চিরকালই বিস্মৃতি-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া আছেন।

অবৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে ভারতচন্দ্রের [১৭১২-৬০ খৃ] নাম বড়ো নাম। তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের [১৭১০-৮২ খৃ.] রাজকবি ছিলেন। তাঁহার ভাষা অনুকরণের অতীত, ধীশক্তি প্রখর, এবং প্রতিভা সর্বতোমুখী। বিদ্যাসুন্দর তাঁহার প্রধান কাব্য, তাঁহার কীর্তিস্তম্ভ ও তাঁহার অমৃতভাণ্ড। কিন্তু বিদ্যাসুন্দর তাঁহার নিজের নহে, ধার করা জিনিস। ধারও আবার মূল সংস্কৃত হইতে নহে। মূল সংস্কৃত হইতে যদিই বিদ্যাসুন্দর ধার করা হয়, তবে ভারতচন্দ্রের পূর্বে অন্য লোক তাহা ধার করিয়াছিল, তিনি ধার করা জিনিস আবার ধার করিয়াছেন। যথেষ্ট সুদ সমেত শোধ দিয়াছেন সত্য, কিন্তু জিনিসটা ধারের ধার। তিনি কাহার নিকট বিদ্যাসুন্দরের গল্পটি গ্রহণ করিয়াছেন ? রামপ্রসাদ সেনের [১৭২০ ?-৮১ খৃ.] নিকট নহে। কারণ, উভয়েই এক কালের লোক— প্রায় এক সময়েই বিদ্যাসুন্দর লিখিয়াছেন। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ, দুই জনেই আর-এক জনের নিকট বিদ্যাসুন্দর পাইয়াছিলেন। এই প্রবন্ধের শীর্ষ-দেশে যে মাননীয় মহাপুরুষের নাম দৃষ্ট হইতেছে, তিনি বাংলায় বিদ্যা-সুন্দর প্রথম প্রচারিত করেন। কিন্তু তাঁহার নাম জানা যায় না। এখন এক প্রকার লোপ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার গ্রন্থও পাওয়া যায় না। তিনি কয়খানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাও আমরা অতি কষ্টে দুইখানি সংগ্রহ করিয়াছি। তাই বাসনা, বাংলা সাহিত্যে যাঁহাদের অনুরাগ আছে, তাঁহাদের হস্তে কিছু উপহার দিই।

কৃষ্ণরামের কথা আমরা কেহ কিছু জানি না, অথচ তিনি আমাদের প্রতিবাসী ও বিশেষ আত্মীয়। কলিকাতা হইতে চারি ক্রোশের মধ্যে, বেলঘরিয়া স্টেশনের অর্ধ ক্রোশ পূর্বে, নিমিতায় কৃষ্ণরামের বাড়ি। তিনি যখন জীবিত ছিলেন, তখন কবি বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। কারণ, এখনো নিমিতা গ্রামে দুই-একজন লোক কবি কৃষ্ণরামের নাম করে, এবং তাঁহার ভিটা দেখাইয়া দেয়। সে ভিটায় এক শত বৎসরেরও অধিক কাল কেহ বাস করে না, অথচ প্রাচীন লোকেরা বলিয়া থাকেন— উহা কৃষ্ণরামের ভিটা। কৃষ্ণরামের বংশ নাই, কিন্তু তিনি নিজে নিঃসন্তান ছিলেন কিনা কেহ বলিতে পারে না।

তিনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। তাঁহার উপাধি দাস, সুতরাং কুলীন ছিলেন না। মৌলিক কায়স্থ ছিলেন, তাঁহার পিতার নাম ভগবতী দাস। তাঁহার প্রণীত রায়মঙ্গল ও কালিকামঙ্গল গ্রন্থে আমরা পাঁচ বার এই কবিতাটি প্রাপ্ত হইয়াছি—

"নিমিতে গ্রামেতে বাস, নাম ভগবতী দাস,
কায়েস্থ কুলেতে উৎপতি।
হইয়ে একচিত, রচিয়া রায়ের গীত,
কৃষ্ণরাম তাঁহার সন্ততি।"

কোথাও একটু আধটু পাঠভেদ থাকিলেও, পাঁচ জায়গাই এক কথা। কবি মহাশয়ের ভিটা ৺অক্ষয়কুমার দত্তের জামাতা মিত্রজ মহাশয়ের বাটীর অতি নিকটে অবস্থিত।

কৃষ্ণরাম কোন্ সময়ে বর্তমান ছিলেন, এবং কোন্ সময়ে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে লোকের কৌতূহল হইতে পারে। আমরা তাঁহার প্রণীত কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দরের যে পুঁথি পাইয়াছি, তাহার শেষ ভাগে এই কয়টি কথা আছে—

"ইতি সমাপ্ত। এই পুস্তক শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ বাবুজির ইহা জানিবা। স্বাক্ষর শ্রীআত্মারাম ঘোষ কায়েস্ত সাং কলিকাতা সুতানুটী চড়কডাঙ্গার পশ্চিম ॥ ইতি সন ১১৫৯ সাল মাহ শ্রাবণ ॥ ২৭ রোজ শুক্রবার ॥ দিবসে সাঙ্গ হইল ॥ ইহার দক্ষিণা এক জোড়া কাপড় আর দুই তঙ্কা আত্মা ॥[২]

শেষ তিনটি অক্ষর বড়ো জড়ানে। আত্মারামের হস্তাক্ষর অতি সুন্দর। ঠিক মুক্তার মতো, সমস্তই কালো কালিতে লেখা। কেবল দাঁড়িগুলি, ছেদগুলি, হেডিংগুলি লাল কালিতে। এখন লেখাইতে গেলে ৪৲/৫৲ টাকা পড়িত, কিন্তু অমন সুন্দর লেখা এখন পাওয়া যায় না। মুদ্রাযন্ত্রের দৌরাত্ম্যে আর হাতের লেখার, বিশেষ নগণ্য বাংলা ভাষায় হাতের লেখার, কিছুমাত্র আদর নাই।

আত্মারাম ঘোষ ১১৫৯ সালে কলিকাতায় বসিয়া গ্রন্থখানি নকল করেন। ১১৫৯ সাল ইংরাজি ১৭৫২/৫৩। তখনো বাংলা ইংরেজের হয় নাই। পলাশির যুদ্ধ হইতে ৪/৫ বৎসর বিলম্ব আছে। হলওয়েল সাহেব [John Zephaniah Holwell, ১৭১১-৯৮ খৃ.] ছয় মাসের

জন্য কোম্প্যানির জমিদারির ভার পাইয়া, 'ব্ল্যাক জমিদার' গোবিন্দরাম মিত্রের[৩] সঙ্গে জমিদারির হিসাব লইয়া গোল বাধাইয়াছেন। আর বর্গিরা উড়িষ্যার রাজত্ব ও বাৎসরিক ১২ লক্ষ টাকা চৌথ লইতে স্বীকার করিয়া বাংলা ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। কিন্তু তখন ভারতচন্দ্র কোথায় ? তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ। প্রত্যহ একটি করিয়া কবিতা লিখিয়া রাজাকে শুনান ও মাসহারা খান। তাঁহার বিদ্যাসুন্দর লেখা হইয়াছে কি ? সকলেই জানেন, ১৬৭৪ শকে অর্থাৎ ১৬৭৪+৭৮=১৭৫২ খৃস্টীয় অব্দে, ঐ গ্রন্থ সমাপ্ত হয়, সুতরাং আত্মারাম যখন চড়কডাঙায় বসিয়া কৃষ্ণরামের প্রসিদ্ধ কালিকামঙ্গল নকল করিতেছেন, তখনো ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর শেষ হয় নাই।

কিন্তু কোন্ বৎসর যে কালিকামঙ্গল রচিত হয়, তাহার কিছু ঠিকানা পাওয়া যায় না। কৃষ্ণরাম যখন 'শিশু', তখন একদিন তিনি খাসপুর পরগনায় বড়িশ্যা গ্রামে এক গোয়ালার গোয়াল-ঘরে নিদ্রিত আছেন, এমন সময় তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে, এক প্রকাণ্ডকায় মহাপুরুষ বাঘের উপর সোয়ার হইয়া, তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "আমি দক্ষিণের রায়। আমার রাজত্ব আঠারো ভাটি। তুমি আমার মঙ্গল-গীত গাও, আমি তোমার ভালো করিব। মাধব আচার্য আমার যে মঙ্গল রচনা করিয়াছে, তাহা আমার পছন্দ হয় না।" কবি কহিলেম, "আমি শিশু, আমি আপনার মহিমার কী জানিব ? তাহাতে রায় মহাশয় আপনার মাহাত্ম্যটা কীর্তন করিয়া অন্তর্ধান হইলেন। এই স্থানে কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি—

"শুনহ সকল ধীর অপূর্ব্ব কথন।
যেমতে হইল এই কবিতারচন ॥
খাসপুর পরগণা নামে মনোহর।
বড়িস্যা তাহার এক তপ বিশ্বাম্বর (?) ॥
তথায় গেলাম ভাদ্রমাস সোমবারে।
নিশিতে শুইলাম গোয়ালার গোলঘরে ॥
রজনীর শেষে এই দেখিলাম স্বপন।
বাঘপিঠে আরোহণ এক মহাজন ॥

করে ধনুঃশর চারু সেই মহাকায়।
পরিচয় দিলা মোরে দক্ষিণের রায়॥
পাঁচালী প্রবন্ধে কর মঙ্গল আমার।
আঠারভাটীর মধ্যে হইব প্রচার॥
পূর্ব্বেতে করিল গীত মাধব আচার্য্য।
না লাগে আমার মনে তাহে নাহি কার্য্য॥
মশান নাহিক তাহে সাধু খেলে পাশা।
চাসা ভুলাইয়া সেই গীত হইল ভাষা॥
মোর গীত না জানিয়া যতেক গায়ন।
অন্য গীত করাইয়া গায় জাগরণ॥
ফাকুটী নাকুটী করে আর রঙ্গি ভঙ্গি।
পরম কৌতুকে শুনে মউল্যা মলঙ্গি॥
তোমার কবিতা যার মনে নাহি লাগে।
সবংশে তাহারে তবে সংহারিবা বাঘে॥"

স্বপ্ন দিয়া গীত লেখানোটা দেবতাদের সাধারণ রোগ। অনেক পঞ্চম শ্রেণীর কবি স্বপ্নের দোহাই দিয়া হস্তকণ্ডূয়ন সুখানুভব করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু রায় মহাশয়ের রোগটা কিছু বেশি। যে তোমার কবিতা পছন্দ না করিবে, তাহাকে সবংশে বাঘে খাইবে! আমায় যদি কেহ এমন পাকাপাকি একরার দেয়— নিশ্চয় বলিতেছি— আমি ২০ ভলিউম কোয়ার্টো কবিতা একমাসে লিখিয়া দিতে পারি! কেহ যদি না শুনে, তাহাকে সবংশে বাঘে খাইবে। সুতরাং পাঠক ও শ্রোতারও অভাব হইবে না।

এরূপে কৃষ্ণরামের কবিত্বশক্তির সূত্রপাত হইল। কবি বলিতেছেন, তখন আমি অতি শিশু। কত শিশু, তাহা জানি না। নিমিতে হইতে বড়িশ্যা যাইয়া গোয়ালার ঘরে বাসা করিয়া আছেন, নিতান্ত শিশু না হওয়াই সম্ভাবনা। আমরা বছর ২০ বয়স ধরিয়া লইব।

সেটা কোন্ বৎসর কবি বলিতেছেন—

"কৃষ্ণরাম বিরচিল রায়ের মঙ্গল।
বসু শূন্য ঋতুচয় [চন্দ্র] শকের বৎসর॥"

"রলয়োরভেদঃ", এই সূত্র অনুসারে এখানে "ল" ও "র"এ মিল

হইয়াছে। এখন বসু শূন্য ঋতুচন্দ্র [চন্দ্র], ৮০৬১, অঙ্কস্য বামা গতিঃ ; সুতরাং ১৬০৮ হইল। ১৬০৮ শকে ১৬০৮+৭৮=১৬৮৬ খৃস্টীয় অব্দ হইল। রায়মঙ্গলে দুই জায়গায় কবি এই বৎসরের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং আরঙ্গজীবের রাজত্বকালে [১৬৫৮-১৭০৭ খৃ], যে বৎসর ইংরাজেরা হুগলি হইতে তাড়িত হন [২০ ডিসেম্বর ১৬৮৬ খৃ.], তাহার পূর্ব বৎসরে, শিবজীর [১৬২৭-৮০ খৃ.] মৃত্যুর ৫ বৎসর পরে, কবি কৃষ্ণরাম স্বপ্নাদেশ মতো রায়মঙ্গল লিখিয়া আপন কবিত্ব-খ্যাতির সূত্রপাত করেন।

তাঁহার কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর ইহার পরে রচিত। কারণ, ও বইখানি নেহাত শিশুর লেখা নহে। আর উহাতে একটি কথা আছে, তাহাতেও কিছু দিন পরে গ্রন্থরচনা হয় বলিয়া অনুমান হয়। কারণ, বন্দনার শেষভাগে কবি লিখিতেছেন—

"ভাগীরথীর পূর্ব্বতীর অপরূপ নাম।
কলিকাতা বন্দিনু নিমিতা জন্মস্থান ॥"

কলিকাতা অনেক দিনের জায়গা, তাহার সন্দেহ নাই। ১৪৯৫ সালে বিপ্রদাস কবি উহার নামোল্লেখ করিয়াছেন[৪], কিন্তু তখন কলিকাতা বন্দনার যোগ্য নহে। ইংরাজের কুঠি হওয়ার পর হইতেই উহা বন্দনার যোগ্য হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ১৬৯৮ সালে কলিকাতায় ইংরাজ সৌভাগ্যের সূত্রপাত হয়। ঐ সালে পুরাতন দুর্গটি নির্মাণ হয় ও কলিকাতা শহর হয়। ১৬৮৬ সালে রায়মঙ্গল লিখিয়া, ১৬৯৮ সালের পর কালিকামঙ্গল লেখা কিছুই বিচিত্র নহে। যেরূপেই হউক, কৃষ্ণরামের বিদ্যাসুন্দর, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের অপেক্ষা অন্তত ৪০/৫০ বৎসর পূর্বে রচিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

যতদূর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, বিদ্যাসুন্দর গত শতাব্দীতে চারি বার বাংলা ভাষায় ও একবার উর্দুতে লিখিত হয়। বাংলায় প্রথম লেখা কৃষ্ণরামের ; দ্বিতীয়, রামপ্রসাদের ; তৃতীয়, ভারতচন্দ্রের ; চতুর্থ, পূর্ব বাংলার কবি প্রাণরামের। প্রাণরাম তাঁহার গ্রন্থে এই কয়টি কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। উহা হইতে বিদ্যাসুন্দরের গ্রন্থকর্তা কে কে, তাহা জানা যায়।

"বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম বিকাশ।
বিরচিলা কৃষ্ণরাম নিমিতা যাঁর বাস ॥

তাঁহার রচিত গ্রন্থ আছে ঠাঁই ঠাঁই।
রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা নাই।
পরেতে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে।
রচিলেন উপন্যাস প্রসঙ্গের ছলে॥"[৫]

প্রাণরামের মূল গ্রন্থ আজিও আমরা দেখি নাই। বঙ্গসাহিত্যের ভাবী ইতিহাস-লেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় [১৮৬৬-১৯৩৯ খৃ.] এই কবিতা কয়টি আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ঘোর শাক্ত ও ঘোর চৈতন্যদ্বেষী ছিলেন। তাঁহার পারিষদ ভারতচন্দ্রও শাক্ত ছিলেন। রামপ্রসাদ শাক্ত ভক্তিতে সিদ্ধ হইয়া মূর্তিকে ভক্তির দাসী বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা কালীমহিমাখ্যাপনের জন্য বিদ্যাসুন্দর লিখিতে পারেন। কিন্তু কৃষ্ণরাম কোন্ ধর্মাবলম্বী ছিলেন? এবং তিনি কালিকামঙ্গল লিখেন কেন? এই দুইটি প্রশ্নের মীমাংসা অত্যন্ত কঠিন।

কালিকামঙ্গলে একটি সুদীর্ঘ বন্দনা আছে। তাহাতে গণেশ, সরস্বতী, কালী, কৃষ্ণ-রাধা, চৈতন্য, নিত্যানন্দ এবং মহাদেবের বর্ণনা আছে। অন্য দেবতার বন্দনা যতই থাকুক, চৈতন্য-নিত্যানন্দের বন্দনাটি কিছু ঘোরঘটা করিয়া লিখিত হইয়াছে—

"নবদ্বীপে চৈতন্য গোঁসাই অবতার॥"
"নিত্যানন্দ ঠাকুর অপার পারিসাদ।
বন্দিনু পরম ভক্ত সকলের পাদ॥"
"যথায় কীর্ত্তন হয় চৈতন্য-চরিত্র।
বৈকুণ্ঠ সমান ধাম পরম পবিত্র॥
তাহে গড়াগড়ি দেয় (যেবা) প্রেমে নৃত্য করে।
জীবন সুকৃত তার ধন্য দেহ ধরে॥
হেলায় শ্রদ্ধায় জীব কণ্ঠী ধরে যত।
তাহা সবাকারে মোর প্রণাম শত শত॥
শ্রীকৃষ্ণ-গুণ শ্রবণে পুলক যেবা হয়।
তাঁরে গুণবান্ বলি বেদ মিথ্যা নয়॥"

উপরি-উক্ত কবিতাটি হইতে বেশ বুঝা যায় যে, কৃষ্ণরাম চৈতন্য-মতাবলম্বী ছিলেন। তবে তিনি কালিকামঙ্গল লিখেন কেন? যাহারা বিল্বপত্রকে

তেফড়কার পাতা বলে, জবাফুলকে ওড় পুষ্প বলে, 'কাটাকে' 'বানানো' বলে, যাহারা দুর্গানাম শুনিলে কানে হাত দেয়, তাহাদের মধ্যে একজন যে কালিকামঙ্গল লিখিবে, ইহা আপাতত বড়োই বিচিত্র বোধ হয়।

কিন্তু যাঁহারা বাংলা প্রাচীন সাহিত্য পড়িয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। ত্রিবেণীনিবাসী পরাশরের পুত্র মাধবাচার্য[৬] চৈতন্য-মতাবলম্বী ছিলেন, তাঁহার প্রধান পুস্তক 'ভাগবতসার'। কিন্তু কীর্তন করা তাঁহার ব্যবসায় ছিল। তিনি সকল দেবতার কীর্তন লিখিতেন। তাঁহার রচিত দুর্গা-মাহাত্ম্য বা চণ্ডীর গান অদ্যাপি চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত আছে। আর এই রায়মঙ্গল পাঠে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, তিনি দক্ষিণ রায়ের মাহাত্ম্যও কীর্তন করিয়াছিলেন। মাধবাচার্য ১৫৭৯ খৃস্টাব্দে তাঁহার গ্রন্থাবলী প্রণয়ন করেন, আর ১৬৮৬ খৃস্টাব্দে তাঁহারই পদানুসরণ করিয়া কৃষ্ণরাম রায়মঙ্গল, কালিকামঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। অনুমান হয়, কীর্তন ব্যবসায়ীরা সকলেই বৈষ্ণব ছিলেন। তবে, ব্যবসায়ের খাতিরে তাঁহারা অবৈষ্ণব গ্রন্থও রচনা করিতেন এবং গানও করিতেন।

একটি নূতন কথা আছে। কৃষ্ণরামের বিদ্যাসুন্দরে বিদ্যা আছে, সুন্দর আছে, কালীস্তব আছে, চোরপঞ্চাশতের কবিতা আছে, মশান আছে, কালী আছেন। বীরসিংহ আছেন, গুণসিন্ধু আছেন, নাই কেবল বর্ধমান। বর্ধমানের সঙ্গে বিদ্যাসুন্দর-ঘটিত কলঙ্কের যোগাযোগ কুটিল, মুখুটীবংশীয় ভারতচন্দ্রের কল্পনাপ্রসূত। ভারতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন, তাঁহার বংশীয়েরা অদ্যাপি এই উপাধিতে বিভূষিত আছেন। মুখুর্যেরা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বড়োই কুটিল। কথাই আছে, "মুখুটি কুটিল বড়ো বন্দ্যঘটী সাদা"। এ কবিতা আর অধিক উদ্ধৃত করিব না। ভারত জাতিতে মুখুর্যে, তাহাতে বর্ধমানরাজ তাঁহার পিতাকে সর্বস্বান্ত করেন, এবং তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। সুতরাং তাঁহার রাগ বাড়িয়া যায়, তাই বিদ্যাসুন্দরের কেলেঙ্কারি বর্ধমানরাজের ঘাড়ে চাপাইয়া ভারত তাহার অনেকটা প্রতিশোধ লয়েন। বর্ধমানরাজ যে ভারতচন্দ্রের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, সে কথা লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের ঘটনা যে নিশ্চয়ই বর্ধমানে ঘটিয়াছিল, এ ধারণা অনেকেরই আছে, এবং এই সংস্কারের বশবর্তী হইয়াই

পূজ্যপাদ রামগতি ন্যায়রত্ন [১৮৩১-৯৪ খৃ.] মহাশয় মালিনীর বাটী অন্বেষণার্থে বর্ধমান শহরে অনেক দিন ভ্রমণ করিয়াছিলেন, এবং সেই সুড়ঙ্গ দিয়া এখনো রাজবাটী যাওয়া যায় কিনা, দেখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, কৃষ্ণরামের বর্ধমানরাজের উপর ক্রোধ ছিল না। সুতরাং তিনি আর বর্ধমান লইয়া তাঁহার গ্রন্থ আরম্ভ করেন নাই। তাঁহার গ্রন্থ-। সূচনা এই—

"উর মাতা আসরে হও অধিষ্ঠান ॥
সুন্দর সুন্দর নাম রাজার নন্দন।
পূজিয়া পরমদেবী করিল গমন ॥
স্বপনে শিবার কথা সত্য মনে লয়ে।
পাইবে রমণীমণি আনন্দ হৃদয়ে ॥
জনকেরে না বলিল না জানে জননী।
একাকী করিল গতি কবি-শিরোমণি ॥
জয়পত্র যুকত বিচিত্র ছত্র ধরি।
দিব্যাস্ত্র ভূষণ দ্বিজেরে দান করি ॥
কবি পণ্ডিতের বেশে প্রতাপের শূর।
সারদা সহায়ে যায় বীরসিংহপুর ॥
ছাড়াইল নিজ রাজ্য চলি দিন ছয়।
সম্মুখে অরণ্য ঘোর দেখে লাগে ভয় ॥
বরাহ মহিষ বাঘ তাহাতে সকল।
ভয় পাইয়া ভাবে কালীচরণ-কমল ॥
শিরে মণি জ্বলে ফণী বেড়ায় চরিয়া।
পাইলে গণ্ডার চণ্ড গিলয়ে ধরিয়া ॥
যেই দিকে চাহে কবি সেই দিকে বন।
ফিরিয়া না যাব ঘরে করিয়াছি পণ ॥
প্রবেশে অরণ্য মাঝে ভাবিয়া সারদা।
সঙ্কটে তারিয়া লও হরের প্রমদা ॥
ব্যাঘ্র আদি দেখিয়া ফিরিয়া নাহি চায়।
পশ্চাতে করিল বন তবে পথ পায় ॥

চলিতে না পারে আর ক্ষুধায় আকুল।
রম্যস্থান দেখিয়া বসিল তরুতল ॥
অকস্মাৎ পাইল দিব্য নানা উপহার।
দেবযোগ্য মনোহর কি বলিব আর ॥
সর্ব্বকালি দেবীর মায়া শুন সর্ব্বজন।
কত রঙ্গ করেন বুঝিতে তার মন ॥
হেন কালে সম্মুখে দেখিল ঘোর নদী।
কূল নাহি তরঙ্গ যেমন নিরবধি ॥
ক্ষেণে ভাসে ক্ষেণে ডুবে হাঙ্গর কুম্ভীর।
নাহিক কাণ্ডারী তরি বড়ই গভীর ॥
নারিব হইতে পার দাঁড়াইল সার।
বুঝান না যায় মাতা চরিত্র তোমার ॥
আপনি কহিলা পথে কোনও দুঃখ নবে।
সম্মুখ সমুদ্র ঘোর কি উপায় হবে ॥
ফিরিয়া সদনে যাই হেন মনে লয়।
সবে দুঃখ তোমার বচন মিথ্যা হয় ॥
বলিতে বলিতে কবি অপরূপ দেখে।
মহাযোগী এক জন আইল সম্মুখে ॥
রক্তবস্ত্র পরিধান শুখায়ল তনু।
যোগবল-কিরণ তপন যেন ভানু ॥
সুন্দরেরে বলে শুন রাজার নন্দন।
যদি মনে লয় ধর আমার বচন ॥
কালীমন্ত্র জপ তুমি না করিও আর।
করিতে না পারেন তিনি সঙ্কটে উদ্ধার ॥
মহেশের মন্ত্র আসি লহ মোর ঠাঁই।
যাহার সমান আর তিন লোকে নাই ॥
যোগবলে যাহা চাহ নিকটে মিলিবে।
এ পাঁচ মাসের পথ এক দণ্ডে যাবে ॥
শুনিয়া সুন্দর বলে তুমি মূঢ় জন।
সহনে না যায় মোর তোমার বচন ॥

হরগৌরী এক অঙ্গ দেব পরমাণ।
ইহাতে করিলে ভেদ রৌরবে হয় স্থান ॥
যোগী মহাশয় তুমি জগৎ পূজিত।
শিব শিবা ভেদ কর নহে ত উচিত ॥
ফিরিয়া সুন্দর দেখে যোগী নাহি তথা।
ঘুচিল মায়ার নদী অপরূপ কথা ॥
হইল আকাশবাণী শুন কবিবর।
কুতূহলে যাহ বীরসিংহের নগর ॥
পাইয়া প্রসাদপুষ্প আনন্দ হৃদয়।
গমন করিল গুণসিন্ধুর তনয় ॥
পঞ্চমাসের পথ বীরসিংহের দেশ।
দশম দিবসে গিয়া করিল প্রবেশ ॥
অমরাবতীর তুল্য মনোহর স্থান।
ধরণী বলিতে নাহি যাহার সমান ॥
নৃত্য-গীত আনন্দিত যত প্রজালোক।
অকাল-মরণ নাহি নাহি দুঃখ শোক ॥
নৃপতি উত্তম দাতা নাহি অবিচার।
চাঁদেরে মলিন কৈল যশেতে যাহার ॥
বাহুবলে অধিকার করিল অনেক।
অধিকার ধরাতলে কহিব কতেক ॥
কমলার দয়া তারে কভু নাহি টুটে।
ভূপতি ভকত সদা ভাবে করপুটে ॥
কবি কৃষ্ণরাম বলে কালীপদযুগ।
দেখিয়া সুন্দর দেশ সুন্দরের সুখ ॥

'সাহিত্য'
জ্যৈষ্ঠ, ১৩০০ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. সূত্র

কৃষ্ণরাম দাসের জন্ম আনুমানিক ১৬৫৬ খৃস্টাব্দে। কালিকামঙ্গলের রচনাকাল ১৬৭৬-৭৭ খৃ., তখন কবির বয়স ২০ বৎসর। কালিকামঙ্গলে কবির উক্তি—

"সেই গ্রাম মধ্যে বাস　　নাম ভগবতী দাস
কায়স্থকুলেতে উতপাতি
তাঁহার তনয় হই　　নিজ পরিচয় কই
বয়ঃক্রম বছর বিংশতি।"

সুতরাং ১৬৮৬-৮৭ খৃস্টাব্দে লেখা রায়মঙ্গল কালিকামঙ্গলের পরের বই, এটি কবির তৃতীয় রচনা। তিনি আরো তিনটি মঙ্গলকাব্য লিখেছেন ; ষষ্ঠীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল এবং কমলামঙ্গল।

"বিদ্যাসুন্দর··· বাংলায় প্রথম লেখা কৃষ্ণরামের"— শাস্ত্রীমশায়ের এই ধারণাও ঠিক নয়। বাংলায় বিদ্যাসুন্দর কাহিনী নিয়ে লেখা কাব্যের প্রথম কবি শ্রীধর। ইনি সম্ভবত হোসেন শাহ্‌র নাতি ফীরূজ শাহ্‌র অনুচর ছিলেন। ফীরূজ শাহ্‌র রাজত্বকাল ১৫৩১-৩২ খৃস্টাব্দে অল্প কয়েক মাস।

১. George Peele (১৫৫৮-৯৭ খৃ.), Thomas Nashe (১৫৬৭-১৬০১ খৃ.), John Webster (১৫৮০ ? - ১৬২৫ ? খৃ.), Francis Beaumont (১৫৮৪-১৬১৬ খৃ.), John Fletcher (১৫৭৯-১৬২৫ খৃ.), Sir William D'Avenant (১৬০৬-৬৮ খৃ.), George Farquhar (১৬৭৮-১৭০৭ খৃ.), William Congreve (১৬৭০-১৭২৯ খৃ.), Thomas Shadwell (১৬৪২ ? - ৯২ খৃ.), James Thomson (১৭০০-৪৮ খৃ.), George Wither (১৫৮৮-১৬৭৭ খৃ.), John Chalkhill, John Cleveland / Cleiveland (১৬১৩-৫৮ খৃ.)

২. শেষ বাক্যটির শুদ্ধ পাঠ, "ইহার দক্ষিণা এক জোড় কাপড় আর দুই তঙ্কা আড়কাট"। আড়কাট = আর্কট। আর্কটের টাকার দাম কিছু বেশি ছিল। দ্র. বা-সা-ই, অপরার্ধ, পৃ. ৩০৭।

৩. গোবিন্দরাম মিত্র সম্পর্কে শাস্ত্রীমশায় অন্যত্র লিখেছেন—

"ইংরাজেরা ১৬৯৮ খৃ. অব্দে তিন গ্রামের জমিদারি পাইয়া আপনাদিগের কাউন্সিলের একজনকে জমিদার করিতেন, তিনি দুই হাজার টাকা করিয়া মাহিয়ানা পাইতেন। চারি-পাঁচ মাস অন্তর জমিদার বদল হইত। অর্থাৎ কাউন্সিলের সকল মেম্বরেরাই কিছু দিন করিয়া দুই হাজার টাকা মাহিয়ানা মারিতেন। তিনি কাজকর্ম কিছুই করিতেন না, কখনো দুই-একটা সহি করিতেন। তাঁহার অধীনে একজন ব্ল্যাক জমিদার থাকিতেন, তাঁহারই হাতে জমিদারির ভার থাকিত। ব্ল্যাক জমিদারের মাহিয়ানা ত্রিশ টাকা ছিল। কুমারটোলির মিত্রদিগের আদিপুরুষ গোবিন্দরাম মিত্র ১৭২০ খৃ. অব্দে ব্ল্যাক জমিদার পদে নিযুক্ত হন তাঁহার পূর্বে ঐ পদে কে ছিলেন তাহা জানা যায় না। কিছু দিন পরে গোবিন্দরাম মিত্রের বেতন ত্রিশ টাকা হইতে পঞ্চাশ টাকা হয়, কারণ তিনি কোম্পানির নিকট আরজি করেন যে, ত্রিশ টাকায় ব্ল্যাক জমিদার নামক উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সম্ভ্রম রক্ষা করা হয় না। গোবিন্দরাম মিত্রের মন্দির চিৎপুর রোডের ধারে অদ্যাপি বর্তমান আছে।" ("কলিকাতা দুইশত বৎসর পূর্বে", 'নব্যভারত', কার্তিক ১২৯০ ব., অনুচ্ছেদ ৪)।

গোবিন্দরামের আদিবাস ছিল ব্যারাকপুরের কাছে চন্দনপুকুরে। ১৭২০ খৃস্টাব্দেই প্রথম ডেপুটি-জমিদার বা ব্ল্যাক জমিদার পদ সৃষ্টি হয় এবং গোবিন্দরাম এই পদ পান। ১৭৫৬ পর্যন্ত এই পদে কাজ করেন। সম্ভবত ১৭৭২-৭৩ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। চিৎপুর রোডে তিনি ১৭৩০এ ১৬৫ ফুট উঁচু নবরত্ন মন্দির তৈরি করান, মন্দিরের চূড়া অক্‌টারলনি মনুমেন্টের চেয়েও উঁচু ছিল। ১৭৩৭এর ১০ বা ১১ সেপ্টেম্বরের ঝড় ও ভূমিকম্পে মন্দিরটি ভেঙে পড়ে।— দ্র. রাধারমণ মিত্র, 'কলিকাতা দর্পণ', কলকাতা ১৯৮০, পৃ. ৬৯।

৪. বারাসত মহকুমা থেকে শাস্ত্রীমশায় প্রথম বিপ্রদাস পিপ্‌লাইয়ের মনসামঙ্গলের পুথি আবিষ্কার করেন এবং এই পুথির বিবরণের ভিত্তিতে ভাগীরথীর দুই কূলের প্রাচীন স্থান-পরিচয় দেন "Notes on the Banks of the Hugli in 1495" নিবন্ধে (*Proceedings of Asiatic Society of Bengal*, 1892, pp. 193-97)। এই পুথিতে কলকাতার উল্লেখ—

"পূর্ব্বকূল বাহিয়া এড়ায় কলিকাতা।
বেতড়ে চাপায় ডিঙ্গা চাঁদ মহারথা॥"

(*Sastri-Cat.*, Vol. IX, p. 340).

বিপ্রদাসের কাব্য ১৪৯৪/৯৫এ রচিত হলেও অষ্টদশ শতাব্দীর আগে লেখা কোনো পুথি পাওয়া যায় নি। স্থান-নামগুলি পরবর্তী সংযোজন, কলকাতার উল্লেখও প্রক্ষিপ্ত। দ্র. বা-সা-ই, পূর্বার্ধ, পৃ. ২০৯।

৫. দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেছেন, এই অংশ 'কালিকামঙ্গল' প্রকাশক রামচন্দ্র তর্কালংকারের লেখা, প্রাণরামের লেখা নয়। দ্র. "প্রাণরাম চক্রবর্তীর কালিকামঙ্গল" সা-প-প, ১৩৫০ ব., পৃ. ৬০-৬৩।

৬. মাধবাচার্য বা দ্বিজ মাধবের নামে 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' এবং 'চণ্ডীমঙ্গল' পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ভাগবতের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। কবি তাঁর চণ্ডীমঙ্গলকে কোথাও কোথাও 'সারদাচরিত', 'সারদামঙ্গল' বলেও উল্লেখ করেছেন। এই চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকাল ১৫৭৯ খৃস্টাব্দ, মতান্তরে ১৬৪৫এর কাছাকাছি সময়ে। কবির আত্মপরিচয়—

"ত্রিবেণীতে গঙ্গাদেবী ত্রিধারে বহে জল।
সেই মহানদী তটবাসী পরাশর
যাগযজ্ঞে জপে তপে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর ॥
...
তাহার তনুজ আমি মাধব আচার্য"

২. অনুষঙ্গ

নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 'বিশ্বকোষ' চতুর্থ খণ্ডে কৃষ্ণরাম দাস প্রসঙ্গটি শাস্ত্রীমশায়ের লেখা। রচনাটি বিশ্বকোষ থেকে এখানে সংকলন করে দেওয়া হল—

"কৃষ্ণরামদাস, একজন বাঙালি কবি। ইঁহার নিবাস নিমতা, ইনি জাতিতে কায়স্থ। ইঁহার পিতার নাম ভগবতীদাস. ইঁহার রচিত দুইখানি বাংলা পুস্তক আছে। একখানির নাম 'কালিকামঙ্গল', অপরখানির নাম 'রায়মঙ্গল'। রায়মঙ্গলখানি খাসপুর পরগনার বড়িশ্যা গ্রামে ১৬০৮ শকাব্দে রচিত হয়। একদিন কবি ঐ গ্রামে কোনো কার্য উপলক্ষে গমন করেন, সেদিন সোমবার ভাদ্র মাস। এক গোপের গোশালাতে তাঁহার বাসা হয়। তিনি শেষরাত্রে স্বপ্ন দেখেন, যে বাঘে চড়িয়া একজন লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং পরিচয় দিলেন যে."আমি দক্ষিণরায়। মাধবাচার্য আমার মঙ্গলগীত রচনা করিয়াছে— কিন্তু সে গীত আমার মনোনীত হয় নাই। সে আমার মাহাত্ম্য জানে না। তাহার গায়নেরা ফাকুটি নাকুটি আর রঙ্গি-ভঙ্গি করিয়া মউল্যা মলঙ্গীদিগকে ভুলাইয়া রাখে। অতএব তুমি 'রায়মঙ্গল' গান রচনা করো, যে

তোমার গান না শুনিবে, আমার বাঘ তাহাকে সবংশে নিধন করিবে।" এই স্বপ্ন দেখিয়া কৃষ্ণরাম রায়মঙ্গল লিখিলেন।

"কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গল বিদ্যাসুন্দরের গল্প লইয়া লিখিত, কিন্তু ইহাতে বর্ধমানের নামও নাই, গন্ধও নাই, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর লিখিত হইবার অনেক পূর্বে কবি কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গল লিখিত হইয়াছিল। পুস্তক দুইখানি পড়িলে অনেক সময় বোধ হয় ভারতচন্দ্র কৃষ্ণরামের সুরেই সুর বাঁধিয়াছেন। ভারতচন্দ্র তাঁহার পূর্ববর্তী কোনো বিদ্যাসুন্দর লেখকের নাম করেন নাই। কিন্তু বিদ্যাসুন্দর লইয়া ভারতচন্দ্রেরও পর যে বঙ্গদেশীয় কবি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তিনি স্বীয় গ্রন্থে কৃষ্ণরামের বিশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। এই বঙ্গদেশীয় কবির নাম প্রাণরাম। তিনি বলেন—

'বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম বিকাশ।
বিরচিলা কৃষ্ণরাম নিমতা যার বাস॥
তাঁহার রচিত গ্রন্থ আছে ঠাঁই ঠাঁই।
রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা নাই॥
পরেতে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে।
রচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে॥'

"কবি কৃষ্ণরামের জন্মভূমি নিমতা, ইস্টারন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ের বেলঘরিয়া স্টেশনের অর্ধক্রোশ দূরে, তাঁহার ভিটা অদ্যাবধি বর্তমান আছে, কিন্তু তাঁহার বংশে কেহই নাই।" —'বিশ্বকোষ' (চতুর্থ খণ্ড), পৃ. ৪৫০-৫১।

বাংলা ভাষায় কিছু কম আড়াই শত বাংলা ব্যাকরণ লিখিত হইয়াছে। গত দশ বৎসরের মধ্যেই ইঁহাদের অধিকাংশ প্রাদুর্ভূত হইয়া বঙ্গীয় বালকগণের মস্তিষ্ক বিকৃত এবং তাঁহাদের অভিভাবকগণের পয়সা অপহরণ করিতেছেন। এতগুলি ব্যাকরণ বাহির হইয়াছে বলিয়া বাঙালির গৌরব করিবার কিছুই নাই; কারণ সমস্ত বাংলা ব্যাকরণগুলিই দুই শ্রেণীর লোক কর্তৃক দুই প্যাটেন্টে প্রস্তুত হইতেছে; একটি মুগ্ধবোধ-প্যাটেন্ট গ্রন্থকার পণ্ডিতগণ, আর-একটি হাইলি-প্যাটেন্ট[১] গ্রন্থকার মাস্টারগণ। এক প্যাটেন্টের গ্রন্থ খুলিলেই বর্ণের উচ্চারণস্থান ও নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়; অপর প্যাটেন্টের ব্যাকরণ খুলিলেই দেখিতে

পাওয়া যায়, শব্দ সমূহ পাঁচ ভাগে বিভক্ত— বিশেষ্য বিশেষণ সর্বনাম ক্রিয়া ও অব্যয়। ক্রমে এই প্যাটেন্টে সংস্কৃত সূত্রগুলির তর্জমা, আর-এক প্যাটেন্টে ইংরেজি রুলগুলির তর্জমা। বাংলাটা যে একটা স্বতন্ত্র ভাষা, উহা যে পালি মাগধী অর্ধমাগধী, সংস্কৃত পারসি ইংরেজি প্রভৃতি নানা ভাষার সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে, গ্রন্থকারগণ সেকথা একবারও ভাবেন না। অনেকে আবার দুই প্যাটেন্ট মিশাইয়া এক প্রকার খিচুড়ি প্রস্তুত করেন। সে অতি উৎকৃষ্ট পদার্থ। তাহাতে যুক্তির লেশমাত্রও নাই; বহুদর্শিতার নামও নাই। উদাহরণ দেখুন— সংস্কৃত ব্যাকরণকারেরা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলেন, পদরাশিকে দুই ভাগে ভিন্ন বিভক্ত করা যায় না। সেই জন্য তাঁহারা লিখিলেন— পদ দুই প্রকার— সুবন্ত ও তিঙন্ত। তাঁহাদের সংস্কার "নাপদং শাস্ত্রে প্রযুঞ্জীত" বিভক্তিযুক্ত না হইলে ধাতু ও শব্দ শাস্ত্রে প্রয়োগ করা যায় না; সুতরাং ধাতুর উত্তর তিবাদি বিভক্তি এবং সর্বপ্রকার শব্দের উত্তর সুবাদি বিভক্তি হয়, এই তাঁহাদের ব্যবস্থা; তাঁহারা অব্যয়ের উত্তর বিভক্তি করিয়া লোপ করিবেন; কিন্তু বিনা বিভক্তিতে শব্দ প্রয়োগ করিতে পারা যায়, ইহা কিছুতেই স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবেন না। কিন্তু বাংলা ব্যাকরণকারেরা বলিলেন, অব্যয়ের উত্তর বিভক্তি হয় না। সুবুদ্ধি বালক যদি জিজ্ঞাসা করে, 'রাম রাবণকে মারিলেন' 'কেশব আম খাইলেন' এ-সকল স্থলে 'রাম', 'কেশব' ও 'আম' কেন অব্যয় শব্দ হইবে না, তাহা হইলেই ব্যাকরণকারেরা অবাক্। তাঁহারা দেখিয়াছেন সংস্কৃত ব্যাকরণকারেরা বিভক্তি দেন; সুতরাং তাঁহাদিগকে বিভক্তি দিতে হইবে। তাঁহারা দেখিয়াছেন ইংরেজি ব্যাকরণকারেরা parts of speech দেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে দু-ই দিতে হইবে। নইলে বাহাদুরি হয় না, বই বিক্রি হয় না; কিন্তু দুই রকম ব্যাকরণ হইতে দুই রকম নিয়ম চুরি করিয়া নিজের বিদ্যা প্রকাশ হইয়া গেল, তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না। আবার দেখুন সংস্কৃত ব্যাকরণে বিভক্তি স্বতন্ত্র জিনিস, কারক স্বতন্ত্র জিনিস। কারক অর্থ-সাপেক্ষ, বিভক্তি শব্দসাপেক্ষ। সংস্কৃতে অনেকগুলি বিভক্তি আছে, অনেকগুলি কারক আছে; কারক ভিন্ন নানা সম্বন্ধে নানা কারণে নানা বিভক্তির উৎপত্তি হয়; সুতরাং সংস্কৃত ব্যাকরণে কারক ও বিভক্তি দুইটি স্বতন্ত্র রাখা প্রয়োজন হইয়াছে। সংস্কৃতে কারকের লক্ষণ স্বতন্ত্র; ক্রিয়ার

সহিত অন্বয় না হইলে কারক বলা যায় না ; কিন্তু ইংরেজিতে case-এর লক্ষণ অন্য রূপ ; নাউনের কন্ডিশন দেখাইয়া দিলে case হয় ; সুতরাং case-এ ও কারকে আকাশ পাতাল তফাত। ইংরেজিতে পসেসিভ কেস, সংস্কৃতে উহা কারক নহে ; কিন্তু অনেক বাংলা ব্যাকরণে সম্বন্ধ পদ কারক রূপে বিরাজ করিতেছেন। ইংরেজিতে বিভক্তি বলিয়া জিনিস এক। পসেসিভের আপস্ট্রফি এস্ আছে, আর বহুবচনে কিছু পরিবর্তন আছে ; সুতরাং কর্মবাচ্য স্থলে ইংরেজিতে মোটামুটি কর্তাকে নমিনেটিভ কেস্ই বলে ; কিন্তু সংস্কৃতে কর্মবাচ্যের সব্‌জেক্‌টকে ঐরূপে কর্তাকারক বলিলে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড উপস্থিত হয় ; কিন্তু আমরা দুই-চারিখান ব্যাকরণ দেখিয়াছি তাহাতে একেবারে বিভক্তির নাম নাই। মাঝে মাঝে আছে, কর্তা কারকে অধিকরণ কারক হয়, যথা— 'ছাগলে পাতা খায়' ; করণ-কারকেও অধিকরণ কারক হয় ; যথা 'ছুরিতে কাটে' 'মুখে খায়' ইত্যাদি। এইরূপে কারক ও বিভক্তিতে গোলযোগ করিয়া অনেক ব্যাকরণেই ছেলেদের মনে একটা ত্রাস জন্মাইয়া দেয়। কিন্তু যদি বিভক্তি ও কারক স্বতন্ত্র রাখিয়া তাহাদের কার্য লক্ষণ প্রয়োগ প্রভৃতি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে দেখাইয়া দেওয়া যায়, কোন্ কারকে কোন্ বিভক্তি হয়, কোন্ শব্দের যোগে কোন্ বিভক্তি হয়, কোন্ অর্থে কোন্ বিভক্তি হয়, এইগুলি ভালো করিয়া দেখাইয়া দিলে প্রণালী শুদ্ধরূপে বালকদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

বিভক্তির আকার লইয়াই কত গোলযোগ আছে। কেহ লিখিলেন, বিভক্তির আকার এইরূপ—

প্রথমা	ঃ				রা	
দ্বিতীয়া	কে	রে	য়	তে	দিগকে	দের
তৃতীয়া	দ্বারা				দিগের	দ্বারা
	দিয়া	এ	য়		দিগকে	দিয়া
চতুর্থী	কে				দিগকে	
পঞ্চমী	হইতে				দিগের	হইতে
	থেকে				দিগের	থেকে

ইত্যাদি। কেহবা প্রথমার বিসর্গের পরিবর্তে ফাঁক দিয়া থাকেন। সংস্কৃতে যেমন বিভক্তির রূপগুলি আছে, বাংলায় সেইরূপ থাকা চাই, নাহিলে চণ্ডী অশুদ্ধ হইবে।

আমরা জিজ্ঞাসা করি 'দ্বারা' 'দিয়া' বিভক্তি হইল কিরূপে ? শব্দের সঙ্গে জমাট না বাঁধিলে বিভক্তি হয় না। 'আমাদিগের দ্বারা' 'আমার দ্বারা' দিব্য সম্বন্ধ পদ রহিয়াছে, কেমন করিয়া বলিব উহা বিভক্তি ? 'ছুরি দিয়া কাটিবে' এ স্থলে 'দিয়া' অসমাপিকা ক্রিয়া ; কর্ম 'ছুরি' ; কী বলিয়া 'দিয়া' কে করণের বিভক্তি বলিব ? অথচ সকল ব্যাকরণেই, দেখি 'দিয়া' করণের বিভক্তি। কেমন করিয়া বলিব ব্যাকরণকারেরা ব্যাকরণ লিখিবার সময় মস্তিষ্ক বিলোড়ন করেন। তাহার পর আবার 'দিগকে' বিভক্ত করা হইয়াছে ; কিন্তু 'দিগকে' কি আমরা কখনো ব্যবহার করি ? পশ্চিম রাঢ়ে 'দিগ্‌গে' একটা কথা আছে বটে ; আমাদেরও পুরানো দলিলাদিতে 'আমার দিগরের' দেখিতে পাই বটে ; কিন্তু 'দিগকে' কখনো দেখিতে পাই না, কখনো বলিও না। যখন 'আমার দিগরকে' ব্যবহার করিত, তখন 'দিগর' বিভক্তি ছিল না। 'দিগর' পারস্য শব্দ[২] অর্থ গণ। যদি বিভক্তি বলিতে হয়, যে টুকু জমাট বাঁধে, সেই টুকু দের'। বিভক্তি বলিতে গেলে 'দের'কেই বলিতে হয়। কিন্তু সে 'দের' কর্মের বিভক্তি, সম্বন্ধের বিভক্তি, অধিকরণেরও বিভক্তি।

অনেক প্রাকৃত ব্যাকরণে সম্প্রদান কারক নাই, বাংলায়ও সম্প্রদান কারক নাই। কিন্তু মুগ্ধবোধ-প্যাটেন্টই হউক, আর হাইলি-প্যাটেন্টই হউক, উভয় প্রকার ব্যাকরণেই সম্প্রদান কারকের অস্তিত্ব বজায় রাখা হইয়াছে। দুই-একখানি ব্যাকরণে 'ধোপাকে কাপড় দিলাম' সম্প্রদান কারকের উদাহরণ বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। 'রজকস্য বস্ত্রং দদাতি' যে সম্প্রদান হয় না, আর তা লইয়া যে সংস্কৃত ব্যাকরণকারেরা অনেক মাথা কুটাকুটি করিয়া গিয়াছেন, তাহা শোনেই বা কে আর পড়েই বা কে। বাংলা ব্যাকরণকারেরা দেখিলেন, দান ক্রিয়ার কর্মকেই সম্প্রদান বলে ; সুতরাং রজক কেন সম্প্রদান হইবে না ? সংস্কৃতওয়ালারা বলেন, স্বস্বত্ব ধ্বংসপূর্বক পরস্বত্বোৎপত্ত্যনুকূল ব্যাপারকে দান বলে ; রজককে যে বস্ত্র দেওয়া গেল, তাহাতে স্বস্বত্বেরও ধ্বংস হইল না, পরস্বত্বেরও উৎপত্তি হইল না ; তবে রজককে বস্ত্র দান করা হইল কিরূপে, রজকই বা সম্প্রদান হইল কিরূপে ?

তার পর সন্ধি— বাংলা ব্যাকরণ খুলিলেই চতুর্থ বা পঞ্চম পত্রেই সন্ধি আরম্ভ— 'অকারের পর অকার কিংবা আকার থাকিলে উভয়ে

মিলিয়া আকার হয়— আকার পূর্ব বর্ণে যুক্ত হয়'। সুবুদ্ধি বালক যদি জিজ্ঞাসা করে 'রাম আইস' এ স্থলে 'রামাইস' কেন হইবে না, 'তখন অবিনাশ বলিল' 'তখনাবিনাশ বলিল' কেন হইল না, পণ্ডিত মহাশয় নিরুত্তর। সংস্কৃত ব্যাকরণে পদান্ত সন্ধি আছে; সুতরাং কোনো কোনো ব্যাকরণকার সংজ্ঞাপ্রকরণের পরেই সন্ধি আরম্ভ করিয়াছেন। বাংলায় পদান্ত সন্ধি নাই, সুতরাং ব্যাকরণের প্রথমেই সন্ধি থাকা উচিত নহে; থাকিলেই 'পাঁচ পণ বিচালি কিনিলাম, তথাপ্যাকচালাখানা বাঁধা হইল না' এইরূপ প্রয়োগ হইবে। বাস্তবিকও বাংলা ব্যাকরণের প্রথমে সন্ধি দেওয়া কেবল চিন্তাশূন্যতার পরিচয়। সংস্কৃতে লিখিত কাশ্মীরি ভাষায় একখানি ব্যাকরণ সম্প্রতি প্রচারিত হইয়াছে, তাহার প্রথম দুইটি সূত্র 'সন্ধিঃ পদেষু' 'ন বাক্যেষু'। কাশ্মীরিদের যে সুবুদ্ধিটুকু আছে, বাঙালির সেটুকু নাই; অনেক ব্যাকরণে 'পদের অন্তে স্থিত নকারের পর ল থাকিলে নকারের স্থলে ল হয় এবং অনুনাসিকত্বসূচক চন্দ্রবিন্দু ব্যবহৃত হয়; যথা— বিদ্বাল্লিঁখতি' এইরূপ সূত্র ও পদ আছে। আবার 'পদের অন্তস্থিত একার অথবা ওকারের পর আকার থাকিলে অকারের লোপ হয় ও লুপ্ত অকারের চিহ্ন থাকে'। বলুন দেখি এ-সকল ব্যাকরণকে কী বলিতে ইচ্ছা হয়!

কেহ কেহ বলিবেন, যদি ব্যাকরণের গোড়ায় সন্ধি না দাও, তাহা হইলে 'যদ্যপি' 'অদ্যাপি' 'অতএব' 'ইতস্ততঃ' ইত্যাদি স্থলে বালকে কিরূপে জানিবে যে এস্থলে সন্ধি আছে। তাহার উত্তর এই যে এরূপ স্থলই তো অতি অল্প; তার পর সে গুলি সন্ধিতে জমাট করা জিনিস সংস্কৃত হইতে পাইয়াছি এবং আমরা তাহাকে একপদ রূপেই ব্যবহার করিয়া থাকি। উহা ভাঙিবার জন্য ইচ্ছাও হয় না, প্রবৃত্তিও হয় না, প্রয়োজনও নাই। আর যদি ঐ কটা সংস্কৃত শব্দের জন্যই ব্যাকরণের গোড়ায় সন্ধি শিখিতে হয়, তাহা হইলে অমন অনেক জমাট বাঁধা ইংরেজি শব্দ আমরা বাংলায় ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহার জন্যও তো সন্ধির সূত্র রাখা প্রয়োজন, যথা— 'মানোয়ারি গোরা'। এইরূপ পারসি শব্দেরও করিতে হয়, যথা— 'সিরাজ উদ্দৌলা' 'নিজাম উল্মুলুক' ইত্যাদি। হিন্দি শব্দেরও করিতে হয়; ফরাসি শব্দেরও দিতে হয়।

বাংলায় সমাস হইলে অনেক পদ একত্র করিয়া এক পদ হইলে সন্ধি

হয়, একথা অনেকে স্বীকার করিয়াছেন। আমরা বলি সংস্কৃতমূলক শব্দ ভিন্ন অন্যত্র সমাসেও সন্ধি হয় না ; যথা— 'রেল ওয়ে' 'কমল আঁখি' 'জ্যাকেট আস্তেন' 'নিলাম ইস্তাহার' 'বাংলা ইতিহাস' 'সংস্কৃত অভিধান' 'বাংলা অভিধান' 'তুমি আমি' ইত্যাদি। তবে যে-সকল সমাস-করা পদ সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে, তাহাতেই সন্ধি থাকে ; যথা— 'মহাশয়' 'দেবালয়' 'বিদ্যালয়' 'কুশাসন' ইত্যাদি। তবেই নিজ বাংলা ভাষার সমাসেই হউক আর অসমাসেই হউক, সন্ধির দরকার নাই। তবে সন্ধির আর-এক দরকার হইতে পারে কৃতে ও তদ্ধিতে ; এখানেও সেই কথা ; যে-সকল শব্দ সংস্কৃত কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন হইয়া বাংলায় আসিয়াছে, তাহাতেই সন্ধি আছে, নিজ বাংলায় নাই। তদ্ধিত যথা — 'বাড়ি-ওয়ালা' 'ঘড়ি-ওয়ালা' ; কৃৎ যথা— 'দেওন' 'লওন' 'লইয়া' 'যাইয়া' ইত্যাদি। সুতরাং সন্ধি জিনিসটা খাঁটি বাংলা ব্যাকরণে একে-বারেই দরকার নাই। সংস্কৃত হইতে যে-সকল শব্দ আসিয়াছে, তাহা-দিগকে স্বতন্ত্র শব্দ বলিয়াই ব্যবহার করিব। যাঁহাদের তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রবৃত্তি হইবে, তাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়ুন।

সংস্কৃতজ্ঞেরা বলিবেন, বাংলায় সব শব্দই সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে অথবা এত অধিক শব্দ সংস্কৃত ভাষা হইতে আসিয়াছে, যে সংস্কৃত ব্যাকরণ একবারেই ছাড়িয়া দিবার জো নাই। আমরা একথা স্বীকার করি না। লিখিত ভাষায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুকরণে সংস্কৃতের বাড়াবাড়ি কিছু বেশি হইয়াছিল বটে, কিন্তু ক্রমে সে ভাষা অপ্রচলিত হইয়া আসিতেছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি 'তেল' শব্দ সংস্কৃতে 'তৈল', প্রাকৃতে 'তেল্ল', প্রাচীন বাংলায় 'তেল'। আমরা যদি 'তেল' লিখি, চণ্ডী অশুদ্ধ হইবে কেন ? যদি অলংকার শাস্ত্রের ব্যবস্থা শুনি, তাহা হইলে 'তৈল' শব্দ প্রয়োগ করিলেই অপ্রযুক্তত্ব দোষ আসিয়া পড়িবে। 'কাজ' শব্দ প্রাকৃত 'কজ্জ' শব্দ হইতে উৎপন্ন ; এখনকার পণ্ডিতাভিমানীরা সংস্কৃত 'কার্য্য' শব্দ হইতে আসিয়াছে বলিয়া 'কায' অন্তঃস্থ য দিয়া বানান করেন, এ জায়গায় পাঠকবর্গ বলুন দেখি 'জ' শুদ্ধ না 'য' শুদ্ধ। আমরা ছেলেদের যাদু বলিয়া আদর করিয়া থাকি ; পণ্ডিতদিগের সংস্কার উহা যাদব শব্দ হইতে উৎপন্ন, সুতরাং তাঁহারা 'যাদু' লিখিয়া থাকেন ; কিন্তু যাদব শব্দ হইতে ছেলেদের আদর অর্থ আসে কেমন করিয়া ?

আসিবার তো কোনো সম্ভাবনাই নাই। যদুবংশে উৎপন্ন বলিলে যদি আদর হয়, তবে রঘুবংশে উৎপন্ন বলিলে আদর হইবে না কেন? বাস্তবিক 'জাদু' শব্দটি 'যাদব' হইতে উৎপন্ন নহে: সংস্কৃতে ছেলেদের আদর করার জন্য 'জাত' একটি শব্দ আছে, প্রাকৃতে উহা 'জাদ' হয়, তাহা হইতেই বাংলায় 'জাদু' হইয়াছে। সুতরাং বাংলায় অন্তঃস্থ য দিয়া 'যাদু' লিখিলে খাঁটি ভুল হইয়া যায়। অনেক স্থলে সংস্কৃত ও প্রাকৃতমূলক দুটি শব্দ একই অর্থে বাংলায় চলিত আছে, আমরা লিখিবার সময় সংস্কৃতমূলক শব্দটি ব্যবহার করি, আর কথা কহিবার সময় প্রাকৃত-মূলক শব্দটি ব্যবহার করি, 'অদ্য'— 'আজ', 'কল্য'— 'কাল': কেন 'আজ' 'কাল' লিখিলে কি অর্থ পরিষ্কার হয় না? আমরা তো দেখি অর্থের কোনো ব্যত্যয়ই হয় না; তবে কেন সাধ করিয়া চলিত শব্দ ত্যাগ করি, আর অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়া ছেলেদের মানের বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া দিই। গোড়ায় তো সেই আহাম্মুকি করি, আবার শেষ রক্ষা করিবার জন্য পৃথিবী সুদ্ধ সন্ধির সূত্র মুখস্থ করিয়া মরি।

শব্দবিভাগ সম্বন্ধে একটি কৌতুকের কথা মনে পড়িয়া গেল। এক-জন সুবুদ্ধি বাংলা-ব্যাকরণকার প্রাতিপদিকের শ্রেণীবিভাগ করিতে গিয়া দেখিলেন, একজাতীয় শব্দ বিভক্তিযুক্ত হইলেও বিকৃত হয় না, আর-এক জাতীয় শব্দ বিকৃত হয়: যাহারা বিকৃত হয় না, সংস্কৃতে তাহাদের অব্যয় বলে, সেইজন্য যাহারা বিকৃত হয়, তিনি তাহাদিগকে সব্যয় বলেন। সব্যয় শব্দ না আছে সংস্কৃতে না আছে বাংলায়। যদি বা সংস্কৃতে ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলেও উহার অর্থ তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা কোনো ক্রমেই হয় না। পূর্বেই বলিয়াছি, অনেক বিভক্তিতে বাংলা শব্দের কোনো বিকারই হয় না, সেগুলিও তবে অব্যয় হইয়া যাউক। বাস্তবিক বাংলায় তিন-চারিটি বৈ বিভক্তি নাই। তাহার মধ্যে আবার 'এ' বিভক্তিটি সকল কারকেই হয়, সুতরাং সংস্কৃতের মতো প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী ইত্যাদি এবং একবচন, বহুবচন করিয়া একটা লম্বা গাছ আঁকিবার প্রয়োজন কী? ইংরেজিতে বিভক্তি দুটি বৈ নাই, বাংলায় চার-পাঁচটি আছে, সুতরাং বিভক্তিটা একেবারে লোপ করিলে চলিবে না। বিশেষ যখন বিভক্তি শব্দের অঙ্গ ও কারক অর্থের

অঙ্গ, তখন ও দুটা বাল্যকাল হইতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র করিয়া দেখাইয়া দেওয়া উচিত।

বাংলা ব্যাকরণকারদিগের অতি অদ্ভুত আবিষ্কার 'মিশ্র ক্রিয়া'। তাঁহারা বলেন 'আহার করা', 'প্রচার করা' এ-সকল 'মিশ্র ক্রিয়া', অর্থাৎ ক্রিয়াটার খানিকটা বিশেষ্য ও খানিকটা ক্রিয়া; দুইয়ে মিশিয়াছে বলিয়া উহার নাম মিশ্র ক্রিয়া। পাণিনির চৌদ্দপুরুষেও এত উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিতে পারেন নাই। বাংলা ব্যাকরণকারেরা বলেন, যদি 'আহার করা' ক্রিয়া না হয়, তবে 'অন্ন আহার করিতেছেন' এস্থলে 'অন্ন' কর্ম-কারক কিরূপে হইবে? সুতরাং মিশ্র ক্রিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে 'করে' ক্রিয়ার কর্ম 'আহার', 'অন্ন' ঐ ক্রিয়ার কর্ম হইতে পারে না; 'অন্ন' পদটি 'আহার' এই কৃদন্ত পদের কর্ম। সংস্কৃতে যেমন কৃদন্ত পদের কর্তা ও কর্মে ষষ্ঠী হয়, বাংলায় সেরূপ কৃদন্ত পদের কর্মের রূপান্তর হয় না। কিন্তু পণ্ডিত-মানীরা বাংলার শক্তি যে সংস্কৃতের শক্তি হইতে বিভিন্ন, তাহা স্বীকার করিতে সাহস করেন না, সুতরাং 'আহার' এই কৃদন্ত ক্রিয়ার কর্মে ষষ্ঠী হয় নাই দেখিয়া 'আহার'টাকে সুদ্ধ ক্রিয়ার মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। দুই-একজন বাংলা লেখক এরূপ স্থলে 'অন্নের আহার করিতেছেন' এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন।

এ সম্বন্ধে আরো একটি কথা আছে। 'আহার করিতেছেন' বা 'অন্ন আহার করিতেছেন' ইহা তো সাধুভাষা বা কেতাবি ভাষা, আমরা কি সচরাচর এরূপ কথা বলিয়া থাকি? আমরা সচরাচর বলিয়া থাকি 'তিনি খাইতে বসিয়াছেন' বা 'তিনি ভাত খাইতে বসিয়াছেন'। কিন্তু আমাদের এমনই রোগ যে যাহা সচরাচর ব্যবহার করি, তাহা লিখিতে চাহি না। "Familiarity breeds contempt," কিন্তু এই contempt সম্পূর্ণ অমূলক; উহাদের দ্বারা ভাষার ক্ষতি হইতেছে বৈ বৃদ্ধি হইতেছে না। উহাতে একার্থ-বোধক বহুতর শব্দ ভাষায় জমিয়া যাইতেছে, বহুতর ভাব সংগৃহীত হইবার পথে কণ্টক হইতেছে। বালকেরা নিরর্থক কতকগুলা শব্দ ও তাহার অর্থ মুখস্থ করিতেছে।

পূর্বেই বলিয়াছি বাংলা ব্যাকরণের প্রথমেই শব্দের উচ্চারণস্থান ও

নিয়ম বলিয়া একটি অধ্যায় আছে ;[১] কিন্তু এ অধ্যায়ের কিছুই প্রয়োজন নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণে এ অধ্যায়টি নহিলে চলে না, কারণ তাহাতে সবর্ণ ও অসবর্ণ ভেদের প্রয়োজন ; সেই জন্য বোপদেব বর্ণের উচ্চারণ-স্থান দিয়া বলিলেন, "এষাং যো যেন সমঃ স তস্য তত্র ততঃ"। কিন্তু বাংলা ব্যাকরণে কোথায়ও সবর্ণ শব্দেরও প্রয়োগ দেখি না। অথচ উচ্চারণস্থান সম্বন্ধে মুগ্ধবোধকে অনেক দূর ছাড়াইয়া গিয়াছে ; মুগ্ধবোধে স্বল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণের, অন্তঃস্থ স্পর্শ উষ্ম প্রভৃতির উল্লেখ নাই। বাংলা ব্যাকরণে এ-সকল না থাকিলে এ অধ্যায়ই হয় না। মুগ্ধবোধকার, কেন অমুক শব্দ অমুক স্থান হইতে উচ্চারিত হইল, তাহার কারণ অনু-সন্ধান করিতে যান নাই। বাংলা ব্যাকরণকারেরা অনুসন্ধান করিতে গিয়া অনেক সময়ে অনেক কৌতুককর ব্যাপারের অবতারণা করিয়াছেন। একজন লিখিয়াছেন, শ ষ স এবং হ উষ্মবর্ণ, কারণ এই-সকল বর্ণের উচ্চারণকালে মুখ দিয়া গরম বাতাস নির্গত হয়। অনুস্বার ও বিসর্গ অযোগবাহ বর্ণ, কারণ উহারা যে স্বরবর্ণের পরে থাকে, তাহাদেরও যে উচ্চারণস্থান, উহাদেরও সেই উচ্চারণস্থান। 'অযোগবাহ' শব্দের পাণিনি ভিন্ন অন্য কোনো সংস্কৃত ব্যাকরণে প্রয়োগ নাই। 'অযোগ' অর্থাৎ শিবসূত্রসমূহে যোগ নাই, অথচ 'বাহ' অর্থাৎ ব্যাকরণের কার্যনির্বাহক, পাণিনির এই অর্থ। বাংলা ব্যাকরণকারেরা যে অর্থ করিয়াছেন তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। আমরা বলি বাংলা ব্যাকরণে এ অধ্যায়টি রাখিবার কোনো প্রয়োজন নাই। সপ্তমবর্ষীয় বালকেরা শিক্ষকের শাণিত বেত্রাঘাতে এ অধ্যায়টি অতি কষ্টে মুখস্থ করে ; কিন্তু ব্যাকরণের কোথায়ও ইহার একটা প্রয়োগও পায় না।

বাংলা ব্যাকরণের আর-একটা বিসমোল্লায় গলদের কথা বলি—তাঁহারা বলেন বাংলা ব্যাকরণ লিখিতেছি ; কিন্তু লক্ষণ লেখেন 'যে শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে বাংলা ভাষা শুদ্ধ করিয়া লিখিতে পড়িতে ও বলিতে পারা যায়, তাহার নাম বাংলা ব্যাকরণ' ; অর্থাৎ সংস্কৃত 'ব্যাকরণ' শব্দ ব্যবহার করেন ; কিন্তু লক্ষণ দেন ইংরেজি গ্রামারের। সংস্কৃত ব্যাকরণ শব্দের অর্থ "ব্যাক্রিয়ন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে শব্দা অনেন" অর্থাৎ "ইটিমলজি—ডেরিভেশন্"। বাস্তবিকই মুগ্ধবোধাদিতে পদটি তৈয়ার করিয়া দেওয়া পর্যন্ত ব্যাকরণের কার্য ; ইংরেজিতে যাকে syntax বলে,

যে সম্বন্ধে ব্যাকরণকারেরা বড়ো ব্যস্ত নহেন। ইংরেজি গ্রামার কিন্তু সচরাচর পাঁচ ভাগে বিভক্ত— অর্থোগ্রাফি, ইটিমলজি, সিন্ট্যাক্স, পংচুয়েশন এবং প্রসডি, সময়ে সময়ে উহাতে figures of speech এবং compositionও থাকে ; সংস্কৃতে কিন্তু orthographyর জন্য শিক্ষা নামে শাস্ত্র, syntaxএর জন্য বাদার্থ, prosodyর জন্য ছন্দ শাস্ত্র, figures of speechএর জন্য অলংকার শাস্ত্র আছে ; punctuation ও composition এর জন্য সংস্কৃতে স্বতন্ত্র শাস্ত্র নাই। ব্যাকরণ শুদ্ধ etymology মাত্র ; সেই ব্যাকরণকে grammarএর লক্ষণে লক্ষিত করা উচিত কিনা, সহজেই বোধ করা যাইতে পারে। অনেক বাংলা ব্যাকরণকারের এ বিষয়ে উদ্বোধ হইয়াছে ; এজন্য তাঁহারা 'বাংলা ব্যাকরণ' না লিখিয়া 'বাংলা ভাষাতত্ত্ব', 'বাংলা ভাষাবোধ' প্রভৃতি নাম দিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

এবার কতকগুলি স্থূল বিষয়ের আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলাম ; বারান্তরে বিস্তারিত বর্ণনার বাসনা রহিল।

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'
প্রথম সংখ্যা, ১৩০৮ ॥
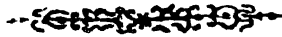
প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. সূত্র

আজ থেকে আশি বছর আগে লেখা শাস্ত্রী মহাশয়ের 'বাংলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধটি যেদিন সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশনে পড়া হয় সেদিন শ্রোতাদের মধ্যে অনেক বিজ্ঞ ও সুধী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে যাঁরা শীর্ষস্থানীয় তাঁরা সবাই হরপ্রসাদের বক্তব্য সমর্থন করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের মেজোদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পরিষদের সভাপতি, সভাপতিত্ব করেছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণের যে দোষ দেখিয়েছিলেন তা আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কোনো বিদ্বান্ মনীষী সংশোধনের অথবা প্রতিকারের জন্য কলম ধরেন নি। এমন-কি সুনীতিবাবুও তা এড়িয়ে গেছেন তাঁর বিরাট 'ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ'-এ। রবীন্দ্রনাথকে ব্যতিক্রম নির্দেশ করলুম বটে, কিন্তু তিনি কোনো ব্যাকরণ রচনা করেন নি, তিনি করে গেছেন বাংলা ভাষার শব্দ ও গঠন বিষয়ে কয়েকটি সমস্যার বিশদ আলোচনা। এ আলোচনায় তিনি প্রবৃত্ত হয়েছিলেন শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠ শুনে তার পরেই। তাই মনে করি রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নির্দেশ অনুধাবন করে বিচারের পথে পা বাড়িয়েছিলেন।

বাংলা ব্যাকরণের শব্দরূপে সংস্কৃত ও ইংরেজি ব্যাকরণের জোট মেলাবার চেষ্টা করে লেখকরা যে বিভক্তি-কারক-case-এর ঘণ্ট পাক করে গেছেন তা এখনো বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের গলাধঃকরণ করতে হচ্ছে। এই দোষের ভাগী আমিও, সুনীতিবাবুর মতো। সুনীতিবাবুর সঙ্গে মিলে আমিও একদা স্কুলপাঠ্য বাংলা ব্যাকরণ লিখেছিলুম। অপরাধ যেমন স্বীকার করছি, তেমনি একথাও জোর করে বলছি যে বাংলা ব্যাকরণ আমাদের নিজস্ব চিন্তা ও গবেষণার সাহায্যে রচনা ও প্রকাশ করার কোনো উপায় ছিল না। সেই বই শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ কখনোই পঠন-পাঠনযোগ্য বলে সমর্থন করতেন না। শাস্ত্রী মহাশয় যে কালে তাঁর প্রবন্ধটি পড়েছিলেন তখন ইস্কুলের পাঠ্য-ব্যবস্থায় শিক্ষিত ও পণ্ডিত ব্যক্তির বেশ অধিকার ছিল। আমাদের সময়ে তা চলে গিয়েছিল সম্পূর্ণ শিক্ষা-দপ্তরের কর্মচারীদের হাতে। তাঁরা নড়তেন চড়তেন নিজেদের খেয়াল খুশি ও সুবিধা মতো।

কিছু কাল হল আমি শাস্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এবং আমার শব্দ-বিদ্যার জ্ঞান অনুসারে বাংলা ভাষার নিজস্ব— অর্থাৎ সংস্কৃত, প্রাকৃত, ইংরেজি, ল্যাটিন ইত্যাদি ভাষার আদর্শ না ধরে— ব্যাকরণ রচনার চেষ্টা করছি। তার কিছু কিছু ফল প্রকাশিতও হয়েছে। কারক-বিভক্তির ঘোঁট প্রসঙ্গে আমি এখন শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তব্যের কিছু আলোচনা করতে চাই।

শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে বাংলায় সম্প্রদান কারক নেই। সে কথা ঠিক। এখনকার দিনের বাংলায় নেই, পুরোনো দিনে বাংলায় ছিল। তবে তাকে সম্প্রদান কারক অথবা তাদর্থ্য কারক অথবা উদ্দেশ কারক— যাই বলি না কেন। এই কারকের স্পষ্ট তফাত ছিল কর্ম কারকের সঙ্গে, এবং দুটি কারকের মধ্যে বিভক্তিরও তফাত ছিল। যেমন, 'জননী শিশুরে স্তন দেন হর্ষ মনে'। এখানে 'শিশুরে' সম্প্রদান কারক, আর 'স্তন' কর্ম কারক। এখানে বলা উচিত যে সম্প্রদান নামটির সংস্কৃতে উপযোগিতা যেমনই থাক বাংলায় একেবারেই নেই। সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে 'রজকায় বস্ত্রং দদাতি' হতে পারে না, কেননা তখন 'দা' ধাতুর অর্থ ছিল নিঃস্বত্ব দান করা। রজককে বস্ত্র দেওয়া নিঃস্বত্ব দান নয়, তাই সেখানে 'দা' ধাতুর প্রয়োগ হত না, তবে অন্য ধাতুর সঙ্গে এখানে চতুর্থী বিভক্তির ব্যবহারেও বাধা ছিল না। যেমন, 'ধাবনার্থং রজকায় বস্ত্রং ত্যজতি'— এখানে কারক একই, তবে একে 'সম্প্রদান' বলব না, বলব 'ত্যজ'-ধাতুর উদ্দিষ্ট কারক। সুতরাং বলা উচিত 'উদ্দেশ কারক', এ নাম সম্প্রদানেও খাটবে। পুরোনো বাংলায় এখানে 'এড়' ধাতুর ব্যবহার হত। 'এড়া কাপড়' এই ব্যবহারে এ অর্থ এখনো চলিত আছে। এমন স্থলে আধুনিক বাংলায় '-কে' বিভক্তির প্রয়োগ হয়, এবং এখন এই '-কে' বিভক্তি কর্ম কারকেও ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন, 'রামকে যেতে দাও', 'ছেলেকে মারছ কেন?' এখানে 'রামকে' খাঁটি কর্ম কারক নয়, 'দা' ধাতুর ফল ভোগী, উদ্দিষ্ট কারক, কিন্তু 'ছেলেকে' খাঁটি কর্ম কারক। আমাদের বোধে উদ্দিষ্ট কারক কর্ম কারকের কাছাকাছি এসে পড়েছে। তাই আমরা এখন পুরোনো 'সম্প্রদান' কারকের নাম দিয়েছি 'গৌণ কর্ম'।

শাস্ত্রী মহাশয়ের অন্যান্য বক্তব্যের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ এক মত।

শ্রীসুকুমার সেন।

১১ শ্রাবণ ১৩০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে শাস্ত্রীমশায় 'বাংলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধ পড়েন। সভায় সভাপতি ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সভার কার্যবিবরণে উল্লেখ আছে—

"অতঃপর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় স্বীয় প্রবন্ধ পাঠ করিতে উঠিয়া বলিলেন, আজকার প্রবন্ধে কোন গবেষণা নাই। বাংলা-ব্যাকরণ এখন যাহা আছে, তাহার প্রায় সকলগুলিই স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণ। সেই সকল

ব্যাকরণ যে প্রণালীতে রচিত হয়, তাহারই সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবার আছে তাহাই বলিব। আজকার প্রবন্ধে আসল কথার বিশেষ কিছুই নাই, ইহা ভূমিকা মাত্র। এই ভূমিকা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে। এ সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া কর্তব্য। এ আলোচনার জন্য একা আমি দাঁড়াই নাই, আমার বন্ধু-বান্ধবেরাও এ বিষয়ে প্রস্তুত হইয়াছেন।…"

সভায় প্রবন্ধটির বক্তব্যের পক্ষে এবং বিপক্ষে আলোচনা করেন বীরেশ্বর পাঁড়ে, চারুচন্দ্র ঘোষ, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যোগীন্দ্রনাথ বসু, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এবং সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কার্যবিবরণ থেকে এঁদের আলোচনা তুলে দেওয়া হল—

বীরেশ্বর পাঁড়ে ॥

শাস্ত্রী মহাশয় যে সকল কথা বলিলেন, তাহার অনেকাংশ ঠিক। আমারও একখানি বাঙ্গালা-ব্যাকরণ আছে ; কিন্তু সুখের বিষয় যে, তিনি যতগুলি দোষের কথা বলিয়াছেন, অধিকাংশের উদাহরণ আমার ব্যাকরণখানিতে নাই। শাস্ত্রী মহাশয় শিক্ষাবিভাগের উচ্চপদে নিযুক্ত, তাঁহাদের ন্যায় লোকের অভিপ্রায় অনেক সময়ে উপদেশ বা হুকুমের কাজ করে ; কারণ, তাঁহাদের অভিপ্রায় অনুসারে গ্রন্থকারগণকে পুস্তক লিখিতে হয়। আজকাল বাঙ্গালা-ব্যাকরণ সংস্কারের একটা ঢেউ উঠিয়াছে। এখনও বাঙ্গালা-ব্যাকরণ সংস্কৃত-ব্যাকরণের পন্থানুসরণে লিখিত হয় ; কিন্তু সংস্কার-প্রার্থীরা কতকগুলি বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির দোহাই দিয়া বাঙ্গালা ব্যাকরণকে প্রাকৃত-ব্যাকরণের আদর্শে গড়িতে চাহেন। উদাহরণ স্বরূপ তাঁহারা 'অদ্য = অজ্জ = আজ, কার্য্য = কজ্জ = কাজ' ইত্যাদি সংস্কৃতের প্রাকৃত ও বাঙ্গালা অপভ্রংশ শব্দমালার উল্লেখ করেন। আমার বোধ হয় সংস্কৃত ভাষা সেকালে লেখা-পড়ার ভাষা ছিল। তদ্ভিন্ন প্রাকৃত ভেদে নাটকাদিতে যে বিভিন্ন অপভাষার প্রয়োগ দেখা যায়, তাহাদের মাগধী, লাটী, মাথুরী, প্রভৃতি নাম হইতেই বুঝা যায় যে, সেগুলি তন্নামক দেশ-প্রচলিত কথোপকথনের ভাষা। নাটকাদিতে অলংকার শাস্ত্রের শাসন অনুসারে পাত্র-বিশেষের মুখে ঐ সকল ভাষার প্রয়োগ হইত। এখনকার কথোপকথনের ভাষাকে আমরা লেখা পড়ার ভাষায় তুলিয়া লইতে গিয়া একটু গোলে পড়িয়াছি। চাটগাঁয়ের কথা, বিক্রমপুরের কথা, আসামের কথা সমস্তই বাঙ্গলা ; কিন্তু কাহার সাধ্য, ঐ সকল দেশের লোক পরস্পরের কথা বুঝিতে পারে। আমার বোধ হয় সেইরূপ, তখনকার নানা দেশের কথোপকথনের ভাষাগুলি যেমন সংস্কৃতের অপভ্রংশ, এখনকার তেলগু, তামিল ভিন্ন হিন্দী, উড়িয়া, আসামী, বাঙ্গালা, মারহাট্টী সমস্তই সংস্কৃতের অপভ্রংশ। তবে কালক্রমে তাহাদের মধ্যে পূর্ব্বযুগের অপভ্রংশ ভাষায় অর্থাৎ সেকালের কথোপকথনের ভাষায় শব্দ সংখ্যার

সাদৃশ্য বেশী থাকিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে কি ? মূলে তজ্জন্য তাহা সংস্কৃতানুসারিণী না হইবে কেন ? লিখিত ও কথিত ভাষা কোন কালেই এক নহে ; যে প্রাকৃত ভাষা আমরা নাটকাদিতে দেখি, তাহাই যে তখনকার কথোপকথনের ভাষার ঠিক প্রতিরূপ, তাহা বলা যায় না। এখনকার বাঙ্গালা ভাষার দৃষ্টান্ত দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে,— হুতমী ভাষা, আলালী ভাষার সমান নহে, অথচ উভয়ই কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। আবার বিদ্যাসাগরের ভাষা, বঙ্কিমের ভাষা এক নহে। এখনকার অনেক নবীন লেখকের চেষ্টা হইয়াছে যে, এতদঞ্চলের কথোপকথনের ভাষার শব্দের অপভ্রংশরূপের যেরূপ উচ্চারণ হয়, লিখিত ভাষায় তাহাই ব্যবহার করিতে হইবে। ইহারা 'বিদির্কিচ্ছি' লিখিতে উৎসাহ প্রকাশ করেন, 'যাইব' লিখিতে ভালবাসেন ; কিন্তু 'অদ্য' লিখিলে, 'গমন করিব' লিখিলে বিরক্ত হন। ইঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দোষ দেন ; কারণ তিনিই লেখা পড়ার ভাষাকে সংস্কৃত-শব্দ-বহুল করিয়া গড়িয়া গিয়াছেন। তাহা নয় ; বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ব্বে প্রাচীন গীতকার কবিদিগের গানের ভাষা, দেওয়ান মহাশয়ের গান, নিধুবাবুর গান, রামপ্রসাদের গান প্রভৃতির ভাষা আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে বিদ্যাসাগরের অবলম্বিত ভাষার রূপ বহু পূর্ব্ব হইতেই দেশে প্রচলিত হইয়াছিল। অনেকের আপত্তি বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত শব্দবাহুল্য হইলে উহা সাধারণের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িবে ; অভিধান, ব্যাকরণ পাশে না রাখিয়া মাতৃভাষার সাহিত্য পাঠ করা চলিবে না ;— আমার মত তাহা নহে, পূর্ব্বে বরং শিক্ষা সঙ্কুচিত ছিল, নকল করিয়া কৃত্তিবাস কাশীদাস, সত্যনারায়ণ না পড়িলে সাহিত্য পড়িতে পাওয়া যাইত না ; সাহিত্য রসাস্বাদন করিতে হইলে গায়ানের গান শুনিতে হইত। এখন তাহা নাই ; এখন mass education চলিয়াছে, সকলেই বালককাল হইতে বিদ্যাসাগরের ভাষায় অভ্যস্ত হইতেছে, mass education বৃদ্ধি হইলে, প্রসার হইলে ঐ আশঙ্কা দূর হইয়া যাইবে না কি ? এখন যে আকারের ভাষা লেখা পড়ার ভাষা বলিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অবলম্বিত ভাষার বহু পূর্ব্ব হইতেই দেশে চলিত হইয়াছিল। সংস্কৃত শব্দ বাহুল্য থাকায়, তাহা চাটগাঁ হইতে আসাম এবং মেদিনীপুর হইতে জলপাইগুড়ি সর্ব্বত্র বোধ সুলভ আছে, কিন্তু এই ভাষাকে ভাঙ্গিয়া যদি এই প্রদেশের slang অপভাষার এবং colloquial গ্রাম্য ভাষার শব্দ দিয়া নূতন করিয়া গড়িতে যাই, তবে ফল কি হইবে ? এত দিনের চেষ্টায় যাহা অগ্রসর হইয়াছে, তাহা আবার পিছাইয়া পড়িবে। সত্য কথা বলিতে কি, এখনকার এই নূতন ভাষায় লিখিত শতকরা ৭৫খানা পুস্তক আমিই বুঝিতে পারি না। বাঙ্গালা ব্যাকরণ গঠন সম্বন্ধে এই বলিতে চাই যে অনেকে 'পিতা' পদকে শব্দের মূল রূপ বলিতে চাহেন। কারণ বাঙ্গালায় 'পিতা' এই শব্দে বিভক্তি যোগ হয়, পিতাকে, পিতার, পিতা দ্বারা কাজেই

তাঁহারা 'পিতৃ' শব্দের অস্তিত্ব বাঙ্গালা ব্যাকরণে লোপ করিতে চাহেন। কিন্তু তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য পৈতৃক, পিতৃব্য, পিতৃকৃত্য প্রভৃতি স্থলে 'পিতা' পাইবেন কোথা? পিতাকে, পিতার, পিতা দ্বারা প্রভৃতি পদের জন্য যদি অভিনব ব্যাকরণ প্রয়োজন হয়, তবে পৈতৃক প্রভৃতির জন্য পূর্ব্ব ব্যাকরণ মানিব না কেন? কারকের বিভক্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় যাহা বলিলেন, তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই 'দিয়া' 'দ্বারা' 'হইতে' প্রভৃতি যে অর্থে বিভক্তি সে অর্থে সে সকল শব্দের অন্য প্রয়োগ দেখি নাই, হইতে পারে বলিয়াও বোধ হয় না। 'হাত দিয়া খাই', আর 'টাকা দিয়া ধান লই' এই দুটি 'দিয়া'র অর্থ সম্পূর্ণ পৃথক। সম্প্রদান কারক বাঙ্গালায় নাই কেন?— দুটা 'কে' বিভক্তি রাখিতে হয় বলিয়া কি সম্প্রদান কারক উঠাইয়া দিব?— সংস্কৃত দুটা 'ভ্যস্' দুটা 'ভ্যাম্' আছে, কৈ, কাহারও গোল লাগে কি? সে স্থলেও অর্থ বুঝিয়া কারক নাম বলিতে হয়, তবে বাঙ্গালায় স্বতন্ত্র নিয়ম কেন হইবে? বৃহদাকার বিভক্তি সংস্কৃতেও আছে, বাঙ্গালায় থাকিতে দোষ কি? আর যদিই হয়, তবে উহাই বাঙ্গালা কারকের বিশেষত্ব হউক না কেন? 'হইতে' 'থেকে' 'কর্ত্তৃক' বাদ দিলে বাঙ্গালায় অপাদান ও করণ কারকের এক প্রকার অভাব হইয়া পড়ে, আর উহাদের বিভক্তিত্ব স্বীকার না করিলে ঐ সকল স্থলে উহাদের সার্থকতাই বা কি হইবে, তাহা বুঝি না। ক্রিয়া সম্বন্ধে বক্তব্য এই, মরিয়া যাইব, খাইয়া ফেলিব, ইহাদিগকে মিশ্র ক্রিয়া না বলিয়া পূর্ব্বাংশকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলিয়া অভিহিত করিলে অর্থ হইবে কেন? মরিয়া যাইব— অর্থাৎ আগে মরিব পরে যাইব? এরূপে ক্রিয়া বিভাগ করিতে হইলে বাঙ্গালার ভূ অর্থাৎ হওয়া ও কৃ অর্থাৎ করা ভিন্ন ধাতু থাকে না। তবে এদিকে দৃষ্টি দেওয়া ভাল। বাঙ্গালায় মৌলিক ধাতুর ব্যবহার বাড়ান আবশ্যক। অবশেষে বক্তব্য এই আজ কাল অনেক ভাবুক লেখক দেখা দিয়াছেন। এই সকল ভাবুক লেখকের ভাবের লেখায় অনেক সময় কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া ঠিক থাকে না, বা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কাজেই আমাদের ভাবগ্রহ হয় না। তাঁহাদের ভাব তাঁহাদের মনেই রহিল, লেখায় ফুটিল না, আর আমি বুঝিয়া লইব,— একি electricity নাকি? এ ভাবের ভাষা বাড়িলে আর কিছু দিন পরে বিদ্যাসাগরের ভাষা পড়িয়া কেহ কিছু বুঝিবে না। অতএব আমার অনুরোধ এই, ভাষার গতি যাহা দাঁড়াইয়াছে, লোকে যে সংস্কারসম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িতে না গিয়া, যাহা আছে তাহা মাজিয়া ঘসিয়া লওয়া হউক। বিশেষ বিবেচনা করিয়া একটা কাজ করা ভাল। ইংরাজী ব্যাকরণের যে ধরণের সংস্কার হইতেছে, ঠিক সেই ধরণেই যে আমাদেরও ভাষা সংস্কার করিবার জন্য নাচিতে হইবে, তাহা ঠিক নহে। বিদেশী অনুকরণে আমরা সর্ব্বস্ব খোয়াইয়াছি, আবার বিদেশী অনুকরণে অর্দ্ধপ্রস্তুত ভাষার বিরুদ্ধাচরণ করি কেন?

চারুচন্দ্র ঘোষ ॥

শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ অতি উৎকৃষ্ট এবং সময়োপযোগী হইয়াছে। আমিও যতদূর আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে এখানকার বাঙ্গালা ব্যাকরণগুলিকে বাঙ্গালা ব্যাকরণ বলা কোনরূপেই যুক্তি সঙ্গত হয় না। তাহার কারণ আজ আমরা যে ভাষায় এই বিচারবিতর্ক করিতেছি তাহা আমার ভাষাই হউক, আর পাঁড়ে মহাশয়ের ভাষাই হউক, ইহার গঠনের জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণ আবশ্যক হয় না বা তাহার নিয়মাদি ইহার পক্ষে প্রয়োজন হয় না। বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের অল্পতা যাঁহারা সহ্য করিতে না পারেন, তাঁহারা সংস্কৃতই শিখুন। তাঁহাদের বাঙ্গালা শিক্ষারূপ গলগ্রহ কেন? এখনও বাঙ্গালা ভাষায় অন্যান্য ভাষার শব্দ প্রবেশ করিতেছে, ভাষার পুষ্টি হইতেছে; এ অবস্থায় কেবল সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মগুলি লইয়া বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ লিখিতে গেলে চলিবে কেন? যখন বিভিন্ন ভাষার শব্দ লইয়া এ ভাষা পুষ্ট হইতেছে, তখন ব্যাকরণও বিভিন্ন প্রণালীর হইলেই বা ক্ষতি কি? তবে আমার মতে ব্যাকরণের সময় এখনও হয় নাই। বাঙ্গালার লিখিত ভাষার আদর্শ যদি তারাশঙ্করের কাদম্বরীর ভাষা বা বিদ্যাসাগরের ভাষা হয়, তবে সে ভাষা অনুস্বারবিসর্গশূন্য সংস্কৃত ভাষাই হইবে। বাঙ্গালা ভাষাই হইবে না। সে ভাষা যদি কালে লোপ হয় হউক। আর একটী কথা কেহ কেহ বলেন, বাঙ্গালা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণ হইতে না হইলে ভবিষ্যতে সংস্কৃত শিখিবার বিশেষ ব্যাঘাত হইবে। ইহার উত্তরে আমি এই বলি বালকমাত্রেই যে ভবিষ্যতে সংস্কৃত পাঠ করে, এরূপ কোথাও দেখিয়াছেন? বাস্তবিক যাহাদিগের সংস্কৃত ভাষায় আস্থা নাই তাহাদিগের এ গলগ্রহ কেন? তবে যাঁহারা সংস্কৃত ভালরূপ শিখিতে চাহেন, তাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ করিবেন। আধ বাঙ্গালা আধ সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িয়া লাভ কি?

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ॥

শাস্ত্রী মহাশয়ের আধুনিক বাঙ্গালা ব্যাকরণ সম্বন্ধে মতামত খুব ঠিক। শ্রদ্ধাস্পদ পাঁড়ে মহাশয় প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ঠিক বুঝিতে পারেন নাই, প্রথমত: দেখিতে হইবে, সংস্কৃত শব্দের পরিমাণ যত বেশী হউক, তদ্ব্যতীত বাঙ্গালা ভাষার শব্দ কিছু আছে কি না? যদি থাকে তাহাদের জন্য ব্যাকরণের রূপ কিরূপ হওয়া উচিত? সংস্কৃতাদি প্রাচীন ভাষার গতি কিছু সংক্ষিপ্ততার দিকে। এখনকার ভাষার গতি বিস্তারের দিকে। পূর্ব্বে সন্ধি সমাসাদির দ্বারা শব্দ যোগ করিয়া শব্দের অর্থান্তর ঘটাইয়া ভিন্নার্থ প্রকাশের চেষ্টা হইত, এখন প্রত্যেক অর্থের জন্য বিভিন্ন শব্দের বিভিন্ন ব্যবহার হয়। ব্যাকরণ সম্বন্ধে আমার বোধ হয়, ভাষায় যে সমস্ত বিভিন্ন ভাষার শব্দ আছে, সে সমস্ত ভাষার ব্যাকরণের নিয়মাদির

প্রয়োজনমত সারসঙ্কলন হওয়া উচিত। এইরূপে নবকল্পিত বাঙ্গালা ব্যাকরণে সংস্কৃত, উর্দ্দু, পার্সী ইত্যাদি অধ্যায় ভেদ থাকিলে চলিতে পারে।

প্রাকৃত ভাষা সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, যে ভাষা সামান্য লোকে বুঝিত, অপভাষা বলিয়াই কেবল যে তাহা নাটকে সামান্য জনের মুখে দেওয়া হইত এমন নহে। কুমারে আছে, শিবপরিণয়ে শিব সংস্কৃতে মন্ত্র পাঠ করিলেন, আর পার্ব্বতীকে প্রাকৃত মন্ত্র পড়ান বা বুঝান হইল। সুতরাং যাহা সাধারণের বোধ সৌকর্য্যার্থে ব্যবহৃত হওয়া আবশ্যক, তাহা প্রাকৃত হওয়াই উচিত। সেই জন্যই বুদ্ধদেব তৎকালপ্রচলিত পালি ভাষায় ধর্ম্মোপদেশ দানের ব্যবস্থা করেন। এখন আমাদের বাঙ্গালা ভাষাকে সাধারণবোধ্য করিতে হইলে ইহার সংস্কৃতত্ব হ্রাস করা আবশ্যক হইবে। শব্দত্যাগ করিতে বলিতেছি না। শব্দের ব্যবহার, পদ ও বাক্য গঠনাদির ব্যবস্থা প্রাকৃতভাবে হওয়াই উচিত। অজ্জ ও কজ্জ সম্বন্ধে পাঁড়ে মহাশয় যে 'জ'এর সাদৃশ্য দেখাইয়া আজ ও কাজ শব্দ উৎপাদনের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। প্রাকৃত ভাষার 'য' এর প্রয়োগ যত বেশী, তত 'জ'এর নহে ; সুতরাং কার্য্য হইতে কজ্জ করিবার জন্য প্রাকৃত ভাষায় 'য' ত্যাগ করিবার কারণ 'য'এর অভাব নহে এবং সেই অভাবকে মূল ধরিয়া বাঙ্গালায় 'কাজ' লিখিতেও যে 'য' বাদ দেওয়া হয় তাহা নহে। মিশ্রধাতু সম্বন্ধে পাঁড়ে মহাশয় যে অর্থ করিলেন, ওরূপ অর্থ কেহ করে না। 'মরিয়া গেল'— এখানে 'গেল' গমনার্থক নহে, ইহা ক্রিয়ার সমাপ্তিসূচক অংশমাত্র। ঐ অংশের অর্থ ওরূপ নহে।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ॥

বাঙ্গালা ব্যাকরণ সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় যাহা বলিলেন, তাহা সুন্দর সুযুক্তিপূর্ণ এবং মনোজ্ঞ। তাঁহার মতামতের বিরুদ্ধে বলিবার আমার কিছু নাই। তাঁহার প্রবন্ধ শুনিয়া যাঁহারা সমালোচনা করিলেন, তাঁহাদিগের কয়েকটি কথা সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

কোন কোন বক্তার কথায় বোধ হইল, তাঁহারা ভাষাকে ব্যাকরণের নিয়ম-নিগড়ে শৃঙ্খলিত করিতে একান্ত ইচ্ছুক। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। ভাষার স্রোতকে ব্যাকরণের বাঁধ দিয়া বাঁধিতে চেষ্টা করা আমার বোধ হয় ঐরাবতের গঙ্গাস্রোত-রোধ চেষ্টার মত উপহাসাস্পদ। আমার বিশ্বাস উহা মানুষের ক্ষমতায় হয় না। ব্যাকরণের অতীত ইতিহাস আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, ভাষাকে নিয়ন্ত্রিত করা ব্যাকরণের উদ্দেশ্য নহে— ভাষার বিদ্যমান অবস্থা বুঝাইয়া দেওয়াই ব্যাকরণের কার্য্য। দুটি প্রাচীন ভাষার উদাহরণ দিতেছি। প্রথমতঃ দেখুন সংস্কৃত ভাষা, যে ভাষার ভিত্তির উপর বাঙ্গালা ব্যাকরণ গঠিত করার প্রস্তাব হইয়াছে, সেই ভাষার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ব্যাকরণও কত পরিবর্ত্তিত

হইয়াছে। বৈদিকযুগে সংস্কৃত ভাষার যে আকার ছিল, কালে বৈদিক ভাষার সে আকার পরিবর্ত্তিত হইল। যখন বৈদিক ভাষা সংস্কৃত আকার ধারণ করিল, তখন ভাষার প্রকৃতি ও অবস্থা এবং বৈদিক ভাষার সহিত প্রভেদ দেখাইবার জন্য পাণিনি জগতের শ্রেষ্ঠতম ব্যাকরণ রচিত করিলেন— তাঁহার ব্যাকরণের সর্ব্বত্র দেখান হইয়াছে, "ছন্দসি ভাষায়াং" এইরূপ। তাহাতেও সংস্কৃত ভাষা নিগড়িত হইল না, তাহার স্বাধীনগতি থামিল না। ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া তাহার যে অবস্থা দাঁড়াইল তাহা যথাযথ বুঝাইতে পাণিনিসূত্রে কুলাইতে পারিলেন না। কাত্যায়ন তখন বার্ত্তিক রচনা করিয়া পাণিনির সূত্রকে সময়োচিত করিতে অগ্রসর হইলেন। কাত্যায়ণের বার্ত্তিককে যদি সমসাময়িক স্বীকার করা যায় তাহা হইলে মানিতে হয়. যে শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ পাণিনির সূত্রের ভ্রমপ্রমাদ সংশোধন জন্য তিনি বার্ত্তিক রচনা করিয়াছিলেন। ইহা সম্ভব নহে। নতুবা বলিতে হয়, পাণিনির পরে ভাষায় যে পরিবর্ত্তিত অবস্থা হইয়াছিল, তাহা দেখাইবার জন্য বার্ত্তিককার পাণিনির সূত্রে নূতন সূত্র যোজনা করিয়া দিয়াছিলেন। গ্রীক ভাষার ব্যাকরণ পূর্ব্বে ছিল না। রোমকেরা যখন গ্রীস্ জয় করে, তখন রোমকেরা গ্রীস্ সাহিত্যের মনোহারিতায় মুগ্ধ হয়। উহাতে তাহাদের প্রবেশলাভের জন্য গ্রীক্ বৈয়াকরণেরা গ্রীক্ ব্যাকরণ প্রস্তুত করে। ভাষাকে নিয়ন্ত্রিত বা নিগড়িত করিবার জন্য গ্রীক্ ব্যাকরণ রচিত হয় নাই।

সেইরূপ আমাদের বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ যাঁহারা গড়িতে যাইবেন, তাঁহাদের ইহা মনে রাখা উচিত, যে তাঁহারা ভাষায় যাহা আছে, তাহারই প্রয়োগ প্রকৃতি গঠন প্রণালীর নিয়মাদি কিরূপ তাহা ব্যাখ্যা করিবেন মাত্র, কেহ কিছু গড়িবেন না।

আজ অনেকেই সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কারকের বিভক্তি লইয়া অনেক আলোচনা করিয়াছেন। আমার বোধ হয় তাঁহারা একটী কথা অনুধাবন করেন নাই। ভাষা বিজ্ঞানে যাহাকে Postposition পর নিপাত বলে, বাঙ্গালা ভাষায় সেইরূপ কতকগুলি আছে। 'হইতে, দ্বারা, থেকে' প্রভৃতির কারকের বিভক্তিবৎ ব্যবহার হয়। সংস্কৃতের সেইরূপ হয় না। অন্য ভাষার উদাহরণ দিলে কথাটা ভাল বুঝা যাইবে। ইংরাজিতে যেমন কারকার্থ প্রকাশক of, to, in, প্রভৃতি শব্দের পূর্ব্বনিপাত হয়— যথা সেইরূপ বাঙ্গালায় 'হইতে', 'থেকে', 'দ্বারা', প্রভৃতির পর নিপাত হয়,— যেমন ছাদ হইতে জল পড়িতেছে।

সংস্কৃত বঙ্গ ভাষার আদি জননী বলিয়া যাঁহারা বাঙ্গালা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে গড়িতে চাহেন, তাঁহাদের একটা বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত। ফরাসী, ইতালীয় প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষা, লাটিন ভাষা হইতে উৎপন্ন হইলেও কাহারও ব্যাকরণ লাটিন ব্যাকরণের অনুসারে গঠিত নহে। সমস্ত মানবজাতি মনুর অপত্য বলিয়া যদি ইউরোপীয় ও ভারতীয় জাতিকে কেহ এক বলিতে

চাহেন, তাহা যেমন ভুল হয়, হিন্দী, বাঙ্গালা, উড়িয়া, সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন বলিয়া সংস্কৃতের সহিত এক বলাও সেইরূপ ভুল। সত্য বটে এই সকল ভাষা সংস্কৃতের রূপান্তর, কিন্তু উভয়ের মধ্যে এত অন্তর যে তাহাকে হোমিও-প্যাথিক ডাইলিউসন হিসাবে এক বলা যায় মাত্র। যাঁহারা শিক্ষার দোহাই দিয়া বা বিভিন্ন দেশবাসী লোকের মধ্যে ভাষার একত্ব সাধন দ্বারা একতা স্থাপনের কথা বলেন, তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত যে এ প্রণালীতে ভাষার একতা হয় না; জাতীয় সাহিত্য গঠিত হইলে তবেই একতা হয়। জেলায় জেলায় বাঙ্গালা ভাষার বিভিন্নতা আছে, কিন্তু বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্য গঠিত না হইলে একতা হইতে পারে না। ভাষার একত্বসম্পাদন ব্যাকরণে হয় না। কোন দেশে প্রতিভাশালী লেখক জন্মিলেই লোকে তাহার রচনা অনুকরণ করিতে চেষ্টা পায়, এইরূপে সাহিত্যের ভাষার গতি একত্বের দিকে অগ্রসর হয়। প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভাষার কোনরূপ একতা থাকে না। প্রতিভাশালী লেখক যে প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই স্থানের কথিত ভাষাই লিখিত ভাষার আদর্শ হয়। এইরূপ ইংলণ্ডে চসারের ভাষা, ইটালীতে দান্তের ভাষা, জাতীয় ভাষা হইয়াছে। আমাদের বাঙ্গালা ভাষার গদ্য সাহিত্যের পরিণতি দেখিলে তাহা বুঝা যাইবে। প্রথমে রাজা রামমোহন, পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়, পরে বঙ্কিমবাবু ভাষার রশ্মি ধরিয়া তাহাকে যে দিকে লইয়া গিয়াছেন, ভাষা সেই দিকে গিয়াছে। এখনও বঙ্কিমের ভাষাই চলিতেছে, তাঁহার ভাষারই অনুকরণ সর্ব্বত্র হইতেছে। পাঁড়ে মহাশয় পঞ্চাশ বৎসর পরে বিদ্যাসাগরের ভাষার অবোধ্যতার বা লোপের যে আশঙ্কা করিলেন, আমি দেখিতেছি তাহার কোন প্রতিকার নাই। তাহা হইবেই হইবে। ইংলণ্ডেও তাহা হইয়াছে। চসারের বা সেক্সপিয়রের ভাষার অভিধান ব্যাকরণ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে: তাহা বুঝিতে ব্যাখ্যার আবশ্যক হয়।

ভাষাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা পাইলে বিদেশী ভাষা বুঝা দূরে থাক, বিভিন্ন প্রদেশীয় ভাষার একত্ব সাধন দূরে থাক, শিক্ষারই বিস্তার হইবে না। পাঁড়ে মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন, সে কালে শিক্ষার বিস্তার ছিল না। শিক্ষার বিস্তারের জন্য রচনার ভাষা যত কথিত ভাষার নিকটবর্ত্তী হইবে, ততই সুফল ফলিবে। ভাষা অর্থে যদ্দ্বারা ভাষণ করা যায়, সুতরাং তাহা কথিত ভাষার নিকটবর্ত্তী হওয়াই উচিত। বুদ্ধদেব কথিত ভাষার নিকটবর্ত্তী হইবে বলিয়াই পালি ভাষায় উপদেশ গ্রন্থাদি নিবদ্ধ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। আলোচনা কালে অনেকে সংস্কৃত ব্যাকরণের পক্ষপাত দেখাইয়া যে সকল সুবিধার কথা উল্লেখ করিলেন, তাহার কোনটিই সংস্কৃতের প্রলেপময় ভাষা দ্বারা হইবার নহে। এ সম্বন্ধে জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি যাহা বলেন, তাহার উল্লেখ করিতেছি। বাক্‌ল্ বলেন, জর্ম্মানিতে ইংলণ্ডের অপেক্ষা অনেক প্রতিভা-বান জ্ঞানী সুলেখক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তবুও জর্ম্মানিতে ইংলণ্ডের ন্যায়

শিক্ষার বিস্তার হয় নাই, তাহার কারণ এই যে জর্ম্মনের সাহিত্যের ভাষা জনসাধারণের ভাষার অনেক দূরে। আর ইংলণ্ডের সাহিত্যের ভাষা, যে ভাষা শিক্ষাবিস্তারের মিডিয়ম, তাহা সাধারণের ভাষার অতি নিকটবর্ত্তী।

ভাষার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, তবে সে পরিবর্ত্তন যত সাধারণের বোধ্য হয়, ভাষার নিকটস্থ হয়, ততই ভাল। তাহাই বাঞ্ছনীয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর॥

হীরেন্দ্রবাবু যাহা বলিয়াছেন, প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ে তদতিরিক্ত বলিবার আর কিছুই নাই। নিঃশেষ করিয়া সকল কথার উত্তর দিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতায় আজ অনেক বিষয় শিক্ষা হইল, সেজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ব্যাকরণ প্রবন্ধ কিরূপ হইবে, এ সন্দেহ আমার ছিল, কৌতূহলী হইয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু এমন মনোজ্ঞ প্রবন্ধ শুনিব, তাহা কল্পনা করিতেও পারি নাই। ভাষা যে আমরা নিজে ইচ্ছা করিলে, গড়িতে পারি, ভাঙ্গিতে পারি, এরূপ নহে। সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সহজে বুঝা যায়, কিন্তু কোথায় কোথায় কিরূপ পার্থক্য আছে. সেগুলি লক্ষ্য করাই এখন আবশ্যক। তবেই ইহার বর্ত্তমান আকৃতি জানা যাইবে, তবেই ব্যাকরণ গঠনের চেষ্টা হইতে পারিবে। আমারও মনে হয় যে বাঙ্গালা ব্যাকরণ সংস্কৃতমূলক হবে কেন? সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য বাংলায় বেশী বলিয়াই ভাষার গঠনাদিও সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে করিতে হইবে? বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি কাঠামো যে সম্পূর্ণ তফাত ইহা না বুঝিলে চলিবে কেন? তবে সংস্কৃত ব্যাকরণ আলোচনা করা আবশ্যক, নতুবা আমরা ঠিক পথে চলিতে পারিব না। আমার আর বক্তব্য নাই ; শাস্ত্রী মহাশয়কে আমার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী॥

আমার একটা কথা বলিবার আছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। ব্যাকরণ সম্বন্ধে আলোচনা তিনি আরম্ভ করিয়া পরিষদের একটি উদ্দেশ্যসাধনের সূত্রপাত করিলেন। ব্যাকরণ শব্দের শাস্ত্রীয় অর্থ Etymology. শব্দের রহস্য জানা আবশ্যক, শব্দটি কোথা হইতে আসিতেছে জানিতে পারিলে আমরা আমাদের ভাষাটিকে চিনিতে পারিব, তখন আমাদের নিজের জাতি জানিতে পারিব। শাস্ত্রী মহাশয় অদ্য যে আলোচনা আরম্ভ করিলেন, আশা করি ইহা সবেগে চলুক। এই আলোচনার ঘর্ষণে কিঞ্চিৎ উত্তাপের উদ্ভব অনিবার্য্য ; তবে আলোকের উদ্ভবও যথেষ্ট হইবে।

যোগীন্দ্রনাথ বসু ॥

আমি শাস্ত্রী মহাশয়ের ছাত্র; আমা দ্বারা প্রবন্ধের সমালোচনা হওয়া উচিত নহে, তবে এ সম্বন্ধে আমার মনে যে সকল তর্ক উপস্থিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার নিকট উপস্থিত করিয়া আরও কিছু শিখিতে চাই। বাঙ্গালা ব্যাকরণ যখন আবশ্যক হইয়াছে, তখন তাহা কিরূপ হইবে ইহাই বিচার্য। সকল কাজের আদর্শ আবশ্যক। বাঙ্গালা ব্যাকরণের আদর্শ কি হইবে? প্রথমতঃ বাঙ্গালা কোন একখানা পুস্তক লইয়া বিবেচনা করা উচিত, তাহাতে সংস্কৃত শব্দ ও অন্যান্য ভাষার শব্দ কি পরিমাণে আছে। যে ভাষার শব্দ সংখ্যা অধিক হইবে, ব্যাকরণ তদনুসারে গঠিত হইলে ক্ষতি কি? অদ্য আলোচনা করিয়া বিভিন্ন দিকে যাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাহা ঠিক নহে। একটা সামঞ্জস্য আবশ্যক। বাঙ্গালা ভাষার এ অবস্থায় সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে সৃজন, কৃষক প্রভৃতি পদ অশুদ্ধ হইলেও আর তাহা ত্যাগ করা যায় না। একজন বলিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষা অল্পদিনের শিশু ইহাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিলে ইহার স্ফূর্তি নষ্ট হইয়া ইহার অঙ্গ হানি হইবে। সত্য; কিন্তু শিশুর অভিভাবকের তাহার পদস্খলনের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়, নতুবা তাহাতেও অঙ্গহানি সম্ভাবনা। একজন বলিয়াছেন, পূর্ব্বে ভাষার গতি সংক্ষিপ্ততার দিকে ছিল, এখন একটি শব্দ মনোভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এখনকার ভাষায় যে একেবারে সংক্ষিপ্ততার অভাব তাহা নহে। বিদেশীয় ভাষাতেও সন্ধি সমাসের অস্তিত্ব দেখা যায়। ইংরাজীর Pickpocket, Scarecrow প্রভৃতি শব্দ উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। অনেক পদকে এক করার জন্যই ভাষার সন্ধি সমাসের আবশ্যক হয়। যাঁহারা ব্যাকরণ দ্বারা ভাষার গতি প্রতিরোধ আশঙ্কা করিতেছেন, তাঁহারা ভাষার অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণের কোন প্রকৃষ্ট উপায়ের কথা নির্দ্দেশ করিতেছেন না। অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা পরিহার যে প্রার্থনীয় তাহা সকলেরই স্বীকার্য। যাঁহারা বৈদেশিক শব্দ লইয়া ভাষায় পুষ্টির পক্ষপাতী, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এমনও বলেন যে, কালে বাঙ্গালা ভাষার বিদেশী শব্দের বা নূতন শব্দের এত প্রাদুর্ভাব হইবে যে সংস্কৃত শব্দগুলি টিম টিম করিতে থাকিবে। আমার মতে সংস্কৃত ধাতু প্রত্যয়ের যোগে আবশ্যক পদসমূহ রচনা করিয়া লইতে যে বিলম্ব, বিদেশীশব্দকে বাঙ্গালার অঙ্গীভূত করিয়া ব্যবহার করিতেও সেই পরিমাণ বিলম্বই হইবে, এরূপ স্থলে মূলভাষার সহিত নৈকট্য রাখা কি প্রার্থনীয় নহে। এরূপ হইলে ভাষায় একটা আদর্শ থাকিবে, নতুবা বৈদেশিক শব্দের প্রাচুর্য্যে এবং তাহাদের ব্যবহারের একটা সুসঙ্গত প্রণালী না থাকায় ভাষায় উচ্ছৃঙ্খলতাই বাড়িবে। অতএব বাঙ্গালা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শে গড়িলে বিশেষ ক্ষতি কি হইবে?

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ॥

এতক্ষণ যাঁহারা প্রবন্ধের আলোচনা করিলেন, তন্মধ্যে অনেকেই একটা বিষয়ে গোলমাল করিয়া তর্ক বিস্তার করিতেছেন। সকলেই অভিধান ও ব্যাকরণ এই দুটাকে একার্থবোধক করিয়া অলোচ্য করিয়াছেন। তাহা নহে, ব্যাকরণের কার্য্য ও অভিধানের কার্য্য স্বতন্ত্র। এতদ্ভিন্ন যাহাকে ভাষার প্রকৃতি বা genius বলে, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষার সেই genius বা মূল প্রকৃতি যে স্বতন্ত্র, তাহার দিকে কেহ লক্ষ্য করিতেছেন না। সকল ভাষাতে বিভিন্ন ভাষার শব্দ অল্পবিস্তর মিশ্রিত আছে, কিন্তু তাহাদের ব্যবহার, গঠন, ইত্যাদি তত্তৎ ভাষার নিজের প্রকৃতি অনুসারে হইয়া থাকে। আমরা সকলেই যে ভাষার আলোচনা করিলাম, এই ভাষার প্রকৃতি স্বতন্ত্র, ঠিক সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মাদি দ্বারা এ ভাষার গঠন হওয়া অসম্ভব : অতএব যাঁহারা বাঙ্গালা ব্যাকরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন, তাঁহারা এবিষয়টা স্মরণ রাখিবেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥

আমার বক্তব্য বড় বেশী নাই, শাস্ত্রী মহাশয় এ সকল বিষয়ে পাণ্ডিত্যের আদর্শ। তাঁহার প্রতিবাদ করিতে যাওয়া স্পর্দ্ধা মাত্র। আজকার প্রবন্ধের আলোচনায় দেখা গেল, মত দ্বিবিধ হইয়াছে। সংস্কৃতানুসারে ব্যাকরণ আর বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতিগত ব্যাকরণ। উভয়ের সামঞ্জস্য আব। যে কোনকশ্য ভাষার গতি পর্য্যালোচনা করিলেই দেখা যায়, ভাষা ব্যাকরণের অনুসারে গঠিত হয় না ; গঠিত ভাষার নিয়মাদি নির্দ্ধারণ ব্যাকরণের কার্য্য। বলিবার কথা উভয়পক্ষেই বিস্তর আছে। মীমাংসাও অল্পে হইবে না। এ বিষয়ের যেন বিস্তৃত আলোচনা হয়, আর তাহা পরিষদেই হয়, ইহা ত্রিবেদী মহাশয়ের মত ; আমারও মত বটে। আমার নিজের মনের ঝোঁক শাস্ত্রী মহাশয়ের মতের সঙ্গেই মিলে। লিখিত ভাষা ও কথিত ভাষায় প্রভেদ যত কম থাকে, ততই ভাল। যা বলি তা বেশ বুঝি, কিন্তু তাহা লিখিয়া বুঝাইতে গেলে অভিধান ব্যাকরণের সাহায্য ভিন্ন হইবে না, ইহা একটু বিসদৃশ বোধ হয়। তবে ভাষার সৌন্দর্য্যসাধনের জন্য কিছু কিছু পার্থক্য কথিত ভাষার সঙ্গে থাকাও আবশ্যক। সে কতটা প্রয়োজন, তাহা সুলেখক ও সুকবি সহজেই বুঝেন। তাঁহাদের লেখায় তাহা প্রকাশ পায়। যাঁহারা বাঙ্গালা ব্যাকরণ আলোচনা করিতে চাহেন, তাঁহাদের বাঙ্গালা ভাষার প্রধান উপাদান সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় ভাল করিয়া আলোচনা করা কর্ত্তব্য। ভাষার গতিও লক্ষ্য করা উচিত। বাঙ্গালা ভাষা এখন কোথায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা যিনি দেখাইয়া দিতে পারিবেন, তিনিই বাঙ্গালা ব্যাকরণের ঠিক পথপ্রদর্শক হইবেন। যাহা হউক, এ বিষয়ের আলো-

চনার সূত্রপাত করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় বড়ই উপকার করিলেন ; তাঁহার নিকট আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ। (সা-প-প, ১৩০৯ ব.)

১. Richard Hiley-র লেখা *English Grammar* পাঠ্য বই হিসেবে ব্যবহার হত। ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে লণ্ডন থেকে ছাপা *An Abridgment of Hiley's English Grammar* আমরা দেখেছি। এঁর অন্যান্য বই *Practical English Composition, Pragressive Geography, Latin Grammar* ইত্যাদি।

২. এই বইয়ের পৃ. ৩০২ সূত্র ১ দ্র.

২. অনুষঙ্গ

'বাংলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধে শাস্ত্রীমশায় যে আলোচনার সূত্রপাত করেন তার অনুবৃত্তি রূপে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-পরিষদে ১২ আশ্বিন ১৩০৮, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯০১ তারিখে অনুষ্ঠিত পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' এবং ২৪ অগ্রহায়ণ ১৩০৮, ১০ ডিসেম্বর ১৯০১ তারিখে অনুষ্ঠিত সপ্তম মাসিক অধিবেশনে 'বাংলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধ দুটি পড়েন। (দ্র. র-র-বি, ১২, পৃ. ৩৮২, ৫৬৪)। দুটি সভাতেই শাস্ত্রীমশায় উপস্থিত ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সম্পর্কে আলোচনা করেন। সাহিত্য-পরিষদের কার্য বিবরণ থেকে তাঁর আলোচনা দুটি এখানে সংকলন করা হল।

এক.

রবীন্দ্রবাবুর প্রবন্ধে আজ আমার আনন্দ শতগুণ বর্ধিত হইয়াছে। এক মাস পূর্বে আমি এ বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ করি, রবীন্দ্রবাবুর মতো লোকে যে এত শীঘ্র সহায়তা করিবেন সে আশা করি নাই। আরো অনেকে প্রস্তুত হইতেছেন।

মতভেদ যাহা শুনা গেল, সে সম্বন্ধে একটা ভুল উভয় পক্ষেই হইতেছে, প্রবন্ধটি কী ও কী নয়, তাহা আগে দেখা আবশ্যক। রবীন্দ্রবাবুর প্রবন্ধ ব্যাকরণ নহে। যাঁহারা তাহা মনে করিয়াছেন, তাঁহারা ভুল করিয়াছেন। রবীন্দ্রবাবু প্রত্যয়াদির রূপ বাঁধিয়া দেন নাই, প্রত্যয় পরে শব্দ গঠনের নিয়ম লেখেন নাই, বিধিনিষেধের কোনো ব্যবস্থাই করেন নাই। তিনি পদান্ত স্বর ও ব্যঞ্জন ধরিয়া কতকগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দ সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র। ব্যোমকেশ বাবুর মতো সেগুলির উৎপত্তি কোন্ ভাষা হইতে তাহাও নির্ণয় করিতে যান নাই, এমন-কি জানা শুনা বিদেশী শব্দগুলিকেও জানিয়া শুনিয়া নিজকৃত বিভিন্ন শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধের বিষয় কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়, কিন্তু তিনি এতই সাবধান যে, কোন্‌গুলা কৃৎ আর

কোন্‌গুলা তদ্ধিত তাহা পর্যন্ত তিনি পৃথক করিতে চেষ্টা পান নাই বা বলিয়াও দেন নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণের মধ্যে কলাপেও 'কৃৎ' নাম নাই। যে-সকল বাংলা শব্দের উপর কাহারো কোনো দৃষ্টি পড়ে নাই, রবীন্দ্রবাবুর এই প্রবন্ধের পর তাহাদের প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি পড়িবে। রবীন্দ্রবাবুর লেখার গুণে প্রবন্ধে সে আকর্ষণী আছে। রবীন্দ্রবাবুর এই সূত্রপাতে, আশা হয়, একদিন এবিষয়ে একটি exhaustive সংগ্রহ দেখিতে পাইব। রবীন্দ্রবাবু যে গৌড়িয়ান গ্রামারের কথা বলিলেন, তাহা ডাঃ হরন্‌লির [Augustus Rudolf Frederich Hoernle, ১৮৪১-১৯১৮ খৃ.] লেখা। গৌড়িয়ান গ্রামারে [*Comparative Grammar of the Gaudian Languages*, ১৮৮০ খৃ.] এইরূপ দেখা যায় : কিন্তু তাহার টান সাধু ভাষার দিকে। আর সেটা বড়োই পুরাতন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ যে বাংলা ব্যাকরণ লিখিয়াছেন, তাহাতে এই সকল বিষয়ের অনেক কথা আছে। তবে সেখানি ছেলেদের পড়িবার জন্য লেখা, সুতরাং তাহাতে শব্দ গঠনের নিয়মাদি, বিধিনিষেধ সবই আছে। সংস্কৃত শব্দও তাহাতে আছে : কিন্তু উভয়ের মধ্যে কষি টানিয়া পৃথক করা আছে। (সা-প-প, ১৩০৯ ব.)

দুই.

একটি প্রশ্ন এই যে ব্যাকরণ নিয়ে এত মতামত হইতেছে কেন। ব্যাকরণ একখানা লিখিতে হইবে, সেটা কোন্‌ ভাষার হইবে, ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক। বাংলা ভাষায় লেখা পড়া বড়ো বেশি দিন হইতেছে না। ইংরেজ রাজত্বের প্রথমাবস্থায় সাহেব সিভিলিয়ানদিগকে দেশীয় ভাষা শিখাইবার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। সেই কলেজে সংস্কৃত জানা পণ্ডিত মহাশয়েরা গদ্যে পুস্তক লিখিতে লাগেন। বাংলা গদ্যের তখন তিন রূপ। এই কলেজের পণ্ডিত মহাশয়গণের রচনা একরূপ। আদালত-প্রভৃতিতে পারসি শব্দের আধিক্য মিশ্রিত একরূপ, দোকানদার, জমিদার, মহাজন, উকিল মোক্তার প্রভৃতির মধ্যে সে ভাষা চলিত। আর কথক মহাশয়েরা আর-এক ভাষায় দেশের সাধারণ লোক ও স্ত্রীলোকের নিকট পুরাণাদি ব্যাখ্যা করিতেন। তখন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মহাশয়েরা শাস্ত্র আলোচনা করিতেন, কাজেই তাঁহাদের ভাষায় বহুল সংস্কৃত শব্দ আসিয়া পড়িত। আদালতি বা কিতাবতি বাংলায় পারসি শব্দের বহুল ব্যবহার হইত, তাহার একটা খিচুড়ি রকম সাহিত্য আছে, তাহাকে এখন মুসলমানি বাংলা বলা হয়। আর কথক মহাশয়েরা দেশের সাধারণ লোকের বোধ্য ভাষায় যে কথকতা করিতেন, তাহা ঠিক slang নয়। তার পর Education Committee শিক্ষা বিভাগ হইল, সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত মহাশয়েরা বাংলা পুস্তক লিখিবার ভার পাইলেন। তাঁহারা

দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সুখবোধ্য যেএকটা ভাষা আছে, আর সে ভাষার গদ্যে নহে পদ্যে যে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, সে সংবাদ রাখিতেন না। কথকতার ভাষায় কোনো লিখিত গ্রন্থ ছিল না। তাঁহারা লিখিত ভাষার আদর্শ যাহা পাইলেন, তাহা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত মহাশয়গণের ভাষা আর আদালতি বা কিতাবতি ভাষায় দলিল দস্তাবেজ খাতাপত্র। কাজেই তাঁহারা ভাষার সংস্কার করিতে বসিয়া যাহা করিয়া তুলিলেন তাহাতে ঝুড়ি ঝুড়ি সংস্কৃত শব্দ ঢুকিয়া গেল। কারণ তাঁহারা সেই ভাষাই ভালো জানিতেন, দেশের ভাষার খোঁজ রাখিতেন না। ক্রমে তাঁহাদের পরে যাঁহারা বই লিখিতে লাগিলেন, তাঁহারাও তাঁহাদেরই অনুকরণ করিতে লাগিলেন। বিশুদ্ধ বাংলা ভাষার আদর্শ হইল বেতালপঞ্চবিংশতি। দুঃখের বিষয় এই যে সে বাংলা বাঙালিরা বুঝিল না, সংস্কৃত শব্দের অভিধান ও ব্যাকরণ ভিন্ন তাহার অধ্যয়ন ও অধ্যাপন দুরূহ হইল। আর-একখানি পুস্তক 'রেখাবতী', তাহা আবার বেতালেরও বাড়া। অভিধান ভিন্ন ইহার এক পংক্তির অর্থ সংগ্রহ হওয়া দুরূহ। শেষে যাহা হইবার হইল, প্রথমে এইরূপ যাঁহারা সংস্কৃত শব্দ-বহুল বাংলা ভাষা লিখিতেন, তাঁহারা সংস্কৃতের পণ্ডিত ছিলেন, কাজেই তাঁহারা ব্যাকরণ বজায় রাখিয়া লিখিতেন, শেষে যাঁহারা অনুকরণ করিতে গেলেন, তাঁহারা অনেকেই সংস্কৃত ব্যাকরণের ধার বড়ো ধারিতেন না। কাজেই আবার একটা খিচুড়ি ভাষার সৃষ্টি হইল। ইহার পর একটা প্রতিঘাত হইল, 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' বাহির হইল। তখন ভাষায় যে আর-একটা দিক আছে, তাহার প্রতি কাহারো কাহারো দৃষ্টি পড়িল। বঙ্কিমবাবু এই সময় অল্প মাত্রায় সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়া এক নূতন ধরনের লিখিতে লাগিলেন। দেশের লোক যেন প্রাণ পাইল. দেখিতে দেখিতে সেই ভাষার অনুকরণে দেশের সংবাদ পত্রাদি ছাইয়া গেল। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই ভাষা দেখিয়া বলিতেন, আমি সংস্কৃত শব্দগুলা সংস্কৃত অর্থে ব্যবহার করি, আর বঙ্কিম সেগুলা অসংস্কৃত অর্থে ব্যবহার করে। সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টা এখন সফল হইয়াছে। পণ্ডিতি বাংলা গদ্যের আবির্ভাবের পূর্বে এদেশে একটা সাহিত্য ছিল, আর তাহাতে পদ্যে ১০০০/২০০০ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত মহাশয়েরা ইহার একখানাও পড়িতেন না বা সংবাদ রাখিতেন না। রাখিলে এ ভুল তাঁহারা করিতেন না। সেই ১০০০/২০০০ গ্রন্থ দেখিয়া তাঁহারা অবশ্যই ভাষার ধারা স্থির করিতে পারিতেন। তাঁহারা যাহা করেন নাই, আমাদের তাহা করিতে হইবে। আমরা যখন সেই ১০০০/২০০০ গ্রন্থ হাতের কাছে পাইয়াছি, তখন তাহাদের আলোচনায় বাংলা ভাষার যথার্থ প্রকৃতি কী, তাহা স্থির করিতে চেষ্টা করিব, এবং তদনুসারে ব্যাকরণ ও অভিধান সংকলনের চেষ্টা করিব। বাংলা ব্যাকরণ বলিতে

আমরা আর শব্দ-সাধনের নিয়ম পুস্তক চাহি না। বৈদিক সংস্কৃতের একখানা ব্যাকরণ ছিল ; তাহা কালে পরিবর্তিত হইয়া পাণিনির ব্যাকরণ হয়, তাহার কত পরে আবার বার্তিক হয়। যদিও বাংলা ভাষার প্রথমাবস্থায় বর্তমানকালে বাংলা ব্যাকরণ নামে প্রচলিত গ্রন্থগুলির দ্বারা কার্য চলিয়া গিয়া থাকে, এখনো কি আর তাহার সংস্কারের সময় হয় নাই ? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার অনুকরণ আর এখন কেহ করে না, এখন যে ভাষায় লেখা পড়া গ্রন্থ রচনা' চলিতেছে, তাহার style স্বতন্ত্র। এই style অনুযায়ী একখানা বাংলা ব্যাকরণ হওয়া কি আবশ্যক নহে ? গ্রন্থ রচিত হয় কেন ? দেশের লোককে বক্তব্য বুঝাইবার জন্য : ভাষাবিৎ শিল্পীগণের শব্দ কচ্‌কচির জন্য নহে। বাংলার ছাঁচ স্বতন্ত্র। এ সম্বন্ধে এই আলোচনায় যে একটু জেদাজেদি হইতেছে, আমি ইহা শুভ বলিয়া মনে করি। প্রাণে জেদ না থাকিলে কেহ আসলের জন্য খাটিবে না। তরকারিতে ঝাল থাকা মন্দ নহে। ৭০/৮০ বৎসর পূর্বে লর্ড হার্ডিঞ্জের সময় Vernacular Education Society যখন হয়, তখন সংস্কৃত জানা পণ্ডিত মহাশয়েরাই বাংলা পাঠ্য পুস্তক লিখিবার জন্য অগ্রণী হইতেন। কাজেই বাংলা ভাষা নিজের ছাঁচ ছাড়িয়া সংস্কৃত ছাঁচে গড়িয়া উঠিতে লাগিল। এই কথাটা বুঝানো শক্ত নয়, কিন্তু বুঝিতে যে কেন শক্ত লাগিতেছে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। কথাটা উপেক্ষায় নয়, ধীর ভাবে ইহার আলোচনা হওয়া আবশ্যক। সন্ধির কথায় এইটুকু বলি বাংলায় সন্ধির নিয়ম সর্বত্র আমরাও মানি না, পণ্ডিত মহাশয়েরাও মানেন না। তাঁহারাও ‘অপ্রতিহত প্রভাবে অপত্য নির্ব্বিশেষে’ এই বাক্যাংশে সন্ধির সূত্রানুসারে পদ লিখিতে নারাজ, অথচ ব্যাকরণের সন্ধির সমস্ত সূত্রগুলি দিতে ছাড়েন না। বাক্যের শেষে একটি বাংলা ক্রিয়াপদ মাত্র ব্যবহার করিয়া আগাগোড়া দেড় গজি সংস্কৃত সন্ধি সমাস নিবদ্ধ পদ ব্যবহার করিলে বাংলা লেখা হয় না। পণ্ডিত মহাশয়দের পরে যাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণ না জানিয়া ঐরূপ ভাষা লিখিতে যান, তাহারাই ‘সুন্দরী মুখ’ লেখেন, তাহাতে আমরাও চটি। শিক্ষা বিভাগের পরীক্ষায় যিনি যত বেশি fail হন, দুঃখের বিষয় বাংলায় তিনিই তত বড়ো গ্রন্থকার হন। আমরা সংস্কৃত ছাড়িতে চাহি না। দুটাই আমাদের আবশ্যক, তবে সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হইবে। অদ্মর-ঘস্মর শব্দের খাতিরে সমস্ত সংস্কৃত শব্দ-সাধনের নিয়ম বাংলা ব্যাকরণে আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। (সা-প-প, ১৩০৯ ব.)

১

ইংরাজি শিক্ষা আরম্ভ হইয়া অবধি ইংরাজি ধরনের কাব্য নাটক উপন্যাস নবন্যাস নভেল গুপ্তকথা গীতিকাব্য ব্যঙ্গকাব্য নক্‌শা দপ্তর-প্রসঙ্গ রচনা প্রহসন অপেরা প্রভৃতি নানান রকম তরবেতর সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেছে। লোকে পড়িয়া কত আমোদ পাইতেছে। গ্রন্থকারের কত যশলাভ হইতেছে—ধনলাভ হইতেছে। এই-সকল কাব্যের গুণাগুণ বিচার করিয়া কত লোক সুখ্যাতি লাভ করিতেছেন, কত লোকের উপর আপনাদের মনের ঝাল ঝাড়িতেছেন; ক্রমে সাহিত্য ও দোষগুণ বিচার লইয়া কী একটা প্রকাণ্ডকাণ্ড হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু ইংরাজি লেখাপড়া আরম্ভ হইবার পূর্বে আমাদের দেশে কত পুরাণের তর্জমা, রামায়ণ মহাভারতের তর্জমা, কত কীর্তনের গান, কত চরিত, কত লীলা, কত বিলাস, কত মঙ্গল হইয়া গিয়াছে সে বিষয়ে বড়ো একটা খোঁজ-খবর নাই। সেকালে কত কাব্য, এমন-কি মহাকাব্য পর্যন্ত, লেখা হইয়া গিয়াছে তারো কোনো খোঁজ-খবর নাই। তার খোঁজও নাই— তার দোষগুণ বিচারও নাই। তাহা লইয়া দলাদলিও নাই, ঝালঝাড়াও নাই।

কয়েক বৎসর ধরিয়া সেকেলে কাব্যের কতকটা খোঁজ আরম্ভ হইয়াছে। বটতলা কতক ছাপাইয়াছিল। এবিষয়ে এখন সাহিত্য-পরিষদ্ বটতলার উত্তরাধিকারী হইয়াছেন ; সেকেলে বই খুঁজিয়া ভালো কাগজে ছাপাইতেছেন, নানা দেশ হইতে পুথি আনিয়া পাঠ ঠিক করিতেছেন। যাঁহারা ছাপাইতেছেন তাঁহারা অনেক বিদ্যা বুদ্ধি খরচ করিতেছেন, অনেক দেখিতেছেন শুনিতেছেন ভাবিতেছেন, চিন্তা করিতেছেন— পাতের তলায় নোট দিয়া পাত পুরাইতেছেন, বড়ো বড়ো ভূমিকা লিখিতেছেন, নানা রকমের সূচী দিতেছেন ; কিন্তু লোকে বড়ো আদর করিতেছে না। সেকালের কবিদের এত রস ও ভাবময় কাব্য ইঁদুর ও উইয়ে পরম সুখে আস্বাদন করিতেছে। সাহিত্য-পরিষদে ভালো গুদাম নাই, সুতরাং শীঘ্রই সে-সকল কাব্য জায়গা জোড়া করিবার অপরাধে মনদরে বিক্রয় হইয়া বাবুদের জুতা বাঁধিবার কাগজ হইরা দাঁড়াইবে।

যাহা হউক মন্দের ভালো, কিছু খোঁজ তো হইতেছে, দুজন দশ জন পড়িতেওছে। তাই আমি ভরসা করিয়া একখানি সেকেলে মহাকাব্যের দোষগুণ বিচার করিব মনে করিয়াছি। কাব্যখানি যে মহাকাব্য সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নাই. কিন্তু কবি উহাকে মহাকাব্য বলেন নাই, আর পণ্ডিত মহাশয়েরাও বলিবেন না। কারণ তাঁহাদের মতে 'সর্গবন্ধো মহাকাব্যং।' কিন্তু আমাদের কাব্যে সর্গই নাই। উহার ভাগগুলির নাম উল্লাস। মহাকাব্যে বাইশের অধিক সর্গ থাকে না, ইহাতে চৌত্রিশটি উল্লাস আছে, একেবারে শতকরা ৬০টি বেশি! ইহাকে মহাকাব্য বলিলে অলংকার শাস্ত্রের সহিত বিরোধ হইবে এবং যে বলিবে, মহামহা-পণ্ডিতেরা তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইবেন।

আমি যে কাব্যখানির কথা বলিতেছি সেখানি ১২৯৭ সালে

কবির পুত্র মাড়োগ্রামনিবাসী শ্রীমদনগোপাল গোস্বামীর দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থ-রচনাকালও কবি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন—"শ্রীশ্রীরাধামাধবয়োঃ প্রীতয়ে ভবতু শাকেঽব্দেক্ষ্মাসপ্তসপ্তক্ষ্মামিতে বৃষ-সংক্রমে গঙ্গাতীরে পানিহাটীগ্রামেয়ং পূর্ণতামগাৎ ॥ হরি ওঁ ॥" সুতরাং ১৭৭১ শকাব্দে গ্রন্থখানি রচনা হয়। অর্থাৎ ইহাতে ৭৮ যোগ করিলে ইংরাজি ১৮৪৯ সনে কাব্যখানি লেখা হয়; অর্থাৎ 'মেঘনাদবধ' [১৮৬১ খৃ.] বাহির হইবার দশ বৎসর পূর্বে।

কবিও যে বিশেষ অপরিচিত তাহা নহেন। তিনি "শ্রীমৎ-কলিযুগপাবনাবতার ভগবন্নিত্যানন্দবংশাবতংস শ্রীলকিশোরীমোহন-গোস্বামীসূনু শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামী।" সুতরাং বৈষ্ণব সমাজে তিনি খুব সুপরিচিত। যদিও তিনি খড়দহের গোস্বামী নহেন, তথাপি তিনি নিত্যানন্দবংশীয়। যাঁহারা কাব্য বুঝেন, তাঁহাদের কাছেও তিনি অপরিচিত নহেন। কারণ তাঁহার পুত্র কাব্যপ্রকাশকালে বলিতেছেন, "যিনি শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য এবং মধুররসাশ্রয় ভক্তজনগণমানসরসায়ন পরমকরুণা-বরুণালয় শ্রীশ্রীমন্‌রামচন্দ্রের জন্মাদি সুচারু লীলাপ্রসঙ্গ শ্রীশ্রীমদ্রামরসায়ন গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন সেই মহাত্মা রঘুনন্দন গোস্বামী প্রণীত, এক্ষণে তৎপুত্র মাড়োগ্রামনিবাসী শ্রীমদনগোপাল গোস্বামীর দ্বারা প্রকাশিত"। সুতরাং রামরসায়ন ও আমাদের মহাকাব্য একজন কবির লেখা, তাঁহার নাম রঘুনন্দন গোস্বামী। তিনি নিত্যানন্দবংশীয়, তাঁহার নিবাস মাড়োগ্রাম, জেলা বর্ধমান।

রামরসায়ন গ্রন্থখানিও যে বিশেষ সুপরিচিত তাহা নহে। তবে যে কেহ রামরসায়নের ঝংকার শুনিয়াছেন, তিনি উহাতে মুগ্ধ হইয়াছেন। রঘুনন্দনের রাম লক্ষ্মণবর্জন করিলেন না, সরযূতে ঝাঁপ দিলেন না। তিনি সীতার সহিত অশোকবনে প্রবেশ করিলেন। বৌদ্ধদের সুখাবতী পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম, মিল্টনের Paradise-এর বর্ণনা পড়িয়া একদিন বিচিত্র আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম, বৈষ্ণবের বৃন্দাবনধাম পরম সুখের সামগ্রী, কিন্তু রঘুনন্দনের অশোকবন অতি বিচিত্র। সে বর্ণনা বোধ হয় মাধুর্যে এ-সকলকেই অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। সে পবিত্রতা অন্যত্র কোথাও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। রচনার সে মাধুরী, ছন্দের সে ঝংকার বোধ হয় সাহিত্যে অতুল।

কিবা অভিরাম সুখধাম সে অশোকবন।
যারে বর্ণিবারে নাহি পারে কোনো কবিজন ॥
প্রভু ইচ্ছামতে এ জগতে যাহার প্রকাশ।
কৈলে বিবেচন সেই বন বৈকুণ্ঠ বিলাস ॥
যেই হেতু সেই পুরী সেই বৈকুণ্ঠ অভেদ।
যত শোভা তার তাও ভার এই কহে বেদ ॥
অন্ত -পুর কাছে রহিয়াছে সেই উপবন।
যার উপমান দিতে স্থান না হয় নন্দন ॥
তারে যেই পায় তার যায় সব শোকগণ।
তেঁই বেদগণে তারে ভণে অশোক-কানন ॥
তার চারিপাশে পরকাশে স্ফটিক প্রাচীর।
যারে লঙ্ঘিবারে নাহি পারে আপুনি সমীর ॥
তার আছে দ্বার পরিষ্কার দুই দুই স্থানে।
এক সভা-প্রান্ত আর অন্তঃপুর সন্নিধানে ॥
তার দ্বারে বসি চর্ম অসি ধারণ করিয়া।
আছে ষণ্ডগণ বিলক্ষণ ভূষণ পরিয়া ॥
তার পথ সব অসম্ভব সুন্দর চিকণ।
যাহে করি যত্ন নীলরত্ন করেছে পাতন ॥
মাঝে মাঝে তার রক্ত আর ধবল পাষাণ।
দিয়া সাজায়েছে নাহি আছে যার উপমান ॥
আল -বালচয় স্বর্ণময় পরম শোভন।
দিয়া নানা মণি খানি খানি করেছে সাজন ॥
তাহে বৃক্ষগণ সুশোভন না হয় বর্ণন।
পীত -মণিময় যার হয় স্কন্ধ শাখাগণ ॥
যত পত্র তার চমৎকার হরিন্মণিময়।
যার পুষ্প সেই বর্ণ সেই মণীকৃত হয় ॥
হেন তরুতাতি আছে কতি সেইতো কাননে।
তাহা কহিবারে কেবা পারে একক বদনে ॥
কত মনোহর নাগেশ্বর অশোক চম্পক।
লোধ্র কাঞ্চনার কর্ণিকার শেফালিকা বক ॥

তাহে নানাজাতি যূঁথি জাঁতি মল্লিকা টগর।
কর -বীর কুন্দ মুচুকুন্দ বকুল বিস্তর॥
কত সুবিরাজ গন্ধরাজ পুন্নাগ আমলী।
কত সপ্তপর্ণ নানাবর্ণ ঝিণ্টী কৃষ্ণকলি॥
কিবা স্থলপদ্ম শোভাসদ্ম মাধবী মালতী।
কত পরিষ্কার গুলানার বান্ধুলী শেবতী॥
এই আদি কতি পুষ্পজাতি আছে তরুলতা।
রহু তা সবার গণিবার দূরেতে বারতা॥
তাহে আমলকী হরিতকী কপিত্থ কাঁটাল।
কত নারিকেল মিষ্টবেল দাড়িম্ব রসাল॥
কত নাগরঙ্গ সুছোলঙ্গ বাতাপি খর্জ্জুর।
কত দ্রাক্ষা তাল রম্ভা জাল কমলা আঙ্গুর॥
কত মিষ্টরস আনারস অঞ্জীর বাদাম।
কত আম্রাতক মন্দারক লোনা পীলু জাম॥
এই আদি করি ফলধারী যত তরুগণ।
তাহা সংখ্যা করে এ সংসারে নাহি হেন জন॥
সেই বনে ছয় ঋতু রয় সদা মূর্ত্তিমান॥
তাহে ঋতুপতি সদা অতিশয় শোভমান।
তাহে মনোরম বিহঙ্গম কোটি কোটি চরে।
কিবা নীলকণ্ঠ কদ্রুকণ্ঠ মিষ্ট রব করে॥
তাহে সারি সারি দিব্যসারি বসি কথা কয়।
যাহা শুনি নরবাক্যে বড় ঘৃণাবুদ্ধি হয়॥
কত কাকাতুয়া টিয়া শুয়া কাজলা মদনা।
কত দহিয়াল হরিতাল ফুলটুশী ময়না॥
এই আদি মিষ্টভাষী হৃষ্ট কত বিহঙ্গম।
তাহে অলি সব করে রব অতি মনোরম॥
তাহে কৃষ্ণসার রঙ্কু আর রৌহিষ শম্বর।
এই আদি যত মৃগ কত খেলে মনোহর॥
তাহে আছে কত নানামত কৃত্রিম অচল।
যাহা দেখি মজে মহালাজে পর্ব্বত সকল॥

তাহে মনোহর সরোবর আছে অগণিত।
নানা মণিচয় বদ্ধ হয় যাহাদের ভিত ॥
চারি দিকে চারি ঘাট পরিষ্কার সুচিক্কণ।
সেই নানা বর্ণ শিলা স্বর্ণ পট্টে সুশোভন ॥
তাহে শোভে জল সুনির্ম্মল দর্পণ সমান।
যাহা করি পান সুধাজ্ঞান করে সুবিদ্বান ॥
সেই জলান্তরে খেলা করে কত জলচর।
যেন অন্ধকারে উঁড়ি ফেরে খদ্যোতনিকর ॥
তাহে শোভে কত রক্ত সিত অসিত কমল।
কত ইন্দীবর মনোহর কৈরবপটল ॥
তাহে করে রব হংস সব শরালি সারস।
কত চক্রবাক ছাড়ে বাক ডাহুক সরস ॥
তাহে ভৃঙ্গততি করে অতি মধুর ঝঙ্কার।
যাহা শুনি চিত বিচলিত না হয় কাহার ॥

কিন্তু রামরসায়নের কথা তো বলিতে বসি নাই— আমরা রঘুনন্দনের অপর কাব্যের কথা বলিতেছি। রামকথা ও কৃষ্ণকথা এই দুই কথাই ভারতবাসীর প্রধান সম্বল। রঘুনন্দন রামকথা রামরসায়নে বলিয়াছেন, তাঁহার দ্বিতীয় কাব্য কৃষ্ণকথায় পূর্ণ। উহার নাম 'রাধামাধবোদয়'। কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া রাধিকার রাগোদয় হইতে রাসলীলা পর্যন্ত এ কাব্যে লিখিত হইয়াছে। ইহাতে মাথুর লীলাও নাই প্রভাস লীলাও নাই— ইহার এক লীলা বৃন্দাবন লীলা। সে লীলা আনন্দের ঝরনা, প্রীতির উচ্ছ্বাস ও সুখের ফোয়ারা। সমস্ত কাব্যখানিতে অসুখের নামগন্ধ নাই। কবি গোস্বামী, কীর্তন তাঁহার সিদ্ধ বিদ্যা, কৃষ্ণলীলা তাঁহার মজ্জাগত। তিনি যখন কৃষ্ণলীলা লিখিতে বসিয়াছেন, তখন সংকীর্তনের পদগুলি ভাঙিয়া পয়ার ত্রিপদী চৌপদী প্রভৃতি সুললিত ছন্দে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার কাব্য পড়িতে গেলে সব সময়েই মনে হয় যেন কীর্তনের গান শুনিতেছি, যেন রেনেটি ও মনোহরসাহি সুর কানে বাজিতেছে। কবির ভাষা তাঁহার ছন্দের ঠিক অনুরূপ— এখনকার মতো চোয়ালভাঙা সংস্কৃত শব্দ তাহাতে নাই। লম্বা সমাসের, দূরান্বয়ের, ইংরাজি ভাবের ছড়াছড়ি নাই।

তাঁহার কাব্যের প্রথমেই কৃষ্ণের বংশীধ্বনি। সে বংশীধ্বনিতে সপ্ত স্বর্গ সপ্ত পাতাল পূর্ণ হইয়া গেল। তবে এখনকার সপ্ত স্বর্গ সপ্ত পাতালের ধারণা একরূপ, সেকালে আর একরূপ ছিল। জিনিসটা একই কিন্তু লেখার ভঙ্গি আর-একরূপ।

সেইকালে কাননেতে শ্রীনন্দনন্দন।
করিলেন কৌতুকেতে মুরলী বাদন॥
সেই শব্দে এ তিন ভুবন আচ্ছাদিল।
তাহে নানা স্থানে নানা ভাব উপজিল॥
বিধাতার ধ্যান-ভঙ্গ করিল সে রব।
কাঁপিতে লাগিল তাঁর কলেবর সব॥
বুঝি বেণু-রবে তাঁর আসন কমল।
প্রফুল্ল হইল তেঁই করে টলমল॥
সনকাদিমুনিদের সমাধি ভাঙ্গিল।
নয়নেতে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল॥
বুঝি বেণু-রবে দ্রব হইয়াছে মন।
দেখিছে বাহিরে আসি সে নন্দনন্দন॥
সেই রব শুনি ভব হইল স্তম্ভিত।
বুঝি কৃষ্ণে দেখিতে গিয়াছে তাঁর চিত॥
মুরলীর রব শুনি কাঁপে মরুত্বান্।
তাহাতে আমার মন করে অনুমান॥
সেই শব্দ শুনি খসে শচীর বসন।
তাহা দেখি কোপে কাঁপে সহস্রলোচন॥
পাতালে পন্নগ পতি স্তম্ভিত হইলা।
সেই হেতু পতি-ভয়ে ভূমি কি কাঁপিলা॥
যমুনাদি নদী যত হইল স্থগিত।
নিজ নিজ গতি ভুলে অত্যন্ত বিস্মিত॥
মকর কচ্ছপ মীন আদি জলচর।
মুখ তুলি তুলি ভাসে জলের উপর॥
জলের ভিতরে ভাল শ্রবণ না হয়।
সেই লাগি মুখ তুলি তাহারা ভাসয়॥

ময়ূর কোকিল আদি বিহঙ্গম সব।
তারা শুনে ত্যজি ত্যজি নিজ নিজ রব ॥
গো মৃগ মহিষ আদি যত পশুগণ।
আহার ত্যজিয়া শুনে সেই বেণুস্বন্ ॥
বৎস সব দুগ্ধ পান করিতে করিতে—
মুরলীর শব্দ শুনি মোহ পায় চিতে ॥
অতএব সেই দুগ্ধ গিলিতে না পারে।
গড়ায়ে গড়ায়ে ভূমে পড়ে মুখদ্বারে ॥
অপর কি কব যত তরুলতাগণ।
মঞ্জরী-ছলেতে করে পুলক ধারণ ॥
যে যে তরুলতা আগে শুষ্ক হয়ে ছিল।
তাহারাও দল ফুল ফলেতে ভরিল ॥
অপর কি কব আর মাধুরী তাহার।
পাষাণ গলিয়া গেল সংযোগে যাহার ॥

এই বংশীধ্বনি শুনিয়া রাধার ভাবোদয় হইল। কবি তাঁহার প্রথম উল্লাসের নাম রাখিয়াছেন 'রাধাভাবাঙ্কুরোদগম'। কৃষ্ণ যখন বাঁশি বাজান, তখন রাধিকা সখীগণকে লইয়া অট্টালিকার উপরে কন্দুক ক্রীড়া করিতেছিলেন। তিনি কৃষ্ণের রূপও দেখেন নাই, গুণও শুনেন নাই। কিন্তু সেই বংশীধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাঁহার হৃদয়কে সুধা-ধারায় আর্দ্র করিয়া দিল এবং সেই সুধাসিক্ত হৃদয়ে ভাবের অঙ্কুর উদয় হইল। তাঁহার গণ্ডদেশ পুলকিত হইল, হাত কাঁপিতে লাগিল, হাত হইতে গেঁদ পড়িয়া গেল। যিনি কন্দুক-ক্রীড়ায় অদ্বিতীয়, তাঁহার হাত হইতে গেঁদ পড়িয়া গেল দেখিয়া সখীরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি হইল?" শ্রীরাধিকা বলিলেন, "ওই শুন কী শব্দ হইতেছে— উহাতে আমার কান ভরিয়া গিয়াছে— মন মজিয়া গিয়াছে, আমি হাত ঠিক রাখিতে পারিতেছি না। এই কথা শুনিয়া সখীরা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে উহা বাঁশির রব, কৃষ্ণ ওই বাঁশি বাজাইতেছেন। তখন রাধিকা ললিতার নিকট কৃষ্ণের পরিচয় লইলেন—

সখি ওই কৃষ্ণ হন কাহার তনয়
কেমন তাহার রূপ কি গুণ ধরয়।

ললিতা বলিলেন—

সখি দিয়া মন করহ শ্রবণ
নন্দের নন্দন গোকুলে রহে।
কৃষ্ণ তাঁর নাম অতি অভিরাম
যার কোটি কাম সমান নহে॥

* * *

যত গুণ তার আছে তাহা কার
সখি গণিবার শকতি আছে
শ্রীরঘুনন্দন হন কি না হন
গুণের ভবন তাঁহার কাছে॥

এই-সকল কথা শুনিয়া রাধিকা একটু উন্মনা হইলেন এবং অসুখ করিয়াছে বলিয়া শয়ন করিতে গেলেন।

কবির দ্বিতীয় উল্লাসের নাম রাধার 'রাগাবিকাশ'। সেই রাত্রেই রাধিকা স্বপ্ন দেখিলেন—

দেখিছেন তাহে রাধা যমুনার ধারে।
কদম্ব তরুর মূলে শ্রীনন্দ-কুমারে॥

কিন্তু স্বপ্নের খেলা; কিছু ক্ষণ পরেই রাধিকা কৃষ্ণকে হারাইয়া ফেলিলেন—

এই রূপ দেখিতে দেখিতে ক্ষণকাল।
দেখিতে না পান আর রাধিকা গোপাল॥
তবে তিঁহ অতিশয় হইয়া বিহ্বল।
ভুজঙ্গিনী যেন মণি হারায়ে বিকল॥
হায় হায় কি হইল কি হইল বলি।
জাগিয়া উঠিল তিঁহ করিয়া বিকলি॥

সখীরা নিকটে শুইয়া ছিল তাহারাও জাগিয়া উঠিল এবং বার বার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কী স্বপ্ন দেখিয়াছ?" রাধিকা লজ্জায় কিছু বলিতে পারিলেন না, নখ দিয়া মাটি খুঁড়িতে লাগিলেন। সখীরা প্রথম অনেক সাধ্যসাধনা করিলেন, যখন কিছুতেই কিছু হইল না, তখন বলিলেন, "লজ্জাই তোমার বড়ো হল, তবে আমরা কেহ নই?"—

থাক তুমি সেই প্রিয় সখীরে লইয়া।
মোরা কি করিব আর এখানে থাকিয়া॥
এত কহি ললিতা বিশাখা দুইজন।
উদ্যম করেন কুঠী করিতে গমন॥

তখন নিরুপায় হইয়া রাধা স্বপ্নের কথা প্রকাশ করিলেন—

দেখিতে দেখিতে সেইরূপ ক্ষণকাল।
স্বপ্ন হরিয়া নিল বিধি হয়ে কাল॥
অতএব সেই রূপ না পাই দেখিতে।
উঠিলাম বৈকল্য করিয়া আচম্বিতে॥

* * *

কে বটে সে কোথা রহে তনয় কাহার।
তাহা অনুভব নাহি আসয়ে আমার॥
তথাপি দেখিতে তারে মন সদা চায়।
কি করিব সখি হল মোর বড় দায়॥

বিশাখা বলিলেন, "দেখ আমি বেশ ছবি আঁকিতে পারি। আমি গোকুলে ঘরে ঘরে ঘুরে আসি. তুমি যে রূপ বর্ণনা করিলে, সে রূপ যেখানে দেখিব আঁকিয়া আনিব। এই বলিয়া বিশাখা বাড়ি গেল এবং কৃষ্ণের ছবি আঁকিয়া আনিয়া রাধিকাকে দিল।

কিবা বিশাখার সেই চিত্র চমৎকার।
যাহে চিত্রবুদ্ধি নাহি হইল রাধার॥
স্বপ্নদৃষ্ট সেই এই হয় বলি মানি।
চমকিত হইয়া উঠিলা ঠাকুরাণী॥

* * *

হেন মত সৌভাগ্য কিবা হইবে আমার।
দেখিতে পাইব তারে এই ছবি যার॥

রাধিকা এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় ললিতা আসিয়া উপস্থিত। ললিতা বলিলেন, কেমন ছবি ঠিক হইয়াছে? রাধিকা বলিলেন—

এই চিত্র যার তাহার দর্শন লাগিয়া।
অধিক উৎকণ্ঠা করিতেছে মোর হিয়া॥

ললিতা জিভ কাটিয়া বলিলেন, সেটি তো কিছুতেই হইতে পারে না।

~ ~

তুমি পতিব্রতা, কিরূপে পরপুরুষ দেখিতে চাহিতেছ। তোমার স্বামী আছে, শাশুড়ি আছে, ননদ আছে, ঘর গৃহস্থালি আছে, তোমার কি পরপুরুষে মন দেওয়া উচিত। তাহা হইলে তোমার অখ্যাতি হইবে, লোকে তোমায় ধিক্কার দিবে। তোমার পিতা রাজা, তাঁর মুখ হেঁট হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তখন রাধিকা বিরসবদনে বলিলেন—

সখি, আপনার মন বশ করিবারে।
করিতেছি আমি যত্ন বিবিধ প্রকারে ॥
কিন্তু এহ কোন মতে স্থিরতা না পায়।
যদি জান তবে কিছু বলহ উপায় ॥

তখন ললিতা রাধিকার ভাবাঙ্কুর পুষ্ট হইয়াছে জানিয়া বলিলেন—

সখি, আমাদের গুরু হন পৌর্ণমাসী।
বিশেষে তোমায় তাঁর দেখি স্নেহরাশি ॥
অতএব এই কথা জানাইবা তায়।
করিবেন তিঁহ ইথে উচিত উপায় ॥

এই বলিয়া বিশাখাকে সঙ্গে লইয়া ললিতা পৌর্ণমাসীদিদির বাড়ি গেলেন এবং তাঁহাকে অদ্যোপান্ত সব বলিলেন। পৌর্ণমাসী সুখী হইলেন এবং বলিলেন—

বাছা চিরজীবী হও তোরা দুইজন।
করিলে আমারে বড় আনন্দিত মন ॥
রাধার কৃষ্ণেতে হয় প্রেমের প্রকাশ।
নিরবধি এই মোর মনে অভিলাষ ॥
আনুকূল্য করিতেছ তোরা দোঁহে তায়।
এই লাগি করিতেছি আশিষ্ দোঁহায় ॥
এবিষয়ে যেই যেই সাহায্য করিবে।
সেই সেই মোর প্রিয় অধিক হইবে ॥
যেহেতুক রাধাকৃষ্ণ-লীলা দেখিবারে।
আমি আছি চিরদিন গোকুল মাঝারে ॥
এতদিনে বুঝি মোর সেই ত বসতি।
সফল হইতে পারে এই হয় মতি ॥

এই পৌর্ণমাসীটি বাঙালি কবিকুলের সৃষ্টি। চণ্ডীদাসের 'কৃষ্ণকীর্তনে'

ইহার নাম বড়াই ; আমাদের কবি ইহার নাম দিয়াছেন পৌর্ণমাসী। এই পৌর্ণমাসী মাসির সঙ্গে বিদ্যাসুন্দরের মালিনী মাসির কোনো সম্পর্ক আছে কিনা জানি না, কিন্তু দুজনেরই ব্যাবসা এক। তবে বিদ্যাসুন্দরের ধর্মটা নাই। এখানে ধর্মটা ফোটাবার বেশ চেষ্টা আছে। পৌর্ণমাসী বলিতেছেন— আমি রাধাকৃষ্ণ-লীলা দেখিব বলিয়া বহু-কাল ধরিয়া গোকুলে বাস করিতেছি, তোমরা দুজনে আজ আমার কাছে আসিয়া ও এই-সকল খবর দিয়া আমাকে কৃতার্থ করিলে, আমার জন্ম সফল করিলে। মালিনী মাসির যেমন পাওনা-গণ্ডার উপর দৃষ্টি ছিল, এখানে তাহার একবারেই নাই। এক শ্রেণীর পাঠক নাক সিঁটকাইয়া বলিবেন, রাধাকৃষ্ণের অবৈধ প্রণয়, আর তার মধ্যবর্তিনী পৌর্ণমাসী সামান্য কুট্টিনীমাত্র। আবার আর-একদল বলিবেন যে, এই পৌর্ণমাসী যেন St. John। St. John যেমন যিশু খৃস্টের অবতারের পথ পরিষ্কারের জন্য আগেই আসিয়াছিলেন, সেইরূপ পৌর্ণমাসী রাধাকৃষ্ণের পথ পরিষ্কার করিবার জন্য বহু-কাল হইতে আসিয়া বৃন্দাবনে বাস করিতেছেন।

যাহা হউক পৌর্ণমাসী রাধাকৃষ্ণের মিলন করিয়া দিবেন ভার লইলেন। বন্দোবস্ত হইল, রাধিকাকে সূর্য-পূজার ছলে বনে পাঠাইয়া দিবেন। সেইখানেই কৃষ্ণরাধা মিলন হইবে।

'নারায়ণ'
অগ্রহায়ণ, ১৩২২ ॥

প্রথম মিলন ॥

২

রাধামাধবোদয়ের তৃতীয় উল্লাসের নাম 'শ্রীরাধামাধব প্রথম দর্শন'। এই অঙ্কে পৌর্ণমাসীর কৌশলে সূর্যদেবের পূজা করিতে গিয়া রাধিকা সর্বপ্রথম কৃষ্ণের দর্শন পান। শ্রীকৃষ্ণ সুবলের সঙ্গে বনে ভ্রমণ করিতেছেন, কিন্তু তিনি আজ বড়ো অন্যমনস্ক। হাতে বাঁশি আছে, অথচ তিনি বাজাইতেছেন না। সুবল জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কৃষ্ণ, আজ তোমার একী হইল ; তুমি আনমনে কী ভাবছ ?" কৃষ্ণ বলিলেন, "ভাই, তোমার কাছে লুকাইয়া আর কী ফল ? কাল পৌর্ণমাসী আসিয়া আমার কাছে রাধিকার রূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছে। সেই অবধি আমি রাধিকাকে দেখিবার জন্য বড়োই চঞ্চল হইয়াছি।"

সুবল বলেন সখা যেন রূপ তার।
তাহাতে মোহিত হয় সকল সংসার ॥
শুনিমাত্র যদি তুমি হয়েছ চঞ্চল।
দেখিলে হইবে তুমি নিতান্ত পাগল ॥
অতএব তাহে দেখি নাহি প্রয়োজন।
চল যাই এখান ছাড়িয়া অন্য বন ॥
শুনিয়াছি সেহ পূজা করিতে রবিরে।
আসিবেক আজি ওই রবির মন্দিরে ॥
তার পথ এই হয় আসিতে আসিতে।
যদি দেখ তবে স্থির নারিবে হইতে ॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন সখা যা ঘটে ঘটিবে।
কিন্তু তারে একবার দেখিতে হইবে ॥

শ্রীকৃষ্ণ সুবলের সহিত এইরূপ আলাপচারি করিতেছেন, এমন সময় রাধিকা দুই সখী লইয়া সেই দিকে আসিতেছেন। তিনি দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া ললিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

সখি দেখহ সখি দেখহ
নবনীপকমূলে
ত্যজি অম্বর ধরণীপর
নবনীরদ বুলে

দলিতাঞ্জন- চয়গঞ্জন
মধুরদ্যুতিজালে
করু শ্যামল পৃথিবীতল
নভমণ্ডল-ভালে
চপলাততি ঝলকে তঁতি
থির অদভুত কাঁতি
অতি পান্তর রুচি সুন্দর
বিলসে বকপাঁতি
সুরভূপতি- ধনুরাকৃতি
বহু রঙ্গহি সাজে
সুষমাযুত অতি অদ্ভুত
শশিমণ্ডল রাজে

অর্থাৎ রাধিকা বলিতেছেন, সখি, কদম্বের মূলে নূতন মেঘ আকাশ ছাড়িয়া আসিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সে মেঘের দ্যুতি ভাঙা আঁজনের অপেক্ষাও সুন্দর— পৃথিবীকে একেবারে শ্যামল করিয়া তুলিয়াছে। তাহাতে বিদ্যুৎ ঝলকিতেছে, কিন্তু তাহার কান্তি স্থির— এ বড়ো অদ্ভুত। অতি সুন্দর শাদা বকপক্ষী উড়িতেছে— সেই মেঘের উপর আবার ইন্দ্রধনু নানা রঙে সাজিয়া রহিয়াছে। এ অদ্ভুত মেঘ আকাশ ছাড়িয়া পৃথিবীতে কেমন করিয়া আসিল ?

তখন ললিতা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ও মেঘ নয়। ও একটি মনুষ্য। তুমি যাহাকে বিদ্যুৎ বলিয়া মনে করিতেছ তাহা বিদ্যুৎ নয়— ও তাহার পীত বসন। তুমি যাহাকে বক-পক্ষী বলিয়া মনে করিয়াছ— সে উহার হার। আর তুমি যাহাকে রামধনু মনে করিতেছ— সে উহার চূড়ার ময়ূরপাখা। বিশাখা বলিলেন, "পৌর্ণমাসীর কেমন চাতুরি দেখিলে ? সূর্য-পূজার ছলে তিনি তোমাকে এখানে আনাইয়া তোমার বাঞ্ছিত শ্রীকৃষ্ণকে দেখাইয়া দিলেন।" এই বলিয়া বিশাখা শ্রীকৃষ্ণ-রূপ বর্ণনা করিতেছেন।

অপরূপ কৃষ্ণরূপ না হয় বর্ণন।
হরে মন যেই জন করয়ে দর্শন ॥
নবঘন সুচিক্কণ অঞ্জন সমান।
অঙ্গশোভা মনোলোভা হরয়ে নয়ান ॥

শোভা করে চূড়াশিরে শিখণ্ড রচিত।
যাহা দেখি হয় সুখী রমণীর চিত ॥
দেখি কেশে লজ্জাবেশে যাবত চামরী।
আগে গিয়া লুকাইয়া বনের ভিতরি ॥
শ্রীবদন দেখি মন করে অনুমান।
পূর্ণিমার শশী ছার নহে উপমান ॥
শোভে ভাল কিবা ভাল যেন অর্দ্ধ ইন্দু।
তাহে ভায় শশিপ্রায় চন্দনের বিন্দু ॥
ভুরুদ্বয় বুঝি হয় কামের কোদণ্ড।
বর্ষে যারা শরধারা কটাক্ষ প্রচণ্ড ॥
অতিশ্রেষ্ঠ নাসাওষ্ঠ সুন্দর নয়ন।
যাহা হেরি ব্রজনারী হারাইল মন ॥
দরপণ সুশোভন শ্রীগণ্ডযুগল।
যার তেজে অতিরাজে মকরকুণ্ডল ॥
ভুজদণ্ড করিশুণ্ড সমান গঠন।
শোভা পায় কত তায় তাড়ঙ্ক কঙ্কন ॥
দুই পাণি দেখি মানি মোরা মনে মনে।
নাহি স্থান উপমান দিতে ত্রিভুবনে ॥
শোভে তাহে বেনুআ হে মোহিত সংসার।
যে হরিল কুলশীল সব গোপিকার ॥
পরিসর মনোহর বুকের বলনী।
করে আলা বনমালা তাহে ধনি ধনি ॥
সিংহজিনি মাজাখানি ক্ষীণ অতিশয়।
পীতধটি পরিপাটি কটিতে শোভয় ॥
কিবা উরু রম্ভাতরু সমান শোভন।
বান্ধে নারী মন করি যাহাতে মদন ॥
শ্রীচরণ সুশোভন শীতল কোমল।
দেখি যারে লাজে মরে রাতুল কমল ॥
কিবা তায় শোভা পায় সুবর্ণ নূপুর।
যার রব করে সব মনদুঃখ দূর ॥

~ ~

দেখ সখি ভরি আঁখি শ্রীবংশীমোহন।
দেখি যারে স্থানান্তরে যাবে না নয়ন ॥

বিশাখার এইরূপ বর্ণনা একটি অমৃতের নদী— আর শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-শোভাও আর-একটি অমৃত নদী। এক নদী কান দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিল, আর নদী চক্ষু দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিল। দুই নদীর অমৃতে, অমৃতরসের আধার হৃদয় ভরিয়া গেল, পূর্ণ হইয়া গেল। ক্রমে সে অমৃত, হৃদয় ছাপাইয়া বাহির হইতে লাগিল। তাই কখনো রাধিকার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল, কখনো ঘাম হইয়া গা দিয়া ছুটিতে লাগিল।

যেমন কৃষ্ণের রূপ দেখিয়া রাধা বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছেন, কৃষ্ণও সেই-রূপ রাধিকার রূপ দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছেন--

কিবা স্বর্ণবর্ণজিনি অঙ্গের মাধুরী।
করিয়াছে ধরিয়া কি চন্দ্রিকা বিজুরী ॥
কেশজাল কাল সূক্ষ্ম চিকন শোভয়।
পামর চামর তুল্য ইহারে কে কয় ॥
দিব্যবেশ কেশ দেখি এই মানে মন।
বুঝি রতিপতি জাল করেছে পাতন ॥
পড়ি যায় হায় মোর নয়ন-খঞ্জন।
উঠিবারে নারে আর পাইল বন্ধন ॥

* * *

যদি শশী ঘষি ঘষি ঘুচায় লাঞ্ছন।
হইবারে পারে তবে এ মুখ যেমন ॥
শশী-খণ্ড-চণ্ড-মদ-দমন কপাল।
তাহে বিন্দু সিন্দূরের সাজে অতি ভাল ॥
কালসর্প দর্পজয়ী কিবা ভুরুদ্বয়।
মন মোর ঘোর কাম ধনুক মানয় ॥

* * *

ওষ্ঠাধরে ধরে শোভা প্রবাল সমান।
বিম্বফলে বলে কে ইহার উপমান ॥

তাহে মন্দ মন্দ হাসি শশীর প্রকাশ।
যাহা হেরি মোর ধৈর্য্য লজ্জা হল নাশ ॥

*　　*　　*

পয়োধরে ধরে শোভা পদ্মকলিকার।
করিকুম্বে কুম্ভে কিবা উপমা ইহার ॥
তাহে ভাল কাল শ্রীকাঁচুলী শোভা করে।
নবঘনগণ যেন সুমেরু শিখরে ॥
তদুপরি পরিষ্কার হার সুশোভন।
বকমালা আলা করে যেন সেই স্থান ॥
রোমাবলী লালিত লাবণি বিলোকিয়া।
ত্যজি কাল ব্যালদর্প গর্ত্তে আছে গিয়া ॥
মাঝাখানি মানি মুষ্টি মাঝে ধরা যায়।
পঞ্চানন বনে গেছে যা দেখে লজ্জায় ॥

শ্রীকৃষ্ণ রাধার দিকে চাহিয়া সুবলের সহিত কথা কহিতেছেন— রাধা শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিয়া সখীদের সহিত কথা কহিতেছেন।

তবে চারি চক্ষুতে চক্ষুতে দরশন।
হয় রণে বাণে বাণে সংযোগ যেমন ॥
পরস্পর দরশনে বড় লজ্জা পাই।
ফিরাইলা আপনার নয়নেরে রাই ॥
কেহ কহে কৃষ্ণনেত্র-শর বল ধরে।
তেহ ঠেলি লয়ে গেল রাধানেত্র-শরে ॥
আমি কহি রাধানেত্র হয় বলবান।
টানি লয়ে গেল কৃষ্ণনেত্রে নিজ স্থান ॥
যেহেতু কৃষ্ণনেত্র সেখান হইতে।
নিজ স্থানে না পারিল ফিরিয়া আসিতে ॥
নয়ন ফিরাই রাই মুখ নামাইলা।
বুঝি ভূমিপানে চাহি পুঁছিতে লাগিলা ॥
কিবা পুণ্য করিয়াছ তুমিহ ধরণী।
যাহে ভ্রমিছেন তোহে এ পুরুষমণি ॥
মোরে যদি সেই পুণ্য কহ কৃপা করি।

তবে আমি তাহা করি তব দেহ ধরি ॥
তাহা হলে এই দিব্য পুরুষরতন।
আমারি উপরে সুখে করেন ভ্রমণ ॥

রাধিকা যখন এইরূপ ভাবিতেছেন, তখন ললিতা বলিলেন, “তুমি কেন মুখ নিচু করিয়া রহিয়াছ ? নয়ন ভরিয়া একবার কৃষ্ণরূপ দেখো।” তাহাতে রাধিকা উত্তর করিতেছেন—

রাধিকা কহেন কি করিব নিরীক্ষণ।
দেয় নাই মোরে বিধি অধিক নয়ন ॥
যদি কোটি আঁখি দিত নিমেষ রহিত।
তবে বুঝি দেখি আশা পূরিত কিঞ্চিত ॥
একে দুই আঁখি তাহে আছয়ে নিমেষ।
পূর্ণ নাহি হয় দেখি লালসার লেশ ॥
অতএব চক্ষু মুদি করিয়ে ভাবনা।
তাহে পূর্ণ হতে পারে মনের বাসনা ॥

ললিতা বলিলেন, “তাই বেশ, তাই বেশ। সেই রকমই করিও। কিন্তু এখন তো সূর্যপূজার সময় বহিয়া যায় চলো সূর্যের মন্দিরে যাই।” তিন জনে চলিলেন, কিন্তু রাধিকা বারংবার ফিরিয়া ফিরিয়া কৃষ্ণকে দেখিতে লাগিলেন। তাহাতে বিলম্ব হইতে লাগিল, ললিতা বড়ো চটিয়া গেলেন। বলিলেন, “ওরূপ বার বার পিছন দিকে চাহিতে চাহিতে চলিলে পায়ে হোঁচট লাগিবে, কাঁটা ফুটিবে। লোকে তোমার নিন্দা করিবে।”

বিশাখা বলেন দোষ নাহি রাধিকার।
নেত্র আকর্ষক বড় লাবণ্য কালার ॥
ও লাবণ্যে পড়িলে নয়ন একবার।
টানিয়া লইতে পারে পুন কেবা আর ॥

যাহা হউক ক্রমে তাঁহারা সূর্যের মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে তো একজন ব্রাহ্মণ চাই। নহিলে পূজা করায় কে ? সে বনে কোথায় ব্রাহ্মণ পাইবেন বলিয়া, তাঁহারা বড়ো চিন্তিত হইলেন। এমন সময় শ্রীকৃষ্ণের সখা মধুমঙ্গল সেখানে আসিয়া উপস্থিত। মধুমঙ্গল ব্রাহ্মণ। মধুমঙ্গল যে তথায় আসিবেন, এটাও পৌর্ণমাসী যোগাড় করিয়া

দিয়াছিলেন। ললিতা বলিলেন, "মধুমঙ্গল, তুমি রাধিকাকে সূর্যপূজা করাও।" মধুমঙ্গল বলিলেন—

শুনি বাণী মোর, মিত্রে যদি থাকে প্রীত।
রাধিকার তবে আমি হব পুরোহিত॥
অন্যথা না করাইব আমিহ পূজন।
যদ্যপিও দক্ষিণাতে দাও বহুধন॥

এখানে মিত্র শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহার হইয়াছে। এক অর্থে সূর্য, আর-এক অর্থে বন্ধু। সূর্যের প্রতি ভক্তির ছলে মধুমঙ্গল কৃষ্ণের প্রতি প্রেম যাচ্ঞা করিতেছেন। এইরূপ দুই অর্থে শব্দ ব্যবহার করা সেকালের কবিরা বড়ো ভালোবাসিতেন। কবি সংস্কৃতই লিখুন আর ভাষাই লিখুন, লয়মতো দুটো দুই অর্থের শব্দ ব্যবহার করিতে পারিলে কৃতার্থ বলিয়া মনে করিতেন। আমাদের কবি রঘুনন্দনও অনেক জায়গায় এইরূপে দুই অর্থের শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। সূর্যপূজার মন্ত্র পড়িতে গিয়া, সংকল্প করাইতে গিয়া মধুমঙ্গল বলিতেছেন, বলো—

হরিপ্রীতি কামে করি হরির পূজন

এখানেও কবি আবার হরি শব্দ দুই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। হরি শব্দে সূর্য ও হরি শব্দে কৃষ্ণ। তাহাতে ললিতা বলিলেন, "ও কী কর? পূজা করিতে বসিয়াছ— কপট বাক্য কেন বল?" মধুমঙ্গল বলিলেন, "আমি কপট বাক্য বলি নাই। যদি ছল ধরিতে বসো, সকল কথাতেই ছল ধরিতে পারো।"

যে হউক্ সে হউক্ হয়ে গিয়াছে সঙ্কল্প।
এখন তোমার ব্যর্থ এ সব বিকল্প॥

ক্রমে সূর্যপূজা হইয়া গেল। রাধিকা সোনার অঙ্গুরি দক্ষিণা দিতে চাহিলেন। মধুমঙ্গল একে ব্রাহ্মণ তায় ছেলেমানুষ। বলিলেন, "আমি সোনা লইয়া কী করিব? আমায় গোটাকতক মোয়া দাও।" রাধিকার এক সখী মধুমঙ্গলের আঁচলে মোয়া বাঁধিয়া দিলেন।

আবার পথে আসিয়া কৃষ্ণের সহিত মিলন হইল। কৃষ্ণ বলিলেন, "স্ত্রীলোক বড়ো কৃপণ! সূর্যের পূজায় সোনা দক্ষিণা দিতে হয়। তাহা না দিয়া দিয়াছে কিনা গোটাকতক মোয়া। ইহাতে কি পূজার ফল হয়?

কৃষ্ণ যে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে যাইতেছেন, সে কথা ললিতা জানিত। চন্দ্রাবলী ভদ্রকালীর পূজা করিতেন, তাহাও সে জানিত। তাই ব্যঙ্গ করিয়া বলিল—

যেইজন ভদ্রকালী দেবীরে পূজয়।
তারি ফল সিদ্ধি বাঞ্ছা করিবারে হয়॥
যেহেতুক তাহে আছে নিজ প্রয়োজন।
উদাসীন জন লাগি নিরর্থ চিন্তন॥

শ্রীকৃষ্ণ এই তীব্র ব্যঙ্গের মর্ম বেশ বুঝিতে পারিলেন এবং বলিলেন—

… সাধু স্বভাব এ হয়।
পরের অহিত দেখি সহিতে নারয়॥

সখীদের সহিত কৃষ্ণের এইরূপ উক্তি প্রত্যুক্তি হইতেছে এমন সময় মধুমঙ্গল মাঝে পড়িয়া বলিলেন—

বটু বলে সখা তোর কথা অনুচিত।
যেহেতুক এই দক্ষিণাতে মোর প্রীত॥
যাহা পাই তুষ্ট হয় আচার্য্য হৃদয়।
সেই দক্ষিণায় পূজকের ফল হয়॥

তখন সকলে আপনাপন ঘরে চলিয়া গেল।

এই কৃষ্ণ ও রাধার প্রথম মিলন। এ মিলনের মধ্যবর্তী দেবী পৌর্ণমাসী। তাঁহার অবলম্বন মধুমঙ্গল। পৌর্ণমাসী ও মধুমঙ্গল দুটিই বাঙালি কবির সৃষ্টি! কৃষ্ণ রাধিকার প্রেম বাঙালির মনের মতো করিবার জন্য বাঙালি কবিরা একটি বুড়ি ও একটি ছেলে আনিয়া যোগাইয়াছেন। এরূপ যোগানো কবিদের স্বভাব। দেখুন না, মহাভারতের শকুন্তলা বনের মাঝে নিজেই রাজার সহিত সব কথাবার্তা কহিলেন। রাজসভায় আসিয়াও নিজেই নিজের জন্য ওকালতি করিলেন। কিন্তু কালিদাস সে ভাবে শকুন্তলাকে দেখাইতে পারিলেন না। বনের মধ্যে শকুন্তলার সঙ্গে দুটি সখী ছিলেন। একটিতে হইল না— দুটি। রাজসভায়ও সঙ্গে দুটি ব্রাহ্মণ পড়ুয়া ছিলেন। সেখানেও একটিতে হইল না, দুটি। যদি এই চারিটি না দেন, কালিদাসের সময় কেহও সে শকুন্তলা পছন্দ করিত না। এখানেও সেইরূপ, বাঙালি কবিরা পৌর্ণমাসী ও মধুমঙ্গল

এই দুটিকে আনিয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেমে যোগ করিয়া দিলেন। বাঙালি কবিরা আরো একটি নূতন জিনিস আনিয়াছেন। সেটি চন্দ্রাবলী। তিনি কৃষ্ণপ্রেমে রাধিকার সতীন। সুতরাং রাধিকার একটি সতীন জুটাইয়া কবিরা রাধিকার কৃষ্ণপ্রেম আরো ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছেন। এই সব নূতন নূতন মানুষ গড়ার কথা পরে হয়তো আবার বেশি করিয়া বলিতে হইবে। সুতরাং এখানে সংক্ষেপে বলিলেই চলিবে। কিন্তু কৃষ্ণরাধার প্রথম দর্শনে কবি কী বাহাদুরিই করিয়াছেন। কৃষ্ণের প্রথম দর্শনে রাধিকার বিস্ময়-চকিত ভাব— স্তব্ধভাব, কী সুন্দর ভাবেই দেখানো হইয়াছে। রাধিকা প্রথম মানুষ বলিয়াই চিনিতে পারেন নাই। তাঁহার মনে হইয়াছিল কদম্বের মূলে এক খণ্ড মেঘ পড়িয়া আছে। তাহাতে স্থির বিদ্যুৎ, মেঘের পাশে হাঁসের সার ও তাহার উপর রামধনু। অনেক কষ্টে সখীরা যখন বুঝাইয়া দিলেন ও মেঘ নয়, ওই কৃষ্ণ, তখন রাধিকা একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন, আর-এক সখী কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। চোখেও কৃষ্ণ, কানেও কৃষ্ণ। কবি বলিলেন, দুই ইন্দ্রিয় দিয়া দুটি অমৃতের নদী রাধিকার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। অল্প ক্ষণেই সে হৃদয় ছাপাইয়া উঠিল। রাধিকার সাত্ত্বিকভাবের উদয় হইল। স্বেদ, অশ্রু ঝরিতে লাগিল। কৃষ্ণেরও রাধিকাকে প্রথম দেখিয়া এরূপ ভাবই হইয়াছিল। ক্রমে যখন চার চক্ষের মিলন হইল, কবি বলিলেন, "এতো চক্ষের মিলন নয়, এ যেন বাণে বাণে যুদ্ধ। কেবল বিবাদ কার বাণের বল বেশি। কেহ বলিলেন, কৃষ্ণের বাণের বল বেশি। কবি বলিলেন সেটা একেবারেই নয়, রাধার বাণেরই বল বেশি। তিনি সেটি কী প্রকারে প্রমাণ করিয়াছেন, সে কথা আগেই বলা হইয়াছে।

'নারায়ণ'
বৈশাখ, ১৩২৩ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

'রাধামাধবোদয়' শিরোনামে এই আলোচনা 'নারায়ণ' পত্রিকার দুটি সংখ্যায় —অগ্রহায়ণ ১৩২২ ও বৈশাখ ১৩২৩ ব.— প্রকাশিত হয়েছিল। অংশ দুটি ১ ও ২ সংখ্যায় নির্দেশ করা হল।

ইংরেজ রাজত্বের রাজধানী কলকাতায় আধুনিক বিদ্যাচর্চা এবং আধুনিক সাহিত্যের সূত্রপাত হলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত গ্রাম-বাংলায় পুরানো বিদ্যাচর্চার এবং সাহিত্যের জের চলেছিল। এই ধারার প্রতিনিধি রঘুনন্দন গোস্বামী বংশানুক্রমে চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর নিবাস বর্ধমান জেলার মানকড়ের কাছে মাড়ো গ্রামে। সংস্কৃতবিদ্যায় পারংগম রঘুনন্দনের সংস্কৃত রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'সদাচার-নির্ণয়', 'দুর্জনমিহিরকলঙ্ক', 'গোবিন্দচরিত', 'ভক্তলীলামৃত', 'গোবিন্দমাধবোদয়' : ব্যাকরণের বই 'ধাতু-প্রদীপ', 'ঔণাদিকোষ' এবং আয়ুর্বেদের বই 'রোগার্ণবতারিণী', 'অরিষ্ট-নিরূপণ' ; আনুমানিক ১৮৩১ খৃস্টাব্দে রচিত 'রামরসায়ন' বা 'শ্রীমদ্রামরসায়ন'-এর কলকাতা থেকে প্রকাশিত ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের একটি সংস্করণের উল্লেখ আছে জাতীয় গ্রন্থাগারের তালিকায়। বঙ্গবাসী কার্যালয় থেকে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বেঙ্গল লাইব্রেরির রিপোর্টে এই বই সম্পর্কে শাস্ত্রীমশায়ের মন্তব্য—

"*Vaishnavism* is better represented this year than any other form of religion in Bengal. The largest work in point of bulk is the *Rāmarasāyana.* It is the work of Raghunandana Gosvāmī, eleventh in descent from Nityānanda, the great associate of Chaitanya. The work differs greatly from the Rāmāyana of Krittivāsa. It omits altogether the story of the horse sacrifice, the fight with Lava and Kusha, and the exile of Sītā. It ends with the union of Rāma and Sītā at an *Ashoka* grove in Ajodhyā, a creation of the poet's own imagination, and embellished

with a richness of fancy rarely to be met with in Bengali. The *Ashoka-vana*, produced by the wild fancy of a Bengali Vaishnava, who always revels in the scenes of Brindāvan, can very well stand a comparison with the Sukhāvati of the Buddhists, the Amarāvati of the Hindus, or the Alakā of Kālidāsa. The writer has taken pains to expunge everything from the story which jars on a Vaishnava's ear. For instance, the worship of Durgā, which forms so important a chapter in the sixth book of the Rāmāyana, has been carefully left out. (*RBL*, 1890, p. 9.)

রাধাকৃষ্ণ বিষয়ে রঘুনন্দনের আর-একটি কাব্য 'গীতিমালা' ১৮০১ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।

চণ্ডীদাস-১

উত্তর-রাঢ়ের উত্তর-পশ্চিম কোণে বীরভূমি, বাংলার একেবারে সীমানায়। বীরভূমের পশ্চিমে আর বাংলা নাই। মুসলমানদের বাংলায় আসিবার ২০০ শত বৎসর পূর্ব পর্যন্ত বীরভূমের ইতিহাস ও বীরভূমের ধর্ম বিষয়ে যাহা কিছু জানা যায়, তাহার একটু আলোচনা হওয়া আবশ্যক। এই ২০০ শত বৎসরের মধ্যে বীরভূমে মহীপাল নামে এক রাজা ছিলেন [প্রথম মহীপাল, রাজত্বকাল ৯৮৮-১০৩৮ খৃ.]। তাঁহার নামে প্রকাণ্ড এক দিঘি আর প্রকাণ্ড একটি ঢিবি এখনো বর্তমান আছে; সেই স্থানটির নামও মহীপাল। কাঞ্চী নগরের রাজেন্দ্র চোল এই মহীপালকেই পরাস্ত

করিয়া উত্তর-রাঢ় লুঠ করিয়াছিলেন [১০২১-২৩ খৃ -র মধ্যে]। ইহার পর, বীরভূম জেলার মধ্যে পাইকোড় গ্রামে নারায়ণচত্বরে একখানি শিলালিপিতে লেখা আছে যে, কর্ণচেদি এই দেশ দখল করিয়াছিলেন ও এখানে কিছু দিন রাজত্বও করিয়াছিলেন। কর্ণচেদি ১০৪২ খৃ. অব্দে রাজা হন। তাঁহার রাজধানী নর্মদা নদীর ধারে ত্রিপুরী নগরে ছিল। সেইখান হইতে তাঁহার পিতা ও তিনি চারি দিকে রাজ্য জয় করিতে করিতে এক প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য করিয়াছিলেন : উত্তরে হিমালয় হইতে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত, পূর্বে বাংলা হইতে পশ্চিমে দিল্লি পর্যন্ত তিনি সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। কিন্তু তিনি বরেন্দ্র-ভূমিতে বিগ্রহপালের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হন ; বিগ্রহপালকে কন্যা দান করেন। তিনি পাহি দত্তকে বীরভূমির সামন্ত-রাজা করিয়া দেন। পাহি দত্তও নিজের নামে এক দুর্গ নির্মাণ করেন ও নিজের নামে তাহার নাম রাখেন পাহিকোট্ট বা পাইকোড়।[১]

ঐ নারায়ণচত্বরে কর্ণচেদির শিলালিপির পাশেই বিজয়সেনের এক শিলালিপি পাওয়া যায়। সেনবংশ উত্তর-রাঢ় হইতেই আপনাদের রাজ্য বিস্তার করেন।

যত বার নূতন রাজা আসিয়াছেন, তত বারই বীরভূমে নূতন নূতন ধর্ম হইয়াছে। মহীপালের আগে প্রায় সবই বৌদ্ধ ছিল। কিন্তু তখনকার বৌদ্ধ হীনযানও ছিল না, মহাযানও ছিল না : সবই সহজ-যান হইয়া গিয়াছিল। সহজযানের দুই রূপ আছে— এক ভৈরব-ভৈরবী, আর-এক নাড়ানাড়ী। প্রথমটি শাক্ত হইয়া দাঁড়ায়, দ্বিতীয়টি বৈষ্ণব হইয়া দাঁড়ায়। কথা দুয়েরই এক— যুগনদ্ধ বা যুগলরূপের উপাসনা। কেহ তাহার সঙ্গে মাছ-মাংস খান, কেহ বা খান না।

নানারূপ ধর্মের মধ্যে বীরভূমে এক নূতন সহজিয়া ধর্ম উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহার নাম কী বলিব, জানি না ; তবে মোটামুটি বলা যায়, কঙ্কালিনীর উপাসনা। ভারতবর্ষের ২৪ জায়গায় কঙ্কালিনীর উপাসনা হইত ; বীরভূমের অট্টহাসই তাহার প্রথম জায়গা। এখানে তাঁহার মন্দির ছিল না, তিনি এক কদম্ব-তলায় থাকিতেন। অট্টহাসের এই মূর্তি এখন সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে আছে। তাঁহার পাঁজরাগুলি সব গনা যাইতেছে ; কেবল যেন চামড়া দিয়া ঢাকা ; পেটটি খোলে পড়িয়া

গিয়াছে ; চক্ষু কোটরগত। তিনি উৎকুটুকাসনে বসিয়া আছেন অর্থাৎ পায়ের গুলমুড়া দুটি জোড় করিয়া, পাছার নিচে দিয়া বসিয়া আছেন। তিনি কাসিতেছেন, কাসির ভাবটি বেশ দেখা যাইতেছে, কিন্তু তাহার মধ্যেও বেশ আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিতেছে। তাঁহার আকার-প্রকার দেখিলে, তিনি যে সহজযানের দেবতা, তাহা বেশ বুঝা যায়। কারণ, তাঁহার নিকটেই এক প্রকাণ্ড মুখওয়ালা ক্ষেত্রপাল থাকেন। আমরা ডাকার্ণব তন্ত্র হইতে অট্টহাসের কঙ্কালিনীর কথা তুলিয়া দিতেছি।

অথ কঙ্কালযোগেন দেশে দেশে স্বযোনিজম্।
জ্ঞানযুক্তা[ং] বিজানীয়াদ্যোগিনী[ং] বীরনায়িকা[ম্] ॥
অট্টহাসে চ যা (রজা) দেবী নায়কী সর্ব্বযোগিনী।
তস্মিন্ স্থানে স্থিতা দেবী মহাঘণ্টা কদম্বদ্রুমে ॥
তস্য দেবী সদা [মহা] বীরক্ষেত্রপালো মহাননঃ।
কঙ্কালসুখমায়া সা সন্তর্বান্তি[ন্তী] মহাত্মনাং ॥
মুদ্রণং তেষু কঙ্কালমোড্ডানরন্ধ্রতোদ্গতং।
স্বধাতৃপ্তির্তবিজ্ঞানং সর্ব্বদেশগতং ক্রমাৎ ॥[১]

এই ধর্ম ভারতবর্ষের যে ২৪টি জায়গায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, সে নামগুলি সবই পুরানো নাম। অনেকগুলি এখনো ঠিক করা যায় নাই।

কর্ণচোদির আসার পর হইতেই ইঁহারা হিন্দু হইতে আরম্ভ করেন। কিন্তু সেও একটু অদ্ভুত রকম। তখন নাথেরা খুব প্রবল। সুতরাং এক দল শৈব হন ; কিন্তু শৈব হইলেও গাজনে তুলসীর মঞ্জরী দিয়া থাকেন। আর-এক দল বৈষ্ণব হন, কিন্তু মাছ-মাংস দিয়া বালগোপালের ভোগ দেন। এই-সকল সহজিয়া হিন্দুদেব সর্বপ্রধান জয়দেব ঠাকুর। রাধা-কৃষ্ণের যুগল-মূর্তি তিনি উপাসনা করেন, সে উপাসনা সহজভাবেই ভোর। যে সহজভাব বৌদ্ধ বোধিসত্ত্বেরা নিজের বোধিচিত্তে অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইতেন, হিন্দু সহজিয়ারা সেই ভাবটি রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্তিতে আরোপ করিয়া, তদ্দর্শনেই আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন। সহজভাব কেহ কাহাকেও বুঝাইতে পারেন না, নিজে যে বুঝিতে পারিল, সেই বুঝিতে পারিল, নহিলে বুঝাইবার জো নাই। কাহ্নপাদ বলিয়া গিয়াছেন—

"গুরু বোধসে সীসা কাল"— অর্থাৎ গুরু যখন বুঝাইয়া দেন, শিষ্য তখন কালা হইয়া যায়। তিনি আরো বলিয়াছেন—

ভণই কাহ্নু জিণরয়ণ বিকসই সা।
কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা॥

ইহার ব্যাখ্যা— ভণই ইত্যাদি। কৃষ্ণাচার্য্যো হি বদতি কীদৃশং জিনরত্নং রতিং অনন্তমনুত্তরসুখং তনোতীতি রত্নং চতুর্থানন্দং বোদ্ধব্যং। যথা বধিরঃ সংকেতাদিনা মূকস্য সংবোধনং করোতি, তদ্বদ্দূরে সদ্‌গুরুঃ শিষ্যে রতিস্বপ্রভাবেন মহাসুখং তনোতি। তথাচ ইউডীপাদাঃ। অদূরে দূরে বেত্যাদি॥ [বৌ-গা-দো, পৃ. ৬১-৬৩]

সরহপাদ বলিতেছেন—

সো পরমেসুরু কাসু কহিজ্জই।
সুরঅকুমারী জিমহু পডিজ্জই॥[৩]

অদ্বয়বজ্রের ব্যাখ্যা— ভ্রান্ত্যা যাবৎ সত্ত্বনিকায়ৈঃ স্থিতোপি স পরমতত্ত্বং পরমেশ্বরো অন্য সিদ্ধান্তাভাবাৎ। কস্য পৃথগ্‌জনাবস্থিতস্য কথয়ামি হি তৎ। কথনমাত্রেণ তেষু প্রবৃত্তিঃ। কিন্তর্হি যথা কুমার্য্যঃ সখীভ্যামালোচয়ন্তি প্রত্যয়ং কুর্ব্বন্তি। প্রথমতঃ ত্বয়া স্বামিনে গত্বা সুরতসুখমনুভূতং তন্ময়ি সাক্ষাদ্বদসি নিশ্চিতমেতৎ। গত্বা সা পুনরস্য গৃহাদাগত্য সখিনা চ পৃচ্ছতি পূর্ব্বোক্তং কীদৃশমিতি। তা ঊচুঃ। ত্বয়া সাক্ষাৎ স্বামিনা সহানুভবকালে জ্ঞেয়মিতি, সুখোৎপাদং ন কিঞ্চিৎ সাক্ষাৎ তে বক্তুমবাচ্যত্বাৎ। [বৌ-গা-দো, পৃ. ৯৯]

আমরা জয়দেবের যে বইখানি পাই, তাহাতে তিনি যে বৈষ্ণব সহজিয়া ছিলেন, ইহাই বুঝিতে পারি। তিনি রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্তিরই উপাসনা করিতেন। অন্যরূপ সহজিয়া ভাব তাঁহার কাব্যে নাই। কিন্তু বনমালী দাস তাঁহার যে চরিত লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ হয়, তিনি বা এক সময় খাঁটি সহজিয়া ছিলেন।[৪] তাঁহার জাতি-কুল কেহই জানিত না। তিনি কেন্দুলিতে থাকিতেন, কিন্তু কেন্দুলির কেহই তাঁহার জাতি-কুল জানিত না। যখন দক্ষিণ দেশ হইতে এক ব্রাহ্মণ জগন্নাথের এক দেবদাসীকে সঙ্গে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল ও জয়দেবের খোঁজ করিল, তখন সকলেই বলিল যে, জয়দেব বলিয়া একজন কদম্বখণ্ডীর ঘাটে থাকে বটে, কিন্তু তাহার জাতি-কুল কেহই জানে না।

কিন্তু ব্রাহ্মণ তো জাতি-কুল খুঁজিতে আসে নাই, যদি খুঁজিত, নিজের দেশেই সে মেয়ের বিবাহ দিত। সে আসিয়াছে জগন্নাথের হুকুমে জয়-দেবকে মেয়ে দিতে, তাই সে তাহাকে মেয়ে দিয়া চলিয়া গেল। এই মেয়েই পদ্মাবতী। পদ্মাবতীর সঙ্গে জয়দেবের ঠিক স্বামী ও স্ত্রী সম্বন্ধ ছিল বলিয়া মনে হয় না। কোন্ হিন্দুর ছেলে আপনাকে "পদ্মাবতী-চরণচারণচক্রবর্ত্তী" বলিয়া পরিচয় দিতে পারে? তিনিও বোধ হয়, এক সময়ে খাঁটি সহজিয়া ছিলেন, কিন্তু পদ্মাবতীর পাল্লায় পড়িয়া অথবা অন্য কোনো নিগূঢ় কারণে বৈষ্ণব সহজিয়া হইয়া গিয়াছিলেন।

এইবার চণ্ডীদাসের কথা। তাঁহার বাড়িও বীরভূমে, কেন্দুলি হইতে বেশি দূরে নয়। তাঁহারো বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে তাঁহার কথাটা জয়দেবের চেয়ে আরো একটু জটিল। কেন না, তিনি গোড়ায় ছিলেন বাশুলির সেবক, তাহার পর হইলেন রামী রজকিনীর চরণচারণচক্রবর্তী, তাহার পর তাঁহার দেবতা হইলেন রাধা-কৃষ্ণের যুগল-মূর্তি। জয়দেবের যদি দুই মূর্তি হয়— খাঁটি এবং বৈষ্ণব সহজিয়া, তাহা হইলে চণ্ডীদাসের তিন মূর্তি। এক মূর্তি হইতে আর-এক মূর্তিতে কেমন করিয়া গেলেন, সেটাও একটি ভাবিবার কথা। বাশুলি তাঁহাকে রামী রজকিনীর সঙ্গে মিলাইয়া দিলেন, আবার তিনিই, কৃষ্ণের নির্মাল্য একটি ফুল চণ্ডীদাস তাঁহাকে যখন অর্পণ করিলেন, তখন বলিলেন— ঐ ফুল আমার গুরুকে দেওয়া হইয়াছে, আমি আর কী করিয়া লইব? চণ্ডীদাস বলিয়া উঠিলেন— সে কী মা! তোমার আবার গুরু! তিনি আবার কে? দেবী বলিলেন— জান না? কৃষ্ণ আমার গুরু। তখন চণ্ডীদাস বলিলেন— তবে আমি কৃষ্ণকেই ভজিব! এ পর্যন্ত যত দূর লেখা-পড়া হইয়াছে, তাহাতে জানা যায়, চণ্ডীদাসের জীবনে তিন বার এই তিন রকম পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। যখন তিনি বাশুলির সেবক, তখন তিনি খাঁটি বৌদ্ধ; যখন রামী রজকিনীর সেবক, তখন খাঁটি সহজিয়া; আবার রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির সেবা করিয়া তিনি বৈষ্ণব সহজিয়া হইয়া গেলেন। তাঁহার মধ্যে এইটুকুই বিচিত্র যে, তিনি যে ভাবেই থাকুন, যে রসেই মজুন, আগেকার দেবতাটিকে ভুলেন নাই। বাশুলিও তাঁহার সঙ্গের সাথী, রজকিনীও দেখা হওয়া অবধি তাঁহার সঙ্গের সাথী। বসন্তরঞ্জনবাবু [রায়, ১৮৬৫-১৯৫২ খৃ.] ঠিক অনুমান করিয়াছেন যে, রামী রজকিনী

বাশুলি দেবীর দেয়াসিনী ছিলেন, আর চণ্ডীদাস একজন বাশুলির ভক্ত। বাশুলি দেবী আর-কেহ নহেন, আমরা ঘরে ঘরে যাঁহার পূজা করিয়া থাকি, তিনি সেই মঙ্গলচণ্ডী। আমরা 'ধর্ম্মপূজাবিধি'তে বাশুলির যে ধ্যান ও আবাহন-মন্ত্র পাইয়াছি, তাহা নিচে তুলিয়া দিলাম—

ওঁ আয়াতা স্বর্গলোকাদিহ ভুবনতলে কুণ্ডলে কর্ণপূরে
সিন্দূরাভাবসন্ধ্যা প্রবিকটদশনা মুণ্ডমালা চ কণ্ঠে।
ক্রীড়ার্থে হাস্যযুক্তা পদযুগকমলে নূপুরং বাদয়ন্তী
কৃত্বা হস্তে চ খড়্গং পিব পিব রুধিরং বাশুলী পাতু সা নঃ॥

ওঁ বাশুল্যৈ নমঃ।

ওঁ আবাহয়ামি তাং দেবীং শুভাং মঙ্গলচণ্ডিকাং।
সরিত্তীরে সমুৎপন্নাং সূর্য্যকোটিসমপ্রভাং॥
রক্তবস্ত্রপরীধানাং নানালঙ্কারভূষিতাং।
অষ্টতণ্ডুলদূর্ব্বাভিঃ অর্চ্চেন্মঙ্গলকারিণীং।
অসিদ্ধসাধিনীং দেবীং কালীং কিল্বিষনাশিনীং।
আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবি সান্নিধ্যমিহ কল্পয়॥[৫]

এই-সকল দেবতা ঠিক হিন্দুর দেবতা নহেন, সুতরাং ইঁহাদের দেয়াসিনী থাকাই সম্ভব। বসন্তবাবুর অনুমান, সেইজন্য সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

এতক্ষণ তো গৌরচন্দ্রিকা গেল। আসল কথা এই, চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে আমরা কয়েকটি নূতন খবর পাইয়াছি, তাহাও বসন্তবাবুর অনুগ্রহে। সেইগুলি পাইয়া চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে যাহা জানা আছে, তাহাতে সন্দেহ জন্মিয়াছে।

জানার মধ্যে প্রথমটি এই, একদিন আমি সাহিত্য-পরিষদের পুথি-খানা দেখিতে গিয়াছি; দেখিলাম, বসন্তবাবু তন্ময় হইয়া কী পড়িতে-ছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— ও কী? তিনি বলিলেন— চণ্ডীদাসের মৃত্যু। কতকগুলি বাজে পুথির পাতার মধ্য হইতে এইখানি বাহির হইয়াছে, ২০০/২৫০ বৎসর পূর্বের হাতের লেখা। লেখাগুলি এই—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমো॥
কাঁহা গেয়ো বন্ধু চণ্ডীদাস।

চাতকি পিয়াসী গ(ঘ)ন না পাইআ বরিসণ
নআনের নাগয়ে পিয়াস ॥
কি করিল রাজা গৌড়েস্বর।
না জানিঞা প্রেম লেহ ব্রেথাই ধরিস দেহ
বধ কৈলে প্রাণের দোসর ॥
কেনে বা সভাতে কৈলে গান।
স্বর্গ মণ্ড পাতালপুর আবিঃর্ভূত পষু নর
মানিনীর না রহিল মান ॥
গান সুনি পাৰ্চ্ছরি বেগম।
অস্থির হইল মন ধৈর্য্য নহে এক ক্ষণ
রাজারে কহে জানিঞা মরম ॥
রাণি মনঃকথা রাখিতে নারিল।
চণ্ডিদাস সনে প্রিত করিতে হইল চিত
তার প্রিতে আপন খুয়াল্য ॥
রাজা কহে মন্ত্রিরে ডাকিয়া।
ত্বরান্বিতে হস্থি আনি পিষ্ঠে পেলি বান্ধ টানি
পিষ্ট খুদে বৈরী ছাড় গিয়া ॥
আমি অনাথিনী নারী মাধবির ডালে ধরি
উর্চ্চস্বরে ডাকি প্রাণনাথ।
হস্থি চলে অতি জোরে ভালস্তে না দেখি তোরে
মাথাএ পড়িল বজ্রাঘাত ॥
রানি কহে ছাড়িয়া না জায়।
কহিতে কহিতে প্রান আর দেহ সমাধান
দুহু' প্রান একত্রে মীলায় ॥ ১ ॥

সুন প্রিয় রজকিনি আসকে হারালাঙ রাণী
এ বার তরাবে তুমি মোরে।
বেগম সহিত লেহ হা নাথ খুয়ালে দেহ
প্রাণে মাল্য এ রাজা গুয়াঁ[]র ॥
আসকে লভিত প্রাণ তখনি করিলে গান
কেমনে জানিব হেন হবে।

বৈরি সত ডংসে গায় চেতন পাইএ তায়
তোমারে ডাকিএ আত্মা ভাবে ॥
এই করি আস মনে উধ্বারিবে পতিত জনে
তবে সে দুল্লভ মানি প্রীত।
নতুবা ফুরাল্য দায় বৈরি চোটে প্রাণ যায়
কে য়ার করিবে মোরে হীত ॥
কান্ধি কহে চণ্ডীদাস দস দসার আস
পূর্ণ কর রজককুমারি।
নহিলে একলা জাই সঙ্গে মোর কেহ নাই
কাছে আস্য তবে প্রাণে মরি ॥ ২ ॥

সূন বন্ধু চণ্ডীদাস দুখিনিরে সঙ্গে করি লেহ ॥ ধ্রু ॥
চঞ্চল সভাব তোর চিত। সভাতে গাইলে গিত ॥
মনের মরম করি সার। অনুরাগে কি করিলে ফুৎকার ॥
পাতি হাট বসাত্যে না দিলে। আসক আনলে পড়াইলে ॥
বৈরি কাটে তোমার গায়। তুমি সে আনন্দ বাস তায় ॥
মোর অঙ্গ সব ক্ষেতি হৈল। বৃধিরে বসন ভিজ্যা গেল ॥
পরাসিতে এ জনার মন। কতেক কর্য্যাছ কদর্থন ॥
রামি কহে জদি সঙ্গে নিবে। তুরিতে পরান তেজ তবে ॥৩॥

সূন প্রাণনাথ চণ্ডিদাস তার নির্ব্বন্ধন।
দৈবের কর্ম্ম ফাঁস না জায় খণ্ডন ॥
ছাড়ি পরিবার মোরে সঙ্গে কর
সভারে কহিলে সত্য।
বাসুলি বচন না কৈলে স্মঙরণ
তাহাতে মজাল্যে চিত্ত ॥
আমা মুখ চাঞা গজপৃষ্টে সুঞা
রয়্যাছ বন্ধন পাকে।
রাজা গৌড়ের স্বর দুষ্ট কলেবর
কেহো না বুঝাল্য তাকে ॥
নাথ আমি সে রজকবালা।

আমার বচন না সুনে রাজন
বুঝিল কৃষ্ণের লীলা ॥
সুদ্ধ কলেবর হইল জর্জ্জর
দারূন সন্ধান ঘাতে।
এ দুস্খ দেখিয়া বিদরএ হিআ
অভাগিরে লেহ সাথে ॥
কহেন রামিনি সুন গুনমনি
জানিলাঙ তোমার রিতি।
বাসুলি বচন করিলে লংঘন
সুনহ রসিকপতি ॥ ৪ ॥

পার্চ্ছার বেগম কয়। সুন মহিনাথ মহাশয় ॥
তুমি অবলা বচন রাখ। রসিকমণ্ডল দেখ ॥
আমি সে অবলা নারি। তুমারে কহিএ বিনয় করি ॥
জোড় করে কহি বানি। সুন নৃপচূড়ামণি ॥
সুন রসের স্বরূপ সে। কেন বিনাস করহ তাহার দে ॥
সে ষামান্য মানুস নহে। রতি স্থিতি তার দেহে ॥
জাহার সুস্বর গানে। বিন্ধিল আমার প্রাণে ॥
কেনে কৈলে এমন কাজ। ভুবনে রাখিলে লাজ ॥
রাজা হে জবন জাতি। কি জানে রসের গতি ॥
চণ্ডিদাসে করি ধ্যান। বেগম তেজল প্রাণ ॥
সুনিঞা ধবিনি ধায়। পড়িল বেগম পায় ॥ ৫ ॥

এই গানগুলি হইতে জানিতে পারা গেল যে, চণ্ডীদাস, রামী রজকিনীর সহিত কোনো গৌড়েশ্বরের বাড়িতে গান করিতে গিয়াছিলেন। গানে মুগ্ধ হইয়া রানী চণ্ডীদাসকে কামনা করেন এবং তিনি সে কথা সাহসপূর্বক রাজাকে বলেন। রাজা শুনিয়াই হুকুম দেন যে, চণ্ডীদাসকে হাতির উপরে কাছি দিয়া কষিয়া বাঁধিয়া, হাতিকে চালাইয়া দেওয়া হউক। ইহাতেই চণ্ডীদাসের মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁহার দেহ হইতে প্রাণ বাহির হইবার পূর্বেই রানী প্রাণত্যাগ করেন-- শুনিয়া রজকিনীও রানীর পায়ে গিয়া পড়িল।

এই গৌড়েশ্বর কে ? হিন্দু, না মুসলমান ? গানে তাঁহাকে পাতসাহও বলিতেছে, রাজাও বলিতেছে ; রানীকে রানীও বলিতেছে, বেগমও বলিতেছে। রানী কিন্তু রাজাকে যবনই বলিতেছেন এবং চণ্ডীদাসকে ছাড়িয়া দিবার জন্য নানারূপ অনুনয়-বিনয় করিতেছেন। সুতরাং এ গৌড়েশ্বর কে ? রাজা গণেশ হইবেন কি ? তিনি তো হিন্দু-মুসলমান সব সমভাবেই দেখিতেন। তাঁহারই বাড়িতে কি চণ্ডীদাস গান করিতে গিয়াছিলেন ? তাঁহাকে পাতসাহও বলা যায়, রাজাও বলা যায় ; তাঁহার রানীকে রানীও বলা যায়, বেগমও বলা যায়। কিন্তু তিনি কি চণ্ডীদাসের মতো একজন ধার্মিক লোককে 'চিত্রবধ' করিবার আদেশ দিবেন ? বিশ্বাস তো হয় না। রাজা গণেশ কখনো মুসলমানধর্ম গ্রহণ করেন নাই, তিনি শেষ পর্যন্ত হিন্দুই ছিলেন। সুতরাং এ গৌড়েশ্বর তিনি নহেন। তবে কি এ গৌড়েশ্বর গণেশের পুত্র যদু বা জালালুদ্দিন [রাজত্বকাল ১৪১৮-১৪৩১ খৃ.] ? ইনি তো মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ; সুতরাং ইঁহাকে পাতসাহ্ এবং রাজা এবং ইঁহার রানীকে রানী ও বেগম, দু-ই বলা যাইতে পারে। তাহাতেও এক বিষম গোল উপস্থিত। কারণ, শ্রীমৎ আর. ডি. বন্দ্য [রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৮৫-১৯৩০ খৃ.] মহাশয় 'বৈজ্ঞানিক রীতিতে গবেষণা' করিয়া গণেশ ও যদুর যে কাল নিরূপণ করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে তাঁহারই লিখিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির লিপিকাল মিলিতেছে না। তিনি লিখিয়াছেন— "অতএব ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় কৃষ্ণকীর্ত্তনের যে পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে, সম্ভবত খ্রীঃ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে লিখিত হইয়াছিল।" আমিও বলি, "তথাস্তু"। যদিও আমার বিশ্বাস যে, তিনি যতগুলি প্রমাণ ও যুক্তি দিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই বৈজ্ঞানিক রীতিবিরুদ্ধ। 'শূদ্রপদ্ধতি'র লিপিকাল লেখা আছে, "স° ১৪৪২ শাকে", উনি সেটিকে সংবৎ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন ; এটি যে বিশেষ বৈজ্ঞানিক রীতিসিদ্ধ, তাহা বলিয়া তো মনে হয় না। আর তিন-চারি জায়গায় এইরূপ সং— শক পাইয়াছি, সে-সকল জায়গায় শকই ধরিয়া লইতে হইয়াছে, তাহাতে চারি দিক সামঞ্জস্যও হইয়াছে ; কিন্তু সেটাও ঠিক বৈজ্ঞানিক রীতি নহে। ঠিক বৈজ্ঞানিক রীতিতে

চলিলে উহার উপর নির্ভরই করিতে নাই। কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উহারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছেন। কারণ তিনি সংবৎ ধরিয়া ১৪৪২-৫৭ করিয়া, ১৩৮৫ খৃ. অ. পাইয়াছেন এবং সেইটিই তাঁহার হিসাবের মূল ভিত্তি হইয়াছে। কারণ, তিনি বলিতেছেন— "১৩৮৫ খৃ. অ. হইতে ১৪৯৫ খৃ অব্দের মধ্যে লিখিত এই গ্রন্থত্রয়ে ব্যবহৃত অক্ষর অপেক্ষা কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের প্রাচীন অক্ষরসমূহ প্রাচীনতর।" এখন খৃ. ১৩৮৫ই যে অসিদ্ধ হইয়া যায়। উহার মূল সে সং ১৪৪২, সে যদি শক হইয়া যায়, তাহা হইলে ১৪৪২+৭৮=১৫২০ খৃ অ. হইয়া গেল।

আর ১৪৪২ যে সংবৎ নহে— শক, আর. ডি. মহাশয় একটু প্রণিধান করিলেই সেটা দেখিতে পারিতেন। যেখানে ঐ অঙ্কটি আছে, তাহার পরপরই স্পষ্ট করিয়া বলা আছে—

"শাকে যুগ্ম(২)সরোজ(৪)সম্ভবমুখাম্ভোরাশি(৪)চন্দ্রা(১)ন্বিতে।" এখানে শাকই আছে।

প্রমাণ ও যুক্তিতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত একমত হইতে না পারিলেও তাঁহার সিদ্ধান্তে আমার সম্পূর্ণ মত আছে। তিনি অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে কৃষ্ণকীর্তনের অক্ষরগুলি পরীক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু অঙ্কগুলি পরীক্ষা করেন নাই। সেগুলি পরীক্ষা করিলে তিনি জানিতে পারিতেন যে, '৩' এই সংখ্যাস্থানে 'ও' লেখা ১৩৬০ খৃ অব্দের পরে আর দেখা যায় নাই। কৃষ্ণকীর্তনের পুথিতে কিন্তু সকল জায়গাতেই '৩' এই সংখ্যার স্থানে 'ও' আছে; সুতরাং উহা খৃ. ১৩৬০ বা তাহারো পূর্বে লিখিত হইবে। শুদ্ধ যে '৩' স্থানে 'ও' আছে, তাহা নহে। '৫' স্থানে ঔ লেখাও খুব প্রাচীন।

যখন কৃষ্ণকীর্তনের পুথিখানি ১৩৬০ সালের পূর্বে লেখা হইল, তাহা হইলে কি গ্রন্থকর্তা চণ্ডীদাস যদুর সময়ে মরিতে পারেন? যদুর রাজত্বকাল খৃ. ১৪১৪ [১৪১৮] হইতে খৃ. ১৪৩১ পর্যন্ত। পুথি লেখার ৫৪ বৎসর পরে যদুর রাজত্বকাল আরম্ভ হইল, তাহা হইলে গ্রন্থ রচনার কত পরে? অতএব এ চণ্ডীদাস যদুর সময়ে হইতেই পারে না।

যদি বল, চণ্ডীদাসের এই মৃত্যু গণেশ ও যদুর অনেক পূর্বে

ঘটিয়াছিল— গণেশের পূর্বে ইলিয়স শাহিরা বাংলার রাজা ছিলেন। এই বংশে পাঁচ জন রাজার নাম পাওয়া যায়[৬]—

১.	সামসুদ্দিন ইলিয়স শাহ্	১৩৪৫-১৩৫৮
২.	সেকেন্দর শাহ্	১৩৫৮-১৩৮৯
৩.	গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ্	১৩৮৯-১৩৯৬
৪.	সহিকুদ্দিন হামজা শাহ্	১৩৯৬-১৪০৬
৫.	সামসুদ্দিন দ্বিতীয়	১৪০৬-১৪০৯

ইঁহাদের কাহারো সময়ে চণ্ডীদাস যে কৃষ্ণকীর্তন বা সহজিয়া গান গাইবার জন্য গৌড়ে যাইবেন, এমন তো বোধ হয় না। তবে সেকাল-কার মুসলমান সুলতানেরা অনেক সময় হিন্দুদিগের উৎসবে যোগ দিতেন এবং হিন্দু কলাবতদের উৎসাহ দিতেন। সেই জন্য হয় তো গৌড়েশ্বরের বাড়িতে গান করিতে গিয়া চণ্ডীদাস প্রাণ হারাইয়াছিলেন। অথবা বলিতে হয় যে, নূতন আবিষ্কৃত পদগুলি অনেক পরে কেহ রচনা করে, কী লিখিতে কী লিখিয়াছে।

আর-এক উপায়ে এই সন্দেহ দূর করা যাইতে পারে— অর্থাৎ যদি আমরা একাধিক চণ্ডীদাস মানিয়া লই, তবে এই সমস্যার কতকটা মীমাংসা হইতে পারে। বসন্তবাবু বলেন, চণ্ডীদাসের পদাবলীর দুইটি গানের ভণিতায় 'আদি চণ্ডীদাস' এই শব্দ আছে। শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদিত 'চণ্ডীদাসের পদাবলী' [১৩২১ ব.], পৃঃ ৭৮৬ ও ৮১৫—

আদি চণ্ডীদাস চারি সে বুঝান।
মূঢ় উঠাইল জানিল মান ॥

পঞ্চ রস অনুবাদ যে হয়।
আদি চণ্ডীদাস বিধেয় কয় ॥

গান দুইটিই সন্ধ্যা ভাষায় লেখা, গুরুমুখী ভিন্ন অর্থগ্রহ হয় না। তবে কি একজন চণ্ডীদাস কৃষ্ণকীর্তনের গ্রন্থকর্তা, পদকর্তা আর-এক চণ্ডীদাস? দুই জনেই বাশুলির ভক্ত। কৃষ্ণকীর্তনে কিন্তু রামীর নামও নাই, নান্নুরের নামও নাই। বাশুলি যখন মঙ্গলচণ্ডী, তখন 'চণ্ডীদাস' শব্দেরও মানে বুঝা গেল। বাশুলি চণ্ডীর যাঁহারাই দাস,

তাঁহারাই হইলেন চণ্ডীদাস। তাঁহারা সহজিয়া ছিলেন, অন্য সহজিয়াদের মতো গান করিয়া বেড়াইতেন, সঙ্গে যোগিনীও থাকিত।

অন্তত দুই জন চণ্ডীদাস স্বীকার করিলে, প্রথম চণ্ডীদাস জয়দেবের মতো বৈষ্ণব হইয়া গিয়া কৃষ্ণকীর্তন লিখিয়াছেন ; আর-একজন বৈষ্ণব হয়েন নাই ; কখনো তিনি খাঁটি সহজিয়া গান গাহিতেন, কখনো বা রাধাকৃষ্ণকে লইয়া সহজিয়ার গান গাহিতেন। সম্ভবত ইঁহারই মৃত্যু গৌড়েশ্বরের বাড়িতে হইয়াছিল।

এ বিষয়ে একটু প্রমাণ আছে। একটি পদ কৃষ্ণকীর্তনেও আছে, পদাবলীতেও আছে। কিন্তু পদাবলীর পদটি ভাষা সমন্ধে আধুনিক। যেন পুরানো পদ দেখিয়া, আধুনিক ভাষায় কেহ ভাঙিয়া লইয়াছে।

কৃষ্ণকীর্তন— ৩৩৪ পৃ.

দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী
সব কথা কহিআরোঁ তোহ্মারে হে।
বসিআঁ কদমতলে সে কৃষ্ণ করিল কোলে
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে॥ ইত্যাদি

পদাবলী— ১০১ পৃ.

প্রথম প্রহর নিশি সুস্বপন দেখি বসি
সব কথা কহিয়ে তোমারে।
বসিয়া কদম্বতলে সে কানু করেছে কোলে
চুম্ব দিয়া বদন-উপরে॥ ইত্যাদি

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'
২য় সংখ্যা, ১৩২৬॥

চণ্ডীদাস-২

এতক্ষণ আমরা বাংলা ভাষায় বৌদ্ধেরা যে গান লিখিয়াছেন, সেই কথাই বলিতেছিলাম। এখন হিন্দুদিগের বাংলা গানের কথা বলিব। এই-সকল গানের প্রধান কবি, 'কবি চণ্ডীদাস'। তিনি যেমনি প্রধান, তেমনি প্রাচীন। তাঁহার গানের কথা ভালো করিয়া বুঝিতে গেলে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের কথা আগে বুঝিতে হয়। তাই আমরা এখন বিষ্ণু ও বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে দুই-চারি কথা বলিব।

বিষ্ণু বেদের দেবতা। তিনি মধ্যাহ্নকালের সূর্য। তিনি তিন পা দিয়া জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। তাঁহার এক পা উদয়াচলে, এক পা অস্তাচলে, আর-এক পা ঠিক মাথার উপরে। আমরা এখনো যে বিষ্ণুর উপাসনা করিয়া থাকি তাঁহাকে সূর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়াই উপাসনা করিয়া থাকি। পুরাণ-কর্তারা বিষ্ণুকে ত্রিমূর্তির মধ্যে স্থান দিয়াছেন। সে ত্রিমূর্তি— ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। ইঁহাদের মধ্যে বিষ্ণু পালনকর্তা, সুতরাং পৃথিবী পালনের জন্য তাঁহাকে অনেক বার অবতার হইতে হইয়াছে। যখনই যখনই প্রজা উৎপীড়িত হইয়াছে, তখনই তিনি অবতার হইয়াছেন। তাঁর অবতার অসংখ্য। তাহার মধ্যে দশটি প্রধান। এই দশের মধ্যেও আবার বরাহ, নৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণ— ইঁহাদেরই অধিক উপাসনা হয়। কৃষ্ণের উপাসনা অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। কৃষ্ণ লইয়াই মহাভারত, কৃষ্ণ লইয়াই হরিবংশ, কৃষ্ণ লইয়াই ভাগবত। কিন্তু এ সকল গ্রন্থে রাধার কথা নাই। কতদিনে যে কৃষ্ণের সহিত রাধার মিলন হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। ইংরেজি প্রথম শতকে অন্ধ্র বংশে হালা বা শালিবাহন নামে একজন রাজা হন। তিনি মহারাষ্ট্রী ভাষায় সাত শত আদিরসের গান সংগ্রহ করেন, তাহার মধ্যে রাধা ও কৃষ্ণের নাম এক জায়গায় পাওয়া যায়।[৭] তাহার পর বহু-দিন ধরিয়া রাধাকৃষ্ণের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং রাধাকৃষ্ণ প্রাচীন হইলেও, তাঁহাদের উপাসনা যে বেশি পরিমাণে প্রচলিত ছিল, বোধ হয় না।

কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ নামে একখানি আধুনিক পুরাণ আছে, এখানিতে শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদের কথা আছে। সুতরাং উহা শঙ্করাচার্যের পরের লেখা, অর্থাৎ ইংরেজি আট শত সালের পরের

লেখা। এখানি আধুনিক বলিবার আর-একটি কারণ আছে। আমাদের অষ্টাদশ মহাপুরাণ বেশ প্রাচীন, উহার মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ একখানি। নারদপুরাণে এই প্রাচীন অষ্টাদশ পুরাণের সংক্ষেপ বিবরণ দেওয়া আছে, সুতরাং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেরও বিবরণ দেওয়া আছে। কিন্তু সে পুরাণের সঙ্গে এখন যেখানি ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ বলিয়া চলিত আছে, তাহার সঙ্গে একেবারে মিল নাই। এখানি পাঁচটি খণ্ডে ভাগ করা। শেষটি শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড। উহাতে প্রথম হইতেই রাধার কথা। রাধা বৈকুণ্ঠেও বৈকুণ্ঠেশ্বরী। সেখান হইতে শ্রীদামের শাপে তাঁহাকে মানুষী হইয়া বৃন্দাবনে জন্মাইতে হয়। কৃষ্ণও তখন কংসাসুর বধের জন্য অবতার হইতেছিলেন। তাঁহাকেও যে কারণে বহু-কাল বৃন্দাবনে বাস করিতে হইয়াছিল, তাহা সকলে জানেন। এইখানে রাধাকৃষ্ণের মিলন হয়। সে মিলনও একরূপ অদ্ভুত। নন্দরাজা একদিন কৃষ্ণকে কোলে করিয়া গরু বাছুর চরাইতে মাঠে গিয়াছিলেন, হঠাৎ দেবতারা সন্ধ্যার সময় ঝড় বৃষ্টি তুলিয়া দিলেন। নন্দ মহা-ফাঁফরে পড়িলেন। ছেলে লইয়া বাড়ি ছুটিয়া যাইবেন, সে জো নাই। সব গরু বাছুর মাঠে, এদিকে ছেলেও কাঁদিয়া উঠিল। এ সময়ে নন্দ দেখিলেন, রাধা সেখানে উপস্থিত। তিনি ছোটো ছেলেটিকে রাধার কোলে দিয়া বলিলেন, তুমি একে বাড়ি পোঁছিয়া দাও। রাধা কৃষ্ণকে কোলে করিয়া বাড়ি যাইতেছেন, পথে কৃষ্ণ নিজমূর্তি ধারণ করিলেন। মনোহর যুবাপুরুষের মূর্তি ধরিয়া রাধার কাছে প্রেমভিক্ষা করিলেন। ঠিক সেই সময় ব্রহ্মা আসিয়া দুজনের বিবাহ দিয়া গেলেন। তাহার পর যা হইবার, তাহাই হইল।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের এই গল্পটি লইয়া মহাকবি জয়দেব তাঁহার গীতগোবিন্দের মঙ্গলাচরণ লিখিয়াছেন—

> মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
> র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
> ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
> রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ ॥

সুতরাং জয়দেব ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ বেশ জানিতেন। কারণ, ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণই রাধাকে প্রচার করিয়াছে এবং এ গল্পটি আর-কোথাও পাওয়া যায় না।

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথিখানি (অথবা যে বইখানি বসন্তবাবু 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' বলিয়া ছাপাইয়াছেন) মোটামুটি ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের ছাঁচে ঢালা হইয়াছে। ইহারো পালাগুলির নাম 'খণ্ড'। প্রথম পালাটির নাম 'জন্মখণ্ড'। এখানেও প্রথমেই আকাশে দেবসভা হইয়াছে। কংসের জন্য সৃষ্টি নাশ হইতেছে, সৃষ্টি রক্ষা করিতে হইবে। ব্রহ্মার কথায় দেবতারা বিষ্ণুর কাছে গেলেন, বিষ্ণু তাঁহাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া কংস বধ করিবেন, স্বীকার করিলেন এবং একগাছি কালো এবং একগাছি সাদা চুল দিয়া বলিয়া দিলেন— বসুদেবের ঘরে দৈবকীর উদরে বলরাম ও কৃষ্ণের জন্ম হইবে, তাঁহারাই কংসকে নাশ করিবেন। নারদ আসিয়া কংসকে সে কথা বলিয়া দিয়া গেলেন। কংস প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাঁহার ভগিনী দৈবকীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই, তাহাকে মারিয়া ফেলিবেন। ছ-টি শিশু মারা যাওয়ার পর, সাদা চুল দৈবকীকে দেওয়া হইল। তাঁহার গর্ভসঞ্চার হইলে, বলরাম বিমাতা রোহিণীর গর্ভে গিয়া রহিলেন, প্রকাশ করিয়া দিলেন, দৈবকীর গর্ভপাত হইয়াছে। অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়, কেমন করিয়া বসুদেব কৃষ্ণকে কোলে করিয়া লইয়া গিয়া যশোদার সদ্যোজাত মেয়েটিকে লইয়া দৈবকীর আঁতুড়ে রাখেন, সে কথা সকলেই জানেন। কংস যখন সেই মেয়েটিকে পাথরের উপর আছড়াইয়া মারিয়া ফেলে, তখন সে কন্যা আকাশে উঠিয়া কংসকে বলিয়া গেল—

তোমারে মারিবে যে।
গোকুলে বাড়িছে সে ॥

এই যে মহামায়ার কথা, ইহা কিন্তু কোনো পুরাণে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় কেবল অতি প্রাচীন ভাস [আ. খৃ. তৃতীয় শতকের শেষ বা চতুর্থ শতকের প্রথম অর্ধ] কবির 'বালচরিত্র' নামে নাটকে। চণ্ডীদাস একথা কোথায় পাইলেন, জানি না।

কৃষ্ণ যখন গোকুলে বাড়িতে লাগিলেন, তখন দেবতারা পরামর্শ করিয়া লক্ষ্মীকে বৃষভানুর কন্যা করিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইলেন এবং অভিমন্যু নামে একটা নপুংসকের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দিলেন। এই অভিমন্যুই আয়ান ঘোষ বা আইহান। একে লক্ষ্মী আসিয়াছেন, তাহাতে নপুংসকের স্ত্রী হইয়াছেন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিতে তাঁহার ধর্মমতো আর-কোনো বাধা রহিল না। রাধার শাশুড়ি রাধার মায়ের

কাছে গিয়া তাহার পিসিকে লইয়া আসিল। সে-ই রাধার অভিভাবক হইল, তাহার নাম বড়াই বুড়ি। সে-ই রাধার রক্ষণাবেক্ষণ করিত। বড়াইয়ের রূপ বর্ণনা—

শেত চামর সম কেশে।
কপাল ভাঙ্গিল দুঈ পাশে॥
ভ্রূহি চুন রেখ যেহ্ন দেখি।
কোটর বাটুল দুঈ আখি॥
মাহা পুট নাশা দণ্ডহীনে।
উন্নত গণ্ড কপোল খীনে॥
বিকট দন্ত কপট বাণী।
ওঠ আধর উঠক জিণী॥
কাঠী সম বাহু যুগলে।
নাভি মূলে দুঈ কুচ লুলে।
কুটিল গমন ঘন কাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

কাশ্মীরের কবি দামোদর ইংরেজি অষ্টম শতকে 'কুট্টনীমত' নামে একখানি বই লিখিয়াছিলেন। তাহাতে কুট্টনীর যে বর্ণনা আছে, এই বর্ণনা ঠিক সেইরূপ। মিথিলার কবি জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর[৮] 'বর্ণনরত্নাকরে'ও কুট্টনীর ঠিক এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

রাধিকার বয়স এগারো বৎসর হইলে, রাধিকার শাশুড়ি দই, দুধ, ঘি ও ঘোলেতে পসরা সাজাইয়া বড়াইয়ের সাথে রাধিকাকে মথুরার হাটে বিক্রয় করিতে পাঠান। একদিন বড়াই পথে যাইতে যাইতে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিল। রাধিকাকে দেখিতে না পাইয়া বুড়ি বড়োই ফাঁফরে পড়িল। সে বনের মধ্যে দেখিল, কাহারা গোরু চরাইতেছে। বুড়ি রাখালকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার নাতিনী রাধাকে দেখিয়াছ? কৃষ্ণই গোরু চরাইতেছিলেন, তিনি বড়াইয়ের কাছে রাধার পরিচয় লইলেন। তাহার রূপবর্ণনা শুনিলেন। তার পর বলিলেন, তুমি যদি রাধার সঙ্গে আমার ভাব করাইয়া দিতে পারো, তবে তোমাকে আমি রাধার কাছে পৌঁছাইয়া দিতে পারি। কৃষ্ণ বড়াইয়ের হাতে পান সাজিয়া দিলেন এবং রাধিকার জন্য অনেক ফুল ও ফল ভেট পাঠাইলেন

~ ~

এবং দূর হইতে দেখাইয়া দিলেন, ঐ বকুলতলাতে রাধা বসিয়া আছেন। বুড়ি সেখানে গিয়া খানিক কথাবার্তার পর কৃষ্ণের কথা তাহাকে শুনাইয়া দিলেন এবং কৃষ্ণের ভেঁট তাহাকে দিলেন।

এ বোল সুণিআঁ নাগরী রাধা
হাণএ সকল গাএ।
যত নানা ফুল পান করপুর
সব পেলাইল পাএ ॥

* * *

ঘরের সামী মোর সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর
আছে সুলক্ষণ দেহা।
নান্দের ঘরের গরু রাখোআল
তা সমে কি মোর নেহা ॥

বড়াই অনেক চেষ্টা করিল, কিছুতেই রাধাকে রাজি করিতে পারিল না, তখন কৃষ্ণ বড়াইয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, রাধাকে লইয়া বড়াই মথুরার হাটে দই দুধ বিক্রয় করিতে যাইবে এবং দান লইবার ছলে তিনি রাধিকার নিকট অনেক টাকা কড়ি চাহিবেন এবং না দিতে পারিলে একটু জোর-জবরদস্তি করিবেন। ইহার নাম 'দানখণ্ড'। এ বইয়ের দানখণ্ড খুব লম্বা। এই দানখণ্ডেই কৃষ্ণ ও রাধার কথাবার্তায় কবি বেশ বাহাদুরি করিয়াছেন। রাধিকা কৃষ্ণকে যথেষ্ট তিরস্কার করিতে লাগিলেন— আমি তোর মামি, তোর গুরু লঘু জ্ঞান নাই। আমার বয়স অল্প, আমি তোর অত খোশামুদে কথা বুঝি না— আমার স্বামী আছে, শাশুড়ি আছে, শ্বশুর আছে : আমি বড়ো ঘরের মেয়ে, বড়ো ঘরের বউ, আমি ইচ্ছা করিলে কংস রাজাকে বলিয়া দিয়া তোকে খুব জব্দ করিতে পারি। কিন্তু কৃষ্ণ কিছুতেই ছাড়িলেন না। তিনি তার দই দুধ সব ছড়াইয়া দিলেন এবং তার যত সখী ছিল, তাহাদের সকলের জন্য অনেক টাকা দান চাহিয়া বসিলেন। দান না দাও, আমি যা বলি, তাই করো। রাধিকা বড়াইয়ের কাছে নালিশ করিল। বড়াই কৃষ্ণের দিকে টানিয়াই কথা কহিল—

সকল বএসে মোর এগার বরিষে।
বারহ বরিষের দান চাহ মোরে কিসে ॥

এতেকেঁ বুঝিল তোর কাজের ভাষ ।
লোক সুণিলে তোকে হৈব উপহাস ॥ ১ ॥
পন্থ ছাড়ি দেহ কাহ্নাঞি বিরোধ না কর ।
তোর পুণে্য জাওঁ বিকে মথুরা নগর ॥ ধ্রু ॥
নাগর শেখর তোহ্মে নামে বনমালী ।
তোর যোগ নহোঁ মোঁএ আতিশয় বালী ॥
আধিক পীড়এ ষবেঁ ভুখিল ভষলে ।
তভোঁ নাহিঁ পাএ মধু কমল মুকুলে ॥ ২ ॥
বড়ার বহুআরী আহ্মে বড়ার ঝী ।
মোর রূপ যৌবনে তোহ্মাতে কী ॥
দেখিল পাকিল বেল গাছের উপরে ।
আরতিল কাক তাক ভাখিতেঁ না পারে ॥ ৩ ॥
রতি কথা সখি মুখে না শুণীলোঁ কানে ।
বারেক রাখহ কাহ্নাঞি আহ্মার সমানে ॥
চরণে ধরোঁ তোর দেব নারায়ণ ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণ কোনো কথার উত্তর না দিয়া কেবল রাধিকার রূপ বর্ণনা করিতে লাগিলেন ও তাঁহার প্রণয় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কখনো কখনো পুরাণ হইতে পরস্ত্রীগমনের কথা বলিতে লাগিলেন এবং কখনো কখনো 'আমি যে ত্রিদশের নাথ, আমি কত বড়ো বড়ো কর্ম করিয়াছি; আমি তোমার কংস রাজাকে ভয় করি না'— ইত্যাদি বলিতে লাগিলেন।

একবার রাধা বলিলেন—

সুণহ (মোর বচন) নটক টেণ্ঢন কাহ্ন
কেহ্নে কর অপমানকে বাটে ।
তোর কি বাড়িতে আছোঁ তোর কিবা ভাত খাওঁ
ন মানসি কংস রাঅ পাটে ॥

কৃষ্ণ জবাব দিতেছেন—

হই এ আহ্মে দামোদর মারিলোঁ আসুর বল
কত দাপ দেখাসসি মোরে ।

মারিবোঁ কংস আসুর তোর দাপ করোঁ চুর
দেখোঁ কে বা পাড়িঘাএ তোরে ॥

রাধার জবাব—

হঅ গরু রাখোআল বোল আকাশ পাতাল
তা সুণি কে বা পাতিআএ।
তোহ্মে বাটে মাহাদাণী মোহোঁ আইহন রাণী
বল কৈলেঁ জাণায়িবোঁ রাজাএ ॥

কৃষ্ণ বলিতেছেন—

রাধা হে তোর বলে ভাণ্ড ভাঁগিআঁ
সকল দধি খাইবোঁ আপণ ইছাএ।

দানখণ্ডে জোর-জবরদস্তি করিয়া কৃষ্ণ আপনার অভিলাষ পূরণ করিলেন। আর-একদিন রাধিকাকে নৌকায় চড়াইয়া নদীর মাঝখানে তাহার প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিলেন। রাধিকা যখন বুঝিলেন, কৃষ্ণের দশা এইরূপ, তখন তিনি একদিন রাস্তায় বসিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, আমি আর এ পসরা বহিতে পারি না, বড়াই আমার জন্য একটা মজুর আনিয়া দে। বড়াই কৃষ্ণকে আনিয়া দিল। আবার কৃষ্ণ ও রাধিকার কিছু গালাগালি হইল, কিন্তু রাধিকা কৃষ্ণকে দিয়া ভার বহাইয়া লইলেন। আর-একদিন রাধিকা ভয়ানক রৌদ্রে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া গাছতলায় বসিয়া পড়িলেন। কৃষ্ণ কী করেন, তাঁহার মাথায় ছাতা ধরিয়া তাঁহাকে বাড়ির কাছে পৌঁছিয়া দিলেন। পুস্তকের যে খণ্ডে এই-সকল ব্যাপার আছে, তাহার নাম 'ভারখণ্ড' ও 'ছত্রখণ্ড'। তাহার পর 'বৃন্দাবনখণ্ড'।

এবার রাধা বড়াইয়ের সহিত পরামর্শ করিতেছেন, কেমন করিয়া কৃষ্ণের কাছে যাওয়া যায়। বড়াই বলিল, মথুরাতে পসরা লইয়া চলো। শাশুড়ি অমনি আর যাইতে দিবে না ; তুমি এক কাজ করো, আমার সখীদের শাশুড়িদের কাছে যাও। আমার শাশুড়ির বিরুদ্ধে তাহাদিগকে খেপাইয়া দাও ; বলো, আইহনের মা রাধাকে মথুরায় যাইতে দেয় না, তাই কোনো গোয়ালিনি মথুরায় যাওয়া হয় না। তারা বড়োলোক, সব করিতে পারে ; দই দুধ না বেচিলে তোমাদের সংসার কিসে

চলিবে ?— এই কথা শুনিয়া সব বুড়ি গোয়ালিনি রাগিয়া রাধার শাশুড়ির কাছে বলিল—

তোহ্মে এবেঁ গোআলত ভৈলা বড় জাতী ।
আজি হৈতেঁ আহ্মারা হৈলাহোঁ এক মতী ॥
আপণ আপণ বহু হাটক পাঠায়িব ।
তোহ্মার ঘরত অন্ন পাণি না খাইব ॥
এ বোল সুণিআঁ ডরে আইহনের মাএ ।
প্রণাম করিআঁ বুইল তা সহ্মার পাএ ॥
কালি হৈতেঁ যাইবে রাধা মথুরা নগর ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বর ॥

পরদিন সকাল বেলা সব সখীরা একত্র হইয়া বিচিত্র সাজগোজ করিয়া—

দধি দুধ ঘৃত ঘোল সাজিআঁ পসারা ।
রাধা সঙ্গে চলি জাই হাট মথুরা ॥

* * *

ডাক দিআঁ আনায়িল বড়ায়ি করি সঙ্গে ॥
তখনে হাসিআঁ বুয়িল সহ্মাক বড়ায়ি ।
এবেঁসি নাতিনী সব মণে সুখ পাই ॥
নানা ফুল ফুটিলছে মাঝ বৃন্দাবনে ।
তাক পিন্ধি মথুরাক করিউ গমনে ॥

রাস্তায় যাইতে যাইতে বড়াই বলিতে লাগিল, কানাই এখন বড়ো ভালো ছেলে হইয়াছে। সে আর বাটদান, হাটদান ঘাটদান কিছুই চাহে না। কেবল লোকের উপকার করে। যে-সব লোক হাটে যায়, তাহাদের ফুল ফল দিয়া সন্তুষ্ট করে এবং সঙ্গে করিয়া যমুনার ধারে পৌঁছিয়া দেয়। অতএব তোমরা তাহাকে আর ভয় করিও না। সে এখন বড়ো ভালো লোক হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া সব গোয়ালিনির ইচ্ছা হইল, বৃন্দাবনের ফুল ফল কিছু ভোগ করে—

বৃন্দাবনের ফুলে সহ্মার হইল আশ ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥

সময়টা বসন্তকাল। মলয় পবন বহিতেছে, কিন্তু বৃন্দাবনে সব ঋতুই বিরাজ করিতেছেন, সকল ঋতুর ফুলই সেখানে আছে। সম্বৎসরের যত ফল ফুল— সবই বৃন্দাবনে পাওয়া যায়। গোয়ালিনিরা সেই ফুলের লোভে সব বৃন্দাবনের দিকে চলিয়া গেল। কৃষ্ণ রাধাকে দেখিয়াই বলিলেন—

শপথ করিআঁ রাধা বোলোঁ এ বচনে।
তোহ্মার আন্তরে কৈলোঁ এ বৃন্দাবনে॥
এক ঠাঁয়ি থুয়িআঁ রাধা মাথার পসার।
ফুল পহু ফল খাঅ ত্রিভুবনে সার॥

রাধা বলিলেন— আমি তো আসিয়াছি, আমার সঙ্গে অনেক সখী আসিয়াছে। তুমি ইহাদিগকে সন্তুষ্ট করো। ইহারা যেন আমার নিন্দা করিতে না পারে।

সামী সাসু দুইহো খরতর।
আর খল সকল নগর॥
সব তোর মোর দোষ চাহে।
তেঁসি মোর মন থীর নহে॥
তোর মনে হেন পড়িহাসে।
ফুল ফলের দিআঁ আশে॥
সখিগণ নেহ চারি পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

কৃষ্ণ বলিলেন— তুমি ঠিক বলিয়াছ; আমার মনের কথা টানিয়া বলিয়াছ।

ষোল সহস্র তোর সখিগণ।
সভ্মার তোষিব আহ্মে মন॥
রাধাল।
করিআঁ বিবিধ তনু আহ্মে দেবরাজে।
বিলসিবোঁ গোপী সমাজে॥

এই বলিয়া কৃষ্ণ সকল সখীদের কাছে বলিলেন— এই তোমাদের অভয় দিলাম, তোমরা যত পারো ফুল ছেঁড়ো, ফল খাও। যখন

দেখিলেন, ফুল উঁচায় রহিয়াছে, একজন পাড়িবার চেষ্টা করিতেছে—পারিতেছে না, তখন তিনি তাহাকে কোলে লইয়া উঁচু করিয়া ধরিলেন, সে আপন হাতে ফুল পাড়িয়া ভারি খুশি হইল। গোপীরা যে যেখানে বেড়াইতেছে, কৃষ্ণ তাহাদের কাছে গিয়া তাহাদের সহিত নানা রসরঙ্গ করিতে লাগিলেন।

খণেক গুণিল কাহ্নে।
ষোল সহস্র গোপী তোষিবোঁ কেমনে ॥
আনেক হয়িআঁ তখনে।
বিলসিল গোপীগণে।
যাহারে রমএ সেসি দেখে কাহ্নে ॥

ইহারই নাম রাস। চণ্ডীদাস রাস শব্দটি ব্যবহার করেন নাই। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ সে শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন এবং জাঁকালো রাসমণ্ডপ করিয়া সেখানে কৃষ্ণকে কেলি করাইয়াছেন। কৃষ্ণ কায়ব্যূহ রচনা করিয়া গোপীগণের সহিত কেলি করিলেন।

কিন্তু কৃষ্ণ হঠাৎ দেখিলেন, রাধিকা নিকটে নাই। তখন তিনি সব দেহ সংহার করিয়া আবার এক কানাই হইয়া গোপীগণকে ছাড়িয়া রাধিকার কাছে গেলেন। রাধিকা গোপীগণের প্রতি স্নেহ দেখিয়া মান করিয়া বসিয়াছেন। কৃষ্ণ যাইবামাত্র তিনি বলিলেন—

ভাল উপদেশ দিলোঁ মো তোরে
আপণার মতিমোষে।
এখণে তাহার ফল ভুঞ্জোঁ মোএ
আপণে আপণ দোষে ॥

* * *

যে পর পুরুষ সমে নেহ করে
তার হএ হেন গতী।
দৈব দোষে কাহ্ন তোহ্মাত ভজিলোঁ
বাণ্ডিলোঁ আপণ পতী ॥
যেহেন বাহির তেহেন ভিতর
সরূপেঁ জাণিলোঁ তোরে।

শপথ করিআঁ বুইলোঁ মো তোরে
না জায়িবোঁ তোহোর পাশে।
তোহ্মার চরিত্র দেখিআঁ কাহ্নাঞি
কে নাহিঁ উপহাসে ॥

এ কথা শুনিয়া কৃষ্ণের বড়ো ভয় হইল। তিনি রাধিকার মান ভঞ্জনের জন্য বলিতে লাগিলেন—

যদি কিছু বোল বোলসি তবেঁ
দশন রুচি তোহ্মারে।
হরে দুরুবার ভয় আন্ধকার
সুন্দরি রাধা আহ্মারে ॥
তোহ্মার বদন সংপুন চান্দ
আধর আমিআঁ লোভে।
পরতেখ তোর নয়ন চকোর
যুগল নিশ্চল শোভে ॥
মদন বাণে দগধ ভৈলোঁ
তোর অকারণ মাণে।
বদন কমল মধুপান দিআঁ
রাখহ মোর পরাণে ॥
যবেঁ সতোঁ কোপ কয়িলেঁ
তবেঁ মোরে হান নয়ন বাণে।
দৃঢ় ভুজযুগেঁ বন্ধন করিআঁ
অধর দংশ দশনে ॥
তোহ্মে সে মোহোর রতন ভূষণ
তোহ্মে সে মোহোর জীবনে।
এহা বুঝি রাধা মোরে দয়া কর
খুলি তেঁ আতি যতনে ॥
তোহ্মার নয়ন মলিন নলিন
আধরে কোকনদ রূপে।
মদন বাণে কৃষ্ণক রঞ্জিলেঁ
হএ তোর আনুরূপে ॥

এ তোর কুচ শোভে মণি (মাল)
জঘনে নাদ করউ রসনে।
বোল হৃদয়ত করোঁ মো তোহোর
থল কমল চরণে ॥
মদন গরল খণ্ডন রাধা
মাথার মণ্ডন মোরে।
চরণ পল্লব আরোপ রাধা
মোর মাথার উপরে ॥
পালাউ আহ্মার মদন বিকার
সত্বরেঁ করহ আদেশে।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥

কৃষ্ণ পায়ে ধরিলেন, কিন্তু তাহাতেও রাধার মান ভাঙিল না। তখন কৃষ্ণ তাহাকে ভয় দেখাইতে লাগিলেন, তোমার সখীরা আমার বৃন্দাবনের সব গাছ ভাঙিয়াছে, ডালপালা ভাঙিয়াছে ; আমি তোমার কাছ হইতে ইহার দাম তুলিয়া লইব।

রাধা বলিলেন— বাঃ, তুমি খোশামোদ করিয়া আমাকে এখানে আনিলে, সখীদের বন দেখাইলে ; তাহাদের অভয় দিলে— এখন তুমি আমার কাছে দাম চাও ? এ তোমার বড়ো কুচরিত !

কৃষ্ণ বলিলেন— আমি তোমায় আনি নাই। তুমি রাজপথে মথুরায় যাইতেছিলে, অস্তব্যস্ত হইয়া আমার বৃন্দাবনে কেন আসিলে ? আর আমার এই ক্ষতি করিলে ? আমি অনেক যত্নে বৃন্দাবন তৈরি করিয়াছি, সব নষ্ট করিয়া দিলে ! এইরূপ কচাল করিতে করিতে অনেকক্ষণে রাধার মান ভাঙিয়া গেল, রাধাকৃষ্ণের আবার মিলন হইল। দুই জনে নানারূপ কেলি করিতে লাগিলেন।

ইহার পর 'কালিয়দমনখণ্ড'। এ খণ্ডে রাধার কথা নাই। তাহার পর, 'যমুনাখণ্ডে' জলকেলি, তার পর 'হারখণ্ড', 'কৃষ্ণ রাধিকার হার ছিঁড়িয়া দিয়াছিলেন, রাধিকা যশোদার কাছে গিয়া নালিশ করিলেন। তাহার পর 'বাণখণ্ড'। মায়ের কাছে নালিশ করায় কৃষ্ণের রাগ হইয়াছে, তাই তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, রাধাকে পায়ে ধরাইব, তবে

ছাড়িব। শেষে হইলও তাই। তাহার পর 'বংশীখণ্ড'। কৃষ্ণের বাঁশি রাধা চুরি করিলেন এবং অনেকক্ষণ 'চুরি করি নাই' বলিলেন, তার পর বাঁশি দিয়া তাঁহার সহিত ভাব করিলেন। তার পর, রাধার বিরহ। কৃষ্ণ এখন বেশ জুত পাইয়াছেন, তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর রাধাকে চাই না। রাধিকার বড়ো অনুতাপ হইল, তিনি বলিলেন—

শিশুকালে আহ্মে মতি ভোলে।
বড়ায়ি না লয়িলোঁ কাহ্নের তাম্বুলে।
এবেঁ আহ্মার মন মজিল বাল গোপালে॥
তোহ্মে যাত্রা কর শুভক্ষণে।
বড়ায়ি ঝাঁট চল কাহ্নাঞি'র থানে।
বিনয় বচনে তোষিআঁ কাহ্নাঞি' আন মোর থানে॥
দূতী বোল গিআঁ কাহ্নের থানে।
বারেক দয়া করী মোরে দেউ দরশনে॥

দূতী বলিলেন—

গরবেঁ না তুষিলেঁ হরী।
পাছু না গুণিলী আছিদরী॥
বড় রোষ তার মনে জাগে।
এহা শুণী না মারে মোকে বড় ভাগে॥

বড়াইর অনুরোধে অনেক কষ্টে কৃষ্ণ একবার দেখা করিতে রাজি হইলেন। তিনি রাধাকে আসিতে বলিলেন। রাধা আসিলে দুই জনে কেলি করিলেন। তার পর, কৃষ্ণের ঊরুর উপর মাথা রাখিয়া রাধা ঘুমাইয়া পড়িলেন। কৃষ্ণ এই সুযোগে রাধার মাথাটি নামাইয়া রাখিয়া সরিয়া পড়িলেন। ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া রাধা দেখিলেন, কৃষ্ণ নাই। তিনি বিলাপ করিতে লাগিলেন; বার বার বড়াইকে পাঠাইতে লাগিলেন, কিন্তু কৃষ্ণের আর উদ্দেশ পাওয়া গেল না। বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তন শেষ হইয়া গেল।

এই বইখানি যদিও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের ছাঁচে ঢালা, কিন্তু কৃষ্ণের জীবন সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্তের সঙ্গে ইহার অনেক তফাত। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে রাধা বৈকুণ্ঠেই ছিলেন, বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রীদামের শাপে তিনি

পৃথিবীতে আসেন। কৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হইলে, ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাদের বিবাহ দিলেন। আয়ান ঘোষের নাম ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে নাই, পুরাণকারেরা এই-সকল কথা লিখিয়া কৃষ্ণরাধার প্রেমটা দম্পতী-প্রেমরূপেই দেখাইয়া গিয়াছেন। সর্ব অংশেই বামনাইটা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

বড়ু চণ্ডীদাসের বইয়েও সব দিক রক্ষা করিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে বামনাই করিয়া নয়। নারায়ণ যেমন দুই গাছি চুল দিয়া বলিলেন, আমি যখন কৃষ্ণ ও বলরাম রূপে অবতার হইব, অমনি দেবতারা সাধ্যসাধনা করিয়া লক্ষ্মীকেও পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিলেন, সেই লক্ষ্মীই রাধা। কবি তাঁহাকে আইহনের সঙ্গে বিবাহ দিলেন। আইহন নপুংসক। সুতরাং—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।

পতি ক্লীব, সুতরাং রাধা অনায়াসেই অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারেন। কবি তাঁহাকে কৃষ্ণের হাতে অর্পণ করিয়া ধর্মটা কোনো রূপে বজায় রাখিলেন।

রাধাকৃষ্ণের প্রথম মিলন পুরাণের মতে নন্দ রাজা করাইয়া দেন। কিন্তু বড়ু বড়াইয়ের হাতে পান ও ফুলের ডালি দিয়া কৃষ্ণই যে মিলনের জন্য ব্যাকুল, তাহা দেখাইয়াছেন। রাধিকা প্রথম সে পানডালা ফেলিয়া দিলেন, বড়াইকে এক চড়ও মারিলেন। কিন্তু বড়াই তাঁর মায়ের পিসি, সুতরাং বড়াইকে তাড়াইতে পারিলেন না। ক্রমে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

পুরাণের মতে কৃষ্ণরাধিকা দেবতা। তাঁহাদের সব কার্যই শাস্ত্রসঙ্গত ও দেবতাদের মতোই জাঁকালো। বড়ু চণ্ডীদাসের মতে একজন গোয়াল, আর-একজন গোয়ালিনি। গোয়ালিনি মথুরার হাটে দই দুধ বিক্রয় করিতে যায়, আর কৃষ্ণ তাহা কাড়িয়া খান আর রাধিকার উপর নানারূপ অবৈধ উৎপীড়ন করেন। দুজনেরই কথাবার্তা, ভাবভঙ্গি, মতিগতি গোয়ালাদেরই মতো। তাঁহারা যে ঝগড়া করেন, সেও গোয়ালাদের মতো।

পুরাণের রাস খুব জাঁকালো। কিন্তু রাসের আগেই বস্ত্রহরণ। বড়ু চণ্ডীদাসে রাসের পর কালিয়দমন, যমুনাখণ্ড বা জলকেলি ও বস্ত্র-

হরণ। পুরাণের রাস এইরূপে আরম্ভ হয়— গোপীরা সকলে মিলিয়া কৃষ্ণকে পতি পাইবার আশায় পার্বতীর পূজা করে। পার্বতী বর দেন, তিন মাস পরে মধুমাসে শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকা ও গোপীদের সঙ্গে রাসলীলা করিবেন। কৃষ্ণ এই তিন মাস ধরিয়া রাসমণ্ডপ খুব করিয়া সাজাইলেন। গোপীরা কুলধর্ম ত্যাগ করিয়া, নিঃশঙ্ক ও কামমোহিত হইয়া রাসমণ্ডে গমন করিল। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে সন্তুষ্ট করিয়া, রাধিকাকে সঙ্গে লইয়া রাসমণ্ড ত্যাগ করিলেন এবং ভারতবর্ষের সমস্ত দেশ রাধিকাকে লইয়া ভ্রমণ করিলেন ও সেখানে বিহার করিলেন। সকলের শেষে মলয় পর্বতের উপরে গিয়া রাধাকে নানারূপ আধ্যাত্মিক উপদেশ দিতে লাগিলেন।

বড়ু চণ্ডীদাসের রাস— রাসই নয়। তিনি রাস শব্দই ব্যবহার করেন নাই। সেটা একটা গয়লা-গয়লানির ব্যাপার। তাহা পূর্বেই বর্ণনা করিয়াছি। পুরাণে রাসের মধ্যে মান নাই, কিন্তু চণ্ডীদাসে মান কিছু চড়া। রাধিকা নিজেই বলিলেন, আমার শাশুড়ি দুরন্ত : আমার স্বামী দুরন্ত : তোমার আমার কুৎসা পাইলে লোকে আর-কিছু চায় না। সুতরাং তুমি আমার সখীদের আগে ঠাণ্ডা করো, সন্তুষ্ট করো : তাহাদের অভিলাষ পূরণ করো। কৃষ্ণ যখন তাহা করিলেন, তখন রাধিকা ভাবিলেন, ভালোরে ভালো, আমি স্বামী ছাড়িয়া কৃষ্ণের কাছে আসিলাম, আর তাহার এই ব্যবহার। সে আমার সামনে আর পাঁচ জনকে লইয়া কেলি করিতে লাগিল। যাক, আমি কৃষ্ণকে চাই না। কৃষ্ণ অনেক স্তব স্তুতি করিলেন, পায় ধরিলেন : তাহাতে হইল না। কিন্তু যখন বলিলেন, তোর সখীরা বৃন্দাবন ভাঙিয়াছে, তোকে দাম দিতে হইবে, নহিলে তোকে বাঁধিয়া রাখিব, তখন রাধিকা ঝগড়ায় হারিয়া কৃষ্ণের কথায় রাজি হইলেন।

জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' আরম্ভ হইয়াছে বসন্তবর্ণন লইয়া। তাহার পরে গোপীদের সহিত রাস। তাহা দেখিয়া রাধিকার মান। উভয় পক্ষে দূতী পাঠানো। কৃষ্ণ রাধিকাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রাধিকা অত্যন্ত দুর্বল, আসিতে পারিলেন না। কৃষ্ণই আসিলেন এবং তাঁহার স্তব স্তুতি করিয়া পায় ধরিয়া, তাঁহার মান ভঞ্জন করিলেন।

জয়দেবের যতগুলি গীত আছে, এই পায়েধরার গীতটিই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী—

অত্রান্তরে মসৃণরোষবশামসীম-
নিঃশ্বাসনিঃসহমুখীং সুমুখীমুপেত্য ।
সব্রীড়মীক্ষিতসখীবদনাং প্রদোষে
সানন্দগদ্‌গদপদং হরিরিত্যুবাচ ॥

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরং ।
স্ফুরদধরসীধবে তব বদনচন্দ্রমা
রোচয়তি লোচনচকোরং ॥
প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানং ।
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসং
দেহি মুখকমলমধুপানং ॥
সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী
দেহি খরনয়নশরঘাতং ।
ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনং
যেন বা ভবতি সুখজাতং ॥
ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নং ।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতিযত্নং ॥
নীলনলিনাভমপি তন্বি তব লোচনং
ধারয়তি কোকনদরূপং ।
কুসুমশরবাণভাবেন যদি রঞ্জয়সি
কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপং ॥
স্ফুরতু কুচকুম্ভয়োরুপরি মণিমঞ্জরী
রঞ্জয়তু তব হৃদয়দেশং ।
রসতু রসনাপি তব ঘনজঘনমণ্ডলে
ঘোষয়তু মন্মথনিদেশং ॥

স্থলকমলগঞ্জনং মম হৃদয়রঞ্জনং
জনিতরতিরঙ্গ পরভাগং।
ভণ মসৃণবাণি করবাণি চরণদ্বয়ং
সরসলসদলক্তকরাগং ॥
স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারং।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনানলো
হরতু তদুপাহিতবিকারং ॥

ইহার পর সখীরা আসিয়া রাধিকার মান ভঞ্জন করিয়া দিল ও তাঁহাদের মিলন হইল।

পূর্বেই বলিয়াছি, জয়দেব ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের কথা জানিতেন। তাঁহার মঙ্গলাচরণ শ্লোকের ভাব তিনি ঐ পুরাণ হইতেই লইয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে মান নাই। মানভঞ্জনও নাই। জয়দেব এ মান-ভঞ্জনের কথা পাইলেন কোথায়? বলিবে তাঁহার নিজের রচনা। কিন্তু নিজের রচনা হইলেও ইহার মূল তো কোথাও আছে। বোধ হয়, বড়ু চণ্ডীদাসের বৃন্দাবনখণ্ডই তাহার মূল। বড়ু চণ্ডীদাসের বইখানি কৃষ্ণের ইতিহাস। তাঁহার জন্ম হইতে রাধিকার বিরহ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে; বাকি কতদূর ছিল, জানি না। কিন্তু জয়দেবের গীতগোবিন্দে রাস, মান ও মানভঞ্জন, বড়ু চণ্ডীদাসের বৃন্দাবনখণ্ড মাত্র। দুইয়েরই আরম্ভ বসন্ত-বর্ণন লইয়া। তাহা হইলে কি মনে হয় না যে, জয়দেব এই মানের কথা বড়ু চণ্ডীদাসের বই হইতে লইয়াছেন? তিনি উচ্চ অঙ্গের কবি, সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত; বড়ু একজন ভাষা-কবি। বলিতে গেলে এক-রকম মেঠো কবি। জয়দেব লক্ষ্মণ সেনের পঞ্চরত্নের এক রত্ন। তিনি রাজকবি। বড়ু চণ্ডীদাস সাধারণ লোকের জন্য পাঁচালি ও গীত লিখিয়াছেন। জয়দেব চণ্ডীদাসের গোয়াল-গোয়ালিদের যে-সমস্ত ব্যাপার আছে, সব নিঃশব্দে ছাড়িয়া দিয়াছেন। তিনি একজন বড়ো কবি, পরের জিনিস ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া অলংকারশাস্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কেমন করিয়া কাব্য লিখিতে হয়, ঠিক জানেন। তাই ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও বড়ু চণ্ডীদাস, এই দুই জনকে ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া গীতগোবিন্দ লিখিয়া-ছেন। জয়দেবের "বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী" এই গানটির

সহিত বৃন্দাবনখণ্ডের "যদি কিছু বোল বোলসি তবেঁ দশনরুচি তোম্ভারে" এই গানটি মন দিয়া তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, চণ্ডীদাসের গানটি জয়দেব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কেন-না, জয়দেবের অমন অলোকসামান্য গানের পর চণ্ডীদাস ওরূপ গান লিখিতে কখনোই সাহস করিবেন না। জয়দেব আরো অনেক জায়গায় চণ্ডীদাসের গানের পাপাড়িগুলি লইয়া অলৌকিক সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। সে সৃষ্টির পর ওরূপ পাপাড়িগুলি কোনো কবিই সাহস করিয়া লিখিতে পারেন না।[৯]

বসন্তবাবু বড়ু চণ্ডীদাসের পুথি ছাপাইয়াছেন ['শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', ১৩২৩ ব.] এবং ছাপাইবার জন্য বেশ খাটিয়াছেন। নিজের মত কোনো জায়গায় জাহির করিবার চেষ্টা করেন নাই; অন্তত তাহা লইয়া বাড়াবাড়ি কিছু করেন নাই। বড়ু চণ্ডীদাসের পুথিখানির হাতের লেখা ১৩০০ হইতে ১৪০০ ইংরেজি সনের। এবিষয়ে দুই মত নাই। রাখালবাবুও স্বীকার করিয়াছেন, ১৪ শতকের লেখা; আরো সকলে স্বীকার করিয়াছেন। ১৪ শতকের শেষার্ধে বাংলায় কতকটা শান্তি থাকিলেও ১২০০ হইতে ১৩৫০ পর্যন্ত এখানে কিছুমাত্র শান্তি ছিল না। আমরা এ পর্যন্ত এই ১৫০ বছরের হাতে লেখা সংস্কৃতই হউক বা বাংলাই হউক, কোনো পুথিই আজও পাই নাই। এই ঘোর অরাজকের সময় যে বড়ু চণ্ডীদাস বসিয়া এত বড়ো একখানা বই লিখেবেন, এ কথা আমি তো বিশ্বাস করিতে পারি না। তাই আমার মনে হয়, বইখানা হিন্দু আমলের রচনা। বোধ হয়, লক্ষ্মণ সেনের সময়ই এই বইখানি রচিত হইয়াছিল। সে সময়ে বৈষ্ণবধর্ম লইয়া বাংলায় একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। তাই শৈব বল্লাল সেনের ছেলে লক্ষ্মণ সেন বৈষ্ণব হইয়া গেলেন এবং বৈষ্ণব কবি জয়দেবকে খুব আদর করিলেন। কাশ্মীর দেশের একখানি জয়দেবের পুথিতে লেখা আছে— লক্ষ্মণ সেনই জয়দেবকে 'কবিরাজ' এই আখ্যা দিয়াছিলেন। জয়দেব যখন গীতগোবিন্দ লেখেন, তখন তাঁহাকে তাঁহার পূর্ববর্তী বৈষ্ণবের বই-সকল পড়িতে এবং আয়ত্ত করিতে হইয়াছিল— সে পুথি বাংলাতে হউক বা সংস্কৃতেই হউক। পূর্বেই দেখানো হইয়াছে, তিনি কতক লইয়াছেন ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ হইতে আর কতক লইয়াছেন, বড়ু চণ্ডীদাসের পুস্তক হইতে। বলিবে, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে যে-সব কথা নাই, বড়ু চণ্ডীদাস সে-

সব কথা পাইলেন কোথায় ? তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, সে কালে বাংলাদেশে কৃষ্ণরাধা সম্বন্ধে নানারূপ কথা প্রচলিত ছিল। চণ্ডীদাস সেগুলি সব লইয়াছেন। কারণ, তাঁহার শ্রোতা সাধারণ বাঙালি। সংস্কৃতে বিশেষ বিজ্ঞ নহেন। পুরানো বামনাইয়ের দিক হইতে তার অনেক ছাঁটিয়া ফেলিয়াছেন, জয়দেবও সংস্কৃতকবির দিক হইতে তাহার অনেক ছাঁটিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু সেগুলি পূর্ণমাত্রায় আছে— বড়ু চণ্ডীদাসের পুথিতে।

এ দেশের লোকের সংস্কার যে, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের পূর্বে রাধার নাম কোথাও পাওয়া যায় না। সে সংস্কারটি ভুল। পূর্বেই বলিয়াছি, হাল সপ্তশতীতে রাধার নাম আছে এবং সেখানে কৃষ্ণের নামও আছে। উহার ৮৯ শ্লোকে আছে—

> "মুহমারুএণ তং কণ্‌হ গোরঅং রাহিআএ অবণেন্তো।
> এতাণং বল্লবীণং অণ্ণাণং বি গোরঅং হরসি॥"

গাথাসপ্তশতী, ১।৮৯

ইহার সংস্কৃত ব্যাখ্যা— মুখমারুতেন ত্বং কৃষ্ণ গোরজং (-চক্ষুরাগঃ) রাধিকায়া অপনয়ন্। এতাসাং বল্লবীনামন্যাসামপি গৌরবং হরসি। সৌভাগ্যগর্ব্বখণ্ডনাৎ।

রাধার চক্ষে গোরুর পায়ের ধুলা লাগিয়াছে। কৃষ্ণ ফুঁ দিয়া সেই ধুলা বাহির করিয়া দিলেন। তাহাতে এই-সমস্ত গোপী এবং অন্য যে-সকল আছেন, তাঁহাদের সৌভাগ্য-গর্ব নষ্ট হইল।

সুতরাং এখানে কৃষ্ণ-রাধার প্রেমের কথাই বলা হইল; কতকটা রাসের কথাও বলা হইল। 'এই-সকল গোপীর' অর্থাৎ যাহারা কৃষ্ণ-রাধার সম্মুখে ছিল; ইহা হইতে বোধ হইতেছে, কৃষ্ণ অনেকগুলি গোপী লইয়া ক্রীড়া করিতেছিলেন, এমন সময় সেখান দিয়া কতকগুলি গোরু চলিয়া যায় তাহাতে রাধার চোখে ধুলা পড়ে। কৃষ্ণ আদর করিয়া নিজের মুখে ফুঁ দিয়া সে ধুলা ঝাড়িয়া দেন। তাহাতে 'অন্য গোপীদের' আমি কৃষ্ণের বড়ো প্রিয়া বলিয়া যে অভিমান ছিল, সে অভিমানটা কাটিয়া যায়। সুতরাং বলিতে হইবে, সেখানে অনেকগুলি গোপী ছিল এবং কৃষ্ণ সকলকে লইয়াই কেলি করিতেছিলেন।

পণ্ডিতেরা বলেন, এ বইখানি ইংরেজি ৬৯ সালের লেখা। সে সময়

হইতেই তাহা হইলে কৃষ্ণরাধার প্রেমের কথা চলিয়া আসিতেছিল এবং বোধ হয়, রাসের কথাও চলিয়া আসিতেছিল। এই-সকল কথা ক্রমে ১২ শতক পর্যন্ত খুব বিস্তার হইয়া পড়ে। বড়ু চণ্ডীদাস সেগুলিকে জড়ো করিয়া তাঁহার বই লেখেন এবং বড়ু চণ্ডীদাসের বই হইতে জয়দেব রাস এবং মানের কথা পান।

এতদিন পর্যন্ত আমরা জানিতাম, চণ্ডীদাস নামে একজন কবি ছিলেন। তাঁহার বাড়ি নান্নুরে। নান্নুর বীরভূম জেলায়। তিনি কবি, বামুনের ছেলে। তিনি বাশুলি দেবীর পূজারী। বাশুলি তাঁহাকে বলিয়া যান, তুমি রামী রজকিনীর সহিত প্রেম করো, নহিলে তোমার সিদ্ধিলাভ হইবে না। রজকিনী মন্দিরের পোটলি ছিল, অর্থাৎ মন্দির ঝাঁট-ঝুঁট দিত।

বিদ্যাপতির সাথে চণ্ডীদাসের দেখা হইয়াছিল। দুজনেই দুজনার কবিত্বে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। যখন তাঁহাদের দেখা হয়, তখন চণ্ডীদাসের বয়স বেশি ; বিদ্যাপতির বয়স অল্প। চৌদ্দ শতকের মাঝখান হইতে পনের শতকের মাঝখান পর্যন্ত চণ্ডীদাসের সময়। যাঁহারা চণ্ডীদাসের পদাবলী ছাপাইয়াছেন, তাঁহারা ইহার মধ্যে অনেক কথাই মিছা বলিয়াছিলেন। নীলরতনবাবু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পরস্পরের দেখাশুনার কথা উড়াইয়াই দিয়াছেন। তাঁহার মনের ভাব এই— চণ্ডীদাস তো এ কথা বলেন না, বিদ্যাপতিও এ কথা বলেন না। বলেন, তাঁহাদের চারি শত বৎসর পরের নরহরি দাস ও বৈষ্ণব দাস। সুতরাং উহাতে বিশেষ আস্থা করিবার কোনো কারণ নাই। ভুল বলিবার আরো এক বিশেষ কারণ আছে। চণ্ডীদাস যদি বিদ্যাপতির সহিত দেখা করিতে যান, তিনি পশ্চিম-মুখে যাইবেন এবং বিদ্যাপতি পূর্ব-মুখে আসিবেন। তাহা হইলে গঙ্গাতীরে দেখা হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই, গঙ্গা নান্নুর হইতে পুবে। সুতরাং ও কথাটা অগ্রাহ্য। নান্নুরে যে চণ্ডীদাসের বাড়ি, তাহারো কোনো প্রমাণ নাই। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলার বইয়ে সে কথা নাই। নীলরতনবাবু যে চণ্ডীদাসের পদাবলী ছাপাইয়াছেন, তাহাতেও সে কথা নাই ; আছে, নীলরতনবাবুর 'রাগাত্মিক' পদাবলীর মধ্যে। নীলরতনবাবু সেগুলিকে 'রাগাত্মিক' বলিয়াছেন, কিন্তু সেগুলিতে রাগরাগিণীর উল্লেখ নাই।

সেগুলিকে কতদূর প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, আমি জানি না। সেগুলির ভাষা, ভাব-ভঙ্গি দেখিলে মনে হয়, বড়োই একেলে। সেগুলিকে যদি অগ্রাহ্য করি, তাহা হইলে এদেশে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে যে-সকল কথা প্রচলিত আছে, তাহার একটিও টিকে না। নান্নুরও টিকে না, রামী রজকিনীও টিকে না। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তন পুথিখানার বয়স ১৩০০ হইতে ১৪০০। না-হয় এই ১০০ বছরের শেষা-শেষি হইবে। চণ্ডীদাস ১৩৫০ হইতে ১৪৫০ পর্যন্ত যদি বাঁচিয়া থাকেন, তবে এই পুথি কি তাঁহার জন্মের পূর্বে লেখা হইয়াছিল; না, ওখানি তিনি নিজে লিখিয়াছিলেন? পূর্বে লেখা তো সম্ভবই নয়, তাঁহার নিজের হাতের লেখা বলিয়াও তো বোধ হয় না। তার পর আর-এক কথা, এক চণ্ডীদাস কৃষ্ণলীলার জন্য দুখানা পুস্তক লিখিবেন কেন? একখানা ছাপিয়াছেন বসন্তবাবু, আর-একখানা ছাপিয়াছেন নীলরতনবাবু। একই বিষয়ের বই, অথচ কোথাও কিছু মেলে না কেন? একখানার ভাষা বড়োই পুরানো, আর-একখানার বড়োই নূতন। একখানাতে চণ্ডীদাস আপনাকে বড়ু চণ্ডীদাস বা শুধু চণ্ডীদাস বলিয়াছেন, আর-একখানায় তিনি নিজেকে দ্বিজ চণ্ডীদাসই বলিয়াছেন —কখনো কখনো শুধু চণ্ডীদাসও আছে। এক জায়গায় কবি চণ্ডীদাস বলিয়াছেন, দশ-বারো জায়গায় বড়ু চণ্ডীদাসও বলিয়াছেন। কিন্তু আসল বড়ু চণ্ডীদাসের বইয়ের গানের সঙ্গে একটি গানও মেলে না। ইহার অর্থ কী? চণ্ডীদাস দুজন না হইলে ইহার সামঞ্জস্য হয় না।

বড়ু চণ্ডীদাসের রাগিণীগুলি সব পুরানো, তাহার অনেকগুলি 'বৌদ্ধগান ও দোহায়' আছে। আবার অনেকগুলি জয়দেবেও আছে। দ্বিজ চণ্ডীদাসের রাগরাগিণীগুলি প্রায়ই নূতন। দু-চারটি যে পুরানো নাই, তাহা নহে, কতকগুলি আবার বড়োই বেশি নূতন। ইহারই বা অর্থ কী? দুই জন চণ্ডীদাস স্বীকার না করিলে ইহার সামঞ্জস্য হয় না। ভাষার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলেও দুজন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এক চণ্ডীদাসকে ভাঙিয়া দুই করিতে বাঙালি কি রাজি হইবেন? বড়ু চণ্ডীদাস বলিতেছেন, আমার নাম অনন্ত, দ্বিজ চণ্ডীদাস তাঁহার ৭৬৩ কৃষ্ণলীলার পদে এক জায়গায়ও অনন্তের নাম করেন নাই। বড়ু চণ্ডীদাস আবার কোথাও রামী রজকিনীর নাম করেন

নাই। পদ দুজনারই, দুজনেই গান লিখিয়াছেন। একজন কৃষ্ণলীলার জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া কতদূর লিখিয়াছেন, বলিতে পারি না। কিন্তু তাঁহার 'জন্মখণ্ডে' ও 'কালিয়দমনখণ্ডে' রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের কথা নাই। কিন্তু সে প্রেম ছাড়া নীলরতনবাবুর একটি পদও নাই। বড়ু চণ্ডীদাস গানে গানে কৃষ্ণের সব কথাই লিখিয়াছেন। গানের মধ্যে তিনি যে পূতনা বধ করিয়াছিলেন, যমলার্জুন বধ করিয়াছিলেন, শকটাসুর বধ করিয়াছিলেন— সে সব কথা আছে। তিনি যেন গান সঞ্চয় করিয়া কৃষ্ণের একটি ইতিহাস লিখিয়াছেন। নীলরতনবাবুর বইখানি কতকটা কীর্তনের ছাঁচে ঢালা। তাঁহার চণ্ডীদাস ইতিহাসের কথা বলেন না। কেবল প্রেম, আর কেবল রাধা। এ ভেদ হইবার কারণও বোধ হয়, চণ্ডীদাস দুই জন। একজনের সময় এ ধরনের কীর্তন আরম্ভ হয় নাই। আর-একজনের সময় কিছু কিছু আরম্ভ হইয়াছে। চৈতন্যদেবের মৃত্যুর কিছু দিন পরে জীব গোস্বামী [রূপ গোস্বামী] 'উজ্জ্বল-নীলমণি' নামে একখানি অলংকারের বই লেখেন, সেই সময় হইতেই রাগ, রস, ভাব লইয়া কীর্তন আরম্ভ হয়। বড়ু চণ্ডীদাস ইহার অনেক আগে। তাঁহার পুঁথিতে রাগ, রস, ভাব লইয়া গান বা পদ সাজাইবার কোনো চেষ্টা নাই। যে-সব চণ্ডীদাসের পদ নীলরতনবাবু ছাপাইয়াছেন, তাহাতে কতক কতক সে ভাবে সাজাইবার ব্যবস্থা ছিল। নীলরতনবাবু কিন্তু নূতন কীর্তনের ধরনে সেগুলি সাজাইয়াছেন। রসাস্বাদনের পক্ষে বেশ হইয়াছে, কিন্তু ইতিহাসের পক্ষে তাহাতে, একটু মন্দ হইয়াছে। এ চণ্ডীদাসের সময়টা উজ্জ্বল-নীলমণির আগে হইয়াছিল বলিয়া বুঝিতে একটু কষ্ট পাইতে হয়। তিনি যে ভাবে পুঁথিগুলি পাইয়াছিলেন, সে ভাবে ছাপাইলে বোধ হয়, ইতিহাসকারের পক্ষে একটু সুবিধা হইত।

যদি চণ্ডীদাস দুই হন, তাহা হইলে দুজনের এক জায়গায় মিল আছে। দুজনেই বাশুলি দেবীর ভক্ত। বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলিকে আয়ি বলিয়াছেন। আয়ি শব্দে তিনি কী বুঝিতেন, জানি না, উহা বোধ হয়, 'আর্যা' শব্দের অপভ্রংশ। অনেক জায়গায়, মাকে আয়ি বলে। রাজপুতানায় আয়িপন্থ বলিয়া এক ধর্ম আছে। মালবের স্বাধীন মুসলমান রাজারা যখন মাঁড়ুতে রাজধানী করিয়া রাজত্ব

করিতেছিলেন, সেই সময়ে ভিখাডাবির ঘরে একটি ছোটো সুন্দর মেয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাঁহাকে সকলে আয়ি বলিয়া ডাকিত। আয়ি মানে মা। তিনি যে ধর্ম প্রচার করেন, তাহার নাম আয়িপন্থ। বাংলায় আয়ি বলিতে দিদিমা বুঝায়। অনেক জায়গায় প্রপিতামহীও বুঝায়। চণ্ডীদাস বাশুলিকে কী বলিতেন, জানি না। তিনি আপনাকে বাশুলির গণ বলিয়াছেন, বাশুলির গতি বলিয়াছেন, গতি শব্দের অর্থ চেলা। বৌদ্ধদের মধ্যে একথাটা খুব চলিত এবং এখনো চলে। তিনি আরো বলিয়াছেন, তিনি বাশুলির বরে এই বই লিখিতেছেন। তাঁহার ভণিতার পর গানে আর কৃষ্ণরাধার কথা শুনা যায় না। দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদে ভণিতার পরও চণ্ডীদাস কৃষ্ণকে উপদেশ দেন। তিনি আয়ি, গতি বা গণ, এই সব শব্দ ব্যবহার করেন না। কিন্তু বাশুলির নাম স্থানে স্থানে করিয়া থাকেন, কিন্তু বড়ো বেশি নয়। এক বাশুলির চেলা হইলেও দুই জনের মধ্যে বেশ একটু তফাত আছে।

এখন দেখিতে হইবে বাশুলি কে? এতদিন লোকের সংস্কার ছিল, বাশুলি ও বিশালাক্ষী এক। তিনি নিত্যাদেবীর সহচরী। নিত্যাষোড়শী নামে এক দেবী আছেন বৌদ্ধদের। তাঁহার ষোলো জন সহচরী ছিল। ষোলো জন সহচরী-সুদ্ধ নিত্যার মন্দিরও বাঁকুড়া বা বীরভূম জেলায় আছে। বাশুলি তাঁহার এক সহচরী। কিন্তু তিনি মানুষী, কি দেবী, বুঝা গেল না। তিনি যদি নিত্যার আদেশে চণ্ডীদাসকে একটি চড় মারিয়া থাকেন, তবে তিনি মানুষী। সে কালে বড়ো বড়ো মন্দিরে দেবদাসী থাকিত। বাশুলি তাহাও হইতে পারেন। তিনি বিশালাক্ষী নহেন। ধর্মপূজার বিধিতে ধর্ম ঠাকুরের যত আবরণ-দেবতা আছেন, তাহার মধ্যে একজন আছেন, বিশ্বালাক্ষী। একজন আছেন বাশুলি। সুতরাং দুজনে এক হইতে পারেন না। বাশুলির নমস্কারে তাঁহাকে মঙ্গলচণ্ডী বলা হইয়াছে। মঙ্গলচণ্ডী আমাদের একজন পুরানো দেবতা। তিনি ব্রাহ্মণের দেবতা নন। বৌদ্ধদের অঞ্চল হইতে আসিয়াছেন। তাঁহাকে সকল জাতিই পূজা করিতে পারে। প্রতিমায়, পটে, খোলায়-খাবরায় তাঁহার পূজা হয়। তিনি কিন্তু খুব প্রাচীন দেবতা। ঢাকায় টাউন হলের পাশে এক চণ্ডী দেবীর মূর্তি আছে। উহা লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যের তৃতীয় বৎসরে খোদাই

করা হয়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে রাধিকা চণ্ডীর পূজা করিয়াছেন। বড়ু অনন্ত এই চণ্ডীর চেলা ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম চণ্ডীদাস হইয়াছে, মনে হয়। এক-একবার মনে হয়, যেন এই চণ্ডীর দাসেরা সকলেই গান করিয়া বেড়াইতেন এবং সকলেই চণ্ডীদাস বলিত। তাহা না বলিলে বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, কবি চণ্ডীদাস, আদি চণ্ডীদাস— এ-সকলের অর্থ হয় না। তাই এক-একবার মনে হয়, চণ্ডীর সেবক যাঁরা গান করিয়া বেড়াইতেন, তাঁরাই চণ্ডীদাস হইতেন। সুতরাং অনেক চণ্ডীদাস থাকিতে পারেন। তাহা হইলে কিন্তু সব দিক সামঞ্জস্য হয়। বড়ু চণ্ডীদাস জয়দেবের আগে, দ্বিজ চণ্ডীদাস ১৪/১৫ শতকে : তার পরও হয়তো কেহ চণ্ডীদাস ছিলেন। একজন আবার আদি চণ্ডীদাস ছিলেন, অর্থাৎ তিনিই প্রথম চণ্ডীর দাস হইয়া গান করিতে বাহির হন। কিন্তু এক চণ্ডীদাসেই রক্ষা নাই, মেলা চণ্ডীদাস হইলে না জানি কী হইবে! এইরূপ নানা চণ্ডীদাস স্বীকার করিলে আর-একটি বিষয়েরও সামঞ্জস্য হয়। ঐ যে গৌড়ের বাদশাহের বাড়িতে গান করিতে গিয়া একজন চণ্ডীদাস মারা যান, তাঁহারো একটা কিনারা হইতে পারে।

সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় একখানি প্রাচীন বাংলা অক্ষরে লেখা পাতা পাওয়া যায়। তাহাতে লেখা আছে, চণ্ডীদাস একদিন গৌড়ের বাদশাহের বাড়ি কীর্তন করিতে যান। তাঁহার কীর্তনে সকলেই মুগ্ধ হয়। বাদশাহের এক বেগম এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি গান শুনিবার জন্য চণ্ডীদাসের বাসায় উপস্থিত হন এবং তাঁহার হাবভাবে বোধ হয়, যেন তিনি চণ্ডীদাসের প্রতি আসক্ত হইয়াছেন। বাদশাহ্ তাঁহাকে বারংবার নিষেধ করেন, তুমি ওখানে যাইও না। কিন্তু বেগম সাহেব তাহা না শুনিয়া পুনরায় চণ্ডীদাসের কাছে গেলেন। বাদশাহ্ ইহাতে অত্যন্ত রাগিয়া হুকুম দিলেন, চণ্ডীদাসকে হাতির পিঠে বাঁধিয়া, হাতি খুব জোরে চালাইয়া দাও। এইরূপে তাহার চিত্রবধ হউক। ঠিক সেইরূপই করা হইল। হাতিকে খুব জোরে চালানো হইল। হাতির পিঠে কাছি দিয়া চণ্ডীদাস খুব শক্তরূপে বাঁধা ছিলেন। হাতি চলায় কাছির ঘেঁষে তাঁহার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল ও রক্ত পড়িতে আরম্ভ হইল। তিনি মরিয়া গেলেন। হাতিকে অনেক দূর জোরে দৌড় করাইয়া ফিরিয়া আসিয়া মৃত দেহ বাদশাহের সম্মুখে ফেলিয়া দেওয়া হইল। রামী

রজকিনী নিকটে দাঁড়াইয়া এই সকল দেখিতেছিল। এমন সময় বাদশাহের বেগম আসিয়া হঠাৎ চণ্ডীদাসের বুকের উপর পড়িলেন এবং দেহত্যাগ করিলেন। রামী রজকিনী বেগম সাহেবকে অত্যন্ত ভাগ্যবতী মনে করিয়া আপনাকে নিন্দা করিতে লাগিল।

একথা সত্য কি-না, জানা যায় না। সত্য হইলে একজন চণ্ডীদাস যে বাংলার স্বাধীন মুসলমান রাজাদিগের রাজত্বকালের খুব বড়ো কীর্তনীয়া ছিলেন, সেকথা বিশ্বাস করিতে হয় এবং এ বাদশাহ্ কে ছিলেন, তাহারো সন্ধান করিতে হয়। প্রথম ইলিয়াস্‌শাহি বাদশাহেরা খাঁটি মুসলমান ছিলেন। তাঁহারা যে কীর্তন শুনিবেন, একথা মনে হয় না। রাজা গণেশের বংশধরেরা মুসলমান হইলেও তাঁহাদের কীর্তন শুনার প্রবৃত্তি থাকিতে পারে। রাজা গণেশের পুত্র যদু মুসলমান হইয়া জেলাল উদ্দিন নাম গ্রহণ করেন এবং তাঁহার পৌত্র মহম্মদ শা কয়েক বৎসর বাংলায় বাদশাহি করেন। ইহাদের কাহারো রানী বা বেগম কীর্তন শুনিয়া ভুলিতে পারেন। তাহা হইলে চৌদ্দ শতকের শেষ অর্ধেক হইতে ১৫ শতকের প্রথম অর্ধেক পর্যন্ত একজন কীর্তনীয়া চণ্ডীদাস ছিলেন, স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে দ্বিজ চণ্ডীদাস এই সময়ের লোক বলিয়া মনে করিতে হয়। তিনি রামী রজকিনীকে আপনার নির্বাণ লাভের সঙ্গিনী করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আমি নীচ সংসর্গে মিশিয়াছি।

তাহা হইলে মোট মীমাংসা হইল, বড়ু চণ্ডীদাস লক্ষ্মণ সেনের সময়ে তাঁহার বই লেখেন এবং জয়দেব তাঁহারই বই হইতে অনেক ভাব ও কথা লইয়াছিলেন। আর দ্বিজ চণ্ডীদাস কেবল গান করিয়া বেড়াইতেন, খেয়ালমতো গান বাঁধিতেন— রীতিমতো কোনো বই লিখিয়া যান নাই।

এখন ভাষা দেখিতে হইবে। কবি কৃত্তিবাস ১৪০০ হইতে ১৫০০-এর মাঝখানে রামায়ণ লেখেন। জয়গোপালের হস্ত হইতে সে রামায়ণখানি রক্ষা করিয়া প্রাচীন হাতে লেখা পুঁথি দেখিয়া হীরেন্দ্রবাবু [নাথ দত্ত, ১৮৬৮-১৯৪২ খৃ.] তাহার অযোধ্যাকাণ্ড [১৩০৭ ব.] ও উত্তরকাণ্ড [১৩১০ ব.] ছাপাইয়াছেন। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতও [নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, প্রথম ভাগ ১৩০৬ ব., দ্বিতীয় ভাগ

১৩০৮ ব.] এই সময়ের লেখা। এই মহাভারত, রামায়ণ ও চণ্ডীদাসের গানের ভাষা আপাতদৃষ্টিতে এক বলিয়াই বোধ হয়। যা ভেদ দেশ-ভেদে। চণ্ডীদাসের বাড়ি পশ্চিমবঙ্গে, কৃত্তিবাসের বাড়ি শান্তিপুরের নিকট, বিজয় পণ্ডিতের বাড়ি ফরিদপুর বা বরিশালে। দেশভেদে যেটুকু ভেদ হয়, ততটুকু ভেদই আছে। 'আপাতদৃষ্টিতে' শব্দ ব্যবহার করিলাম, কারণ, এই-সকল পুস্তকের দুরূহ পদসমূহের সূচি নির্মাণ করিয়া বা ইহাদের ব্যাকরণ-ঘটিত ব্যাপারের তুলনা করিয়া দেখি নাই, দেখিবার সময়ও নাই। যদি কেহ দেখাইয়া দিতে পারেন, অত্যন্ত বাধিত হইব এবং তাহার ফল যদি চণ্ডীদাসকে অধিক প্রাচীন বা অধিক নবীন করিয়া তুলে, তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত হইব না।

বড়ু চণ্ডীদাসের ভাষা কিন্তু বৌদ্ধগান ও দোহার ভাষার মতোই। তবে দেশভেদে ও কালভেদে যতটুকু তফাত হইবার, তাহা হইয়াছে। তিনি ঐ-সকল দোহা ও গান হইতে যে কেবল অনেক ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা নহে, অনেক কথাও লইয়াছেন। তাহা ধরিয়া দেওয়া বিশেষ কঠিন নহে। বৌদ্ধগানের মধ্যে চাটিলের[১০] নামটি সকলের চেয়ে নূতন। কারণ, চাটিলের নাম আমরা আর-কোথাও পাই নাই। সিদ্ধপুরুষদের নামের ফর্দেও পাই নাই। তেঙ্গুরের ক্যাটেলগেও পাই নাই। 'বর্ণনরত্নাকরে'ও পাই নাই। তাঁহার গানের সঙ্গে বড়ু চণ্ডীদাসের ভাষার বেশ মিল আছে। কাহ্নপাদের[১১] ভাষার সঙ্গেও অনেকটা মিল আছে। তবে কাহ্নপাদের বাড়ি পূর্ববঙ্গে, চাটিলের বাড়ি বোধ হয়, পশ্চিমবঙ্গেই হইবে। সুতরাং বড়ু ও দ্বিজ চণ্ডীদাস দুজন হইয়া দাঁড়াইতেছেন।

এতক্ষণ আমরা যাহা বলিতেছিলাম, তাহাতে সহজিয়া ভাবের একেবারেই উল্লেখ করি নাই— কেবল কৃষ্ণলীলার কথাই বলিয়াছি। কিন্তু কৃষ্ণলীলাটি যে হিন্দুর সহজিয়া ভাব, সে কথাটি আমি অনেক জায়গায় বলিয়াছি। সহজিয়ারা যে জিনিসটি নিজের দেহের উপর লইয়া আসে, হিন্দুরা সেটা কৃষ্ণের উপর অর্পণ করেন। হিন্দুরা দেবতা মানেন। বৌদ্ধেরা মানেন না। তাঁহারা গুরু মানেন এবং গুরু হইবার চেষ্টা করেন। হিন্দুরা দেবতার সালোক্য ও সাযুজ্য পাইতে চান। দেবতা হইতে চানও না, পারেনও না। সুতরাং সহজিয়ারা যে মহাসুখ

আপনি উপভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত হয়. হিন্দুরা সেই মহাসুখে কৃষ্ণ-রাধাকে মগ্ন দেখিয়াই তৃপ্ত হইয়া থাকেন। আপনাকে সে সুখের অধিকারী বলিয়াই মনে করেন না। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা সিংহাসনে নিত্য বিহার করিতেছেন। আট জন নিত্যসখী তাঁহাদের বিহারের উপকরণ যোগাইতেছে। আমরা সেই সখীদের সখী হইয়া কৃষ্ণরাধার মহাসুখের প্রতিভাস দেখিতে পাইব এবং তাঁহাদের সেবায় রত থাকিব অর্থাৎ নিত্য-সখীদের নিকট উপকরণ যোগাইয়া দিব. এই তাঁহাদের চরম উদ্দেশ্য। কিন্তু বৌদ্ধ সহজিয়াদিগের উদ্দেশ্য আর-একরূপ। তাঁহারা নিজেই নিরাত্মা দেবীর ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িবেন এবং অনন্তকাল তাঁহার সহিত মিশিয়া এক হইয়া থাকিবেন ; দুই একেবারেই থাকিবে না। বৌদ্ধ-দিগের অধিকাংশ চর্যাপদেরই উদ্দেশ্য এই। বড়ু চণ্ডীদাস ও জয়দেব কৃষ্ণ রাধিকার উপর সেই জিনিসটি অর্পণ করিয়া হিন্দুদিগকে সহজিয়া করিয়া তুলিয়াছিলেন। বড়ু চণ্ডীদাসের বাড়ি কোথায় ছিল, জানা যায় না, কিন্তু জয়দেবের বাড়ি কেন্দুলি ছিল। কেন্দুলি অজয় নদীর ধারে। সেনপাহাড়ি অর্থাৎ সেন রাজাদিগের প্রাচীন রাজধানী হইতে বেশি দূরে নয়। সহজিয়ারা আজিও দলে দলে পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে জয়দেবের ঘাটে স্নান করিতে আসে এবং প্রতি বৎসর ত্রিশ হইতে পঞ্চাশ হাজার লোকের সমাগম হয়। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলে বলে, উনিও তো আমাদের গুরু। আগে বোধ হয়, শুদ্ধ হিন্দু সহজিয়ারাই কেন্দুলিতে আসিত। বৌদ্ধেরা আসিত না। কিন্তু বৌদ্ধেরা এখন আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়াছে : মনে করে, আমরাও হিন্দু এবং কেন্দুলিতে বছর বছর আসা তাহাদের নিতান্ত কর্তব্য কর্ম। কিন্তু একটু বেশি পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেই তাহারা বলে. আমরা দেবতা মানি না। আমরা চৈতন্যকে মহাপুরুষ বলিয়া মানি. কৃষ্ণকেও মহাপুরুষ বলিয়া মানি। আমাদের দেবতা, আমাদের সাধন ভজন এই দেহে। তাহারা কেন্দুলিতেই যায়, চৈতন্যসম্প্রদায়ের আর-কোনো তীর্থস্থানে বড়ো একটা যায় না। কিন্তু হিন্দু সহজিয়ারা সকলেই কৃষ্ণকীর্তন করে। অনেকে কৃষ্ণ-কীর্তন করিতে করিতে শেষে খাঁটি সহজিয়া হইয়া যায়। দ্বিজ চণ্ডীদাস বোধ হয়, কৃষ্ণকীর্তন ছাড়িয়া শেষে পাকা সহজিয়া হইয়া গিয়াছিলেন। কারণ, নীলরতনবাবু কৃষ্ণলীলার ৭৬৩ পদের পর রাগরাগিণীশূন্য যে

কতকগুলি 'রাগাত্মিক' পদ দিয়াছেন, তাহা পুরা সহজিয়া। সেইজন্যই বোধ হয়, গৌড়ের বাদশাহের বেগম সাহেব— হয়তো তিনি কোনো সহজিয়া ঘরেরই মেয়ে হইবেন— দ্বিজ চণ্ডীদাসের প্রতি এত অনুরক্ত হইয়াছিলেন।

'সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা'
চতুর্থ সংখ্যা, ১৩২৯ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১৩২৯ বঙ্গাব্দের চতুর্থ সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত দ্বিতীয় চণ্ডীদাস প্রবন্ধটির সূচনায় বলা হয়েছে, "এতক্ষণ আমরা বাংলা ভাষায় বৌদ্ধেরা যে গান লিখিয়াছেন, সেই কথাই বলিতেছিলাম।" এখানে "এতক্ষণ' বলতে ১৩২৯-এর প্রথম সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত 'সভাপতির অভিভাষণ' (এই বইয়ের ৪৩৩ পৃ. দ্র.) নির্দেশ করেছেন।

১. পাইকোড় গ্রামে কর্ণদেবের এবং বিজয়সেনের শিলালিপি আবিষ্কার করেন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

"নারায়ণ-চত্বরে যে শিলালিপি দুইটি আবিষ্কৃত হইয়াছে— তাহার একটি চেদিরাজ শ্রীকর্ণদেবের। অপরটি রাজা শ্রীবিজয়সেনের। কর্ণদেবের শিলালিপি কিঞ্চিদূন প্রায় এক হস্ত উচ্চ একটি স্তম্ভে ক্ষোদিত রহিয়াছে। স্তম্ভটি সুন্দর কারুকার্য্যে সুশোভিত। লিপিগুলি ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত। অধিকাংশ অক্ষরই উঠিয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, সি, আই, ই, মহোদয় এবং রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব মহাশয় পাইকোড় গ্রামে গিয়া এই লিপির যেরূপ পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল। (লিপি প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে ক্ষোদিত)—

১। শ্রীশ্রীগণপতে * * *

২। * * * *

৩। দেব দ্বিজ গুরু ভজন্তো বৈষ্ণবাদয়ঃ স্বং ভিনত্তি দু * *

৪। নিবেদয়ন্ শ্রদ্ধয়াস্মিন্ কর্ম্মণি রাজশ্রীকর্ণদেবস্য * *

৫। স্বস্তি সমৃদ্ধরাট্ শ্রীচেদিরাজ্ঞ শ্রীকর্ণদেবস্য ধ্বনন্তি বা কীর্ত্তিপ্রশস্তি বিশালা . * *

৬। স্বহস্তিয়ঃ বিশ্বকর্ম্মচরণপ্রসাদাৎ দেবীমূর্ত্তি * নৃর্ম্মিত্যং শ্রিয় শ্রীকার্ত্তি * *

দ্বিতীয় শিলালিপিখানি একটি মূর্ত্তির পাদপীঠে ক্ষোদিত

রহিয়াছে। মূর্ত্তিটি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। লিপির নিম্নলিখিত অংশ-টুকু মাত্র বর্ত্তমান আছে যথা,—

'রাজ্যে শ্রীবিজয় সেন' "। (মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী সম্পাদিত, 'বীরভূম-বিবরণ', দ্বিতীয় খণ্ড, হেতমপুর রাজবাটী, বীরভূম, ১৩২৬ ব., পৃ. ৯-১০)

২. অনুবাদ : তারপর দেশে দেশে নিজের থেকে উৎপন্ন কঙ্কালীস্বরূপে জ্ঞানযুক্ত (অর্থাৎ ভৈরবের সঙ্গে আলিঙ্গিত) বীর নায়িকা যোগিনীকে জানতে হবে ॥

সে দেবী অট্টহাসে সব যোগিনীদের কর্ত্রী। সেখানে দেবী আছেন কদমতলায় মহাঘণ্টা (নামে, এবং মহাঘণ্টা নিয়ে) ॥

সে দেবীর (সঙ্গে আছেন) বিকটবদন মহাবীর ক্ষেত্রপাল। সে (দেবী) কঙ্কালময়ী (সুরত) সুখ মায়াময়ী, মহাত্মাদের পূজিত ॥

সেই কঙ্কালিনীর মোড়ামুড়ির রন্ধ্রপথে (?)··· আপনি উৎপন্ন চিত্তবিজ্ঞানে সব দেশে প্রবাহিত হয় ক্রমে ক্রমে।

৩. অনুবাদ : সে পরমেশ্বরের কথা কাকে বলা যায়। যেমন (বলা যায়) কচি মেয়েকে সুরতের কথা ॥

৪. অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী (১২৭৪-১৩৫৩ ব.) সম্পাদিত বনমালী দাসের 'জয়দেব-চরিত্র' ১৩১২ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে প্রকাশিত হয়। শাস্ত্রীমশায় ভূমিকা লেখেন। এর একখানি মাত্র পুথি পাওয়া গেছে, লিপিকাল ১২০৮ ব.। 'জয়দেব-চরিত' রচনাকাল ১৬৯০ খৃস্টাব্দের আগে নয়।

৫. অনুবাদ : স্বর্গলোক থেকে এই ধরাতলে এসেছেন (তিনি)। (তাঁর) কানঢাকা কর্ণাভরণ, সিঁদুরের রঙে রাঙা, দাঁত বেরিয়ে আছে, গলায় মুণ্ড-মালা। খেলার ছলে হাসিমুখে দুটি পদ্ম-পায়ে নূপুর বাজাতে বাজাতে, হাতে খাঁড়া নিয়ে,— খাও খাও রক্ত (অথবা রক্ত খেতে খেতে)— (এমন যে) বাশুলি তোমাদের রক্ষা করুন।

বাশুলীকে প্রণাম।
সেই দেবী শুভ মঙ্গলচণ্ডীকে আহ্বান করি।
(যিনি) নদীতটে উৎপন্ন হয়েছিলেন, (যিনি)
কোটি সূর্যের তেজ ধারণ করেন ॥

পরনে লাল কাপড়, নানা অলংকারে ভূষিত,
(এমন) মঙ্গলকারিণীকে আটটি চাল ও
আটটি দূর্বা দিয়ে পূজা করতে হয় (সেই)
দেবী কালীকে, (যিনি)
অসাধ্য সাধন করেন, পাপ হরণ করেন।
এসো দেবী চণ্ডিকা, এখানে সন্নিধি কর॥

৬. *The History of Bengal*-এ এঁদের রাজত্বকাল—

সামসুদ্দিন ইলিয়স শাহ্ ঃ ১৩৪২-৫৭ খৃ.
সেকেন্দর শাহ্ ঃ ১৩৫৭-৮৯ খৃ.
গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ্ ঃ ১৩৮৯-১৪০৯ খৃ,
সইফুদ্দিন হাম্জা শাহ্ ঃ ১৪০৯-১০ খৃ.

দ্র. *HB-II*, pp. 103, 111, 116, 119.

৭. অন্ধ্রবংশ বা অন্ধ্রভৃত্য বংশের রাজারা খৃ. পূ. তৃতীয় শতকের মাঝামাঝি থেকে তৃতীয় খৃস্টাব্দের সূচনাকাল পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব করেন। এঁদের কুলগত পদবি সাতবাহন বা শালিবাহন। অন্ধ্রবংশধারায় হাল সপ্তদশ রাজা, রাজত্ব করেন প্রথম অথবা দ্বিতীয় খৃস্টাব্দে। প্রাকৃত কবিতার সবচেয়ে পুরানো সংকলন 'গাথাসপ্তশতী' সংকলকরূপে হালের নাম পাওয়া যায়। লোকমুখে প্রচলিত কোটি কোটি গাথার মধ্যে হাল সাতশো সংকলন করলেন— তৃতীয় গাথায় এই উল্লেখ আছে। সংকলিত শ্লোক-গুলি মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে লেখা, ছন্দ আর্যা। লৌকিক ঐতিহ্য থেকে সংগ্রহ করা হলেও সংকলক পরিমার্জনা করেছেন। সংকলনের নাম অনুযায়ী সাতশো শ্লোক থাকার কথা, কিন্তু ৪৩০টি শ্লোক পাওয়া যায়। পরে শতাব্দীর পর শতাব্দী শ্লোক যোগ করা হয়েছে। শ্লোকের ভাষা হালের সমকালীন হতে পারে না, সাতবাহন হালই যে প্রকৃত সংকলক এ বিষয়ে তাই সংশয়ের অবকাশ আছে। কোনো কোনো শ্লোকে নবীন-ভারতীয় আর্যভাষার কবিতার বীজ আছে। অধিকাংশই আদি রসের কবিতা, অধিকাংশ কবিতায় কবির নাম পাওয়া যায়। দ্র. *HIL*, Vol. III, part I, pp. 123-32 ; সুকুমার সেন, 'ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস',

৮. এই বইয়ের পৃ. ৫৫১ সূত্র ৯ দ্র.

৯. চণ্ডীদাস জয়দেবের পূর্ববর্তী, শাস্ত্রীমশায়ের এই মত কখনোই গ্রাহ্য হয় নি। পরে তিনি নিজেও এ ধারণা পরিত্যাগ করেন।

১০. এই বইয়ের পৃ. ৪২৪ সূত্র ১৪ দ্র.

১১. এই বইয়ের পৃ. ৩০১ সূত্র ৩৪ দ্র.

মানুষ আপনার মনের ভাব কিরূপে বাহিরে প্রকাশ করে এবং যাহাতে সেইটি বহু-দিন থাকে, তাহার চেষ্টা করে, তাহার ইতিহাস অতি অপূর্ব। প্রথম প্রথম মানুষ কোনো প্রধান ঘটনা দেখিলে তাহার ছবি আঁকিয়া রাখিত। পাথরে আঁকিয়া রাখিলে অনেক দিন থাকিবে, সেই-জন্য পাথরেই আঁকিত। মিসর দেশে এইরূপ ছবি অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। ঐরূপ ছবি আঁকাকে 'হায়রোগ্লিফিক্' বলে।

ইহার পর আর-এক রকমের ছবি হয়। সে ছবি কতকটা লেখার মতো। একটা মাছ লিখিলে মাছ জাতিকে বুঝাইবে। তাহার পর বিশেষ মাছ লিখিতে হইলে বিশেষ বিশেষ দাগ লাগাইতে হইবে।

এইরূপে পৃথিবীর সব জিনিসের একটা একটা ছবি আঁকিয়া লওয়ার নাম 'পিক্‌চার রাইটিং' অথবা 'ছবি-লেখা'। চীনদেশে এইরূপ লেখা চল্‌তি আছে।

তাহার পর মেসোপটেমিয়ায় আর-একরূপে লোকে মনের ভাব ও পৃথিবীর ঘটনা প্রকাশ করিত। তাহাদের একটা করিয়া তীরের আগার মতো দাগ থাকিত। সেই তীরের আগা দুটা, তিনটা, চারটা করিয়া আঁকিয়া মনের ভাব বা পৃথিবীর ঘটনা প্রকাশ করিত। ইহার নাম 'কিউনিফরম্‌' লেখা।

কিন্তু এখনো অক্ষর হয় নাই। একটি একটি শব্দ একটি একটি দাগ দিয়া প্রকাশ করার নাম অক্ষর। ইউরোপীয়গণ বলেন, ফিনিসিয়া দেশের লোকেরা সর্বপ্রথম অক্ষরের সৃষ্টি করে।[১] তাহাদের অক্ষর বাইশটি মাত্র। তাহাদের অক্ষরগুলির আকার বাহিরের বস্তুর সহিত মিলে— যেমন 'অ্যাল্‌ফা' বলিতে ষাঁড় বুঝায়। অ্যাল্‌ফা অক্ষরটিতে একটা দাঁড়ির উপর দুই দিক হইতে দুইটা ট্যারচা দাঁড়ি আসিয়া পড়িয়াছে। দেখিতে ঠিক ষাঁড়ের শিঙের মতো হইয়াছে। 'বেথ' অক্ষরটি ডালাখোলা একটি বাক্সের মতো। বেথ শব্দের অর্থও বাক্স। এইরূপ বাইশটি অক্ষরই বাহিরের বাইশটি পদার্থের প্রথম অক্ষর লইয়া। বাস্তবিকই এরূপ করিলে শিখাইবারও সুবিধা হয়। আমরাও এক কালে কয়ে করাত, খয়ে খরগোশ, গয়ে গাধা, এইরূপ করিয়াই অক্ষর শিখিতাম। কিন্তু আমাদের ক-খয়ের সহিত করাত বা খরগোশের কোনো সম্পর্কই ছিল না। ফিনিসিয়ান্‌দের ঐরূপ আদি অক্ষর লইয়া বর্ণমালা। কিন্তু যে পদার্থের আদি অক্ষর, তাহার সহিত অক্ষরের আকার মেলে।

পারসি, আরবি, গ্রীক, রোমান, ইংলিশ, রুশিয়ান প্রভৃতি সকল বর্ণমালাই ফিনিসিয়া হইতে উৎপন্ন। আমাদেরও তাই। কিন্তু কিরূপে উৎপন্ন হইল? ২২টা হইতে ২৪টা, কি ২৬টা হওয়া কিছু বিচিত্র নহে, ৩০টা অবধি হইতে পারে, কিন্তু পঞ্চাশ হওয়া বিলক্ষণ কঠিন। আর-এক কথা— আরব, পারস্য, গ্রীক ও লাটিন দেশ ফিনিসিয়ার

কাছে ; সুতরাং ফিনিসিয়া হইতে কিছু ধার করা বড়ো কঠিন নয়। কিন্তু ভারতবর্ষ অনেক দূরে : কেমন করিয়া ধার লইল ? এ-সকল কথার মীমাংসা আমি এ প্রস্তাবে করিবার প্রয়োজন দেখি না। এ সম্বন্ধে বিউলার [Johann Georg Bühler, ১৮৩৭-৯৮ খৃ.] সাহেবের মত খুব চলিতেছে। সুতরাং দু-চার কথায় তাঁহার মত ব্যাখ্যা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিলাম।

বিউলার সাহেব বলেন— ফিনিসিয়ানদের প্রথমকার লেখা পাওয়া যায় না। মোয়াব্‌দের দেশে একখানা পাথরে একখানা শিলাপত্র আছে। সেই পত্রই ফিনিসীয় অক্ষরের সকলের চেয়ে পুরানো। ব্যাবিলন দেশের বাট্‌খারার উপর কতকগুলি অক্ষর থাকিত। সেগুলি মোয়াব্‌দের অক্ষরের চেয়ে কিছু নূতন। বিউলার বলেন, বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে সেই অক্ষরগুলি আরবদেশের দক্ষিণাংশে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ক্রমে সেখান থেকে ভারতবর্ষের দক্ষিণে আসে। তখন লেখাটা ডান দিক থেকে বাঁ দিকে আসিত। ভারতবর্ষে আসিয়া উহার দিক বদলাইয়া যায়। তখন বাঁ দিক হইতে ডান দিক যাইবার ব্যবস্থা হয়। বাইশটি হইতে পঞ্চাশটি অক্ষর করিতে গেলে কোনোটিকে কাত করিতে হয়, কোনোটিকে উলটাইয়া ফেলিতে হয়, কোনোটিতে বিন্দু দিতে হয়, কোনো জায়গায় বা অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হয়। ১ম চিত্রে মোয়াবাইট্, ফিনিসিয়ান্ ও আমাদের ব্রাহ্মী, এই তিনটি অক্ষরের ছবি দেওয়া হইল। ফিনিসীয় ও মোয়াবের 'অ'র একটা কোণ মাঝখানে কাটা। ব্রাহ্মীর 'অ' কোণের মাথার উপর দিয়া একটা খাড়া দাঁড়ি টানা। ফিনিসীয় ও মোয়াবের 'ব' একটা দাঁড়ির উপর অর্ধচন্দ্র দেওয়া ; ব্রাহ্মীর 'ব' ঠিক উলটাইয়া অর্ধচন্দ্র বা পূর্ণচন্দ্রের উপর একটা লম্বা দাঁড়ি দেওয়া। ১ম বাইশটি মাত্র অক্ষরের ছবি আছে। অপরগুলির ছবি দেওয়া হয় নাই। সেইগুলি দেখিলে উপরে যাহা লেখা আছে, তাহা ঠিক সত্য বলিয়া বোধ হইবে।

আমরা যাহাকে ব্রাহ্মী বলিলাম, তাহার অনেক নাম আছে—

কেহ কেহ ইহাকে অশোক অক্ষর বলেন, কেহ কেহ ইণ্ডো-পালি বলেন। কিন্তু আমাদের প্রাচীন পুস্তকে ইহার নাম ব্রাহ্মী— আমাদের দেশের সকল অক্ষরের এই আদি। অশোক রাজার সময়ে প্রায় ২৩০০ বৎসর পূর্বে ইহা খুব চল্‌তি ছিল, সেইজন্য কেহ কেহ ইহাকে অশোক অক্ষর বলেন। ইহা হইতেই আমাদের দেশের সকল অক্ষরের উৎপত্তি।

১. ফিনিসীয়, মোআবাইট ও ব্রাহ্মী

আমরা ২ চিত্রে ব্রাহ্মী হইতে কেমন করিয়া বাংলা অক্ষর হইয়াছে, তাহাই দেখাইব। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর [হীরাচাঁদ] ওঝা মহাশয় তাঁহার প্রাচীন লিপিমালার দ্বিতীয় সংস্করণে [*The Palaeography of India*, Ajmer 1918] যে-সকল চিত্র দিয়াছেন, তাহারই একখানি হইতে আমরা এই চিত্রটি সংগ্রহ করিয়াছি। ইহাতে পাঁচটি কলম আছে। প্রথম লতায় বাংলা অক্ষরগুলি দেওয়া আছে। এ

অক্ষর এখন চলিতেছে। দ্বিতীয় লতায় অশোকের সময়ের অক্ষর আছে, তৃতীয়ে অশোকের ৪০০ শত বৎসর পরে কুষাণ রাজাদের সময় যে অক্ষর ছিল, তাহাই আছে, চতুর্থে কুষাণদের ৩০০/৪০০ শত বৎসর পরে গুপ্ত রাজাদের অক্ষর দেওয়া আছে। পঞ্চমে গুপ্ত রাজাদের ৩০০ শত বৎসর পরের অক্ষর দেওয়া আছে, তাহার পরে পুরানো বাংলা দেওয়া আছে। ৩০০/৪০০ শত বৎসর অন্তর কেমন করিয়া

২. ব্রাহ্মী হইতে বাংলা

অক্ষরগুলি আস্তে আস্তে বদলাইতেছে, এ চিত্রে তাহা বেশ অনুভব করা যায়। নিচ ও উপর হইতে দুইটি রেখা আসিয়া এক বিন্দুতে মিলিল ; সেই বিন্দু হইতে খাড়া উপর-নিচে দাঁড়ি টানিলে অশোকের 'অ' হইল। কুষাণের 'অ' নিচেকার রেখাটি একটু বাঁকা, উপরের রেখাটি একটু বড়ো, আর-সব অশোকের 'অ'রই মতো। গুপ্ত 'অ'-কারে নিচেকার রেখাটি একেবারে বাঁকা এবং সে রেখার সহিত উপরের রেখা মিলে নাই। গুপ্ত অক্ষরের ৩০০ বৎসর পরে উপরের রেখার সহিত

খাড়া দাঁড়ির মিলনটা খুব বড়ো হইয়া গিয়াছে; যেন চৌকা হইয়া গিয়াছে। নিচের রেখাটি তাহার বাঁ দিকের কোণে বাঁকা হইয়া লাগিয়া আছে। তাহার পর আমাদের পুরানো 'অ'-কার, তাহার পর আমাদের এখনকার 'অ'-কার।

হ্রস্ব 'ই' অশোক অক্ষরে তিনটি বিন্দু— উপরে একটি, নিচে দুইটি। কুষাণদের সময় প্রথম বিন্দুটি একটি রেখা হইয়া গিয়াছে; তাহার নিচে দুইটি বিন্দু। গুপ্ত অক্ষরেও ঠিক তাই, কেবল দাঁড়িটির বাঁ দিক হইতে একটি রেখা বাঁকিয়া আসিয়া ডান দিকের বিন্দুতে মিশিয়াছে, আর বাঁ দিকের বিন্দু হইতে একটি রেখা ট্যারচা হইয়া নিচের দিকে নামিয়াছে। ইহার পর আবার দুইটি বিন্দুর মধ্যেও একটি রেখা হইয়াছে। তাহার পর এক টানে কলম না তুলিয়া সমস্ত অক্ষরটি লিখিবার চেষ্টা হইয়াছে। তাহার পর আমাদের এখনকার 'ই'— রেখাটির মাথায় একটি চৈতন বাহির হইয়াছে।

হ্রস্ব 'উ' অশোক অক্ষরে উপর হইতে নিচে একটি দাঁড়ির তলা হইতে সমকোণ করিয়া একটি ছোটো রেখা। কুষাণ অক্ষরে এই রেখাটি একটু বড়ো, গুপ্ত অক্ষরে ঐ রেখাটির আবার একটি হুল নিচের দিকে বাহির হইয়াছে। তাহার পরের অক্ষরে সমকোণটি নাই। আর এখনকার বাংলায় দাঁড়িটির মাথায় একটি মাত্রা আছে, আর-একটি চৈতন আছে।

'এ'-কার। অশোকের 'এ' একটি ত্রিভুজ। কোণটির উপরে ডাহিন হইতে বাঁয়ে একটি রেখার উপরে আঁকা। কুষাণের 'এ' ঠিক ইহার উলটা। গুপ্তদের 'এ' উপরে মাত্রা, তাহার ডান আগা হইতে সমকোণ করিয়া একটি দাঁড়ি নামিয়াছে। তাহার শেষ বিন্দু হইতে মাত্রার বাঁ দিকের বিন্দু পর্যন্ত একটি অল্প বাঁকা রেখা। গুপ্তদের পরে মাত্রার সহিত এই রেখার সম্বন্ধ একটু বিচ্ছেদ হইয়াছে। আমাদের 'এ'-কারে সে সম্বন্ধ একেবারেই নাই।

'ও'। উপর হইতে নিচে একটি দাঁড়ি টানিয়া, তাহার সহিত সমকোণ করিয়া, উপরের বিন্দু হইতে বাঁ দিকে এবং নিচের বিন্দু হইতে ডান দিকে দুইটি ছোটো ছোটো রেখা টানিলে 'ও' হয়। কুষাণেও তাই। গুপ্ত অক্ষরে নিচে সমকোণ নাই এবং রেখাটিও সরল

রেখা নয়। গুপ্তের পর নিচের সরল রেখাটি বেশ বাঁকিয়া গিয়াছে। আমাদের 'ও'-কারের উপর নিচ দুই-ই বাঁকিয়াছে।

'ক'। ডান হইতে বাঁয়ে একটি রেখার উপর তাহাকে সমকোণে ছেদ করিয়া উপর হইতে নিচে একটা দাঁড়ি টানিলে 'ক' হয়। 'ক'য়ের মধ্যবিন্দু হইতে চারি দিকে চারিটি রেখাই এক সমান। কুষাণদের সময় বাঁ হইতে ডান রেখাটি বাঁকিয়া গিয়াছে। গুপ্ত অক্ষরেও রেখাটি বাঁকা তো আছেই, খাড়া রেখাটিরও তলাটা বাঁকিয়া গিয়াছে। গুপ্তের পরে বাঁ দিকের বাঁকা দুটি রেখা জুড়িয়া গিয়াছে। তাহার পর আমাদের 'ক', সেই জোড়াটি একটি ত্রিভুজ হইয়াছে, আর ডান দিকের রেখাটি একটি আঁকড়ি হইয়া গিয়াছে।

এইরূপে ৫০টি বর্ণই কেমন করিয়া অশোক হইতে আমাদের বাংলা হইল, তাহা এই চিত্রে দেখানো আছে।

বাংলা অক্ষরে যে-সকল পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে বঙ্গ-ভূমিশ্বর রাজা হরিবর্মদেবের ৩৯ সালের লেখা একখানি বৌদ্ধপুথি সকলের চেয়ে পুরানো। এই পুথিখানি যশোহর জেলার ব্যাং নদীর ধারে লেখা হইবার ৭ বৎসরের মধ্যে ৭ বার পাঠ করা হয়। রাজা হরিবর্মদেবের সময় এখনো সূক্ষ্ম করিয়া বলা যায় না।[১] তবে এ কথা ঠিক যে, তিনি ১০ ও ১১ শতকের সন্ধিস্থলে বাংলায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। পুথি-খানি কালচক্রযান নামক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মূল পুথির টীকা। এই পুথি-খানির অক্ষরের টান প্রায়ই এখনকার অক্ষরের মতো। তালব্য 'শ'টি বেশ দুপুঁটুলি। বর্গীয় 'জ' ঠিক আমাদের মতো, 'ক' যদিও একেবারে তেকোণা নয়, কিন্তু প্রায়ই আমাদের মতো; কেবল ডান দিকের কোণটি একটু বাঁকা। 'খ' প্রায়ই আমাদের মতো, কেবল নিচের দিকে দুটি কোণ হয় নাই, একটা বাঁকা রেখা চলিয়া গিয়াছে। 'গ', 'ঘ', 'ঙ' তিনই এখনকার মতো। আমাদের ছাপার 'চ' উপর-নিচের একটা দাঁড়ির ডান দিকে একটা থলে, কিন্তু আমাদের হাতের লেখা 'চ' কখনোই এরূপ ছিল না। দাঁড়িটা একটা বাঁকা রেখা, বাঁ দিকে হেলা, থলেটাও সেই রকম। এ পুথির 'চ' ঠিক সেই রকম। দুটা 'চ' জুড়িয়া 'ছ' হয়, তবে এখনকার বাংলায় 'ছ'য়ের কোলের দিকে একটু টান থাকে; এখনো পাঠশালায় বলে 'কোলটানা ছ'। বর্গীয় 'জ' ঠিক এখনকার মতো। কেবল ডান

৪. হরিবর্মদেবের রাজত্বে যশোহরে লেখা বৌদ্ধপুথির স্বরবর্ণ

৫. হরিবর্মদেবের রাজত্বে যশোহরে লেখা বৌদ্ধপুথির ব্যঞ্জনবর্ণ

দিকের রেখাটা মাত্রার নিচে থেকে না বেরিয়ে আরো খানিক নিচে থেকে বেরিয়েছে। কাঁধে বাড়ি 'ঝ' তখনো যেমন, এখনো তেমনি। বিশেষের মধ্যে এই, পালানের নিচের মুখটা জোড়া নয়। 'ট'য়ের চৈতন পর্যন্ত আছে, ঠিক এখনকার মতো। তখনকার 'ঠ'য়ের মাত্রাও নাই, চৈতনও নাই। 'ড', 'ঢ', 'ণ' ঠিক এখনকার মতো।

৫ চিত্রে শেষ ছত্রে ব্যঞ্জনবর্ণগুলি সব দেওয়া আছে। কিন্তু জানি না, কোন্ কারণে আগে প-বর্গ, তাহার পর ত-বর্গ দেওয়া আছে। অক্ষরগুলি প্রায় এখনকার মতো, কেবল 'প'টির নিচের মুখটা দাঁড়ির তলায় আসিয়া লাগিয়াছে। তাহার পর দন্ত্য 'স', তাহার পর আর-একটি কী অক্ষর, তাহার পর 'ষ', পরে 'শ' ও তাহার পর 'ক্ষ'।

৪ চিত্রে স্বরবর্ণগুলি দেওয়া আছে। 'অ', 'আ' প্রায়ই এখনকার মতো, কেবল নিচের দিকে বাঁ-হাতি একটা ট্যারচা টান আছে। 'ই', 'ঈ', একটু পুরানো, দুটা গোল শূন্য, তাহার মাথায় একটা রেখা ; একটু চৈতনও আছে। দীর্ঘ 'ঈ' ঠিক হ্রস্ব 'ই'র মতো, কেবল নিচের দিকে দেবনাগরি 'উ'-কারের মতো কী একটা লাগানো আছে। তাহার পর 'ঋ' 'ৠ' ঠিক এখনকার মতো, তাহার পর 'উ' 'ঊ'— দুইয়ের একটিরও চৈতন নাই ; নিচের একটা টান দেখিয়া দীর্ঘ 'ঊ' চিনিয়া লইতে হয়। 'ঌ', 'ৡ' এখনকার মতো নহে। 'এ', 'ঐ' ঠিক এখনকার মতো। এ চিত্রে 'ও' 'ঔ' পাওয়া যায় নাই। গ্রন্থকার নিজেই বর্ণমালাটি দিয়া গিয়াছেন, সেইজন্য আমাদিগকে কষ্ট করিয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া, বাছিয়া বাছিয়া তৈয়ারি করিয়া লইতে হয় নাই।

এ পুথিখানি যশোহরে ১১ শতকের গোড়ায় লেখা ; সুতরাং ইহার স্থান ও কাল একরূপ ঠিক আছে। তাই এখানির সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা বলিলাম। অন্য পুথিতে এত কথা বলিবার প্রয়োজন হইবে না।

৩ চিত্রে যতটুকু লেখা আছে, আমরা তাহা তুলিয়া দিতেছি। পাঠকগণ অক্ষর মিলাইয়া পড়িবেন।

প্রথম লাইন— "প্রভায়াং নানোপায়বৈনেয়মহোদ্দেশঃ চতুর্থঃ সমাপ্তঃ ॥ ॥
সমাপ্তেয়ং টীকা জ্ঞানপটলস্য ॥ ০ ॥ সম্বুদ্ধব্যাকৃতেন
প্রবরমণিগণং স্থাপিতং বুদ্ধমার্গে দত্তা প্রজ্ঞাভিষেকং

দ্বিতীয় লাইন— "ইহ যশসঃ শ্রীকলাপে নৃপস্য ॥ সম্বুদ্ধব্যাকৃতেন ॥ ॥

৩. হরিবর্মদেবের রাজত্বে যশোহরে লেখা বৌদ্ধ পুথি

৬. ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি

প্রমুদিতমনসা শ্রীযশশ্চো ॥ ॥ দিতেন টীকাং শ্রীমূলত (ন্ত্রে) স্ফুটকুলিশপদান্বেষিকাং তন্ত্ররাজে…

তৃতীয় লাইন— "॥ ০ ॥ যে ধর্ম্মা হেতুপ্রভবা হেতুং তেষাং তথাগতোঽহ্য-বদৎ তেষাং ॥ ০ ॥ চ যো নিরোধঃ এবং বাদী মহা-শ্রমণঃ ॥ দেয়ধর্ম্মোঽয়ং…

চতুর্থ লাইন— "…ঙ্গমং কৃত্বা সকলসত্ত্বরাশেরনুত্তরজ্ঞানফলাবাপ্তয়ে ইতি মহারা ॥ ০ ॥ জাধিরাজশ্রীমৎহরিবর্ম্মদেবপদ্দীয় সম্বৎ ৩৯…

পঞ্চম লাইন— "তে। মৃতয়া চুণ্ডুদুকয়া গোর্য্যা স্বপ্নেন দৃষ্টয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলি-মাদায় পৃ-॥ - ॥ ষ্টয়েদমুদীরিতং। পূর্ব্বোত্তরে দিশো ॥ ০ ॥ ভাগে বেংগনদ্যাস্তথাকূলে পঞ্চত্বং ভাষিতবতঃ সপ্ত-সম্বৎসরৈরিতি ॥"

এ পুথিখানি এশিয়াটিক সোসাইটির। সেখানকার গবর্নমেন্ট লাই-ব্রেরিতে আছে। প্রায় এইরূপ অক্ষরে এশিয়াটিক সোসাইটিতে আরো একখানি পুথি আছে। সেখানিও বৌদ্ধ পুথি ; নাম 'ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি'।

৬ চিত্রে তাহার প্রথম পাতাখানির নকল দেওয়া গেল। এই পুথি-খানির ডান দিকে এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি ইন্দুরে খাইয়া ফেলিয়াছে। ইহার 'ক' পূর্বাপেক্ষা আরো তেকোণা হইয়াছে, কিন্তু এখনো বাঁ দিকে ঠিক দুইটি রেখার একটি কোণ হয় নাই। তালব্য 'শ'টি ঠিক দুপু'টুলি। কেবল 'হ'টি 'ভ'য়ের মতো। প্রথম লাইনটি লিখিয়া দিতেছি, দেখিয়া লইবেন—

"ওঁ নমঃ শ্রীলোকনাথায় ॥ সংক্ষিপ্তব্যতিরেকানাং ব্যাপ্তিরন্বয়রূপিণী। সাধর্ম্মবতি দৃষ্টান্তে সত্বে হেতোরিহোচ্যতে ॥ যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং যথা ঘটঃ সন্তশ্চামী ভাবা…"

ইহার মধ্যে "নমঃ শ্রীলোকনাথায়" ঠিক এখনকার মতো। 'প'টি কেবল ঠিক টাঙ্গির মতো নয়। টাঙ্গির মুখের নিচের রেখাটি যেন বাঁটের গোড়ায় গিয়া লাগিয়াছে। 'প'য়ে ও অন্তঃস্থ 'ব'য়ে ভেদ করা কঠিন। অন্তঃস্থ 'য়'য়ের পেটটি একটু ঝোলা, একটু মোটা, 'প'য়ের সেটি নাই। 'ধ'য়ের কাঁধে বাড়িটি নাই ; 'ধ'য়ের মাত্রাও নাই। 'ত'য়ের লেজটি এখনকার মতো মাথায় উঠে নাই, যেন মাঝখানে কাটা পড়িয়াছে। আমরা মনে করি যে, এ পুথিখানিও যশোর অঞ্চলে হরিবর্মদেবের সময় অথবা তাহার কাছাকাছি কোনো সময়ে লেখা হইয়াছে।

৭.　বজ্রাবলী

৮.　কালচক্রাবতার

৭ চিত্রে যে পুথিখানির শেষ পাতার ফোটোগ্রাফ দেওয়া হইল, সেখানি অভয়াকরগুপ্তের[৩] লেখা। অভয়াকরগুপ্তের উপাধি ছিল মহাপণ্ডিত। পুথিখানি বৌদ্ধপুথি। বৌদ্ধেরাও তান্ত্রিকদের মতো নানা রকম 'মণ্ডল' আঁকিত। সেই মণ্ডল আঁকাকে সাহায্য করিবার জন্য ইহার উৎপত্তি। ইহার নাম 'বজ্রাবলী-নাম-মণ্ডলোপায়িকা'। অভয়াকরগুপ্ত রামপালের রাজত্বে বাস করিতেন। সুতরাং তাঁহাকে আমরা ১১ শতকের শেষে ও ১২ শতকের গোড়ায় বসাইয়া দিয়াছি। এই পুথির অক্ষরেও তেকোণা ভাবটা বেশি। 'ম' আর 'হ' প্রায় আমাদের মতো হইয়া আসিয়াছে। তবে 'হ' এখনো তত পরিষ্কার হয় নাই। একটু যেন দেবনাগরির দিকে টান আছে। 'ত'য়ের লেজ যেরূপ জায়গায় কাটা ছিল, এখন তাহা অপেক্ষা একটু বাড়িয়া গিয়াছে। 'অ' এখন ঠিক বাংলা হইয়াছে, তবে 'অ'র বাঁ দিকে যেটুকু 'ত'য়ের মতো, তাহার লেজ এখনো মাথায় উঠে নাই। হ্রস্ব 'ই'র চৈতনটি একটু একটু দেখা যায়। ৭ চিত্রের শেষ লাইনটি তুলিয়া দিলাম।

"...ণ্ডলে বিশ্বমূর্ত্তেঃ ॥ ২৫০ ॥ মহাপণ্ডিতাভয়াকরগুপ্তরচিতা বজ্রাবলী নাম মণ্ডলোপায়িকা সমাপ্তা ॥"

পুথিখানির অক্ষর দেখিয়া বোধ হয়, যেন অভয়াকরগুপ্তের সময়েই লেখা হইয়াছিল।

৮ চিত্রখানি অভয়াকরগুপ্তের লেখা আর-একখানি পুথির শেষ পাতা। নকল করিয়াছেন ধনশ্রী মিত্র। নকলের তারিখ ১০৪৭ শকাব্দা অর্থাৎ ১১২৫ ইংরাজি। এই যে তারিখটি, ইহা পুথি লেখার তারিখ, রচনার তারিখ নয়। কারণ, ইহা ভণিতার পরে দেওয়া আছে। ভণিতার আগে তারিখ থাকিলে সেটা রচনার তারিখ হয়, আর পরে থাকিলে সেটা নকলের তারিখ হয়। নকলের তারিখ ও তাহার পরের অংশ তুলিয়া দিলাম।

"শকাব্দাঃ ১০৪৭ শকাব্দে বুদ্রং মিশ্রয়িত্বা ষষ্টিভাগেন শেষঃ প্রভবাদিজ্ঞাতব্যো বহ্যত্বব্দৌ প্রক্ষেপায়। ষবৈষম সম্বৎসরে প্রভবাদিবর্ষাণি ৩৮ অলেখিয়ং শ্রীধনশ্রীমিত্রৈনৈঃ (?)।"

৯. চর্যাগীতি

৯ চিত্র চর্যাচর্যবিনিশ্চয় বা চর্যাগীতির কয়েকখানি পাতার ফোটো। এ পুথির অক্ষরগুলিও ১২ শতকের গোড়ার। ইহার 'প' অনেকটা এখনকার 'প'য়ের মতো হইয়া আসিয়াছে অর্থাৎ এখনকার 'প'য়ের টাঙ্গির মতো যে মুখ আছে, তাহার নিচের রেখাটি 'প'য়ের দাঁড়িটার তলা পর্যন্ত যায় না, মাঝামাঝি পর্যন্ত যায়। তাহাতেই বোধ হয়, এটা ৩ ও ৭ চিত্রের চেয়ে কিছু নূতন। এ চিত্রের অন্তঃস্থ 'য' আগেকার চিত্রের 'প'য়ের মতো। 'ষ'য়ের আর সেরূপ পেট মোটা নাই, পেটটা পড়িয়া গিয়াছে। সব তেকোণা অক্ষরেরই কোণগুলা বেশ স্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। 'র' 'ব' ঠিক তেকোণা হইয়া উঠিয়াছে। 'ধ'য়ের মাথায় একটু একটু বাড়ি দেখিতে পাওয়া যায়।

বইখানিতে কতকগুলি বাংলাদেশের গান সংগ্রহ করা আছে ও তাহার সংস্কৃত টীকা দেওয়া আছে। প্রথম পাতার দ্বিতীয় ছত্রের মাঝখানে, যেখানে একটা চৌকা ফাঁক আছে, তাহার পরে একটা 'স্ফুটং' শব্দ আছে। তাহার পর হইতে পড়ুন—

দ্বিতীয় লাইন— "কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল চঞ্চল চীএ পইঠো কাল ॥০॥ দিট করিঅ মহাসু—

তৃতীয় লাইন— "হ পরিমাণ লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জান ॥ ধ্রু ॥ সঅল স(মা)হিঅ কাহি করিঅই সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরিআই ॥ ধ্রু ॥ এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের"

১০. কুট্টনীমতম্ (১১৭২ খৃ.)

১১. হেবজ্রতন্ত্রটীকা (১১৯৮ খৃ.)

১০ চিত্র কাশ্মীরের দামোদর গুপ্তের লেখা 'কুট্টনীমতে'র শেষ পাতার ফোটো। এ পাতায় আবার শেষ তিনটি ছত্র নেওয়ারি অক্ষরে লেখা। তাহাতে তারিখ দেওয়া আছে। নেওয়ারি তারিখ— ইংরাজিতে সে তারিখের অর্থ ১১৭২। সুতরাং পুথিখানি ১১৭২-এর কিছু আগে লেখা হইয়াছিল। এর অক্ষরগুলি খুব স্পষ্ট স্পষ্ট এবং বেশ ছাড়া ছাড়া, একেবারেই জড়ানো নয়। দ্বিতীয় লাইনের মাঝখানে আছে— "কৃতিরিয়ং ভট্টদামোদরগুপ্তস্য মহাকবেরিতি"।

১১ চিত্রে 'হেবজ্রতন্ত্রটীকা' নামক একখানি পুথির আধখানি পাতের ফোটোগ্রাফ দেওয়া আছে। এ পুথিখানি ইং ১১৯৮ সালে লেখা। ইহাতে সমস্ত স্বরবর্ণগুলি দেওয়া আছে। 'এ', 'ঐ', 'ও', 'ঔ' ঠিক এখনকার বাংলার মতো। 'অ' নাই। 'আ' ঠিক এখনকার মতো, 'ই' একটু বিচিত্র। 'ই'য়ের মাথার দাঁড়িটি বাঁকিয়া গিয়াছে এবং নিচে দুটির বদলে একটি বড়ো শূন্য আছে। হ্রস্ব 'ই'র কোলে একটা টানা দিয়া 'ঈ' করা হইয়াছে। হ্রস্ব 'উ' ঠিক বাংলা 'ভ'য়ের মতো। দীর্ঘ 'ঊ' তাহার কোলে একটা টানা। 'ই', 'ঈ', 'উ', 'ঊ' কাহারো মাথায় চৈতন নাই। 'ঋ' এখনকার 'ঋ'য়েরই মতো, এখনকার 'ঋ' হইতে উহাকে তফাত করা কঠিন। হ্রস্ব 'ঋ'য়ের উপর একটা ঋ-ফলা দিয়া দীর্ঘ 'ৠ' করা হইয়াছে। 'ঌ'টি এখনকার 'ঌ' খাড়া করিয়া দিলে যেমন হয়, প্রায় তেমনই। দীর্ঘ 'ৡ'ও তাই। এই আধখানি পাতায় যাহা আছে, পড়িতে কোনো বাঙালির একটুও কষ্ট হইবে না। হেবজ্রতন্ত্রের 'প' চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের মতো।

১২. রামচরিত মূল

১৩. রামচরিত টীকা

১৪. দোহাকোষপঞ্জি

১২ চিত্র 'রামচরিত' কাব্যের শেষ পাতার ফোটোগ্রাফ। গ্রন্থকারের নাম সন্ধ্যাকর নন্দী, নকল করিয়াছেন শীলচন্দ্র। ইহার 'প'ও চর্যাচর্য-বিনিশ্চয় ও হেবজ্রতন্ত্রটীকারই মতো। হ্রস্ব 'ই' দুইটি পুঁটুলি ও তাহার পাশে একটা দাঁড়ি ও মাত্রা। শেষ অক্ষর কয়টি—

"ইতি শ্রীসন্ধ্যাকরনন্দিবিরচিতং রামচরিতং নাম কাব্যং সমাপ্তমিতি। যথাদৃষ্টমিতি শ্রীশীলচন্দ্রস্য।"

১৩ চিত্র রামচরিতের টীকার শেষ পত্র। দ্বিতীয় সর্গের ৩৫ শ্লোকের টীকা ইহাতে শেষ হইয়াছে। ইহার পর আর টীকা পাওয়া যায় নাই। অক্ষর প্রায়ই মূলের মতো, তবে মূল হইতে অনেকটা স্পষ্ট। ইংরাজি ১২ শতকের লেখা বলিয়া মনে হয়। শেষ তিনটি ছত্র লিখিয়া দিতেছি—

"ইতীত্যাদি ইত্যনন্তরোদিতবিমর্দ্দব্যতিকরেণ যত্র সুবেলে বিবুধাদীনাং অঙ্গনানাং ভুজঙ্গাস্তে বানরাদয়ঃ কম্পয়া মদিরয়া উদ্দীপ্তত্বাৎ আপ্তো মারো মন্মথঃ তেন ধারিতং সুরতং যেষাং তে তাদৃশা অপি দুর্ম্মনায়িতাঃ। অন্যত্র —ইত্যনন্তরোদীরিততদ্বংশাবমানে সতি যস্মিন্ ভীমে তে সুভটা ভীম-সহায়াঃ ॥"

১৪ চিত্র। দ্বাদশ শতকে স্থিরমতি পণ্ডিত তিব্বত হইতে পুথি সংগ্রহ করিতে বাংলায় আসিয়াছিলেন। এখানি তিনি সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এখানি অনেক দিন নেপালে নেওয়ার রাজাদের গুরুর বাড়িতে ছিল। নেপালের রাজার পুথিখানার অধ্যক্ষ এখানি আমাকে উপহার দিয়াছেন। ইহার অক্ষরগুলি একটু বাঁকা ছাঁদের, একটু ট্যারচা ছাঁদের— অত্যন্ত পরিষ্কার। পুস্তক শেষ হইলে লেখা আছে—

"সমাপ্তেয়ং দোহাকোষস্য পঞ্জিকা। গ্রংথপ্রমাণমষ্টশতমস্য কৃতি-রিয়ং অদ্বয়বজ্রপাদানামিতি। অস্তব্যস্তপদো ভাতি গ্রন্থোয়ং লেখদোষতঃ। তথাপি লিখ্যতেঽস্মাভিঃ গ্রন্থসংগ্রহকাঙ্ক্ষয়া। দানপতিশ্রীস্থিরমতি-পণ্ডিতস্য পুস্তকমিদং। লেখিক শ্রীউদয়ভদ্রেন। শুভমস্তু সর্ব্বজগতাং ॥"

১৫ চিত্রে যত দূর সম্ভব, ইহার একটি বর্ণমালা দেওয়া হইয়াছে। তিব্বতদেশীয় পাণ্ডিতেরা আসিয়া জগদ্দল বিহারে থাকিতেন। জগদ্দল বিহার বরেন্দ্র-ভূমিরই কোনো স্থানে ছিল। সুতরাং ইহার টান একটু উত্তরবাংলার মতো হইবে। ইহার হ্রস্ব 'ই'তে মাত্রাও আছে, মাত্রার নিচে দুটি পুঁটুলিও আছে। দীর্ঘ 'ঈ'-কারে, 'ই'-কারের উপর ডাইনে একটি দাঁড়ি আছে। 'ঋ' অনেকটা 'অ'-কারের মতো। 'ঘ' ঠিক চিরুনির মতো। 'ঘ'য়ের কাঁধে একটা বাড়ি হইয়াছে। 'ড' প্রায় এখনকার মতো হইয়াছে, কেবল লেজটি একটু কাটা। 'ফ' দেখিতে 'হ'য়ের মতো হইলেও 'প'য়ের মাথা খুব ফাঁক করিয়া, তাহাতে একটা আঁকড়ি দিয়া হইয়াছে।

১৬. দোহাকোষের বর্ণমালা

১৬ চিত্র— অপোহসিদ্ধি। এখানিও আমার পুঁথি। নেপালের পুঁথিশালার অধ্যক্ষ ৺বিষ্ণুপ্রসাদ রাজভাণ্ডারীর[৪] দান। ইহারো অক্ষরাদি 'দোহাকোষ-পঞ্জিকা'র মতো, তবে ট্যারচা নয়। গ্রন্থকারের নাম মহাপণ্ডিত স্থবির রত্নকীর্তি।

১৬. অপোহসিদ্ধি

১৭. সুভাষিতসংগ্রহ

১৮. পঞ্চরক্ষা
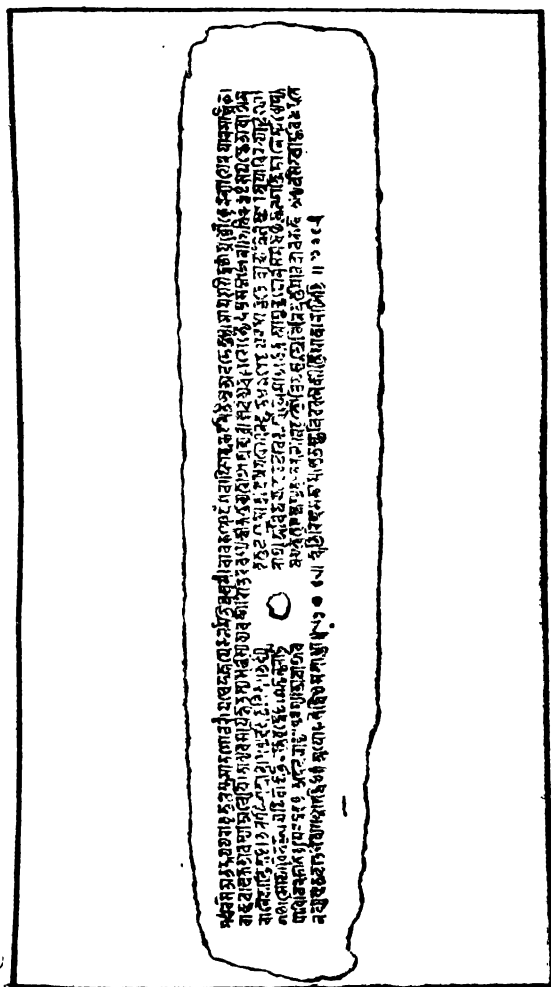
১৭ চিত্র— সুভাষিতসংগ্রহ। ইহাতে বৌদ্ধদের অনেক সুভাষিত অর্থাৎ ভালো কথা জড়ো করা আছে ; কতক সংস্কৃতে এবং কতক বাংলায়। পুথিখানি বিদ্যাপতি দত্তের লেখা। তিনি নালন্দার পার্শ্বে বটগ্রামে বসিয়া পুথিখানি লিখিয়াছিলেন। অক্ষরগুলি সরু সরু, কিন্তু বেশ স্পষ্ট। 'প' একেবারে বাংলা। 'ভ'ও অনেকটা বাংলা। 'ব'টি একেবারে তেকোণা। 'ধ'টি মাত্রাহীন 'ব'-কারের মতো, কাঁধে বাড়ি নাই। 'অ'-কার ঠিক এখনকার মতো। 'হ'টি এখনকার উলটা 'ও'-কারের মতো।

এতক্ষণ আমরা যে-সকল পুথির আলোচনা করিতেছিলাম, সবই মুসলমান রাজত্বের আগেকার। চল্লিশ বৎসর পূর্বে বাংলা অক্ষর যে এত পুরানো, তাহা কাহারো ধারণাই ছিল না। ইং ১৮৬৭ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র [১৮২২-৯১ খৃ.] 'সেতুবন্ধে'র একখানি পুরানো বাংলা অক্ষরের পুথি পাইয়া বড়োই আনন্দিত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, সে পুথিখানি ৬৩৬ বছরের পুরানো। তাঁহার তারিখ ঠিক হইয়াছিল কি-না সন্দেহ, কিন্তু তিনিও মুসলমান-বিজয়ের পূর্বে যাইতে পারেন নাই। ১৮৮৩ সালে বেণ্ডল সাহেব [Cecil Bendall, ১৮৫৬-১৯০৬ খৃ.] ১১৯৮ সালের বাংলা অক্ষরে লেখা 'হেবজ্রতন্ত্রে'র একখানি টীকার একটি পাতের আধখানির এক ফোটোগ্রাফ বাহির করেন। পূর্বে তাহার কথা বলা হইয়াছে। বাকিগুলি সব আমার বাহির করা। ইহার মধ্যে ১৩ শতকের একখানি মাত্র পুথি পাওয়া গিয়াছে (১৮ চিত্র দেখ); তাহাতে শকাব্দার তারিখ দেওয়া আছে ১২১১। সেখানি লেখা পূর্ব-বাংলায়। পুথিখানি বৌদ্ধ 'পঞ্চরক্ষা'র পুথি। তখন পূর্ববঙ্গে স্বাধীন রাজা মধুসেন। উহার শেষে লেখা আছে,—

"পরমেশ্বরপরমসৌগত-পরম-রাজাধিরাজশ্রীমদেগৌড়েশ্বরমধুসেন দেবকানাং প্রবর্দ্ধমানবিজয়রাজ্যে যত্রাঙ্কেনাপি শকনরপতেঃ শকাব্দাঃ ১২১১ ভাদ্র দী ২।" ইহার অক্ষর কতকটা পুরানো ঢঙের। 'ব'টি ঠিক তেকোণা, কিন্তু মাঝে ফাঁক নাই, একেবারে নিরেট। 'ধ' মাত্রাশূন্য, কাঁধে বাড়ি নাই। 'প'টি পুরানো 'প'। 'জ'টিও বাংলা, 'ভ'টিও বাংলা, তবে দুটির একটিরও লেজ মাথায় ঠেকানো নাই।

১৯. জীমূতবাহনের ধর্মরত্ন

২০. কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশ। প্রথম অংশ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

১৯ চিত্র— জীমূতবাহন 'দায়ভাগ' লিখিয়াছেন : তিনি বলিয়াছেন, দায়ভাগ ধর্মরত্ন নামে একটি বড়ো নিবন্ধের অংশ মাত্র। সেই নিবন্ধের 'কালনির্ণয়' অংশটা 'ধর্ম্মরত্ন' নাম দিয়া ছাপানো হইয়াছে। ইহার এক-খানি পুথিতে একটি তারিখ দেওয়া আছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সেটি নকলের তারিখ ভাবিয়া পুথিখানি ১৪১৭ শকে নকল করা হইয়াছে বলিয়াছেন। বাস্তবিক তাহা নয়। সেটি ঘটকসিংহের ছেলের ঠিকুজির তারিখ। সেকালের পণ্ডিতেরা পুথির গায়ে অনেক জিনিসই লিখিয়া রাখিতেন : ঠিকুজিও লিখিতেন ; সুতরাং পুথিখানা ঠিকুজির অনেক আগের লেখা। পুথিখানি যিনি লিখিয়াছেন, তাঁহার নাম দেওয়া আছে ; নিজের জন্যই তিনি লিখিয়াছিলেন। ঘটকসিংহ তাঁহার নিকট পুথি-খানি পাইয়াছিলেন। সুতরাং পুথিখানি হাত-বদল হইবার পর ঠিকুজিটা লেখা হইয়াছিল। সেইজন্য আমরা ইহাকে ইং ১৪ শতকের পুথি বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। ১৪ শতকের পুথি বড়ো পাওয়া যায় না।

২০ চিত্র— এখানি 'তত্ত্বচিন্তামণি'কার গঙ্গেশোপাধ্যায়ের পুত্র বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ের লেখা 'কুসুমাঞ্জলি'র টীকা— নাম 'কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশ'। পুথি-খানির শেষে অতি অস্পষ্ট একটি তারিখ আছে। তারিখটি রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের নজরে পড়ে নাই : ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার [১৮৩৬-১৯১০ খৃ.] মহাশয়ও পুথিখানি ব্যবহার করেন, তাঁহারো নজরে তারিখটি পড়ে নাই। তারিখটি শকাব্দা ১৩৩২=ইং ১৪২০ [১৪১০]। সুতরাং ১৫ শতকের পুথি। কিন্তু পুথিখানির প্রথম ৯০ পাতা এক হাতের লেখা, বাকিটুকু আর-এক হাতের লেখা। যেখানে দুই হাতের লেখা মিলিয়াছে, সেখানে প্রথমটার খানিকটা কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতেই বুঝা গেল— একখানি পুরানো পুথি ছিল। তাহার অর্ধেকটা হারাইয়া যায় এবং অপর অর্ধেক আর-একখানি পুথি হইতে লইয়া জুড়িয়া দেওয়া হয়। প্রথম অর্ধেকটা পুরানো লেখা। তাতে সর্বত্রই '৩' সংখ্যার জায়গায় 'ও' আছে। এইরূপ '৩'-এর জায়গায় 'ও' লেখা ১৩০০ হইতে ১৪০০-র মধ্যের পুথিতেই পাওয়া যায়। ১৩০০-র পূর্বেও এরূপ দেখা যায় নাই, পরেও অতি বিরল। সুতরাং এই কুসুমাঞ্জলি-টীকার পুথির প্রথম অংশটা ১৪ শতকের লেখা আমরা বলিতে পারি। ১৯ ও ২০ এই দুই চিত্রের অক্ষর গুলির সব ঠিক বাংলা : সব তেকোণা হইয়া গিয়াছে, বাঁকা রেখা নাই।
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

২১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

২২. বোধিচর্যাবতার (১৪৩৬ খৃ.)

২১ চিত্র—সাহিত্য-পরিষদের 'কৃষ্ণকীর্ত্তন'। উহার যে পাতে 'ত'-এর জায়গায় 'ও' আছে, সেই পাতাটির ফোটোগ্রাফ দেওয়া হইল। আমাদের বিশ্বাস, এখানিও ১৪ শতকের লেখা। ইহারো অক্ষরগুলি বেশ পরিষ্কার ও বড়ো বড়ো। সকলেই ইহার সহিত অন্য অন্য লেখার তুলনা করিতে পারেন।

২২ চিত্র—২২এর পুঁথিখানি ১৪৯২ সম্বতে অর্থাৎ ইং ১৪৩৬ সালে বেণুগ্রামে নকল করা হয়। সুতরাং এখানি ইং ১৫শ শতকের লেখা। এখানি বৌদ্ধদের পুঁথি। একজন কায়স্থ জমিদার তাঁহার পুত্রের জন্য একজন ভিক্ষুকে দিয়া পুঁথিখানি নকল করাইয়াছেন এবং আর-একজন ভিক্ষুকে দিয়া সংশোধন করাইয়া লইয়াছেন।

২৩ চিত্র— বাংলা ৯৮৫ সালে অর্থাৎ ইং ১৫৭৮ সালের হাতের লেখা। এখানি কাশীদাসের আদিপর্বের পুঁথি। অক্ষরগুলি মোটা মোটা, আর বেশ পরিষ্কার। পুঁথিখানি পরিষদের।

২৩. কাশীদাসের আদিপর্ব (৯৮৫ ব.)

২৪. অঙ্গদরায়বার (১০৮০ ব.)

২৫. জৈমিনি ভারত (১১৭৫ ব.)

২৬. হরিবর্মদেবের মন্ত্রী ভবদেব ভট্টের শিলাপত্র

২৪ চিত্র— অঙ্গদ রায়বারের পুথি। নকলের তারিখ বাংলা ১০৮০ সাল, ইং ১৬৭৩। এখানি এশিয়াটিক সোসাইটির পুথি।

২৫ চিত্র— 'জৈমিনি ভারত'। নকলের তারিখ বাংলা ১১৭৫, ইং ১৭৬৮। এই-সকল পুথি নিপুণ হইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ইং ১১ শতক হইতে ১৮ শতক পর্যন্ত বাংলা অক্ষরের কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা বেশ দেখা যাইবে। ইহার ভিতর এমন একখানি পুথিও নাই, যাহা দেখিবামাত্র বাংলা পুথি বলিয়া মনে না হয়। বাংলা অক্ষরের একটা ছাঁদ আছে। সে ছাঁদ এই-সব পুথিতেই আছে।

ইহার পর আমরা বাংলাদেশের কতকগুলি শিলাপত্রের ফোটো দেখাইব এবং তাহার অক্ষরের সহিত পুথির অক্ষর তুলনা করিবার জন্য পাঠক মহাশয়দিগকে অনুরোধ করি।

২৬ চিত্র— হরিবর্মদেবের মন্ত্রী ভবদেব ভট্ট ভুবনেশ্বরে অনন্ত বাসুদেবের মন্দির নির্মাণ করেন। এ শিলাপত্রখানি তাহাতেই লাগানো ছিল।[৫] যেটুকুর ফোটো আছে, তাহার পাঠ—

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়
গাঢ়োপগূঢ়কমলাকুচকুম্ভপত্র-
মুদ্রাঙ্কিতেন বপুষা পরিরিপ্সমানঃ।
মা লুপ্যতামভিনবা বনমালিকেতি
বাগ্‌দেবতোপহসিতোঽস্তু হরিঃ শ্রিয়ে বঃ॥

এ অক্ষরের ছাঁদই আর-একরূপ, বাংলার মতোই নয়। 'ভ'টি আমাদের 'ভ' তো নয়ই, দেবনাগরির 'ভ'ও নয়। 'শ'টি এক পুঁটুলি, অথবা উহার একটা তেকোণা নাক আছে। 'ক'র টানটা এখনো কুটিলের দিকেই। 'ত' একেবারে দেবনাগরি। 'চ'ও দেবনাগরি, দাঁড়িটার বাম দিকে থলে। ইহার সঙ্গে ৩য় চিত্রের ফোটো মিলাইলে দেখা যাইবে, দুটিই যদিও এক সময়েরই লেখা, কিন্তু ইহাদের প্রভেদ কত— একটা খাঁটি নাগরি, আর-একটি খাঁটি বাংলা।

২৭. বিজয়সেনের দেবপাড়া প্রশস্তি

২৭ চিত্র— বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেন দেবপাড়া গ্রামে প্রদ্যুম্নেশ্বর শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহারই শিলাপত্র। ইহারো অক্ষরগুলি নাগরি নাগরি বলিয়া মনে হয়। তবে কতকগুলি অক্ষর একেবারে বাংলা আছে— যেমন 'এ'-কার, দন্ত্য 'স', 'ভ', 'ভূ'। দ্বিতীয় শ্লোকটি এই—

ওঁ নমঃ শিবায়। লক্ষ্মীবল্লভ-শৈলজাদয়িতয়োরদ্বৈতলীলাগৃহং
প্রদ্যুম্নেশ্বরশব্দলাঞ্ছনমধিষ্ঠানং নমস্কুর্ম্মহে।
যত্রালিঙ্গনভঙ্গকাতরভ(য়া)স্থিত্বান্তরে কান্তয়োঃ
দেবীভ্যাং কথমপ্যভিন্নতনুতা শিল্পেঽন্তরায়ঃ কৃতঃ।

ঠিক এই সময়ের পুথির অক্ষর ৯ চিত্রে দেওয়া আছে। এই দুই রকম অক্ষর তুলনা করিয়া দেখুন।

২৮ চিত্র-- বল্লালসেনের সীতাহাটি শিলাপত্র। প্রথম শ্লোকটি এই—

সন্ধ্যাতাণ্ডবসন্বিধানবিলয়ন্নান্দীনিনাদার্ম্মিভি-
র্নির্ম্মর্য্যাদ···দিশতু বঃ শ্রেয়োঽর্দ্ধনারীশ্বরঃ।
যস্যার্দ্ধে ললিতাঙ্গহারবলনৈরর্দ্ধে চ ভীমৈ···
···নাট্যারম্ভরসৈর্জয়ত্যভিনয়দ্বৈধানুবোধশ্রমঃ॥

ইহার সহিত কুট্টনীমতের (চিত্র ১০) তুলনা করুন।

২৯ চিত্র— বল্লভদেবের শিলাপত্র ১১০৭ শকাব্দের অর্থাৎ ইং ১১৮৫র খোদাই। অক্ষরগুলি কতক বাংলা, কতক আর-এক রকম। তাহার পর ৩০ চিত্র লক্ষ্মণসেনের তর্পণদিঘির তাম্রপত্র। এ দুইটি প্রায় একই সময়ের। ইহাদের সহিত ১১শ, ১২শ, ১৩শ ও ১৪শ চিত্রের তুলনা করুন। এই শিলাপত্র দুখানির কতকটা পড়িয়া দিতেছি।

২৯শ চিত্র—

··· ··· ··· ··· ··· সূনুনা
অক্ষয়স্বর্গলাভায় জনন্যা জনকাজ্ঞয়া॥
এতস্যা ভক্তশালায়া নির্বাহার্থং মহাভুজঃ।
বিশালকীর্ত্তিশালিন্যাঃ শ্রীমান্ বল্লভদেবকঃ॥
শাকে নগনভোরুদ্রৈঃ সঙ্খ্যাতে চোত্তরায়নে।
শুভে শুভে ক্ষণে রাশৌ শস্তে ব্যস্ততমোগুণঃ॥

২৮. বল্লালসেনের সীতাহাটি প্রশস্তি

২৯. বল্লভদেবের শিলাপত্র (১১৮৫ খৃ.)

চ. ২।৪৬

৩০ চিত্র— পং ২২। মণ্ডলে—শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিতশ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ মহারাজাধিরাজশ্রীবল্লালসেনদেবপাদানুধ্যাতপরমেশ্বর-পরমবৈষ্ণবপরমভট্টারকমহারাজাধিরাজ শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবঃ কুশলী।

৩০. লক্ষ্মণসেনের তর্পণদিঘি তাম্রপত্র

৩১ চিত্র— লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিশ্বরূপসেনের শিলাপত্র। ইহারো ছাঁদ নাগরি, ঠিক বাংলা নয়। এখানি হয়তো ১৩ শতকে খোদাই হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা মনে করেন, বক্তিয়ার খিলিজির সময়ে লক্ষ্মণসেন বাঁচিয়া ছিলেন না, তাঁহাদের মতে ইহা ১২ শতকেরও হইতে পারে। অনেক অক্ষর ঠিক বাংলা থাকিলেও, ইহার ছাঁদ নাগরি।

৩১. বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসন

৩৮. চট্টগ্রাম তাম্রশাসন

৩২ চিত্র— এখানির ছাঁদই বাংলার ; শকাব্দ ১১৬৫তে (ইং ১২৪৩) চট্টগ্রামে খোদাই করা। প্রথম শ্লোকটি এই—

শুভমস্তু শকাব্দাঃ ১১৬৫
দেবি প্রাতরবেহি নন্দনবনান্মন্দঃ কদম্বানিলো
বাতি ব্যস্তকরঃ শশীতি কৃতকেনালাপ্য কৌতূহলী।
তৎকালস্খলদঙ্গভঙ্গিমচলামালিঙ্গ্য লক্ষ্মীং বলা-
দালোলাননবিম্বচুম্বনপরঃ প্রীণাতু দামোদরঃ ॥

পুঁথি ও শিলাপত্রের লেখা আলোচনা করিলে দেখা যায়, এক দেশের একই সময়ের, পুঁথির অক্ষর একরূপ, আর শিলাপত্রের অক্ষর আর-একরূপ। এইরূপ ১১ ও ১২ শতক চলিয়াছে। পুঁথিগুলি বৌদ্ধদের, শিলাপত্রগুলি ব্রাহ্মণদের। বাংলার ভিন্ন ভিন্ন অংশে অক্ষর ও ছাঁদ কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। হিন্দুদের ঐ সময়ের পুঁথি পাওয়া যায় নাই। সুতরাং যত দূর পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যে, ব্রাহ্মণেরা পশ্চিম দেশ হইতে আসিয়াছিলেন ; তাঁহারা পশ্চিমের অক্ষরের পক্ষপাতী ছিলেন। আর দেশের লোক (অর্থাৎ বৌদ্ধেরা) দেশের অক্ষরের পক্ষপাতী ছিলেন। এই দুয়ের লড়াইতে দেশের লোকে অর্থাৎ বৌদ্ধেরা জয়লাভ করিল। তেকোণা অক্ষর চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণেরাও শেষে সেই অক্ষরেই পুঁথি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। মুসলমান-বিজয়ের পর শিলাপত্র এই দেশের অক্ষরেই লেখা হইত।

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'
প্রথম সংখ্যা, ১৩২৭ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে ২৭ চৈত্র ১৩২৬ ব., ৯ এপ্রিল ১৯২০ খৃ. অষ্টাদশ বিশেষ অধিবেশন এবং ১০ বৈশাখ ১৩২৭ ব., ২৩ এপ্রিল ১৯২০ খৃ. বিংশ বিশেষ অধিবেশনে শাস্ত্রীমশায় আলোকচিত্র সহযোগে এই প্রবন্ধ পড়েন। কার্যবিবরণে উল্লেখ আছে—

"সভাপতি মহাশয় 'বাঙ্গালার লিপিকথা' বিষয়ে তাঁহার প্রবন্ধটির প্রথমাংশ বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করিলেন। প্রবন্ধের অপরাংশ আগামী সপ্তাহে পঠিত হইবে স্থির হইল।

"এই প্রবন্ধোক্ত বিষয়গুলি ব্যাখ্যাকালে শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয় আলোকচিত্র প্রদর্শনে সাহায্য করিয়াছিলেন। রামমোহন লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের ম্যাজিক ল্যান্টার্ন এই উপলক্ষে ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন। এই জন্য উক্ত লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষকে ও শ্রীযুক্ত বিনয়তোষবাবুকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল। তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের এই সারগর্ভ প্রবন্ধের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।" (সা-প-প, ১৩২৭ ব. পৃ. ১০৮)

"প্রবন্ধ লেখক তাঁহার প্রবন্ধের প্রথমাংশ গত ২৭এ এপ্রিল ১৮শ বিশেষ অধিবেশনে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অদ্য অবশিষ্টাংশ আলোকচিত্রাদির সাহায্যে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন।

"এই প্রবন্ধ সপ্তবিংশ ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 'বাঙ্গালার পুরাণ অক্ষর' নামে প্রকাশিত হইবে বলিয়া কার্য্যবিবরণ মধ্যে ইহার সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হইল না।" (সা-প-প, ১৩২৭ ব., পৃ. ১১)

পত্রিকায় প্রকাশের সময়ে এবং 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী' প্রথম খণ্ডে অক্ষরের নমুনাগুলি আলাদাভাবে হাফটোন ব্লক থেকে ছাপা হয়েছিল। আমরা দেখার সুবিধের জন্যে আলোচনার মধ্যে বা পাশাপাশি রেখেছি। ২০ সংখ্যক নমুনা ছাড়া অন্যগুলি লাইন ব্লক থেকে ছাপা হল। এশিয়াটিক সোসাইটির সংগ্রহ থেকে কয়েকটি পুঁথির নতুন ফোটো সংগ্রহ করা গেছে, অন্য-সব পত্রিকার ছবি থেকে নেওয়া। ফোটো ও হাফটোন ব্লকের ছবি লাইন ব্লক করানোর জন্যে সতর্কভাবে কালি-তুলির কাজ করা হয়েছে। ফলে অক্ষরগুলি অনেকটা স্পষ্ট পড়া যাবে।

১. মিসর দেশে প্রথমে ছবি এঁকে ভাব প্রকাশ করা হত। এর নাম hieroglyphics— চিত্রলিপি। তারপর সম্পূর্ণ চিত্র না এঁকে তার আদল আঁকা হত। পুরোহিত সম্প্রদায় ব্যবহার করত বলে এর নাম hieratic— পৌরোহিত্য। সাধারণ লোকের ব্যবহারে এর আদল অনেকটা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সেইজন্য একে বলে demotic— সাধারণ্য। মিসরের এই ডিমোটিক লিপি থেকেই ফিনিসিয়ান্‌রা অক্ষরের— syllabic letter উদ্ভাবন করেছিল।

শ্রীসুকুমার সেন।

২. বর্মণ-রাজ হরিবর্মদেব পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করেন। তাঁর রাজধানী ছিল বিক্রমপুর। তাঁর রাজত্বকাল নির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। পরোক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতে মনে করা হয়, একাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। শাস্ত্রীমশায় নেপালে হরিবর্মদেবের ১৯ রাজ্যাঙ্কে লেখা 'অষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতা' এবং ৩৯ রাজ্যাঙ্কে লেখা কালচক্রযান টীকা 'বিমলপ্রভা' পুথি আবিষ্কার করেন। দ্র. *HB*-I, pp. 199-204.

৩. এই বইয়ের পৃ. ৩০৩ সূত্র ৩৭ দ্র.

৪. এই বইয়ের পৃ. ৪২৭ সূত্র ২৫ দ্র.

৫. ভুবনেশ্বরে বিন্দু-সরোবরের পুব পাড়ে অবস্থিত অনন্ত-বাসুদেব মন্দিরের গায়ে লাগানো প্রশস্তিলিপি। ভবদেব ভট্ট একাদশ শতাব্দীর শেষ এবং দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন মনে করা হয়। তিনি হরিবর্মদেবের সান্ধিবিগ্রহিক মন্ত্রী ছিলেন এবং সম্ভবত হরিবর্মার ছেলের রাজত্বকালে তাঁর উপদেষ্টা ছিলেন। তেত্রিশটি শ্লোকে সম্পূর্ণ এই প্রশস্তিলিপিতে ভট্ট ভবদেবের বংশপরিচয় এবং মনীষা ও পুণ্যকর্মের বিবরণ আছে। দ্র. হ-র-সং-১, পৃ. ৩৯৫-৯৭।
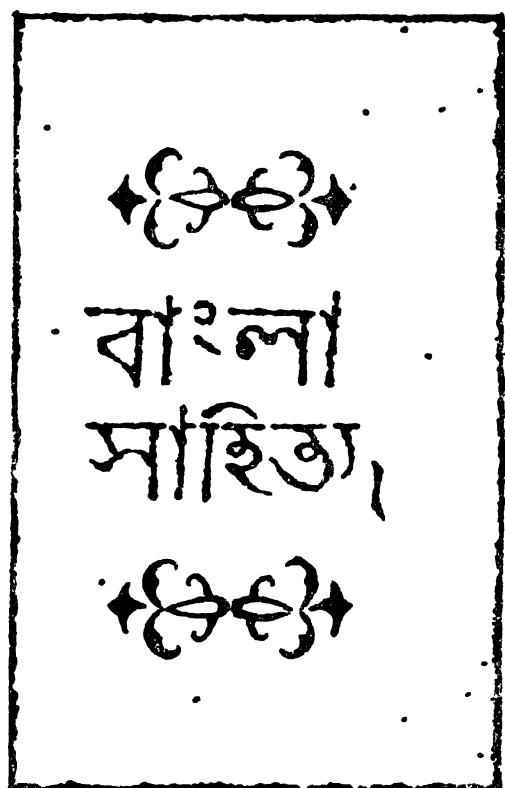
ইংরেজি আমলের বাংলা সাহিত্যের কথা আজ আমার বক্তৃতায় আলোচনা করব। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলাদেশে ঘোর বিপ্লবের যুগ। ইহা ভাঙাগড়ার যুগ, বিপ্লবের যুগ, অশান্তির যুগ, বিশৃঙ্খলার যুগ, অরাজকতার যুগ। এযুগে সাহিত্য উন্নতি এবং পুষ্টিলাভ করতে পারে না।

১৭৫৭ খৃস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধ হয়; ১৭৬৫ খৃস্টাব্দে ইংরেজগণ দেওয়ানি লাভ করেন। কিন্তু দেওয়ানি পেলে কী হবে, রাজস্ব আদায়

জগন্নাথ হল [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়] সাহিত্য সভায় ১৮ই ও ২৫শে ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রদত্ত দুইটি বক্তৃতার সারমর্ম।

করবার মতো ক্ষমতা এবং অভিজ্ঞতা তাদের ছিল না। দেশীয় শাসন প্রণালীর ভিতরে তারা তখনো প্রবেশ করেন নি; কাজেই রাজস্ব আদায়ের ভার সীতাব রায় এবং মহাম্মদ রেজা খাঁর[১] উপর অর্পণ করতে বাধ্য হলেন। দেশের লোক বিশেষ পরিবর্তন হল বলে বুঝল না। কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেব [রাজত্বকাল ১৭৭৪-৮৫ খৃ] এসে ১৭৭২ খৃস্টাব্দে দেওয়ানি কাজের ভার নিজের হাতে নিলেন। রাজস্ব আদায়ের আফিস মুর্শিদাবাদ ও পাটনা হতে কলকাতায় উঠে গেল— সীতাব রায় এবং মহাম্মদ রেজা খাঁ-কে কলকাতায় ১৮ মাস নজরবন্দি রেখে হেস্টিংস তাদের কাছ থেকে হিসাব পত্র সমজে নিলেন। ফৌজদারি মোকদ্দমার ভার নবাবের উপরই ছিল; কিন্তু কর্নওয়ালিসের [রাজত্বকাল ১৭৮৬-৯৩ খৃ.] সময় সদর নেজামত আদালত কোম্পানির হাতে গেল— বাংলার নবাব-নাজিম নামে মাত্র নবাব রহিলেন। তাঁর 'কেল্লার' এলাকায় ইংরেজেরা অধিকার খাটাতেন না এবং তাহা foreign territory বলে গণ্য ছিল; এবং খেলাত দেওয়া উপাধি দেওয়া তাঁহার হাতে ছিল। লর্ড ডালহৌসি [ভারতের গবর্নর জেনারেল, ১৮৪৮-৫৬ খৃ.] এসে খেলাত ও উপাধি দেওয়াও নিজ হাতে লইলেন। ১৮৮২ খৃস্টাব্দে নবাব-নাজিমের পদ উঠাইয়া দেওয়া হয়; বাংলা, বেহার ও উড়িষ্যার নবাব সেই হতে মুর্শিদাবাদের নবাব হন। এরূপে একে একে নবাবকে সমস্ত অধিকারে বঞ্চিত করে ইংরেজেরা বাংলায় আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছেন। বাংলার নিজস্ব বলতে যে শাসন প্রণালী ছিল একশো বছরের বিপ্লবের ফলে তার শেষ চিহ্নটুকুও মুছে গেল।

পলাশির যুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের [বাংলার গবর্নর জেনারেল, ১৮২৮-৩৩ খৃ. ; ভারতের গবর্নর জেনারেল, ১৮৩৩-৩৫ খৃ.] শাসনকাল পর্যন্ত বাংলাদেশে কোনো সুশৃঙ্খল শাসন-প্রণালী ছিল না। সুযোগ পেয়ে চোর ডাকাত তখন দেশে প্রভুত্ব বিস্তার করে; এমন-কি অনেক সম্ভ্রান্ত জমিদারবর্গও তখন ডাকাতি করা অন্যায় মনে করতেন না। দেশে ঘোর অরাজকতা বিদ্যমান ছিল; এই অরাজকতা সাহিত্যচর্চার প্রথম এবং প্রধান অন্তরায়। দ্বিতীয়ত বাংলার জমিদার যাঁরা শিল্প কলা এবং সাহিত্যের আশ্রয়স্থল ছিলেন; ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভেই তাঁরা সর্বস্বান্ত হন। ১৭৯৩ খৃস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের

ঘোষণা হয় ; কিন্তু 'সূর্যাস্ত আইনের' প্রসাদাৎ অনেক প্রাচীন বুনিয়াদি ঘর নষ্ট হয়ে যায়। নূতন যাঁরা নিলামে জমিদারি খরিদ করলেন তাঁরা শিল্প সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হলেন না ; বিশেষত কোম্পানি বাহাদুর তাঁদের তহশিলের শতকরা ৯০ ভাগ দাবি করাতে তাঁদের আর্থিক অবস্থাও বিশেষ স্বচ্ছল ছিল বলে বোধ হয় না। এরূপে অরাজকতা এবং আশ্রয়হীনতার ঘূর্ণাবর্তে পড়ে বাংলা সাহিত্য হাবুডুবু খেতে লাগল। ইংরেজি আমলের সূত্রপাত হবার অব্যবহিত পূর্বে বাংলা সাহিত্য দরিদ্র ছিল না। মুর্শিদকুলি খাঁ [১৭১৩-২৭ খৃ.], সুজাওদ্দৌলা [১৭২৭-৩৯ খৃ.], আলিবর্দি খাঁ [১৭৪০-৫৬ খৃ] এ'দের রাজত্বকালেও বঙ্গ সাহিত্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল। বিদ্যাসুন্দরের গল্প তখন দেশের লোকের খুব প্রিয় ছিল। বিদ্যাসুন্দরের গল্প সত্য ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত — 'চৌর পঞ্চাশতে'র বিহ্লন কবিই এর নায়ক। এই গল্প অবলম্বন করে রামপ্রসাদ [সেন. ১৭২০ ?-৮১ খৃ] ও ভারতচন্দ্র [রায়, ১৭১২-৬০ খৃ.] তখন বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন। কিন্তু রামপ্রসাদের ৭০ বছর আগে নিমতা-নিবাসী কৃষ্ণরামও [দাস, জ. আ. ১৬৫৬ খৃ.] এই আখ্যা অবলম্বন করে 'কালিকামঙ্গল' [১৬৭৬-৭৭ খৃ] রচনা করেছিলেন। এদেশে ধর্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল এবং মনসামঙ্গলের যেরূপ ছড়াছড়ি দেখা যায় তাতে বিদ্যাসুন্দরও যে ৫/৭ খানা রচিত হয়েছিল এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। শাক্ত কবিগণ যখন বিদ্যাসুন্দর লিখছিলেন বৈষ্ণবেরা তখন চুপ করে বসেছিলেন না। আলিবর্দি খাঁর রাজত্ব সময়ে সুবৃহৎ 'পদ-কল্পতরু'[২] গ্রন্থ সংগৃহীত হয়। আর-একখানা পুথি যা রচিত হয়েছিল তা অপূর্ব। ইহা নরহরিদাস বা ঘনশ্যামী দাস কৃত 'ভক্তিরত্নাকর'[৩]। বইখানা বাস্তবিকই রত্নের আকর। পুস্তকখানি ১৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ; এতে চৈতন্যদেবের সময় থেকে আরম্ভ করে বৈষ্ণবধর্মের উত্থান এবং প্রচারের ইতিহাস অতি সুন্দর ও নিখুঁত ভাবে বর্ণিত আছে। বাংলা ভাষায় এমন খাঁটি ইতিহাস আর নাই। পলাশির যুদ্ধের কাছাকাছি সময়ে ইহা রচিত হয়েছিল। ডর্বিনি প্রণীত *History of the Reformation*ই[৪] এর একমাত্র উপমাস্থল। শুধু বড়ো কাব্যের রচনায়ই তখন বাংলার প্রতিভা সীমাবদ্ধ ছিল না ; সেই সময়েই রামপ্রসাদের প্রাণ মাতানো শ্যামাসঙ্গীত রচিত হয়েছিল। দেশের

জমিদারবর্গ তখন উদারভাবে সাহিত্যানুরাগীর পৃষ্ঠপোষণ করতেন। ভারতচন্দ্রের জীবনী এর প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল। ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী প্রথমে তাঁর গুণের আদর করেন ; মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র [রায়, ১৭১০-৮২ খৃ.] তাঁকে ১৬ বিঘা ভিটে, ১০০ বিঘা ধানের জমি এবং ৪০৲ মাসোহারা প্রদান করেন ; এইরূপ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়া বাংলা সাহিত্য ১৭৫৩ [১৭৫২] খৃস্টাব্দে 'অন্নদামঙ্গল' লাভ করতে পেরেছিল। কাব্য হিসাবে অন্নদামঙ্গল অতুলনীয়। রায়গুণাকর তাঁহার অদ্ভুত কবি প্রতিভা প্রয়োগ করে সংস্কৃত, উর্দু এবং পারসি হতে বেছে বেছে রত্ন এনে অন্নদা-মঙ্গলকে সাজিয়েছেন। ইতিহাস হিসাবেও তার মূল্য কম নয়। মানসিংহ এবং প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধের যে বর্ণনা আছে তা জীবন্ত। ভারতচন্দ্রের লেখা আজকালকার দিনে সব স্থলে সুরুচিসঙ্গত বলে গণ্য নাও হতে পারে; কিন্তু কাব্যের মূল্য নিরূপণে যুগ-প্রভাবকে বাদ দিলে চলবে না।

মোটামুটি আমরা দেখতে পাই যে ইংরেজি আমলের অব্যবহিত পূর্বে বাংলা সাহিত্য যথেষ্ট শ্রীসম্পন্ন ছিল। এতে ভাবের অভাব ছিল না— এতে মহাকাব্য ছিল, খণ্ডকাব্য ছিল, রামপ্রসাদি গান ছিল। ভাষার দৈন্য তখন ছিল না— রামপ্রসাদের সহজ সরল গ্রাম্য ভাষা থেকে আরম্ভ করে ভারতচন্দ্রের মার্জিত ভাষা পর্যন্ত সব রকম ভাষাই এতে ছিল। কিন্তু পলাশির যুদ্ধের পর থেকে বাংলায় রাষ্ট্রীয় ঝড় উঠল। এই অরাজ-কতার ঝড়ে অশেষ সম্পদশালী এই সাহিত্য-তরণী সহসা অতল জলে নিমগ্ন হয়ে গেল— সেই যে ডুবল, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বে আর ভাসল না।

১৭৫৭ খৃস্টাব্দের পরে একশো বছরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনো বড়ো বই বাংলায় লেখা হয় নাই। নিভৃতে শান্তিতে বাস না করলে সাহিত্যসৃষ্টি এক প্রকার অসম্ভব কিন্তু অরাজক দেশে চার দিকে অশান্তি, শান্তি মিলবে কোথায় ? তাই বড়ো বড়ো বই লেখার প্রথা দেশ থেকে উঠে গেল। তবে কি সাহিত্যচর্চা একেবারে লোপ হয়ে গেল ?— না, এই বাংলাদেশে সাহিত্য একেবারে লুপ্ত হতে পারে না এবং লুপ্ত হয় নি। বড়ো বড়ো বই রচনা উঠে গেল বটে ; কিন্তু কীর্তন, ছোটো গান, চুট্‌কি কবিতা ও কবিওয়ালার গান পুরাদমে চলতে লাগল। কীর্তন জিনিসটি অতি প্রাচীন। চৈতন্যদেব এবং তাঁর শিষ্যগণ কর্তৃকই এর

বিশেষ প্রচার হয়। বিপ্লবের রোলে যখন অনেক সামাজিক উৎসবাদি বন্ধ হয়ে গেল তখন গ্রামে গ্রামে কীর্তন খুব জাঁকালো হয়ে উঠল। এদিকে কবিওয়ালার দলও আসর গরম করে তুললেন। বড়ো বই লিখবার মতো সুযোগ এবং শান্তি দেশে ছিল না বটে কিন্তু তার বদলে নিধুবাবু [রামনিধি গুপ্ত, ১৭৪১-১৮৩৮ খৃ] প্রভৃতির চুট্‌কি কবিতা অনেক বেরুতে আরম্ভ করল। রসরাজের নাম দিয়ে অনেক হাস্যোদ্দীপক কবিতা তখন বেরিয়েছিল; সংগ্রহের অভাবে তা অনেকগুলি হারিয়ে গিয়েছে, সম্প্রতি উদ্ভটসাগর [পূর্ণচন্দ্র দে, ১৮৫৭-১৯৪৬ খৃ] মহাশয় কর্তৃক উদ্ধার করেছেন।

ইউরোপীয় মিশনারিগণ গোড়া থেকেই শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা আরম্ভ করেন। ইংরেজগণ তাঁহাদিগকে কোম্পানির রাজত্বের সীমার ভিতরে আসতে দিতেন না। তাদের আড্ডা ছিল ইংরেজ রাজত্বের বাইরে—শ্রীরামপুরে। মিশনারিগণ ধর্ম প্রচারের সুবিধার নিমিত্ত নিজেরা দেশীয় ভাষার চর্চা করতেন এবং দেশীয় লোককে ইংরেজি শিক্ষা দিতেন। তখনকার দিনে অল্পস্বল্প ইংরেজি জানলেই কুঠিতে বড়ো বড়ো চাকুরি পাওয়া যেত। ১৮১৩ খৃস্টাব্দে কোম্পানি বাহাদুর শিক্ষার জন্য প্রথম টাকা মঞ্জুর করেন।[৫] এর পূর্বে তাঁরা সাক্ষাৎভাবে শিক্ষায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। অবশ্য এ সময় থেকেই দেশে প্রাইভেট স্কুল হয়ে ইংরেজি শিক্ষা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। ১৮৩৩ খৃস্টাব্দে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে তথা বাঙালি জাতির ইতিহাসে স্মরণীয় কাল। দেশীয় শিক্ষা-পদ্ধতি বজায় থাকবে অথবা ইংরেজি শিক্ষা এ দেশে প্রচলিত হবে এই নিয়ে ১৮৩৩ খৃস্টাব্দে ঘোর বাক্‌যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ এক triangular fight— বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ উইল্‌সন সাহেব [Horace Hayman Wilson, ১৭৮৬-১৮৬০ খৃ.] বলেন যে দেশী লোকের শিক্ষা সংস্কৃতে হউক। মেকলে সাহেব [Thomas Babington Macaulay, ১৮০০-৫৯ খৃ.] এর ঘোর প্রতিবাদ করেন। মেকলের *Minute* [২ জানুয়ারি ১৮৩৫ খৃ] ইতিহাসে স্থান পেয়েছে; সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বিরুদ্ধে এরূপ কলঙ্ক বর্ষণ আর-কখনো হয় নাই। মেকলে বলেন যে যদি এই তিমিরান্ধ দেশকে আলো দিতে হয় তবে পাশ্চাত্য শিক্ষাই এ দেশে চালাতে হবে। এ সময়ে Hodgson [Brian Houghton Hodgson,

১৮০০-১৪ খৃ.] নেপাল হতে লিখে পাঠালেন যে বাঙালির শিক্ষা ইংরেজিতে হয়ে আবশ্যক নেই, সংস্কৃতে হয়েও আবশ্যক নাই, বাঙালির শিক্ষা বাংলায়ই হউক। এই তিন দলে কিছু দিন খুব মারামারি চলল; কিন্তু বেন্টিঙ্ক সাহেব অবশেষে মেকলের দিকে হেলে পড়লেন। মেকলেরই জয় হল।[৬] বাংলা সাহিত্যের পক্ষে এই জয়ের সার্থকতা খুব বেশি। ইংরেজি শিক্ষার সূত্রপাত হতেই প্রাচীন ও নব্যের মধ্যে আড়াআড়ি বেধে উঠেছিল। মেকলের জয়ে নব্যের জয় হল; ইয়ং বেঙ্গলের গোড়া এতে খুব শক্ত হল; এবং এই যে 'নয়ী রোশনী' দেশে আমদানি হল এর সামনে 'পুরাণী রোশনী' ক্রমশ ম্লান হয়ে পিছু হটতে লাগল।

১৮৫০ হতে ১৮৬০ পর্যন্ত যুগসন্ধির কাল। এ সময়ে বাংলাদেশ পুরাতনকে বিদায় দিয়ে 'নূতন'কে বরণ করে নিলে। বহু দিনের যুদ্ধের পর এ সময়ে নিশ্চিন্ত ফল দেখা গেল; এ সময়েই বাংলার পরাজয় সম্পূর্ণ ও ইংরেজির জয় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য ইহা বলবার জো নেই যে সে সময়ে 'Old Bengal'-এর কোনো best representative ছিল না বলেই তার পরাজয় হল। কারণ, এ সময়ে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর [১৪৭৭/৭৮-১৫৩২ ? খৃ.] বংশধর বৈষ্ণবতমশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন গোস্বামী [জ. ১৭৮৬ খৃ.] তাঁর 'রামরসায়ন' [আ. ১৮৩১ খৃ.] ও 'রাধামাধবোদয়' [১৮৪৯ খৃ.] এই দুই অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন। বাংলা ১২৭২ সালে রঘুনন্দনের ছেলের হাত থেকে এই বইয়ের কপিরাইট বিক্রি হয়। বাল্মীকির পরে অনেক রামায়ণ রচিত হয়েছে; কালিদাস 'রঘুবংশ' লিখেছেন, ভবভূতি রামায়ণকে নাটকে পরিণত করে 'মহাবীরচরিত' ও 'উত্তর-রামচরিত' রচনা করেছেন— তুলসীদাস [আ. ১৫২৩/৩১-১৬২৩/২৪ খৃ] তো রামায়ণ লিখে বাংলা ভিন্ন সমস্ত হিন্দুস্থানকে মাতিয়ে গিয়েছেন— 'ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ' কৃত্তিবাস বাংলার ঘরে ঘরে রামায়ণের সুধা বিলিয়ে দিয়েছেন। রঘুনন্দনের রামরসায়নও রামসীতারই কাহিনী, কিন্তু সেই কাহিনীর সঙ্গে যেখানে বৈষ্ণব মতের বিরোধ হতে পারে সে-সব স্থল গ্রন্থকার সোজা উঠিয়ে দিয়েছেন। রঘুনন্দনের রাধামাধবোদয় একখানি অমূল্য রত্ন। তাঁর রচনায় ভাষা এবং ভাবের সৌন্দর্য পূর্ণতা লাভ করেছে। এতে কথায় কথায় অলংকারের যেমন সুষ্ঠু প্রয়োগ আছে এমন আর-কোথাও

নেই। যাঁরা নিজের রচনা ভালো করতে চান তারা আজকালকার বই না পড়ে রঘুনন্দনের লেখা পড়লে যথেষ্ট উপকৃত হবেন। এরকম নিখুঁত রচনা বড়ো চোখে পড়ে না। কিন্তু শুধু ভাষায় নয় এতে ভাবের যে সৌন্দর্য আছে তা অতুলনীয়। রামরসায়নে কবি বৈকুণ্ঠে মিলনের এক ছবি এঁকেছেন। এই বৈকুণ্ঠের যে চিত্র এর কাছে পৃথিবীর সাহিত্য-ভাণ্ডারে স্বর্গের যত চিত্র আছে কোনোটিরই তুলনা হয় না। মিল্টন '*Paradise Lost*'এ স্বর্গের বর্ণনা করেছেন ; কিন্তু স্বর্গের বর্ণনা থেকে তাঁর নরকের বর্ণনাই জাঁকালো বেশি। মিল্টনের 'ভগবান্'কে যেমন মিল্টনের 'শয়তানে'র কাছে দাঁড় করালে খাটো দেখা যায়—তেমনি তাঁর নরকের ছবির কাছে তাঁর স্বর্গের ছবিও খুব ম্লান বলে বোধ হয়। হোমারের স্বর্গের বর্ণনা ইংরেজি অনুবাদের ভিতর দিয়ে আমরা যতটুকু দেখতে পাই তাতে খুব শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয় না। 'সুখাবতীব্যূহে'[৭] নিবদ্ধ বুদ্ধদেবের বিশ্রাম স্থানের বর্ণনা অবশ্য পাশ্চাত্য কবিদের স্বর্গের বর্ণনা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। কিন্তু রামরসায়নের স্বর্গের বর্ণনার কাছে তাহাও সহজেই হার মানে। রাধামাধবোদয়েও অনেক জায়গায় অতি চমৎকার বর্ণনা আছে। প্রথমেই কবি শ্রীকৃষ্ণের মুরলীবাদনের বর্ণনা দিয়েছেন। গ্রীক দার্শনিক 'Music of the Spheres'-এর কথা লিখেছেন ; কিন্তু কল্পনার দৌড়ে তা রঘুনন্দনের 'বংশীধ্বনির' বর্ণনার সহিত কিছুতেই এঁটে উঠতে পারবে না। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশির সুর শুনে সমস্ত জগৎ স্তম্ভিত হয়ে আছে ; রঘুনন্দন সেই স্তম্ভিত জগতের যে ছবি এঁকেছেন তা পড়লে পাঠককেও স্তম্ভিত হয়ে থাকতে হয়।

'পুরাণী রোশনী' ম্লান হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে যে প্রদীপটি জ্বলেছিল তা খুবই উজ্জ্বল। রঘুনন্দনের রচনায় সাহিত্য-সৃষ্টি-কৌশল পূর্ণতা লাভ করেছিল। রঘুনন্দনের সঙ্গে পুরানো যুগ বাংলাদেশ হতে বিদায় গ্রহণ করল। থেমে গেল সেদিন খোল করতাল খঞ্জনি ; আর, বেজে উঠল এদিকে হারমোনিয়ম, ক্লারিওনেট, ফ্লুট। পুরানো যুগ চলে গেল ; কিন্তু তার জন্য দুঃখ হয়। রঘুনন্দনের রচনায় যে সাহিত্য উন্নতির উচ্চ-শিখরে আরোহণ করেছিল, তাতে যথার্থ সৌন্দর্য ছিল ; এবং হয়তো বাঙালি যখন নিজের দিকে ফিরে তাকাবে তখন বাঙালির এই খাঁটি নিজস্ব সাহিত্য আবার নবজীবন লাভ করবে।

নবযুগের সূচনা বাংলাদেশে হল। মাইকেলের [মধুসূদন দত্ত, ১৮২৪-৭৩ খৃ.] 'মেঘনাদবধে' [১৮৬১ খৃ.] ইহার প্রথম ভেরি নির্ঘোষ। মাইকেল জীবনের সব কাজেই wayward ছিলেন ; wayward as a son, wayward as a husband, wayward as a student, wayward as a father, wayward as a man— সাহিত্যেও তাই।[৮] কলম ধরেই তিনি সমস্ত নিয়ম কানুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। সকলে মিত্রাক্ষর লিখত ; তিনি তার জায়গায় অমিত্রাক্ষর বসালেন ; চতুর্দশপদী কবিতা তিনি বাংলায় চালালেন ; শুধু তাই নয় 'রাম'কে ভারতবাসী আবহমান কাল পূজা করে আসছে তিনি রামকে খাটো করে রাবণকে বড়ো করে আঁকলেন ; মিল্টনের ন্যায় নরকের বর্ণনা খুব জাঁকালো করে করলেন। পদে পদে তাঁর বিদ্রোহী ভাবের পরিচয় তিনি দিলেন। মাইকেল প্রতিভাশালী লোক ছিলেন : তিনি বিদ্রোহী ছিলেন কিন্তু এরূপ লোকের সমাজে এবং সাহিত্যে সময় সময় প্রয়োজন হয়। মাইকেলের চরিত্রে অনেক দোষ ছিল কিন্তু তাঁর মন্দ যা তা তাঁর সঙ্গেই পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে তাঁর ভালোটুকুই জগতে রয়েছে, আমরা তারই প্রশংসা করব। মাইকেলের পর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮৩৮-১৯০৩ খৃ.] এবং নবীন সেন [১৮৪৭-১৯০৯ খৃ] মহাকাব্য রচনা করেছেন কিন্তু মেঘনাদবধের কবির মতো কেহই কৃতকার্য হতে পারেন নাই। বঙ্কিমবাবুর বিপুল সমালোচনা [বঙ্গদর্শন, মাঘ ও ফাল্গুন ১২৮১ ব] সত্ত্বেও 'বৃত্রসংহার' [প্রথম খণ্ড ১৮৭৫ খৃ., দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৭৭ খৃ.] লোকের দৃষ্টি সেরূপ আকৃষ্ট করলে না এবং বিংশ শতাব্দীর ব্যস্ততার মধ্যে নবীন সেনের তিন খণ্ড মহাকাব্য পড়ে উঠবার সুযোগ যে লোকে করতে পারবে সে আশাও বৃথা।

মাইকেল আর-একটা জিনিস আমদানি করেন— সেটা নূতন ধরনের 'নাটক'। পূর্বে এদেশে যাত্রা ছিল : ইংরেজেরা যখন থিয়েটার আমদানি করলেন তখন থিয়েটার করবার শখ দেশের লোকের ভিতর জেগে উঠল। রাজামহারাজার বাড়িতে ক্রমে ক্রমে আয়োজন চলতে লাগল কিন্তু নাটক পাবেন কোথায় ? আমাদের সেই পুরানো সংস্কৃত নাটকই কিছু দিন চলতে লাগল। ১৮৫৯ খৃস্টাব্দে মাইকেল নূতন কায়দার নাটক বের করলেন 'একেই কি বলে সভ্যতা' [১৮৬০ খৃ.]।

'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' [১৮৬০ খৃ.] এবং অন্যান্য নাটক ক্রমশ বের হল। তখন পেশাদারি থিয়েটারের জন্ম হয় নাই। রাজারাজড়ার বাড়িতেই এসব নাটক অভিনীত হত। বন্ধুবান্ধব নিয়ে জমিদারগণ তা উপভোগ করতেন। সাধারণ লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাকিয়ে দেখত।

এস্থলে একজন নাট্যকারের নামোল্লেখ করা উচিত ইনি ৺রামনারায়ণ তর্করত্ন [১৮২২-৮৬ খৃ.]। তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন এবং শিক্ষাকার্যে তাঁহার অশেষ দক্ষতা ছিল। তিনি অত্যন্ত রসিক ছিলেন এবং নাটক লেখার একটা বাতিকও তাঁর ছিল। তাঁর 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' [১৮৫৪ খৃ.] সকলের নিকটই সুপরিচিত; তবে তাঁর 'নব-নাটক'খানাকেই [১৮৬৬ খৃ.] তিনি নিজে ভালো বলে মনে করতেন। রামনারায়ণ তর্করত্ন অনেকটা সংস্কৃতের কায়দা বজায় রেখেছিলেন, কিন্তু তাঁর বিষয় ছিল আধুনিক, অতএব তাঁকে পুরানো ও নূতনের মাঝামাঝি বলে ধরা যেতে পারে।

তার পর ৺দীনবন্ধু মিত্র [১৮৩০-৭৩ খৃ.]। দীনবন্ধু মিত্রের নাম সকলেই শুনেছেন। তাঁর মতো রসিক পুরুষ খুব কমই জন্মেছেন। দীনবন্ধুবাবু কার্যব্যপদেশে যত জায়গায় গিয়েছেন সব জায়গায় তাঁর সম্বন্ধে দু-একটি গল্প এখনো প্রচলিত আছে। তিনি লোককে হাসিয়ে অস্থির করে তুলতেন। আবার হাসির ভিতর দিয়ে বিদ্রূপ বর্ষণে সিদ্ধহস্ত তাঁর মতো কেউ ছিল না। 'নবীন তপস্বিনী' [১৮৬৩ খৃ.] 'সধবার একাদশী' [১৮৬৬ খৃ.] ইত্যাদি নাটকে তিনি সেকালের ইংরেজিওয়ালা দলের উপর যথেষ্ট চাবুক মেরেছেন।

১৮৭২ খৃস্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর কলকাতায় প্রথম পেশাদারি থিয়েটারের পত্তন হয়। এর পর অনেক লেখক ও অভিনেতা নাট্য-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করেছেন। গিরিশ ঘোষ [১৮৪৪-১৯১২ খৃ.] নাটক লিখে এবং অভিনয় করে খ্যাতনামা হয়ে গেছেন। সংস্কৃত বৈয়াকরণরা তাঁর উপর এক বিষয়ে বিশেষ চটা; তিনি সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের বিশেষ নিষেধ সত্ত্বেও নাটকে শান্তরসের অবতারণা করেছেন। শান্তরস যে কী করে নাটকে প্রযোজ্য হতে পারে তা এখনো আমার ধারণার অতীত।[৯] অমৃতলাল বসুর আর্টের ধারণা অধিক; তাঁর নাটকে এসব খুঁত নেই।[১০]

পেশাদারি থিয়েটার সমাজের কিছু কিছু অপকার করেছে ; কিন্তু এতে উপকারও যথেষ্ট হয়েছে। বিশেষত গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, অর্দ্ধেন্দু মুস্তফী [১৮৫০-১৯০৮ খৃ.] প্রভৃতি অভিনেতাগণ যে অনেক লোকের মনের গতি ফিরিয়ে দিয়েছেন এবিষয়ে সন্দেহ নেই।

এখন আমরা গল্পের বইয়ের কথা আলোচনা করব। ১৮৩৮-৩৯ খৃস্টাব্দে প্রথমে বাংলায় গল্পের বই বের হয়। বই দুখানির নাম শুনলেই তাদের সম্বন্ধে বেশ ধারণা হবে। এদের একখানির নাম 'নববাবুবিলাস' আর-একখানির নাম 'নববিবিবিলাস'।[১১] এসব বই এখন খুঁজে পাওয়া যায় না। নববিবিবিলাস আমি একখানা পেয়েছিলুম ; তাতে প্রথম ও শেষ দিক নেই, মাঝে কয়েক পাতা মাত্র ছিল। প্রথম যাঁরা গল্প লিখতে আরম্ভ করেন, অনুবাদই প্রায় তাদের অবলম্বন ছিল। ১৮৪৬ খৃস্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর [১৮২০-৯১ খৃ.] প্রথমে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' [১৮৪৭ খৃ.] বের করেন। তার পর গিরিশ বিদ্যারত্ন [১৮২২-১৯০৩ খৃ.] 'দশকুমার চরিত' ['দশকুমার' ১৮৫৬ খৃ.] ও তারাশঙ্কর [তর্করত্ন, মৃ. ১৮৫৮ খৃ.] 'কাদম্বরী' [১৮৫৪খৃ.] অনুবাদ করেন। ক্রমশ 'বিচিত্রবীর্য্য' [কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য রচিত, ১৮৬২ খৃ.] 'রোমাবতী' [রামগতি ন্যায়রত্ন রচিত, ১৮৬২ খৃ.] ইত্যাদি বই বের হয়। যাঁরা এসব বই লিখছিলেন তাদের সকলেরই ভাষা ছিল সংস্কৃত-ঘেঁষা— এমন-কি সে ভাষাকে বাংলা না বলে সংস্কৃতও বলা যেতে পারে। কিন্তু এই জন্যই পণ্ডিত মহলে এসব বইয়ের খুব খ্যাতি প্রতিপত্তি ও আদর যত্ন হল। পণ্ডিতেরা বই পড়ে খুব সুখী হয়ে বলতেন "এমন বই-ই লিখেছে যে অভিধান ভিন্ন একটা কথাও বুঝবার জো নেই।"

একদিকে যেমন সংস্কৃত থেকে অনুবাদ হচ্ছিল, অন্য দিকে ইংরেজি থেকেও অনুবাদ শুরু হল। শ্রীরামপুরের পাদ্রিদের কথা পূর্বেই বলেছি। সেখানেই কেরি [William Carey, ১৭৬১-১৮৩৪ খৃ.] মার্শম্যান [Joshua Marshman ১৭৬৯-১৮৩৭ খৃ] প্রভৃতি সাহেবেরা থাকতেন। ধর্ম প্রচারের সুবিধার জন্য পাদ্রিরা বাংলা ছাপাখানা করে বাংলা বই ছাপাতে আরম্ভ করেন। ইংরেজ রাজত্বে তাঁদের বড়ো প্রতিপত্তি ছিল না। ১৮৩৩ খৃস্টাব্দের পর হতেই তাঁরা কোম্পানির

মুলুকে বিশেষ আনাগোনা ও প্রচারকার্য আরম্ভ করেন। ইতিমধ্যে দেশে অনেক ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কলকাতায় গৌরমোহন আঢ্য [১৮০৫-৪৬ খৃ.] প্রথমে ইংরেজি স্কুল খুলেন। ১৮১৭-১৮ খৃস্টাব্দে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। ইহা সম্পূর্ণ দেশীয় চেষ্টায় হয়েছিল ; গবর্নমেন্ট কোনো সাহায্য করেন নাই। একবার অর্থের অভাব হওয়াতে গবর্নমেন্টের কাছে সংস্কৃত কলেজের কাছে হিন্দু কলেজের জন্য একটু স্থান চেয়ে নেওয়া হয়। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য ভাবে অর্থ সাহায্য করে গবর্নমেন্ট কলেজটিকে আত্মসাৎ করেন। ১৮৩৫ খৃস্টাব্দে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ইংরেজি ভাষায় উচ্চশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এর পর দেশে অন্যান্য কলেজ স্থাপিত হয়। হুগলিতে একটি প্রাইভেট কলেজের প্রতিষ্ঠা হয় [১৮৩৬ খৃ.] ও কৃষ্ণনগরে গবর্নমেন্ট একটি কলেজ স্থাপন করেন [১৮৪৬ খৃ.]। ইংরেজি শিক্ষার প্রচার হওয়াতে ইংরেজি থেকে অনুবাদের বিশেষ সুবিধা হয়।

বাংলায় প্রথম মৌলিক গল্পের বই টেকচাঁদঠাকুর [প্যারীচাঁদ মিত্র ১৮১৪-৮৩ খৃ.] কৃত 'আলালের ঘরের দুলাল' [১৮৫৮ খৃ.]। বইখানার ভাষা সহজ, সরল : অনেক স্থলে গ্রাম্যতা দোষ থাকলেও এ খাঁটি বাংলা ভাষা— সমাসবহুল দীর্ঘ পদবিন্যাস এতে নেই, পড়তে কোনো অভিধানেরও আবশ্যক করে না। খাঁটি বাংলা ভাষায় লেখা হওয়াতে সংস্কৃতওয়ালা পণ্ডিত সমাজে এর খুব নিন্দা হল। কিন্তু প্যারীচাঁদ নিজে পণ্ডিত ছিলেন না : তিনি সংস্কৃতের বড়ো ধার ধারতেন না। খাঁটি বাংলায়ই তিনি লিখতে লাগলেন। 'আলালের ঘরের দুলালে'র পর তাঁর 'রামারঞ্জিকা' [১৮৬০ খৃ.] গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

টেকচাঁদ বেশি দিন একাকী রহিলেন না। তাঁর রচনা প্রণালী সমর্থন করতে আর-একজন লেখক দেখা দিলেন— ইনি কালীপ্রসন্ন সিংহ [১৮৪০-৭০ খৃ.]। কালীপ্রসন্ন উচ্চবংশে জন্মেছিলেন এবং সাহিত্যের একটু বাতিক তাঁর ছিল। তিনি মহাভারতের বাংলা অনুবাদ আরম্ভ করেন। ভূমিকা লিখিবার জন্য তিনি বইখানি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট নিয়ে যান। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদ্যাসাগরি ভাষায় তার এক ভূমিকা লিখে দেন ও স্থানে স্থানে অনুবাদও করে দেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহের তাতে মন উঠল না ; তিনি সংস্কৃতবহুল রচনা প্রণালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এক বই লিখলেন 'হুতুম প্যাঁচার নক্শা'।[১২] বইখানি সকলের পড়া উচিত। নক্শা ১৮৬০ খৃস্টাব্দের পর প্রকাশিত হয়। বই পড়ে পণ্ডিত সমাজ কালীপ্রসন্ন সিংহের উপর একেবারে খেপে গেলেন। অজস্র গালাগালি কালীপ্রসন্নের উপর বর্ষণ হতে লাগল। নক্শাকে বিদ্রূপ করে অনেক পুস্তিকা প্রকাশ হল। হুতুম প্যাঁচার ভাব ও কথার বিরুদ্ধে পণ্ডিতেরা যুক্তিজাল রচনা করলেন। কিন্তু তাঁর ভাষার অনুকরণ কেউ করতে পারলেন না। এক্ষেত্রে পণ্ডিতেরা হার মানলেন।

১৮৬৪ খৃস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' [১৮৬৫ খৃ.] প্রকাশিত হয়। 'পুরাণী রোশনী'র দল কালীপ্রসন্ন সিংহের উপরই চটা ছিলেন ; দুর্গেশনন্দিনী পড়ে তাঁরা আরো চটে গেলেন। ভারতচন্দ্রের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনা করে তাঁরা মত প্রকাশ করলেন যে এ একটা বই-ই হয় নাই। 'নয়ী রোশনী' কিন্তু বই পড়ে খুব খুশি হলেন ও বঙ্কিমচন্দ্রের খুব প্রশংসা করতে লাগলেন। দু-দলে খুব যুদ্ধ চলল। একদল বঙ্কিমের যতই নিন্দা করতে থাকলেন আর-একদল তাঁকে আকাশে তুলতে লাগলেন। দু-তিন বছর পরে বঙ্কিমবাবু 'কপালকুণ্ডলা' [১৮৬৬ খৃ.] বের করলেন। কপালকুণ্ডলা নূতন ধরনের বই ; বই পড়ে লোকে বিশেষ চমৎকৃত হল যে এহেন বইও বিনে অভিধানে পড়া যায়।

নবেল পড়বার বাতিক ক্রমশ লোকের বেড়ে চলল। প্রতাপ ঘোষ [১৮৪০-১৯২১ খৃ.] এ সময়ে 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' [প্রথম খণ্ড ১৮৬৯ খৃ., দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮৪ খৃ.] লেখেন। তার পর সাপ্তাহিক পত্রিকার আকারে উপন্যাস বেরুতে শুরু হল। 'লণ্ডন রহস্য' ও 'হরিদাসের গুপ্তকথা'[১৩] এভাবে প্রথম বাংলায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু এসব পড়েও লোকের মনের অভাব ঘুচল না। সকল অভাব পূরণ করতে ১৮৭২ খৃস্টাব্দে বঙ্গদেশে 'বঙ্গদর্শনে'র আবির্ভাব হয়। বঙ্গদর্শন বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজের সমস্ত সাধনা বঙ্গদর্শনে নিয়োজিত করেন। তাছাড়া আরো ভালো ভালো লেখক ছিলেন। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার

[১৮৪৬-১৯১৭ খৃ.]। অক্ষয়চন্দ্রের রচনায় খুব বাহাদুরি দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর বই পড়তে গ্রন্থকার ও পাঠকের মধ্যে ভাষার ব্যবধান আছে বলে মনে হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের ভালো ভালো রচনা এখন বঙ্গদর্শনে বেরুতে লাগল। বঙ্কিমবাবুর ন্যায় নূতনের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা বড়ো দেখা যায় না। কী করে সাহিত্যে নিত্য নূতন, সৃষ্টি করবেন সর্বদা তাঁর এ ভাবনা ছিল। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম স্তরে আমরা দেখতে পেয়েছি তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন; কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস মাত্র তিনখানা লিখেই ছেড়ে দিলেন। দ্বিতীয় স্তরে দেখতে পাই তাঁর ঝোঁক শিল্পকলার দিকে। 'বিষবৃক্ষ' [১৮৭৩ খৃ.] ও 'চন্দ্রশেখর' [১৮৭৫ খৃ.] এই স্তরের বই। দুটো plot এক গল্পের মধ্যে জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা বঙ্কিমবাবু এ দুখানি বইয়ে করেছেন। বিষবৃক্ষে এ চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয়েছে চন্দ্রশেখরে তা হয় নি। তৃতীয় স্তরে বঙ্কিমবাবু নিখুঁত চরিত্র অঙ্কন করতে ও সর্বশ্রেষ্ঠ আর্ট ফলাতে চেষ্টা করেছেন। 'রজনী' [১৮৭৭ খৃ.] 'কৃষ্ণকান্তের উইল' [১৮৭৮ খৃ.] এই স্তরের বই। কৃষ্ণকান্তের উইলে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা উন্নতির চরম শিখরে উঠেছে ; এ রকম শ্রেষ্ঠ রচনা আর হয় নাই। কৃষ্ণকান্তের উইলের ভাষা খাঁটি বাংলা, এর রচনা-কৌশল অত্যদ্ভুত। চতুর্থ স্তরে বঙ্কিমবাবু অল্পমাত্রায় 'ধর্ম' বইয়ের ভিতর দিয়ে দিতে লাগলেন। 'আনন্দমঠ' [১৮৮৪ খৃ], 'দেবী চৌধুরাণী [১৮৮৪ খৃ], 'সীতারাম' [১৮৮৭ খৃ.] এই স্তরের বই। সাহিত্যের ভিতর দিয়ে ধর্ম প্রচার করতে গেলে আর্ট নষ্ট হয়ে যায়। এজন্য এই তিনখানা বইয়ের সাহিত্যিক মূল্য কম। অবশ্য আনন্দমঠ খুব লোকপ্রিয় হয়েছে ; কিন্তু সে সাহিত্য হিসাবে নয়, অন্য হিসাবে। আনন্দমঠ রচনায় বঙ্কিমবাবু যথেষ্ট গুণপনা দেখিয়েছেন। বিশেষত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা ও দূরদৃষ্টির পরিচয় এতে যথেষ্ট পাওয়া যায়। আনন্দমঠ যখন প্রথম বেরুল তখন 'বন্দেমাতরম্' গান পড়ে তাঁর বন্ধু বান্ধব সমস্তই তাঁকে পরবর্তী সংস্করণে এই গান তুলে দিতে জেদ করলেন। তাঁরা বললেন এর ছন্দ হয় নি, ভাব হয় নি, ভাষা হয় নি ; এ যত শিগ্‌গির বই হতে মুছে দেওয়া যায় ততই ভালো। বঙ্কিমবাবু কিছুতেই টললেন না। তিনি বললেন, 'তোমরা যা বলতে হয় বল ; এ গান আমি রাখবই।' তাঁর

ভবিষ্যৎদৃষ্টি সার্থক হয়েছে ; সে গান আজ সমস্ত ভারতের বেদমন্ত্র হয়েছে ।[১৪]

উপন্যাস জগতে অনেকে বঙ্কিমবাবুর অনুসরণ করেছেন। এঁদের মধ্যে এক নম্বর ৺রমেশচন্দ্র দত্ত [১৮৪৮-১৯০৯ খৃ]। রমেশ দত্ত প্রথমে চারখানা বই লিখলেন ; তাদের ভাষা anglicised ; শেষে আরো দুখানি বই (সংসার, [১৮৮৬ খৃ.] সমাজ [১৮৯৪ খৃ.]) লিখেছেন উদ্দেশ্য নিয়ে— heterodox সমাজে বইগুলি কতক চলবে ।

বঙ্গদর্শন ছেড়ে আমরা অনেক দূর চলে এসেছি। বঙ্গদর্শন প্রথম পর্যায় চার বছর ছিল। এ সময়ে বঙ্কিমবাবু নিজে সব বিষয়ে তত্ত্বাবধান করে কাজ চালাতেন ; তখন বঙ্গদর্শনের সর্বাপেক্ষা গৌরবের সময়। সমস্ত বাছা বাছা প্রবন্ধ তখন এতে প্রকাশিত হত। 'কমলাকান্তের দপ্তর' [১৮৭৫ খৃ] এতে বেরুতে শুরু হয় [ভাদ্র ১২৮০ ব থেকে] ; তা ছাড়া বাংলার ইতিহাসেও বঙ্কিমবাবু হাত দিয়েছিলেন। বঙ্গদর্শনের কাটতিও খুব ছিল। সে সময়ে মাসিক পত্রের অভাব থাকাতে বঙ্গদর্শন পেয়ে সকলেই খুব খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু চতুর্থ বৎসর হতে পত্রিকা আর নিয়মিত ভাবে বের হল না। শেষে কিরূপ দুরবস্থা হয়েছিল তা এ থেকে প্রমাণিত হবে যে শেষ তিন সংখ্যা আমার একটি মাত্র প্রবন্ধ [ভারত মহিলা] অবলম্বন করে পত্রিকা খাড়া রয়েছিল।

দ্বিতীয় পর্যায়-- বঙ্কিমবাবু সম্পাদকের ভার তাঁর ভাই সঞ্জীববাবুর [চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৮৩৪-৮৯ খৃ.] উপর দিয়ে পত্রিকা চালাতে লাগলেন। সঞ্জীববাবু ইংরেজি লেখাপড়া বড়ো জানতেন না। তিনি দেশী ভাষায় খাঁটি দেশী জিনিস লিখতে আরম্ভ করলেন। এই পর্যায়ে বঙ্কিমবাবুর কৃষ্ণকান্তের উইল ও কমলাকান্তের দপ্তর (কিয়দংশ) প্রকাশিত হয়। সঞ্জীববাবুর পত্রিকা ভিন্ন অন্য আয় ছিল না। কিছু দিন পর বঙ্গদর্শন টাকার অভাবে আবার বন্ধ হল। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার [১৮৬০-১৯০৮ খৃ.] বঙ্গদর্শনকে পুনর্জীবিত করে ৫/৭ মাস রেখেছিলেন [৪ মাস, কার্তিক-মাঘ ১২৯০ ব.] ; তার পর আবার বন্ধ হয়। বঙ্কিমবাবুর মৃত্যুর পর বঙ্গদর্শন পুনরায় বেরুতে আরম্ভ হয় ও কিছু দিন চলে। [বৈশাখ ১৩০৮-বৈশাখ ১৩১৩ ব, সম্পাদক— রবীন্দ্রনাথ]।

বঙ্গদর্শনের অনুসরণ করে আরো দুখানা পত্রিকা গড়ে উঠেছিল—

'আর্যদর্শন' [প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৮৭৪ খৃ.] ও 'বান্ধব' [প্রথম প্রকাশ জুন ১৮৭৪ খৃ.]। 'আর্যদর্শনে'র সম্পাদক [যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, ১৮৪৫-১৯০৪ খৃ.] বড়ো তেজস্বী লোক ছিলেন ; তিনি সর্বদাই go-aheadism প্রচার করতেন এবং নিজে বিধবাবিবাহ করেছিলেন। আর্যদর্শনে ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্ডির জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়।[১৫] আর্যদর্শনের ভাষা বড়ো ফারসি বিদ্বেষী ছিল। তাতে 'দোয়াত' না লিখে 'মস্যাধার' 'কলম' না লিখে, 'লেখনী' লেখা হত। বান্ধব কাগজ খানা ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ [১৮৪৩-১৯১০ খৃ.] অনেক দিন বেশ সুখ্যাতির সহিত চালিয়েছিলেন।

এই তিনখানা পত্রিকা আমাদের দেশের যথেষ্ট উপকার করেছে। প্রথমত এরা general reader সৃষ্টি করেছে। দ্বিতীয়ত এতে ইংরেজির প্রভাব খুব কমিয়ে দিয়েছিল। যে সময়ে চিঠিপত্র ইংরেজিতে কিংবা সংস্কৃতে লেখা হত তখন বাংলা পত্রিকা প্রকাশ হওয়াতে যে বাংলার সম্মান খুব বেড়েছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। মাসিক পত্রিকা মেয়ে মহলে খুব আদর পেয়েছে ; এতে আমাদের গেরস্তালি ও রান্নার কাজের পক্ষে একটু খারাপ হলেও সাহিত্যের পক্ষে খুব ভালোই হয়েছে। মেয়েরা এখন বই লিখতে শিখেছেন এবং আমার মনে হয় যে তাঁরা পুরুষদের চাইতে ভালো বই-ই লিখছেন।

বঙ্কিমবাবুর পর অসংখ্য উপন্যাস লিখা হয়েছে. এদের বিষয় বলতে গেলে কূল পাওয়া যাবে না। তবে মোটামুটি এদের কয়েকটি বিশেষত্ব আমি দেখিয়ে দিতে চাই।

প্রথমত— আর্টের দিকে এদের দৃষ্টি নাই। লেখকদের যথার্থ সৌন্দর্য-বোধ নাই ও সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষমতাও এদের আছে কিনা সন্দেহ।

দ্বিতীয়ত— popularity-র দিকে দৃষ্টি বেশি। লোকে যা চায় তাই তারা দিতে প্রস্তুত। সাহিত্যের লক্ষ্য এরূপ হওয়া ঠিক নয়। রুসো [Jean Jacques Rousseau, ১৭১২-৭৮ খৃ.] পাছে popularity খুঁজতে যান এই ভয়ে বই বেচে পয়সা নিতেন না ; নিজে গাছ-গাছড়া বিক্রি করে জীবিকার্জন করতেন। তিনি ইহা খুব জোর করে বলে গিয়েছেন যে বই বেচে পয়সা নেওয়া উচিত নয়। কথাটা অদ্ভুত ঠেকলেও এর ভিতর গভীর সত্য আছে।

তৃতীয়ত— আজকালকার উপন্যাসে moral tone-এর বড়ো অভাব দেখা যায়।

বঙ্কিমবাবুর পরে এই স্রোত চলছে ; কোথায় গড়াবে কে জানে ? তবে বঙ্কিম সাহিত্যের উপযুক্ত চর্চা দেশে হয় নাই ; এ বিষয়ে আরো আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

গীতিকাব্য বিষয়ে দু-একটি কথা বলে আমি বক্তৃতার উপসংহার করব। গীতিকাব্য বাংলার একচেটিয়া বললেও অত্যুক্তি হয় না। সংস্কৃতের শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য রচয়িতা জয়দেব বাঙালি কবি ও বাংলা কবিতার নিকট ঋণী। জয়দেবের কবিতা হাজার সুললিত হলেও তা বড়ু চণ্ডীদাসকে ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি। জয়দেব রাজসভায় গান করেছেন, তাঁর ভাষা মার্জিত ও সুরুচিপূর্ণ ; চণ্ডীদাস বিশ্বমানবের সভায় গান করেছেন তাঁর ভাষা সরল ও প্রাণস্পর্শী। অতি প্রাচীন কাল থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত গীতিকাব্যে বাংলা ভাষা অন্য কোনো ভাষার নিকট মাথা নোয়ায় নাই। সুদূর বৌদ্ধযুগে বাঙালি প্রচারক খোল করতাল নিয়ে গান করতে করতে তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, সাইবিরিয়া[য়] ধর্মপ্রচার করেছিলেন। তারপর জয়দেব, বিদ্যাপতি এলেন। ইঁহারা গীতিকাব্যের রাজা। জয়দেবের পর মুসলমান রাজত্বের আক্রমণ কালে প্রায় দুই শতাব্দী সাহিত্যচর্চা বন্ধ হয়ে যায়। দেশে একটু শান্তি ফিরে আসতেই আবার সাহিত্যচর্চা আরম্ভ হয়। বৈষ্ণব যুগে তো গীতিকাব্য উন্নতির চরম সীমায় উঠেছিল। ইংরেজ রাজত্বের অভ্যুদয়ে যখন আবার সাহিত্যচর্চার হানি হল— মহাকাব্য রচনা যখন দেশ থেকে উঠে গেল— তখনো গীতিকাব্য নিভৃত পল্লীগ্রামে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। আর বর্তমানে তো গীতিকাব্যের রাজা রবীন্দ্রনাথই বাংলার মুখ উজ্জ্বল করে আছেন। গীতিকাব্যের মতো প্রাণ-মাতানো সাহিত্য আর নাই। ভাবপ্রবণ বাংলাদেশে এর শত্রু নাই ; যদি কেহ থাকেন তবে নীরস সংস্কৃতসেবী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের দল। গীতিকাব্য বিষয়ে একটি কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখা উচিত। তা এই যে, কাব্যের ভিতর দিয়ে জোর করে ধর্মপ্রচার করা যায় না। বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম গানের সাহায্যে প্রচারিত হয়েছিল বটে ; কিন্তু সে গান প্রাণের আবেগে রচিত হয়েছিল— ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে সে গান রচিত হয় নাই। উদ্দেশ্য নিয়ে

গান রচনা করলে কী শোচনীয় ফল হয় তার পরিচয় আমরা 'ব্রহ্মসঙ্গীতে' পাই।

মোটামুটি সাহিত্য সম্বন্ধে আমার শেষ একটি কথা বলবার আছে। Highest art, highest morality, highest religion একই জিনিস। যেখানেই এর কোনো একটির নির্মল ও সম্পূর্ণ বিকাশ, সেখানেই অপর দুটি আপনি এসে জুটে। কিন্তু যে মুহূর্তে একটির ভিতর দিয়ে আর-একটিকে প্রকাশ করবার চেষ্টা হয় তখনি সব পণ্ড হয়ে যায়। কালিদাস এ কথাটি খুব ভালো করে উপলব্ধি করেছিলেন : তাইতে তাঁর রচনা এত নিখুঁত। তিনি 'কাব্য' লিখিতেন : তার ভিতর দিয়ে ধর্ম প্রচার করতে চেষ্টা করেন নাই— ধর্ম ও নীতি তাঁর লেখায় আপনি এসে জুটেছে।

'বাসন্তিকা'
প্রথম খণ্ড, ১৩২৯ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য।

১. রাজা সীতাব রায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দুজন ডেপুটি নায়েবের অন্যতম এবং বিহারের রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। ১৭৭২ খৃস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁকে অপসারণ করেন।

মির-জাফরের মৃত্যুর পরে তাঁর মেজো ছেলে নিজাম-উদ্-দৌলা নামে নবাব হলেও (১৭৬৫ খৃ.) প্রকৃত শাসন ক্ষমতা কোম্পানির পক্ষ থেকে নিযুক্ত বাংলার ডেপুটি নবাব মুহম্মদ রেজা খাঁর উপরে ন্যস্ত হয়। রেজা খাঁর নিয়োগে বাংলায় মুর্শিদাবাদের নবাবি শাসন শেষ হল। পরে রেজা খাঁকে ডেপুটি-দেওয়ানের পদও দেওয়া হয় এবং রাজস্বসংক্রান্ত কর্তৃত্ব পান। তাঁর শাসনকালে মন্বন্তরে (১৭৬৯-৭০ খৃ.) বাংলার এক তৃতীয়াংশ মানুষের মৃত্যু হয়। ১৭৭২ খৃস্টাব্দে ডেপুটি-দেওয়ানের পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে কোম্পানি সরাসরি রাজস্ব-প্রশাসন নিজের হাতে নেয়।

২. অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে কাটোয়ার উত্তরে টেঞা-বৈদ্যপুর নিবাসী বৈষ্ণবদাস নামে পরিচিত গোকুলানন্দ সেন 'গীতকল্পতরু' নামে ১৩০ জনেরও বেশি কবির তিন হাজারের উপরে পদ সংগ্রহ করেন। গায়কদের মুখে মুখে এই পদসংহিতার নাম পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ায় 'পদকল্পতরু'। সতীশচন্দ্র রায়ের সম্পাদনায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত (১৩২২-৩৮ ব.)।

৩. আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রচিত নরহরিদাসের (নামান্তর ঘনশ্যাম, 'না জানি কি হেতু হৈল মোর দুই নাম নরহরি দাস আর দাস-ঘন শ্যাম) 'ভক্তিরত্নাকর' বৈষ্ণববিদ্যার একটি বড়ো কোষগ্রন্থ। নরহরিদাসের বাবা জগন্নাথ ছিলেন বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবপণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য। নরহরিদাসের আর দুটি বই 'নরোত্তমবিলাস' এবং 'শ্রীনিবাসচরিত্র'।

৪. Jean Henri Merle D'Aubigné, *History of the Reformation in Europe in the time of Calvin*, 8 Vols., London 1863-78.

৫. ১৮১৩ খৃস্টাব্দের চার্টার অ্যাক্টে "..for the revival and improvement of the literature and for the introduction and promotion of the knowledge of sciences···" এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু এই টাকা কাজে লাগানোর কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। ১৮২৩-এ The General Committee of Public Instruction গঠিত হলে প্রথম সরকারি তহবিল থেকে টাকা মঞ্জুর করা হয়।

৬. এই বইয়ের পৃ. ২৯৩ সূত্র ১৭ দ্র.

৭. 'সুখাবতীব্যূহ' মহাযান-সূত্র গ্রন্থাবলীর অন্যতম। দুখানি সুখাবতীব্যূহ পাওয়া গেছে, একখানি দীর্ঘ অন্যটি সংক্ষিপ্ত। এর বিষয় বুদ্ধ-অমিতাভর মহিমা। সহস্র ভিক্ষু ও বোধিসত্ত্ব পরিবৃত শাক্যমুনি রাজগৃহের গৃধ্রকূট পাহাড়ে এলেন। আনন্দকে অতীত কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে বললেন, তথাগত লোকেশ্বররাজ রূপে তিনি ধর্মাকর নামে এক ভিক্ষুকে উপদেশ দিয়েছিলেন। ধর্মাকর দীর্ঘ সাধনায় বুদ্ধত্ব অর্জন করেন। তাঁর নাম হয় অমিতাভ বা অমিতায়ুস, অমিত জ্যোতি বা অমিত আয়ুসম্পন্ন। তিনিই সৃষ্টি করেন সুখাবতী। মনোরম উদ্যান ও সরোবরে সাজানো বিহার ও প্রাসাদময় সুখাবতীতে অগণ্য প্রজ্ঞাবান্ শ্রাবক-বোধিসত্ত্বদের বাস। আকাঙ্ক্ষিত বস্তু এখানে ইচ্ছামাত্রই পাওয়া যায়। সুখাবতী এক সুখ-স্বর্গ। দ্র. *SBLN*, p. 236.

৮. এই বইয়ের পৃ. ২৯৪ সূত্র ১৯ দ্র.

৯. বেঙ্গল লাইব্রেরির রিপোর্টে গিরিশচন্দ্র ঘোষের (১৮৪৪-১৯১২ খৃ.) 'পূর্ণচন্দ্র' (১৮৮৯ খৃ.), 'বিষাদ' (১২৯৫ ব.), 'প্রফুল্ল' (১৮৮৯ খৃ.) এবং 'হারানিধি' (১৮৯০ খৃ.) সম্পর্কে শাস্ত্রীমশায়ের মন্তব্য—

"Babu Girish Chandra Ghosh, who is regarded in some quarters as thc Garrick of the Bengali stage, has produced a number of good plays, all well

written and well suited to the taste of those who patronise the native stage. His previous plays had a preponderance of the religious element in them. Of his works of the present year, *Pūrnachandra* is written in the old style. In *Bishād* the religious element is subordinated to the political and social, and in *Praphulla* it disappears altogether. *Praphulla,* by far the best work of fiction that appeared during the year, depicts middle class life in Calcutta. It shows that the influence of high English education without religious and moral training is bad. It makes men selfish, avaricious and thoroughly unscrupulous. Jogesh is a character which will be taken as a model in many societies. From abject poverty he raises himself by dint of his own exertions to opulence and a high position. As a Hindu he provides for his brothers, educates them, and as a good man has a kind word and an open hand for all. But he has one weakness— one vice— that of drunkenness. His educated brother Ramesh, who is an attorny, taking advantage of this, gets him to sign a document by which he transfers his entire estate to Ramesh, at a time when the failure of a Bank has involved Jogesh in great difficulty, and when he is anxious to save his credit with his dealers. Ramesh practises all sorts of cruelty in order to get possession of the property thus treacherously obtained. He drives his mother and his brother mad. He puts his younger brother in jail. He reduces his sister-in-law to death by starvation, and is on the point of putting his nephew to death when he is arrested by the police. The work is powerfully written, it paints a variety of minor characters with skill, and on the whole inspires the reader will love and admiration for

characters like Jogesh, and fills him with a strong aversion for selfish brutes like his attorney-brother Ramesh." (*RBL*, 1889, pp. 1-2)

"Babu Girish Chandra Ghosh holds a very high place among the dramatists of Bengal. He has gradually given up writing mythological and historical dramas, and is now engaged in dealing with everyday life. His *Hārānidhi* is an excellent production. It paints modern Bengali society as it is. The hero of the drama fails to pass the Entrance Examination by three marks, and flies from home. He leads an adventurous life in the North-Western Provinces, and, being of a generous and affectionate nature, often falls into great scrapes. Providence, however, rescues him from his difflculties, and he is never tired of doing good to those who stand in need of his help. A curious combination of circumstances brings him back to his native city, where a rich and powerful zamindar wishes to oust his father-in-law from his property and heaps all sorts of indignities upon him. The hero in disguise takes note of everything and manages matters so well that the zamindar is at last compelled to marry his only daughter to the hero's brother-in-law. The characters of the hero's wife, his mother-in-law, his father-in-law, his brother-in-law are vivid and life-like pictures of virtuous Bengali ladies and gentleman." (*RBL*, 1891, pp. 2-3)

১০. অমৃতলাল বসুর (১৮৫৩-১৯২৯ খৃ.) 'তাজ্জব ব্যাপার' (১৮৯০ খৃ.) এবং 'বাবু' (১৮৯৪ খৃ.) নাটক সম্পর্কে বেঙ্গল লাইব্রেরির রিপোর্টে শাস্ত্রী মশায়ের মন্তব্য—

"... *Tājjab Byāpār* by Babu Amrita Lāl Basu, the

author of the beautiful comedietta, *Bibāha Bibhrāt*, paints a state of society in which the Bengali males in women's garments live in the zenana and the Bengali women go abroad to earn their livelihood. The work is a satire on the female emancipation movement, and the writer's keen perception of the ludicrous has enlivened the work with a number of extremely humorous scenes. (*RBL*, 1891, p. 3)

"The author of the *Vivāha-vibhrāt*, the celebrated Bengalī comedietta, has come out this year with another sparkling comedy entitled *Babu*. The object of the new work is the same as that of the old, namely, to ridicule the Reform movement. He holds up the reformers as cowardly, selfish, and utterly devoid of principles. In this work an advocate of female emancipation is represented as being unable to save his wife while walking in the Eden Gardens from the attack of a sailor." (*RBL*, 1894, p. 2.)

১১. ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'নববাবুবিলাস' (১৮২৫ খৃ.) এবং 'নববিবিবিলাস' (আ. ১৮৩১ খৃ.)। 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ'-এ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন 'নববিবিবিলাস' ভবানীচরণেরই রচনা।

১২. এই বইয়ের পৃ. ৫২৮ সূত্র ৬ দ্র.

১৩. G.M. Reynolds-এর অভিজাত সমাজের ভেতরের কেলেঙ্কারি নিয়ে লেখা কাহিনীগুলির অনুকরণে 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র লেখক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দেশী ছাঁচে ১২ খণ্ডে প্রায় ৯০০ পৃষ্ঠার বই 'হরিদাসের গুপ্তকথা' (১২৭৭-৭৯ ব.) লেখেন। খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশের সময়ে নাম ছিল 'এই এক নূতন! আমার গুপ্ত কথা!! অতি আশ্চর্য !!!' নায়কের নাম হরিদাস। এই বই লেখার সময়ে ভুবনচন্দ্র উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের আশ্রিত ছিলেন, বইয়ের স্বত্ব ছিল উপেন্দ্রকৃষ্ণের।

'লণ্ডন-রহস্য' (১৮৭১ খৃ.) হরিচরণ রায়ের নামে প্রকাশিত রেনল্‌ড্‌সের অনুবাদ। এটিও ভুবনচন্দ্রের রচনা হতে পারে।

১৪. এই বইয়ের পৃ. ৪৮ সূত্র ১ দ্র.

১৫. এই বইয়ের পৃ. ৫৩১ সূত্র ৯ দ্র.
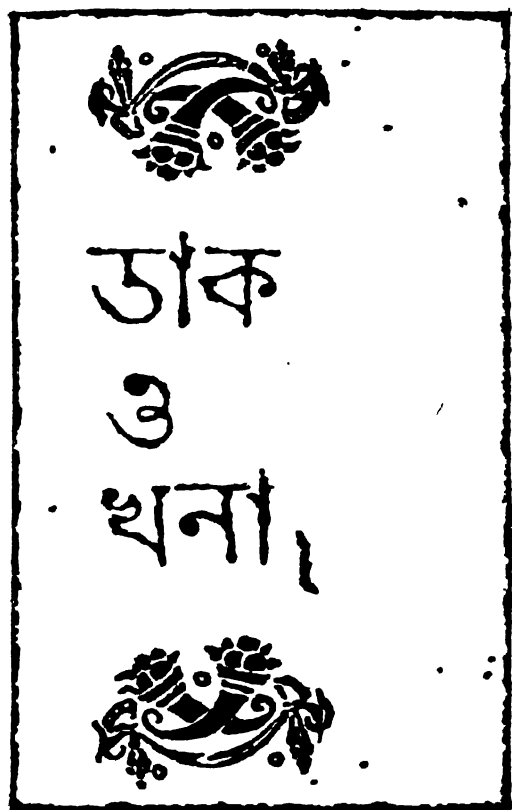
বাংলায় ডাক ও খনার বচন. বলিয়া কতকগুলি চল্‌তি কথা আছে। কোন্‌টি ডাকের বচন, কোন্‌টি খনার বচন ঠিক করিয়া লওয়া দুষ্কর। ভাষা দুয়েরই চাঁছা-ছোলা পরিষ্কার। অল্প কথায় এতো ভাব প্রকাশ করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু এই-সকল বচনে খুব অল্প কথায় অনেক উপদেশ দিয়া গিয়াছে। দুই-চারিটি ডাকের বচন সকলেই জানে, সকলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সব বচন একত্রে পাওয়া যায় না। এ-সকল বচন যে কবে লেখা হইয়াছে তাহাও বলা যায় না, কিন্তু ভাষা যেরূপ চোস্ত, বেশি দিনের বলিয়া মনে হয় না।

আমাদের দেশে লোকের ধারণা খনা বরাহমিহিরের পুত্রবধূ। বরাহ-

মিহির ৪৭৬ খৃ. সালে জন্মান এবং ২৩ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রধান বই লেখেন।[১] তিনি আপনাকে আবন্তক বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। আবন্তক বলিলে অবন্তী দেশের লোক বুঝায় অথবা এক জাতীয় ব্রাত্য ব্রাহ্মণ। তিনি অতি দীর্ঘজীবী ছিলেন. শেষকালে গঙ্গাতীরে কান্যকুব্জে বাস করিতেন। তাঁহার পুত্রের নাম পৃথুষশ। তিনিও একজন বড়ো জ্যোতিষী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার নাম বরাহমিহির। আমাদের খনার, শ্বশুরের নাম বরাহ, স্বামীর নাম মিহির।

১. বলে গেছে বরাহের বৌ।

২. ডাক দিয়ে বলে মিহিরের স্ত্রী শুনহ পতির পিতা।

খনা মিহিরের স্ত্রী ও বরাহের বউ অর্থাৎ পুত্রবধূ। অবন্তীর বরাহ-মিহিরের সহিত খনার সম্পর্কটা ঠিক নয়। তিনি বাংলা দেশেরই মেয়ে। তাহার প্রমাণ—

শয়ন উত্থান পাশমোড়া।
তার মধ্যে ভীমা ছোঁড়া॥
দুই ছেলের জন্মতিথি
অষ্টমী নবমী দুটি॥
পাগলা চৌদ্দ পাগলীর আট।
এই নিয়ে কাল কাট॥
ইহাও যদি না কত্তে পারিস্।
ভগার খাতে ডুবে মরিস॥

ভগার খাত অর্থাৎ গঙ্গা। 'ভগীরথ খাতাবচ্ছিন্ন জল প্রবাহ' এ কথাটা বাংলা ছাড়া অন্য কোথাও প্রচলিত নাই। সুতরাং খনা বাঙালির মেয়ে. কোনো প্রসিদ্ধ বাঙালি জ্যোতিষী আচার্যের স্ত্রী ও আচার্যের বউ।

এই বচনগুলি বেশি দিনের যে পুরানো নয় তাহার কারণ এই যে ইহাতে অনেকগুলি আরবি পারসি শব্দ আছে। তাহার প্রমাণ—

দাতার নারিকেল, বকিলের বাঁশ।
কমে না বাড়ে বার মাস॥

'বকিল' শব্দটি আরবি।

আগে পুতে কলা।
বাগ বাগিচে ফলা॥

'বাগ বাগিচে' পারসি শব্দ।

খনা ডাকিয়ে বলে।
চিটা দিলে নারকেল মূলে॥
গাছ হয় তাজা মোটা।
শীঘ্র শীঘ্র ধরে গোটা॥

'তাজা' শব্দটা পারসি।

বাঁশ বনের ধারে বুন্‌লে আলু
আলু হয় গাছ বেড়ালু॥

এ আলু আমাদের গোল আলু নয়, অন্য আলু, চুবড়ি আলু। কিন্তু 'আলু' শব্দটি পারসি।

শোন্‌রে মালি বলি তোরে।
কলম রো শাওনের ধারে॥

'কলম' শব্দটাই পারসি। 'কলম' করা মুসলমানেরাই হিন্দুদের শিখাইয়াছে। সংস্কৃতেও 'কলম' শব্দ আছে। কিন্তু তাহার মানে 'ধানের গাছ'।

আপাদ্‌পদ্মপ্রণতাঃ কলমা ইব তে রঘুম্‌।
ফলৈঃ সংবর্দ্ধয়ামাসুরুৎখাতপ্রতিরোপিতাঃ॥[২]

এতক্ষণ যা বলা হইল তাহাতে বেশ বোঝা যাইবে যে খনা বাঙালির মেয়েও বটে আর মুসলমান আমলের মেয়েও বটে। কিন্তু হিন্দুর মেয়ে, বৌদ্ধের নয়। নাহিলে তিনি কেবল মাত্র হিন্দুর উপবাসের কথা লিখিতেন না।

ডাক

ডাকিনীর পুংলিঙ্গ ডাক। একথা আমি প্রথম নেপাল হইতে শুনিয়া আসি এবং বলি। সেখানে বলে বামাচারে যাহারা সিদ্ধ হয় তাহাদিগকে বীর বলে। বড়ো বড়ো বীরের নাম বীরেশ্বর বা ডাক। তা তিনি হিন্দুই হউন আর বৌদ্ধই হউন। বৌদ্ধদের ভিতর ডাকার্ণব বলিয়া এক তন্ত্র আছে। বজ্রডাক তন্ত্র নামেও এক তন্ত্র আছে। ডাকার্ণবের মাঝে মাঝে সংস্কৃতের ভিতর চলিত ভাষায় কিছু কিছু লেখা আছে। আমি সেগুলি প্রায় সবই আমার 'হাজার বছরের পুরাণ বৌদ্ধ

২. ২।৪৮

গান ও দোহা'র [১৩২৩ ব.] মধ্যে তুলিয়া দিয়াছি। কিন্তু সে ভাষাটা বাংলা একেবারেই নয়। কী ভাষা বুঝিতে না পারিয়া অনেক ভাষা-পণ্ডিতের নিকট পাঠাইয়াছিলাম। মোনাহান সাহেব বলেন পুরানো আসামি।[৩] গ্রিয়ার্সন সাহেব [Sir George Abraham Grierson, ১৮৫১-১৯৪১ খৃ.] বলেন সেগুলি পঞ্জাব অঞ্চলের ভাষা। বাংলা নয় সেটা এক রকম স্থির।

আর-এক ডাক আছেন, তিনি বৌদ্ধদের। বৌদ্ধদের হেরুক বলিয়া এক দেবতা আছেন। তিনি সকলের অপেক্ষা বড়ো দেবতা। তাঁহার শক্তি বজ্রবারাহী। তিনি যখন বজ্রবারাহীর সঙ্গে যুগ্মনদ্ধ ভাবে থাকেন তখন তাঁহাকে ডাক বলে। বজ্রডাক হেরুকতন্ত্র প্রভৃতি বৌদ্ধদের তন্ত্রের মধ্যে মাঝে মাঝে চলিত ভাষায় গান ও ছড়া পাওয়া যায়। সে গান ও ছড়া পুরানো বাংলা, বৌদ্ধ গান ও দোহার বাংলা। কিন্তু তাহাতে বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের কথা ছাড়া আর-কিছুই নাই।

ডাকের বচন যতদূর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বৌদ্ধধর্মের বড়ো কিছু পাইলাম না। বরং যাহা পাইলাম তাহা হিন্দুর কথা।

১. অতিথি জনারে না বঞ্চিহ।
অতি উৎকট ব্রাহ্মণে না বলিহ॥

২. সাত পাঁচ তিন জন।
তিন দুই যদি হয় ব্রাহ্মণ॥

অর্থাৎ মধ্যস্থ করিতে হইলে সাত পাঁচ তিনজন লোক লইতে হয়, কিন্তু ব্রাহ্মণ হইলে অত লোকের দরকার নাই : দুই-তিন জন লোক হইলেই যথেষ্ট হয়।

ব্রাহ্মণ লইয়া মঙ্গল গাএ।
যাত্র গোতে আরু যাএ॥
এ যাত্রায় যে জন যাএ।
দোলা ঘোড়া সেজন পাএ॥

সুতরাং ব্রাহ্মণ মঙ্গল গাহিয়া দিলে শুভ যাত্রা।

গর্গ বলে ঘর ছাড়।
ভৃগু বলে সীমা এড়॥

ভরদ্বাজ মুনি কএ।
শুভ ক্ষণে যাত্রা হএ॥
ঠাঁই ফেলিয়া যাএ যবে।
বরাহের যাত্রা হয় তবে॥

এই-সকল ঋষিরা হিন্দুর, বৌদ্ধদের নহেন।

পরের বোল লাগা হয়।
শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণী লয়॥
সিন্দকারে ওঠে কাস।
তাহার হয় জীবনের নাস॥

এটাও হিন্দুরই কথা।

[যাঁহারা] মনে করেন খনা হিন্দু আমলের লোক, তাঁহাদের আমি মন দিয়া এই কয়টি ছত্র পড়িতে অনুরোধ করি।

তামাক বুনে গুঁড়িয়ে মাটী।
বীজ পোঁত গুটি গুটি
ঘন ঘন পুত না।
পোষের অধিক রেখো না॥

খনার অন্য অন্য যে ছড়া আছে তাহার সহিত এই ছড়াকয়টিতে ভাষার কোনোই গরমিল নাই। সেই ছোটো ছোটো কথায় ছোটো ছন্দে একটি পাকা উপদেশ। কিন্তু তামাক কি হিন্দু আমলে ছিল? উহা তো আমেরিকা আবিষ্কারের পর টোব্যগাদ্বীপে পাওয়া যায়; তাই উহার নাম হইয়াছে টোব্যাকো। টোব্যাকো হইতে আমরা 'তামাকু' করিয়া লইয়াছি। উহা তো আকবরের রাজ্যের শেষভাগে পর্তুগিজরা আনিয়া আকবরকে উপহার দিয়াছিল। পর্তুগিজরা যেমন করিয়া খাইত তেমনি গুড়গুড়ি, ফরাস, কল্‌কে সাজাইয়া তাহারা আকবরকে খাইতে বলিল। আকবরও নলটি মুখে লইয়া টানিতে যাইতেছেন এমন সময় তাঁহার হাকিম আসিয়া বলিল, "আজান জিনিস খাবেন না।"

আকবরের সময় দেশে তামাক একটু আধটু চলিয়াছিল, কিন্তু জাহাঙ্গীর আইন করিয়া তামাক খাওয়া নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরেরও পরে তামাকের চাষ আরম্ভ হয়। সুতরাং খনার এ বচনটিও

কিছুতেই প্রাচীন হইতে পারে না। বলিবে খনার বচন সংগ্রহ মাত্র, উহাতে অনেক কালের অনেক জিনিস আছে। তাহা হইলে আমি নাচার।

আর-একটা কথা, হিন্দুর নানা প্রকার সংস্কার আছে ; তাহাতে জ্যোতিষের দরকারটা বড়ো বেশি। কিন্তু সেটা কি পাঠানদের সময় অত ছিল ? সেটা যেন মোগল আমলেই বেশি হইয়া আসিয়াছিল। সেই সময়ই আরবি হইতে সংস্কৃতে ফলিত জ্যোতিষের অনেক বই তর্জমা হয়। সে বইগুলিকে "তাজিক" বলিত। "হিল্লাজ"ও বলিত। গণেশ দৈবজ্ঞ ও তাঁহার বংশধরেরা সেই আরবি জিনিসগুলি খুব ছড়াইয়া দেন। সে সময়ে বোধ হয় খনার জ্যোতিষের বচনগুলি অনেক তৈরি হয়। আমাদের দেশে অর্থাৎ বাংলায় সেই পুরানো কালের জ্যোতিষই চলিতেছিল। গণেশ দৈবজ্ঞের ঢেউ যেন খনার বচনের মধ্যে অনেক প্রবেশ করিয়াছে সুতরাং ডাককে বৌদ্ধ যুগের লোক বলা কতদূর সঙ্গত বলিতে পারি না। ডাক যে মুসলমান আমলের লোক তাহার প্রমাণ এই—

তকরার আগে পত্র লিখিব।
তবে আনিয়া সাক্ষী বোলাব ॥

'তকরার' শব্দ পারসি।

মধ্যস্থ হইয়া হেমাতি বোঝে।
বলে ডাক সে নরকে মজে ॥

'হেমাতি' পারসি শব্দ।

বস্তু লইয়া কর্জ্জ দিব।

'কর্জ্জ' পারসি শব্দ।

বিনি সাক্ষীতে না দিব খত।

'খত' পারসি শব্দ। এসব আদালতের শব্দ। সুতরাং মুসলমান রাজাদের সময়ই আমরা এ-সকল শব্দ পাইয়াছি।

বেগর চাষে দিত পান।

'বেগর' শব্দটি পারসি।

আদব নষ্ট নীচ গমনে।
রোগ নষ্ট লঘু ভোজনে ॥

'আদব' শব্দটি পারসি।

এতগুলি আদালতের পারসি শব্দ যাহাতে আছে সে জিনিসটিকে প্রাচীন বলিতে ভরসা হয় না।

আমার এক-একবার বোধ হয় ডাক পূর্ব দেশের লোক। কারণ তিনি যে-সকল ব্যঞ্জনের কথা বলিয়াছেন সেগুলি পূর্ববঙ্গেই পাওয়া যায়।

সুকুতার পাতা কাসুন্দির ঝোলে।
তেলের উপর দিয়ে তোলে॥
পলতা শাক রুহি মাছ।
বলে ডাক ব্যঞ্জনে সাজ॥

তিতো দিয়ে মাছ রান্না রাঢ়েও নাই, বাগড়িতেও নাই।

মদ্গুর মাছ দাএ কুটিয়া।
হিঙ্গ আদা লবণ দিয়া॥
তেল হলদি তাহাতে দিব।
বলে ডাক ব্যঞ্জন খাব॥

পশ্চিমবাংলায় মাগুর মাছের ঝোলই খায়। এইরূপ করিয়া মাগুর মাছ খায় না।

পোনা মাছ জামীরের রসে।
কাসুন্দি দিয়া যে জন পরশে॥
তাহা খাইলে অরুচ্য পালায়।
আছুক মানবের দেবের লোভ যায়।

নেবুর রস দিয়া পোনা মাছ খাওয়া পশ্চিমবঙ্গে নাই। কাসুন্দি বলিতে পশ্চিমবঙ্গে টক আচার বুঝায়। পূর্ববঙ্গে ইহাকে 'আমকাসুন্দি' বলে। আমি প্রথম বুঝিতে পারি নাই যে ডাক নেবুর উপর আবার কাসুন্দি দেয় কেন, তাহার পর শুনিলাম বঙ্গদেশে কাসুন্দি বলে 'গোটা'-কে অর্থাৎ কাঁচা আঁব কুটিয়া তাহার সহিত যে জিনিসটা মিশাইয়া পশ্চিমবঙ্গে কাসুন্দি করে সেইটাকেই পূর্ববঙ্গে কাসুন্দি বলে। সেটা সরষের গুড়ার সঙ্গে নানারূপ মশলা মিশানো। খাইতে অতি সুন্দর; পশ্চিমবঙ্গে তাহাকেই 'গোটা' বলে।

বড় ইচিলা দাএ কুটি।
হিঙ্গ দিয়া তেলে ভাজি॥

উলটি পালটি দেহ পিট।
ইহ খাইলে বোজন দিট॥

এই যে চিংড়ি মাছের বড়া বা চপ ইহা পশ্চিমবঙ্গে নাই। পূর্ববঙ্গে চিংড়ি মাছকে ইচা বা ইচিলা বলে।

যাহা বলিলাম তাহাতে বুঝিতে হইবে ডাক ও খনার বচন বৌদ্ধদের নয়, হিন্দুর। তাও খুব পুরানো নয়। মুসলমান আমলের বটে কিন্তু কতো পুরানো বলা যায় না। বোধ হয় পাঠান আমল হইতেই আরম্ভ; মোগল আমলে শেষ। খনার বচন অধিকাংশই চাষের কথা এবং জ্যোতিষের কথা। 'গুপ্তপ্রেসের' পাঁজিতেই খনার বচনগুলি বেশ সংগ্রহ করা আছে। এতো সংগ্রহ আর কোথাও আছে কিনা জানি না। ডাকের বচন শুধু জ্যোতিষ ও চাষ লইয়া নয়। ইহাতে আরো অনেক কথা আছে। ছেলে মানুষ করা, গৃহিনীর দোষ, গৃহিনীর গুণ, সতীর লক্ষণ, অসতীর লক্ষণ, ব্যঞ্জন রাঁধা, বর্ষার লক্ষণ, ওষুধ এবং আরো অনেক কথা আছে। উপদেশ অনেক রকম আছে। ভালো লোক হইতে গেলে কী কী পরিহার করিতে হয় তাহার একটা তালিকা আছে।

পরিহর নারী যে স্বামী নাই।
পরিহর সেবক যার দুই গোঁসাই॥

* * *

পরিহর ধনী কুটুম্বের মুখ।
পরিহর ভোজনে বাসি সুপ॥
পরিহর দুই গ্রামে চাষ।
পরিহর যত্নে পরস্ত্রীর হ্লাস॥

* * *

পরিহর বিনি কড়িতে হাট্।
পরিহর পুকুর পিছল ঘাট॥
পরিহর একলা চলিতে বাট্।
পরিহর শয়নে ভাঙ্গা খাট॥

* * *

পরিহর যত্নে পরের আশ।
পরিহর বিনি বলদে চাষ॥

পরিহর নাল্গুচি যার মন।
পরিহর যত্নে খল ব্রাহ্মণ ॥

ডাক চরিত নামে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একখানি পুথি আছে। তাহা হইতেই আমরা ডাকের বচন সংগ্রহ করিলাম। ঐ পুথিখানি ১০৯০ সালে লেখা।

'প্রাচী'
শ্রাবণ, ১৩৩০ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. বরাহমিহির খৃস্টীয় ষষ্ঠ দশকের মানুষ, কিন্তু তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। ভিন্ন মতে জন্ম ৫০৫ খৃস্টাব্দে। মৃত্যু ৫৭৮, মতান্তরে ৫৮ খৃস্টাব্দে। তাঁর প্রসিদ্ধ রচনা 'বৃহৎসংহিতা' ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম অর্ধেই রচিত হয়েছিল। অন্যান্য রচনা 'বৃহদ্বিবাহ-পটল', 'স্বল্পবিবাহপটল', 'যোগযাত্রা', 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা', 'বৃহজ্জাতক' এবং 'লঘুজাতক'। কিংবদন্তি অনুসারে তিনি অবন্তীর অধিবাসী এবং বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের অন্যতম। তাঁর ছেলে পৃথুযশা বা পৃথুযশসের লেখা 'হোরাষটপঞ্চাশিকা' জ্যোতিষের বই।

২. অনুবাদ : শালি ধানের চারা (কলম) উপড়ে নিয়ে আবার পুঁতে দিলে যেমন ফলভরে আনত হয়ে শস্য দেয় তেমনি তারা পা পর্যন্ত অবনত হয়ে রঘুকে সম্মান জানালে।

৩. চৈতন্য লাইব্রেরিতে Francis John Monahan বৌদ্ধগান ও দোহা বিষয়ে আলোচনা করেন। আলোচনার সারাংশের জন্য দ্র. বিমলাচরণ মৈত্রেয়, "বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎপত্তি আলোচনা", 'সাহিত্য' ১৩২৪ ব., পৃ. ৩৫৬।
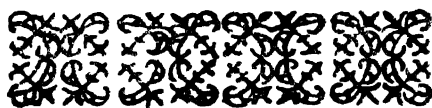
বিদ্যাপতি বাংলার ও মিথিলার একজন আদিকবি ও মহাকবি। তিনি একাধারে সম্পন্ন-গৃহস্থ, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, কবি, পদকর্তা, সভাসদ, রাজকর্মচারী, সেনাপতি এবং সংস্কৃত ও মৈথিল ভাষায় নানা গ্রন্থের গ্রন্থকার। কিন্তু তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি গান বাঁধাতেই হইয়াছিল। তাঁহার গানে যে শুদ্ধ মিথিলার লোকেই মুগ্ধ হইয়াছিল, এমন নহে সমস্ত আর্যাবর্ত তাঁহার গানে মুগ্ধ হইয়াছিল। বেশি হইয়াছিল বাংলা। চৈতন্যদেব তাঁহার গান বড়ো ভালোবাসিতেন। সুতরাং চৈতন্য সম্প্রদায়ের সব লোকই বিদ্যাপতির গোঁড়া ছিলেন। চৈতন্যের সময়ের এবং পরের অনেক পদকর্তা বিদ্যাপতির নকল করিতেন। ভাবের নকল তো

করিবেনই, অনেকে ভাষারও নকল করিতেন। বিদ্যাপতির নকলে বাংলায় যে ভাষা হয় তাহার নাম ব্রজবুলি।[১] কিন্তু ব্রজ বা মথুরার সঙ্গে সে ভাষার কোনো সম্পর্ক নাই। সেটা সেকালের মৈথিলি ভাষার ছায়া মাত্র। ব্রজবুলিতে গোবিন্দদাস সিদ্ধহস্ত ছিলেন। জ্ঞানদাস রায়-শেখর প্রভৃতি পদকর্তারাও ব্রজবুলিতে গান লিখিতেন।

চৈতন্যের বৈষ্ণবধর্মে গোড়া হইতেই দুইটি দল হয়। একটির নাম গোস্বামীমত, অপরটির নাম সহজিয়া। গোস্বামীমতের লোকেরা মুখে বেদ মানিতেন, কিন্তু কখনো পড়িতেন না, যাঁহারা বড়ো পণ্ডিত হইতেন তাঁহারা গীতা ও ব্রহ্মসূত্র পড়িতেন। কিন্তু ভাগবতই তাঁহাদের প্রধান পুঁথি। ভাগবতের দশম আর একাদশ তাঁহারা খুব পড়িতেন এবং উহার নানারূপ মধুর ব্যাখ্যা করিয়া আপনাদের মত প্রচার করিতেন। সহজিয়ারা সংস্কৃত পুঁথির দিক দিয়া বড়ো যাইত না, তাহারা মনে করিত নিজের দেহেতেই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আছে, দেহের সেবাই তাহাদের পরমার্থ। স্ত্রীলোকের প্রেম হইতেই তাহারা বিশ্বপ্রেমে যাইবার চেষ্টা করিত। গোস্বামীমতের লোকে বিদ্যাপতিকে যে ভাবেই দেখুন না কেন, সহ-জিয়ারা তাঁহাকে সহজিয়া ভাব হইতেই দেখিত। তাহারা তাঁহাকে সাত জন রসিক ভক্তের একজন বলিয়া মনে করিত। প্রধান রসিক ভক্ত বিল্ব-মঙ্গল যেমন চিন্তামণি নামে এক বেশ্যার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া পরে কৃষ্ণ-প্রেমে মত্ত হইয়াছিলেন, বাঙালি সহজিয়ারাও মনে করিত যে বিদ্যাপতি সেইরূপ শিবসিংহের পত্নী লখিমাদেবীর প্রেমে মত্ত হইয়া, পরে কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা হইয়াছিলেন। তাই তিনি কৃষ্ণরাধার প্রেম লইয়া বহু-সংখ্যক পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহারা মনে করে বিদ্যাপতির সমস্ত পদই সহজিয়া ভাবের পদ। বিদ্যাপতি কিন্তু সহজিয়া ছিলেন না। তিনি মিথিলা, বাংলা ও ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের ব্রাহ্মণের ন্যায় স্মার্ত ও পঞ্চোপাসক ছিলেন, অর্থাৎ স্মৃতির ব্যবস্থা মানিয়া চলিতেন এবং গণেশ, সূর্য, শিব, বিষ্ণু ও দুর্গা এই পঞ্চ দেবতার উপাসনা করিতেন। তাঁহাদের পূর্বপুরুষেরা অনেকেই শিবের মন্দির দিয়া গিয়াছিলেন ; তিনিও নিজের গ্রাম বিসপিতে শিবের মন্দির দিয়াছিলেন। সে মন্দির এখনো নাকি আছে। গঙ্গার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, তাঁহার আসন্ন কাল উপস্থিত দেখিয়া তিনি পালকি করিয়া গঙ্গার তীরে যাইতেছিলেন।

পথে আর সময় নাই, অন্তিমকাল উপস্থিত দেখিয়া তিনি পালকি নামাইতে বলিলেন এবং মাটিতে বিছানা করিয়া শুইলেন। এমন সময় দূরে একটা জলস্রোতের শব্দ হইল। দেখা গেল গঙ্গা স্রোতস্বিনী হইয়া বেগে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং সেই জলেই তাঁহার অন্তর্জলি হইল। তিনি যেমন কৃষ্ণরাধার প্রেমের অনেক পদ লিখিয়া গিয়াছেন, তেমনি শিব ও গঙ্গার বিষয়ে অনেক পদ লিখিয়া গিয়াছেন।

স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি 'শৈবসর্বস্ব-সার' নামে একখানি স্মৃতির গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। উহাতে স্মৃতির মতে শিবপূজার যত বিধান আছে সব দেওয়া আছে। তিনি 'গঙ্গাবাক্যা-বলী' নামে আর-একখানি স্মৃতির গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, উহাতে হরিদ্বার হইতে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত গঙ্গার কোন্ তীর্থে কোন্ তীর্থকৃত্য করিতে হয় তাহার বিবরণ পাওয়া যায়। সেকালে নানারূপ দান চলিত ছিল। তাহার মধ্যে ষোড়শ দান অতি প্রসিদ্ধ; তুলাপুরুষদান সর্ব প্রধান। বিদ্যাপতি 'দানবাক্যাবলী' নামে একখানি স্মৃতির গ্রন্থ লিখিয়া এই-সকল দানের ইতিকর্তব্যতা নির্ণয় করিয়া যান। বারোমাসে তেরো পার্বণ সকলেই জানেন। তিনি এই তেরো পার্বণের এক বই লেখেন তাহার নাম 'বর্ষক্রিয়া'। দায়ভাগেরও তাঁহার এক বই আছে, নাম 'বিভাগসার'।

পুরাণেও তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি যখন শিবসিংহের পিতা দেবসিংহের সঙ্গে নৈমিষারণ্যে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় কোশল, মিথিলা, কাশী, প্রয়াগ প্রভৃতি দেশের প্রধান প্রধান গ্রাম ও নগরগুলির একটি বিবরণ লিখিয়া যান। উহার নাম 'ভূ-পরিক্রমা'। উহা এখনকার গেজেটিয়ারের মতো। কিন্তু পুরাণের সঙ্গে না মিলাইলে তো উহা প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না। তাই তিনি লিখিয়াছেন যে, বলরাম শাপগ্রস্ত হইলে শাপ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য যে-সকল তীর্থে গমন করেন, তাহারই বিবরণ লইয়া তিনি লিখিতেছেন।

তিনি যে শুধু পণ্ডিতই ছিলেন, কেবল পুঁথি লইয়াই থাকিতেন, তাহা নহে। তাঁহার নিজের সময়ের ও তাহার আগেকার অনেক ঘটনা তিনি তাঁহার 'পুরুষপরীক্ষায়' লিখিয়া গিয়াছেন। পুরুষপরীক্ষা এক-রকম গল্পগুচ্ছ বলিলেও হয়। উহা কিন্তু সমস্তটাই কাল্পনিক নহে। অধিকাংশই সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। উহাতে মামুদ গজনির

[প্রথম ভারত আক্রমণ ১০০১ খৃ.] সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যা-পতির সময় পর্যন্ত অনেক সত্য ঘটনা পাওয়া যায়। যাঁহারা পুরুষ, যাঁহাদের পুরুষের মতো সদ্‌গুণ ছিল, তাঁহাদেরই গল্প পুরুষপরীক্ষায় পাওয়া যায়। মুসলমানেরা এদেশ জয় করিলে, তাঁহারা হিন্দুদের সঙ্গে বিশেষ হিন্দু বীরপুরুষদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতেন, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত ইহাতে পাওয়া যায়। যাঁহারা এই সময়ের ভারতবর্ষের ইতিহাস ভালো করিয়া বুঝিতে চান, পুরুষপরীক্ষা তাঁহাদের পক্ষে বড়োই দরকার।

বিদ্যাপতির আর-একখানি অতি সুন্দর বই 'লিখনাবলী' অর্থাৎ পত্র লিখিবার ধারা। কাহাকে পত্র লিখিতে হইলে কিরূপ পাঠ দেওয়া দরকার, তাহা এই পুস্তকে খুব ভালো করিয়া দেওয়া আছে ও সেই সঙ্গে সঙ্গে সেকালের অনেক রাজারাজড়া ও বড়ো বড়ো লোকের নামও আছে।

তখন ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে দুর্গাপূজাটা খুব চলিয়া আসিতেছিল। আমাদের দেশে সাহড়িয়া গাঞীয়ের মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি' 'দুর্গোৎসববিবেক' নামে একখানি গ্রন্থ লেখেন। উড়িষ্যার রাজা পুরুষোত্তম দেব [১৪৭০-৯৭ খৃ] দুর্গাপূজার আর-একখানি বই লিখিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্যাপতির 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' [দুর্গাপূজাতরঙ্গিনী ?] প্রমাণে ও প্রয়োগে এই দুই পুস্তকের অপেক্ষা কোনো অংশেই ন্যূন নহে। এই-সকল স্মৃতির গ্রন্থ লিখিতে বিদ্যাপতিকে সমস্ত বেদ, পুরাণ, স্মৃতি পড়িতে হইয়াছিল। কেননা, তিনি যাহা-কিছু বলিয়াছেন, সকলেরই প্রমাণ দিয়াছেন, প্রমাণ না দিলে তাঁহার কথা শুনিবে কে ? শুধু যে পুঁথি পড়িয়াই তিনি বই লিখিয়াছিলেন এমন নহে, তাঁহাকে অনেক দেশ ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। সকলেই জানে যে প্রয়াগে গঙ্গা যমুনা সরস্বতী মিলিত হইয়া যুক্তবেণি হইয়াছিলেন। কিন্তু সপ্তগ্রামে গিয়া আবার তিনটি নদী যে মুক্তবেণি হইলেন, সে কথাও বিদ্যাপতিই বলিয়া যান। প্রথম মুসল-মান আক্রমণের প্রবল স্রোতে হিন্দুদিগের ধর্মকর্ম একপ্রকার লোপ পাইয়া আসে। মৈথিল পণ্ডিতেরা নানা গ্রন্থ রচনা করিয়া আবার হিন্দু-সমাজকে পুনর্গঠিত করিবার চেষ্টা করেন। বিদ্যাপতি এই-সকল মৈথিল পণ্ডিতদিগের মধ্যে একজন প্রধান। শুনা যায়, তিনি গয়া সম্বন্ধেও এক পুঁথি লিখিয়া গিয়াছেন। যে সময় মুসলমানেরা কুরুক্ষেত্র, বৃন্দাবন, প্রয়াগ,

এমন-কি, কাশী পর্যন্ত লোপ করিয়া তুলিয়াছিল, সেই সময়ে বিদ্যাপতি প্রাদুর্ভূত হইয়া নানা গ্রন্থ লিখিয়া অনেক তীর্থের পুনঃ সংস্থাপন ও অনেক হিন্দু সৎকর্মের পুনঃ প্রচলন করেন। তিনি ও তাঁহার সহযোগী মৈথিল পণ্ডিতদিগের নিকট হিন্দু সমাজ এ বিষয়ের জন্য চিরদিন ঋণী থাকিবে। পরবর্তী পণ্ডিতেরা হিন্দুদিগের ক্রিয়াকাণ্ড ও তীর্থ সম্বন্ধে বই লিখিতে গেলেই বিদ্যাপতির দোহাই দিতে হইয়াছে।

বিদ্যাপতি কি নিজের প্রতিভার বলেই এই-সকল সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়া হিন্দুসমাজকে পুনর্গঠিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভা যে খুব উজ্জ্বল ছিল, সে বিষয়ে কাহারো সন্দেহ নাই। উহা যে সর্বতোমুখী ছিল সে বিষয়েও সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই। কিন্তু যে গানে তাঁহার খ্যাতি, যে গানে তাঁহার প্রতিপত্তি, যে গানে তিনি জগৎ মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি যদি তাহার একটি গানও না লিখিতেন, কেবল পণ্ডিতের মতো স্মৃতি, পুরাণ, তীর্থ ও গেজেটিয়ার প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলেও বলিতে হইত, তাঁহার প্রতিভা উজ্জ্বল ও সর্বতোমুখী। তবে এই-সকল সংস্কৃত পুস্তক লিখিবার তাঁহার আর-এক উদ্দেশ্য ছিল। তিনি যে বংশে জন্মিয়াছিলেন, যে সময়ে জন্মিয়াছিলেন, যে সমাজে জন্মিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি শুধু গান লিখিয়া কখনোই ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেন না। বংশোচিত, সময়োচিত এবং সমাজোচিত কার্য তাঁহাকে করিতেই হইত।

তাঁহার বংশ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বলিয়াছেন, "বিদ্যাপতির বংশ পণ্ডিতের বংশ; তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা অসাধারণ পণ্ডিত, কার্য্যক্ষম ও বুদ্ধিমান ছিলেন এবং কেহ কেহ প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। বিদ্যাপতির অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ কর্ম্মাদিত্য ঠাকুরের নাম পঞ্জীতে এইরূপ পাওয়া যায়— গঢ়বিসপী নিবাসী কর্ম্মাদিত্য ত্রিপাঠী। মিথিলায় তিলকেশ্বর নামক শিবমঠে কীর্ত্তিশিলায় কর্ম্মাদিত্য মন্ত্রীর নাম উৎকীর্ণ আছে। কাল—অব্দে নেত্রশশাঙ্কপক্ষ গদিতে শ্রীলক্ষণক্ষ্মাপতেঃ, অর্থাৎ ২১৩ ল সং।[৩] কর্ম্মাদিত্যের পুত্র সান্ধিবিগ্রহিক, অর্থাৎ সন্ধি-বিগ্রহ করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত মন্ত্রী, দেবাদিত্য। বিদ্যাপতির পিতামহের সম্বন্ধে ভ্রাতা জ্যোতিরীশ্বর কবিশেখরাচার্য্য। ইনি সংস্কৃত ভাষায় পঞ্চশায়ক গ্রন্থকর্ত্তা ও ধূর্ত্তসমাগম প্রহসনকর্ত্তা, এবং মিথিলাভাষায়

বর্ণনরত্নাকর নামক প্রথম গদ্যগ্রন্থ রচয়িতা। প্রপিতামহের ভ্রাতা দশকর্ম্ম-পদ্ধতিকর্ত্তা মহামহত্তক বীরেশ্বর ঠাকুর রাজমন্ত্রী ছিলেন। বীরেশ্বরের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ মহামহত্তক সান্ধিবিগ্রহিক চণ্ডেশ্বর। ইনি সপ্তরত্নাকর, কৃত্যচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহার সম্বন্ধে মিথিলায় শ্লোক আছে—

শ্রীকৃত্যদান ব্যবহার শুদ্ধি
পূজাবিবাদেষু তথা গৃহস্থে।
রত্নাকরারত্নভুবো নিবদ্ধাঃ
কৃতাস্তুলাপুরুষদান সপ্ত ॥

চণ্ডেশ্বর তুলাপুরুষ দান করিয়া সংসারাশ্রম ত্যাগ করেন এরূপ প্রবাদ আছে। রত্নাকর সপ্ত— কৃত্য, দান, ব্যবহার, শুদ্ধি, পূজা, বিবাদ, গৃহস্থ। তন্মধ্যে বিবাদরত্নাকর আমাদের দেশেও প্রামাণিক গ্রন্থ, এবং ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়াছে।

"বীরেশ্বরের আর এক ভ্রাতুষ্পুত্র রামদত্ত উপাধ্যায় কর্ম্মপদ্ধতিকর্ত্তা। দুই জনের গ্রন্থ মিথিলায় একত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

"বিদ্যাপতির পিতা গণপতি ঠাকুর গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী নামক গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে শিবসিংহের পিতার অগ্রজ রাজশ্রী গণেশ্বরের নাম আছে। গণপতি ঠাকুর গণেশ্বরের সভাপণ্ডিত ছিলেন।

"যে বংশে সরস্বতীর নিত্য অর্চ্চনা হইত, পুরুষানুক্রমে বীণাপাণি বাগ্দেবীর সাধনা হইত, সেই বংশে সরস্বতীর এই বরপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" ['বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী' ১৩১৬ ব. পৃ. ।৵০-।৶০]

মিথিলায় তখন ব্রাহ্মণ রাজা। ইঁহারা এককালে ক্ষত্রিয় রাজাদিগের গুরু ছিলেন। পরে ইঁহারাই রাজা হইয়াছিলেন। বিদ্যাপতির পূর্ব-পুরুষেরা ক্ষত্রিয় রাজাদিগের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। ব্রাহ্মণ বংশেরও তাঁহারা দক্ষিণ হস্তই ছিলেন। বিদ্যাপতি নিজেও অনেক রাজার অধীনে কাজ করিয়াছিলেন। প্রথম কীর্তিসিংহ, তারপর দেবসিংহ, তারপর শিব-সিংহ, তারপর পদ্মসিংহ, তারপর হরসিংহ, তারপর নরসিংহ দেব, তার-পর ধীরসিংহ। বিদ্যাপতি ইহাদের সকলেরই রাজসভাসদ ও পণ্ডিত ছিলেন।

কীর্তিসিংহের রাজত্বের ঠিক পূর্বেই মুসলমানেরা তিরহুত দখল করিয়া

লয় এবং তিরহুতে অরাজকতা উপস্থিত হয়। হিন্দু সমাজ লণ্ডভণ্ড হইয়া যায়। কীর্তিসিংহ পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন এবং আবার হিন্দু সমাজের পুনর্গঠন করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি অধিক দিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই। তাঁহার উত্তরাধিকারীরাও স্বল্পভোগী ছিলেন। সমাজ গঠনের ভারটা দীর্ঘজীবী বিদ্যাপতির উপরই পড়িয়াছিল এবং বিদ্যাপতি সে বিষয়ে কিরূপ দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন, তাঁহার সংস্কৃত বইগুলি হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কিন্তু বিদ্যাপতি কত দীর্ঘজীবী ছিলেন? নগেনবাবু তাঁহার বিদ্যাপতির পদাবলীর ভূমিকায় লিখিয়াছেন, শিবসিংহ যখন ১৩২৪ শকে অর্থাৎ ইংরেজি ১৪০২ সালে রাজ্যলাভ করেন তখন তাঁহার বয়স ৫০ বৎসর ছিল। বিদ্যাপতি তাঁহার সমবয়সী ছিলেন। তাহা হইলে ইংরেজি ১৩৫২ সালে অথবা তাহারই কাছে-পিঠে বিদ্যাপতির জন্ম হয়। কিন্তু বিদ্যাপতি যে শিবসিংহের সমবয়সী ছিলেন, নগেনবাবু তাহার কোনো প্রমাণ দেন নাই। তাঁহার বইয়ের যত টীকা টিপ্পনী আছে, সব পড়িয়া আমার বোধ হইল বিদ্যাপতি অন্তত একশতউনআশি বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। কারণ, নগেনবাবু বলিয়াছেন যে, বিদ্যাপতি শ্রোত্রীয় বংশের দ্বিতীয় রাজা ভোগীশ্বরের ভণিতা দিয়া একটি গান লিখিয়াছেন। ভোগীশ্বর ফিরোজ শাহের "প্রিয় সখা" ছিলেন। ফিরোজ শা ইং ১৩৫১-১৩৮৮ রাজত্ব করেন। এই দীর্ঘ রাজত্বের প্রথম অবস্থাতেই ফিরোজ শাহ্ ভোগীশ্বরকে প্রিয় সখা বলিতে পারেন। কারণ, 'কীর্তিলতা'য় আমরা দেখিতে পাই লসং ২৫২ বৎসরে ভোগীশ্বরের পুত্র গণেশ্বর রাজা হইয়াছেন এবং অস্‌লান নামক একজন তুর্ককে বুদ্ধিবিক্রমে হারাইয়া দিয়াছেন। লসং ২৫২ ইংরেজি ১৩৬৭-৬৮ হইবে। ইহার পূর্বেই তাহা হইলে ভোগীশ্বরের সহিত ফিরোজ শাহের বন্ধুত্ব হয়। ভোগীশ্বরের নামে বিদ্যাপতির যে গান আছে, সেটি ১৩৬৮-এর পূর্বে অর্থাৎ অন্তত ১৩৬৭ সালে লেখা হইয়াছিল। নগেনবাবু আরো বলেন, বাংলার স্বাধীন সুলতান নসরৎ শাহের ভণিতা দিয়া বিদ্যাপতি একটি গান লিখিয়াছেন। নসরৎ শাহ্ মোটামুটি ধরিতে গেলে ১৫২১ হইতে ১৫৩০ পর্যন্ত রাজত্ব করেন [১৫১৮-৩৩ খৃ.]। যদি মনে করা যায়, নসরৎ শাহ্ রাজা হইবার পরেই ঐ গান লেখা হয়, তাহা হইলেও মনে করিতে হইবে, যে,

বিদ্যাপতির সবচেয়ে পুরানো গানটি ১৩৬৭ এবং সবচেয়ে নূতন গানটি ১৫২১ সালে লেখা হয়। এই দুই গানের অন্তর ১৫৪ বৎসর। প্রথম গানটি যখন লেখেন তখন তাঁহার গান লেখার বয়স— অন্তত ২০ বৎসর। আর ১৫২১ সালে গান লিখিয়াই তো তিনি মরেন নাই। তাহার পরও তিনি দু-পাঁচ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। ১৫৪য় আর ২৫ বৎসর যোগ করিলে ১৭৯ হয়। এত বৎসর কি মানুষ বাঁচিতে পারে? সম্ভব তো নয়। তাহা হইলে নগেন্দ্রবাবুর হিসাবে কিছু ভুল আছে।[৪] নসরৎ শাহের নামের গানে বিদ্যাপতির নাম নাই, আছে কবিশেখর। গানটি মৈথিল তো নয়ই, বাংলায় মৈথিলির নকল হইবারই সম্ভাবনা। নসরৎ শাহের সময় বাংলায় রায় শেখর নামে একজন বড়ো পদকর্তা ছিলেন। এ গানটি তাঁহার হইবারও সম্ভাবনা। গানের ভণিতায় কবিশেখর নাম আছে। নগেন্দ্রবাবু আরো বলেন, যে, বাংলার সুলতান হুসেন শাহের নামে বিদ্যাপতির গান আছে। হুসেন শাহ ১৪৯৪ হইতে ১৫২১ [১৪৯৩-১৫১৯ খৃ.] পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ১৪৯৪ সালে গান লিখিলেও তখন বিদ্যাপতির বয়স ২০+১২৭ ; এটাও সম্ভবপর নয়। এ হুসেন শা যে বাংলার হুসেন শা, নগেনবাবু তার কোনো প্রমাণই দেন নাই। জোয়ানপুরে একজন সুলতান হুসেন শাহ্ ছিলেন। তিনি ১৪৫৬ সালে রাজা হন। এ গান তাঁহার নামে হওয়াই সম্ভব। কারণ জোয়ানপুরের সঙ্গেই তিরহুতের বেশি সম্পর্ক ছিল, বাংলার সঙ্গে নয়। তখন বিদ্যাপতির বয়স হইবে ২০+৩৩+৫৬=১০৯। ইহাও যে সম্ভবপর তাহা নহে ; তবে অনেক ব্রাহ্মণ ১২০ বৎসর বাঁচিতে শুনা যায় ; এবং তখনো তাঁহারা সতেজ ও সবল ছিলেন শোনা যায়। রায় বাহাদুর শ্যামনারায়ণ সিংহ ইংরেজিতে যে তিরহুতের ইতিহাস লিখিয়াছেন[৫] তাহাতে লেখা আছে বিদ্যাপতির শেষ সংস্কৃত গ্রন্থ গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী[৬] তিরহুতের রাজা ধীরসিংহের সময় লেখা হয়। সেটা ১৫ শতকের মাঝামাঝি অর্থাৎ প্রায় ১৪৫০। কিন্তু ধীরসিংহ কোন্ সালে রাজত্ব আরম্ভ করেন এবং কোন্ সালে তাঁহার রাজত্ব শেষ হয়, তাহার কোনো প্রমাণ শ্যামনারায়ণবাবু দিতে পারেন নাই। তাঁহার হিসাব সত্য হইলেও বিদ্যাপতি প্রায় ১০০ শত বৎসর বয়সে ঐ পুস্তক লেখেন, মানিয়া লইতে হইবে। উপস্থিত যাহা-কিছু প্রমাণ পাওয়া গেল, তাহাতে বোধ হয়

বিদ্যাপতি ১০০ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন এবং শেষ বয়সেও মৈথিল ভাষায় গান ও সংস্কৃত ভাষায় পুথি লিখিয়াছিলেন।

সহজিয়ারা যে বলিয়া থাকে, বিদ্যাপতি রসিক ভক্ত ছিলেন ; লখিমা দেবী তাঁহার প্রেমপাত্রী ; একথাটা একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। কারণ বিদ্যাপতি শুধু লখিমাদেবী ও শিবসিংহেরই কর্মচারী বলিয়া যে কেবল তাঁহাদেরই নামে ভণিতা দিয়াছেন এমন নহে : তিনি হুসেন শাহের, নসরৎ শাহের ও আলম শাহের নামেও ভণিতা দিয়াছেন। সুতরাং ভণিতায় রানীদের নাম দেখিয়া বিদ্যাপতিকে সহজিয়া ঠাহরানো যুক্তিযুক্ত নয়। একথা নগেন্দ্রবাবুও বলিয়াছেন। বিদ্যাপতির বংশধরেরা এখনো বর্তমান আছেন। তাঁহার পুত্রপৌত্রেরা বেশ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার পুত্র-বধূও গান লিখিয়াছেন, শোনা যায়।

বিদ্যাপতিকে আমরা প্রধানত তিন মূর্তিতে দেখিতে পাই। এক মূর্তিতে তিনি পণ্ডিত, সংস্কৃত সাহিত্যে খুব ব্যুৎপন্ন, তিরহুতের রাজাদের একজন প্রধান সভাসদ, এবং হিন্দু সমাজের পুনর্গঠনে কৃতসংকল্প। আর-এক মূর্তিতে দেখি তিনি কবি, কবির চক্ষে জগৎ দেখিতেছেন, আদিরসের পদ লিখিতেছেন এবং সময়ে সময়ে ভক্তির উচ্ছ্বাসে গদ্‌গদ হইতেছেন। তাঁহার আরো এক মূর্তি আছে, তিনি ইতিহাস লিখিতেছেন —কীর্তিসিংহ কেমন করিয়া পিতৃবৈরী নাশ করিয়া রাজ্য উদ্ধার করিলেন, শিবসিংহ কেমন করিয়া স্বাধীন হইলেন, দেবসিংহের মৃত্যুর পর কেমন করিয়া সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া শিবসিংহ রাজ্য লাভ করিলেন ; এই-সকল কথা তিনি তাঁর তৃতীয় মূর্তিতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ইতিহাসের গানগুলি;তাঁহার 'কীর্তিপতাকা' ও 'কীর্তিলতা' তাঁহাকে ভারতবর্ষের একজন প্রধান ইতিহাস লেখক করিয়া তুলিয়াছে। ভারতের যে ইতিহাস একেবারে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ হিন্দু সমাজের ইতিহাস— হিন্দুদিগের দিক হইতে ইতিহাস, তাহা তিনিই লিখিয়াছেন। এতদিন লোকের বিশ্বাস ছিল, মুসলমানেরাই কেবল আমাদের ইতিহাস লিখিয়া-ছেন এবং মুসলমানেরা যাহা লিখিয়াছেন তাহাই ধ্রুব সত্য : শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ সরকারের মতো শুদ্ধ মুসলমান লেখকের উপর বিশ্বাস করিলে চলিবে না।[৭] এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি, যে হিন্দুরাও ইতিহাস লিখিত, সত্য ঘটনা লইয়া তাহার বিবরণ লিখিত। এখন যদি কেহ

যথার্থ ইতিহাস লিখিতে বসেন, তাঁহার দুই দিকই দেখিতে হইবে, মুসলমানেরা কী বলে তাহাও দেখিতে হইবে আর হিন্দুরা কী বলে তাহাও দেখিতে হইবে। কাহাকেও ধ্রুব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলে চলিবে না। কারণ, যে লেখে আপনার জাতের দিকে টানিয়াই লেখে। যিনি যথার্থ ঐতিহাসিক. তাঁহার কোনো দিকেই টান থাকিবে না ; তিনি বিচারকের আসনে বসিয়া দুই দিক দেখিয়া বিচার করিবেন। একটা জিনিস কিন্তু বড়োই আশ্চর্য। বিদ্যাপতি সংস্কৃতে যে বই লিখিয়াছেন তাহাতে স্মৃতি অর্থাৎ হিঁদুয়ানি তো আছেই তার উপর শিব আছেন, দুর্গা আছেন, গঙ্গা আছেন, কৃষ্ণ একেবারেই নাই। আবার মৈথিল ভাষায় যে গান লিখিয়াছেন, তাহাতে শিবও আছেন, সেই সঙ্গে দুর্গাও আছেন, গঙ্গাও আছেন. বেশির ভাগ কৃষ্ণরাধা আছেন। ইহার অর্থ কী ? যখন পণ্ডিত হইয়া লিখিতেছেন. তখন কৃষ্ণের নামও করেন নাই। কিন্তু যখন মৈথিলি লিখিতেছেন তখন রাধা ও মাধবে ভরপুর। আবার তিনি স্বহস্তে ভাগবতও নকল করিয়াছেন। ইহার অর্থ ঠিক বোঝা যায় না।

একটি অর্থ আমার মনে লাগিতেছে, অন্যের মনে লাগিবে কিনা জানিনা, বিদ্যাপতি যেখানে আদিরসের গান লিখিতেছেন সেইখানেই রাধা ও কৃষ্ণের নাম বেশি। আদিরসের গান লিখিতে গেলেই যেন রাধাকৃষ্ণ আপনিই আসিয়া পড়িয়াছে। এখনো আমাদের দেশে দেখা যায়, আদিরসের গান লিখিতে গেলেই লোকে রাধাকৃষ্ণেরই নাম করে। একদিন দেখিয়াছিলাম, জন দশেক কয়েদি লইয়া দুই জন কন্‌স্টেব্‌ল নির্জন রাস্তা দিয়া জেলের দিকে যাইতেছে। পথটা দীর্ঘ ; সমস্ত দিন খাটার পর সকলেই একটু স্ফূর্তি চায়। আমিও সেই পথ দিয়া যাইতেছিলাম, কিন্তু সকলের পিছনে। একজন কন্‌স্টেব্‌ল একজন কয়েদিকে ডাকিয়া বলিল. ওরে এই সময় তুই একটা গান গা। সেখানে বাদ্যও নাই, ভাণ্ডও নাই, বাদ্যের মধ্যে তুড়ি। কয়েদি গান ধরিল। আর-কয়েদিরাও সেই সঙ্গে গান ধরিল, তাহাদেরও বাজনা তুড়ি। গানটা আমার বেশ মনে আছে. সেটা এই—

আজকে যদি থাকত আমার শ্যাম,
ধান আন্‌তে [ভান্‌তে] গিয়ে যখন পড়ত মাথার ঘাম,
আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিত করত কত কাম।

এখানে শ্যাম নাম শুনিয়া আমার বেশ বোধ হইল, আমাদের দেশের কবিরা আদিরসের গান লিখিতে গেলেই রাধাকৃষ্ণের দোহাই দিতেন। নিজের মনের ভাব ছল করিয়া রাধাকৃষ্ণের ঘাড়ে চাপাইয়া দিতেন। পাঁচালিওয়ালারাও এই কাজ করিতেন, কবিওয়ালারাও করিতেন, ঝুমুরওয়ালারাও করিতেন, তরজাওয়ালারাও অনেক সময় করিতেন। বিদ্যাপতিও যেন তাই করিয়া গিয়াছেন। নগেন্দ্রবাবু একটু অন্যায় করিয়াছেন ; তিনি যদি বিদ্যাপতির গানের সংগ্রহগুলি যেমন পাইয়াছিলেন, তেমনই ছাপাইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় অনেকটা ভালো হইত। তাহা না করিয়া তিনি সব আদিরসের কবিতা কীর্তনের ছাঁচে ঢালিয়া ছাপাইয়াছেন। তাহাতে বিদ্যাপতি যে কীর্তনের গান লিখিতেছেন এই কথাই প্রথম মনে হয়। কিন্তু এই যে কীর্তনের ছাঁচ, এ তো বিদ্যাপতির সময় হয় নাই। 'উজ্জ্বলনীলমণি', 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' প্রভৃতি রসশাস্ত্রের বই খুব প্রচলিত হইয়া গেলেই বৈষ্ণব-সমাজে ইদানীন্তন কীর্তনের সৃষ্টি হয়। বিদ্যাপতির সময় সেটা ছিল কি ? বিদ্যাপতির অন্তত দুই শত বৎসর পরে রসশাস্ত্রের বহুল প্রচার হয়। সুতরাং তিনি কীর্তনেরই গান লিখিয়াছেন এবং রসশাস্ত্রের ছাঁচে তাহা ঢালিয়াছেন, একথা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। তিনি ছিলেন রাজকবি, রাজ-পারিষদ। রাজারা বা রাজ-সভাসদেরা যেমন ফরমাইস করিতেন, তিনি তেমনই গান লিখিতেন, এবং তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিবার জন্য তাঁহাদের এবং তাঁহাদের পরিবারের নাম সেই সঙ্গে জুড়িয়া দিতেন। রাজসভায় খুব একটা আমোদ হইত। অনেক সময়ই তাঁহাকে ফরমাস-কর্তাকে শ্যাম সাজাইতে হইত এবং তাঁহার সোহাগিনীকে রাধা সাজাইতে হইত। তাই করিয়াই বিদ্যাপতির এত আদিরসের গান সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি কীর্তন লিখিতেও বসেন নাই, রাধাকৃষ্ণের প্রেম লইয়া বই লিখিতেও বসেন নাই। গানগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, ভিন্ন ভিন্ন লোকের ফরমাইস মতো লেখা হইয়াছিল। ইদানীন্তন বৈষ্ণবেরা যে রসে যেটি খাটে কীর্তনে সেইটিকে সেইখানে বসাইয়া দিয়াছেন এবং বিদ্যাপতিকে বৈষ্ণব কবি সাজাইয়া তুলিয়াছেন। এমন-কি সহজিয়াও করিয়া তুলিয়াছেন।

আমরা বেশ করিয়া পিঁজিয়া পিঁজিয়া দেখিয়াছি যে বিদ্যাপতির

অনেক গানে রাধাকৃষ্ণের নামও নাই, গন্ধও নাই ; অথচ নগেন্দ্রবাবু সে গুলিকেও কীর্তনের ছাঁচে ঢালা রসপ্রবাহের মধ্যে বসাইয়া দিয়াছেন। একটি গান তো সকলেরই জানা আছে, "কামিনী করএ সনানে"। ইহাতে রাধাকৃষ্ণের নামও নাই, গন্ধও নাই। একজন সুন্দরী স্নান করিয়া উঠিতেছিলেন। কেহ ফরমাস করিল, তুমি এই রমণীর রূপ বর্ণনা করো। বিদ্যাপতি অমনি ধরিলেন—

কামিনি করএ সনানে।
হেরিতহি হৃদঅ হনএ পচবানে ॥ ২।
চিকুর গরএ জলধারা।
জনি মুখ সসি ডরে রোঅএ অন্ধারা ॥ ৪।
কুচ জুগ চারু চকেবা।
নিঅ কুল মিলত আনি কোনে দেবা ॥ ৬।
তেঁ সঙ্কাএে ভুজ পাসে
বাঁধি ধএল উড়ি জাএত অকাসে ॥ ৮।
তিতল বসন তনু লাগূ।
মুনিহুক মানস মনমথ জাগূ ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি গাবে।
গুণমতি ধনি পুনমত জনি পাবে ॥ ১২।

কামিনী স্নান করিতেছেন। দেখিলেই মদন হৃদয়ে পাঁচটি বাণ হানে। চিকুর হইতে জলধারা পড়িতেছে যেন চাঁদ মুখের ভয়ে অন্ধার কাঁদিতেছে। কুচযুগল যেন চকা আর চকি। যেন কেহ দুটিকে আনিয়া নদীর একপারে মিলাইয়া দিয়াছে। পাছে তারা আকাশে উড়িয়া যায়, এই ভয়ে ওদুটিকে ভুজপাশে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে। ভিজা কাপড়খানি গায়ে লাগিয়া আছে, দেখিলে মুনির মনেও মন্মথ জাগিয়া উঠে। বিদ্যাপতি গান করিয়া বলিতেছেন, কোন্ পুণ্যবান না জানি এই গুণমতী রমণীকে পাইবে।

এই গানটিতে রাধাকৃষ্ণের নাম নাই। মিথিলায় প্রবাদ আছে, এই গানটি কোনো বাদশাহের ফরমায়েসি। তথাপি নগেন্দ্রবাবু ইহাকে বয়ঃসন্ধি শিরোনামায় ফেলিয়া "মাধবের উক্তি" বলিয়া লিখিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, "মিথিলায় এই পদ রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বলিয়া বর্ণিত হয় না,

কিন্তু তাহাতে দোষের কিছুই নাই।" কেন নাই বুঝিতে পারিলাম না। এটি তো বয়ঃসন্ধির গান নয়, মাধবের উক্তিও নয়। সুন্দরী রমণীকে স্নান করিয়া উঠিতে দেখিয়া একজন সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন কবি গানটি বাঁধিয়াছেন। ইহাতে রাধাকৃষ্ণ ভাবের কিছুই নাই।

এটিতে তো রাধাকৃষ্ণের নাম নাই, প্রবাদ আছে এটি ফরমায়েসি, তথাপি ইহাকে কীর্তনের গান করা হইয়াছে। ইহার পরের গানটি দেখুন—

আজু মঝু শুভ দিন ভেলা।
কামিনি পেখল সনানক বেলা ॥ ২ ।
চিকুর গলয় জল ধারা।
মেহ বরিস জনি মোতিম হারা ॥ ৪ ।
বদন পোছল পরচুরে।
মাজি ধয়ল জনি কনক মুকুরে ॥ ৬ ।
তেঁই উদসল কুচজোরা।
পলটি বৈসাওল কনক কটোরা ॥ ৮ ।
নীবিবন্ধ করল উদেস।
বিদ্যাপতি কহ মনোরথ শেস ॥ ১০ ।

এ গানটিকেও বয়ঃসন্ধি শিরোনামায় ফেলিয়া মাধবের উক্তিতে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহা নাহিয়া ওঠা একটি সুন্দরী রমণীর বর্ণনা মাত্র।

জাইত পেখল নহাইলি গোরী
কতি-সঞে রূপ ধনি আনলি চোরী ॥ ২ ।
কেশ নিঙ্গারইত বহ জল ধারা।
চামরে গলয় জনি মোতিম হারা ॥ ৪ ।
অলকহি তীতল তহি' অতি শোভা।
অলিকুল কমলে বেঢ়ল মধুলোভা ॥ ৬ ।
নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা।
সিন্দুরে মণ্ডিত জনি পঙ্কজ পাতা ॥ ৮ ।
সজল চীর রহ পয়োধর সীমা।
কনক বেল জনি পাড়ি গেল হীমা ॥ ১০ ।

ও নুকি করতহি চাহে কিয় দেহা।
অবহি ছোড়ব মোহি তেজব নেহা ॥ ১২।
ঐসন রস নহি পাওব আরা।
ইথে লাগি রোই গলয় জলধারা ॥ ১৪।
বিদ্যাপতি কহ শুনহ মুরারী।
বসন লাগল ভাব রূপ নিহারী ॥ ১৬।

এ কবিতাটিতে 'মুরারি' শব্দটি আছে। বিদ্যাপতি মুরারিকে বলিতেছেন, স্নানের পর রমণীর রূপ দেখিয়া কাপড়ের ভাব লাগিয়াছে। এই মুরারি শব্দ থাকাতেই যদি এ পদটি রাধাকৃষ্ণের প্রেম লইয়া হইয়া থাকে, হউক, আমি আপত্তি করিব না।

ইহার পরের গানটি যে কৃষ্ণরাধিকার প্রেম লইয়া লেখা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গানটি তুলিয়া দিলাম।

নহাই উঠল তীরে রাই কমলমুখি
সমুখে হেরল বর কান।
গুরু জন সঙ্গে লাজে ধনি নত মুখি
কৈসনে হেরব বয়ান ॥ ২।
সখি হে অপরুব চাতুরি গোরি।
সব জন তেজি অগুসরি সঞ্চরি
আড় বদন তঁহি ফেরি ॥ ৪।
তঁহি পুন মোতি হার টুটি ফেকল
কহইত হার টুটি গেল।
সব জন এক এক চুনি সঞ্চরু
শাম দরশ ধনি লেল ॥ ৬।
নয়ন চকোর কাহ্নুমুখ শশিবর
কয়ল অমিয় রসপান।
দুহু দুহু দরশনে রসহু পসারল
কবি বিদ্যাপতি ভান ॥ ৮।

আরো একটি গানে রাধিকা স্নান হইতে উঠিতেছেন ও কৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিতেছেন—

নাহি উঠল তীরে সে ধনি রাহি।

মঝু মুখ সুন্দরি অবনত চাহি ॥ ২ ।
এ সখি পেখল অপরুব গোরি ।
বল করি চিত চোরায়ল মোরি ॥ ৪ ।
একলি চললি ধনি হোই অগুয়ান ।
উমগি কহই সখি করহ পয়ান ॥ ৬ ।
কিয়ে ধনি রাগি বিরাগিনি হোয় ।
আশ নিরাশ দগধ তনু মোয় ॥ ৮ ।
কৈসে মিলব হমে সে ধনি অবলা ।
চিত নয়ন মঝু দুহু তাহে রহলা ॥ ১০ ।
বিদ্যাপতি কহ শুনহ মুরারি ।
ধৈরজ ধএ রহ মিলব বর নারি ॥ ১২ ।

এই পাঁচটি গানেই বিদ্যাপতি নাহিয়া উঠার পরের কোনো সুন্দরী রমণীর রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম দুইটিতে রাধাকৃষ্ণের নাম একেবারেই নাই। তৃতীয়টিতে মুরারির নাম থাকিলেও উহা কৃষ্ণের প্রেমের কথা নয় বলিয়াই মনে হয়। বাকি দুইটিতে রাধিকা নাহিয়া উঠিতেছেন, সম্মুখে কৃষ্ণ, রাধা ও কৃষ্ণ পরস্পরকে দেখিতেছেন। এ দুটিতে কিন্তু রূপ বর্ণনার চেষ্টা নাই। আছে কেবল নায়ক নায়িকার চাতুরি ও তাহাদের মনের ভাব। এই পাঁচটিকেই রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কীর্তনের পদ বলিলে একটু জোর করিয়া বলা হইবে না কি? আদিরসের নায়ক নায়িকাকে রাধাকৃষ্ণ সাজাইয়া বর্ণনা করা আমাদের দেশে অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। কী বড়োলোক, কী ছোটোলোক সকলেই এইভাবে নায়ক নায়িকার বর্ণনা করিয়া থাকে। যদি কেহ বলে এ পাঁচটি পদই শুধু আদিরসের পদ, যে দুটিতে কৃষ্ণরাধা আছে সে নায়ক নায়িকা মাত্র, তাহা হইলে তাহাকে বলিবার কিছুই নাই। কিন্তু আমরা ততদূর যাইব না। প্রথম তিনটিকে আদিরসের পদই বলিব, বাকি দুটিকে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ বলিব।

এই পাঁচটির কোনটিতেই কোনো রাজা ও রানীর নাম যোগ করা নাই। সুতরাং এগুলিকে ফরমায়েসি বলিতে পারি না। সবগুলিই বেফরমায়েসি গান, বিদ্যাপতির নিজের কথা। সুতরাং বিদ্যাপতি নিজেও যে-সকল পদ লিখিয়াছেন তাহার অনেকই মাত্র আদিরসের,

রাধাকৃষ্ণ বা বৈষ্ণবের পদ তত নয়।

নগেন্দ্রবাবু যে ৮৪০টি কীর্তনের পদ দিয়াছেন, তাহার মধ্যে আমরা গনিয়া দেখিয়াছি, ৩৩৭টিতে রাধাকৃষ্ণের নামও নাই, গন্ধও নাই, বাকি ৫০৩টিতে আছে। তাহার মধ্যেও আবার অনেকগুলিতে কেবল ভণিতার কাছে মুরারি কিংবা হরি আছে। সবটাই যে রাধাকৃষ্ণের কথা, তাহা মনে হয় না। অনেক সময় মনে হয় আলিপুরের সেই কয়েদির শ্যাম। সংস্কৃত অলংকারে যত কিছু কবিপ্রৌঢ়োক্তি আছে, যত চলিত উপমা আছে, বিদ্যাপতি ঠাকুর তাঁহার গানগুলিতে সেগুলির প্রচুর ব্যবহার করিয়াছেন। হালাসপ্তশতী, আর্যাসপ্তশতী, অমরুশতক, শৃঙ্গার তিলক, শৃঙ্গারশতক, শৃঙ্গারাষ্টক প্রভৃতি সংস্কৃত এবং প্রাকৃত আদিরসের কবিতাগুচ্ছ হইতে বিদ্যাপতি আপনার গানের যথেষ্ট ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন। অনেক সময় পড়িতে পড়িতে সুপরিচিত সংস্কৃত শ্লোক মনে পড়ে। অনেক সময় বোধ হয়, এই-সকল সংস্কৃত কবিতার উপর বিদ্যাপতি রঙ চড়াইয়াছেন। তাহাদের ভাব লইয়া বেশি করিয়া ফুটাইয়াছেন। সময় সময় স্ত্রীলোকের রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া শরীরের কোনো অঙ্গেরই নাম করেন নাই, কিন্তু অঙ্গগুলির উপমানগুলিকে এমন করিয়া সাজাইয়াছেন, যে, যে সংস্কৃত না পড়িয়াছে সে তাহার রসগ্রহ করিতে পারিবে না। পারিলেও অনেক কষ্টে করিতে হইবে। দৃষ্টান্ত দেখো—

সাজনি অকথ কহি ন জাএ।
অবল অরুন সসিক মণ্ডল
ভীতর রহ নুকাএ ॥ ২।
কদলি উপর কেসরি দেখল
কেসরি মেরু চঢ়লা।
তাহি উপর নিশাকর দেখল
কির তা উপর বইসলা ॥ ৪।
কীর উপর কুরঙ্গিনি দেখল
চকিত ভমএ জনী।
কীর কুরঙ্গিনি উপর দেখল
ভমর উপর ফনী ॥ ৬।

এক অসম্ভব আওর দেখল
জল বিনা অরবিন্দা।
বেবি সরোরুহ উপর দেখল
জইসন দুতিঅ চন্দা ॥ ৮।
ভন বিদ্যাপতি অকথ কথা
ই রস কেও কেও জান।
রাজা শিবসিংহ রূপনরায়ন
লখিমা দেই রমান ॥ ১০।

রমণীর পদতল আশ্চর্য দেখিলাম। জিনিসটা অনির্বচনীয় তরুণ অরুণ শশিমণ্ডলের মধ্যে লুকাইয়া আছে। পায়ের নখগুলা শশিমণ্ডল, পায়ের লালবর্ণ তাহাতে লুকাইয়া রহিয়াছে। কলাগাছের পর সিংহ চড়িয়াছে, সিংহের উপর মেরু চড়িয়াছে। ঊরুর সহিত রামরম্ভার তুলনা হয়; ক্ষীণ কটির সঙ্গে সিংহের ক্ষীণ কটির তুলনা হয়, আর স্তন যুগলের সহিত মেরু যুগলের তুলনা হয়। মেরুর উপর চন্দ্র, চন্দ্রের উপর শুকপক্ষী, তাহার উপর চকিত হরিণী, আর তাহার উপর ভ্রমর আর ভ্রমরের উপর ফণী। নিশাকর হইলেন মুখ, শুকপক্ষীর নাসার সহিত স্ত্রীলোকের নাসার তুলনা, নাসার উপর চকিত হরিণীর চোখের ন্যায় চোখ, তাহার উপর ভ্রমর অর্থাৎ কালো ঝাপটা, তাহার উপর সর্প অর্থাৎ বিনুনি। আরো-এক আশ্চর্য দেখিলাম বিনা জলে পদ্ম ফুটিয়াছে, আর পদ্মের উপর দ্বিতীয়ার চন্দ্র। পদ্ম হইলেন পয়োধর আর দ্বিতীয়ার চন্দ্র হইলেন, নখলেখা। যাঁহারা সংস্কৃত আদিরসের কবিতা পড়িয়াছেন, তাঁহারা সহজেই ইহা বুঝিয়াছেন, আর যাঁহারা পড়েন নাই তাঁহাদের নিকট ইহা হেঁয়ালির মতো মনে হয়। তাহার পর তলাইয়া বুঝিলে রস পাওয়া যায়। সে রস প্রথম পাইয়াছিলেন লখিমাদেবীর পতি শিবসিংহ। শুধুই যে সংস্কৃত উপমা বিদ্যাপতির সম্বল, তাহা নহে, তাঁহার নিজের উপমাও আছে: তিনি যুবতীর স্তনের সহিত উলটানো সোনার বাটির তুলনা করিয়াছেন, এবং সোনার শিব-লিঙ্গের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এক জায়গায় বলিয়াছেন, কনক কটোরা যেন উলটাইয়া বসাইয়াছে। আর-এক জায়গায় বলিয়াছেন "কনকমহেশ"।

বিদ্যাপতির নিজস্ব কিন্তু সাজানোর তারিফ। তাহাতে এমন একটা নূতনত্ব আছে, পড়িলেই মুগ্ধ হইতে হয়। আমি গান সাজাইবার কথা বলিতেছি না, সেগুলি নগেন্দ্রবাবুর সাজানো, গানের ভাবগুলি সাজানো বিদ্যাপতির নিজেরই ; সে অতি সুন্দর। বিদ্যাপতি বহির্জগতেই হউক আর অন্তর্জগতেই হউক সুন্দর সুন্দর জিনিস বাছিয়া লইয়া সাজাইবার সময় সেগুলিকে সুন্দরতর সুন্দরতম করিয়া তুলিয়াছেন। এ বিষয়ে বয়ঃসন্ধি হইতে একটি উদাহরণ দিব। এটি বাহিরের সৌন্দর্য। কৈশোর যাইতেছে, যৌবন আসিতেছে, সেই সময়টা বিদ্যাপতি বর্ণনা করিতেছেন—

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহু পথ হেরইতে মনসিজ গেল ॥ ২।
মদনক ভাব পহিল পরচার।
ভিন জনে দেল ভিন অধিকার ॥ ৪।
কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।
একক খীন আওকে অবলম্ব ॥ ৬।
প্রকট হাস অব গোপত ভেল।
উরজ প্রকট অব তন্হিক লেল ॥ ৮।
চরণ চপল গতি লোচন পাব।
লোচনক ধৈরজ পদতলে যাব ॥ ১০।
নব কবিশেখর কি কহইত পার।
ভিন ভিন রাজ ভিন বেবহার ॥ ১২।

ইহার সবটাই বাহিরের সৌন্দর্যের কথা। বাল্যকাল চলিয়া যাইতেছে, যৌবন আসিতেছে, মদন দুজনকেই পথ দেখাইয়া দিতেছে—একজনকে বলিতেছে "যাও"। আর একজনকে বলিতেছে "এসো"। এতদিন মাজাটি মোটা ছিল সে ক্ষীণ হইয়া আসিল। নিতম্ব দুটি শুকনা ছিল, সে দুটি মোটা হইল। আগে খুব হো হো করিয়া হাসিত। এখন সেটি মুচ্‌কে হাসিতে দাঁড়াইল। আগে স্তনের চিহ্নমাত্র ছিল, এখন সেটি প্রকাশিত হইয়া উঠিল। এতদিন চরণ চঞ্চল ছিল, খুব ছুটোছুটি করিত, এখন সেটি বন্ধ হইয়া গিয়া চঞ্চলগতি চক্ষে উঠিল।

অন্তর্জগতের সৌন্দর্য একটা দেখানো যাইতেছে—

সজনী কানুক কহবি বুঝাই।
রোপি পেমক বীজ অঙ্কুরে মোড়লি
বাঁচব কোন উপাই ॥ ২।
তৈলবিন্দু যৈসে পানি পসারিয়ে
ঐসন তুয় অনুরাগে।
সিকতা জল যৈসে ক্ষণহি শুখায়
তৈসন তোহর সোহাগে ॥ ৪।
কুলকামিনী ছলোঁ কুলটা ভৈ গেলু
তকর বচন লোভাই।
অপন করে হম মুড় মুড়ায়ল
কানুসে প্রেম বঢ়াই ॥ ৬।
চোররমনি জনি মনে মনে রোয়ই
অম্বরে বদন ছপাই।
দীপক লোভে শলভ জনি ধায়ল
সে ফল ভুজইতে চাই ॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি ইহ কলিযুগরীতি
চিন্তা ন কর কোই।
অপন করমদোষে আপহি ভুঞ্জই
যে জন পরবশ হোই ॥ ১০।

সখী কানুকে বুঝাইয়া বলিবে. প্রেমের বীজ রোপন করিয়া অঙ্কুরে মোচড়াইলে কোন্ উপায়ে বাঁচিবে। তৈল বিন্দু যেমন জলে পড়িলে চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে তোমার অনুরাগও সেইরূপ। মরুভূমিতে জল পড়িলে যেমন তখনই শুকাইয়া যায়, তোমার সোহাগও সেইরূপ বোঝা গেল। তোমার কথায় ভুলিয়া. ছিলাম কুলকামিনী, হইলাম কুলটা। তোমার প্রতি প্রেম বাড়াইয়া আমি আপনার হাতে আপনি মাথা মুড়াইলাম। চোরের রমণী যেমন ফুকরাইয়া কাঁদিতে পারে না, কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া মনে মনে কাঁদে, আমারও দশা তেমনি হইল। দীপের লোভে পতঙ্গ যেমন ধাবিত হইল অমনি তাহাকে ফলভোগ করিতে হইল; আমারও সেই দশা হইয়াছে। বিদ্যাপতি বলেন. এই কলিযুগের

রীতি, এ বিষয়ে কেহ চিন্তা করিও না। যে আপনাকে পরের বশ করে সে আপনার কর্মের ফল আপনিই ভোগ করে।

বিদ্যাপতি অনেক জায়গায় ঋতু-বর্ণনা করিয়াছেন। ভাষা অতি-মিষ্ট, সুর অতিমিষ্ট। সংস্কৃত ঋতু-বর্ণনার যা-কিছু মিষ্ট আছে সব আনিয়া এক করা হইয়াছে। গানগুলি ছোটো, একটা পুরা কিছুর বর্ণনা ভালো করিয়া করিতে গেলে যতটুকু জায়গা চাই, গানে ততটুকু জায়গা পাওয়া যায় না। সুতরাং দু-চারিটি অতি মিষ্ট জিনিস একত্র করিয়া গানটি শেষ করিতে হইয়াছে। বেশি কথা বলিবার জায়গা নাই, সুতরাং যাঁহারা সংস্কৃত পড়িয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে সুর আর ভাষা ছাড়া নূতন জিনিস কিছুই নাই। কেবল সেই সংস্কৃত কবিতার স্মৃতি জাগাইয়া দিয়াই গান থামিয়া যায়। নগেন্দ্রবাবু যেরূপে গানগুলি সাজাইয়াছেন তাহাতে সময়ে সময়ে সেগুলি বেশ একটু একঘেয়ে হইয়াছে।

এইবার আমরা বিদ্যাপতির কথা শেষ করিব। বিদ্যাপতি কীর্তনের গান লিখেন নাই। তাঁহার দু-দশটি গান লইয়া কীর্তনীয়ারা তাহাদের কীর্তনে যোগ করিয়াছে মাত্র। বিদ্যাপতি বৈষ্ণব ছিলেন না। তিনি পঞ্চোপাসক ছিলেন, বিষ্ণুর উপাসনায় তাঁহার কিছুই আপত্তি ছিল না। তিনি শিব-গঙ্গার জন্য যেমন গান লিখিয়াছেন কৃষ্ণের জন্যও তেমনি লিখিয়াছেন। বিশেষ বৈষ্ণব ভাব তাঁহাতে নাই বলিলেও হয়। তিনি সৌন্দর্যের কবি ছিলেন, সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। আদিরস সৌন্দর্যের খনি, তিনি বহু-সংখ্যক আদিরসের গান লিখিয়া গিয়াছেন। আদিরসের মধ্যে কৃষ্ণরাধার প্রেম খুব বড়ো জিনিস, তিনি তাহার যথেষ্ট ব্যবহার করিয়াছেন। অনেক সময় কৃষ্ণরাধা উপলক্ষমাত্র, আদিরসই প্রধান লক্ষ্য। মিথিলার রাজসভায়, ব্রাহ্মণরাজার সভাসদগণের মধ্যে, বাহিরে একটা পবিত্র ভাব দেখানো, একটা সংযত ভাব দেখানো, একটা ধর্মের ভাব দেখানো, খুব দরকার ছিল। বিদ্যাপতি তাহা বেশ দেখাইয়াছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ হইলে কী হয়। রাজা ও রাজসভাসদেরাও তো রাজা ও রাজসভাসদই ছিলেন; গান, বাজনা, কাব্য, কবিতা, হাসি, মস্করা এসবও তো তাঁহাদের সভায় ছিল। এগুলিও বিদ্যাপতি বেশ করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণ রাজগণের কাব্যপ্রিয়তার কথা বিদ্যাপতি এক জায়গায় এইরূপে বলিয়াছেন—

গেহে গেহে কলৌ কাব্যং শ্রোতা তস্য পুরে পুরে।
দেশে দেশে রসজ্ঞাতা দাতা জগতি দুর্লভঃ ॥

দাতা জগতি দুর্লভঃ, কিন্তু মিথিলার রাজারা সকলেই কাব্যামোদী ছিলেন, কাব্যের উৎসাহ দিতেন এবং কাব্যের রসজ্ঞ ছিলেন, তাই তাঁহাদের সময়ে মিথিলায় বিদ্যাপতির মতো রসজ্ঞ কবির উদ্ভব হইয়াছিল।

বিদ্যাপতিকে আমরা এ পর্যন্ত যে ভাবে দেখিয়া আসিয়াছি, তাহাতে তিনি মাত্র কবি ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত রচনা বেশ করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে তিনি শুদ্ধ কবি ছিলেন না, ঐতিহাসিক ছিলেন, রাজ-কর্মচারী ছিলেন, পণ্ডিত ছিলেন, ধর্মপ্রচারক ছিলেন এবং অল্পভোগী রাজাদিগের যে বিশেষ কর্তব্যকর্ম ছিল, তিনি দীর্ঘায়ু হইয়া সেই কার্যটি সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। সেটি মুসলমান-বিধ্বস্ত হিন্দু-সমাজের পুনর্গঠন ও হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রচার। তাঁহার কৃষ্ণ-প্রেমের সঙ্গীতও তাঁহাকে সে বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। হিন্দুধর্মের সম্প্রদায়গুলি তিনি চৌচাপটে ফের গড়িতে চাহিয়াছিলেন : সুতরাং কৃষ্ণপ্রেম তিনি কিছুতেই ছাড়িতে পারেন নাই।

'কীর্তিলতা' (১৩৩১ ব.)
পৃ. ১০/.-৩৲

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. সূত্র

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ৩০ বর্ষের তৃতীয় বিশেষ অধিবেশনে ২৯ ভাদ্র ১৩৩০ ব., ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৩ খৃ., শনিবার শাস্ত্রীমশায়ের 'বিদ্যাপতি' প্রবন্ধ পড়া হয়। কার্যবিবরণে উল্লেখ আছে—

"প্রবন্ধ-লেখক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় 'বিদ্যাপতি' নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।...

"প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয়, প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে তাঁহার প্রবন্ধের জন্য সুখ্যাতি করিয়া বলিলেন যে, এই প্রবন্ধে আজ অনেক নূতন কথা জানিতে পারা গেল। কিন্তু তাঁহার একটি বিষয়ে সন্দেহ রহিয়া গেল। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে, বিদ্যাপতি ফরমাইসি পদ রচনা করিতেন। কিন্তু তাঁহার পদে যেরূপ প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে সেগুলি যে অন্যের ফরমাইস-মাফিক্ রচিত হইতে পারে, তাহা বুঝিতে ও বিশ্বাস করিতে তিনি সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বিদ্যাপতির পদের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং একাল পর্য্যন্ত সকলে তাঁহার গানে মুগ্ধ। বিদ্যাপতি স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন এবং অন্যান্য বিষয়ে খ্যাতিলাভ করিলেও তাঁহার পদই তাঁহাকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়াছে, ইহাই যেন বোধ হয়। যাহা হউক, প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় আজ থাকিলে তাঁহার শিষ্যের মত আজ তাঁহার সন্দেহগুলির তিনি ভঞ্জন করিয়া লইতেন। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, বৈষ্ণবেরা বেদ মানিতেন, কিন্তু পড়িতেন না। এ কথাটিও যেন ভাল লাগিতেছে না। এই বলিয়া তিনি পুনরায় শাস্ত্রী মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।"

এই প্রবন্ধ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩০ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যা 'প্রাচী' পত্রিকায়। পরে শাস্ত্রীমশায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত বিদ্যাপতির 'কীর্ত্তিলতা' (১৩৩১ ব.) বইয়ে ছাপা হয়েছিল। পাঠ ঈষৎ পরিবর্তিত। মিথিলা থেকে আনা গ্রিয়র্সনের সংগ্রহ (দ্র. *An Introduction to the Maithili language*

of North Bihar containing a grammar, chrestomathy and vocabulary, 2 pts. Asiatic Society, 1881-82.) এবং 'পদকল্পতরু' 'পদামৃতসমুদ্র', 'কীর্তনামৃত' প্রভৃতি সংগ্রহের ব্রজবুলি পদ বেছে নিয়ে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী' সংকলন করেন (ব-সা-প, ১৩১৬ ব.)। বিদ্যাপতি ভণিতার পদের সঙ্গে নির্বিচারে 'কবিরঞ্জন', 'কবিবল্লভ' প্রভৃতি ভণিতার পদ সংকলন করায় এবং অর্বাচীন পাঠ ও অমূলক জনশ্রুতির উপরে নির্ভর করায় বিদ্যাপতির জীবনকাল অসম্ভব রকম দীর্ঘ কল্পনা করতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন। শাস্ত্রীমশায় এই ত্রুটি লক্ষ করলেও প্রমাণগুলি যাচাই করে দেখেন নি। বাঙালি বিদ্যাপতির অস্তিত্ব সম্পর্কেও এ'রা অভিহিত ছিলেন না, যদিও শৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত অনেক আগেই এই কবির পরিচয় দেন। (দ্র. "শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব কবি", 'সমালোচনী' মাঘ ১৩১১ এবং 'প্রদীপ' জ্যৈষ্ঠ ১৩১২ ব.)।

রাজ-পরম্পরায় মিথিলার রাজসভার সঙ্গে বিদ্যাপতি বহু-দিন যুক্ত ছিলেন এবং তাঁর জীবৎকালের আনুমানিক শেষ সীমা ১৪৬০ খৃ.। সুলতান ঘিয়াস-উদ্-দিনের কাছে পরাস্ত হয়ে ১৩২৩-২৫ খৃষ্টাব্দে মিথিলার শেষ স্বাধীন রাজা হরসিংহদেব (বা হরিসিংহদেব) নেপালে চলে যান। হরসিংহদেবের মহামন্ত্রী ঠক্কুর চণ্ডেশ্বরের এক জ্ঞাতি কামেশ্বর বিজয়ী মুসলমান শক্তির আনুকূল্যে হরসিংহের কিছু ভ্রষ্ট রাজ্যাংশের অধিকার পেয়েছিলেন। কামেশ্বরের উত্তরাধিকারীদের অনেকের নাম পাওয়া যায় বিদ্যাপতির রচনায়। কামেশ্বরের ছেলে ভোগেশ্বর, ভোগেশ্বরের দুই ছেলে গণেশ্বর ও ভবেশ্বর। গণেশের তিন ছেলে রামসিংহ, বীরসিংহ ও কীর্তিসিংহ। রামসিংহের রাজত্বের সময়ে লেখা একটি পুঁথির তারিখ ১৩৯০ খৃ.। কীর্তিসিংহের রাজত্বের সময়ে বিদ্যাপতি কীর্তিলতা লেখেন। কীর্তিসিংহের পরে সম্ভবত রাজ্যের অধিকার বর্তেছিল তাঁর খুড়তুতো ভাই 'গড়ুরনারায়ণ' দেবসিংহের উপরে, এ'র সভাতেও বিদ্যাপতি সম্মানিত সদস্য ছিলেন। বিদ্যাপতির মৈথিল পদের ভণিতায় তাঁর পারিপোষক রাজাদের মধ্যে প্রথম নাম পাওয়া যায় দেবসিংহের। দেবসিংহের ছেলে শিবসিংহ এবং বিদ্যাপতির জীবৎকালের একটি নির্দিষ্ট তারিখ ১৪১০ খৃ.। অধিকাংশ পদে শিবসিংহের উল্লেখ আছে, মনে হয় এই সময়েই বিদ্যাপতির কবি প্রতিভার চরম বিকাশ হয়েছিল। নিঃসন্তান শিবসিংহের পরে তাঁর ভাই পদ্মসিংহ রাজা হন। রাজ্য চালাতেন পদ্মসিংহের রানী বিশ্বাসদেবী। ইনিও বিদ্যাপতিকে মাননা করতেন। তার পরের দুই রাজা নরসিংহ এবং তাঁর ছেলে ধীরসিংহের রাজত্বের সময়— অন্তত ১৪৪০-৪৭ খৃস্টাব্দ অবধি মিথিলার রাজসভার সঙ্গে বিদ্যাপতির যোগের প্রমাণ আছে। ১৪৬০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বিদ্যাপতি অধ্যাপনা করেন, মুড়িয়ার গ্রামের এক ছাত্র শ্রীরূপধর হলায়ুধ মিশ্রের 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব'-এর অনুলিপিতে নিজের পরিচয় দিয়েছেন 'পণ্ডিত-

শ্রীবিদ্যাপতি-মহাশয়েভ্যঃ পঠতা ছাত্র' বলে, পুথির লিপিকাল লক্ষ্মণ সংবৎ ৩৪১ = ১৪৬০ খৃ.।

১. গ্রিয়র্সন ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করতেন, বিদ্যাপতির মৈথিলি পদাবলীর অনুকরণে পদ লিখতে গিয়ে বাঙালি পদকর্তারা ব্রজবুলি ভাষা সৃষ্টি করেছিলেন, ব্রজবুলি মৈথিল ও বাংলা মিশিয়ে গড়া কৃত্রিম ভাষা। কিন্তু পুরানো ব্রজবুলি পদের ভাষার সঙ্গে মৈথিলির মিল কম। গোবিন্দদাসের আগের ব্রজবুলি রচনায় বাংলা ও অ-বাংলা অংশ প্রায় সমান সমান। মৈথিলির অনুকরণে ব্রজবুলি গড়ে উঠে থাকলে গোড়ার দিকের রচনায় মৈথিলির প্রভাব বেশি থাকার কথা। বিদ্যাপতির অনুকরণে এই ভাষার উদ্ভব হয়েছিল বলা চলে না, কারণ বিদ্যাপতির অধিকাংশ ব্রজবুলি পদ বাংলাদেশেই পাওয়া গেছে। বিষয়ের দিক থেকে বৈষ্ণব কবিতার পূর্বরূপ পাওয়া যায় অবহট্‌ঠে। অবহট্‌ঠকে বলা যায় সপ্তম থেকে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত আর্যাবর্তে প্রচলিত কথ্য ভাষার সাধুরূপ নির্ভর সাহিত্যিক ভাষা। এই অবহট্‌ঠই ব্রজবুলির মূল। প্রাদেশিক ভাষাগুলি অল্পাবিস্তর পূর্ণরূপ ধরার পরেও দরবারি সাহিত্যে, বিশেষ করে রাধাকৃষ্ণ পদাবলীতে অবহট্‌ঠের আদর কমেনি। এই পরবর্তী অবহট্‌ঠের উপরে মৈথিলি প্রভৃতি স্থানীয় ভাষার প্রভাবে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে ব্রজবুলি রূপ নিয়েছিল। ব্রজবুলি তাই আর্যভাষার সাধারণ সম্পত্তি এবং কনিষ্ঠতম সর্বভারতীয় সাধু আর্যভাষা। অর্বাচীন অবহট্‌ঠে লেখা বিদ্যাপতির কীর্তিলতার কোনো কোনো অংশ একেবারেই ব্রজবুলির সদৃশ। যেমন—

পাঞে চলু দুঅও কুমর, হরি হরি সবে সুমর।
বহুল চ্ছাডল পাঢ়ি পাঁতরেঁ, বস ন পাওল আঁতরে আঁতরে।

অবহট্‌ঠ ও ব্রজবুলির মধ্যে অন্তরঙ্গ মিলের এও একটি প্রমাণ। মিথিলায় ব্রজবুলি প্রথম পাওয়া যায় চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ায় উমাপতি ওঝার 'পারিজাতমঙ্গল'-এর গানে। ব্রজবুলি পদাবলীর রীতি বাংলা, ওড়িশা ও আসামে চলে এসেছে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে, তবে কেবল বাংলাতেই স্থায়ী হয়েছিল। বাংলাদেশে রচিত প্রাচীনতম ব্রজবুলি পদ যশোরাজ খানের লেখা—

'এক পয়োধর চন্দন লেপিত আর সহজই গোর।'

২. আনুমানিক খৃ. একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতকের লোক। জীবনী ও জীবনকাল সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না। প্রাক্-রঘুনন্দন যুগের একজন খ্যাতনামা স্মৃতিকার। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির ওপর 'দীপ-কলিকা' নামে একখানি সংক্ষিপ্ত ও সরল টীকা রচনা করেছিলেন। অন্যান্য বই— 'দোলযাত্রাবিবেক', 'ব্রতকালবিবেক', 'সম্বন্ধবিবেক', 'দত্তবিবেক' ইত্যাদি।

৩. মিথিলায় লক্ষ্মণ সংবৎ নামে প্রচলিত অব্দ। এই অব্দ কখন থেকে গণনা করা হয় এবং কে এর প্রচলন করেন তা অনিশ্চিত হলেও লক্ষ্মণ সেনের স্মৃতি জড়িত। লসং লক্ষ্মণ সেনের সিংহাসন আরোহণ কালে সূচনা হয়নি। কারণ, এই সংবতের প্রথম বৎসর বিভিন্ন মতানুসারে ১১০৮-১৯ খৃ.-র মধ্যে পড়ে। লক্ষ্মণ সেন এর ৬০/৭০ বৎসর পরে সিংহাসনে বসেন। সম্ভবত বিজয় সেন যখন মিথিলা জয় করেন তখন পৌত্র লক্ষ্মণ সেনের জন্মসংবাদ পেয়ে এই অব্দ প্রচলন করেন।

৪. অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ ব. সংখ্যা 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত "কীর্তিলতা ও বিদ্যাপতি" নামে একটি প্রবন্ধে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সক্ষোভে শাস্ত্রীমশায়ের সমালোচনার উত্তর দেন। বিদ্যাপতির জীবৎকাল সম্বন্ধে শাস্ত্রীমশায়ের আপত্তি নগেন্দ্রনাথ মেনে নিয়ে বলেন, "ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্কশাস্ত্র যোগ করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, আমার হিসাবে ভুল হইয়াছে।

"এই যুক্তি অকাট্য আমি স্বীকার করি। পদাবলীর ভণিতায় বড় গোল আছে।" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও বলেন, ভূমিকায় বিদ্যাপতির জীবনবৃত্তান্তে তিনি লিখেছেন যে বিদ্যাপতি "...প্রায় ৯০ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন"। একথাটি শাস্ত্রীমশায় উল্লেখ করেন নি। "নসরৎ শাহের নামের গানে বিদ্যাপতির নাম নাই, আছে কবিশেখর" —এই মন্তব্য প্রসঙ্গে নগেন্দ্রনাথ বলেছেন, "...কবিশেখরের পার্শ্বে টীকা আছে, 'ইতি বিদ্যাপতেঃ'"। বিদ্যাপতির অনেক পদে রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও নগেন্দ্রনাথ সেগুলিকে "কীর্ত্তনের ছাঁচে ঢালা রসপ্রবাহের মধ্যে" বসানোর আপত্তি সম্পর্কে নগেন্দ্রনাথ বলেন, "বৈষ্ণব কবি ও সাধক বিদ্যাপতির যে সকল পদ গ্রহণ করিয়াছেন কাহারও সাধ্য নাই যে, তাহার একটিও বাদ দেন"।

৫. Shyam Narayan Singh, *History of Tirhut from the earliest times to the end of the nineteenth century*, Calcutta 1922.

৮. 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' বিদ্যাপতির রচনা নয়, বীরেশ্বরের পুত্র গণপতির (বা গণেশ্বরের)। এই গণপতিকে অনেকে বিদ্যাপতির বাবা বলে ভুল করেন। গণেশ্বরের অপর বই 'সুগতিসোপান'। দ্র. সুকুমার সেন, 'বিদ্যাপতি-গোষ্ঠী ও গীতিত্রিংশতিকা', বর্ধমান ১৩৫৪ ব., পৃ. ১৯।

৭. শাস্ত্রীমশায়ের 'হিন্দুর মুখে আওরাঙ্গেবের কথা' প্রবন্ধ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে যদুনাথ সরকার (১৮৭০-১৯৫৮ খৃ.) মন্তব্য করেন, "পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গের জীবিত প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অগ্রণী। তিনি আমাদের সকলের গুরুস্থানীয়। সুতরাং তাঁহার মুখে প্রশংসা লাভ করিয়া আমি নিজের পরিশ্রম সফল মনে করি। কিন্তু আমার রচিত ইংরাজী 'আওরংজীবের ইতিহাসে'র ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট পড়িলে আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে, আমি শুধু মুসলমান লেখকগণের উক্তির উপর নির্ভর করি নাই। প্রথমতঃ সমসাময়িক যে সমস্ত গ্রন্থ ও চিঠি ব্যবহার করিয়াছি তাহা ফার্সী ভাষায় লিখিত হইলেও তাহার অনেকের লেখক হিন্দু। তদ্ভিন্ন হিন্দু-রচিত আসামী, হিন্দী ও মারাঠী ভাষার বুরঞ্জী, বখর ও কাব্যাদি হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি, সে সব সমসাময়িক ইউরোপীয় পর্য্যটকগণ তৎকালীন ভারতের ইতিহাসের সাক্ষী ছিলেন, তাঁহাদের বৃত্তান্তও আমার কাজে লাগিয়াছে।" ('অষ্টম-বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, ইতিহাস শাখার কার্য্যবিবরণ', বর্ধমান ১৩২১ ব., পৃ. ৶০।)

২. পাঠ-প্রসঙ্গ

এই প্রবন্ধ 'প্রাচী' পত্রিকার ভাদ্র ১৩৩০ ব. সংখ্যায় "বিদ্যাপতি" নামে প্রকাশিত হয়। পরে শাস্ত্রীমশায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত বিদ্যাপতির 'কীর্ত্তিলতা'র (১৩৩১ ব.) ভূমিকা রূপে ছাপা হয়। পাঠ ঈষৎ পরিবর্তিত। এখানে কীর্তিলতার পাঠ নেওয়া হয়েছে। প্রধান পাঠান্তরগুলি দেখানো হল।

নিচের উল্লেখগুলির শুরুতে ব্যবহৃত সংখ্যা দুটির প্রথমটি পৃষ্ঠা এবং দ্বিতীয়টি ছত্র সংখ্যা নির্দেশক।

৭৬১/১ : "…মিথিলার একজন আদিকবি ও মহাকবি।" পত্রিকার পাঠ : "…মিথিলার একজন আদিকবি।"

৭৬১/২ : "…সভাসদ, রাজকর্মচারী, সেনাপতি এবং…।" পত্রিকার পাঠ : "…সভাসদ, রাজকর্মচারী এবং…।"

৭৬৩/২৭ : "তাঁহার নিজের সময়ের ও তাঁহার আগেকার অনেক ঘটনা…।" পত্রিকার পাঠ : "তাঁহার নিজের সময়েরও অনেক ঘটনা…।"

৭৬৮/৮ : "...আছে কবিশেখর। গানটি মৈথিল তো নয়ই, বাংলায় মৈথিলির নকল হইবারই সম্ভাবনা।" পত্রিকার পাঠ : "...আছে কবিশেখর। গানটি ব্রজবুলিতে।"

৭৬৯/৪ : পত্রিকার পাঠ : "কারণ বিদ্যাপতি শুধু শিবসিংহের ও লখিমাদেবীরই ভণিতা দেন নাই, ভোগীশ্বর ও তাঁহার রানীর ভণিতা দিয়াছেন, তিরহুতের অনেক বড়ো বড়ো রাজকর্মচারী ও তাঁহাদের পরিবারের নামে ভণিতা দিয়াছেন ; এমন-কি হুসেন শাহের নামেও ভণিতা দিয়াছেন।"

৭৬৯/২৭ : "...শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ সরকারের মতো শুদ্ধ মুসলমান লেখকের উপর বিশ্বাস করিলে চলিবে না। এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি, ...।" এই অংশ পত্রিকায় নেই।

৭৭০/১৩ : "আবার তিনি স্বহস্তে ভাগবতও নকল করিয়াছেন।" এই অংশ পত্রিকায় নেই।

৭৭৩/১৮ : "...বয়ঃসন্ধি শিরোনামায়...।" পত্রিকার পাঠ : "...বয়ঃ-সন্ধি হেডিংয়ে...।"

৭৭৮/২৫ : "নিতম্ব দুটি শুকনা ছিল, সে দুটি মোটা হইল।" পত্রিকার পাঠ : "নিতম্ব দুটি মোটা হইল।"

৭৭৯/২১ : "তোমার কথায় ভুলিয়া, ছিলাম কুলকামিনী, হইলাম কুলটা।" পত্রিকার পাঠ : "তোমার বচনে ভুলিয়াছিলাম, কুলকামিনী ছিলাম, হইলাম কুলটা।"

৭৮০/২৪ : "বাহিরে একটা পবিত্র ভাব দেখানো, একটা সংযত ভাব দেখানো, একটা ধর্মের ভাব দেখানো, খুব দরকার ছিল।" পত্রিকার পাঠ : "বাহিরে একটা পবিত্রভাব দেখানো খুব দরকার ছিল।"

৭৮১/৪ : "...কাব্যের উৎসাহ দিতেন এবং কাব্যের রসজ্ঞ ছিলেন...।" পত্রিকার পাঠ : "কাব্যের উৎসাহ দিতেন এবং তাহা হইতেই কাব্যের ও রসজ্ঞ কবির উদ্ভব হইয়াছিল।"

আমাদের এখনকার যে থিয়েটার, এটা ইংরাজের কাছে থেকে পাওয়া। ইংরাজের ছিল থিয়েটার, আমাদের দেখাদেখি হল থিয়েটার। যাত্রায় বাবুদের মন উঠিত না, কাজেই প্রথম প্রথম শখের থিয়েটার আরম্ভ হইল। পণ্ডিত মহাশয়েরা সংস্কৃত নাটক তর্জমা করিয়া দিতেন, আর বড়োমানুষ লোকে নিজের বাড়িতে স্টেজ সাজাইয়া সেই-সকল অভিনয় করিতেন। ক্রমে সংস্কৃত নাটকের তর্জমা বন্ধ হইয়া বাংলায় নাটক লেখা আরম্ভ হইল। প্রথম নাটক 'নববাবু-বিলাস' ও 'নববিবি-বিলাস'। উহা কখনো অভিনয় হইয়াছিল কিনা জানি না।[১] মাইকেলের [মধুসূদন দত্ত, ১৮২৪-৭৩ খৃ.] 'শর্মিষ্ঠা' [১৮৫৯ খৃ.] ও 'কৃষ্ণকুমারী' [১৮৬১ খৃ.] পাইক-

পাড়ার রাজবাড়িতে প্রথম অভিনয় হয়.[২] তাঁর 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' [১৮৬০ খৃ.] ও 'একেই কি বলে সভ্যতা' [১৮৬০ খৃ.] এই দুইখানি নাটক জোড়াসাঁকোতে প্রথম অভিনয় হইয়াছিল। তার পর চাঁদা করিয়া শখের থিয়েটার আরম্ভ হইল। বোবাজারের এক শখের থিয়েটারে মনো-মোহন বসুর [১৮৩১-১৯১২ খৃ] 'হরিশচন্দ্র' [১৮৭৫ খৃ.] প্রভৃতি কয়েকখানি নাটক অভিনয় হয়। তার পর বোধ হয় ১৮৭২ সালে [৭ ডিসেম্বর] জোড়াসাঁকোতে [মধুসূদন] সান্যাল মহাশয়দের বাড়ির দালানে টিকিট করিয়া 'নীল দর্পণ' [১৮৬০ খৃ.] অভিনয় হইতে দেখিয়াছি। সেই সময় যাঁহারা থিয়েটারে সাজিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই মরিয়া গিয়াছেন, অনেকে অ্যাক্ট করিয়াই দিন কাটাইয়া গিয়াছেন : অনেকে আবার বিস্তর নাটকও লিখিয়াছেন। তাঁহাদের হইতেই আমাদের নাটক আরম্ভ, তাঁহাদের হইতেই আমাদের নাটকের গৌরব, তাঁহাদের হইতেই আমাদের নাটকের শ্রীবৃদ্ধি। সুতরাং তাঁহাদের সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা আবশ্যক। যাঁহারা থিয়েটারকে পেশাদারি করিয়া বহু-সংখ্যক ভদ্রলোকের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, থিয়েটারকে জীবিকার উপায় করিয়া দিয়াছেন তাঁহারা দেশের এক মহা-উপকার করিয়াছেন। এই দুঃখ-দারিদ্রের দিনে যদি ১০০/২০০ ঘর লোকেও থিয়েটার করিয়া খাইতে পারে, সেটা কি মন্দ কথা ?

ইহাতে শুধু যে কয়েক শত লোকের জীবিকার উপায় হইয়াছে, তাহা নহে, ইহাতে সারা বাংলার লোকে আনন্দ উপভোগ করিয়াছে, সে আনন্দের ঢেউ বাংলার বাহিরেও অনেক দূর ছড়াইয়া পড়িয়াছে, ইহাতে সমাজেরও বিস্তর উপকার হইয়াছে। সমাজের বিস্তর অবিচার, অনাচার, কদাচার আস্তে আস্তে দূর হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় [১৮২০-৯১ খৃ.] বহুবিবাহ নিবারণের জন্য শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বই লিখেন, তাঁহার নাম-প্রতিপত্তি খুব ছিল, ক্ষমতাও যথেষ্ট ছিল, লেখাও খুব জোরই হইয়াছিল। কিন্তু ফল কী হইল ? তাঁহার নিজের দলেই ঘোর আপত্তি উঠিল, অনেক বন্ধু-বিচ্ছেদ হইল, বিস্তর দলাদলি শেষে গালাগালি, ব্যাকরণের ঝগড়া। একজন লিখিলেন, লাঠি থাকিলে পড়ে না। শেষে বিদ্যাসাগর মহাশয় মধুরেণ সমাপয়েৎ করিলেন, কস্যাচিৎ ভাইপোস্য লিখিয়া। আসল কাজের কিছু হইল না, বহুবিবাহ যেমন

ছিল, তেমনি রহিল। কিন্তু দীনবন্ধুবাবুর [মিত্র, ১৮৩০-৭৩ খৃ.] "বোগী-আবাগী" ও "বিন্দী আবাগী"র ঝগড়ায় বহুবিবাহের যত সর্বনাশ করিয়াছে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শত বইয়েতেও তত করিতে পারে নাই। ঘর-জামাইটা সেকালে একটা অতি বিশ্রী জিনিস ছিল, দীনবন্ধুর 'জামাই-বারিকে' [১৮৭২ খৃ.] তার খুব দোষ দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। খুব ঠাট্টা করা হইয়াছিল। ঘর-জামাই এখনো হয়, কিন্তু কদাচ কখনো, বিশেষ কারণ না থাকিলে হয় না। সুতরাং নাটকে একটা কদাচার উঠাইয়া দিউক. বা না দিউক, অনেকটা কমাইয়া আনিয়াছে সন্দেহ নাই। এইরূপে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বাংলার থিয়েটার বাংলায় খুব প্রতিপত্তি করিয়াছে। এবং এখনকার সমাজের উপর যথেষ্ট ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছে।

'নাচঘর'
২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য।

১. 'নববাবুবিলাস' (১৮২৫ খৃ.) ও নববিবিবিলাস (১৮৩১ খৃ. ?) ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা। 'নববাবুবিলাস'-এ প্রমথনাথ শর্ম্মণ এবং 'নববিবিবিলাস'-এ ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনাম ব্যবহৃত। এ দুটি নাটক নয়। শাস্ত্রীমশায়ের এই লেখা প্রকাশিত হওয়ার পর 'নাচঘর'-এ অমরেন্দ্রনাথ রায় এ বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন—

"প্রায় ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে রাজনারায়ণ বসু বলিয়াছিলেন— 'ভদ্রার্জ্জুন নাটক বাঙ্গালা ভাষার প্রথম প্রকাশিত নাটক।'— তদবধি এই মতই এ দেশে চলিয়া আসিতেছে। সেদিন কিন্তু দ্বিতীয় সংখ্যার 'নাচঘরে' দেখিলাম, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার প্রথম নাটক হিসাবে অন্য দুইখানি পুস্তকের নাম করিয়াছেন।··· শাস্ত্রী মহাশয়ের এই উক্তি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে যে ইহা একটা নতুন তথ্যরূপে গৃহীত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, 'নববাবু বিলাস' ও 'নববিবি বিলাস' গ্রন্থদ্বয়কে কি সত্যই নাটক বা প্রহসন নামে অভিহিত করা যায় ?

"এই পুস্তক দুইখানি পড়িবার বা স্বচক্ষে দেখিবার সুযোগ যে অদ্যাবধি আমাদের হয় নাই, এ কথা অবশ্য প্রথমেই বলিয়া রাখিতেছি। তবে ৬৬ বৎসর পূর্ব্বে শাস্ত্রী মহাশয়েরই সাহিত্যগুরু স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় তাঁহার 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রে ঐ দুই পুস্তকের যে পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িলেই 'নববাবু বিলাস' ও 'নববিবি বিলাস'কে শ্লেষাত্মক গদ্য রচনা ব্যতীত আর কিছুই বলিবার উপায় থাকে না। ১৭৮০ শকাব্দার 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র ২৮০ পৃষ্ঠায় আছে— 'যথার্থ ব্যঙ্গ কাব্যের মধ্যে নববাবু বিলাস নামক গদ্য পুস্তকের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। তাহা ত্রিংশতাধিক বর্ষ হইল একজন সুচতুর ব্যক্তি প্রস্তুত করেন। তাহাতে পিতার অমনোযোগে বালকের বিদ্যাভ্যাসের হানি হইলে স্ত্রৈণ্যতা ও পাণদোষে কি পর্য্যন্ত অনিষ্ট ঘটিতে পারে, তাহা তোতারাম দত্তের পুত্র বাবু কেশবচন্দ্রের উপন্যাসে প্রোজ্জলরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যে সময়ে তাহা প্রস্তুত হইয়াছিল, তৎকালে বর্ণিত বাবুর আদর্শ কলিকাতায় অপ্রাপ্য

ছিল না। অল্পকালে হর্তাপিতৃ অনেক ধনাঢ্যের চরিত্র অবিকল গ্রন্থোক্ত নববাবুর প্রতিরূপ মনে হইত। এই পুস্তকের আদর্শে অপর কোন রসোল্লাসী ব্যক্তি 'নব বিবি বিলাস' নামক ব্যঙ্গ প্রস্তুত করেন। ভদ্রস্ত্রী কুলটা হইলে যে দুর্গতি হয় তাহারই বর্ণন করা তাঁহার অভিপ্রেত ; এবং সে উদ্দেশ্যের অনুরোধে এবং কিয়দ্বা সহৃদয়তার অভাবে আপন আপন গ্রন্থ অশ্লীলতায় লিপ্ত করিয়াছেন। যদিও বর্ণিত বিষয় সত্য বটে, তত্রাপি তাহার পাঠে সহৃদয়দিগকে ব্যথিত হইতে হয়। ** তৎপরে কএক বৎসর মধ্যে উল্লেখের উপযুক্ত কোন ব্যঙ্গ কাব্যের প্রকাশ হয় নাই। পাঁচ বৎসর হইল মাসিক পত্রিকা নামে এক ক্ষুদ্র সাময়িক পত্রে 'আলালের ঘরের দুলাল' শিরোনামে ক-একটি প্রস্তাব প্রকটিত হয়, তাহা তদন্তর সংশোধিত ও প্রকৃষ্টীকৃত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধের আদর্শ 'নববাবু বিলাস'। কেবল 'নববাবু বিলাসের' অশ্লীলতা তাহাতে নাই, এবং নব্য শ্লেষবাক্যে বাবুবিলাস হইতে বিশেষ প্রোজ্জ্বল হইয়াছে।'— এই লেখাটুকু পড়িয়া কি 'নববাবু বিলাস' বা 'নববিবি বিলাস'কে নাটক বলিয়া পরিচয় দিবার সাহস হয়? এ সকল কথার প্রত্যুত্তরে শাস্ত্রীমহাশয়ের কি বলিবার আছে, তাহাই আমরা শুনিতে চাই। 'নববাবু বিলাস' ও 'নববিবি বিলাস' যদি কাহারও সন্ধানে থাকে, তবে সে গ্রন্থ দুইখানির সম্যক পরিচয় দেওয়া তাঁহার এখন কর্তব্য মনে করি।" ("বাংলার প্রথম নাটক কি?", 'নাচঘর', ৬ আষাঢ় ১৩৩১ ব.)।

২. পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়ার বাগান-বাড়িতে বেলগাছিয়া নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯ খৃস্টাব্দে এখানে 'শর্মিষ্ঠা'র প্রথম অভিনয় হয়। শর্মিষ্ঠা ছাড়া মধুসূদনের আর কোনো নাটক বা প্রহসন বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনয় হয় নি। তাঁর 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক ১৮৬৬ খৃস্টাব্দে শোভাবাজার নাট্যসম্প্রদায় অভিনয় করেন।

পরিশিষ্ট

১

THE LATE BANKIM CHANDRA CHATTERJI

Babu Bankim Chandra Chatterji, the greatest novelist in Bengal, died on the 8th April, at the age of 56, two years after his retirement from the public service after a brilliant career as Deputy Magistrate for nearly a quarter of a century.

His ancestry

Babu Bankim Chandra was descended from one of the five Brahmans who about a thousand years ago settled in Bengal and gave it a Hindu civilisation. He belonged to that section of the descendants of these Brahmans who settled in *Rârh* or western Bengal. One of his ancestors received the title of high nobility in the court of Ballal Sen. His title was confirmed by Ballāl's distinguished son, king Lakshman Sen. One of Bankim's ancestors performed the difficult and now unknown sacrifice of *Abasathî*, hence the family was distinguished above all other Brahman families in Bengal as *Abasathî*. This family is one of those which never migrated to Vikrampur after the fall of Hindu monarchy in western Bengal. By the middle of the sixteenth century, when a great chapter of Rârhyah Brahman nobility was held under the presidency of Devivara, the great re-organizer. Bankim's ancestors were found so distinguished for their learning, piety and strict

adherence to Hindu laws that they were placed in the highest of the thirty-six exogamus groups or *Mels* into which Devivara divided the *Kulin* Brahmans of his time. How and under what circumstances one of his ancestors lost the high place by marrying in a family of lower status is not generally known, but the family always retained the proud distinction of belonging to the *Fulia Mel.*

Settlement at Kantalpara

About two hundred years ago at the beautiful spot where a creek of the *bheel bariati* joins the Ganges opposite the Dutch settlement of Chinsurah, there lived a poor Brahman, Raghudeva Ghosâl, who eked out a precarious livelihood by priestly work. Tradition asserts that a holy person, সন্ন্যাসী, *Sannyâsî*, fell ill at Kântâlpârâ, the name of the village where Raghudeva lived. Raghudeva nursed him with all the attention of a devoted disciple. And his care was rewarded by the complete recovery of the Sannyâsî's health. The Sannâysî rewarded the poor Brahman with the image of Krishna and Râdhâ named *Râdhâballabha* and procured for the maintenance of the worship some land in the Purgana of Muragâchâ in Diamond Harbour. This not only placed the Brahman above want, but enabled him to marry two of his daughters, one in the *Fulia Mel* and another in the *Ballabhî.* Raghudeva's son-in-law in the *Fulia Mel* was Ramjîvan Chatterji, the great grandfather of the distinguished novelist whose death has just now plunged the whole of Bengal into deep sorrow.

His father

The income of the property granted to the idol placed the two families above the ordinary wants of daily life and enabled them to distinguish themselves in any walk of life which they choose to tread. Some of the Chatterjis took to public service under the Mahomedan Government, and Bankim's father Jadab Chandra Chatterji raised himself to the

position of a Deputy Collecter under the British Goverment.

This distinguished man received elementary education in Persian from a Mahomedan Munshi, whose services as a tutor were also retained by the Mittra family of Naihâti a neighbouring village. He began his career as a Mohorir on eight rupees a month in the salt department. Mr. Grote, under whom he served for a long time had the highest respect for him. On retirement from the public service he was rewarded with the title of Rai Bahâdur by the Government, which appreciated his services.

His brothers

Jādav Chandra had four sons all of whom distinguished themselves in the public service, three of them as Deputy Collectors— the highest position which educated natives could attain in those days. Bankim Chandra was the third of his sons.

His education

He was born on the 27th June of the year 1838. He received the rudiments of knowledge in Bengali from one Râmprân Sarkâr, a *Gurumahasaya* who practised his calling at and near Kântâlpârâ. He was for eight months under the care of this poor tutor. Then he was taken to Midnapur where his father was Deputy Collector. He began his English education in the Midnapur school. The frequent transfer of judical and executive officers is a hindrance to their childrens education, and Bankim's education was often interrupted by the transfer of his father. But he was not a man to waste his time or loss his opportunities. A thirst for knowledge distinguished him from his earliest childhood. While a student of the Hughly College he cultivated the society of the learned Brahmans of Bhâtpârâ and the neighbourhood. There was amongst

Sanskrit studies

these an individual named Śrînâm Nyâvâgîsha, who had established a small college or *tol* in Bankim's immediate neighbourhood. He

used to teach grammar and literature. His knowledge of grammar was profound, and his capacity for appreciating poetical beauty was far above the men of his class and time. Bankim received his knowledge of Sanskrit grammar and Sanskrit Literature from this distinguished pundit. It is surprising that a young lad of sixteen, most of whose time was occupied with varied Fnglish studies, should be able in his leisure to unravel the mysteries of a Sanskrit grammar, especially of *Mugdhabodha*, the hardest of them all. But from the beginning he was an admirer of Sanskrit poetry, and his admiration was heightened by the teaching of his distinguished Guru.

At this period of his life, Bankim Chandra also cultivated the society of Ishvara Chandra Gupta, the greatest living poet of the day.

His apprenticeship as a Bengali writer

Ishvara Chandra not only wielded a *facile* pen but was the greatest encourager of young men with literary tendencies. Under the fostering care of this popular poet, distinguished writer, and clever journalist, Bankim Chandra acquired a facility for writing Bengali ; which in after life made him the famous man he was. Ishvara Gupta was so much charmed with his poetical and prose compositions, that he often paid him a visit at Kântâlpârâ while journeying homeward from Calcutta, during the Durgâ Pûjâ holidays. In after life, Bankim Chandra used to relate to his friends the story of these visits with pride. In fact the poet Ishvara Chandra Gupta made the greatest impression on the youthful mind of Bankim Chandra and gave it a character and a shape which his pupil improved upon by his varied culture, distinguished scholarship and wide acquaintance with the world.

At College Bankim Chandra was a voracious reader of history, and he always longed to be a distinguished historian. It is often observed that literary men are averse to

mathematics, but this was not the case with our hero. He took to mathematics with as much zest as he took to literature. Even in his old age he applied himself with enthusiasm to Hindu astrology and was never tired of long calculations. His English style was terse and vigorous, and was often characterized by his superior officers as pungent.

College career

Bankim Chandra had already finished his education at Hughli College when the Calcutta University was established. The first B.A. examination of the University was held in the year 1858, and Bankim Chandra appeared as a candidate. When the list of successful graduates was published he headed that list, and the Calcutta University can now well be proud of its first B.A. His successin the examination attracted the notice of the Government, and he was appointed a Deputy Collector. Shortly afterwards it was resolved to place Deputy Collectors who had received a liberal education, in charge of sub-divisions, and Bankim Chandra was made the sub-divisional officer of Khulna. He ruled the sub-division with distinguished ability and proved that native gentlemen of birth and education possess administrative ability of a very high order. During his career as a Deputy Magistrate he was in charge of various sub-divisions, such as Baruipur, Baraset, Jhenida and Jajpur. He was often placed in the head-quarters of important districts, such as Hughli, Howrah, Midnapur, Maldah and the 24-Perganas. In many of these places he had to perform the duties which had never before been entrusted to native gentlemen but always kept in reserve for Joint-Magistrates. While at Hughli he was for several months the personal assistant to the Commissioner of Burdwan, but he never liked the the work of a clerk, and considered it to be a great relief when he was transferred from that appointment. For

His Deputy Collectorship

six months he officiated as an assistant secretary to the Government of Bengal. He discharged the functions of that important office with distinguished ability, and received the highest enconiums from the secretary, the late Mr. Macaulay.

In the early part of his career, Bankim Chandra tried to distinguish himself as an English writer; but he soon found out that he would be of a greater service to his native tongue than to the English language. It was a fortunate moment when the decision in favour of Bengali was made; it was fortunate for himself, it was fortunate for the Bengali language, and it was fortunate for the people of Bengal. His early poems in English, his articles in the *Calcutta Review*, even his English novels are now forgotten. His controversy with Rev. Mr. Hastie, and even his last speech in English on the Vedas created but a temporary interest. But his Bengali works will live,— a monument of his genius. They have in fact created a style in Bengali, elevated the taste of his readers, and shown to non-believers that the vernaculars of India possess powers of expression scarcely inferior to other languages. They have checked in young Bengal a tendency towards wild Anglicism which distinguished the early receivers of English education. His later works were undertaken expressly in the interest of Hindu revival— a movement which received its strength and vitality from his adherence. In his *Dharma Tattva* he has attempted to give the educated classes in Bengal a religion which will be acceptable to them. This advocacy of Hindu revival is not the outcome of blind faith, nor the effect of disappointment in securing the favour of Government, nor did it arise from any political motive. It arose from a settled conviction. He believed that the highest object of life is the full and harmonious develop-

His Bengali writing

Hindu revival

ment of all the various faculties of human nature, physical, intellectual and moral. He believed that no religion afforded greater facilities for the attainment of this highest aim than Hinduism. So he became a Hindu revivalist. He believed that the Krishna of the *Mâhâbhârata* was the highest embodiment of this noble idea of culture, and so became a worshipper of Krishna. So deeply was he convinced of the divinity of Krishna— for to him the highest ideal of man and divinity are identical— that two years before his death he repaired, at a great cost, the temple in which the image of his ancestral god Râdhâballabha was preserved.

But his works on religion are not so popular as his novels. The latter have admirers all over the country ; many of them have been translated into different languages ; and it is by these that he is, and will be, best known. Bankim Chandra received at college a purely secular education, and his first novels have not the least tendency to religion, his sole object in these being artistic excellence,— the creation of beauty for beauty's own sake. A chronological study of his novels will show the development of his mind and the gradual attainment of excellence in art. Extensive study of the Mahomedan period of Indian history, and the friendship extended to him by some distinguished Mahomedan gentlemen created in him a deep sympathy for the professors of Islam. With his non-sectarian education he could not understand why the great nations who inhabit India should hate each other so much. It is to this that we owe the mixing together of Hindu and Mahomedan characters in his early novels *Durgesha Nandinî* and *Kapâlakundalâ*. As he advanced in age, he gradually gave up introducing Mahomedan characters in his novels, some of which are entirely without them.

His novels

The beauty of Bankim Babu's novels consists in the delineation of love. He places his chief characters always in an ideal position free from the cares of the world and worldly pursuits. They are admirers of beauty, and it is beauty that they love. This beauty is not merely physical, nor merely intellectual, nor again, merely, moral beauty. In every one of his novels we find two individuals having the same object of love, and we also find that the most beautiful of the individuals succeeds in attaining the object of love. Suryamukhi and Kundanandini both loved Nagendra Nath but who gets him ? She who is the more beautiful. For can there be any doubt that Suryamukhi's intellectual and moral beauty is infinitely superior to the physical and sentimental beauty of her rival ? Rohini and Bhramar both love Gobinda Lal, but who gets him ? Certainly Bhramar ; and can there be any doubt that between Bhramar and Rohini, Bhramar is gifted with superior beauty in spite of her dark complexion ? Such moral beauty, such devotion to her duty, that is, her love for her husband is simply impossible to an individual like Rohini who in spite of her physical beauty is so depraved in her morals that had she been spared she would have run away with Danesh Khan, her Music Master, if a better companion could not have been found. The clue to the gradual development of Bankim's ideal of love is to be found in his idea of beauty. Which again is nothing else but a harmonious development of the various faculties of human nature. The higher the development, the superior the beauty. Those who have the time to trace this idea from *Durgeshnandiní* to *Krishnakânta's Will*, will find the lowest development in the earlier writings and the highest in *Krishnakânta*, with which the purely artistic work of Bankim Chandra ends.

His idea of beautiful

As is the case of other first class writers Bankim too,

after showing the highest ideal of beauty in love for individuals rises to wider ideas of love, that is, love for his country and his nation.

Later novels

Rȃjasinha is the embodiment of the love of one's country ; *Ānandamatha* is the embodiment of love for one's nation. But there is a love which is even superior to the love of one's own country and the love of one's own nation, that is, the love and sympathy for the weak and the miserable. This we find embodied in *Devî Chaudhurȃnî*, and *Sîtȃrȃm*. At an advanced age Babu Bankim Chandra gave up teaching by example, and began teaching by precept. From the concrete he rose to the abstract, from picture-painting he rose to the theory of art, from a novelist he became a preacher. There again his peculiar idea of beauty influenced him, and he preached a religion which though nominally Hindu was the Religion of Beauty.

There is a phase in Bankim Chandra's character which is very little known, but which is far reaching in its consequences, and should not be left unnoticed. The example of Ishvara Chandra Gupta

His school

was not lost on him. He on his part became a great encourager of literary excellence in others. A word of encouragement from such a high authority, even though in a patronising tone was calculated to rouse enthusiasm in young aspirants to literary fame. But Bankim Chandra was no humbug. He never used a patronising tone. Where he found excellence he became an enthusiastic admirer, where he found none he turned his face away. He has done excellent service by starting the first magazine in Bengali on the highest model of excellence, but his greater service was the creating of enthusiasm in young minds by an impartial appreciation of their productions. He was not always social, some people thought he was positively rude, but he was all love, all admiration, in the company of his literary friends whatever their age and

position in life. Many a distinguished writer in Bengali will remember to the end of their days with loving gratitude, and honest pride, how so distinguished an individual as Bankim Chandra found excellences to admire in their early productions. He has in fact left a school which will go on extending the influence of his example to unborn generations, and thus multiply the good work done by Bankim in the onward march of Bengali literature in the path of progress.

The Calcutta University Magazine
Vol. I, No. 5, May 1, 1894.

২

বেঙ্গল লাইব্রেরির রিপোর্টে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬ খৃ.) এবং 'রাজসিংহ' (১৮৮২ খৃ.) সম্পর্কে শাস্ত্রীমশায়ের মন্তব্য।

কৃষ্ণচরিত্র

MISCELLANEOUS.— On taking up this head, the attention of the reader is arrested by two masterly works ['কৃষ্ণচরিত্র' এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'সামাজিক প্রবন্ধ'] on two subjects of the most vital importance to Hindu society by two of the most distinguished men whom English education has produced in Bengal. Both have retired after a distinguished career in the public service, full of years and honours, and in their retirement have continued their literary pursuits. *Krishnacharitra*, by Babu Bankim Chandra Chatterji, is written in that attractive and brilliant style, which has made his works so popular. ...Krishna is worshipped as an incarnation of the Supreme Being all over India ; but his character, as represented by modern worshippers, does not appear to come up to the standard of the ideal of an incarnation. This led Babu Bankim Chandra to investigate the subject, and he read a large number of books concerning it. *Mahābhārata* appeared to him to be the greatest and most authentic work for the glorification of Krishna, but the *Mahābhārata*, as we at present have it, is a huge mass of literature, composed at different times and by different hands ; with patient research, therefore, Babu Bankim Chandra has attempted to distinguish the original from the interpolated parts of the work, and he has been eminently successful. That the *Mahābhārata* is a very ancient work is indicated by the fact that it is mentioned in the *Ashvalāyana Grihya sūtra*. Babu Bankim Chandra has shown that this original work consisted of 24,000 *slokas*, and he has with great scholarship attempted to find out these 24,000

verses in the modern *Mahābhārata*, and Krishna appears from these to be the highest ideal of all that is good in man. Later additions to the *Mahābhārata* have misrepresented the character of Krishna, although the memory of that character still survives in popular worship. After clearing the character of Krishna from the thick cloud of misconception which has surrounded it for centuries, the author proceeds to explain the conception of *Rādhā*. This also he has done with ability and judgement. The service he has done to young Bengal by writing this book is great. It will enable them to appreciate ancient India much better than if they had to depend for that interpretation either on the *Pundits* of India, or on western Sanskrit scholars. (*RBL*, 1892, p. 6)

রাজসিংহ

The fourth edition of *Rājsiṅha*, by Babu Bankim Chandra Chatterji, has been so thoroughly enlarged that it has become altogether a new book. The plot has been more fully developed and new characters have been introduced. *Rājsiṅha* was always considered to have been a failure, but Bankim Chandra has converted a failure into a brilliant success. The contrast of the Hindu and Musalman is throughout striking. The Moghal Emperor, Aurangzeb, with all the splendour of the Moghal court and *seraglio*, shrinks into insignificance in contrast with the patriotic and chivalrous *Rājsiṅha*, who, with a handful of brave Rajput warriors, defies the immense resources of the Empire. (*RBL*, 1893, p. 5)

VERNACULAR LITERATURE OF BENGAL BEFORE THE INTRODUCTION OF ENGLISH EDUCATION

[1891]

In rising in obedience to the order of the President to read a paper on the Vernacular Literature of Bengal before the commencement of English Education, I must thank the Cumbuliatola Reading Club for doing me the honor of electing to lecture on this occasion. I am fully sensible of my shortcoming in discharging a duty of so much importance and would have been exceedingly happy if the task had been imposed on some one more able than myself to do justice to the subject. If my effort does not come up to the standard of the lectures read in previous years at this Club, I must crave the indulgence of my audience on the ground that the choice of the authorities of the Club has not fallen on a proper person.

বর্তমান প্রবন্ধটি কম্বুলেটোলা রিডিং ক্লাবের বার্ষিক অভিভাষণরূপে রচিত ও পঠিত। পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯১ খৃস্টাব্দে। আধুনিক-পূর্ব বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় ঐতিহাসিক গবেষণার দৃষ্টিপাত এই-ই প্রথম। প্রবন্ধটি দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (১৮৯৬ খৃ.) রচনায় প্রবৃত্তি ও উৎসাহ দিয়েছিল। সাবিত্রী লাইব্রেরির অভিভাষণ (এই বইয়ের ৪৯৪ পৃ. দ্র.) এবং কম্বুলেটোলা রিডিং ক্লাবের ইংরেজি অভিভাষণ এক সঙ্গে পড়লে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথম খসড়া মিলবে। শাস্ত্রীমহাশয় কিছু কিছু যে ভুল করেন নি তা নয়। তবে তা নগণ্য বলতে পারি। টীকায় কিছু কিছু দেখিয়েছি। শাস্ত্রীমহাশয় নির্ভর করেছিলেন নিজের সংগৃহীত পুথির, বইয়ের ও তথ্যের উপর। দুঃখের বিষয় তাঁর একটি সিদ্ধান্ত— যা আমি এখন সমর্থন করি—. কৃত্তিবাসের সময়, কোন্ পুথির উপর নির্ভর করে অথবা কোন্ তথ্য সম্বল করে তিনি গড়েছিলেন তা বলেন নি। এই প্রবন্ধে এমন অনেক রচনার ও রচয়িতার নাম ও পরিচয় অল্পস্বল্প দিয়েছেন যা আগে জানা ছিল না। শেষে দিয়েছেন বৈষ্ণব পদকর্তাদের তালিকা এবং এঁদের রচিত পদের সংখ্যা। সবসুদ্ধ তিনি একশো চোদ্দ জন পদকর্তার নাম করেছেন।

সুকুমার সেন।

The subject, however, is a new one. Early vernacular literature is a newly discovered mine, and to a scientific researcher it is like a tremendous find of great importance. Some years ago the educated people of Bengal were not aware of the existence of a vast body of literature whose historical, literary and philological value cannot be overrated. The songs of Vidyapati and Chandidas are well known. Jnanadas and Govindadas also enjoy great popularity. But what are these eminent men ? They are *padakartas* or song makers only. And the only works of these ancient poëts that are known are their songs. But of late several long poems have been discovered, some of them running over 1400 pages, of which chroniclers of Bengali literature, Pandit Ramgati Nyayaratna and Mr. R. C. Dutta, knew nothing. Besides these, a number of short works on a variety of subjects and in a variety of provincial dialects have been published. A cursory examination of these works is all that is proposed in this paper.

Before proceeding to speak of these works and giving my remarks on them I must heartily thank a distinguished English gentleman who first drew the attention of the people of Bengal to the unusually rich treasure of literature which they have totally neglected. His efforts to interest the University in the work of publishing and editing ancient Bengali works were not successful. But his eloquent appeal on behalf of the ancient literature of Bengal made some impression on the minds of those for whom it was meant, and many people began to think of these works and to read such of them as were available. As the first fruit of this new study, I may mention the interesting articles in the *Navyabharata* Magazine on Chaitanya's life and his religion and some short treatises on the same subject.[১]

১. "চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধর্ম্ম" শিরোনামে জগদীশ্বর গুপ্তর ধারাবাহিক আলোচনা নব্যভারত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল পৌষ ১২৯২ থেকে আশ্বিন ১২৯৯ ব. সংখ্যা অবধি।

Babu Jagadishvara Gupta, the writer of the *Navyabhārata* articles, seems to have made Chaitanya's life his special study and has given us a neat edition of one of the three Chaitanya biographies; namely, the *Chaitanya-Charitāmrita.* Another neat edition of a second but more authoritative biography has been published by Babu Golab Chandra Ghosh, brother of the eminent editor of the *Amrita Bāzār Patrikā.* A short life of Chaitanya has been published by a young man who sold the copy-right to the proprietor of the Popular Library. A boy of seventeen, the son of an eminent pleader of Hugli, has written a short work in which he makes an attempt to grasp Chaitanya's idea of *bhakti.* So, Sir W. Hunter's efforts have to a certain extent borne fruit. I have named my subject the Vernacular Literature of Bengal; but it would be interesting, I believe, to speak here of the development of the Indian Vernaculars in general. In India, Brahmans have always held sway. In matters relating to religion, literature and education the language has always been Sanskrit, and Sanskrit has therefore been extensively cultivated all over India from the remotest times. It is needless to expatiate on the richness of Sanskrit literature. The Brahmans and their followers have almost always constituted the higher class of Indian Society. Whatever their language may have been at home and in the ordinary transactions of life, they used Sanskrit on all public and solemn occasions. So, the Vernaculars were seldom raised to the dignity of literary languages. Of course, I am not going to enter into the question whether Sanskrit was ever a spoken language at all. I do not go very far back. But from the very dawn of recorded history, however meagre that record may be, we find the Vernaculars used at home and Sanskrit abroad. At times, however, the Vernaculars of particular provinces seem to have been cultivated and used in writing. The remnants of some of these cultivated Vernaculars are to be found only in quota-

tions in later Vernacular works and in inscriptions on stones. The former are not always reliable, as they have been, as a rule, smoothed down to a very considerable extent by those who made them owing to their ignorance of the idioms of the ancient dialects. Every one who has gone into the work of editing ancient songs in Bengali has felt this difficulty, later MSS. always giving a smoothed down version of the ancient dialects. But the evidence of the inscriptions is much more reliable because there has been no smoothing down of the language of inscriptions at all, and it is a curious fact that the most ancient inscriptions *i.e.*, those from the third century B.C. down to the first century A.D. are mostly, if not all, in the vernaculars.

Now to the question— why in spite of the influence of the Brahmans to the contrary were the Vernaculars sometimes made the medium of written communication? The answer to this question is not far to seek. From the very earliest times Hindu Society has made arrangements for the retirement of men with a religious cast of mind from the concerns of the world. We find in the ancient treatise on Law by Gautama, supposed to have been written at least 1000 years before Christ, a complete code for the guidance of these ascetics. They speculated on spiritual matters away from human habitations, and some of them achieved great eminence in their work. Men of superior genius and sanctity among them had their followers among the inhabitants of the cities near which they lived. If these great men were bent on doing good to their followers by preaching what they had learnt by their prolonged speculation, what medium of communication would they adopt? Certainly the Vernaculars. It is a fact, that jealousy always subsisted between Brahmans and these ascetics and their followers. The Brahmans indeed, were, as a rule, predominent, but in many places the followers of the ascetics often raised their heads. I will name some of them as old

as the emancipation of Buddha. I take these names from the *Lalita Vistara*. They are *Cheraka*, *Paribrajaka*, *Sravak*, *Gautama*, *Nirgrantha i.e. Jaina*, *Ajiva* and *Sakra*. These names often occur in Buddhist works. Most of these are yet unknown. Dr. Hœrnle has discovered buried in the midst of works written in Jaina Prakrit a long account of the Ajivaka Sect. Their founder was Godamiye Mankhaliya Putte of Srāvasti. Their doctrines are quoted in the Jaina works and the language though considerably smoothed down appears to be different from that of the book in which they are quoted.

Next to these are the quotations given in the *Lalita Vistara* in what Raja Rajendralala Mitra calls the Gatha language. That language is nearer Sanskrit than any of the other ancient Vernaculars of India. It has been called a jargon in certain quarters ; in fact it is so utterly impossible to bring it under any grammatical rules that many may be tempted not to give it the name of a language. Others again think that while it retains all the Sanskrit idioms it differs from Sanskrit only in the matter of pronunciation. The Asoka inscriptions afford an example of a third series of Indian Vernaculars. Inscriptions in different parts of the country are written in the Vernacular of those parts and a collection of these inscriptions is really a curious and instructive study. The inscriptions are paragraph by paragraph, line by line and word for word the same throughout and yet curiously enough what is *raja* in one place is *laja* in another, what is *ebam* in one place is *hebam* in another.

A fourth form of the Vernacular is to be found in the work entitled *Mahavastu Avadana* the only survival of a vast body of literature which belonged to the Mahasanghika School of the Buddhists who seceded from the orthodox faith settled by the great Council of Asoka. The late lamented Babu Raj Krishna Mukherji used to say that the

language of this work bears a close resemblance to that of the *Satapatha Brahman.*

The 5th Vernacular is the Pali which is now a classical language studied by the Buddhists of all the countries to the east of India.

The 6th is the language of Purbies ; the first set of works belonging to Jain religion now lost. Wrecks of that language are to be met with in quotations in the Anga works of Jainas written in Jaina Prakrit which is the 6th Vernacular which rose to the dignity of a literary tongue. The various Dramatic Prakrits which are to be met with in the works of Kalidas and other poets look like so many descendants of the various dialects of the Asoka inscriptions.

These Vernaculars flourished as long as the sects which favoured their use flourished. With the decay of these sects the Vernaculars also decayed and become fossilised so to say.

The modern Vernaculars, too, owe their literature to the same cause, the activity of ascetics and their followers in preaching their peculiar doctrines. The followers of Nanak, Kavir, Tukaram and a whole host of them wrote in the Vernaculars of the Provinces in which they flourished. A record of the works of these great men, as far as the North-Western Provinces are concerned, is to be found in Mr. Grierson's excellent and elaborate work on the modern Vernacular literature of the North-Western Provinces ; and gentlemen, you will be glad to learn that Pundit Vāman Shāstri Upādhyāya of Islampur in Bombay will shortly publish an elaborate account of all the Vernacular poets of India. We in Bengal owe our Vernacular literature chiefly to the Vaishnavas and in some measure to the worshippers of Mangal Chandi and Vishahari. We have got a long series of orthodox Hindu books too. But they are later than these works. It is to the followers of Chaitanya

Prabhu and the Vaishnavas of earlier date that we owe our first great works. I will try to give an account of these works and their authors as much in the chronological order as may be possible ; and I will, in order to save your valuable time, pass over those works which are already well known to the educated public of Bengal. With this view I will pass over the work of Vidyapati and Chandidas both of whom flourished in the fourteenth century of the Christian era. These two eminent men are known only by their songs and I am not quite sure whether we can claim Vidyapati as our own. The Maithilis have, I believe, substantiated their claim to Vidyapati.

Nearly a century passes away after the publication of the works of these men before we come to *Shri Shri Krishna Vijaya*, our first poem of any bulk. It was taken up in 1470 and finished in ten years, that is to say, some years before the birth of Chaitanya in 1485. Chaitanya was fond of reading three books,— Vidyapati, Chandidas and *Shri Shri Krishna Vijaya*, the only Vernacular works available in his time. The work was written by Gunaraja Khan belonging to the Basu family of Kulinagram. The family was an extremely influential one ; the place was a fortified town and, I believe, lay on the ancient road to Jagannath, as without *duri* or cord from the Basus of Kulinagram no one was allowed to proceed to that holy shrine. Gunaraja was the grandfather of Basu Ramananda, one of the companions of Chaitanya, so called to distinguish him from Ray Ramananda of Vijinnagram another of Chaitanya's companions. Basu Ramananda lives in the memory of the Vaishnavas by his songs, some of which are to be found in the *Pada-Kalpataru*. Gunaraja Khan's work is a metrical translation of the last two skandhas of *Srimadbhagavata* written in an easy flowing and beautiful language in all its native vigour and uninfluenced either by Sanskrit or by Persian admixture. It is not known whether Gunaraja lived

to see Chaitanya raised to the dignity of an incarnation, but his grandson did.

Next in order of time comes Murari Gupta Beja an exceedingly estimable man who was already an old man when Chaitanya was born. He wrote the chronicle of the first period of Chaitanya's life and his *karchas* were drawn upon by all the biographers of Chaitanya. Lochandas was a relative of Murari[২] and was much indebted to these *karchas* for the materials of his Chaitanyamangal. I have found only one song by Murari and that is written not in the Maïthilized Bengali of the *padakartas* but in pure, simple and beautiful Bengali. It is a matter of extreme regret that Murari's *karchas* are lost.[৩] An active search should be made to recover them, for they are sure to help a philological study of the Bengali language.

Contemporary with Murari but younger in years, were Svarupa and Damodar, the chroniclers of the two later periods in the life of the great reformer.[৪] The Chaitanya biographers drew upon these two *karchas* but they also

২. লোচন দাস জাতিতে বৈদ্য ছিলেন, মুরারি গুপ্তের মতো। কিন্তু তাঁর সঙ্গে মুরারির কোনো ব্যবহারিক সম্পর্ক ছিল না। এঁরা ঠিক সমসাময়িক ছিলেন কিনা সন্দেহ।

৩. শাস্ত্রীমহাশয় যে মুরারি গুপ্তের কড়চাকে বিলুপ্ত বলেছেন, সে কথা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। অমৃতবাজার পত্রিকা আপিস থেকে মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' (১৯১১ খৃ.) নাম দিয়ে যে সংস্কৃত মহাকাব্য ছাপা হয়েছিল তা শাস্ত্রীমহাশয়ের এই রচনার অনেক পরে। বইটির অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে অজস্র সন্দেহ আছে।

৪. স্বরূপ-দামোদরের কড়চাকে স্বরূপ ও দামোদর নামে দুই ব্যক্তির দুখানি পৃথক রচনা বলে ভুল করেছেন। দামোদর পণ্ডিত নামে শ্রীচৈতন্যের একজন ভক্ত ছিলেন, স্বরূপ-দামোদর নামেও একজন ছিলেন। স্বরূপ-দামোদরের কড়চার দু-একটি শ্লোক কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। অনেক পরবর্তীকালে স্বরূপ-দামোদরের কড়চা নামে যে বাংলা-সংস্কৃত-পুস্তিকা প্রস্তুত হয়েছিল এবং বটতলা ও অন্যত্র ছাপাও হয়েছিল, তা একেবারেই গ্রহণীয় নয়।

are lost. I went to Navadvipa to search for these *karchas*, but with the utmost effort I could get only three *Karchas* of Damodar bearing on the eighth chapter of the second book of the *Chaitanya Charitamrita.* One of them relates to 7 Rasikabhaktas, Vılvamangal, Chandidas, Vidyapati &c. Neither is their matter nor language quite in accordance with good taste. My guide told me, this could not be the real work, as a purist like Krishnadas Kaviraj could not have used these as his materials. A blind old Vairagi informed me that a complete set of Svarup and Damodar's *karchas* are to be found in the possession of Hara Chattaraj of Dainhat in Cutwa but no effort has yet been made to search for the works there.

Chaitanya himself is said to have been a padakarta and the beautiful song *ay re Jagai Madhai ay Hari name majbi yadi ay* is attributed to him. The depth of devotional feeling and the breadth of views are not unworthy of the great reformer.[৫]

From an examination of these *pada* songs it appears clear that every Vaishnava in those days attempted to write *padas* and in the struggle for existence only the fittest have survived.

Basudeva Ghosh and Madhav Ghosh were companions of Chaitanya when the latter lived at Nadia and we find many *padas* bearing the signature of these men.

I will now proceed to speak of the three biographies of Chaitanya and my remarks on them need not be long, because they are well known works. Pandit Ramgati Nyayaratna has given accounts of *Chaitanya-charitamrita* and *Chaitanya-bhagavata*, and the *Navyahharata* articles

---

৫. পদটি আমাদের অজ্ঞাত। শাস্ত্রীমহাশয় যদি সবটা তুলে দিতেন তা হলে ভালো হত। গানের উদ্ধৃত প্রথম ছত্রটি দেখে মনে হচ্ছে এটি থিয়েটারি সংগীত। শাস্ত্রীমহাশয় যখন প্রবন্ধটি লেখেন তার আগেই আমাদের রঙ্গমঞ্চে বৈষ্ণব ভাবধারার বর্ষণ শুরু হয়ে গিয়েছিল।

give a full account of *Chaitanya-mangal.* Of these *Chaitanya-bhagavata* is the most authentic. It is written by Brindaban Das who is said to be the son of Narayani the daughter of Srivas Pandit[৬] who survived Chaitanya. Brindaban is said to be the Vyas of the Chaitanya incarnation. His work is written in a most businesslike language and a most businesslike manner. *Chaitanya-charitamrita* is by Krishna Das Kaviraj an inhabitant of Jhamatpur near Naihati in Cutwa. He lived long in Brindaban and was the nestor of the Vaishnab community there. He wrote both in Bengali and in Sanskrit. After writing the *Charitamrita* he gave it to Jiva Gosvami to see it, and the Gosvami, who thought that if this book in Bengali were published the Sanskrit works written by his uncles Rup and Sanatan and by himself would not be studied, locked the book up and did not return it to the Kaviraj. But a pupil of the Kaviraj clandestinely prepared a copy of the work, which enabled it to be published in spite of the Gosvami's exertions to suppress it. We learn this incident from the *Vivartavilas* by a pupil of of the Kaviraj who does not reveal his name.[৭] As I will not speak of the *Vivartavilas* any more, it is necessary to remark here that this is an important work as it gives much information regarding the secret ceremonies of the Vaishnavas; though some say that it is an apocryphal work written in the interest of the Khartabhajas.[৮]

The third biography of Chaitanya, the *Chaitanya-mangal,* is not regarded as of much authority though it is

৬. শাস্ত্রীমহাশয় এখানে ভুল করেছেন। নারায়ণী শ্রীবাসের কন্যা ছিলেন না, ছিলেন শ্রীবাসের এক ছোটো ভাই শ্রীরামের কন্যা।

৭. বিবর্তবিলাসের রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে হতে পারে না। সুতরাং এ বই কৃষ্ণদাস কবিরাজের কোনো শিষ্যের— মুকুন্দদাসের ?— রচনা নয়।

৮. শাস্ত্রীমহাশয়ের এই অভিমত যথার্থ বলে মনে করি।

a poetical work of the highest order. Lochandas its author received his inspiration from Murari Gupta. Lochan himself belonged to the Vaidya family of Shrikhanda, and was related to Narahari and Raghunandan.[৯] I should like to regard it as a work of the highest authority ; but there is no help. the Vaishnavas do not regard it so. Perhaps a poet of his stamp is never very careful about his facts. His *padas* are exceedingly charming. The *Vinoda pada* which is so much liked by all lovers of Kirtans is by Lochandas.

Here I think I should close my account of works written by the contemporaries of Chaitanya and proceed to the next generation.

As Chaitanya, Nityananda and Advaita were the great figures of the generation in which Chaitanya lived, so Shrinivas, Narottam and Shyamananda are the great figures of the generation which followed. Shrinivas does not figure in Bengali literature because he studied Sankrit. Narottam was a *padakarta* and an author. Shyamananda under the name of Dukhi Krishna Das wrote a number of songs. Narottam was a Kayastha and Shyamananda a Sadgop by caste. Narottam belonged to a rich family and his uncle had the title of Raja. They belonged to the village of Khetari on the Padma. He renounced the world at an early age and became a disciple of Loknath at Brindavan.[১০] He studied Sanskrit and Bengali and was a favourite both of Krishnadas Kaviraj and Jiva Gosvami. He had a large following of whom his brother Santosh

---

৯. নরহরি মুরারি গুপ্তের ছোটো ভাই। রঘুনন্দন মুরারি গুপ্তের ছেলে। দুজনেই শ্রীচৈতন্যের অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। লোচনদাস নরহরির কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। গুরুবংশের সঙ্গে লোচনের কোনো রক্তের অথবা বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল কিনা জানা নেই।

১০. নরোত্তম কখনো সন্ন্যাসী বা বৈরাগী হন নি। তিনি সংসারেই থাকতেন, তবে বিয়ে করেন নি। আচরণে তিনি বৈরাগীই ছিলেন বলা যায়।

Datta was the chief. He induced his brother to consecrate five images of Krishna at Khetari and the ceremony of consecration has been described by his followers in the most glowing colours. Narottam was one of those who were entrusted by the Vaishnava leaders of Brindavan to bring the works written by the Gosvamis at that place to Bengal for publication. The cart which contained this precious load was stolen by Bir Hambira Raya, the Raja of Ban Vishnupur, under the impression that it contained precious stones. But on opening the covers he was undeceived and instantly commenced to search for the persons to whom the manuscripts belonged. He found Shrinivas to be their owner, and began to study the Bhakti Shastra with him and gradually became his disciple. Narottama's songs are well known. They are, though not entirely, but certainly in a great measure, free from Maithilism.[১১] But his greatest work is a short metrical treatise on Bhakti entitled *Prembhakti Chandrika*, which is regarded as the quintessence of a lac of works. It expresses high sentiments and teaches noble precepts within the shortest possible compass, and many of its verses have become house-hold sayings with us.[১২] His other work is a metrical and explanatory translation of Rup Gosvami's short work entitled the *Smarana Mangala*.[১৩]

Narottama's great contemporary and intimate friend was Ram Chandra Kaviraja the brother of the voluminous *padakarta* Govinda Das. Ram chandra was a Sanskrit poet but he has also a short Bengali metrical treatise

১১. Maithilism বলতে শাস্ত্রীমহাশয় ব্রজবুলির প্রভাব বুঝিয়েছেন।
১২. 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'র এই যথার্থ প্রশংসা শাস্ত্রীমহাশয়ই প্রথম করলেন।
১৩. একাধিক 'স্মরণমঙ্গল' আছে। এগুলি রূপ গোস্বামীর কোনো রচনার অনুবাদ নয়। মনে হয় শাস্ত্রীমহাশয় এখানে জীব গোস্বামীর 'স্মরণীয় টীকা' নামে প্রচলিত রচনাটির কথা মনে করেছেন।

entitled *Smaran Darpan*, which treats of Vaishnava *mantra* and Vaishnava system of devotion.[১৪]

Ram Chandra and Govinda were the sons of Chiranjiva Sen of Kamarnagar [Kumarnagar] on the Ganges. Kamarnagar is often identified with Konnagar near Calcutta. But Konnagar is never known to have possessed a very large Vaidya population. Govinda's grandfather on the mother's side was Damodar of Shrikhand. He died childless and so Chiranjiva was obliged to migrate to Khanda with his family. Both Damodar and Chiranjiva were followers of Chaitanya and Khanda itself was a great stronghold of Vaishnavism. Govinda and Ram chandra were therefore educated under the strongest Vaishnavite influence. Ram chandra was a friend and associate of Narottama who never tires of honoring him. Govinda was a great *padakarta*. I believe a collection of his *padas* existed under the name of *Padamrita*. Some of his *padas* are in pure Bengali and some are full of Maithilism.[১৫] He often attempts to break his lance with the great Vidyapati. I have got one of Vidyapati's songs under Vidyapati's signature containing a second signature of Govinda in which Govinda seems to have attempted to correct Vidyapati. Of all the *padakartas* he appears to be the most voluminous. The number of his songs in the two collections, which I have analysed, is 458.

But the two great poets of this period to whom Bengali literature is exceedingly obliged are entirely forgotten.

১৪. রামচন্দ্র পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও শ্লোক রচনা-শক্তির জন্যই সম্ভবত তিনি কবিরাজ নামে খ্যাত হয়েছিলেন। তবে তাঁর কোনো বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থই আমাদের হস্তগত হয় নি।

১৫. গোবিন্দদাস কবিরাজ বাংলা পদ যে লেখেন নি এমন নয়। তবে গোবিন্দদাস ভণিতায় উৎকৃষ্ট বাংলা পদ প্রায় সবই গোবিন্দদাস চক্রবর্তীর বলে জানা গেছে। চক্রবর্তীও কবিরাজের মতো শ্রীনিবাসের শিষ্য ছিলেন।

Their works are large and throw much light on the manners, customs, rites and ceremonies of the Vaishnavas of those days. They are Narahari Chakravarti and Madhavacharyya. Narahari had another name,— Ghanashyam. His songs are sweet and melodious, his works are exceedingly well written. His first work is *Bhaktiratnakar*, over 1000 pages in print. It gives an account of Vaishnavism from the death of Chaitanya down to the spread of Vaishnavism all over Bengal under the rule of Shrinivas, Narottama and Shyamananda, that is to say starting from 1533 down to about 1580. The work is a mine of information about the Chaitanya religion. To a historical student the *Bhaktiratnakar* will always repay a careful perusal. It gives the topography of Navadvipa and Brindavan as exact as the topography of Gaya, Kapila Vastu and Kushinagar given by Hiouen Thsang, noting down every place connected with events in the life of Krishna and Chaitanya. There are topographies of holy places to be found every where in the world. Mandeville gives the topography of Jerusalem. The Brahmanda Khanda of the *Bhabishya Purana* gives a topography of Benares. These descriptions however are exceedingly dry reading. But it is a pleasure to go through the topography given by Narahari. It is like a picture drawn with consummate art which with the help of proper light and shade appears truely life-like. The work contains a beautiful chapter on the Vaishnava melodies and another on the Vaishnava idea of love. It gives an account of several early festivals in which all the great Vaishnava leaders were assembled. It holds up before the view a vast panorama of the ancient world of the Vaishnavas with its assemblies, *sankirtans*, festivals and feasts, with great men rising before our eyes as familiar friends, the history of whose previous life the author has already taken pains to acquaint us with. It was in fact the same thing for

Vaishnavism that Hiouen Thsang's work is for Buddhism with this difference that Narahari's work contains flashes of his poetical genius throughout. Narahari himself was the son of Jagannath who was a disciple of Vaishvanath Chakravarti the Vaishnavite commentator on the *Bhagavadgita.*

He has two other works, one is the life of Narottam and the other that of Shrinivas. *Norottama Vilasa* has been published.[১৬] It contains the life of that great man from his birth to his death just in the spirit of modern biographies. There is much that is marvellous in the work, for instance, his birth was foretold by Chaitanya and his death was characterised by miracles. The writer has enlivened his narrative, exceedingly interesting as it is, with songs.

Contemporary wlth Narahari but very much his senior in years was Madhavacharyya, a voluminous writer on a great variety of subjects. His father was Parasar, a learned Brahman of Triveni where the three streams, the Ganga, the Jamuna and the Sarasvati, separate. He was himself a Vaishnava, a follower of Chaitanya. The profession by which he lived was the *kirtan.* In one of his works he prays to Sarasvati that the boys of his party, recruited from various castes, may acquire purity of pronunciation. He seems to have been attached to Nityananda among whose *parikars* or associates his name very often appears. Indeed Triveni formed a suburb of the great city of Saptagram where Nityananda's influence was very great. He was present at the great festival performed by Jadunandan Chakravarti of Cutwa in honor of the dis-

১৬. 'নরোত্তমবিলাস' বহু বার ছাপা হয়েছে। প্রথম ছাপা হয় পুথির আকারে ১৮১৫ খৃস্টাব্দে। শ্রীনিবাসের জীবনী 'বীরচন্দ্রচরিত' ভক্তিরত্নাকরে উল্লিখিত আছে। এ বইয়ের কোনো পুথি মিলেছে বলে জানি না।

appearance (death) of his Guru, Gadadhar Das, whom Chaitanya asked to accompany Nityananda to Gaurdesh for the purpose of preaching his new faith. He was also present at the consecration of the five great images by Santosh Datta the cousin of Narottam who inherited all his ancestral estate. These are the facts that I have been able to collect in connection with the life of Madhavacharyya.[১৭] He may be compared to his great namesake the great Madhavacharyya of Southern India in the variety and extent of his works. I have got only one of his songs in the *Padàmrita Samudra* : it commences with a *bole* or tune of *khol.*

> *Agar tan tan Dadhi damba aore thugu thugu thugu thuga tan.*

His first work is *Bhagavat Sara* a metrical work of considerable length giving the substance of the *Srimad-bhagavata* as explained in the Vaishnava works. The language is simpler and more businesslike than that of Narahari. His second work is *Durga Mahatmya* or Chandi. It describes the origin and spread of the worship of Mangal Chandi. It is the same story which has been related by the great Mukundaram Chakravarti with so much power in what is known as *Kavi Kankan Chandi.* In fact, Kavi Kankan's work drove it out of Bengal proper and it found a safe refuge in the wilds of Chittagong whence it has been recently published. I have reason to think that the works of Madhava and Kavikankan were both derived from the same source and about the same

---

১৭. মাধব-আচার্য সম্বন্ধে শাস্ত্রীমহাশয় খুব গোলমাল করে ফেলেছেন। মাধব-আচার্য অন্তত তিন জন ছিলেন। হয়তো তাঁরা মোটামুটি সমসাময়িক ছিলেন। নরহরি চক্রবর্তী অষ্টাদশ শতাব্দীয় প্রথম অর্ধের লোক। কনিষ্ঠতম মাধব-আচার্যকে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধের পরে আনা যায় না। কোথা থেকে শাস্ত্রীমহাশয় মাধব-আচার্য সম্বন্ধে এত সব খবর যোগাড় করেছিলেন তা নির্দেশ করেন নি। করলে ভালো হত।

time.[১৮] There were other versions of the story more ancient still, for even before Chaitanya's birth Mangal Chandi used to be extensively worshipped and Brahmans often advised Chaitanya to take to the worship of this deity if he wanted to be rich. Madhavacharyya wrote in 1579 and Kavikankan wrote during the Viceroyalty of Mansinha.[১৯] Now Mansinha came to Bengal twice, once during Akbar's reign and once during the reign of his successor Jahangir, and it is not known at which of these two periods Mukundaram wrote his book.

Madhavacharyya had another work which seems to have been equally supplanted, namely, a work on the origin and spread of the worship of Dakshin Raya the deity who rides on tigers and presides over the jungly tracts of the Sunderbunds.[২০] Ramkrishna[২১] the author of the *Raya Mangal*, who lived in the country south of Calcutta and wrote his work in 1665 of the Saka era *i.e.*, about 150 years ago, says that Madhavacharyya's work on the subject is good for nothing as the author knew nothing of Dakshin Raya and has filled his pages with *iti uti*, this and that. On this account Ramkrishna wrote a new and very interesting work in which the great battle between the Tigers and the Mollas for the sovereignty of the Sunderbunds has been described with great force.

Bishahari's Panchali is as old as the works in honor of Mangal Chandi. The works on the subject extant are the *Mansar Bhashan* jointly by two authors namely

---

১৮. মাধব-আচার্যের চণ্ডীকাব্য আর মুকুন্দ কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল হুবহু এক উপাদানে গড়া নয়। উপক্রম কাহিনীতে যথেষ্ট ভিন্নতা আছে।

১৯. কবিকঙ্কণের কাব্য কখন প্রথম গাওয়া হয়েছিল তা আবিষ্কৃত হয়েছে। মুকুন্দ মাধব-আচার্যের আগে কাব্য রচনা করেছিলেন বলে আমার ধারণা।

২০. মাধব-আচার্যের এই রচনাটি পাওয়া যায় নি।

২১. শাস্ত্রীমহাশয় নামটি ভুল লিখেছেন। 'কৃষ্ণরাম' হবে। এই বইয়ে 'কবি কৃষ্ণরাম' প্রবন্ধ দ্র.

Kshemananda Das and Ketakadas[২২] and the other entitled *Padma Puran* by Narayan Deva. The latter is the only poetical work written in East Bengal yet discovered.

After Narahari and Madhava comes Mukundarama who is very well-known as the author of *Kavikankan Chandi.* The age of Krittivasa is not known but he is said to have flourished one hundred years after the death of Chaitanya.[২৩] He was a Brahman and an inhabitant of Fulia near Santipore. His Bengali version of the *Rāmāyana* is so well-known that it does not require a notice here.' So is Kashiram Das' Bengali version of the *Mahābhārata.* Kashiram flourished about two hundred years before this.[২৪] He was a Kayastha by caste and an inhabitant of Singi near Cutwa where his house is still pointed out as *Kesher bhita.* The Brahmans did not eye with favour the popularization of the stories of the *Rāmāyana* and the *Mahābhārata* : witness the proverb—

Kashideshe Krittibeshe ar Bamunghenshe ai tin sarbaneshe. Kashi Das, Krittivas and those who being low caste men associate with Brahmans are dangerous fellows.

We now come to the 18th century. The best poets of this period are Ghanaram whose work has superseded all the previous works on the Dharma-cult. The Dharma-

২২. ক্ষেমানন্দদাস ও কেতকাদাস দুই ব্যক্তি নন। এর মধ্যে একটি হল নাম, আর একটি উপাধি। কোন্‌টি যে নাম আর কোন্‌টি যে উপাধি এই নিয়ে সংশয় আছে। আমার মনে হয় 'ক্ষেমানন্দদাস' উপাধি, কেননা এই ভণিতায় আরো কেউ কেউ মনসার পাঁচালি লিখে গেছেন।

২৩. কী সূত্র অবলম্বন করে শাস্ত্রীমহাশয় কৃত্তিবাসের এই রকম মোটামুটি সময় নির্ধারণ করেছিলেন তা জানি না। তবে আমার নিশ্চিত অভিমত শাস্ত্রীমহাশয়ের সমর্থনে।

২৪. কাশীরাম দাসের এই কাল নির্ধারণ সমর্থনযোগ্য নয়। শাস্ত্রীমহাশয় একটি পুঁথির জাল লিপিকাল গ্রহণ করে এই ভুলটি করেছিলেন। অনেক পরে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে এই পুঁথিটি শাস্ত্রীমহাশয়ের সম্পাদনায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে 'মহাভারত আদি পর্ব্ব' নামে ছাপা হয়েছিল।

cult had,- 1st, the *Hākandapuran* which appears to have been lost, 2nd, Mayur Bhatta's work which is said to be still used in remote parts of Bankura, 3rd, Rupram's *Dharmamangal* which is used in the country to the South and West of Calcutta. The enterprising proprietor of the *Bangabasi* has published several editions of the work and people now know the work better than they did 8 or 9 years ago. Ghanaram finished his work in 1710. We owe to the enterprising spirit of the same gentleman the publication of two other works namely *Govindamangal* and *Sivayana* by Rameshwar Bhattacharyya and Duhkhi-shyama Raya, works which have been widely circulated of late.[২৫]

Just about the same period was translated Jayadeva's *Gitagovinda* in Bengali by Rasamayadas as well as by Giridhar.[২৬] Giridhar seems to have been the better poet of the two. He finished his work in 1731. Leaving these we come to Bharat Chandra and Kaviranjan Ramprasad Sen both of whom passed the last days af their life in the township of Naihati. Their descendants are still living and the sites of their houses are shown to all persons. A *Mela* has been instituted in honor of Ramprasad Sen. The great-grandsons of Bhart Chandra still occupy the land given to their great ancestor by the munificent Raja Krishna Chandra of Nadia. Only one name more and I enter into the nineteenth century, I mean, Durgaprasad, the author of the *Durgabhaktitarangini*, a work which used to be extensively read 20 years ago.[২৭] I need not speak of more modern poets, such as Ram Bose, Haru

---

২৫. এই বইগুলি বটতলা থেকে এবং / অথবা অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্গবাসী কর্তৃপক্ষ নতুন সংস্করণ বার করেছিলেন।

২৬. গীতগোবিন্দের পদাবলীর অনুবাদ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগেই করা হয়েছিল। সে বই হল লোচনদাসের 'জগন্নাথবল্লভ-নাটক'।

২৭. 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' গাওয়াও হত।

Thakur &c. as the patience of my audience has been tried to the utmost by this lengthy and dry narrative.

I should not forget to mention here two collections of songs which I succeeded in laying my hands upon, one by Radhamohan, a grandson of Shrinivas Acharyya and the other by Vaishnav Das. The first collection was made in the 17th and the second in the beginning of the 18th century.[২৮] I have analysed these two works and I find that the songs are composed chiefly by the members of the *parikars* of Chaitanya, Nityananda, Advaita, Shrinivas, Narottam and Shyamananda, and it is my firm conviction that a careful study of Vaishnava works will enable the reader to obtain much information regarding these *padakartas*.[২৯] The result of my analysis is given below—

		Nos. of Songs.			Nos. of Songs.
1.	Vidyapati	150	6.	Bindudas	2
2.	Shyamananda	7	7.	Shiva Ray[৩০]	1
3.	Gaur Mohan	1	8.	Jadupati[৩১]	1
4.	Gokuldas	1	9.	Raghunath	1
5.	Nandan Das	1	10.	Gopal Bhatta	1

২৮. রাধামোহন ঠাকুরের পদ-সংগ্রহ 'পদামৃতসমুদ্র'। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদেও জীবিত ছিলেন। স্বকীয়া-পরকীয়াবাদ নিয়ে যে তর্কসভা হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে, তাতে মধ্যস্থ হয়েছিলেন। তবে দুজন রাধামোহন ঠাকুর ছিলেন এবং তাঁরা প্রায় সমসাময়িক।

বৈষ্ণবদাসের আসল নাম গোকুলানন্দ সেন। এঁর পদসংগ্রহের নাম 'গীতকল্পতরু' বা 'পদকল্পতরু'। সতীশচন্দ্র রায়ের সম্পাদনায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত, ১৩২২-৩৮ ব.

২৯. শাস্ত্রীমহাশয়ের এই নির্দেশ আমি না জেনে অনুসরণ করেছিলুম চল্লিশ বছর পরে। তার ফল *A History of Brajabuli Literature* (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৫ খৃ.)।

৩০. এ নামের কোনো পদকর্তা পাই নি।

৩১. এ নামটিও ভুল। ভণিতা ভুল পড়ার ফলেই বোধ হয়।

No.	Name	Nos. of Songs.
11.	Sadananda	1
12.	Jadu Nath Das	17
13.	Gopikanta	1
14.	Balaram Das	131
15.	Bishvambhar	2
16.	Radhamadhab	1
17.	Madhavi Das	17
18.	Baladev	1
19.	Krishna Pramod Das	2
20.	Kanu Das	13
21.	Atharam Das[৩২]	4
22.	Jagamohan Das	2
23.	Shivai Das	5
24.	Churamani Das	1
25.	Krishnakanta Das	29
26.	Ghanaram Das	14
27.	Nrisinha Dev	4
28.	Bipradas Ghosh	1
29.	Madhav Das	61
30.	Jadabendra	3
31.	Naba Chandra Das	2
32.	Balai Das	3
33.	Dharani Das	1
34.	Basu Ramananda	9
35.	Mathur Das	1
36.	Gobardhan Das	17
37.	Jnan Das	198
38.	Atmaram Das[৩৩]	1
39.	Sundar Das	2
40.	Shyam Das	2
41.	Kalisikhar[৩৪]	68 + 111 = 179
42.	Gobinda Das	458
43.	Uddhav Das	99 + 3 = 102
44.	Gaur Das	2
45.	Devaki Nandan	4
46.	Ram Kanta	1
47.	Shankar Das	4
48.	Basudev Ghosh	134
49.	Radha Mohan	428
50.	Dvija Nanda	1
51.	Purushottam	12
52.	Sachi Nandan	3
53.	Bhuban Das	1
54.	Shivananda	3
55.	Chandra Sekhar	3
56.	Rasamay Das	2
57.	Madhusudan	5
58.	Jadu Nandan	95
59.	Govinda Ghosh	12
60.	Ram Chandra Das	4
61.	Chandi Das	119
62.	Murari Gupta	5
63.	Madhav Ghosh	8
64.	Ray Ramananda	15
65.	Narotsam Das [Narottam]	87

৩২. আত্মারাম ?

৩৩. দ্র. ২১ সংখ্যক নাম।

৩৪. এ নামের কোনো পদকর্তা পাই নি।

		Nos. of Songs.
66.	Narahari Das	81
67.	Ballabh Das	26
68.	Basanta Das Roy[৩৫]	41
69.	Ananta Das	47
70.	Champati Thakur	16
71.	Lochan Das	29
72.	Gopal Das	5
73.	Krishna Das Kaviraj	22
74.	Shrikrishna Prasad	5
75.	Gadadhar	3
76.	Brindaban Das	33
77.	Bansibadan Das	34
78.	Subal	2
79.	Madhavacharyya	5
80.	Kabiranjan	9
81.	Jadupati or Radhasinha Bhupati[৩৬]	4
82.	Jagannath Das	9
83.	Sinha Bhupati	7
84.	Baisnab Das	27
85.	Srinibas	3
86.	Birnarayan Bhupati	2
87.	Manohar Das	4
88.	Paramesvar Das	1

		Nos. of Songs
89.	Basanta Roy[৩৭]	10
90.	Dvija Bhim	1
91.	Hare Krisna Das	2
92.	Lakshmi Kanta Das	1
93.	Brajananda	1
94.	Haridas	7
95.	Mohan Das	27
96.	Gauridas	7
97.	Paramananda Das	11
98.	Gaur Sundar Das	3
99.	Hari Ballabh[৩৮]	4
100.	Radha Ballabh	19
101.	Shiva Ram	22
102.	Paramad [Parasad] Das	5
103.	Ram Chandra Das	2
104.	Din Hin Das	3
105.	Ram Das	2
106.	Kanaram Das [Kanuram]	4
107.	Nayananda	25
108.	Jagadananda	4
109.	Chaitanya Das	15
110.	Prem Das	31

---

৩৫. কবির নাম বসন্ত রায়। ইনি হয়তো 'বসন্ত দাস' নামও ভণিতায় ব্যবহার করে থাকবেন। তাই শাস্ত্রীমহাশয় নাম দিয়েছেন বসন্ত দাস রায়।

৩৬. এ'র পদাবলী 'সিংহ ভূপতি' অথবা 'চম্পতি-পতি' ভণিতায় পেয়েছি। ৮৩ সংখ্যক নাম দ্রষ্টব্য।

৩৭. দ্র, ৬৮ সংখ্যক।

৩৮. 'হরিবল্লভ' বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'তখল্লুস'।

	Nos. of Songs.		Nos. of Songs.
111. Bhupati Nath[৩৯]	4	114. Narananda [Nayananda]	1
112. Rasik Das	3	ANONYMOUS	287
113. Hare Ram Das	2		

I have derived one great benefit from the study of these early Bengali works. The late lamented Mr. Blochmann wrote several papers on the geography of Muhammadan Bengal after carefully reading a large number of works and after carefully deciphering a number of Arabic and Persian inscriptions and coins. His papers are exceedingly valuable and are to be found in the journals of the Asiatic Society of Bengal. All the important places he has identified could have been identified with greater ease if he had access to the works of which I have spoken. One place he could not identify and that is *Kalifatabad* in Jessore. Some say it is the ruined city near Bagher Hat where there is the celebrated tomb of Pir Ali Khan. I notice the same place mentioned in connection with the biography of Jiva Gosvami. His family had a halting stage at Fateabad in Jessore and they used to stop there for some days on their way from Cutwa to Chandradvipa in both of which places they had their houses.

Private enterprise is doing a great deal towards the search and publication of ancient Bengali works but I think there should be a systematic search for these works. If that is done much new light will be thrown on the history and geography of Bengal during the last three or four centuries.

৩৯. সিংহ ভূপতির ভণিতান্তর হতে পারে

ANCIENT BENGALI LITERATURE UNDER MUHAMMADAN PATRONAGE

Ala-Uddin Husain Shah was one of the greatest Sovereigns of Bengal. He rose from the humble position of a menial servant to a Kāyastha officer, of the later Illias Shāhi Dynasty of Bengal. It is said that his master, Subuddhi Khan, did not scruple even to beat his humble Muhammadan servant. The secret of Husain's success appears to have been his conciliatory policy towards the Hindus. He gave high offices under the State to learned Brahmans and shrewd Kāyasthas. Rūp aud Sanāton were his ministers. Hiraṇya and Gobardhan held under him the Viceroyalty of thc whole of Satgaon. The family of Narottom Dās rose to eminence during his reign. He tolerated the Hindu religion. Chaitanyaism flourished and spread during his time. Sanskrit learning revived during the prosperous period of the rule of his dynasty.

Following the example of their Noble Master, the Provincīal Governors and Generals ·also assumed a conciliatory policy towards their Hindu subjects. This enabled Husain to make extensive conquests in every direction. He conquered a portion of Tripura, and the greater part of Chattagrām. He destroyed the powerful dynasty of Kamtapur, in the north, and led several expeditions against the King of Orissa. He afforded an asylum to the last fugitive King of Jaunpur, and thereby risked the displeasure of the powerful Lodi King of Delhi. All this he was enabled to do because the Hindus were friendly towards him, and he had nothing to fear at home.

One of the means by which he and his Generals conciliated the Hindus, was the encouragement of their Vernacular literature. Before Husain's time the Bengalis

possessed a Vernacular literature. The Rāmāyana had been translated by Kṛttivāsa and the Bhāgavat by Guṇarāj Khan. There were innumerable popular versions of the stories of Manasā, Mangalcaṇḍī, and Dharmarāj. The Mansā Mangal, by Bipra Dās, was composed in 1495. But it appears that as yet the Mahābhārat had not been translated. It was a great desideratum. Popular Hinduism can scarcely do without a Bengali version of the Mahābhārat, and a Muhammadan General of Husain Shah undertook to have it translated under his own partronge. His name was Parāgol Khan. I do not know how the name will spell in Persian. Parāgol was the *Laskar* or General of Husain Shah, and held his Court at Chittagong.[1] He employed a native bard Parameçvar, who was dignified with the title of *Kavīndra*.[2] The Mahābhārat that was translated was Jaimini's and not Vaisampāyana's.[3] Janamajaya seems to have incurred

1. नृपति हुसेन साह् हय महामति। पञ्चम गौड़ेते करे परम ये ख्याति।
* * * * परागलखान महामति। सुबर्ण वसन पाइल अश्ववायु गति ।।
चस्करि विषय पाइया * * * चलिया। चाटिग्रामे चलिया * * * * ।।
* * राज्य करे खान महामति। पुराण शुनन्त नित्य हरषित अति ।।
संस्कृत महाश्लोक अति गुरुतर । * * * * * भारतकथा शुनि ।।
कोनमते पाण्डवे चाराय राजधानी । leaf 1

2. श्रीयुत परागलशान पद्मिनी भास्कर । कवीन्द्र कहन्ति कथा शुनन्न लस्कर ।। leaf 55

भीष्मपर्व्व युद्धारम्भे शुन रसमय । खान आज्ञा पद्‌वन्ध कवीन्द्रेते कय ।। leaf 96

लस्कर परागल धर्म्म अवतार । कवीन्द्र परमेश्वर रचिल पयार ।। leaf 291

3. जयमुनि नामे शिष्य दिल तोह्मा स्थाने । एँहि कथा कहिवेन शून सावधाने ।

the wrath of a Rishi, who cursed him, and the curse produced leprosy. The king in distress sent for Vyāsa, who ordered the king to hear from his pupil, Jaimini, the story of the Mahābhārata. The interlocutors are Janamajaya and Jaimini. It is curious that the Jaimini Bhārata is not to be found in its entirety in Sanskrit.[4] The only *Parva*, that is extant, is the *Açvamedha Parva*. But the Bengali version contains the whole of the Jaimini Bhārata. From this it appears certain that 400 years ago, in Husain Shah's time, the Jaimini Bhārata was procurable in its entirety, I have procured a copy of Parāgol's Mahābhārata, very nearly complete, at Komilla, from a shopkeeper who came from Chittagong.

At the end of the *Açvamedha Parva* of this work which runs through 12 leaves only there is a curious passage[5]

> ए वलिया मुनि * * * * अन्तर्द्धान । जयमुनि कहन्त कथा राजा विद्यमान ।। leaf 3
>
> जयमुनि कहन्त ये शुन जन्मजय । आदिपर्व्व कहिलाम शुनह निश्चय ।। leaf 22

4. See Notices of Sanskrit Mss. by Rājā Rājendralāl Mitra, vol. vi., page 219.

5. लस्कर परागल खानेर तनय । शुनिया युद्धेर कथा सरस हृदय ।।
छुटिखान नाम नसरत महामति । पश्चाते कि हइल हेन पुछिल भारती ।।
श्रीकर नन्दीरे कहे देखिया संगीता । जयमुनि कहिलेक भारथेर कथा ।। leaf 304
अश्वमेध पुण्यकथा, कल्पतरु पुण्यलता, पापताप आर नाहि भय ।
शुनिते मधुरतर, युक्तिप्रद अक्षर, शुनि वाणी नाहिक संशय ।।
खान परागल सुत, सर्व्वगुणे अद्भुत, मेदिनीमदन समशर ।।
वन्धुजन विकाश, अरिकुल हैलनाश, मन्त्रणाते येन शशधर ।।
लस्कर ये छुटी खान, कल्पतरु यारदान, वलवन्त वृकोदर सम ।।
ताहार निर्देश लभि श्रीकर नन्दीय कवि, करिलेन * * अनुपाम ।। leaf 307

to the effect that Parāgol's son, Chuti Khan, had ordered Çrikar Nandī, another poet, to give a full account of the wars described in that Parva. This stimulated my travelling Puṇḍit Binod Vihārī Kāvyatirtha to see if Chuti Khan's Açvamedha Parva was procurable. After a diligent search in Tripura during the last rainy season his exertions were rewarded with marked success. He found in the collection of Babu Anukūl Chandra Rāy, a landholder in the vicinity of Komilla, a copy of Chuti Khan's work, complete in 87 leaves. He has brought a complete notice of the work, from which it appears that Chuti Khan was as great a patron of Bengali literature as his father. After the usual benedictory verses, the work gives some account of Nasrat Shah, the son of Husain Shah, the Sultan of Bengal. Chuti Khan was a general of Nusrat Shah. He invested Tripura and compelled its King to abandon his capital in the plains and to retire to the hills and there found a new city, perhaps, Udayapura.

Chuti Khan loved his father tenderly, and received from the Sultan many marks of distinction. His father's Jagir was Charlol a little to the North of Chittagong, in the beautiful Mount Candra Çekhara. The land was surrounded on all sides by the river Faṇi.[6]

[6] नसरत् साहा तात अति महाराजा । राम * * पाले सव प्रजा ।।
नृपति हुसेन साहा ये * क्षितिपति । सामदान दण्डभेदे पालये वसुमती ।।
तार एक सेनापति लस्कर छटीखान । त्रिपुरार उपरे करिल सन्निधान ।।
चाटिग्राम नगरेर निकट उत्तरे । चन्द्रशेखर पर्व्वत सुन्दरे ।।
चारलील गिरिभार पैतृक वसति । विधि ए निर्म्मिल ताके कि कहिव अति ।।
फणी नाम नदी ये वेष्टित चारिधार । पूर्व्वदिके महागिरि पार नाहि तार ।।

As already mentioned, the poet who wrote the Açvamedha Parva, under the patronage of Chuti Khan, was Çrikar Nandī or Çrikaran Nandī.[7] He treats his work as a supplement to the greater work of Kavīndra Paramesvara. The language of the work is very good Bengali. There is no pedantic use of Sanskrit words, and is completely free from Persian influence. There are indeed, such forms as करन्ति, निवसन्ति, तुह्मी, आह्मार, &c., the old *Pali* and *Prakrit* forms which have not yet been eliminated from the language. A study of these works is likely to remove that misapprehension about the poverty of the Bengali language, which has induced some of the Bengali writers to coin new words, and to make the modern Bengali style jar in the ears of the Bengali public.

The Codex belonging to Babu Anukūl Chandra Rāy was copied on the 24th of Çraban, in the 1585th year of the Çaka era, that is, 233 years from this date.

लस्कर परागल खानेर तनय । ससरे निर्भय छुटी खान महाशय ।।
त्रिपुर नृपति यार डरे एड़े देश । पर्व्वत गह्वरे गिया करिल प्रवेश ।।
गजवाजी करदिया करिल सन्धान । महा वनमध्ये तवे पुरीर निर्म्माण ।।
ताँहार आदेश माल्य मस्तके करिया । श्रीकरणे करिलेक पयार रचिया ।।

৭ The Colophon of Chuti Khan's work has this :—
अश्वमेध यज्ञ यत तन्त्रेर सार । कवीन्द्र परमेश्वरे रचिल पयार ।।
लस्कर परामल खानेर तनय । संग्रामेते बिजय छुटी खान महाशय ।।
अष्टादश भारतेर करिया समाधान । रात्रिदिने भारतेर कथा अवधान ।।
अश्वमेध समर्पिया हरषित मन । स्वर्गेते हइल तवे पुष्पवरिषण ।।

Proceedings, Asiatic Society of Bengal
November 1894

~ ~

৫

Notices of Sanskrit MSS, Vol. XI 1895-এর ভূমিকা
থেকে বাংলা পুথি বিষয়ে আলোচনা নিচে উদ্ধৃত হল।

The operations of the last three years have considerably increased our knowledge of ancient Bengali literature. Hitherto, the latter end of the sixteenth century was regarded as the period for the commencement of Bengali literature, that is, learned people thought that the followers of Caitanya were the first pioneers of Bengali Poetry, and that the *Vaiṣṇava* literature was the earliest effort towards the formation of a Vernacular literature in Bengal. But Bengali works of a much higher antiquity have been received or discovered within the last three years, and every one of them from some out-of-the-way corner of the Province. One work is dated 1495 A.D.; another was written during the reign of Husain Shāh, 1491 to 1523; a third was composed during the reign of Nasrat Shāh, the successor of Husain Shāh. Some of these works were written under the patronage of some Muhammadan grandees, who seem to have followed the settled policy of the Bengal Saiyad Dynasty, of conciliating the Hindu population by encouraging the growth and development of their Vernacular literature. It seems certain that before the accession of this dynasty to power, Bengal had already a strong body of Vernacular writers, and that the Vernaculars were encouraged by the higher classes of Society, the Kāyasthas and Brāhmaṇs. Mālā Jhar Basu, who obtained from his Muhammadan sovereign the title of Guṇarāj Khān, and who is the founder of one of the most aristocratic Kāyastha clans of Bengal, translated between the years 1472 and 1482, the 10th and 11th *Skandhas* of the *Çrīmadbhāgavat* in beautiful Bengali verse. Kṛttivāsa, who was hitherto considered to be a contemporary of Akbar, was the grandson

of Murāri Ojhā, and ninth in descent from one of the Brāhmaṇs who received Kulinism from Ballāl Sen. Kṛttivāsa, therefore, must have flourished by the middle of the fifteenth century. He composed a Bengali work on the life and achievements of Rāma, differing widely from the version given by Vālmīki. What led to this literary activity amongst the higher classes is not yet known, but there are indications by which it may be guessed. It is said that the goddess of Serpents and Maṅgal Caṇḍī used to be largely worshipped by the lower classes, and the Brāhmaṇs who deserted their own camp and became the priests of these aboriginal deities, suddenly rose to wealth and power. There were the worshippers of Dharmarāj, too, who all belonged to the lowest order of society. The works written for the glorification of these aboriginal deities, were in the Vernacular, and this fact ensured for them a popularity which the Brahmanic deities wanted. The Brāhmaṇs, therefore, were compelled to adopt this new method of propagandism, and translate the great stories of the *Rāmāyaṇa, Mahābhārata* and *Çrimadbhāgavata* into Bengali. There is no doubt, that the Manasā literature is the oldest in Bengal, for Bipra Dās, who wrote in 1495, appears to have consulted many previous works. The story of Dharmarāj, which is the remnant of popular Buddhism in Bengal also has gone through various transformations till it was finally settled by the genius of Ghanarām, in 1710.

From all this it appears that Bengali literature at its earliest stage, that is, in the 14th and 15th centuries, was confined to the lower orders of people and to the aboriginal deities,— Maṅasā, Maṅgal Caṇḍī, and Dharma.

2. That during the 15th century the higher class of Hindus took to writing Bengali for the purpose of propagating their own faith.

3. That the Saiyad Dynasty patronized Vernacular literature as a means of conciliating Hindus of all classes.

4. That by the middle of the 16th century the followers of Caitanya made the Vernacular the principal medium of preaching their religion, and wrote a very large number of works in Bengali.

5. With the decline of the activity of Caitanya's followers, the Brahmanists took up the Vernacular, and during the whole of the last century wrote a very large number of excellent works.

The operation of the last three years in search of manuscripts in Bengal, has brought to light the following Bengali works, which were consigned for a long time to undeserved oblivion :—

Manasā, by Bipra Dās Pippalāi, written in 1495, after consulting previous works on the subject. A paper has already been written based on this work on the antiquity of the places on the banks of the Hugli. (See Proceedings, July 1893). This MS. is, unfortunately, in a very fragmentary condition.

Manasā, by Dvija Vaṁçi Dās, written a little after Bipra Dās, containing a glowing description of a sea voyage by a Bengali, has been obtained from Babu Umākiçor Rāy, Deputy Inspector of Schools, Dacca. The codex is worm-eaten, with its leaves sticking together from age and want of care.

A fragment of *Dharmamaṅgal*, by Rūp Rām, who preceded Ghanarām in describing the story of Dharma.

Rāmāyaṇa, by Kṛttivāsa, acquired at Komilla. Since the introduction of printing in Bengal, this work has gone through various editions, but ignorant editors have largely interfered with the text of the author, and have to a very great extent given it a modern air. The Komilla codex differs greatly from the printed editions, and is likely to be nearer to what the author wrote.

Çrīkṛṣṇavijay, by Guṇarāj Khān, acquired at Viṣṇupur, in Bankura. Babu Kedār Nāth Datta, a retired Deputy Collector, who has published an edition of this work, edited it from a worm-eaten bad manuscript. Our codex is complete, and in very good preservation.

Mahābhārata, by Kavīndra Parameçvara, written under the patronage of Parāgal Khān, of Chittagong, a distinguished general of Husain Shāh, acquired at Komilla. This is a Bengali version of the Sanskrit work, entitled *Jaimini Bhārata*, in its entirety. It is curious that only the Açvamedha Parva of this work is extant in Sanskrit.

Açvamedha Parva, by Çrikar Nandī, written under the patronage of Cuti Khān, the son of Parāgal Khān, deposited at the house of Anukūl Chandra Rāy, at Komilla.

Mahābhārata by *Sañjaya*, acquired at Komilla. This is also a Bengali version of the *Jaimini Bhārata* in its entirety, differing from that of *Kavīndra Parameçvara*. The style and idiom of the two works are so exactly alike, that the authors seem to have flourished much about the same age.

Kṛṣṇa Maṅgal, by Mādhav Ācāryya, belonging to the family of Caitanya's second wife, Viṣṇupriyā. The work is yet recited very extensively by the *Vaiṣṇava* Community. This has been acquired at Viṣṇupur by the exchange of certain printed works.

Kṛṣṇa prakāça ratna, copied at Viṣṇupur, a Bengali version of the *Çrimadbhāgavata*.

An account of Caitanya's life, by Cūḍamaṇi Dās, acquired at Viṣṇupur.

Prema vilās, by Narahari Cakravarttī, copied at Viṣṇupur. Paṇḍit Rām Nārāyaṇa Vidyāratna, of Berhampur, has published an edition of this work, but the codices consulted by him seem to differ from the codex from which this copy is made.

Adbhuta Rāmāyaṇa, by Jagatrām and his son Rāmprasād, written in Sk. 1677, Ādikāṇḍa and Laṅkākāṇḍa. Acquired at Purulia.

Kālikā Maṅgal, by Kṛṣṇarām Dās, acquired at Viṣṇupur. The codex was copied at Calcutta in 1753, by one Ānandarām for two rupees and two pieces of cloth. Kṛṣṇarām was an inhabitant of *Nimtā*, seven miles to the north-east of Calcutta.

Hari-Hara Maṅgal acquired from Bīrsiṁhā.

(pp. 17-19)

BENGALI BUDDHIST LITERATURE

The discovery of a Bengali Buddhist Literature is an event of some importance in Literary History. The interest of the discovery is enhanced by the fact that the Literature is one thousand years or more old and that it may lead to a further discovery of a more ancient Literature of the same kind. It is a matter of congratulation that the Bengali which 60 to 70 years ago was regarded as a new language incapable of expressing educated thought and as having no Literature worth the name should prove to be as ancient as Canon Bede[১] and the *Saxon Chronicles*[২], and it is still more a matter of congratulation that this Literature should be found influencing the religious thought of Tibet and through it that of the greater portion of Northern, Central and Eastern Asia. The authors of this Literature are still regarded as wise men in these countries and are worshipped as saints and holy men.

The History of the search of Bengali Literature which has led to such excellent results, may be told here with profit and, as it is not long, it may not prove tiresome. In the year 1879 appeared for the first time a history of

১. ইনি খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে কিছু খৃস্টীয় সংগীত রচনা করেছিলেন এঁর মাতৃভাষা ইংরেজিতে। পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। অন্যান্য রচনা লাটিন ভাষায়। লাটিনে লেখা *Ecclesiastical History of the English Nation* বিখ্যাত বই। জীবৎকাল ৬৭৩ ?-৭৩৫ খৃ.।

২. *Anglo-Saxon Chronicle* বইটিতে প্রাচীন ইংরেজি ভাষায় ওদেশের ইতিহাস কাহিনী বর্ণিত আছে। রচনা আরম্ভ করিয়েছিলেন রাজা আলফ্রেড— Alfred the Great— সম্ভবত ৮৯২ খৃস্টাব্দে। ১১৫৪ খৃ. পর্যন্ত ঘটনার বিবরণ এতে পাওয়া যায়।

Bengali Literature[৩], written by an educated Pandit, whose great admiration for Sanskrit Literature did not stand in the way of his appreciating what was then regarded as a lower form of Literature in the Vernaculars. Pandit Ramgati Nyayaratna did not go deep in the old history but he did a great service by criticizing the few old works that were known and showing from his own point of view that modern Bengali was deteriorating by falling off from the Sanskritized Standard set up by his immediate predecessors, the Pandits of the Sanskrit College and specially Pandit Iswara Chandra Vidyasagara criticized with severity the style and idiom of Michael Madhusudan Datta and Babu Bankim Chandra Chatterji and others who tried to infuse a modern spirit in the language and its Literature. His work did another service, it roused an enthusiasm for the literature and a number of earnest men began to study and enquire into its history. The first and most powerful of these was Mr. R. C. Datta whose work in English[৪] is still read with interest by all Europeans who want to know anything about Bengal. Others followed in the wake both in Bengali and in English and in 1891 appeared a small pamphlet entitled "Vernacular Literature of Bengal Before the Introduction of English Education"[৫] in which the author tried to give an exhaustive account of the old Literature. He had exceptional opportunities of knowing all that was printed and published up to the year of the publication of the pamphlet covering the period under his review.

---

৩. 'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় ১৫ জুলাই ১৮৭২ খৃ.। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে প্রকাশিত হয় আগস্ট ১৮৭৩ খৃ.।

৪. Ar Cy Dae, *The Literature of Bengal*, Calcutta 1877.

৫. এই বইয়ের পৃ. ৮০৭ দ্র.

He, therefore, concentrated his attention to new works and new facts not treated of by his illustrious predecessors. Yet he brought to light the names of more than one hundred poets of the 16th century and gave much interesting information about them. His object was not to write a history but to draw the attention of educated public to the almost inexhaustible resources of the old Bengali Literature. It became known from his pamphlet that three years before the birth of Chaitanya, Guṇarāj Khān finished after ten years of labour a Bengali versified translation of the Skandas of *Śrīmadbhāgavata* relating to the incarnation of Krishna. Chaitanya is said by all his biographers to have a great liking for three poets, *Jayadeva, Vidyāpati* and *Chaṇḍīdāsa.* Of these *Jayadeva* flourished in the 12th century A.D. and wrote his inimitable songs in Sanskrit on the sports of Krishna and Rādhā. But the songs were written in such easy Sanskrit and the idioms are so near Bengali that people of Bengal, especially those who had any pretensions to education, found little difficulty in understanding and appreciating them.

Vidyāpati was a Maithil Brahman belonging to the last half of the 14th and the first half of the 15th century. His date has been fixed in a very curious way. Shortly after, it is supposed of the defeat and death of Sivasimha, his great patron, who for many years defied the Muhammadan power, he retired with his patron's family in the jungles and employed two scribes to hastily copy a commentary of the well-known rhetorical work entitled *Kāvyaprakāśa.* The manuscripts in two different hands has been found in Nepal and it is dated 291 La Sam, *i.e.*, the era started by the Laksmana Sena, king of Bengal in 1119 A.D. As the years in that era are calculated in 360 days, the difference between La Sam date and a date in A.D. becomes one year more in 73 years. Calculating that way La Sam, 291 would be 1119 + 291 − 4 = 1406 A.D. *Vidyāpati* lived to a

great age. In his early years he wrote in Maithil and in his later years in Sanskrit. *Vidyāpati* was therefore a middle aged man when he got this manuscript copied.[৬]

Vidyāpati, it is said, was anxious to see *Chanḍīdās* whose fame as a Vaisnava poet was spread far and wide in the Vaisnava world of the time and started from home towards Nannur in Birbhum where *Chanḍīdās* lived.[৭] But they met on the way and were delighted to see each other. *Chanḍidās* is regarded as an elder contemporary of *Vidyāpati* so he must have flourished about the same time, only a little earlier. But we get two different idioms'in *Chanḍīdas's* works. His songs are written in one idiom and his *Krishṇa Kīrtan* in another idiom. The question of this difference of idioms has not yet been studied but there can be only two explanations. One that the songs have been modernized by those who sing them and that the epic which has been recently discovered in an old script has not yet undergone the process of Modernization.[৮] The other

৬. যে-সব পুথির ভণিতায় অথবা রচয়িতা রূপে বিদ্যাপতির নাম পাওয়া যায় তা এক ব্যক্তির মনে করলে বিদ্যাপতিকে শুধুই সুদীর্ঘজীবী নয় সুদীর্ঘ জোয়ান ব্যক্তি বলেও গণ্য করতে হয়। নেপাল দরবারে শাস্ত্রীমহাশয়ের আবিষ্কৃত একটি পুথির পুষ্পিকায় লিপিকার বলেছেন যে তিনি সদুপাধ্যায় বিদ্যাপতির কাছে পড়ছেন এমন ছাত্র। পুথিটি লেখা শেষ হয়েছিল ১৪৬০ খৃস্টাব্দে। তখন বিদ্যাপতি জীবিত তো ছিলেনই, কর্মক্ষমও ছিলেন। সুতরাং আমাদের একথা ধরে নিতে হবেই যে মিথিলা অঞ্চলে বিদ্যাপতি নামে একাধিক কবি-পণ্ডিত ছিলেন। আমার মনে হয় ওই অঞ্চলের রাজসভায় সভা-পণ্ডিতকবির উপাধি ছিল 'বিদ্যাপতি'।

৭. বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মিলন কাহিনী সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব কবির কল্পনাপ্রসূত কাহিনী ছাড়া কিছুই নয়।

৮. শাস্ত্রীমহাশয়ের এই অনুমানের পক্ষে কিছু প্রমাণ আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দু-একটি পদ পদাবলীতে যথারীতি পরিবর্তিত আকারে পাওয়া গেছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় -সম্পাদিত 'চণ্ডীদাস-পদাবলী' (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্, ১৩৪১ ব.) দ্র.।

explanation is that there were two *Chaṇḍīdāsas*, one older and the other younger. Whichever explanation is found correct in the long run it would not be very wrong if *Krishṇa Kīrtan* is placed in the middle of the 14th century and thus if the beginning of the Vaisnab Literature in Bengali be placed about that time.

Some may object to drag *Vidyāpati* in the history of Bengali Literature as he was a Maithil Brahman and his language and idiom was Maithil. But it is certain that *Mithila* was an integral part of the Kingdom of the Senas of Bengal in the 12th century and that the Maithil Society, Maithil Language, Maithil Script, and Maithil Literature, both Sanskrit and Vernacular, were greatly influenced by their intimate contact with Bengal. Harisimha was the king of Maithila in the first quarter of the 14th century. He invaded Nepal and fought with the forces of the Emperors of Delhi. He had a court poet named *Jyotirīśvara Kaviśekharācārya* who wrote both in Sanskrit and Vernacular. One of his Sanskrit works, a drama entitled *Dhūrttusamāgama*, the Meeting with a Knave, in order to give a reception to the victorious *Rājā* on his successful encounter with the Muhammadans. His Vernacular work is entitled The *Varṇana Ratnākara*,[১] the Ocean of description. It is written in a sort of prose. It gives directions to intending poets how to describe men and things. The language in which it is written can scarcely be distinguished from Bengali, in fact, it is more Bengali than Maithil. It is a store house of information and its known date enhances the value of the information given.

In the year 1883, Babu Jogendra Nath Bose, the proprietor of the *Baṅgabāsī* newspaper, published a work entitled *Dharma Maṅgal*, written about the year 1710, by *Ghanarām*. It is written for the glorification of the Dharma

১. এই বইয়ের পৃ. ৪৫১ সূত্র ১ দ্র.

Cult, a Cult which is now regarded in many quarters as the last remnant of Buddhism in Bengal. Subsequent researches have brought to light a number of works of the Cult and a number of facts to prove that it is the survival of Buddhism.[১০] *Ramāi Paṇḍit* is regarded as the originator of the Cult or at least the Cult is indebted for its spread to him. A ballad ascribed to him complains of hardship, which the followers of Buddhism or Sadharma (a word meaning Buddhism in Asoka inscriptions in a number of Buddhist works and in the ballad also) suffered at the hands of Brahmans. They appealed to *Dharmarāja*, their god, who is the Second Member of the Buddhist triad, namely, Dharma which in later Buddhism meant the Stupa. He assumed the form of a Musalman with a black cap on his head. His associates such as Siva and Visnu, Durga and others, assumed the forms of Musalman saints. Siva became Adam and Durga became Eve and so they assailed the Brahmans and broke their power. The passage is a significant one. It shows how the Buddhists and Musalmans united against the Brahmans and how Muhammadans absorbed a good deal of the Buddhist population in Bengal. The story given in the *Dharma Maṅgal* goes back to the time of the rise of the *Pālas* in Bengal. But the originafor of the Cult by his own admission seems to have flourished after the Musalman conquest of Bengal, how long after, cannot be said. The scene of the ballad is laid at *Jājpore* and Maldaha, but these are not the well-known cities which go by these names, but obscure places in Western Bengal. Under these circumstances the ballad

---

১০. পরবর্তী গবেষণায় শাস্ত্রীমহাশয়ের এ মত ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয়েছে। ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি বাংলা রচনায় যে ধর্ম ঠাকুরের উল্লেখ আছে তার সঙ্গে বৌদ্ধ মতের ত্রিশরণের মধ্য শরণ ধর্মের কোনোই সম্পর্ক নেই। এ বিষয়ে 'রূপরামের ধর্মমঙ্গল'-এর (১৩) ব.) ভূমিকা এবং বা-সা-ই (অপরাধ), সপ্তম পরিচ্ছেদ দ্র.।

may well be placed in the second century of the Musalman conquest. The *Śūnyapurāṇa* by the same *Ramāi Pandit* must come to the same age as this curious ballad. Thus neither the Literature of Dharma Cult nor of the Krishna Cult, in Bengali can go beyond the second century of the Muhammadan conquest, *i.e.*, the 14th century A.D.

Our knowledge of the antiquity of the Bengali Literature remained at this stage for many years. In the meanwhile Babu Nagendra Nath Vasu wrote his memorable article on Bengali Literature in the *Viśvakoṣa* or, the Bengali encyclopædia and Dinesa Chandra Sen, Ray Saheb, wrote his work entitled *Bāṅgālā Bhāṣā* and *Bāṅgālā Sāhitya* [*Bāṅgālābhāṣā o Sāhitya*] in 1896 and translated it into English under the distinguished patronage of the Calcutta University in 1913. These works simply systematizes the information from the time of the *Śūnyapurāṇa* downwards and presented it in a readable form. In their anxiety to give a complete account of the works in these centuries they had no time to work out the details of any special period of literary activity or any special form of literature. Many enthusiastic young men are now engaged filling in the gaps left open by them. Of these Babu Susil Kumar De is doing a special service by working out details of the Bengali Literature of the early years of British rule, when British officers and Missionary gentlemen took great interest in Bengali, wrote books, pamphlets, papers and articles and even conducted newspapers, thus laying the foundation of that Bengali prose, which is so much admired at the present moment." These established foundries for Bengali type, taught the Bengali compositors their work and made the beginning of the Bengali Press which is so active at the present day and which gives occupation to so many thous-

১১. *Bengali Literature In the Nnineteenth Century*, Calcutta 1919.

ands of men. The merit of Babu Susil Kumar De's patient work in bringing to light the patient and persevering work of these foreign founders of Bengali prose and of Bengali Press cannot be overrated. He has not forgotten his own countrymen who under the guidance of these philanthropic Europeans enriched their own Literature by writing a number of works on a variety of subjects.

The search for manuscripts of Bengali Literature is still going on unabated, the newspapers and magazines teem with descriptions of old manuscripts of old works brought to light and two names stand prominent in this department of literary activity : one is a Muhammadan gentleman in Chittagong, Moulvi Abdul Karim, who has collected and described several thousands of Bengali manuscripts of works written both by Hindus and Muhammadans and his descriptions are always full and accurate and possess much literary and historical value.[১২] Chittagong being an out-of-the-way place free from the vicissitudes of the richer and more favoured districts of Bengal have preserved many valuable relics of the past and among these the manuscripts of the works of Bengali Literature, and it is a matter of congratulation that these have fallen into the hands of such an earnest and enthusiastic worker like our friend Abdul Karim. The other gentleman is Babu Siva Ratan Mitra[১৩] who has made a large collection of manuscripts and described them but has not yet been able to publish much.

While these earnest men were enthusiastically working in the plains with Bengali manuscripts, Bengali works, their

---

১২. দ্র. আবদুল করিম -সম্পাদিত 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ' প্রথম খণ্ড, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ।

১৩. শিবরতন মিত্র বহু পুথি সংগ্রহ করেছিলেন। এঁর সংগ্রহ বিশ্বভারতী কিনে নিয়েছেন। সাহিত্য-পরিষদের 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ' দ্বিতীয় খণ্ড এঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

history, their influence, their literary merit and so on, a Bengali *Brāhmaṇ*,who for obvious reasons should be nameless here, was working patiently, quietly with the dusty heaps of palmleaf manuscripts in the Royal and private collections in the depth of the Himalayas, in the City of Khatmandu and in its neighbourhood. His work was of a thrilling nature, sometimes he gets a lost epic of the first century A.D., sometimes a work on Buddhist logic, sometimes one of Buddhist Philosophy, sometimes a *Purāṇa* copied in the sixth century script, sometimes an unknown work of the Saiva sect, sometimes the Sanskrit original of a work known only in Tibetan translation, sometimes the Sanskrit original of a work known only in Chinese translation, sometimes a work on astronomy translated from Greek into Sanskrit, sometimes a Samhita, a class of Literature intermediate between Puran and Tantra, sometimes an ancient work on Hindu medicine, sometimes a genealogy of the kings of Nepal, sometimes a genealogy of the Brahmanas of *Maithilā*, sometimes the standard work of a sect which has now only a few representatives in Tibet alone, sometimes a work on Smriti compilation made in the 11th century and a lot of Tantric works of various shades of opinions and forms, all inculcating the worship of deities in extremely amorous position representing the 50 letters of the India alphabet as the forms of different deities, instructing how these letters and their combinations are to be spiritualized and enlivened into the form of divinities and preaching sensual and, nay, sexual pleasure as the *summum bonum* of human bliss. The pleasure and thrilling delights of these discoveries kept him always occupied. But he longed for more, he longed for some discoveries towards the elucidation of the ancient history and Literature of his own country, dear old Bengal. Once he got a history of Bengal for two or three reigns in the 11th century supplementing and adding to the

knowledge of Bengal history under the *Pālas* from epigraphic records. The service which the publication of *Rāmacharita* or the History of *Rāmapāla Deva* has done is now well known. Spiteful people may magnify a printing mistake here and a clerical error there into grave serious mistakes and inexcusable faults, but that is the store house of information to which every one must turn in his need. But the delight of this Brahman knew no bound when he laid his hands, one fine morning, on a palmleaf manuscript in the early 12th century Bengali script, of a collection of Bengali songs with Sanskrit commentary attached. About the date of the script he had no doubt. It was Bengali on the face of it, much older Bengali handwriting than that given in Professor Bendall's photo etching at the end of his Catalogue of Buddhist Manuscripts in the Cambridge University Library, and belonging to the year 1198. If so, he argued the script belong to the early 12th century, the Sanskrit commentary must be earlier than that time. The collection of songs must precede the commentary, and the composition of the songs must precede the collection. The songs belong to 20 different authors, whose signatures are invariably attached to the last lines of their songs. The authors therefore must belong to the 10th century at least, and all this afforded food to his thought, reflection and study for several years.

The songs belong to 20 different authors, all called *Siddhāchāryyas*. Of these again Lui[১৪] is called the *Ādi Siddhāchāryya*, the first *Siddhāchāryya*. Dārik,[১৫] another *Siddhāchāryya*, says that it is through the grace of Lui that he has attained the twelfth stage of progress and has now become fully equal to Buddha. Dārik seems therefore to

১৪. এই বইয়ের পৃ. ২৯৮ সূত্র ৩১ দ্র.
১৫. এই বইয়ের পৃ. ৩০১ সূত্র ৩৩ দ্র.

be an immediate disciple of Lui. *Krishṇāchāryya*[১৬] was a *Siddhāchāryya*. From his language he appears to have been a Bengali. He uses such peculiarly Bengali words as *Chināli, Jautuka, ṭāla, bol bob* for *bobā*, or dumb, *Kāl* for *kālā* deaf, *bhāli* for *bhāla, dehu* for *deo, māli* for *mālā*, garland. Four of his descendants are among the authors of these songs, namely Saroruha or Saraha.[১৭] Dharma or Dhāmapāda, Dhendhana or Dhetana and Mahīpāda. Kambala or *Kāmali*[১৮] is one of the authors and Kankana is one of his descendants. *Vīrūpa* or *Viruā*[১৯] is one of the *Siddhāchāryyas* and *Vīṇāpāda*[২০] is his descendant. So it is clear that these belong to several, at least, to two generations. The songs in this collection have been taken from their own collections of songs or *gītis*. The vernacular works in ancient Bengal, were either *gīti* or songs, or *gāthā* ballads, or *dohā* couplet. If this is true then there were in ancient Bengal altogether 33 poets whose Bengali works have been preserved in Tibetan translations. These 33 also wrote many works in Sanskrit. Some of them were men of wide fame and wielded much influence in Buddhist countries, for instance, Atisha or *Dīpankar Srījnāna*,[২১] who reformed Tibetan Buddhism in the second quarter of the 11th century, wrote several collections of *gītis* and he was the son of the *Rājā* of Vikramanipore, east of Magadha. *Nāda* Pandit, from whom Atisha learned Tantrika Buddhism and who has a great name still in Tibet, was a writer in the Vernacular.

As regards the chronology of these songs it can be

১৬. এই বইয়ের পৃ. ৩০১ সূত্র ৩৪ দ্র.
১৭. এই বইয়ের পৃ. ৩০২ সূত্র ৩৫ দ্র.
১৮. এই দইয়ের পৃ. ৪২১ সূত্র ৯ দ্র.
১৯. এই বইয়ের পৃ. ৪২২ সূত্র ১০ দ্র.
২০. এই বইয়ের পৃ. ৪২৪ সূত্র ১৮ দ্র.
২১. এই বইয়ের পৃ. ২৯৯ সূত্র ৩২ দ্র.

proved in this way. Atisha, as stated before, was the son of a Prince of Vikramanipura east of Magadha. So he was a Bengali, Nāda Pandit was his guru. He went to *Suvarṇadvīpa* or Indo-Chinese Peninsula to study *Mahāyāna*. Then he became the chief Abbot of *Vikramasīla Vihāra*. In the year 1038 he was invited to Tibet at the age of 58. He worked there for 14 years and died at the age of 72. But early in life, most likely before leaving for *Suvarṇadvīpa*, he wrote a work entitled *Abhisamayabibhaṅga* in collaboration with Lui. As Lui's name stands first and Atisha's after his, Lui appears to have been the elder of the two. We may therefore take the period of Lui's literary activity in the last half of the 10th century A.D. and that of the sect founded by him between 950 to 1100 A.D. But who was Lui ? He was an inhabitant of *Rādha* where he is still worshipped by the followers of Dharma who often dedicate a he-goat to Lui and it is a sin to kill the goat so dedicated and in that portion of the *Mayūrabhanj* State which is still called *Rādha* he is still worshipped as a Siddhapurusha or saint. In Tibet he is still worshipped as one of the wise men. He was very fond of eating the entrails of the fish and therefore he had a nickname *Matsāntrāda* or the eater of the entrails of the fish, and the Cataloguist of the Tangur remarks that he should be distinguished from *Matsendranāth*, the son of *Mīnanātha*,[২২] the founder of the *Saiva Yogī* sect.

When the founder of the sect was a Bengali and he wrote in Bengali, it is natural to suppose that his followers also wrote in Bengali. If his followers belonged to any other nationality, their idioms will be a little different and

২২. মীননাথ নামে একজন দোহা অথবা গীতি রচয়িতা ছিলেন। এ'র একটি চউপই দোহা চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে ২১ সংখ্যক পদের টীকায় উদ্ধৃত আছে। মৎস্যেন্দ্রনাথ নামে কোনো ব্যক্তির হদিস কিছুমাত্র পাওয়া যায় নি।

so some of the songs are tinged with Oriya and other idioms. This plainly shows that the language of the songs is mainly Bengali. But in those remote ages the languages were not so well marked as they are now. Hence following Tāranāth Wassiljew thought that some of the works mentioned in the Tangur were written in the *Apabhraṅśa* dialects and Professor Bendall thought that they were written in Prakrit or Buddhist Prakrit. These words Prakrit and *Apabhraṅśa* are used very loosely. The Bengali, even the modern Bengali, is often called by our old class Pandits, as Prakrit. The Pandits, when they find a language which does not conform to the rules of the current Prakrit grammars, often call it *Apabhraṅśa*, a word which etymologically means fallen from the standard of purity as set forth in grammars. So these words are often used in a loose and unscientific way. The scientific way of dealing with Sanskritic languages would be to name them after the district and the century. The language of Asoka inscriptions should be spoken of in this way, as the Magadha dialect of the third century B.C. But even then it would not be strictly accurate as these inscriptions show a variation in pronunciation and idiom. So, strictly speaking, they should be called the Guzerat dialect of the third century B.C., the Punjab dialect of the same period and so on. So these songs should be described as written in the dialect of Western Bengal in the 10th and 11th centuries. Sometime one song may be tinged with the idiom of the dialect of that particular follower of Lui who wrote it. Since Lui wrote, many revolutions of a sweeping nature have passed over Western Bengal and the changes wrought in the language have been violent and it is wonderful that one can yet recognize his language as Bengali.

Wassiljew saw only the Tibetan translations of what he calls the *Apabhraṅśa* works, so he has simply followed what the translators said. Professor Bendall saw only a

few *dohās* in the *Subhāṣitasaṁgraha* which he edited. The number of these *dohās* quoted from various authors is, I believe, 28. All of them again not complete *dohās*. From these he concluded that the language was either Buddhist Prakrit or simply Prakrit. Now the *dohās* are generally written in an elevated and archaic language. But that is not the case with the songs. The songs are, as a rule, written in the language and idiom of the people. They are intended to touch their heart. So there must be a bit of difference between the language of *dohās* and that of the songs. But after a study of the songs it would be quite easy to pass a judgement as to the language of the *dohās*. When the songs are Bengali of the 10th century the *dohās* represent the archaic dialect of that period. Professor Bendall had his own doubts about the language of the isolated *dohās* that came in his hands, for in one place he calls them Prakrit, in another he calls them Buddhist Prakrit,[২৩] in another he calls them *Apabhraṅśa*. He found that they do not conform to the rules of Prakrit grammar and so he qualifies the expression by adding *Buddhist* to it. But as yet no work in Buddhist Prakrit is known.

The extent of the actual discovery is fifty songs and two *dohākoṣas* or collections of *dohās*, each by one author. The authors of these *dohākoṣas* again are to be found among the composers of the songs. A careful comparison of the authors' *dohās* and their songs will bear out the fact that the *dohās* are written in a more dignified and archaic language. These are not isolated *dohās* like those in Professor Bendall's *Subhāṣitasaṁgraha* but a long series of *dohās*, teaching one doctrine from the beginning to the end, and so afford better material for a comparison of the languages of the *dohās* and songs.

---

২৩. বৌদ্ধপ্রাকৃত আসলে 'অবহট্‌ঠ'। অদ্বয়বজ্র বলেছেন 'অপিভ্রষ্ট'। অবহট্‌ঠ অপভ্রংশের পরিণত রূপ।

The songs are extremely musical and in no way inferior in this respect to the *Kīrtana* songs of the Vaisnava folowers of Chaitanya six hundred years later. The *rāgas* or tunes are almost the same. The method of singing and the musical instruments almost the same. So the originality claimed by the Vaisnavas in inventing *Kīrtana* does not hold good. In the Vaisnava *Kīrtana*, the first couplet of the song is repeated as a burden (or *Dhūyā*) as often as other couplets are sung. But in the Buddhist song all the couplets seem to have been repeated to make the singing long and imposing. This may be very successful with the kind of audience they then had, but would be too tedious and irksome to a more refined audience. Buddhist works either in Sanskrit or in the mixed dialect either in Pāli or in any other dialect are verbose and full of repetition. The Bengali songs and *dohās* are not so. But by often repeating every line in singing they made up for want of verbosity. The last couplet always contains, as in Vaisnava songs, the signature of the poet and a summary of ideas contained in the song, and it rounds up the music with some effect.

The social position of the authors of the songs differed considerably from that of the Vaisnava authors. In those old days Brahmanas were few in Bengal and their followers almost a negligible quantity. The little Aryan culture the people then had came filtered through Buddhism. But still the poets of the songs came from the highest society of the time. Their language was not boorish but elevated and dignified and they tried to make it as much Sanskritized as they could for even then Sanskrit was supposed to give dignity and add respectability. The comparisons are drawn from natural objects such as lotus, mountains. rivers. etc., but what strikes one as peculiar is the oft-repeated *símile* with boats and their constituent parts, the oars, helms, ropes. pegs, and so on. Another fruitful source of com-

parison is the milking of cows. The authors seem to have been substantial boatmen, cowherds and men in a similar position.

These songs do not seen to be the first of their kind in Bengali. There seem to have been other Hindu songs and poetry, for in the Sanskrit commentary of this are quoted some verses as belonging to *Paradarsanas* or foreign religion or to *Bahissāstra*, outside *Sāstra*. One of these is by *Mīnanātha*, the founder of the *Saiva Yogī* sect, otherwise called *Nāthas*. The Saiva sect is always regarded as belonging to the ninth century A.D. Wassiljew following Tāranāth says that they flourished about 800 A.D. Hodgeson seems also be of the same mind. The passage quoted from *Mīnanāth* is undoubtedly good Bengali and may stand good with slight modifications even in modern times. It is impossible to resist the temptation of quoting it.

কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট
কর্ম্ম কুরঙ্গ সমাধিক পাট।
কমল বিকসিল কহিহ ন জমরা
কমল মধু পিবিবি ধোকে ন ভমরা ॥

In the word পরমার্থের, "*era*", as an inflection of the possessive case is distinctly Bengali. কহন্তি, অন্তি as an inflection for third person singular was current in Bengali up to the 16th century and the *Mahābhārata* translated under the patronage of *Parāgala Khan* is full of this form of expression. *Bāṭa* and *pāṭa* are still current in many places. কহিহ and বিকসিল are still current. The same is the case with ধোকে. An energetic and careful search may bring to light the ancient Literature of sect of *Nāthas* who are still very influential in many parts of India and have left in Bengal an intelligent, wealthy and influential caste of *Nāthayogīs*. The doctrine of the *Siddhāchāryyas* are an outcome of the *Mahāyāna* doctrine of Buddhism, though in criticizing the doctrine of other sects one of the *Siddhāchāryyas*, Saroruhavajra speaks contemptuously of the

Mahāyāna. Yet there is not the least shadow of a doubt that *Sahajayāna* is a necessary consequence of that doctrine. It bases itself on *Sūnyavāda,* the distinctive doctrine of *Mahāyāna* and argues in this fashion, "if the whole world is void, if the phenomenal existence is an illusion, then there is no *bandha* or bondage, for that being included in the phenomenal existence, is also void." If there is no bondage there is no *Nirvāṇa,* for *Nirvāṇa* is simply the negation of bondage. If bondage is an illusion, Nirvana is also an illusion. Every man is by his nature perfectly free and one of the poets fervently sings :

অপণে রচি রচি ভবনির্ব্বাণা
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপণা ॥ [২২ সংখ্যক, সরহপাদ]

It is for nothing that people cause bondage to themselves by creating the world and *Nirvāṇa.*

অম্ভে ণ জান হূঁ অচিন্ত জোই
জাম মরণ ভব কইসন হোই ॥

We are transcendental yogis ; we do not know how there can be birth, death and existence.

জইসো জাম মরণ বি তইসো
জীবন্তে মঅলে নাহি বিশেসো ॥

As is birth so is death. There is no distinction between them.

জা এথু জাম মরণে বিষঙ্কা
সো করউ রস রসানেরে কংখা ॥

He who is afraid of birth and death may long for remedy against them.

যে সচরাচর তিদশ ভমন্তি
তে অজরামর কি মপি ন হোন্তি ।

Those who roam in heaven and earth can never be either without death or without old age.

জামে কাম কি কামে জাম
সরহ ভণতি অচিন্ত সো ধাম ।

Sarah says it is no consideration to us whether *Karma* leads to birth or birth leads to *Karma.*

This being the essential doctrine of the sect to them there is no virtue, no vice, no religious merit and no sin. The only bar to the enjoyment of the objects of senses is the realization of the evanescent character of the world. That attained and you are free to act just as you like. But that realization depends entirely upon the instruction received from the guru and not on anything else. Study, reading, meditation, Tantra and Mantra are all useless, absolutely of no worth. One of the poets says :— Gurus' instruction is nectar. Those fools who never drink it die of thirst in the deserts created by lots of scriptures. One of the poets concludes his *dohākoṣa* by saying the absolute monic mind, which may be compared to a tree spreading over the whole space, flowers and produces the mighty fruit, "পর উআর"— do good to others.

The poets were in a very difficult position in explaining the abstruse metaphysical doctrines of the *Mahāyāna* to to ordinary people, who had no metaphysical training and so they had recourse to metaphors and this was allowable in the teaching of Buddha, who laid great emphasis on *Upāyakausalya*, or as Kern translates it, Skilfulness, *i.e.*, the use of innumerable examples and metaphors. One of the metaphors used, and that constantly, to express the condition when the idea of duality disappears and the idea of monism remains supreme, is the union of males and females. The human mind represents the male and *N*[*a*]*irātmā devī* or void, as female. The void is often called the *Mahāmudrā* the great seal. The mind in approaching the seal gets merged into it. And to impress upon a devoted crowd of listeners, the importance of this approach all the details of a man wooing a woman are given in all their attractive forms, and the final stage of transcendental existence is described by another poet in the following way.

"As salt is merged in water so does the mind in the

wife or *Mahāmudrā*. At once they become one and so they remain eternally."

From this metaphor they have evolved the doctrine of *Mahāsukha* or great and eternal pleasure. A pleasure which you can yourself understand and enjoy but which you cannot explain to another. The guru imparts this knowledge in a language which they call *Sandhyābhāṣā*,[২৪] or twilight language, the use of which is sanctioned by Buddha himself in *Mahāyāna Sūtras*.

These are some of the strong and weak points of the *Sahaja* doctrine to understand the historical development of which will exceed the limits of space at the disposal of the writer.

The influence of the *Sahaja* doctrine permeates the religious thought of the whole of Northern India. The absence of *pāpa* and *puṇya*, vice and virtue, has led to much immorality in certain sects. Krishna is regarded as the only male and the rest of the creation as Prakriti and so any woman may go to any man thinking only that he is Krishna. The exalted position of the guru has induced his disciples to devote their *tan*, *man* and *dhan*, their body, soul and wealth to his service. He is sometimes regarded as greater than even Buddha himself. He is *Lāmā* in Tibet, *Karttā* in Bengal, *Bābā* in Hindustan. He is the only exalted personage in Buddhism and is the sole mediator between God and man in Hinduism. The metaphor of union has led to those amorous statues in Hindu and Buddhist temples, which are a mystery to all observers. It has led to the worship of *Heruk* and *Havajra* and other Buddhist deities united with their Sakties in permanent union. It has led to *Jugal* worship in Vaisnavism and of Siva and Sakti in various forms of union. It has also led to many practices and customs which should not be detailed

২৪. এই বইয়ের পৃ. ৩৫০ সূত্র ২১ দ্র.

in polite society. But it has also given birth to that universal spirit of benevolence which is peculiar to Buddhism and to India and which one of their exalted poets has described as পর উআর. It has brought together the two great Buddhist ideas of *Śūnyatā* and *Karuṇā* and made them harmonize with each other and it has produced that attractive doctrine of union or monism before which pales the Advaita doctrine of Saṁkara. Bengal was the great stronghold of this Advaya doctrine and this is evidenced by so many passages in the songs "*Baṅge jāyā nilesi*," "*Adaya Baṅgāle*," "*Baṅgāli bhaili*," and so on, and it is the influence of the Advaya doctrine which kept Śaṅkara's *Advaitavāda* away from Bengal.

The Calcutta Review
1917

অনুক্রমণী

অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-৮৬ খৃ.) ৪০, ২৬০, ২৬১, ৪৬৩, ৪৬৫, ৫০৭, ৫৮০
অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত ৩৫
অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (১৮৫০-৯৮ খৃ.) ৫২০
অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭ খৃ.) ১১৯-৩৭, ১৭০, ৫৬৬, ৫১৮, ৭০৯
অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৫০-১৯১৫ খৃ.) ৫৪৭
অঘোসাধব ৪৩২
অচল সেন ৩২৯
অচিত, অচিতি ৪০২, ৪৪২
অচিন্ত্য ৪৪২
অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী (১২৭৪-১৩৫৩ ব.) ৬৮৪
অনুকূলচন্দ্র রায় ৮০৩, ৮৩৪, ৮৩৮
অদ্বয়বজ্র ২৭৮, ৩০২-০৩, ৩২১, ৩২৩, ৩২৭-২৮, ৩৫০, ৩৯৬, ৪০২, ৪৪০, ৪৪৫, ৮৫৩
অদ্বৈত আচার্য ২৮৮
অধরলাল সেন (১৮৫৫-৮৫ খৃ.) ২১৪-১৬
অনঙ্গ ৪৪৪
অনঙ্গবজ্র ৩৩৮, ৪২৪
অনাথনাথ বসু ২০৮
অনাথপিণ্ডদ ৪৫১
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৭৫-১৯৩৪ খৃ.) ১৮৩, ১৮৫
অপার্ট, Gustav Salomon Oppert (১৮৩৬-১৯০৮ খৃ.) ৩১৩, ৩৪৬
অফ্রেখ্ট, Theodor Aufrecht (১৮২২-১৯০৭ খৃ.) ৭৪, ৭৭
'অবদান কল্পলতা' ৬৭
'অবদানশতক' ৪২৭
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১ খৃ.) ৫৩৫
অবলোকিতেশ্বর ৩৩৮
অভয়াকর গুপ্ত ২৭৮, ৩০৩, ৩২৭, ৪৪৭, ৬৯৯
অমরেন্দ্রনাথ রায় ৭৯১
'অমরুশতক' ৭৭৬
অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ (১৮৭৭-১৯৪০ খৃ.) ৯৪, ১১৪, ১৮৬, ৪৫৯, ৪৭২, ৭৮২
অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯ খৃ.) ১০৩, ১০৫, ১৮৩, ১৮৫, ২৬৫-৬৬, ৭৩৬, ৭৩৭, ৭৪৮
অমৃতানন্দ ৪৭০
অযোগী ৪৪১
অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০ খৃ.) ১৬১-৬২, ১৬৮-৬৯, ১৭৩-৭৪
অর্থশাস্ত্র ১১৩, ৪৬১
অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী (১৮৫০-১৯০৮ খৃ.) ৯৮-১১৪, ৭০৭
অল্-বীরূনী (৯৭৩-১০৪৮ খৃ.) ৩৯৮, ৪২৬-২৭
অশ্বঘোষ ৪২৭
অশোক ২৮১, ৩৬৭, ৬৯১
অসঙ্গ ৩০০
অস্লান ৭৬৭
আকবর ১৭৯, ৭৫৫, ৮৩৫
আজিম্-উদ্-দৌলা ৫৪০
আজীবক ৪৫২
আত্মারাম ঘোষ ৫৮০-৮১
আদিশূর ২৯৬, ৩২০

আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৩
আনন্দবজ্র, ঠাকুর ৪৭০
আনন্দমোহন বসু (১৮৪৭-১৯০৬ খৃ.) ৫৬
আপস্তম্ব ২৯৮
আবদুল করিম, মৌলবি (১৮৭১-১৯৫৩ খৃ.) ৮৪৭
আবদুল গফুর সিদ্দিকি (১৮৭৫-১৯৬১ খৃ.) ৩৭৪
আয়িপন্থ ৬৭৬-৭৭
আর্যদেব, আজদেব, কাণেরিন্, বৈরাগীনাথ ৩৯৩, ৩৯৬, ৪০৪, ৪০৫
আর্য মৈত্রেয় ৩৩০
আর্যাসপ্তশতী ৭৭৬
আরঙ্গজীব ৫৮৩, ৭৮৬
আলম শাহ্ ৭৬৯
আলাউদ্দিন হুসেন শা ৮২০-৩১, ৮৩৫
আলিপুর বোমার মামলা ১৬১, ১৭৩
আলিবর্দি খাঁ ৭৩০
আশুতোষ চৌধুরী (১৮৬০-১৯২৩ খৃ.) ৩৫
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৪-১৯২৪ খৃ.) ৪২, ১৮২, ১৮৫, ১৮৬, ২০২, ২১০
আশ্বলায়ন ২৯৮
আসোপা দাধীক রামকরণ ২২৩
ইউনিভার্সিটি, কলকাতা ৩৬, ৪২, ৫৬, ৬৩, ৬৯, ৭৫, ১২২, ১৯৮-৯৯, ২০১-০২, ২০৬, ২০৮-১১, ২১৫-১৬, ২৫২, ৩০৩, ৭৯৯
ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ, তৃতীয় ৫২৬
ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ (১৮৫৭ ?-৯৪ খৃ.) ৫, ৮
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১ খৃ.) ১৩৪, ৫১৮
. ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ৭৩১
ইন্দ্রভূতি ৩৯২, ৪২১-২৩, ৪২৫, ৪৪২, ৪৪৪
ইন্দ্রানন্দ ৪৭০
ইয়ংবেঙ্গল ৫০৪, ৫১০, ৫১৯
ইরপাদ ৪৭১
ইলিয়ট, স্যার চার্লস, Charles Alfred Elliot ৪৩, ৫৬
ইলিয়স শাহ্ ৬৫৩, ৬৭৯, ৬৮৫, ৮৫০
ইসলাম খাঁ ১৭৯
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ২৫৪

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৬-৯৭ খৃ.) ৩৪, ৫১৯
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-৫৯ খৃ.) ১২৬, ২৫২, ২৫৮, ৫০৫, ৫১৪, ৫১৬
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১ খৃ.) ১২২, ১৫০, ১৯১, ১৯৫, ২০০, ২০৬, ২৫১, ২৫৯, ৩১৫, ৩১৭, ৩৬৫, ৪৬৩, ৫০৭, ৫২১, ৫৫৭, ৫৬০, ৫৯৮, ৬০৬, ৬০৮, ৬১৭, ৬১৮, ৭০৭, ৭৩৮, ৭৮৯-৯০, ৮৪১
ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ৮
ঈশ্বরপুরী ২৪৪, ২৮৮

উইদার, George Wither (১৫৮৮-১৬৭৭ খৃ.) ৫৭৮, ৫৮৯
উইলকিন্‌স, Charles Wilkins (১৭৪৯/৫০-১৮০৬ খৃ.) ৩৪৫
উইলসন, Horace Hayman Wilson (১৭৮৬-১৮৬০ খৃ.) ২৫৪, ২৬১, ৪৬৫, ৪৭০, ৭৩২
উড্ডীয়ান ৪২৩
উদয়ন, রাজা ৩১০
উধিতি ৪৪৩

উন্মন ৪৩২, ৪৪৪
উপনিষদ ৭, ২৫৭, ৪৫২
উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব ৭৪৯
উপেন্দ্রনাথ দাস (১২৫৫-১৩০২ ব.) ৫১৯, ৫৩৯
উমাকিশোর রায় ৮৩৭
উমাপতি ওঝা ৭৮৪
উমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪০-১৯০৭ খৃ.) ২১০
উমেশচন্দ্র বটব্যাল (১৮৫২-৯৮ খৃ.) ১৫, ৫০, ৫৯
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৯০৬ খৃ.) ২০১
উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ৩৭৩

একেন্দ্রনাথ ঘোষ (মৃ. ১৩৪১ ব.) ৪৬০
এডওয়ার্ড, সপ্তম (১৮৪১-১৯১০ খৃ.) ২২২, ২২৩, ২৩৫, ৫৩৯
এডগার, John Ware Edgar (১৮৩৯-১৯২০ খৃ.) ১৮১, ১৮৭
এডিসন, Joseph Addison (১৬৭২-১৭১৯ খৃ.) ৩৬৪, ৩৭৬, ৪৭৫
এশিয়াটিক সোসাইটি ৫১, ৫৫, ৫৯, ৬২, ৬৭, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭৪, ৭৫, ১৪৮, ২১১, ২২৫, ৩১০, ৩১৩, ৩১৫, ৩১৯, ৩২৮, ৩৩১, ৩৪৩, ৪৫১, ৪৫৮, ৭১৭, ৭২৬

‘ঐতরেয় আরণ্যক’ ৪৬৫, ৪৭১
‘ঐতরেয় ব্রাহ্মণ’ ২৭৫

ওদন্তপুরী বিহার ২৯৯
ওয়াটারলুর যুদ্ধ ৪৮৪
ওয়াডেল, L. Austine Waddel ৩৯৭, ৪২৩
ওয়ার্ডসওয়ার্থ, William Wordsworth (১৭৭০-১৮৫০ খৃ.) ৪৭৫, ৪৮১, ৪৮৩
ওয়াশীলজু, Wassiljew দ্র. ভাসিলিয়েফ
ওয়েবস্টার, J. Webster (১৮৫০ ?-১৬২৫ খৃ.) ৫৭৮, ৫৮৯
ওয়েলেস্‌লি, M. R. C. Wellesley ৫০২
ওর্সশরিফ ২৯০
ওসমানআলি মহম্মদ (১৪২৯-৮১ খৃ.) ৫০৯

কাকিলী ৪৪৪
কঙ্কণ ৩৯০, ৪৪১, ৮৫০
কঙ্করী ৪৪০
কঙ্কালিনী ৩৯৩, ৬৪৩, ৬৪৪
কটন, হেনরি Henry John Stedman Cotton (১৮৪৫-১৯১৫ খৃ.) ২০১
কনখল, কনখলা ৪৩২, ৪৪৩
কনগ্রীব, W. Congreve (১৬৭০-১৭২৯ খৃ.) ৫৭৮, ৫৮৯
কন্থলি, কণ্ঠারি, কন্দালি ৪৪৩
কপালি, কপালী ৪৩২, ৪৪৩
কবিওয়ালা ২৫৬, ৫০২, ৫৬২
কবীন্দ্র পরমেশ্বর ৮৩১, ৮৩৪, ৮৩৮
কমল-কঙ্গারি ৪৩২, ৪৪১
কমলকৃষ্ণ বসু ৩৭৩
কর্মারি, কমারী ৪৪৩, ৫৩২
কম্পারি ৪৪২
কম্বল, কম্বলাম্বরপাদ ৩৯০, ৪০৪, ৪০৫, ৪২১-২২, ৪৪১, ৮৫০
করণী ২১৯

করবৎ ৪৩২, ৪৪৪
'করীমা' ৭
কর্ডিয়ার, P. Cordier (মৃ. ১৯১৪ খৃ.) ৪০৩, ৪২০
কর্ণ, চেদিপতি ৯৩, ৬৪৩, ৬৪৪, ৬৮৩
কর্ণারি ৪৪১
কর্নওয়ালিস, C. Cornwallis (১৭৩৮-১৮০৫ খৃ.) ৪৯৮, ৫২৬, ৭২৯
কর্মপাদ ৩৯৯
কর্মাদিত্য ঠাকুর ৭৬৫
কল কল ৪৪৩
কল্যাণবর্মন, রাজা ৩৫২
কল্যাণশ্রী ২৯৯
কল্যাণী মল্লিক ৩০৩
কাওয়েল, E. B. Cowell (১৮২৬-১৯০৩ খৃ.) ৬২
কাগুলি ৪৩২
কাত্যায়ন, বররুচি দ্র.
কানফাট্ যোগী ৪৫৩
কানিংহাম, Alexander Cunningham (১৮১৪-৯৩ খৃ.) ৫৪২
কান্যকুব্জ ৭৫২
কামার, কামরী ৪৩২, ৪৪৪
কামালি ৩৯০
কামিনী সেন ৫৩৪
কামেশ্বর ৭৮৩
কায়েন সিংহ ২২০
কারমাইকেল, Lord Carmichael ২৪০-৪১, ২৮৬-৮৭
কারসন, Dave Carson ১১২
কার্জন, G. N. Curzon (১-৮৫৯ ১৯২৫ খৃ.) ৩৪, ৩৫, ২১২, ৫৫৩
কাল ৪৪১
কালচক্রযান ৩৯০-৯১, ৩৯৩, ৩৯৯, ৪৩৮, ৬৯৩, ৭২৭
কালিদাস ৮, ১৯, ২৩, ৩১, ১৬৩, ১৬৮, ১৮১, ১৮৪, ১৮৫, ৩০৬, ৩৬৩, ৪৭৫, ৪৭৭, ৪৮১-৯২, ৬০৯, ৬৩৮, ৬৪১, ৭৩৩
কালিদাস নাগ (১৮৯১-১৯৬৬ খৃ.) ১০৬
কালীধন সরকার ৭৫
কালীনাথ হালদার ১১৪
কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩-১৯১০ খৃ.) ২৬, ৫১৬-১৭, ৭৪২
কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-৭০ খৃ.) ৫০৭, ৫২৮, ৭৩৮, ৭৩৯
কালু রায় ২৪৫, ২৮৮-৮৯
কাশীরামদাস ৩১৬, ৪৩৬, ৪৭৫, ৪৭৭, ৫৬২, ৬০৬, ৭১৩, ৮২৪
কাহ্ন, কাহ্নু, কাহ্ন, কাহ্নপাদ, কৃষ্ণপাদ, কৃষ্ণাচার্য, কৃষ্ণবজ্র ২৭৭, ৩০১-০২, ৩২১, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৮৬-৮৭, ৪০৪-০৫, ৪৩২, ৪৪০, ৬৪৪, ৬৮০, ৮৫০
ক্যাম্পবেল, George Campbell ৫১
কিরণচন্দ্র দত্ত ৯৪
কিলপাদ, কিরব ৩৮৩, ৪৪৩
কিশোরীমোহন গোস্বামী ৬২১
কীর্তিবর্মা, চন্দেলরাজ ৯৩
কীর্তিসিংহ ৭৬৬, ৭৬৭, ৭৬৯, ৭৮৩
কুক্কুরীপাদ, কুকুর-রাজ ৩৯৫, ৪০৪, ৪০৮, ৪২৫, ৪৪১, ৪৪৬
কুঞ্জবিহারী বসু ১৩২
'কুট্টনীমত' (দামোদর গুপ্ত রচিত) ৬৫৮, ৭০৩, ৭১৯
কুমারি, কুমারী, কুম্ভকার ৪৩২, ৪৪৩

কুমারিলভট্ট ৮১, ৯৩
কুশী ৪৪১
কৃত্তিবাস ৩১৬, ৪৭৫-৭৭, ৫৬২, ৬০৬, ৬৪০, ৬৭৯-৮০, ৮২৪, ৮৩১, ৮৩৫, ৮৩৬, ৮৩৭
কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য (১৮৪০-১৯০২ খৃ.) ৭০৭
কৃষ্ণচন্দ্র, মহারাজ (কৃষ্ণনগর) ২৪৯, ৫০৩, ৫২৮, ৫৭৯, ৫৮৪, ৭০১, ৮২৫
কৃষ্ণদাস, ভারত সোদী ২৩৬
কৃষ্ণদাস কবিরাজ ২৮৮, ৫৭৮, ৮১৬
কৃষ্ণদাস পাল (১৮৩৮-৮৪ খৃ.) ৬১, ৬৩-৬৪, ৬৫
কৃষ্ণমিশ্র ('প্রবোধচন্দ্রোদয়') ৮৩, ৯৩, ৯৬
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-৮৫ খৃ.) ১৯৭, ৫০৫
কৃষ্ণরাম দাস ২৪৮, ২৯২, ৫৭৮-৯২, ৮৩৯
কৃষ্ণসিংহ ২২৩
কৃষ্ণসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য ২৪৭-৪৮
কেঙ্গুর, কাঞ্জুর ৪২০
কেদারনাথ দত্ত ৮৩৮
কেদারি পা ৪৩২, ৪৪৪
কেরি, উইলিয়াম William Carey (১৭৬১-১৮৩৪ খৃ.) ১৫৬, ২৫৮, ৫০২, ৫২৭, ৭০৭
কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪ খৃ.) ১৫, ১৩৫, ২৬০
কোটালি, উদ্দালিপাদ ৪৪২
কোরান শরীফ ৫৭৬, ৫৭৭
কোহল ১০৬, ১১৩
কৌঙ্কণপাদ ৪০৪, ৪০৯
'কৌলজ্ঞাননির্ণয়' ৩৩৯, ৪৫৪, ৪৬৬
'কৌশীতকী আরণ্যক' ৪৭১
ক্রফ্‌ট, Alfred Woodley Croft (১৮৪১-১৯২৫ খৃ.) ৬৯, ২০১, ২১১
ক্লিদি সোঁসান ৩৩৪
ক্লাইব, Robert Clive ২৪১
'ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি' ৬৯৭
ক্ষপণক ৩২৪
ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৯-১৯৩৭ খৃ.) ১৪১
ক্ষীরোদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৮
ক্ষেমানন্দ কেতকা দাস ৮২৪

খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১১৭
খড়্গ ৪৪০
খণ্ডী ৪৪১
খনা ৭৫১-৬০
খাজুরাহো ৮১
খারবেল ৩৬৭

গগন পা ৪৩২, ৪৪৪
গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, দেওয়ান ৮
গঙ্গাচরণ সরকার (১২৩০-৯৫ ব.) ১২২-২৪. ১৩০, ১৩৫, ১৩৬
গঙ্গামণি দেবী ১৪১
গণপতি, গণেশ্বর ৭৮৬
গণপতিচন্দ্র গুপ্ত ২৩৬
গণপতি সরকার ৯৪, ৪৬২
গণেশ, রাজা ৬৫১-৫২, ৬৭৯
গণেশদান ২১৯
গণেশ দৈবজ্ঞ ৭৫৬

গমার ৪৩২, ৪৪৪
গাজী সাহেবের গান ২৮৯
'গাথা সপ্তশতী', 'হালা সপ্তশতী' ৬৭৩, ৭৭৬
গাফ, A. E. Gough ৬২
গ্যারিক, David Garrick (১৭১৭-৭৯ খৃ.) ১০৬, ১১৩, ৭৪৬
গ্যারিবল্ডি, G. Garibaldi (১৮০৭-৮২ খৃ.) ৭৪২
গিয়াসুদ্দিন আজম শা ৬৫৩, ৬৮৫
গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী (১৮৬২-৯৯ খৃ.) ৩৫
গিরিধর ৮২৫
গিরিবর ৪৩২
গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২ খৃ.) ১১২, ২৬৫-৬৬, ৭৩৬, ৭৩৭, ৭৪৬-৭৪৮
গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন (১৮২২-১৯০৩ খৃ.) ১৫, ৭৩৭
গিরিশচন্দ্র দেব ১৮৯
গুণানন্দ ২৯৮
গুণ্ডরীপাদ ৩৮৭, ৪০৮, ৪০৯, ৪২১, ৪৩৮
গুনি ৪২৩
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৯১৮ খৃ.) ৫, ১৮৮-২১৩
গুরুভট্টারক ধৃষ্টিজ্ঞান ৩৯৭
গোকুল ঘোষাল, রাজা ২৫৭
গোকুলানন্দ সেন ৭৪৫, ৮২৬
গোপালচন্দ্র রায় ৫৩
গোপালচন্দ্র সরকার শাস্ত্রী ৫০
গোপীমোহন দেব ২৫৮
গোবর্ধন ৮৩০
গোবিন্দ ৪৩২, ৪৪৪
গোবিন্দনাথ, নাটোরের মহারাজ ১৮৬
গোবিন্দরাম মিত্র (মৃ. ১৭৬৬ খৃ.) ৫৮১, ৫৯০
গোবিন্দলাল দত্ত ৫২৫
গোবিন্দসুন্দর ত্রিবেদী ৯২
গোরক্ষনাথ ৩৩৮, ৩৫৪, ৪৩২, ৪৪০
গোরাচাঁদ, পীর ২৪৫-৪৬, ২৮৯
গোবুড় বা বাগুরি ৪৪২
গোল্ডস্মিথ, Oliver Goldsmith (১৭২৮-৭৪ খৃ.) ৪৭৫
গোঁসাই গোরাচাঁদ ২৯০
গোঁসাই ভট্টাচার্য ৫০০
গৌতম ২৯৮
গৌরমোহন আঢ্য (১৮০৫-৪৬ খৃ.) ৭০৮
গৌরীশঙ্কর (হীরাচাঁদ) ওঝা ৬৯০
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (গুড়গুড়ে) (১৭৯৯-১৮৫৯ খৃ.) ১৯৭, ২৫৭-৫৮, ২৯৪, ৩১৫, ৫০৪
গ্রান্ট, Colesworthy Grant (১৮১৩-৮০ খৃ.) ১৪৮, ১৫৩
গ্রান্ট, Peter Grant ৫৭৬
গ্রীয়ার্সন সাহেব, G. A. Grierson (১৮৫১-১৯৪১ খৃ.) ৫১, ২২৭, ২৩০, ৩৩৩, ৭৫৪
গ্রে, E. Gray ১৫৮

ঘটকসিংহ ৭১১
ঘণ্টাপাদ ৪৪২
ঘনরাম ৮২৪, ৮৩৬, ৮৩৭, ৮৪৪
ঘনশ্যাম দাস ৭৩০, ৭৪৫
ঘিয়াস-উদ্-দীন তুঘ্‌লুক ৪৫১

চক্রশম্বর ৩৯৩

চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনী ১৩১
চণ্ডী ১৯৬
চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৮-১৯১১) ১৭২, ১৭৪
চণ্ডীদাস ৩৬৭, ৬২৯, ৬৪২-৮৬, ৭১৩ ৭৪৩, ৮৪২, ৮৪৩, ৮৪৪
চণ্ডেশ্বর, সান্ধিবিগ্রহিক ৭৬৬, ৭৮৩
চন্দনপাল ৩০২
চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার (১৮৩৬-১৯১০ খৃ.) ৭১১
চন্দ্রকামিনী দেবী ৯২
চন্দ্রকেতু, রাজা ২৪৬
চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪-১৯১০ খৃ.) ২৬, ৩৪, ৫৬, ১২৫, ১৩৪, ৫৩৭, ৫৩৮
চন্দ্রমাধব ঘোষ (১৮৩৮-১৯২৮ খৃ.) ২০১
চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯২২ খৃ.) ৩৪, ১৩৪, ৫১৮
চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ ৫৩৭
চর্পাড়ি, চর্পটি ৪৩২, ৪৪৩
চর্মারিপাদ ৪৪০
চম্পক ৪৩২, ৪৪৩
চর্যাপদ, চর্যাগীতি, 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' ২৯৮, ৩০১, ৩০২, ৩০৪, ৩২১, ৩২৫, ৩৩২, ৩৩৫-৩৬, ৩৩৮, ৩৪২, ৩৫০-৫৩, ৩৮৪-৮৫, ৪০০, ৪২০, ৪২২-২৩, ৪২৫, ৪২৮-২৯, ৪৩৬, ৪৪৪, ৪৪৬, ৪৬২, ৬৮১, ৭০১, ৭০৩, ৭০৫, ৭৫৩-৫৪, ৭৬০
চসার, Geoffrey Chaucer (১৩৪০?-১৪০০ খৃ.) ৪৭৫, ৬১১
চার্টার অ্যাক্ট ৭৪৬
চাটিল ৩৯৩, ৪০৪, ৪১০, ৪২৪, ৪৩২, ৪৪৪, ৬৮০
চান্দন ৪৩২, ৪৪৪
চামরীনাথ ৪৩২
চামার ৪৪০
চারণ ৩১৫
চারুচন্দ্র ঘোষ ৬০৫
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮ খৃ.) ৯৪
চারু রায় (১৮৯০-১ খৃ.) ৯৪
চাঁদ কবি, ('পৃথ্বিরাজ রাসো') ২২৬
চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫ খৃ.) ১৫৯-৭৪
চিন্তাহরণ চক্রবর্তী (১৯০০-৭২ খৃ.) ৪৬২
চিপিল ৪৩২, ৪৪৪
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ৪৯৯, ৫২৬, ৭২৯
চুণীলাল বসু ৪৮, ১৫৪
চূড়ামণি দাস ৫৭৮, ৮৩৮
চূর্ণী, কথকদের ১৩১
চেরো ৪৬৫, ৪৬৬, ৪৭১-৭২
চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩ খৃ.) ১৩৭, ২৪৪, ২৭৭, ২৮০, ২৮৮, ৩১৬, ৩৬১, ৩৯৮, ৫৮৪, ৭৩১, ৭৬১-৬২, ৭৮২, ৮১৩-১৭, ৮২০-২১, ৮২৪, ৮২৬, ৮৩০, ৮৩৫, ৮৩৭, ৮৪২, ৮৫৪
চৌরঙ্গীনাথ ৪৩২, ৪৪৩

ছত্র ৪৪১
ছুটিখাঁ ৩১৯, ৮৩৩, ৮৩৮, ৮৫৫

জগৎরাম ৮৩৯
জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় ৫৩৯
জগদিন্দ্রনাথ রায় (১৮৬৮-১৯২৬ খৃ.) ১৮০-৮৭

জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৯-১৯৩৭ খৃ.) ১৬৮
জগদীশ তর্কালংকার ২০, ২৫২
জগদীশনাথ রায় (১৮২৫-৮৭ খৃ.) ৩৪
জগদ্বন্ধু ভদ্র (১৮৪২-১৯০৬ খৃ.) ১৯৭, ১৯৮, ২১১, ২৬২
জগন্নাথ, (নরহরি দাসের বাবা) ৭৪৫
জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন (১৬৯৪-১৮০৭ খৃ.) ৫০০-০১
জগমোহন ২৪৭, ২৯১
জঙ্গবাহাদুর ৪০১, ৪২৮
জন ক্লেবল্যাণ্ড, John Cleveland (১৬১৩-৫৮ খৃ.) ৫৭৮, ৫৮৯
জন চর্লখিল, John Chalkhill ৫৭৮, ৫৮৯
জনসন, Samuel Johnson (১৭০৯-৮৪ খৃ.) ১:৩
জয়কৃষ্ণ ১৯
জয়গোপাল ৬৭৯
জয়জীরাও ৫৫৬
জয়দত্ত ৭০
জয়দেব ৭০, ২৪৮, ২৫৫, ৩৫২, ৫১৩, ৬৪৪-৪৬, ৬৫৪, ৬৫৬, ৬৬৯-৭৩, ৬৭৫, ৬৮১, ৬৮৫, ৭৪৩, ৮৪২
জয়নন্দী, জয়ানন্দ ৩৯৪, ৪০৪, ৪১০, ৪৪৩
জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন (১৮০৬-৭২ খৃ.) ১৯৩, ১৯৪, ৫০১
জয়রুদ্রমল্ল ৪৫১
জলধর সেন (১৮৬০-১৯৩৯ খৃ.) ৮৮
জালন্ধর. জালন্ধরিপাদ, জালন্ধরী ৩৫৪, ৪৩২, ৪৪২
জালালুদ্দিন ৬৫১
জাহাঙ্গীর ১৭৯, ১৮২, ২৪৭, ৭৫৫
জাহোর ৩৮৫, ৪২১, ৪২৯
জিয়াউদ্দীন ('তোতিনামা') ৯
জীব গোস্বামী ৬৭৬, ৮২৯
জীবন ৪৩২
জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৫২৮
জীমূতবাহন ('দায়ভাগ') ১৯৫, ৭১১
জেতারি ৪২৬
জেলালউদ্দিন ৬৭৯
জেৰ্মানি ৭১৭, ৮৩১, ৮৩২, ৮৩৮
জোন্স, William Jones (১৭৪৬-৯৪ খৃ.) ৩১০, ৩৪৩
জ্ঞানদাস ৭৬২
জ্ঞানসিংহ ৪৪১
জ্ঞানসিদ্ধি ৪৪১
জ্ঞানাঞ্জন পাল ১৭২, ১৭৪
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫ খৃ.) ৯৪, ৫৩২
জ্যোতিরীশ্বর কবিশেখরাচার্য ('বর্ণনরত্নাকর') ৪৩১, ৪৩৯, ৪৪৪, ৪৫১, ৬৫৮, ৬৮০, ৭৬৫, ৮৪৪
জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১২৬৫-১৩৪২ব. ৪২, ৪৭, ৫৬, ১৭২, ১৭৪

টঙ্কদাস, টঙ্গদেব, ডঙ্গদাস ২৭৯, ৫০৪
টনি, Charles H. Tawney ৩১
টমসন, James Thomson (১৭০০-৪৮ খৃ.) ৫৭৮, ৫৭৯
টিপু সুলতান ৪৯৭, ৫২৬
টুঙ্গী ৪৪৪
টেনিসন, Alfred Tennyson (১৮০৯-৯২ খৃ.) ৪৭৫, ৪৮০
টোঙ্গী ৪৪৪
টেম্পল, Richard Temple ১৫, ১৬

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় (১৮৫১-১৯০৩ খৃ.) ৩৪, ১৭৪

ডর্বিনি, J. H. M. D'Aubigné ৭৪৬
ডাক **৭৫১-৫৯**
'ডাকার্ণব' ৩২০, ৩৫০, ৩৫১, ৩৯৯, ৬৪৪, ৭৫৩
ডাফিন, কর্নেল ১৩৬
ডাল্‌হৌসি, Lord Dalhousie ৭২৯
ডিকুইন্সি, Thomas De Quincey (১৭৮৫-১৮৫৯ খৃ.) ৪৭৫
ডুম্বরি ৪৪৪
ডোম্বী ৩৯৪, ৪০৪, ৪১১, ৪৪০, ৪৪১
ডেবেনান্ট, William D' Avenant (১৬০৬-৬৮ খৃ.) ৫৭৮, ৫৮৯
ডোম্বী-হেরুক ৪২২, ৪২৪
ড্রাইডেন, John Dryden (১৬৩১-১৭০০ খৃ.) ৪৭৫, ৪৮০

ঢেণ্‌ঢণ, ধেতন ৩৮৭, ৩৮৮, ৪০৪, ৪১১, ৪৪৪, ৮৫০
ঢেণ্টস ৪৩২
ঢেঁকচন্দ্র ফুকন্‌ ১৪৫
তংশো পেন্‌লো ৪৯৮
তন্তি পা ৪৩২
তন্ত্রযান ৪৩৮
তাও-আন্‌ ২৯৬
তাড়কপাদ ৩৯৪, ৪০৪, ৪১১, ৪৪৫
তাঁতিয়া রায় ৫৫৬
তান্তীপাদ ৪৪০
তাঙ্কে, তন্ত্রপাদ ৪৪১
তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-৯১ খৃ.) ৫২০, ৫৪৫
তারনাথ ৩০২, ৩০৩, ৩০৪, ৩২৮, ৩৩৮, ৩৫০, ৩৫২, ৩৫৪, ৪২২, ৪২৪-২৫, ৪২৯, ৪৫৪, ৮৫২
তাম্রলিপ্ত ২৬৯, ২৭২, ২৯৬
তারানাথ তর্কবাচস্পতি (১৮০৬-৮৫ খৃ.) ৫০১
তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য কাব্যকণ্ঠ ১৬৬, ৪৬৪
তারাশঙ্কর তর্করত্ন (মৃ. ১৮৫৮ খৃ.) ১৪৪, ৪৮১, ৫৬৩, ৬০৮, ৭৩৭
তিলপাদ ৩৩৮
তৌলিপ, তিলোপা, তৌলিপো ৩৯৮, ৪৪১
তুজী ৪৩২
তুলসীদাস ৭৩৩
তেঙ্গুর, টেঙ্গুর, তাঞ্জুর ২৭৯, ৩০১-০৪, ৩২২, ৩২৮, ৩৩৭, ৩৫৩-৫৪, ৩৮২, ৩৮৫-৮৬, ৩৯১, ৩৯৩-৯৪, ৩৯৬, ৩৯৯, ৪০২-০৩, ৪২০-২৬, ৪২৮-২৯, ৪৪৬, ৪৬৩, ৬৮০, ৮৫১
তৌলি ৪৪৩
তেস্‌সিতোরি, L.P. Tessitori ২২৭-২৮, ২৩০-৩৫
'তৈত্তিরীয় আরণ্যক' ৭৬
'তত্তিরীয় ব্রাহ্মণ' ৭৬
ত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২০৬
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯ খৃ.) ৩০৪
তোডরমল, রাজা ২৫৪

থ্যাকারে, W. M. Thackeray (১৮১১-৬৩ খৃ.) ৪৭৫

দক্ষিণ রায় ২৪৫, ২৪৮, ২৮৮, ৫৮১, ৫৮৫, ৫৯১
দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪-১৮৭৮ খৃ.) ২৯৪

দণ্ডী ২৭২, ২৯৭, ৩২১, ৩৪৮, ৪৭৫, ৪৮১, ৬০৯, ৭০৭, ৮৪২
দময়ন্তী দেবী ২৮৮
দর্পনারায়ণ ঠাকুর (১৭৩১-৯৩ খৃ.) ২৫৭
'দশভূমীশ্বর', 'দশভূমক' ২৭২, ২৯৭
দশশালা বন্দোবস্ত ২৫৭, ৫২৬
দাক্ষী (পাণিনির মা) ৩৭৬
দাতারাম রায়চৌধুরী ৪৭০
দান্তে Dante (১২৬৫-১৩২১ খৃ.) ৬১১
দামলিপ্তী ২৭০
দামলজাতি ২৭০
দায়ূদ, সুলতান ২৪৭
দারিক ২৭৭, ৩০১, ৩০৭. ৩৯৩, ৪০৪, ৪১২, ৪৩২, ৪৪৩, ৪৪৬, ৮৪৯,
দাশরথি রায় (১৮০৬-৫৭ খৃ.) ১৩৪, ৫১৮
দিঙ্ক ৪৪১
দ্বিজমাধব ৮২৪
'দিব্যাবদান' ৪২৭
দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬, ৫৪
দীননাথ ধর (জ. ১৮৪০ খৃ.) ১২৮-২৯
দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-৭৩ খৃ.) ৯৯, ১০৩, ১১১, ১১২, ১৪০, ২৫২, ২৬৪-৬৬, ৪৭৫, ৪৮২, ৫০৫, ৫১৪, ৭৯০
দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৯০-১৯৫৭ খৃ.) ৫৯১
দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯ খৃ.) ৩০৩, ৩১৯, ৩৬০, ৩৬৬, ৪০৪, ৫৫১, ৫৮৪, ৮৪৬,
দীপঙ্কর চন্দ্র ৩০১
দীপঙ্কর রাজ ৩০১
দীপঙ্কর ভদ্র ৩০১
দীপঙ্করশ্রী জ্ঞান, অতিশ (৯৮২-১০৫৪ খৃ.) ২৭৭, ২৯৯-৩০০, ৩০৪, ৩৩৭, ৩৫৩, ৩৫৮, ৩৮৪, ৪২৬, ৪৩৫, ৪৪৪, ৮৫০
'দীপবংশ' ২৯৫
দুখী শ্যামরায় ৮২৫
দুর্গা ঘোড়েল, দুগো ঘড়েল, দুর্গাচরণ ঘড়িয়াল ১০৮, ১১৩-১৪
দুর্গাদাস ত্রিবেদী ৮৮
দুর্গাদাস দাস ৫৩৯
দুর্গাপ্রসাদ ৫০১
দুলাল বৈজল, দেব বৈজল ২৯১
দেবসিংহ ৭৬৬, ৭৬৯, ৭৮৩
দেবাদিত্য, সান্ধিবিগ্রহিক মন্ত্রী ৭৬৫
দেবীপ্রসাদ মুন্সী ২৩৫
দেবীবর ৭৯৫-৯৬
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫ খৃ.) ২৬০, ৫১৭
দেবেন্দ্রবিজয় বসু (১২৬৪-১৩২৬ ব.) ১৩৮-৪২
'দোহাকোষ' ৩০২, ৩২১, ৩২৩, ৩২৭, ৩৩৪, ৩৩৬, ৩৫০-৫১, ৩৮২, ৩৯৮, ৪০২, ৪২২, ৪৩০, ৪৪৫, ৫৫১, ৮৪৯, ৮৫৩, ৮৫৭
দোলি, দোলী ৪৩২, ৪৪৪
দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬ খৃ.) ২৬০
দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮১৯-৮৬ খৃ.) ২৫১, ৫০৫, ৫১২
দ্বিজ বংশীদাস ২৭৩, ২৯৭
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬ খৃ.) ২৮৬, ৫১৭, ৫৩১
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩ খৃ.) ১০৩, ২৬৫
ধনশ্রী মিত্র ৬৯৯
ধরণী কথক (১৮১৩-৭৫ খৃ.) ১৪, ১৫, ২৪

ধর্মকীর্তি ৩০০, ৩৫৩
ধর্মগুপ্ত ২৮০
ধর্মঠাকুর ৩১৭-১৯, ৩৩৭, ৩৫৪, ৩৬১, ৩৬২, ৮২৪, ৮৩১, ৮৩৬, ৮৩৭, ৮৪৪-৪৬
ধর্মপাপতঙ্গ ৪৩২
ধর্মপাল ৩০০, ৩০৪, ৩৫৩, ৪৩৪
ধর্মাকর ৭৪৬
ধহুতি ৪৪৩
ধামপাদ ৩৮৭-৮৮, ৪০৪, ৪০৯, ৪৪২, ৮৫০
ধীরসিংহ ৭৬৬, ৭৬৮, ৭৮৩
ধূর্তিল, দত্তিল ১০৬, ১১৩
ধৃষ্টজ্ঞান ৪৪৫
ধোকড়ি ৪৪২
ধোখণ্ডী ৪৪১
ধোঙ্গপা ৪৩২, ৪৪৪
ধোবী ৪৩২, ৪৪৪

নকুল ৭০
নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ ৩৭৩, ৬১৬
নগ্-ছো লো-চা-বা, Nag-tsho lo-tsā-ba ২৯৯
নগুণ ৪৪৩
নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৭৬৫, ৭৬৭-৬৯, ৭৭১-৭২, ৭৭৬, ৭৭৮, ৭৮০, ৭৮৩, ৭৮৫
নগেন্দ্রনাথ বসু (১৮৬৬-১৯৩৮ খৃ.) ২৮৮, ৩০৪, ৩১৮-১৯, ৪৩৪, ৪৫৯, ৫৫১, ৫৯১, ৬৭৯, ৬৮৩, ৮৪৬
ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৮১, ৪৬১
ননীগোপাল মজুমদার (১৮৯৭-১৯৩৮ খৃ.) ৭৬
নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু (১৮৩৫-৯২ খৃ.) ১৭-১৯, ৮৯
নন্দকুমার রায়, মহারাজ (১৭০৫?-৭৫ খৃ.) ২৫৭
নন্দকৃষ্ণ বসু ২১১
নন্দলাল ঠাকুর ২৯৪
নবকৃষ্ণদেব, মহারাজ (১৭৩৩-৯৭ খৃ.) ২৫৭, ২৫৮
নবাব আলি চৌধুরী ৩৭০
নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯ খৃ.) ৫১৪, ৭৩৫
নয়পাল ৩০০, ৪২৬
নরসিংহ ৭৬৬
নরহরি চক্রবর্তী ৮৩৮
নরহরি দাস ৬৭৪, ৭৩০, ৭৪৫, ৮২৪
নরেন গোসাঁই ১৭৩
নরেন্দ্রনাথ দেব (১৮৮৮-১৯ খৃ.) ৪৭, ৯৪
নরেন্দ্রনাথ লাহা (১২৯৩-১৩ ব) ৪৬১
নরেন্দ্রনারায়ণ, রাজা ৮৫
নরোত্তম দাস ৫৭৮, ৮২৬, ৮৩০
নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য ৪৫৯
নলিনীকান্ত ভট্টশালী (১৮৮৮-১৯৪৭ খৃ.) ৩০৩, ৪২১
নলিনীকান্ত সরকার ৪৭, ৯৪
নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত (১২৮৯-১৩৪৭ ব.) ৪৭, ৮৭, ৯৪-৯৫, ১০৭, ১১১, ১৪১
নসরৎ শাহ্ ৭৬৭-৬৯, ৭৮৫
নাগবলি, নাগবালি ৪৩২, ৪৪৩
নাগবোধি ৪২২, ৪৪৩
নাগার্জুন ৩০০, ৩৫৩, ৩৯৭-৯৮, ৪২২-২৩, ৪২৬, ৪৩১-৩২, ৪৪০
নাগার্জুন গর্ভ ৩৯৯
নাচন ৪৩২, ৪৪৪
নাথপন্থ ৩৫৪, ৩৫৯-৬০, ৪৩১, ৮৫৫

সংযোজন-সংশোধন

পৃষ্ঠা / পঙ্‌ক্তি	শুদ্ধ পাঠ
৬/৭	তিনি যে শুদ্ধ
১৮/৫	দাদার সম্বন্ধে নানা গল্প
৫০/৩৩	গোলাপচন্দ্র
৫১/৮ পঙ্‌ক্তির পরে বসবে :	মৃত্যু জুন ১৯২৮ খৃ.
৬৬/১২	এক শো পাতা পুড়ে
৬৮/১২	তাঁহারাও বুদ্ধদেবের
৭১/২৮	বসিয়া বসিয়া কেবল
৭৬/৬	'মেবারের রাজেতিবৃত্ত' (১৮৬১ খৃ. ?)
৭৬/২১	(১৮৫৯, ৬২, ৯০ খৃ.)
৭৬/১৭ পঙ্‌ক্তির পরে বসবে :	*The Sarva-darśna-Saṃgraha* ; *or, review of the different systems of Hindu philosophy*; Tr. by E. B. Cowell, and A. E. Gough, London 1882.
৯৬/৫-৬	সাধের সাহিত্য সম্মিলনের
১১২/২৭	নিরাভূ (হু)
১৪৪/১৮	তাহাদের আমোদের জন্য
১৬৯/২১	হে অন্তরূপী
১৭১/২২	অহংকারেই গট
২১২/৮	যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু
২২১/৮	যাহা যাহা জিজ্ঞাসার
২২৩/২৮	কৃষ্ণসিংহ[৮]
২৩০/৯	by the bards
২৩০/১১	There are
২৯৪/৩১	যোগীন্দ্রনাথ বসুর
৩২৭/১৫	রস রসানেরে কথা
৩৩৯/৯	প্রভৃতি যত লোকায়ত
৩৫৫/১৮	আর্ষ গ্রন্থ
৩৬৯/৩	মহোৎসাহস-সহকারে
৩৮৩/৮	কীথ্‌
৫৮৫/২০	আটটি গানে

পৃষ্ঠা/পঙ্‌ক্তি	শুদ্ধ পাঠ
৪০৬/২৪	পাএ
৪১৬/২৮	বাজিল
৪১৮/৩	বোহি
৪২১/১১	'?Lahore' লিখেছেন।
৪২১/১৫	*H B-I*
৪৩৯/৯	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'কাশীরাম দাসের মহাভারত আদিপর্ব'-এর ভূমিকা দ্র.
৪৫৩/১৯	nature of the
৫৩০/৯	movement
৫৪৯/২৪	নতুন সংযোজন, বঙ্গদর্শনে ছিল না
৫৫৮/৫	পরিহার্য
৬৫২/৭	উহার মূল যে
৬৬১/২৮	গোয়ালিনির
৬৬৪/৭	তোষিবোঁ
৭১৯/১-২	গ্রামে যে প্রদ্যুম্নেশ্বর
৮০০/৪	encomiums
৮৩১/৩	लस्करि
৮৩১/৬	हाराय
৮৩১/১১	परमेश्वरे
৮৩২/৮	पुच्छिल
৮৩২/১০	भारतेर
৮৩৪/১	समरे
৮৩৪/৮	परमेश्वरे
৮৩৪/৯	परागल
৮৪৪/৩১	Jogendranath [Chandra] Bose,